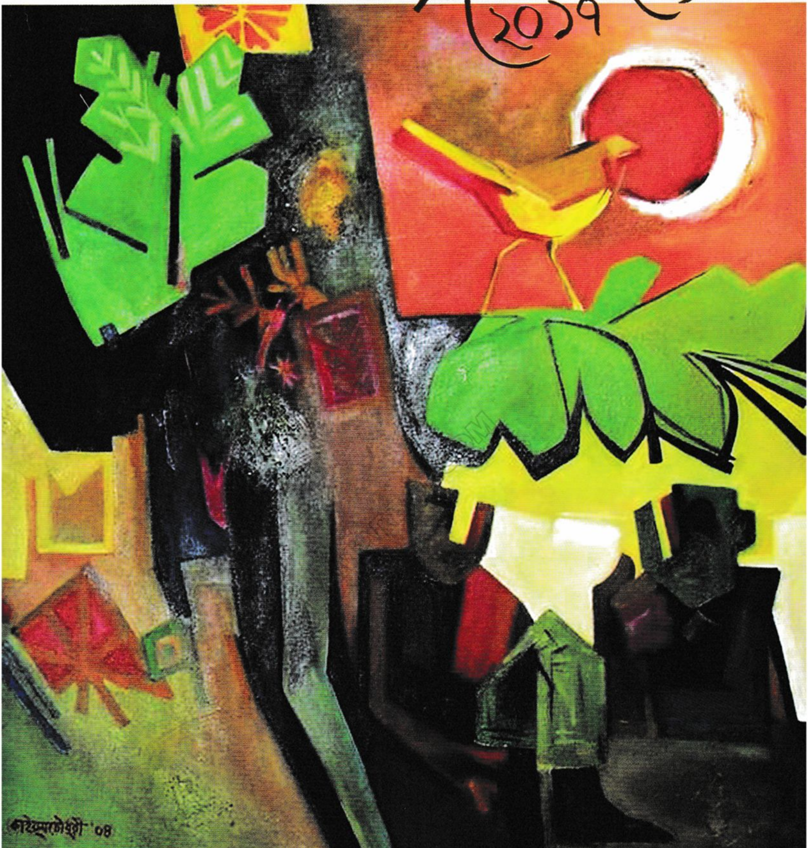
প্রথম আলো ঈদ সংখ্যা ২০১৭





প্রথম আলো

ঈদ সংখ্যা ২০১৭

ঢাকা : জৈষ্ঠ্য-আষাঢ় ১৪২৪, জুন ২০১৭

প্রচ্ছদ কাইয়ুম চৌধুরীর তেলরং চিত্র অবলম্বনে

সম্পাদক
মতিউর রহমান

ঈদসংখ্যা সম্পাদক
সাজ্জাদ শরিফ

প্রধান সমন্বয়কারী
পারভেজ হোসেন

সমন্বয় সহযোগী
পিয়াস মজিদ
আলতাফ শাহনেওয়াজ

পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা
জাহীদ রেজা নূর
জাফর আহমেদ রাশেদ

শিল্পনির্দেশক
অশোক কর্মকার

বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপনা
রশিদুর রহমান সবুর

বিপণন ব্যবস্থাপনা
এবিএম জাকারিয়া

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা
শামসুল হক

গ্রাফিকস
মনিরুল ইসলাম

দাম
২০০ টাকা

প্রকাশক মতিউর রহমান কর্তৃক *প্রথম আলো*র ঈদসংখ্যা হিসেবে ৫২ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০ থেকে প্রকাশিত এবং ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা ১২০৮ কর্তৃক মুদ্রিত। যোগাযোগ : সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫। ফোন : ৮১৮০০৭৮-৮১।
ফ্যাক্স : ৯১৩০৪৯৬।
ই-মেইল : editor@prothom-alo.info

সূচি



সূচি



রাজনীতি

জীবনী

গল্প

সূচি

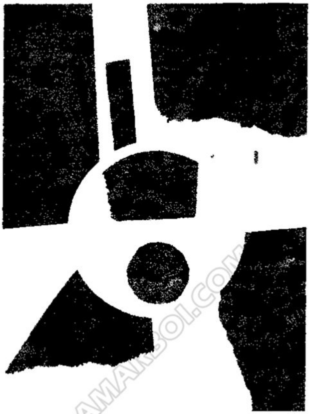




সূচি



সূচি



কবিতা

সচিত্রকরণ



ঈদ আনন্দময় ও অর্থবহ হোক

গেল কয়েক বছর বেশ হাঁকডাক দিয়েই ঈদ আসছে। বিপণন আর প্রচারের এই যুগে ঈদেরও মুক্তি নেই। রকমারি কেনাকাটা আর উদ্যোগ-আয়োজনের প্রস্তুতির হট্টরোলের মধ্যেও যা প্রকাশিত হচ্ছে, তা হলো একটি উৎসবকে বরণ করার আনন্দিত বাসনা। ঈদের মতো এত বড় উৎসব আমাদের আর কোথায়?

উৎসব মানেই আমন্ত্রণ, আবাহন, মানুষের সঙ্গে মানুষের অন্তরঙ্গ সংস্পর্শ। ব্যক্তি নামের যে কোটরে আমাদের সারাক্ষণের বসবাস, তার বাইরে এসে সবার সঙ্গে মেলার অবকাশ। আজকের পৃথিবীতে উগ্রপন্থার উত্থানই যেন একমাত্র ঘটনা—দেশে, উপমহাদেশে, সারা বিশ্বে। জাতি, ধর্ম, রাষ্ট্রের অহংয়ের নামে। উৎসবের মূলে থাকে ভেদ পেরিয়ে যাওয়ার একটি সংকল্প। সামনের ঈদ আমাদের মধ্যে সে সংকল্পকে আরও শাণিত করুক।

একটা সময়ে বাঙালির প্রায় একমাত্র বিনোদন ছিল পড়া। ঈদের আগে আগে অনেকের প্রতীক্ষা থাকত, ঈদসংখ্যাগুলো কখন বেরোবে! কার কার লেখায় ঈদের দীর্ঘ ছুটি রঙিন হয়ে উঠবে। নানা চমকপ্রদ বিনোদনের এই যুগে পড়ার দিন কি অস্তমিত হতে চলেছে? যদি হয়ে থাকে, সে বড় বেদনার কথা। বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় এখন বহু লেখকের পদচারণ। বাংলা সাহিত্যের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র বড় ও বিচিত্র হয়েছে। এখনই দরকার পাঠকদের সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষকতা। বইয়ের চেয়ে অন্তরঙ্গতম বন্ধু তো আর হয় না। যে বই আমি পড়ি, সেটি সারা জীবনের জন্য আমার অংশ হয়ে যায়।

একুশের বইমেলার পর ঈদের আগেই লেখকদের সবচেয়ে বেশি ব্যস্ততা। এই ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে তাঁরা আমাদের যে উপহার দেন, তার মূল্য চিরস্থায়ী। আঁজলাভরে তার যতটা আমরা নিতে পারব, ততই আমাদের লাভ।

এ ঈদসংখ্যাও *প্রথম আলোর* পাঠকদের কাছে আমাদের ভালোবাসার উপহার। সবার ঈদ আনন্দময় হোক। ঈদের আনন্দ সবার মধ্যে অর্থবহ হয়ে উঠুক।

ঈদ মোবারক।

কবিতা



আল মাহমুদ
চেনা জগতের ফেনা রেখে

আমি তো চলেছি কেবল সামনে,
যেখানে শুধুই আমার নামটি ইশারায় ডাকে
আমাকেই শুধু সামনে চলার আদেশে টানে।

আমি চলে যাই; দিক থেকে দূর দিগন্ত পানে
আমি বাঁক ঘুরি—যেখানে অচেনা সুদূরের পথ
দেয় হাতছানি।

কী আছে সেখানে কিছু কী জানি?
তবু চলে যাই চেনা জগতের ফেনা রেখে পিছে
কারা যে আমাকে কেবল টানছে
আমি মুখ থেকে বলি কিছু কথা শব্দের কণা
আমার মুখেই ফণা ধরে আছে
আমি আনমনা—

আমি বলব না কোথায় যাচ্ছি, কোথায় নিবাস
কোথায় ঠিকানা; আমি শুধু যাই, শুধু চলে যাই,
নেই তো ঠিকানা—
কে আমার নাম বলে অবিরাম আমি হেসে ফেলি
আমি ঢোঁক গিলি, আমিও তো হায়
ছিলাম এখানে নিজের বাসায়;

এখন কেবল হতাশায় হাঁটি
নিজের ছন্দ করি কাটাকাটি।

মিলে পৌছবই একদিন ঠিক,
আমিই সঠিক কাব্যের ভাষা করেছি ধারণ
শুনিনি বারণ।
আমি তো রয়েছি আমাকে নিয়েই

এর বেশি আর কথা নেই কিছু
ব্যথা আছে এই বুকের মাঝেই
আমি চলে যাই।

শহীদ কাদরী
যুদ্ধ

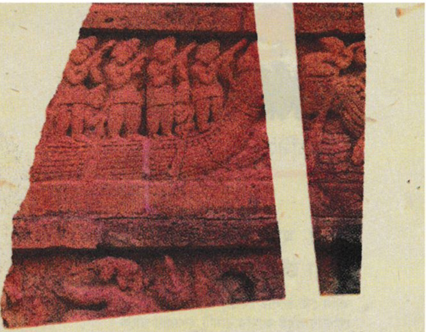
তির-ধনুক নিয়ে তোমরা বড্ড বাড়াবাড়ি
করলে হে। কথা ছিল জঙ্গলের
মানুষখেকোদের বধ করবে। তা প্রায়
সবই তো সাবাড় করে ফেলেছ। শুনছি
আমাদের বনে-বাদাড়ে আগুন রঙের
বাঘ-টাঘ আর ইদানীং দেখাই পাওয়া
ভার। তোমাদের হত্যালিপ্সা হরিণগুলোকে
নিশানা করেছে। আচ্ছা, তোমাদের
কি ক্ষমাঘেন্না বলতে কিছুই নেই, অ্যাঁ?
শেষ পর্যন্ত তোমরা পরস্পরের দিকে
তির-ধনুক-বল্লম ছুড়ে ছুড়ে মারছ।
ভয়ে আমার সমস্ত শরীর সেঁধিয়ে যাচ্ছে।

এখন ভাবছি কবজিতে স্পন্দমান শিরা
না হয়ে যদি হতুম কোনো প্রাচীন মসজিদ
কিংবা পুরোনো মন্দিরগাত্র থেকে
খসে পড়া এক টুকরো পাথর
সেলাম-পেন্নাম নিয়ে ভালোই থাকতাম।

(অপ্রকাশিত)



সচিত্রকরণ : সব্যসাচী হাজরা



বেলাল চৌধুরী
কোকিল কোকিল

কোকিল নিয়তি থেকে কোথায় পালাবে তুমি, দেখি,
যেখানেই যাও, যত দূরই যাও না কেন
অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা এই কোকিল নিয়তি থেকে, কিছুতেই
আর নিষ্কৃতি নেই তোমার—অথচ পথ তো কম ভাঙলে না।

যত কান্না তোমার, সে তো শুধু মায়েরই জন্য,
যে মা তোমাকে বৈশাখী রাতের দুঃসহ
নিস্তব্ধতায় আবৃত জগৎ সংসারে
একা ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল...

সহোদরপ্রতিম বসন্তসখা হে ভাই কোকিল
তোমার নিঃসঙ্গতার সবটুকু আজ ঢেলে দাও,
যতটুকু পারো এই বৈশাখী নিশীথে
আকাশের যত তারা আর ভ্রাতৃসম মাতৃহারাদের প্রতি।

তোমার মতন এমন সুচারু শব্দাংশ আর কার আছে,
আর থাকলেও তাদের নিঃসঙ্গ দুর্দশার কথা কে আর
স্মরণে আনে
মূক হয়েও মুখর হবার মতো এমন আকুতি কেউ কি দেখেছে?



আসাদ চৌধুরী
সতর্কতা

সমাজ ও সময় সম্পর্কে
খুব বেশি নিরপেক্ষ, উদাসীন হলে
অবহেলা লাগাতার লাই পেলে
দুর্দিনে দুর্দার করে ছুটে আসে
প্রমোদে উন্মত্ত জনপদে।
ইতিহাস ফিসফিস করে
কখনো বা হাসাহাসি করে
এই মত বচন শোনায়।

কিন্তু কারে দায়ী করি?
মানুষ? প্রকৃতি?
নাকি তোমাদের বিখ্যাত নিয়তি?

রুবী রহমান
মধ্যদিনে যবে গান

জানি না কী মূল্যে এই মানুষজন্ম আমি পেয়ে
ভূমিষ্ঠ হয়েছি। এর চেয়ে
আর যে কিছুই মূল্যবান নয়, সেটা বুঝিনি তো
মুহূর্তের জন্য ঝলকে ওঠে এই বোধ অন্তর্হিত
হয়ে যায়। তাই বুঝি এলমেল দক্ষিণ সমীরে
খোলামকুচির মতো জীবনটা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে
ধীরে ধীরে
ফুরিয়ে ফেলাও মনে হয় সংগত
জীবন মহার্ঘ তবু। এই বোধ মেলে আপাতত
জীবনের চীর জীর্ণ-বিবর্ণ পোশাকে
দু-চারটি পালক গুঁজে দিয়ে যেতে হবে
সোনার সুতোয় গেঁথে তুলতে হবে বিশ্বসংসার
সাদা ছড়ি হাতে জন্মান্ধ থমকে আছে মধ্যদিনে যবে
গর্জমান ট্রাফিক সিগন্যাল থেকে তাকে
হাত দুটি ধার করে দিতে হবে পার
জটিল পান্থপথ-কাওরানবাজার।

নির্মলেন্দু গুণ
তোমার সৌন্দর্যের অন্তরালের রহস্যগাথা

তোমার চোখ আমার চোখের চেয়ে
অনেকানেক সুন্দর।
তোমার চোখের তুলনায়
আমার চোখ তো কোনো চোখই নয়।
আমার চোখ শুধু দেখার জন্য চোখ।

তোমার বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিটি
বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের
ডান হাতের কম্পমান তর্জনীটির
চেয়েও অধিক সুন্দর।

তোমার নগ্ন পদযুগলের
সৌন্দর্যের কাছে
পরাজিত হওয়ার ভয়ে,
আমাদের পদ্মপুকুরে এবার
একটি পদ্মও ফোটেনি।

তোমার যেকোনো স্তন
আমার বক্ষের অভ্যন্তরে
রক্তসঞ্চালনকারী
হৃৎপিণ্ডটির চেয়ে উষ্ণ,
এবং সুন্দর।

আমার বাগানে সযত্নে ফোটানো
গোলাপগুলির চেয়েও সুন্দর
তোমার বাড়ির আঙিনায়
অযত্নে গজানো গাঁদা ফুলগুলি।

আসলে, সত্যি বলতে কী,
তোমার যেকোনো কিছুই সুন্দর
আমার সকল কিছুর চেয়ে।

এই সত্যটা বুঝতে পারার পর,
তোমার সঙ্গে আমার সকল দ্বন্দ্বের
অবসান হয়েছে।

আমার এমত উপলব্ধির অন্তরালে
লুকিয়ে থাকা প্রকৃতির গোপন রহস্যকে
আমি কখনো প্রকাশ করিব না—,
জানি এই শর্তেই আমার ঈশ্বর আমাকে
কবি বানিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন।

বুড়িগঙ্গা, ৩০ মে ২০১৭



মহাদেব সাহা
মানুষের দুঃখবোধ

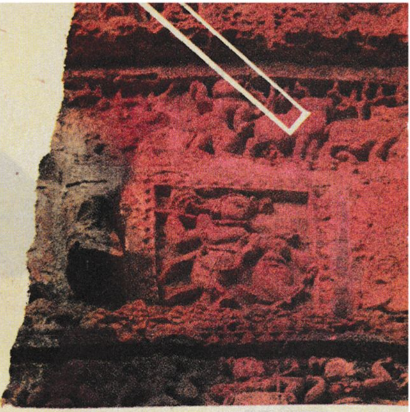
মানুষ নাটক দেখে খুব কাঁদে, জীবন দেখে তার চোখের
পাতাও ভেজে না,
কী করুণাকাতর এই মানুষ, কী কোমল, কী দয়ালু
দুঃখ দেখে তার মন বড় কাঁদে, সে নাটক দেখতে
কতবার যে চোখ মোছে,
চোখের জলে উপন্যাসের পাতা ভেজায়,
কিন্তু যখন কেউ পথে পড়ে কাঁদে, মানুষ ফিরেও চায় না।
মানুষের মন এত মমতাময়, সে নাটকেও দুঃখ
দেখতে পারে না,
কিন্তু মানুষ ক্ষুধায় কাঁদে, দুঃখে হাহাকার করে,
কষ্টে তার বুক ভেঙে যায়
কেউ তার দিকে ফিরেও তাকায় না;
মানুষের মন বড় নরম, হৃদয় বড় অনুভূতিশীল,
কিন্তু একজন মানুষ আরেকজন মানুষের দুঃখ দেখে কাঁদে না।

ক্যালগেরি, কানাডা, ১৯ এপ্রিল ২০১৭

আলতাফ হোসেন
আমি গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলে

আমি গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলে
কানে নাকি ছুরি চালাবে ওরা, রক্তারক্তি করবে
কান কোন দোষ করেছে বলো
এ রকমই হচ্ছে আজকাল, কিছুদিন পরপরই
ওই প্রাসাদে যাচ্ছি
কফি খেতে বেশ লাগছে, ল্যাভেটরিতে যাচ্ছি পেচ্ছাপ করতে
প্রচুর লোকজন এসে ভিড় করছে তবু ততটা
ভিড়-ভিড় লাগছে না
হট্টগোল করছে না একদমই, হয়তো আসবাবপত্র
ও দেয়াল খুব
ঝকঝকে, হাওয়া গা-জুড়ানো বলেই
এই যে আমার মুখে ছুরি চলবে
এ কথাতেও যেন আরাম—এ কোথায় এসেছি, রাকা, বউ
আমার, মা!





কামাল চৌধুরী
অন্ত্যমিল

মাইলের পর মাইল পদ্যগুলো সাজিয়ে রেখেছি
প্রতিটি ধূলিকণায় একেকটি অন্ত্যমিল জন্মাবে বলে

হয়তো কোনো একদিন কারও দীর্ঘশ্বাসে কুড়িয়ে পাওয়া
টাকার পাশে
পাতা কুড়োনিরা পাঠ করবে অন্যমনস্ক অনুপ্রাস

আমিও তাদের মতো অসমাপ্ত থাকতে চেয়েছি আরও কিছুকাল
কারণ জীবিত জোছনায় আমরা চন্দ্রাহত হতে চাই

চাঁদের মোম গলে পড়ছে আর আমি তুড়ি বাজাচ্ছি
প্রতিটি তেমাথায়
দুহাতে অমিল গদ্য লিখে হাহাকার করছে কপোতাক্ষ নদ

এই ফাঁকে অক্ষরের খুঁটিনাটিসমেত ঢুকে পড়ছে
কয়েক স্তরের ঘুম
ঘুমের ভেতর লাফিয়ে উঠছে জোয়ার ও কালান্তরের স্বপ্ন

এইভাবে নিরপেক্ষ দূরত্বে তোমার জন্য লিখে রাখছি
সমিল ধূলিবার্তা।

জাহিদ হায়দার
তরুণ কবির প্রস্তুতি

'নগ্ন' নামের কবিতাটি লেখার আগে
তুমি নগ্ন হবে কি না। কাপড়ের ওপর আরও
সৌন্দর্য পরবে কি না। পরিজ্ঞান শুধুই তোমার।

কবিতাটি শুরু করবার সময়
নিজেকে প্রশ্ন করো, 'আমি কতটা ঋতজিৎ?'

অভিজাত পোশাকে মানুষকে দেখবার পরেও
কত ভঙ্গে উলঙ্গ দেখেছ। বসনের শীলতা ছাড়াও
মনে হয়েছে, কোনো কোনো নগ্নতা শুদ্ধ সংগীত।

ভেবে ভেবে যখন ক্লান্ত খুব, আয়নার সামনে দাঁড়াও।
তুমি কি নগ্ন নাকি কাপড়পরা মানুষ?

কাগজের শাদা নগ্নতায়
অক্ষরের কাপড় পরালেই ঢেকে যাবে সব?

জানলার পাশে শরতের মানসবিলাসী কয়টি মেঘ
কবির দ্বিধাদাসত্ব বুঝে, 'দেখা হতে পারে' বলে
মৃদু হেসে নীলের অধিক নগ্নতায় ভেসে চলে যায়।

এবার কবিতাটি শুরু করা যাক।

সোহরাব হাসান
চুম্বন ও চাবুক

সে আমার জন্য একসঙ্গে দুটি উপহার নিয়ে এল—
চুম্বন ও চাবুক।
প্রত্যূষে ঘুম থেকে উঠে আমি ভাবি, কোনটি নেওয়া ঠিক হবে?
চারদিকে নষ্ট চুম্বনের অসুস্থ প্রতিযোগিতা চলছে
ক্ষমতার উচ্ছিষ্ট পাওয়ার জন্য অনেকে পদতলে
গড়াগড়ি যাচ্ছে
অতঃপর আমি ঠিক করলাম, চুমু নয় চাবুককেই
সানন্দে আলিঙ্গন করব।

কেউ কেউ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন, অত মধুর চুম্বন থাকতে
কেন তুমি চাবুককে বেছে নেবে? আমি বললাম,
গণতন্ত্র নামের রূপসী প্রেমিকার চুম্বনে যতটা বিষ আছে
তার চেয়ে ঢের কম আছে চকচকে চাবুকে।

চাবুক বড় জোর আমার শরীরকে রক্তাক্ত করবে
অথবা আমার ঠাঁই হবে জেলখানার নির্জন সেলে
কিন্তু তার বিষচুম্বন আমার সন্তানকে চিহ্নিত করবে
ক্রীতদাসের অনুগত বংশধর হিসেবে।



শামসেত তাবরেজী
শিউলি

একটু হলুদ—নৈঃশব্দে অনঙ্গনা,
ঠোকর মারতে নিরিখ বেঁধে তুলল ফণা।

ফজর তখন, গোয়ালঘরে ঢুকেছে রোদ,
ঠিক তখুনি—পান না ভেবে স্ববিরোধ

কনুই ঝাড়েন, উত্তলান্তে কেয়ামতের
নজির জাগে, পুরগাতোরিওর সুরতে

অগ্নিজিহ্ব কালনাগিনী আসল ধেয়ে—
অদূরে ভার্জিল দাঁড়িয়ে দ্যাখেন চেয়ে,

নাজাত পেতে বাংলাদেশের ভৃত্য কবি
গিলে ফেলল বিকট রক্তকরবী।

রাত না সেটা, ফজর-প্রাতে যখন পাখি
'আবার কারবালা' বলে যাচ্ছে ডাকি।

খুব সামান্য একটু হলুদ কলুবে মেখে
আজদাহাটা নিলেন ব্রহ্মজিবে চেখে—

আর তখুনি তিন মহাকাশ গেল গুলে
বাস্না হয়ে জানলাধারের শিউলি ফুলে।

চঞ্চল আশরাফ
হাওয়া, প্রতীক্ষাকাতর

ফিরে এল মেঘ। রাত্রি ভেসে যায়। কে অস্ফুট কাঁদে?
তাকে বলো, ভিজে যাওয়া পালক খসিয়ে অস্থিরের ডানা
হালকা এখন, উড়ু-উড়ু। যদি রোদ ওঠে, গন্তব্য জানাবে।
যদি জলমগ্ন ভোর আমাকে উপুড় করে রাখে, তবু
বাঁশিটি হাওয়ায় গচ্ছিত রেখো। আকাশ আমাকে বোঝে।

যে হাওয়া বহুগামিতার প্ররোচনা নিয়ে এসেছিল
লবণের দ্বীপ থেকে, তার ধুলোঘূর্ণি অগ্রাহ্য করেছি।
তুমি এলে আসর বসাব। তখন বৃষ্টি হবে। ফাঁকে ফাঁকে
ঝরে পড়বে জোছনার ঠান্ডা স্যাকারিন। অশ্রু শুকানোর
মুহূর্ত এসে গেল! বনভূমি ঘেঁষে যে পথ চলে গেছে
রহস্যের গাম্ভীর্য ছড়িয়ে, তার পাশে বসে আছি।

তুমি এলে আসর বসাব। রাত্রি বুনে যাব মৃতদের গানে

মাসুদ খান
হর্ষতরঙ্গ

সরো সরো, ঈশান থেকে তিরের বেগে ওই নেমে পড়ছে হংসবাহিনী—উঠানে, অঙ্গনে, ধানখেতে, নয়ানজুলিতে। আর নৈঋত থেকে ছুটে আসছে দস্যি বাচ্চারা। এসেই দুই ডানা পাকড়ে ধরে উঠে পড়ছে রাজহাঁসের পিঠে। তা-ই দেখে তিড়িংবিড়িং নাচছে তিন-তিনটি ছাগশিশু। ঘাস থেকে মুখ তুলে মুচকি হাসছে খরগোশ, প্রশাখাজালের আড়াল থেকে কাঠবিড়ালি।

এক হোঁদলকুতকুতে, দুষ্টের চূড়ামণি, এমনিতেই লেট লতিফ, তদুপরি পিছিয়ে পড়ছে বারবার, কুকুরছানার কান মলে দিয়ে, পোষা শজারুর শলাকা ধরে টান মেরে, খুচরা নৌটংকি সেরে, দুই কাঁধে দুই গুঞ্জরণরত অস্থির বাচ্চা বসন্তবাউরিকে বসিয়ে নিয়ে এগিয়ে আসছে শেষ হংসবাহনের দিকে। রাজহাঁসটি তখনো নয়ানজুলির জলীয় রানওয়েতে। উড়ালে উন্মুখ। বাচ্চাটি জলকাদা মাড়িয়ে এসে হ্যাঁচোড়-প্যাঁচোড় করে উঠে পড়ছে সর্বশেষ হংস-ফ্লাইটে। পেছন পেছন আলপথে হেলেদুলে আসছে কান-মলা-খাওয়া নাদুসনুদুস কুকুরছানাটিও।

তুলাপ্রসূ সব শিমুলের গাছ, ফলপ্রসূ সব আম ও আমড়া বাগান। তাদের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে হংসবাহিনী। এক-একটি হাঁসের পিঠে এক-একটি শিশু। উড়ে যেতে যেতে উৎফুল্ল বাচ্চারা ভূমণ্ডলের দিকে উড়ন্ত চুমু ছুড়ে দেবার মুদ্রায় ফুঁ দিচ্ছে হাতের তালুতে। একবার ডান হাত, আরেকবার বাম। দুই দিকে জেগে উঠছে ছোট-ছোট হাওয়াহিল্লোল। আর সেই হিল্লোলের হালকা ধাক্কাতেই সঙ্গে-সঙ্গে নিচে আগুন ধরে যাচ্ছে হুলুস্থুল কৃষ্ণ ও রাধাচূড়ায়, আর আমের পাতারা খিলখিল আহ্লাদে ঢলে পড়ছে প্রতিবেশী আমড়ার পাতাপল্লবের ওপর।

আজ আগুনে-বাতাসে গুলতানি, পলাশে-শিমুলে শয়তানি, আমে-আমড়ায় দুষ্টামি...
আর সাগর দুলছে পাহাড় ঢুলছে আকাশ ঝুলছে মাথার ওপর উড়াল শহর
ভোলাভালারা ভুলছে, লহরি তুলছে, ধীরে উর্ণা খুলছে মেঘের বহর...



টোকন ঠাকুর
প্রতিভার সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি

কী ক্ষতি করেছি আমি তার, প্রতিভার?

বরং একদিন স্বেচ্ছায় প্রতিভার সামনে গিয়ে
মুখে কোনো শব্দ না করেই বুঝিয়ে দিয়েছি—
যা প্রায় না-পারার, তুমি তাও পারো
তোমার হাঁটুর কাছে এই বসলাম, ইচ্ছে হলে মারো

প্রতিভা, কী সর্বনাশ করেছি আমি তোর?

দ্যাখো দ্যাখো, দগ্ধ বাড়ি, বিলীন সম্পর্ক, পথের নির্ণয়
কিংবা প্রতিদিন বেঁচে থাকবার নানা রকম লড়াই
সব শব্দ-বাক্য হয়ে ঢুকে পড়ছে
আমারই চোখের ভেতর
কারণ, প্রতিভা চায় না আমি ভালো থাকি!

বলেছে হাওয়ার পাখি—
আমি ভালো থাকলেই ঘুমিয়ে পড়ব, সেই লগ্নে
আমার মাথার কাছে জেগে-জেগে পাহারা দেবে
গ্রামলালিত নদী
প্রতিভা সেই আগুনমুখো নদীর বান্ধবী!

প্রতিভা চায়, ইভেন আমাকে ইনসিস্ট করে, 'পোড়ো, মরো
তোমার কঙ্কাল দেখে যেন শনাক্ত করা যায়—
বাজার-অর্থনীতির পাদদেশে তুমি ছিলে সাবলীল,
সন্ধ্যায় মুগ্ধ রোমান্টিক কবি'।

মোস্তাক আহমাদ দীন
রাত্রিকাল

সুখেরও শেষ কিছু আছে। পাশে দুঃখ।
পাশে লোভ। পাশে সেই গন্দমবাগান।
ভাঙলে ভাঙুক ঘর। ঝরে যাক ধান।
আজ রজনী না যেতে চলো
দুই ভাই—ধীরে ধীরে ঘাটুগানে যাই।

এই নাচে—এই মিথ্যে সাজে
তোমার সজল বুকে বেজে ওঠে ব্যথা;
এ নাচে অনেক ভেদ : সাকি আর
রাতের ঘাটুয়া জানে, এ শরীরে শরীর যতটা,
তারও বেশি শূন্যতোয়া ঠাঁই
যেভাবে লীলার পরে গান গায় রাই :
'সখি হামারি দুখের নাহি ওর'।

আজ রজনী না যেতে চলো
দুই ভাই—ধীরে ধীরে ঘাটুগানে যাই

মজনু শাহ
সৌন্দর্যবোধ

সৌন্দর্যবোধ মরে গেলে একেকটা ফুল রাক্ষুসে
জ্যামিতির বেশি নয়,
তখন অফুরন্ত পথ সাপের চামড়া দিয়ে মোড়া। কাটা মুণ্ডুগুলো
খেলার ঘুঁটি। চেনা ময়দান, একটা ওল্টানো বই। কী বই এটা,
বিখ্যাত সব পাখির? পাকা আতাফল পড়ে আছে চতুর্দিকে,
তুমি চতুর লাফিয়ে পার হচ্ছ সেসব,
আর সমস্ত পরিচিত মৃতেরা
দীর্ঘতম তোমার এই মার্বেল পাথরের বারান্দায়
একে একে এসে বসছে
কারুকাজ করা চেয়ারে।

কোথায় আর যাবে তুমি এমন সূর্যহননের দিনে,
এলাচি-লবঙ্গ-দারুচিনি
নিজ নিজ গন্ধ হারিয়ে হয়ে গেছে অন্য কিছু, এখন ছায়ার মাছ
ছায়ার বাঘ ফুটে উঠবে পথে।



শাহীন মোমতাজ
পাহাড়ের গল্প

নিজস্ব ছায়ার দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকানো হবে না!

অন্ধকারে অদৃশ্য পাহাড় থেকে ছলকে আসা খণ্ডকবিতার মতো
পাথরে হোঁচট লেগে পড়ে যাই;
আজন্ম ছায়ার থেকে ছিন্ন হয় এ মরশরীর।

দেখি, দূরের গির্জার আলো ক্রমাগত জাগাচ্ছে ছায়াকে।

এদিকে পাইনবৃক্ষ বাতাসে মোচড় দিয়ে জাগে।
আমি একা বাঁকানো পথের ধারে অলক্ষেতে বসে পড়ি,
পাহাড়ে বেড়াতে এসে নিজের ছায়াকে রেখে ফিরে যাওয়া
কীভাবে সম্ভব হবে, ভাবি।

আহমেদ মুনির
উন্মাদের দিনলিপি

বাসনাকে মাটি চাপা দেব বলে
বেরিয়ে পড়েছি।
হে আনন্দ, উন্মাদ আমি।
উন্মাদের পিছু পিছু
হেঁটে গেছি বাসনাতাড়িত।
শ্রাবস্তীর পথে পথে
মাটি চাপা দিয়েছি বাসনা।
কবর দিয়েছি গণসমাধির পাশে।
ফেলে এসেছি নর্দমা-ডোবায়।
গর্ত খুঁড়ে পুঁতে দিয়েছি
প্রান্তরে, এখানে-ওখানে।
নিশানা রাখিনি কোনো।
নিশানা রাখিনি ঘাম
কান্নার নুনের।
হে আনন্দ, অথচ
এখন বাসনাবৃক্ষে
ছেয়ে গেছে শ্রাবস্তী নগর।

আলতাফ শাহনেওয়াজ
দর্শক

কারুবাসনার পৃথিবীতে
নিঃস্ব কিছু লোক
একাকী,
মেঘ হয়ে কালো;
অন্যদের মতো বাঁচতে না পারার
আফসোসে
মাথার ভেতর
ট্রাম দুর্ঘটনা ঘটাচ্ছে প্রতিদিন।

আমরা দর্শকমাত্র, প্রবল দেখতে চেয়ে
কিছুই দেখতে
পারছি না, এমনকি অন্ধকারও!

চোখের নিচে কালি এ জন্যই এতটা অনুপম!

আসমা বীথি
দরজা

মরচে পড়েছে বহুকাল; ঘুণকাটা
শব্দে কান পেতে রাখি। দুই দিকে দুই
পৃথিবীর অভিশপ্ত গান। স্তব্ধ হলে
এ শহর মনে হয় দূর গ্রহ, ভেসে
আসা কোলাহল ঝিঁঝির ডাকের মতো
স্তব্ধ হলে টের পাই রোজকার দেখা
কাঠের দরজা—নিষ্প্রাণ থাকে না সে-ও
বাজছে কাঠের ক্ষয়, ঘুণকাটা গানে
নিঃসাড় দাঁড়ানো অপলক ছয় ঋতু
প্লাস্টিক পেইন্টে ঢাকা উজ্জ্বল আঁধার
আমাকে জানায়, ভেতরে পেরেক পোঁতা
চির অপেক্ষার সুর, দৃঢ় নীরবতা।



আল ইমরান সিদ্দিকী
আদৃতার জন্য

আমি গেলাম তাহলে চুপ থাকার দিকে—জমাতে চাই কিছু, তোমার জন্য। দ্যাখোই তো দিনগুলি একেবারেই ভালো না; কেউ কারও মন ভালো করে দিতে পারে না। সময় নিজের নিয়মে ঘুরেই যাবে, মনও কিছুটা ভালো হবে তোমার; যা কিছু জমাব, সাথে নিয়ে আসব। বোঝোই তো, আমার সামান্য দেওয়ার থাকলেও, বদলে দেওয়ার নেই। হারাতে চাই না যেটুকু আছে। তোমার জন্য কোথাও জন্ম নিচ্ছে এক জোড়া ডানা, একটি ট্যাটুর নকশা—আমি অনুভব করি; অনুভব করে হারাব ঝোপঝাড়ের ভিতরে। তাকওয়া মসজিদের মিনার কালো কালো গাছের ওপরে সবুজ হয়ে জ্বলে উঠল, ভাঙা ডালপালা আর ছেঁড়া পাতা দিয়ে সাজানো ঝড়বৃষ্টির শেষে।

হিজল জোবায়ের
নামপদ

বিশেষ্যই জ্ঞান—আহুরা মাজদা
আমার আদল দ্যাখো তোমারই আদল

তোমার কমলা বন-প্রান্তরে রোদ-বিস্তৃত
বাতাস-রচিত দীর্ঘ পরিচ্ছদ.
পাতালমুখী অবাধ্য গিরিখাত,
ঝুলে আছে ভাঁজ করা রোদের মসলিন

অনাদি পাথর থেকে
ছিটকে আসা পানির ফোয়ারা
স্বতশ্চল নদী

কবরখানায় অনুচ্চ পাহাড়ে পাহাড়ে
ফুলে ফুলে ছেয়ে আসা কফিনের ডালা
সমাধিসৌধ ঘেরা ফার্ন ও ফাঙ্গাস
পুড়ে যাচ্ছে নরকের স্নিগ্ধ আগুনে

শোক আর ক্ষুধা-নিবারণ
অর্ধ-বধিরতা
ফল আর লোহা

কেটে দেওয়া ঘোড়ার শ্বাসনালি থেকে
রক্ত ছিটকে ওঠে গোধূলির গিলাফে গিলাফে

অস্তমান সূর্যের নিচে তরবারি, লালসালু

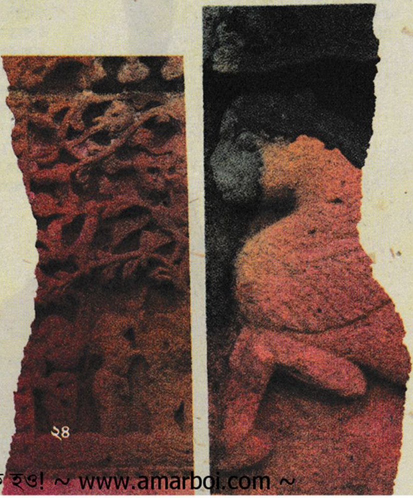
পৃথিবীতে ঝুঁকে আছে
অপার্থিব সন্ধ্যার ছায়া
হাবশি অন্ধকার

অন্ধকারে সেজদায় নত
ওই চাঁদ তুমি
তোমারই তো রুহ
আহুরা মাজদা।

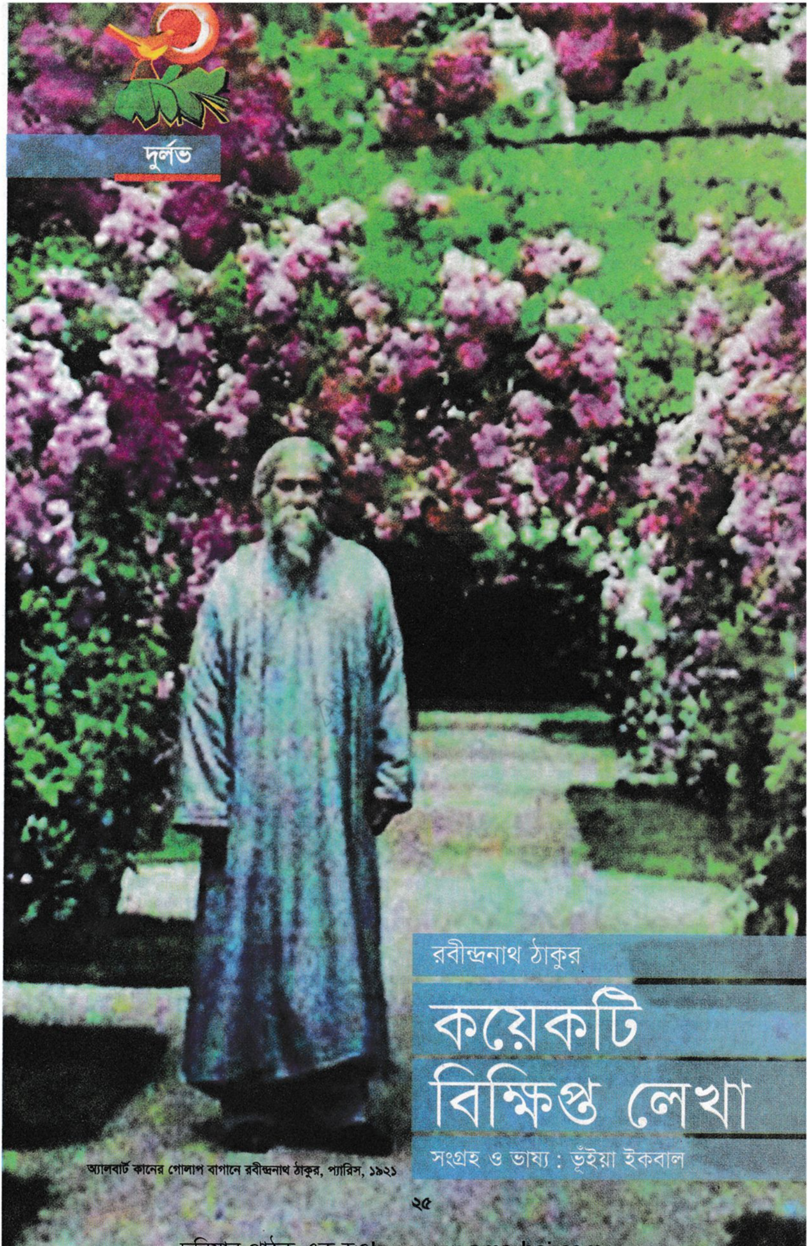
সালেহীন শিপ্রা
প্রহরী

কবর পাহারা দিই, সামলে রাখি রাতে
যদিও তাদের সামলাবার কিছু নেই।
হামলে পড়ে অপরের দিকে ক্রোধাঘাতে
বিস্ফারিত সামান্যও তো নয়। পথেই
ঈর্ষা ঢেলে উৎসারিত হাওয়ায়, সে ফেলে
এসেছে সমস্ত কিছু যা জমানো যায়।
জমিয়ে রাখা সে মুখগুলো মুছে গেলে
কিছুই কি থাকে কোনো তাকিয়ে থাকায়!

এই অন্ধকারে সঙ্গী তারাই আমার,
পলকা সুতোর দূরত্ব ভুলে বসে থাকি।
আমিও কবর যেন, পাশাপাশি তার
শুয়ে পড়ি। চোখে ছায়া ফেলে অন্ধ পাখি
উড়ে যায়—উড়ে যাক—পরিজনহারা
জীবন্ত কবর দেয় কবর পাহারা।



দুর্লভ



অ্যালবার্ট কানের গোলাপ বাগানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্যারিস, ১৯২১

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কয়েকটি বিক্ষিপ্ত লেখা

সংগ্রহ ও ভাষ্য : ভূঁইয়া ইকবাল

দূরের কথা

ঝাপ্‌সা হয়ে থাকে কাজের কথা,
উজ্জ্বলতা
রয়ে গেছে দূরের কাহিনীতে।
নতুন-গাওয়া গীতে
জাদুমন্ত্র মর্ম্মে নাহি পশে
সুরের বাঁধন আলগা হয়ে খসে।
...
সহজ কিছুই ছিল নাকো যখন এ নিখিলে
সব দুরাশায় বিঘ্নমাঝে তুমিই সহজ ছিলে।
...
তখন ক্রমে ক্রমে
প্রত্যাশাটার ধার যে গেল কমে,—
পেতেম যাহা তখনি যে পেতেম সীমা তার
তার বেশি নেই আর।

ভাষ্য

'দূরের কথা' নামে কোনো কবিতা রবীন্দ্রনাথের কোনো বইয়ে বা বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র-রচনাবলীতে কিংবা অনাথনাথ দাস-সম্পাদিত কবিতাসমগ্রে (৫ খণ্ড) সংকলিত হয়নি।

কবির হস্তাক্ষরে কবিতাটির পাণ্ডুলিপি বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবন মহাফেজখানায় সংরক্ষিত।

আসলে এটি 'দূরবর্তিনী' কবিতার আদি লেখন। তিন স্তবকে বিন্যস্ত কুড়ি চরণের 'দূরের কথা'র প্রথম খসড়ার আটটি মাত্র চরণ 'দূরবর্তিনী'তে গৃহীত—সপ্তম থেকে দশম চরণ :

হায় একদা যখন তোমার অভিসারের রথ
পেয়েছিল সহজ সুগম পথ,
ইচ্ছা তোমার পেত না আর নতুন জানার বাধা,
সাধনা নাই, শেষ হয়েছে সাধা।

এবং ত্রয়োদশ থেকে ষষ্ঠদশ চরণ :

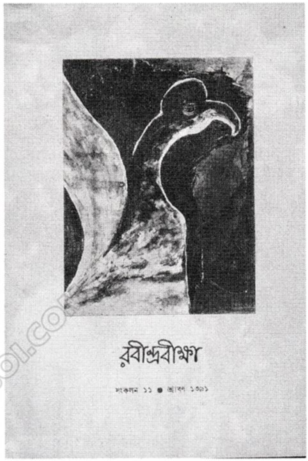
আশার অতীত হঠাৎ অবকাশে
আসতে তখন পাশে,
একটি ফুলের দানে
চির ফাগুন দিনের হাওয়া আনতে গভীর প্রাণে।

—এই দুটি স্তবক 'দূরবর্তিনী' কবিতায় গৃহীত। তবে হুবহু নয়, যৎসামান্য দু-চারটি শব্দের পাঠান্তর আছে কবিতা দুটির পাঠে।

আদি লেখনের ১২টি চরণ 'দূরবর্তিনী'তে বর্জিত। ওই ১২ পঙ্‌ক্তি এই সংকলনে উদ্ধার করে দেখানো হয়েছে।

পাণ্ডুলিপি-প্রতিলিপির শেষ তিন ছত্র :

মনে পড়ে কবে ছিলাম একা বিজন চরে;
তোমার নৌকা ভরা পালের ভরে



রবীন্দ্রবীক্ষা পত্রিকার প্রচ্ছদ

সুদূর পারের হোতে
—'হঠাৎ মিলন' কবিতার সূচনায় বিন্যস্ত হয়েছে।

রচনাবলীতে 'হঠাৎ মিলন'-এর নিচে রচনার তারিখ উল্লেখ আছে ২৭ মে ১৯৩৭, তবে 'দূরবর্তিনী'র নিচে তারিখের জায়গায় প্রশ্নবোধক [?] চিহ্ন দেওয়া।

পাণ্ডুলিপিচিত্র (রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ অভিজ্ঞান-সংখ্যা ১৮৪ পৃ ২৪) শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত (সহযোগী সম্পাদক চিত্তরঞ্জন দেব) রবীন্দ্রভবন প্রকল্পের ষান্মাসিক মুখপত্র *রবীন্দ্রবীক্ষায়* (সংখ্যা ১১, আগস্ট ১৯৮৪) প্রথম প্রকাশ পায়। সম্পাদকীয় টীকা থেকে জানা যাচ্ছে, দুটি কবিতাই একই দিনে আলমোড়ায় লেখা।

কবিতা-দুটি রবীন্দ্রনাথের *সানাই* (১৩৪৭) কাব্যে গ্রথিত।



চিঠি

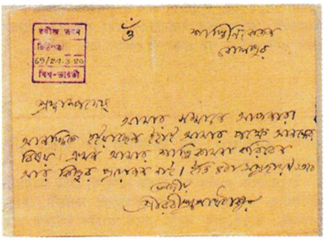
চিঠি : ১ ওঁ

কল্যাণীয় বৎসগণ

আজ আমার জন্মদিনে তোমাদের শ্রদ্ধার উপহার পাইয়া কত আনন্দিত হইয়াছি বলিতে পারি না। তোমরা আমাকে আহারের জন্য কিছু দিয়াছ—তোমাদের হাতের পরিবেশনে আজ আমি যাহা খাইলাম তাহা অমৃত।

আশীর্বাদ করি ঈশ্বর তোমাদের জীবনকে মঙ্গলে পূর্ণ ও পুণ্যে নিকশিত করিয়া তুলুন। ইতি ২৫শে বৈশাখ ১৩১৮

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর


রবীন্দ্র ভবন
চিঠিপত্র
৩৭/২৭.৩.৪০
বিশ্ব-ভারতী

ওঁ শান্তিনিকেতন
বোলপুর

শ্রদ্ধাস্পদেষু
আমার সম্মানে আপনারা আনন্দিত হইয়াছেন ইহাই আমার পক্ষে আনন্দের বিষয়। এখন আমার শান্তি কামনা করিবেন আর কিছুর প্রয়োজন নাই। ইতি ৪ঠা অগ্রহায়ণ ১৩২০
ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিঠি : ২

ওঁ শান্তিনিকেতন
বোলপুর

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমার সম্মানে আপনারা আনন্দিত হইয়াছেন ইহাই আমার পক্ষে আনন্দের বিষয়। এখন আমার শান্তি কামনা করিবেন আর কিছুর প্রয়োজন নাই। ইতি ৪ঠা অগ্রহায়ণ ১৩২০

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভাষ্য

বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবন মহাফেজখানায় রবীন্দ্রনাথের নিজের হাতে-লেখা দুটি চিঠি সংরক্ষিত আছে—একটির প্রাপক তৎকালের বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার চাঁদপুর মহকুমার (পরে জেলা) বাবুর হাট গ্রামের দুই কিশোর ভ্রাতা অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০৩-৯৫)। বোলপুর থেকে পাঠানো বিশ্বভারতীর প্যাডে লেখা ওই চিঠির তারিখ—কবির জন্মদিন—২৫শে বৈশাখ ১৩১৮ বঙ্গাব্দ। বাবুর হাটের ওই দুই কিশোর ভ্রাতা কবির জন্মদিনে মিষ্টি মুখ করার জন্যে নিজেদের সঞ্চিত তহবিলের সামান্য কটি টাকা পাঠিয়েছিল। তাদের প্রেরিত 'শ্রদ্ধার উপহার' পেয়ে কবি স্নিগ্ধ সৌজন্যে আনন্দ প্রকাশ করে আশীর্বাদ জানিয়ে ওই ছোট চিঠি লিখেন। তখন কবি নোবেল প্রাইজ-প্রাপ্ত বিশ্ববিখ্যাত হননি।

কবিকে উপহারদাতা ওই দুই ভাইয়ের বড়টি পরিণত বয়সে শুল্ক বিভাগের পদস্থ অফিসার হয়েছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ সাহিত্যচর্চা করতেন এবং একটি শিশুতোষ বই প্রকাশ করেছিলেন বলে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী শান্তিনিকেতনের পাঠভবনের প্রাক্তন অধ্যাপক পিয়ালী চন্দ জানিয়েছেন। প্রাপকদ্বয় চিঠিটি সযত্নে দীর্ঘকাল সংরক্ষণ করে সম্ভবত কবির প্রয়াণের পর বিশ্বভারতীকে দান করেন।

ওই চিঠির যুগ্ম-প্রাপকদের একজন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সারা জীবন রবীন্দ্রসাহিত্য চর্চায় নিবেদিত ছিলেন। কলকাতায় স্কটিশ চার্চ কলেজের স্নাতক হীরেন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ. পাস করেন। তিনি ১৯৪৩ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত বিশ্বভারতীতে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। হীরেন্দ্রনাথ 'ইন্দ্রজিৎ' ছদ্মনামেও লিখতেন। ১৯৪৭ থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি *দেশ* পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে অসংখ্য প্রবন্ধ লেখেন। তার কিছু সংকলিত হয়েছে *অ-চেনা রবীন্দ্রনাথ* বইয়ে (প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪; দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১৪; কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং)। তাঁর অন্যান্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে *রবীন্দ্রসম্ভব কাব্য*, *শান্তিনিকেতনের এক যুগ* ইত্যাদি।

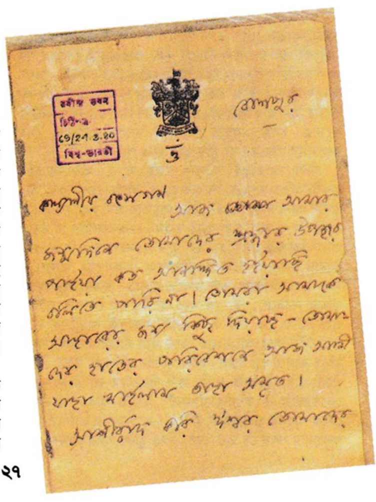
'কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ' নিবন্ধে হীরেন্দ্রনাথ চারণ করেছেন কবিস্মৃতি :

> 'রবীন্দ্রাথের বক্তৃতা শুনেছি, কবিতা পাঠ শুনেছি, একবার একটি সভায় একটি গানও (অন্ধজনে দেহ আলো) শুনেছি।'

'তুমি মোর পাও নাই পরিচয়' রচনায় হীরেন্দ্রনাথের স্মৃতিখণ্ড :

> এসেছিলাম শান্তিনিকেতনের পড়ন্ত বেলায়। রবি সদ্য অস্তমিত কিন্তু সূর্যাস্তের বর্ণ সমারোহে শান্তিনিকেতন তখনো উদ্ভাসিত। শান্তিনিকেতনের জীবন সুরে রসে রঙে রূপে রঞ্জিত নন্দিত। বহু ভাগ্য যে বহু বিলম্বে এসেও অপূর্ব এক জীবনের স্বাদ পেয়েছিলাম। প্রথম দশটি বছরে শান্তিনিকেতন যা আমাকে দিয়েছে তাতেই আজও প্রাণ মন ভরে আছে।

হীরেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা বর্তমানে শান্তিনিকেতনবাসী রবীন্দ্রসংগীত গায়িকা পিয়ালী চন্দ (তাঁর গুণী স্বামী ডক্টর


রবীন্দ্র ভবন
চিঠিপত্র
৩৭/২৭.৩.৪০
বিশ্ব-ভারতী

বোলপুর
ওঁ

কল্যাণীয় বৎসগণ
আজ আমার জন্মদিনে তোমাদের শ্রদ্ধার উপহার পাইয়া কত আনন্দিত হইয়াছি বলিতে পারি না। তোমরা আমাকে আহারের জন্য কিছু দিয়াছ—তোমাদের হাতের পরিবেশনে আজ আমি যাহা খাইলাম তাহা অমৃত।
আশীর্বাদ করি ঈশ্বর তোমাদের

শ্যামল চন্দও একজন রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী) স্মৃতি থেকে জানিয়েছেন, এখানে সংকলিত প্রথম চিঠিটি সম্পর্কে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত *আনন্দবাজার পত্রিকায়* লিখেছিলেন। তবে দ্বিতীয় চিঠি প্রকাশের কোনো তথ্য তাঁর জানা নেই।

রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার লাভে অভিনন্দন জানিয়ে সারদাচরণ দত্ত কবিকে চিঠি লেখেন। কবি তার সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়েছেন ১৩২০ বঙ্গাব্দের ৪ অগ্রহায়ণ 'শান্তিনিকেতন/বোলপুর' ঠিকানা থেকে। সম্বোধন থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, ওই চিঠি সারদাচরণকে লেখা।

সারদাচরণ দত্ত (১২৭৫-১৩৭২ বঙ্গাব্দ) চাঁদপুরে বাবুর হাট হাইস্কুলে প্রথিতযশা ইংরেজির শিক্ষক ও হেডমাস্টার ছিলেন। তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পত্রালাপ ছিল। অন্যত্র রবীন্দ্রজন্মদিন পালনের আগেই তিনি প্রতিবছর তাঁর বাড়িতে রবীন্দ্রজয়ন্তী আয়োজন করতেন। তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের সব চিঠি সম্ভবত সংরক্ষিত হয়নি। তবে পাঁচটি চিঠি সাপ্তাহিক *দেশ* পত্রিকায় প্রকাশ পায় ১৪ নভেম্বর ১৯৪২ সংখ্যায়। (দেখুন, শ্যামাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *দেশ পত্রিকায় রবীন্দ্রচর্চা*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৫; পৃ ৩৪)। তবে ড. গৌরচন্দ্র সাহার *রবীন্দ্র পত্রাবলী: তথ্যপঞ্জী*তে সারদাচরণ এবং তাঁর দুই ছেলেকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র প্রকাশের কোনো তথ্য নেই।


হীরেন্দ্রনাথ দত্ত


সারদাচরণ দত্ত

পুস্তক-পরিচয়

কৃষ্ণরাও—শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত প্রণীত, (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্)।

মানুষের গল্প শোনার প্রথম যুগে হয়েছে রূপকথার সৃষ্টি। রূপকথা বলতে বোঝায় চেহারাওয়ালা গল্প। মনে হওয়া চাই,—ঠিক যেন দেখতে পাচ্ছি। ঐ দেখতে পাওয়াটাই আসল কথা, তার বেশি আর দাবী নেই। গল্পটার প্রমাণ কল্পনায়, যুক্তিতে নয়। কথার সত্য যুগ তখন, অর্থাৎ সত্যকে সেকালে অন্য সাক্ষ্য খুঁজতে হোত না, তার আপনার সাক্ষ্য আপনাতেই। যে সংসারটাকে নিয়ে ব্যবহার করতে হয়, সম্ভবপরতার দরকার তার আগাগোড়া। তার মধ্যে সৃষ্টিছাড়ার হঠাৎ আবির্ভাবকে কেউ ক্ষমা করে না। রূপকথায় ব্যবহারের বেড়া ডিঙিয়ে সৃষ্টিছাড়ার মহলেই মানুষের চড়ুইভাতি।

সাহিত্যের ইতিহাসের গোড়ার পর্ব্বে একটা ছিল প্রাক্‌প্রাকৃতিক যুগ। তখন বিধাতার সৃষ্ট যে প্রাকৃত জগতে মানুষের ব্যবহার ছিল নিয়মে বদ্ধ, তার থেকে নিজের সৃষ্ট অপ্রাকৃত জগতে ব্যবহারের শাসন থেকে নিত সে ছুটি। তখন মানুষের মনের পক্ষে এই ছুটির একান্ত দরকার ছিল। কেননা কঠোর ছিল তার জীবিকার দাবী, সঙ্কীর্ণ ছিল তার ভাগ্য-নির্দ্দিষ্ট সংসার। সেই অবস্থায় সে হাঁপ ছাড়তে চেয়েচে, সেই কল্পলোকে যেখানে যা খুসি তাই হতে পারে।

কিন্তু সংসারেই ঘটুক—গল্পেই ঘটুক—ঘটনামাত্রেরই একটা অভিজ্ঞানপত্রের দরকার আছে, তাকে নিঃসংশয় সত্যের প্রমাণ আনতে হবে। এই নিঃসংশয়তার প্রমাণ প্রাকৃতজগতে একরকম গল্পজগতে আরএক রকম। প্রাকৃতজগতে যে সঙ্গতি তার থাকা চাই সেটা নিয়মের, আর গল্প-জগতে সেটা রূপের। আরব্য উপন্যাস সংসারের নিয়মকে একেবারেই মানলে না কিন্তু রূপ-সঙ্গতিকে তার মানতে হয়েচে। এমন করে তাকে গড়তে হয়েচে, গল্প, যে মনে হয়েচে যে দেখতে পাচ্ছি। প্রতিদিনের যে দৈনিক জগৎটা সর্ব্বদাই মানুষের সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি করে আছে তার থেকে দূরে যাবার জন্যেই সেদিন মানুষ বলেচে গল্প বলো। আজ পূজোর ছুটি হলে টাইম টেব্‌ল্ খুলে বসি, ভাবতে থাকি যাব চিতোরে না উটকামণ্ডে, পেশোয়ারে না কন্যাকুমারিকায়। চিন্তাও করিনে হাড়কাটা থেকে যাব কি রাণীমুদির গলিতে। প্রয়োজনের তাগিদে বাসা বদলাবার সময় সে তর্ক ওঠে। কিন্তু ছুটির সময় আমরা খুঁজি দূরকে, অনভ্যস্তকে। গল্প জিনিষটার সুরু হয়েচে ছুটির আয়োজন নিয়ে।

ইংরেজিতে একটা শব্দ আছে রোমান্স্, যেটা আমাদের রূপকথার সমশ্রেণীর। রাজা আর্থারের কাহিনী হোলো রোমান্স্। ঘরের বাঁধা বরাদ্দ থেকে অঘটন ঘটনের মধ্যে বেরিয়ে পড়বার ফিকির। সেখানকার মাপকাঠি, সংসারের গল্পের মাপকে একেবারে মানে না। খুসি হয় মন সেই জন্যেই, প্রচলিত হিসেব মিলিয়ে চলতে হয় না, জবাবদিহি নেই প্রাত্যহিক প্রয়োজন-বিধাতার কাছে।

শকুন্তলা হোলো রোমান্স্, বইখানা যে পড়ে, নাটকখানা যে দেখে সে নেয় ছুটি। চলে যায় দূরে। এই সব সাহিত্য মানুষের ঘরের মধ্যে দূরকে রচনা করেচে। আশ্বিন মাসে আগ্রায় চিতোরে যাওয়া, আর সার ওয়াল্টর স্কটের নভেল পড়া একজাতের অধ্যবসায়। আগ্রা চিতোর যেসব স্মৃতির সঙ্গে জড়িত সে হোলো দূরস্মৃতি, তাদের পরিমাপও আমাদের হাটবাজারের মাপের নয়। তাদের মধ্যে ক্ষণকালের জন্যে ভুলে যাই আপন প্রাকৃত সত্তাকে, কল্পনার পালে দূর ইতিহাসের হাওয়া লাগে, যে হাওয়াতে এককালকার বড়ো বড়ো ওজনের মানুষ তরঙ্গিত প্রবাহে আপন আপন ভাগ্যতরী নিয়ে বা'চ খেলেচে। কেউ পারে গেছে কেউ তলায়। তখনকার রামায়ণ মহাভারত জাতককথা কাদম্বরী সব কিছুর মধ্যেই ছিল মানুষের ছুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়বার প্রয়াস।

আজ মানুষ এত বড় ঘোরতর কুণো এবং বুড়ো হয়ে গেছে যে এই ইচ্ছেটা তার একেবারে ঘুচে গেছে তা বলতে পারিনে। বাংলা সাহিত্যে প্রথম যখন দুর্গেশনন্দিনী মৃণালিনী কপালকুণ্ডলা দেখা দিল তখন সমস্ত বাঙালী পাঠকের মন যে কী রকম মাতিয়ে দিল তা এখনকার পাঠকেরা কল্পনা করতে পারবে না। ঘোরো বাঙালী সেদিন হঠাৎ বিপুল পরিমাণে ছুটির রস পেয়েছিল। রস-সাহিত্য মাত্রেই এই ছুটি কোনো না কোনো আকারে আছে।

এখনো মানুষ বলে, গল্প বলো। আজকাল এই গল্পের ভূমিকা প্রধানত বাইরের দিক থেকে ঝুঁকেচে মনের দিকে। সে রাজ্য অতি অপরূপ এবং বিশাল। সেখানেও কত অভাবনীয় নানা সংঘাতে সম্ভাবনীয় হয়ে উঠ্‌চে। কলম্বস যেমন আমেরিকা আবিষ্কার করে ইতিহাসের দিগন্তকে বড়ো করে দিয়েচে, এও তাই। এখানে প্রতিদিন বের হচ্ছে নতুন নতুন ক্ষেত্র, নতুন

নতুন খনি। এই মানস মহাদেশে লেখকদের উপনিবেশীর দল চারিদিক থেকে প্রতিদিন এসে জুটচে। মানুষের মন নিয়ে চষা, খোঁড়া, খোঁজা এর আর অন্ত নেই। এই ঠেলাঠেলির ভিড়ের মধ্যে সেদিনের কথা ভুলেছিলুম যেদিন সারাদিনের কাজের ও খেলার শেষে সন্ধ্যা বেলায় প্রদীপ জ্বেলে বলেছিলুম, গল্প বলো।

বাংলা সাহিত্যে এই দূরের কথার ছুটির কথা নেই বললেই হয়, এমন সব কাহিনীর অভাব যার মধ্যে দূরদেশী অজানার রং লেগেচে। তার স্বাদ পাইনে বলেই তার ফরমাস পর্য্যন্ত নেই। অনেক বাঙালীকে দেখেচি বিদেশে, তারা বিদেশের রস পায় না, অত্যন্ত ঘরমুখো তাদের মন। সেখানে যে-ভোজের আসন পাতা তার দিকে সে পিছন ফিরে বসে। বাংলার কথা-সাহিত্য দেখলেই বোঝা যায় বাঙালীর "ঘর হৈতে আঙিনা বিদেশ"।

এমন সময় চারুচন্দ্র দত্তের *কৃষ্ণরাও* বইখানা হাতে এল। লেখক মজলিষি মানুষ, তার উপরে দূরপ্রদেশের অভিজ্ঞতায় তাঁর স্মৃতি-ভাণ্ডার ভরা। যা দেখেচেন তার মধ্যে সমস্ত মন দিয়ে প্রবেশ করেচেন। বোঝা যায় মারাঠায় তিনি ঘরের লোক ছিলেন। এই ঘরের লোক হবার শক্তি সকলের নেই। যাদের আছে তাদের কথা বলবার শক্তি কম। চারু বাবু বিদেশের লোকসমাজের রস পেয়েচেন এবং গল্পে সে রস দিয়েচেন ঢেলে। তাঁর এই কথাগুলিতে দূর দেশ ও দূর-কালের স্বাদ চমৎকার মিলে গেছে। একেই বলে খাঁটি গল্প। এই রকম গল্প পথিকদের কাছে শোনা যেতে পারে পথের ধারের আসরে। এ'কে গল্পগুজব বলে না যেটা চণ্ডীমণ্ডপে বসে পাড়ার লোককে নিয়ে কানাকানি।

গল্প হয়ে গেলেও ছেলেরা বলতে ছাড়ে না, তার পরে। এই বইয়ের প্রথম গল্প ফুরোলে আমাকে সেই ছেলেমানুষিতে পেয়েছিল। আমি হঠাৎ চমক খেয়ে আবিষ্কার করলুম এটা ছোটো গল্প। এই ভেবে মনটাকে গুছিয়ে বসেছিলুম যে এই গল্পটাই এই বইয়ের সর্ব্বব্যাপী। আবার আসন বদলাতে হোলো, তাতে লেখকের উপর কিছু রাগ হয়েছিল। অবশেষে আরো দুটো চারটে গল্প পড়ে মনে মনে মিটমাট করে নিলুম।

আমার দেহ শ্রান্ত এবং কলম কুঁড়ে হয়ে এসেচে। বই এখনো লিখে থাকি কিন্তু বই সমালোচনা করবার মত উদ্বৃত্ত উদ্যম নেই। এই লেখাটাও ঠিক সমালোচনা হোলো না অর্থাৎ সম্যকরূপে কিছুই বল্‌লুম না—মনের কথাটা মোটামুটি বলা হোলো। বিপদ এই ঘটল, আধুনিক অনেক ভালো গল্প সম্বন্ধে আজও কোনো মত দিই নি সেই অপরাধ হোলো নিবিড় যথা বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালি। নিতান্তই কুঁড়েমি করেই কিছু বলি নি, সে ওজর আজকের বেমানান হবে।

কৃষ্ণরাও গল্পের যে ভূমিকা সেইটেই অল্প কিছু বদল করে ঐ বইয়েরও ভূমিকা করা যেতে পারে। পথের পাঁচালির আখ্যানটা অত্যন্ত দেশী। কিন্তু কাছের জিনিষেরও অনেক পরিচয় বাকি থাকে। যেখানে আজন্মকাল আছি সেখানেও সব মানুষের সব জায়গায় প্রবেশ ঘটে না। পথের পাঁচালি যে বাংলা পাড়াগাঁয়ের কথা সেও অজানা রাস্তায় নতুন করে দেখতে হয়। লেখার গুণ এই যে, নতুন জিনিষ ঝাপসা হয় নি, মনে হয় খুব খাঁটি, উঁচু দরের কথায় মন ভোলাবার জন্যে সস্তা দরের রাঙতায় সাজ পরাবার চেষ্টা নেই। বইখানা দাঁড়িয়ে আছে আপন সত্যের জোরে। এই বইখানিতে পেয়েচি যথার্থ গল্পের স্বাদ। এর থেকে শিক্ষা হয় নি কিছুই, দেখা হয়েচে অনেক যা পূর্ব্বে এমন করে দেখি নি। এই গল্পে গাছপালা পথঘাট, মেয়েপুরুষ সুখ-দুঃখ সমস্তকে আমাদের আধুনিক অভিজ্ঞতার প্রাত্যহিক পরিবেষ্টনের থেকে দূরে প্রক্ষিপ্ত করে দেখানো হয়েচে। সাহিত্যে একটা নতুন জিনিষ পাওয়া গেল অথচ পুরাতন পরিচিত জিনিষের মতো সে সুস্পষ্ট।

ঠিক এই সময়েই প্রবোধ সান্যালের *কলরব* আর *নিশি পদ্ম*



পরিচয় পত্রিকার প্রচ্ছদ

বই দুটি আমার হাতে পড়ল। এরা সম্পূর্ণ অন্য জাতের। এরা নিছক আধুনিক।

রিয়ালিজ্‌ম্ এবং আইডিয়ালিজ্‌ম্‌কে প্রাকৃতিকতা এবং ভাবিকতা নাম দেওয়া যেতে পারে। এই দুটোকে নিয়েই মানুষের কারবার। প্রকৃতিকেও সে স্বীকার করতে বাধ্য, তার সঙ্গে তার আপন ভাবের সৃষ্টিও আপনি এসে মেশে। দুইয়ে মিলেই তার রিয়ালিটি; কোনো একটা সাহিত্যিক মতবাদ নিয়ে বলা চলবে না যে মহাভারতের শকুনিই সত্য আর অর্জ্জুন তা নয়, কিম্বা কর্ণের মধ্যে যে অংশে নীচতা সেই অংশে তা রিয়ল, যে অংশে মহত্ত্ব সেই অংশটাই বানানো।

মহাভারতে প্রাকৃতিক এবং ভাবিক অনায়াসে মিশে গেছে, এমন কি অপ্রাকৃতও আপন জায়গা নিয়েচে বিনা কৈফিয়তে। অত বড় সর্ব্বগ্রাহী গল্প জগতের আর কোনো সাহিত্যে লেখা হয় নি। ওর মধ্যে সাহসের সীমা নেই।

কিন্তু নবীন মতবাদওয়ালাদের সাহিত্যের ভীরুতা আছে যথেষ্ট। এরা সুন্দরকে ভয় করে পাছে কেউ গাল দিয়ে বসে এসব মন ভোলাবার ছল, ভালোকে সরিয়ে ফেলে পাছে সেটাতে গুরুগিরির অপবাদ লাগে। এমনি করে এরা কিছুতেই অসঙ্কোচে সহজ হতে পারে না। সাহিত্যে ভালোটা মন্দর চেয়ে ভালো এমন কথা যদি বা অশ্রদ্ধেয় হয় তবু সাহিত্যে ভালোমন্দর একই দর অন্তত এও তো মানতে হবে। কিন্তু এমন ব্যবহার করলে তো চলবে না যে মন্দটার দর ভালোর চেয়ে বেশি—যেহেতু মন্দটাই রিয়ল্। সাহিত্যে এরা এমন একটা জাল পাততে চায়, যে জালে চুনোপুঁটিই পড়ে, এড়িয়ে যায় রুই কাৎলা। রুই কাৎলাকে গাল দিয়ে বলে ওগুলো উঁচকপালে সৌখীনদের মাছ। কোনো কারণে কোনো ভোজে বা কোনো তরকারীতে চুনোপুঁটির যদি বিশেষ ফরমাস থাকে তাহলে আপত্তি করব না কিন্তু কুলবন্ধনের নতুন নিয়মে বড়ো মাছকে যদি একঘরে করা হয় তাহলে বলতেই হবে খাঁটি রিয়ালিজ্‌ম্ এ নয়, এটা বিশেষ দলের ঘরগড়া রীতি, অর্থাৎ কনভেন্‌শন্, নীচতাকেই কৌলিন্যের একমাত্র মর্য্যাদা দেওয়া। এটাকে বাইরে দেখতে মনে হয় সাহসিকতা কিন্তু বস্তুতই এটা ভীরুতা। এটা বাঁধারাস্তার আধুনিকতাগিরি।

প্রবোধ সান্যালের *কলরব* পড়লুম। পড়ে তাঁর রচনা ও কল্পনাশক্তির প্রশংসা করতে হোলো। এই বইয়ে নানা চরিত্র ও নানা ঘটনার ভিড়। কোনোটাকেই মনে হয় না যে বেঠিক। এতগুলো মেয়ে পুরুষকে স্পষ্ট করে গড়ে তুলতে ক্ষমতার দরকার। সে ক্ষমতা আছে লেখকের।

লেখক ইচ্ছে করেই এই বইয়ে দেখাতে চেয়েচেন, একটা বাড়িতে অত্যন্ত সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার একটা ঘোলা আবর্ত্ত। তারা পরস্পর কাছাকাছি আছে এই পর্য্যন্ত, কিন্তু তার চেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তাদের নেই। যেমন অনাদৃত গলি যত রকম আবর্জ্জনায় নোংরা দুর্গন্ধ এবং অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে এ বাড়িতে তেমনি বহুলোকের চিত্তদৈন্য ও অবস্থাদৈন্যের যত কিছু উচ্ছিষ্ট স্তূপাকার হয়ে বাতাসকে মলিন করে তুলেচে। এর মধ্যে অসামান্যতা কোনো চরিত্রে কিছুমাত্র নেই তা নয়—কিন্তু

সে কেমন, হাঁসপাতালে মাঝে মাঝে যেমন দেখা যায় নার্স কিম্বা ডাক্তার কিম্বা ছাত্র। তারা মুখ্য নয় তারা গৌণ।

হাঁসপাতালটা সাধারণ সংসারের প্রতিরূপ নয়। সাধারণ সংসার স্বাস্থ্যে অস্বাস্থ্যে মেলানো; সেইটাকেই বলা যেতে পারে রিয়ল্। হাঁসপাতাল রিয়ল্ নয় অর্থাৎ স্বাভাবিক নয়, ও একটা ছেঁকে আনা জিনিষ। তবু ও স্বীকৃতির দাবী আছে, কেবল প্রয়োজনের দিক থেকে নয় অস্তিত্বের দিক থেকে। ওটা একটা-কিছু হয়ে দাঁড়িয়েচে অতএব সেই মূল্য তাকে দেওয়া চাই। কলরবের বাসাখানাও [...] অসুস্থদেরই বাসা। সংসারে তারা এ-গলিতে ও-গলিতে ছড়িয়ে থাকে। তাদের ছেঁকে এনে একটা জায়গায় সংহত রূপ দেওয়া হয়েচে—অর্থাৎ যা ছিল ক্ষেতের মধ্যে তাকে টিনের মধ্যে বিশেষ জারক রসে ডুবিয়ে প্যাক করা হোলো। আচ্ছা তাই সই।

হাঁসপাতাল সংসার থেকে দূরের জিনিষ, স্বতন্ত্র করা তার সত্তা। সেই দূরের দৃশ্য বিশেষ দিনে দেখতে যাওয়া চলে, রোগীরূপে নয়, ডাক্তাররূপে নয়, নিরাসক্ত দর্শকরূপে। সেই হিসাবে এই হাঁসপাতালী গল্পটাকেও কি রোমান্স্ বল্‌ব না। কিন্তু যদি বলি রোমান্টিক তা হলে আধুনিক মতওয়ালারা লজ্জা পাবেন, কেননা ও শব্দটাকে তাঁরা পছন্দ করেন না। উপায় নেই, পাঠক গল্প শুনতে চেয়েচে, লেখক গল্প জুগিয়েচে নিত্যনৈমিত্তিক সংসার থেকে দূরের দৃশ্যে। মনটা ছুটিতে দূরে যেতেই চায়—গল্প ছুটির জন্যেই। এই দূরের হাওয়া বিচিত্রবর্ণ বসন্তের হতে পারে, হতে পারে ফ্যাকাশে রঙের দরিদ্র শীতের।

আধুনিক লেখকদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা কিছুদিন পূর্ব্বে আমার হাতে পড়েছিল। মনে হয়েছিল তাঁর লেখা বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য। কিন্তু আমার দ্বারা আর ঘটে উঠবে না। যে লেখকরা অবকাশধনে ধনী সমালোচনা তাঁদেরই পোষায়। আমার অবকাশ তলায় এসে ঠেকেচে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

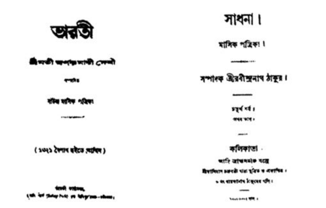
ভাষ্য

ঠাকুরবাড়ির *ভারতী* ও *সাধনা* পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ বেশ কিছু বইয়ের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা লিখেছিলেন। ওই সব সমালোচনা প্রসঙ্গে কবি ভাইঝি ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীকে (১৮৭৩-১৯৬০) এক চিঠিতে লিখেছিলেন :

> ...সাধনার জন্য 'সংক্ষিপ্ত সমালোচনা' এখনো বাকি আছে। দু খানা অপাঠ্য বই পড়ে তার উপরে অপ্রিয় কথা লিখতে হবে। নিতান্ত বাজে কাজ—এমন বাজে কাজ এমন দিনে করা অন্যায়। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস-বশত ফাল্গুনের এই প্রশান্ত মধ্যাহ্নে এই নির্জন অবসরে এই নিস্তরঙ্গ পদ্মার উপরে এই নিভৃত বোটের মধ্যে ব'সে সম্মুখে সোনার রৌদ্র সুনীল আকাশ এবং ধূসর বালুর চর নিয়ে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সাধু-কর্তৃক প্রকাশিত দেওয়ান গোবিন্দরামের সমালোচনা করতে প্রবৃত্ত হতে হচ্ছে। সেই বইও কেউ পড়বে না, সে সমালোচনাও কেউ পড়বে না, মাঝের থেকে আজকের এই দুর্লভ দিনটা নষ্ট হবে।

১৮৮০ থেকে ১৮৯৮ পর্যন্ত উনিশ শতকের শেষ দুই দশকে *ভারতী* ও *সাধনায়* সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ যে তির্যক ব্যঙ্গ ও কটাক্ষ করেছেন তা অবয়সোচিত বলা যাবে না। সমালোচকের বয়স তৎকালে ২০ থেকে ৪০। গ্রন্থ সমালোচনার চেয়ে বরং কবি সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রচনার মূল্য নিরূপণে বেশি গুরুত্ব দেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম সমালোচনামূলক প্রবন্ধ নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের *ভুবনমোহিনী প্রতিভা* (১৮৭৫), রাজকৃষ্ণ রায়ের *অবসর সরোজিনী* (১২৮৩ ব.) ও হরিশচন্দ্র নিয়োগীর



ভারতী ও *সাধনা* পত্রিকার প্রচ্ছদ

দুঃখসঙ্গিনী (১২৮২ ব.) কাব্যত্রয়ীর সমালোচনা।

পরে *জীবনস্মৃতি*তে কবি উল্লেখ করেন :

> প্রথম যে গদ্য প্রবন্ধ লিখিত তাহাও এই জ্ঞানাঙ্কুরেই বাহির হয়। তাহা গ্রন্থ সমালোচনা।...আমি তখন ভুবনমোহিনী প্রতিভা, দুঃখসঙ্গিনী ও অবসর সরোজিনী বই তিনখানি অবলম্বন করিয়া জ্ঞানাঙ্কুরে এক সমালোচনা লিখিলাম।

তার আগে ষোলো বছর বয়সে মাইকেল মধুসূদন দত্তের *মেঘনাদবধ কাব্য* বিষয়ে *ভারতী* পত্রিকায় এক 'দাম্ভিক' সমালোচনা লেখেন। *জীবনস্মৃতি*তে কবি পরে কবুল করেছেন :

> আমি অল্প বয়সের স্পর্ধার বেগে মেঘনাদবধের একটি তীব্র সমালোচনা লিখিয়াছিলাম। কাঁচা আমের রসটা অম্লরস—কাঁচা সমালোচনাও গালিগালাজ। অন্য ক্ষমতা যখন কম থাকে তখন খোঁচা দিবার ক্ষমতাটা খুব তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে। আমিও এই অমর কাব্যের উপর নখরাঘাত করিয়া নিজেকে অমরা করিয়া তুলিবার সর্বাপেক্ষা সুলভ উপায় অন্বেষণ করিতেছিলাম। এই দাম্ভিক সমালোচনাটা দিয়া ভারতীতে প্রথম লেখা আরম্ভ করিলাম।...

মধুসূদনের *মেঘনাদবধ কাব্য*-এর যে সমালোচনাটি ছয় কিস্তিতে *ভারতী*তে (শ্রাবণ-কার্তিক ও পৌষ-ফাল্গুন, ১২৮৪ ব./১২৮৪ খ্রি.) প্রকাশ করেন তার চার বছর আগেই মধুসূদন প্রয়াত হন। ওই দুর্ধর্ষ সমালোচনার কয়েকটি মন্তব্য এ রকম :

> ...তিনি মহাকাব্য রচনার যোগ্য কবি নহেন।...ভাষাকে কৃত্রিম ও দুরূহ করিবার জন্য যত প্রকার পরিশ্রম করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত তাহা তিনি করিয়াছেন।...দেখিলাম তাহার প্রাণ নাই। দেখিলাম তাহা মহাকাব্যই নয়।[১]

তারুণ্যের অভিমানে রবীন্দ্রনাথ সমালোচনায় ব্যঙ্গ-বিদ্র পবাণে বিদ্ধ করলেও পরিণত বয়সে স্নিগ্ধ কৌতুকবোধের সঙ্গে লেখকদের গুণ শনাক্ত করার প্রয়াস পেয়েছেন, উপযুক্ত সমাদর করতেন এবং নবীন লেখকদের উৎসাহ দানে অকৃপণ প্রশংসাও করতেন।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০) সম্পাদিত *পরিচয়* পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-কবিতা ছাড়াও দুটি পুস্তক-পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। জগদীশ গুপ্তর *লঘুগুরু* গ্রন্থের সমালোচনা কার্তিক ১৩৩৮ সংখ্যায় মুদ্রিত।

১৩৪০-এর বৈশাখ সংখ্যায় 'পুস্তক-পরিচয়' বিভাগে চারুচন্দ্র দত্ত-প্রণীত *কৃষ্ণরাও* গ্রন্থের আলোচনা দিয়ে শুরু হলেও ওই সমালোচনায় বিভূতিভূষণের *পথের পাঁচালী* এবং প্রবোধ সান্যালের *কলরব* বই নিয়েও রবীন্দ্রনাথ সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত আধুনিক গদ্য সংকলনেও *কলরব*-এর অংশ সংকলিত।

১৯৩৩-এ লেখা ওই আলোচনায় কবি উল্লেখ করেছেন

যে :

আমার দেহ শ্রান্ত এবং কলম কুঁড়ে হয়ে এসেছে। এই লেখাটাও ঠিক সমালোচনা হোলো না অর্থাৎ সম্যকরূপে কিছুই বললুম না—মনের কথাটা মোটামুটি বলা হোলো। বিপদ এই ঘটল, আধুনিক অনেক ভালো গল্প সম্বন্ধে আজও কোনো মত দিই নি সেই অপরাধ হোলো নিবিড়—যথা বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালি।

আলোচনার উপসংহারে কবি লিখেছেন :

আধুনিক লেখকদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা কিছুদিন পূর্ব্বে আমার হাতে পড়েছিল। মনে হয়েছিল তাঁর লেখা বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য। কিন্তু আমার দ্বারা আর ঘটে উঠবে না। যে লেখকেরা অবকাশ ধনে ধনী সমালোচনা তাঁদেরই পোষায়। আমার অবকাশ তলায় এসে ঠেকেছে।

অবশ্য এর ৬ বছর পর অমিয় চক্রবর্তীর *খসড়া* ও *এক মুঠো* কাব্য—দুটি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ 'নবযুগের কাব্য' নামে সুদীর্ঘ সমালোচনা-প্রবন্ধ লিখেছেন (দেখুন, *চিঠিপত্র,* একাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৯৭৪ পৃ. ৩৫৭-৩৭২)।

তবে ১৯৩৯-এর মার্চ ও এপ্রিলে কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রকে দুটি চিঠি লেখেন :

প্রেমেন্দ্র মিত্র
মিত্র অ্যাণ্ড ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

এর আগে মাঝে মাঝে তোমার লেখা কবিতা পড়েছি। তাতে স্বকীয় বিশিষ্টতায় আমাকে আনন্দ দিয়েছে।...তোমার 'ধূলিধূসর' বইটিতে তোমার লেখা কয়েকটি ছোটগল্প পড়তে পাওয়া গেল। বইটির নামের ছাপে এই গল্পগুলির একটি সংজ্ঞা তুমি দিয়েছ। বোধ হয় জানাতে চাও এর অধিকাংশ নায়ক নায়িকা এবং ঘটনা প্রাত্যহিক তুচ্ছ জীবনযাত্রার ধুলো পড়ে ম্লান। কিন্তু আমি মনে করিনে এ সংজ্ঞা তোমার গল্পগলি সম্বন্ধে ঠিক খেটেছে। প্রথম গল্পটি পড়েই দেখা গেল, এ তো নেহাৎ পায়ে হাঁটা দাগ পড়া চলতি জীবনের কথা নয়। এ তো সচরাচরের বাহির এলেকায়। তারপরে দেখলুম অন্যান্য সব গল্পেই...অপ্রত্যাশিতের উঁকিমারা মুখ কোথাও বা ব্যঙ্গহাস্যে কোথাও বা দাঁত খিঁচিয়ে দেখা দিয়েছে। সেইটেই তার বিশেষত্ব, ধূলির আবরণটা নয়। আমার ঘরের সামনেই ঐ বাগানে একটা আমগাছ আছে। প্রথম বয়সেই তার বারো আনা মুড়িয়ে খেয়েছে গোরুতে।

...এবার বসন্তে হঠাৎ দেখি তার একটিমাত্র ডাল ফলের ভারে নেমে পড়েছে। পঙ্গু জীবনের এই অন্তর্গূঢ় কৌতুক তোমার প্রায় সব গল্পেই হঠাৎ বেরিয়ে পড়েছে। এরা সব আচমকা, একে ধূসরতা বলা চলে না। বইটি পড়ে খুশি হলুম।

ইতি
১৯ মার্চ ১৯৩৯

শুভার্থী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়েষু,

অন্ধ ভাগ্যের পটভূমিকায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন জীবনযাত্রার যে সব সুপ্রত্যক্ষ ছবি তোমার গল্পগুলিতে তুমি প্রকাশ করেছ তা পড়ে আমি বিস্মিত হয়েছি। তোমার অস্খলিতগতি লেখনী রচনাশক্তির উচ্চ পর্যায়ে উত্তীর্ণ হতে পেরেছে সন্দেহ নেই। কেবল দুই একজন সাধু সাধকের চরিত্র আমার কাছে যথেষ্ট পরিচিত হতে পারেনি।

তোমার 'প্রথমা'র কবিতাগুলি আগুনে ঢালাই করা হাতুড়ি পিটোনো কবিতা—এদের ভিতরে পরম অগ্নিস্রাব জমে গিয়েছে। জীবনের যে ভূভাগে মরুর অধিকার পাকা হয়নি, যেখানে ফুল ফোটে, ফল ফলে, সেখানেও কবি বাঁশি বাজাবার বায়না পেয়েছে একথা মনে রেখো, কেবলি দুন্দুভি বাজাবার পালা তার নয়।

ইতি
৮ এপ্রিল ১৯৩৯

ছদ্মনামে রচনা

জলকষ্ট

গতবৎসর জলকষ্ট লইয়া আমাদের দেশে একটা আন্দোলন হইয়া গেছে। সুতরাং এ আন্দোলন আর যে শীঘ্র উঠবে, এমন আশা নাই—কেন না, কথা কহিয়া কাগজে লিখিয়া আমাদের মনটা বেশ খোলসা হইয়া গেছে।

আমাদের ঘরের কাছে জলের কল আছে, অতএব পাড়াগাঁয়ের জলের কষ্ট লইয়া আমরা যেটুকু মাথা বকাইয়াছিলাম, তাহাতে আমাদের বিশুদ্ধ দেশানুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে।

কেবল দুঃখ এই, এ দেশানুরাগে জলের তৃষ্ণা মেটে না, জ্যৈষ্ঠের পর জ্যৈষ্ঠমাস ফিরিয়া আসে। দেশের তালু শুকাইয়া যায়, মধ্যাহ্নে অতিথি আসিয়া জল চাহিলে একগণ্ডুষ জল দিতে গৃহীর হাত সরে না, প্রখর রৌদ্রে ভিজা বালি খুঁড়িয়া তুলিয়া সেই বালি মাথায় দিয়া স্নানের কাজ সারিতে হয় এবং একটিঘড়া জল আনিতে মেয়েরা দেড়ক্রোশ তপ্তপথ হাঁটিয়া যায় এবং ফিরিতে আর দেড়টি ক্রোশ লাগে। ইহা আমার জানা কথা।

এই দেশানুরাগীদের পূর্ব্বপুরুষেরাই গ্রামে গ্রামে পুকুর দিয়াছিলেন, পথের ধারে জলসত্র খুলিয়াছিলেন, জ্যৈষ্ঠমাসে বরফমিশ্রিত লেমনেড খাইবার সময় এই কথাটা চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক।

পুরুষের দেশানুরাগ, বোধ করি, লোকের ক্ষুধা-মিটানো, তৃষ্ণা-মিটানো, রোগের তাপনিবারণ করার কথা তেমন করিয়া ভাবিতে পারে না,—মন্ত্রিসভার সভ্য হওয়া, মোটা মাহিনার চাকরী পাওয়া, এইগুলাই তাহারা বেশি করিয়া বোঝে।

কিন্তু ক্ষুধিতের অন্ন জুটিতেছে না এবং তৃষিত জল পাইতেছে না, ইহাতে আমাদের স্ত্রীলোকের প্রাণ যদি না কাঁদে, তবে দেশের মর্ম্মস্থান পর্য্যন্ত বিকৃত হইয়া গেছে, এ কথা মানিতে হইবে।

স্ত্রীলোকের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা নাই, পুরুষেই কর্ত্তা, এই একটা বলিবার কথা আছে বটে। কথাটা সম্পূর্ণ সত্য কি না, সে আলোচনা আপাতত করিতে চাই না। কিন্তু দেশে বিধবা স্ত্রীলোকের হাতে জমিদারী পড়িয়াছে, দেশে এমন ঘটনা বিরল নহে। কাগজে যখন দেখিতে পাই, তাঁহারা সদর ষ্টেশনে গবর্মেন্টের সদর-আপিস-নির্ম্মাণের জন্য জমি ছাড়িয়া দিতেছেন, তখন আমি বাঙালি স্ত্রীলোক, স্বদেশী মেয়েদের উপর আমার ধিক্কার জন্মে।

আমাদের দেশের পুরুষেরা অনেকদিন হইতে গোলামী করিয়া আসিতেছে—গবর্মেন্টের নাড়া না খাইলে, উপাধির

লোভ না পাইলে, তাহাদের যদি সাড়া না পাওয়া যায়, তবে না হয় তাহাদিগকে মাপ করা যাইবে। কিন্তু আমরা মেয়েমানুষ, আমাদের একটা গর্ব্ব ছিল যে, দেশের ধর্ম্ম দেশের অন্তঃপুরেই শেষ আশ্রয় লইয়াছে। আমাদের এই গর্ব্ব ছিল যে, যখন দেশের পুরুষেরা অনেকদিন ধরিয়া যে চরণের আঘাত খাইতেছে সেই চরণে লুটাইয়াই জন্ম কাটাইল, তখন মেয়েরা যে চরণকে ভক্তি করে সেই চরণেরই সেবা করিয়া আসিয়াছে। মেয়েরা ভয়ের তাড়না বা লোভের উত্তেজনায় নয়, কিন্তু প্রাণের টানেই ক্ষুধিতের ক্ষুধা, তৃষ্ণার্ত্তের তৃষ্ণা মিটাইয়া আসিয়াছে, রোগের সেবা ও শোকের সান্ত্বনা তাহাদের স্নেহেরই কাজ, অতএব ধর্ম্মই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট, রাজদণ্ডের প্রয়োজন নাই।

দেশের কপালক্রমে এখন কি তাহার উল্টা দেখিতে হইবে? দেশে যখন অন্নজলের টানাটানি, তখন যে স্ত্রীলোকের হাতে ভগবান্ সামর্থ্য দিয়াছেন, সেও তেলামাথায় তেল ঢালিয়া গেজেটে নাম লিখাইতে যাইবে? আমরা মেয়েমানুষ, আমাদের আবার নাম কিসের? আমাদের স্বামীর নাম হোক্, আমাদের ছেলের নাম হোক্—নাম আমাদের বাপের আমাদের শ্বশুরের হোক্, ধর্ম্ম আমাদের থাক্!

আমি কোনোমতেই বিশ্বাস করিতে পারিব না যে, আমাদের মেয়েদের প্রাণ কঠিন হইয়া গেছে। তাহা হইলে সংসার চলিত না। যে মেয়েরা ঈশ্বরের কৃপায় অন্নদান-জলদান করিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ভাল করিয়া জানেন না, কোথায় ক্ষুধা, কোথায় তৃষ্ণা।

আজ কাঠফাটা রৌদ্রের দিনে বাংলাদেশের তৃষ্ণা যে কতখানি, তাহা নিশ্চয়ই তাহাদের কানে পৌঁছায় না। যাহারা জানে তাহারা বলিবে, এত অসহ্য দুঃখ, মহাপাপ নহিলে, দেশে ঘটিতে পারে না। সে পাপের বিচার ভগবান্ করুন, কিন্তু যে মেয়েমানুষ, সে যেন তাহার পোষ্যপুত্রটির উদ্দেশে কেবল কোম্পানির কাগজের সুদ না গোণে, তৃষ্ণাতুর দেশ যখন তাহার প্রাসাদের দ্বারে দাঁড়াইয়া ডাকিতে থাকে, মা আমাকে একটু জল দাও—তখন যেন মোটা দেওয়ানবাবু তাড়া করিয়া আসিয়া এই হতভাগ্য অতিথিকে চোখের জলে বিদায় করিয়া না দেয়!

জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের চাঁদার খাতায় যদি বড় বড় অঙ্কপাত করিতে হয়, তবে এমন করিয়া কি করা যায় না, যাহাতে দেশের মুখে কলঙ্কপাত না হয়, যাহাতে গেজেটেও নাম ওঠে আর পিপাসার জল পাইয়া পীড়িত ভগবান্‌ও প্রসন্ন হন? ম্যাজিস্ট্রেটের চেয়েও তিনি কি ছোট?

শ্রীমতী কনিষ্ঠা।

অহেতুক জলকষ্ট

জলকষ্ট সম্বন্ধে আমাদের ভগিনী শ্রীমতী কনিষ্ঠা দেশের ধনী বিধবাদের নামে যে অভিযোগ আনিয়াছেন তাহা সমস্তই মানিয়া লওয়া গেল। দেশে ধনী বিধবা কয়জনই বা আছেন? তাঁহারা সকলেই যদি তৃষ্ণার্ত্তকে দয়া করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলেও কতটুকুই বা সুবিধা হইবে?

কিন্তু দয়া হয় না কেন? সেইটেই ভাবিবার কথা।

শ্রীমতী কনিষ্ঠাকে আমি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি। যেখানে জলের অভাব নাই, সেখানেও যে দেশের লোক জোর করিয়া অকারণে জলকষ্ট সৃজন করে, তৃষ্ণা কাহাকে বলে সে দেশের লোককে কি ঈশ্বর জানাইবেন না? পাপ না থাকিলে কি মানুষ এত দুঃখ পায়?

যাঁহারা দেশের লোক-তালিকা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বলিতে পারেন বাংলাদেশে বিধবার সংখ্যা কত। নিশ্চয়ই বড় কম নয়। ইহাদের মধ্যে নিতান্ত শিশু বালবিধবাও অনেক আছে। দুটি একটি বিধবা নাই এমন হিন্দুঘর বোধ হয় বাংলাদেশে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

শ্রীমতী কনিষ্ঠা একবার একাদশীর কথাটা ভাবিয়া দেখুন্ দেখি। দেশের এক সীমা হইতে আর এক সীমা পর্য্যন্ত প্রত্যেক হিন্দুর ঘরে সে কি দুঃখ! রোগী বিধবা জল না পাইয়া মরিতেছে, শিশু বিধবা পাছে লুকাইয়া জল খায় বলিয়া তাহাকে ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া রাখা হইতেছে এবং আচারবতী বিধবা শুষ্কতালু লইয়া মনে মনে একাদশীর প্রত্যেক দণ্ড গণনা করিতেছে।

বাংলাদেশের ভগবান্ যদি এমন নিষ্ঠুর হন যে, এই সকল হতভাগিনী অবলাদের পক্ষে বিনাকারণে অসহ্য জলতৃষ্ণাকেই তিনি পুণ্যের উপায় করিয়া থাকেন, তবে এদেশের মানুষের মনে দয়া হইবে কেমন করিয়া? বাপ মা যেখানে মেয়েকে, ছেলে মেয়ে যেখানে মাকে, মরিয়া গেলেও মুখে জল দিতেছে না, সেখানে দেশের জলকষ্টের জন্যে দুটো চারটে ধনী বিধবার মনে দয়া জন্মাইবার চেষ্টা করিয়া ফল কি হইবে?

অথচ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতকে যখন জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা সকলেই বলেন এরূপ নিরম্বু-উপবাস কোনো প্রামাণ্য শাস্ত্রের বিধান নহে। তবে তাঁহারা এই অশাস্ত্রীয় বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে কথা কহেন না কেন? তাঁহাদের সাহস হয় না। যে দেশের শাস্ত্রজ্ঞানীরা এতবড় অধর্ম্ম করিতে পারেন, সে দেশ জলের কষ্ট কাহাকে নিবেদন করিবে?

বিশেষ কোনো তিথিতে মানুষ জল না খাইলে দয়াময় ভগবান্ তাহার পরে বিশেষভাবে প্রসন্ন হন এ কথা বিশ্বাস করেন না এমন লোক নিশ্চয়ই এদেশে অনেক আছেন, তবু তাঁহারা যদি তাঁহাদের কন্যা ভগিনী মাতাকে জানিয়া-শুনিয়া নিষ্ফল পীড়া দিতে পারেন, তবে এমন পাপিষ্ঠ দেশকে দয়া করিবে কে?

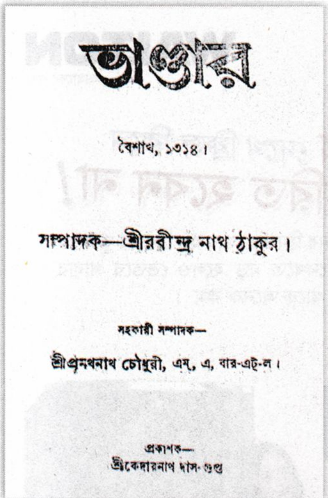
এমনও শুনিয়াছি, একাদশীর দিনে বিধবার নিরম্বু-উপবাস বাংলাদেশের বাহিরে কোথাও প্রচলিত নাই। যে প্রথা কোনো শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রে উপদিষ্ট বা অধিকাংশ হিন্দুসমাজেই অনুষ্ঠিত হয় না, সেই প্রথাকে দেশের পণ্ডিত লোকেরা যদি উঠাইয়া দিতে না পারেন—যে সকল অন্যায় তাঁহাদের স্বকৃত এবং যাহার প্রতিকার তাঁহাদের সাধ্যায়ত্ত তাহাদের সম্বন্ধেও যদি তাঁহারা উদাসীন থাকেন, তবে জলকষ্টের কথা যে আমরা লজ্জায় মুখে আনিতে পারিব না।

আমাদের অনেক দুঃখকষ্টের প্রতিকারের জন্য দেশের শিক্ষিতলোকে গবর্মেণ্টের কাছে দাবি করিয়া থাকেন। তখন তাঁহাদের মনের উত্তেজনা ও ভাষার অসংযম দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। দেশের দুঃখে বাস্তবিকই যদি তাঁহারা এত অধিক ব্যথা পান, তবে যে সকল দুঃখ নিজেরা দূর করিতে পারেন সাহস করিয়া তাহা দূর করিতে চেষ্টা করুন। আর শ্রীমতী কনিষ্ঠার প্রতি আমার নিবেদন এই যে, তাঁহার ঘরের মধ্যে যে অনাবশ্যক অন্যায় জলকষ্ট আছে তাহা নিবারণ করিবার জন্য তাঁহার যতটুকু শক্তি আছে, তাহা যদি প্রয়োগ করিতে পারেন, তবে দেশের জলাভাবের কথা উত্থাপন করিবার অধিকার তাঁহার জন্মিবে, এবং কর্ত্তব্যবিমুখ নরনারীকেও সবলে তিরস্কার করিতে পারিবেন।

শ্রীমতী মধ্যমা।

ভাষ্য

চট্টগ্রামের দেশহিতৈষী কেদারনাথ দাশগুপ্তের (১৮৭৮-১৯৪২, পরে লন্ডনপ্রবাসী ব্যারিস্টার) উদ্যোগে প্রকাশিত মাসিক *ভাণ্ডার*


ভাণ্ডার

বৈশাখ, ১৩১৪।

সম্পাদক—শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

সহকারী সম্পাদক—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী, এম্, এ, বার-এট্-ল।

প্রকাশক—

শ্রীকেদারনাথ দাস-গুপ্ত

ভাণ্ডার পত্রিকার প্রচ্ছদ

(১৩১২-১৩ বঙ্গাব্দ) পত্রিকায় সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের প্রশ্ন, প্রস্তাব, সম্পাদকীয় মন্তব্য, প্রবন্ধ, কবিতা, গান ইত্যাদি প্রায় ৫০টি রচনা প্রকাশ পেয়েছিল।

রবীন্দ্রতথ্যভাণ্ডারী পুলিনবিহারী সেন (১৯০৮-২০০৮) *ভাণ্ডার* ও অন্যান্য সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনার সূচি সংকলন করেছিলেন (দেখুন, পুলিনবিহারী/জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধার্ঘ্য, ২০০৯)। ওই রচনা-পঞ্জিতে অগ্রন্থিত কয়েকটি লেখার কথা আছে। ছদ্মনামে ও নামহীন রচনা সম্পর্কে পুলিনবিহারী ওই তালিকায় উল্লেখ করেছেন :

> এই তালিকার বহির্ভূত রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো রচনা ছদ্মনাম ও নামহীনতায় এই দুই বৎসরের ভাণ্ডারে আত্মগোপন করিয়া আছে বলিয়া মনে হয়। জ্যেষ্ঠ ১৩২২ সংখ্যায় প্রকাশিত 'শ্রীমতী কনিষ্ঠা'-লিখিত 'জল কষ্ট' প্রবন্ধ এবং আষাঢ় ১৩২২ সংখ্যায় উক্ত প্রবন্ধের আলোচনা, 'শ্রীমতী মধ্যমা'-লিখিত 'অহেতুক জলকষ্ট' ভাষা ও বিষয়গুণে রবীন্দ্রনাথের বলিয়া অনুমান হয়। রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখার এরূপ দৃষ্টান্ত দুর্লভ নহে : যথা প্রতিবাদ বা পরিপূরক আলোচনা করিতেছেন ১৩০৫ সালের ভারতী ভাদ্র সংখ্যায় 'মুখুজ্জে বনাম বাঁড়ুয্যে' এবং আশ্বিন সংখ্যায় 'অপর পক্ষের কথা'।

সাপ্তাহিক *দেশ* পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের ছদ্মনাম সম্পর্কে স্পষ্টতই লেখা হয় :

> 'ভাণ্ডার' পত্রিকায় 'শ্রীমতী কনিষ্ঠা'র 'জলকষ্ট' এবং 'শ্রীমতী মধ্যমা'র 'অহেতুক জলকষ্ট' রবীন্দ্রনাথেরই ছদ্মনাম।
>
> (দেখুন, পত্রনবীশ, 'ছদ্মনাম', শ্যামাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *দেশ পত্রিকায় রবীন্দ্রচর্চা* সটীক রচনাপঞ্জি
>
> কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৫ পৃ. ১৫৭।)

পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত ১৯৬২-তে প্রকাশিত *স্বদেশী সমাজ*-এ লেখা দুটি গৃহীত। *ভাণ্ডার*-এর উল্লিখিত দুই সংখ্যা থেকে লেখা-দুটি হুবহু সংকলিত; বানান-অপরিবর্তিত।

অবিভক্ত বাংলায় পানির সমস্যা আজকের চেয়েও প্রকট ছিল বলে আভাস আছে রবীন্দ্রনাথের শতাধিক বছর আগে লেখা নিবন্ধ দুটিতে। 'জলকষ্ট' লেখার তিন দশক পরে কবি শান্তিনিকেতনে এক ভাষণে বলেছিলেন :

> [কুষ্টিয়ায়] আমার জমিদারীতে নদী বহু দূরে ছিল; জলকষ্টের অন্ত ছিল না।[২]

বীরভূমের বোলপুরে পানির সমস্যা কত গুরুতর ছিল তার পরিচয় আছে শান্তিনিকেতনের লাগোয়া ভুবনডাঙায় জলাশয় প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এক সভায় কবি প্রদত্ত 'জলোৎসর্গ' শিরোনামে এক বক্তৃতায় :

> ...একদিন দেশে জল ছিল প্রচুর, আজ গ্রামে গ্রামে পাঁকের তলায় কবরস্থ মৃত জলাশয়গুলি তার প্রমাণ দিচ্ছে,... ।... যে জলকষ্ট সমস্ত দেশকে অভিভূত করেছে তার সবচেয়ে প্রবল দুঃখ মেয়েদের ভোগ করতে হয়।...

পূর্ববঙ্গে বাসের অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন :

> পদ্মাতীরে পল্লীতে থাকবার সময় দেখেছি চার-পাঁচ মাইল তফাত থেকে মধ্যাহ্ন রৌদ্র মাথায় নিয়ে তপ্ত বালুর উপর দিয়ে মেয়েরা বারে বারে জল বহন করে নিয়ে চলেছে।[৩]

একই রকম অভিজ্ঞতার কথা 'জলকষ্ট' নিবন্ধে শ্রীমতী প্রথমা ছদ্মনামের আড়ালে কবি লিখেছেন :

> একটি ঘড়া জল আনিতে মেয়েরা দেড় ক্রোশ [তিন মাইলের বেশি] তপ্ত পথ হাঁটিয়া যায় এবং ফিরিতে আর দেড়টি ক্রোশ লাগে।

শান্তিনিকেতনে প্রথম নলকূপ খনন উপলক্ষে (১৭ এপ্রিল ১৯২২) রবীন্দ্রনাথ এই গানটি লিখেছিলেন :

এসো এসো হে তৃষ্ণার জল,
ভেদ করো কঠিনের বক্ষস্থল, কলকল ছলছল।
এসো এসো উৎসস্রোতে গূঢ় অন্ধকার হতে,
এসো হে নির্মল, কলকল ছলছল।
রবিকর রহে তব প্রতীক্ষায়,
তুমি যে খেলার সাথি, সে তোমারে চায়
তাহারি সোনার তান তোমাতে জাগাক গান,
এসো হে উজ্জ্বল, কলকল ছলছল।

হাঁকিছে অশান্ত বায়—
আয় আয় আয়, যে তোমায় খুঁজে যায়।
তাহার মৃদঙ্গরবে করতালি দিতে হবে,
এসো হে চঞ্চল, কলকল ছলছল।

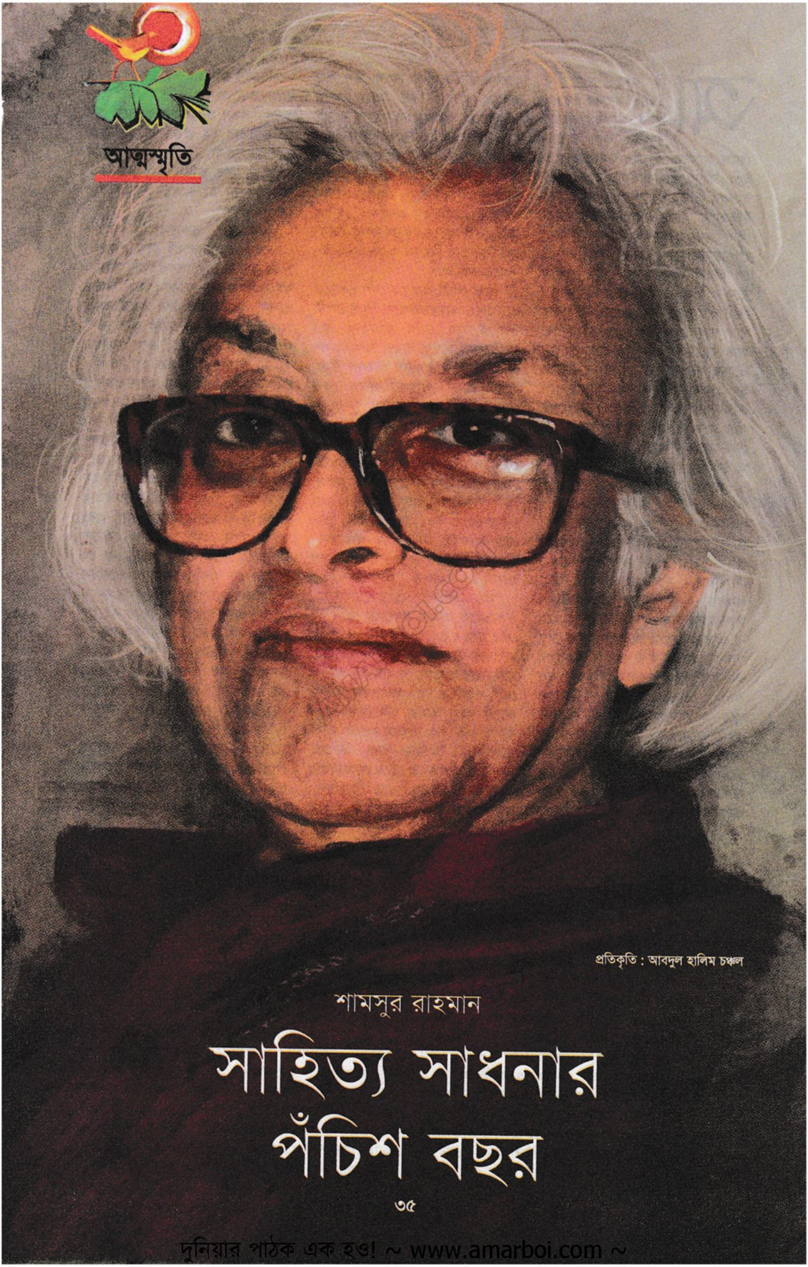
অনাবৃষ্টি কোন্ মায়াবলে
তোমারে করেছে বন্দী পাষাণশৃঙ্খলে,
ভেঙে নীরসের কারা এসো সো বন্ধহীন ধারা,
এসো হে প্রবল, কলকল ছলছল।

[প্রকৃতি পর্ব, গ্রীষ্ম, *গীতবিতান,* পৃ ৪৩১-৩২, *শাপমোচন*, রবীন্দ্র-রচনাবলী, খণ্ড ২২, বিশ্বভারতী, ১৯৫৭ পৃ ৮৭-৮৮]

তথ্যসূত্র

১ রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত খণ্ড-২।
২ 'শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ' পুলিনবিহারী সেন কর্তৃক সংকলিত *পল্লীপ্রকৃতি*, বিশ্বভারতী ১৩৯৩; পৃ ১০০।
৩ রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৯১।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : উদয়নারায়ণ সিং, সুকল্যাণ চন্দ, আবুল মোমেন, অনাথনাথ দাস ও সুমিতা ভট্টাচার্য।



প্রতিকৃতি : আবদুল হালিম চঞ্চল

শামসুর রাহমান

সাহিত্য সাধনার পঁচিশ বছর

৩৫

আমি লিখতে শুরু করি ১৯৪৮ সালের শেষের দিকে। সুতরাং, পঁচিশ বছরের কথা বলতে গেলে আমাকে আগের কথাও বলতে হবে। কারণ, ধারাবাহিকতা বলে একটি ব্যাপার ইতিহাসে আছে, সাহিত্যের ইতিহাসে আছে এবং একজন ব্যক্তি তিনি লেখকই হোন কিংবা অন্য কোনো পেশায় নিয়োজিত হোন, তার জীবনেও সে ধারাবাহিকতা রয়ে গেছে। আমি মনে করি না কোনো লেখকই স্বয়ম্ভু। তিনি তাঁর পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত। তাঁর সঙ্গে অন্য লেখকেরা তাঁরা তাঁর বন্ধু হতে পারেন আবার নাও হতে পারেন, তাঁদের সঙ্গেও তাঁর একটা কথাবার্তা হয়। সে যা-ই হোক, আমি যাঁদের সঙ্গে লেখা শুরু করি, তাঁদের কেউ কেউ আজ আর জীবিত নেই। আবার, কেউ কেউ আছেন এবং আশা করি তাঁরা অনেক দিন থাকবেন।

আমরা যখন লিখতে শুরু করি, তখন একধরনের, আমি কবিতার কথাই বলব—কবিতা ছিল, যেগুলোর মধ্যে পাকিস্তানি একটা উচ্ছ্বাস, জিন্দাবাদধর্মী একটি উচ্ছ্বাস প্রকট ছিল এবং আমার সে বয়সেই মনে হয়েছে তার মধ্যে একধরনের সারল্য নয়, তারল্য ছিল। আপনাদের নিশ্চয়ই বুঝিয়ে বলতে হবে না যে সারল্য এবং তারল্যের মধ্যে বেশ পার্থক্য আছে। আর ওটা সত্যিকারের কবিতার পক্ষে একটা বাধাস্বরূপ ছিল এবং একটু পরে, আরও পরে—আমাদের ভাষাকে একটু ভিন্নধর্মী করার জন্যে কিছু কিছু প্রস্তাব কোনো কোনো বয়স্ক লেখক দিচ্ছিলেন সরকারি প্ররোচনায়। আমি বলব—যা আমাদের ব্যথিত এবং ক্ষুব্ধ করেছিল এবং এখন আমি আমার লেখায় বেশ কিছু—যাকে বলে আরবি-ফারসি কিংবা উর্দু শব্দ ব্যবহার করি। কিন্তু আগে আমি একেবারেই করতাম না। ইচ্ছে করেই করতাম না। প্রতিবাদ করেই করতাম না। কারণ, ওটি আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার একটা প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। আমি তৎসম শব্দ বেশি প্রয়োগ করতাম। আমি শুধু একা নই, আরও কেউ কেউ করতেন। সে যা-ই হোক, সেই পণ্যতার বিরুদ্ধে আমরা দাঁড়াই। লিখতে শুরু করি।

শিখা গোষ্ঠী আমাকে বেশ প্রভাবিত করেছিল। আমরা তখনো শিখা গোষ্ঠী সম্পর্কে খুব বেশি জানতাম না। একধরনের আবছা ধারণা ছিল। এখন বেশ কিছু জানি। কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হুসেন, তারপর আরও কেউ কেউ, তাঁদের যে চিন্তাধারা, তাঁরা যে একটি মুক্তচিন্তা করার কাজ করছেন, এটা আমাকে বেশ আলোড়িত করেছিল। নজরুল ইসলামের কবিতা তো ছিলই। আর আমাদের যাঁরা অগ্রজ, কোনো কোনো আধুনিক কবি এবং রবীন্দ্রনাথের কথা বাদই দিলাম, তিনি তো আছেনই, সব সময় থাকবেন। ত্রিশের কবিদের কবিতাও আমাকে বেশ প্রভাবিত করেছিল।

গত পঁচিশ বছরে—স্বাধীনতা-উত্তরকালে আমার সবচেয়ে বেশি বই বেরিয়েছে। শুধু আমার নয়, এ দেশে স্বাধীনতা-উত্তরকালে কবিতার বই এবং সাহিত্যের অন্যান্য শাখার বই অনেক বেশি প্রকাশিত হয়। স্বাধীনতার পরপর কয়েক বছর আমরা যদি সেটা স্মরণ করতে চাই এবং এখানে অনেক কবি-সাহিত্যিক আছেন—তাঁরা নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবেন যে কবিতার বইয়ের প্রচার খুব বেড়ে গিয়েছিল। প্রকাশকেরা খুব উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন কবিতার বই প্রকাশ করার ব্যাপারে। অনেক কপি বিক্রি হতো তখন। এখন প্রকাশকদের কাছে শুনি যে কবিতার বই প্রকাশিত হয় বটে, তবে আগের মতো বিক্রি হয় না। আমি জানি না এর কারণ কী এবং এটা কতদূর সত্য তা-ও আমি যাচাই করে দেখিনি।

একজন প্রকাশক আমাকে বলেছেন, আপনার বই আগের মতো বিক্রি হয় না। তারপরও তিনি আমার বই বেশি প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন, 'আমি যত দিন বেঁচে আছি আপনার বই বিক্রি হোক আর না-ই হোক প্রকাশ করে যাব।' এতে প্রমাণিত হয় না আমার বই বিক্রি হয় কি না। সেটা আমার প্রতি তাঁর ভালোবাসারও প্রকাশ হতে পারে। এ বিষয়ে অন্য কবিদের অভিজ্ঞতা কী আমি জানি না। সে প্রকাশক বলেছিলেন যে নির্মলেন্দু গুণের বই সবচেয়ে বেশি বিক্রি হতো। এখন নাকি তাঁর বইও অতটা বিক্রি হয় না। তবে, বিক্রি হওয়াটা কবিতার ভালো কিংবা মন্দের নির্ণায়ক নয়। এবং আমি মনে করি, এটাও কোনো মাপকাঠি নয়। তবে, এটা ঠিক যে বিক্রির যে একটা জোয়ার এসেছিল স্বাধীনতার পরপর, সেটি এখন থেমে গেছে। এটা হয়তো কবিতার বইয়ের ক্ষেত্রে বেশি সত্য। উপন্যাস অবশ্য হু-হু করে বিক্রি হয়। কারও কারও উপন্যাস, সব উপন্যাস নয়। কারও কারও উপন্যাস—আমি শুনেছি, কাগজে পড়েছি এক সপ্তাহের মধ্যে কয়েক হাজার কপি বিক্রি হয়ে যায়।

এটা হয়তো কোনো কোনো লেখকের ও ঔপন্যাসিকের ক্ষেত্রে সত্য। এটা আমার শোনা কথা, সত্য-মিথ্যা জানি না। এ-ও শুনেছি

ভূমিকা : সাজ্জাদ আরেফিন

যে কয়জন তরুণ কবিতাকর্মীর হাত ধরে বিগত শতকের চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে এ ভূখণ্ডের কবিতা আধুনিকতার পথে যাত্রা শুরু করেছিল শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬) তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। শামসুর রাহমান চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে আরবি-ফারসি কণ্টকিত পাকিস্তানবাদী ও জিন্দাবাদধর্মী বিপুল কবিতা-আবর্জনার স্তূপ অতিক্রম করে বাংলাদেশের কবিতায় এক নতুন প্রাণপ্রবাহের সঞ্চার করেছিলেন। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, ষাটের উত্তাল গণজাগরণ ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ তাঁর কবিতাকে মাটি মানুষ ও স্বদেশলগ্ন করেছে। তিনি পরবর্তীকালে এ দেশের প্রধান কবি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন।

বাংলা একাডেমি ১৯৯৭ সালে অমর একুশে উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে 'সাহিত্য সাধনায় আমার পঁচিশ বছর : স্বাধীনতা-উত্তরকাল' এই শিরোনামে একটি সিরিজ বক্তৃতার আয়োজন করেছিল। ২ থেকে ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৭ দিনব্যাপী ওই বক্তৃতামালায় অংশ নিয়েছিলেন আহমদ রফিক (১৯২৮-), শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬), শওকত আলী (১৯৩৬-), রাজিয়া খান (১৯৩৬-২০১১), আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩৬-২০০৯), সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬) ও আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩)।

বক্তৃতামালার দ্বিতীয় দিনের বক্তা ছিলেন কবি শামসুর রাহমান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন অধ্যাপক আনিসুজ্জামান ও আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন অধ্যাপক খোন্দকার সিরাজুল হক ও ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ। ওই বক্তৃতায় শামসুর রাহমান তাঁর লেখালেখি নিয়ে শুধু স্বাধীনতা-উত্তরকালে সীমাবদ্ধ থাকেননি, বলেছেন স্বাধীনতা-পূর্বকালের কথাও। ক্যাসেটে ধারণকৃত বক্তৃতাটি অনুলিখন করতে গিয়ে আমরা তাঁর কথা বলার ঢংটি অক্ষুণ্ন রাখতে চেষ্টা করেছি।

প্রকাশকেরা লাইন ধরে বসে থাকেন—তাঁর কাছ থেকে যদি একটি বই, পাণ্ডুলিপি আদায় করা যায়। এটাকে আমি নিন্দার্থে বলছি না। এটাও কিন্তু আমার মনে হয় একটি ইতিবাচক দিক। কারণ, সেই লেখকের বই অন্তত আমি বলব যে অনেক বাজে লেখকের বইয়ের পাঠক থেকে এনে অপেক্ষাকৃত ভালো বইয়ের দিকে পাঠকের সংখ্যা বাড়িয়ে দিচ্ছে। এটাকে আমি বলব একটি ইতিবাচক দিক।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে আমাদের ইতিহাসে, জাতীয় ইতিহাসে বেশ কিছু বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটেছে। সেসব কথা বলতে চাই না। কারণ, এগুলো বারবার বলা হচ্ছে। বারবার একটি কথা বললে সে কথার গুরুত্ব আমার মনে হয় অনেকটা কমেও যায়। সে বিপর্যয়ের ফলে, আমরা যে বাঙালি, যে জন্য রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন হয়েছিল এবং সেই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের যে একটি মূল উদ্দেশ্য ছিল ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলন—সেটাকে নাকচ করে দিয়েই এ দেশে ধর্মান্ধতার একটা জোয়ার এল। কেউ কেউ একটু লুকিয়ে, অনেকে একেবারে প্রকাশ্যে সেটা জাহির করতে শুরু করলেন। এটা আমাদের সাহিত্যের ক্ষতি করেছে বলে আমি মনে করি।

আমরা অনেক সময় কী লিখব, কী লিখব না—এটা ভেবে দ্বিধাদ্বন্দ্বে থাকি। অনেক সময় যা লেখা উচিত, আমরা লিখতে পারি না। বিপদ হবে বলে আমরা লিখি না। আমরা আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে জানি, কোনো কথা বললে সেটি ধর্মের বিরুদ্ধে নয়, ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে বললে আমাদের কারও কারও বিরুদ্ধে মুরতাদ আখ্যা দেওয়া হয়। কোনো বই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। কারও কারও বাসায় বোমা নিক্ষেপ করা হয়। এসব কারণে ধরুন আপনি একজন লেখক, আপনি আপনার মনের কথা বলতে চান, আপনার মুক্তবুদ্ধির কথা বলতে চান। আপনার মনে মুক্তবুদ্ধির চেতনা আছে। স্বাভাবিকভাবেই আপনি চাইবেন যে সমাজের আট-দশজন আপনার সেই চেতনার সঙ্গে পরিচিত হোক। তখন আপনি সেটা জানাতে চাইবেন, লিখতে চাইবেন। কিন্তু লিখে, ধরুন আপনি একটি বাসায় বাস করছেন, সে বাসাটি খুব অরক্ষিত। কেননা, লেখকেরা কেউ মন্ত্রীও নন, প্রধানমন্ত্রীও নন, পার্লামেন্টের মেম্বারও নন যে তাদের বাড়ি সংরক্ষিত থাকবে। সাধারণত অধিকাংশ লেখকই মধ্যবিত্ত—নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির। তাঁরা রাস্তায় হাঁটেন—কেউ হয়তো বাজারে যান, কেউ যান না। কেউ বইয়ের দোকানে যান—কেউ হয়তো আড্ডা দেওয়ার জন্য বন্ধুর বাড়িতে যান, পথে তাঁর বিপদ হতে পারে। আর তাঁর বাসায় যদি বোমা ফেলা হয়, তাহলে তিনি হয়তো থাকবেন না কিন্তু তাঁর একটি ছোট ছেলে কিংবা তাঁর পুত্রবধূ কিংবা তাঁর নাতনি থাকতে পারে। তারা হয়তো আহত হতে পারে এবং মারাও যেতে পারে। যারা এ মুক্তবুদ্ধি প্রচারের জন্য আদৌ দায়ী নন। তারা বিনা অপরাধে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এসব আশঙ্কার কথা চিন্তা করেই আমরা লেখকেরা অনেক সময় যা বলা উচিত, যা আমাদের প্রতিবেশী দেশে বলে এবং অন্যান্য উন্নত দেশে বলা হয়, সেসব কথা আমরা বলতে পারি না, লিখতে পারি না। আমি বেশ কিছুদিন আগে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আমার ধর্ম' নামে একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম। তিনি যে ভাষায়, যেভাবে ওই প্রবন্ধটি লিখেছিলেন—এখানে আমরা যদি কেউ লিখতাম—তাহলে আমাদের দেহ থেকে মাথা একেবারেই ছিন্ন হতো। শুধু আমার মাথা নয়, আমার পরিবারও ক্ষতিগ্রস্ত হতো এবং আরও অনেক কিছু ঘটতে পারত। সুতরাং যাকে বলে বাকস্বাধীনতা যদি না থাকে তাহলে একটি সমাজ কখনো এগিয়ে যেতে পারে না। এ দেশের মৌলবাদীদের যে উৎপাত—হাত-পা কেটে নেওয়া, মেরে ফেলার হুমকি ও অধ্যাপকদের নানাভাবে লাঞ্ছিত করা ইত্যাদি অহরহ ঘটছে। এসব উৎপাতের জন্য অনেক লেখক ঠিক কথাটি লিখতে ও বলতে পারেন না। তাঁর মনে একধরনের ভয় থাকে। এ ভয় তাকে, তাঁর লেখক-সত্তাকে ক্ষুণ্ন করে। তিনি মনে মনে অপমানিত বোধ করেন ও নিজেকে ক্ষুদ্র মনে করতে থাকেন। আমরা যদি এর হাত থেকে রেহাই না পাই তাহলে আমাদের অনেক ক্ষতি হবে। অনেক ভালো ভালো লেখক যা লিখতে পারতেন তা লিখবেন না এবং আমরা অনেক ভালো লেখা থেকে বঞ্চিত হব।



আবুল হুসেন



কাজী আবদুল ওদুদ



১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন

আমি আগেই বলেছি, স্বাধীনতার আগে আমার বই বেরিয়েছিল মাত্র কয়েকটি। যেমন ধরুন আমার প্রথম বই *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*—দ্বিতীয় বই *রৌদ্র করোটিতে*। এখানে *রৌদ্র করোটিতে* বলার সঙ্গে সঙ্গে আমার একটি স্মৃতির কথা মনে ঝলক দিয়ে উঠল। এ বইটি যাতে একটি পুরস্কার না পায়, সে জন্যে বেশ কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক একটি পত্রিকায় আমার বিরুদ্ধে এবং কিছু কিছু কবিতার পঙক্তি উদ্ধৃত করে একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন। সেই বিবৃতিতে এমনসব কবির নাম ছিল—যাঁদের অনেকেই প্রথম সারির কবি। এটাই হলো একজন লেখককে ছোট করে রাখার একটি প্রক্রিয়া।

১৯৫৪ সালে আমি একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম—তখনকার একটি সাহিত্য সম্মেলনে। সে সম্মেলনে দুই বাংলার অনেক কবি-সাহিত্যিকই সমবেত হয়েছিলেন। সেই প্রবন্ধ ও আমার বিরুদ্ধে এ দেশের অনেক কবি-সাহিত্যিক মিলে *আজাদ* পত্রিকায় একটি বিবৃতি ও চিঠি দিয়েছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ পরে অবশ্য বেশ প্রগতিশীল হয়েছিলেন। এগুলো ঠিক সাহিত্য আলোচনায় উল্লেখ করা উচিত নয়। কিন্তু উল্লেখ করছি এই জন্যে যে এগুলো আমাদের কারুশিল্প।

আমার *রৌদ্র করোটিতে* তারপর *নিরালোকে দিব্যরথ,* তারপর স্বাধীনতার প্রাক্কালে *নিজ বাসভূমে*—এই কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়। কিন্তু তারপর আমার বইয়ের সংখ্যা, কবিতার বইয়ের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে সম্ভবত। এর সবগুলোই পঁচিশ বছরে লেখা হয়েছে। আমি বলব না যে আমার এমন কোনো ভ্রম আমার নিজের সম্পর্কে নেই। এটা বিনয় নয় যে, আমি যা লিখেছি—মহাকাব্য লিখেছি—এমন লিখেছি যে কেউ আর লিখবে না, লিখতে পারবে না। কিংবা আমি এমন কিছু হইনি যে আমাকে কেউ অতিক্রম করতে পারবে না।

এখানে অনেকেই আমাকে প্রধান কবি বলে উল্লেখ করে থাকেন। কেউ কেউ অবশ্য আবার এটা নিয়ে বলেন যে তাঁকে প্রধান কবি বলা উচিত নয় ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলো ঠিকই, আমি দুটোকেই মান্য করি। প্রথমটিকে মান্য করেও আমি বলব যে, আমি যে কবি তা আমি মৃত্যুশয্যায়ও জেনে যাব না—আমি সত্যিকারের কবি ছিলাম কি ছিলাম না। এটা দেখা গেছে—যাকে নিয়ে একসময় খুব হইচই করা হয়—তিনি পরে এতই গৌণ হয়ে যান যে তাকে পরবর্তীকালের পাঠকেরা আর স্মরণে রাখেন না। আবার যিনি তাঁর সমকালে এতই উপেক্ষিত থাকেন যে পরবর্তীকালে তাঁকে নিয়ে সবাই আবার নাচানাচি শুরু করেন। অবশ্য, আজকের যুগে আর সেটি হওয়ার জো নেই। কারণ, আজকের যুগ ইলেকট্রনিক মিডিয়ার যুগ।

দুটি পত্রিকার কথা বলব। *সোনার বাংলা* বলে একটি পত্রিকা ছিল, যার সম্পাদক ছিলেন নলিনী কিশোর গুহ এবং আরেকটি পত্রিকা *যুগের দাবী*—তাঁর সম্পাদক ছিলেন মরহুম খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস। *যুগের দাবী* আপনাদের জ্ঞাতার্থে বলি, সেটি একটি যৌন পত্রিকা ছিল। কিন্তু আমি বলব যে তিনি, খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস আমাদের ওখানে ঠাঁই দিয়েছিলেন। তিনি আমাদের লেখা চেয়ে নিয়ে ছাপতেন। আমি বলব, যেখানে কোনো কাগজই নেই, সেখানে যৌন পত্রিকাই হোক এবং অতটা ভালো পত্রিকা না-ই হোক, কিন্তু এই যে আমন্ত্রণ নতুন লেখকদের, এটি আমি মনে করি একজন প্রাগ্রসর ব্যক্তির ধারণা এবং অনুভূতি এবং তিনি যে পরে একজন সত্যিকারের প্রগতিশীল ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তার প্রমাণ আপনারা অনেকেই জানেন। শেষ জীবনে কী এক ঘটনায় তিনি আর বাসা থেকে বের হতেন না। তারপর শেষ দিকে তিনি অন্য রকম মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন। সে সময় তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। তিনি বামপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তখনকার দিনে যৌন পত্রিকা বের করাও কিন্তু কম সাহসের কথা নয়। এটা আমার মনে হয় একটি প্রগতিশীল উদ্যোগ। সে যা-ই হোক, আমাদের সময় তো সেই ছিল। আর কিছু ছিল না। কিন্তু এখন তো অজস্র পত্রিকা। অজস্র পত্রিকা এবং চমৎকার সব পত্রিকা। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

আমার এক শিল্পী বন্ধু ছিলেন। তিনি হলেন শহীদ মিনারের নির্মাতা শিল্পী হামিদুর রাহমান। তিনি আমার লেখা ছাপার ব্যাপারে আমাকে খুব অনুপ্রাণিত করেছিলেন। আমি কবিতা লিখছিলাম আর তিনি বললেন, তুমি ছাপতে দাও না কেন এটা? আমি বললাম যে আমার লেখা কে ছাপবে? ছাপবে না কেন? তুমি দিয়েই দেখো না? তারপর তারই প্ররোচনায় বলব কি না জানি না, তারই প্রেরণায় আমি কবিতা নিয়ে *সোনার বাংলা* অফিসে যাই। *সোনার বাংলায়* আমার প্রথম কবিতা ছাপা হয় উনিশ শ উনপঞ্চাশ সালের পয়লা জানুয়ারি। কবিতাটির নাম 'উনিশ শ উনপঞ্চাশ' ছিল বলেই বোধ হয় সেটি পয়লা জানুয়ারি উনিশ শ উনপঞ্চাশে ছাপা হয়েছিল। কবিতাটি আমার কোনো বইতে নেই এবং আমি ওটাকে এখন আর গ্রাহ্যই করি না। আমার স্মরণেও নেই। সচরাচর নববর্ষ নিয়ে যে রকম লেখা হয়, ওরকম কবিতা ছিল না সেটি। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে তুমি রেডিওতে যাও না কেন? প্রোগ্রাম করো না কেন? আমি বলেছিলাম, আমি যাব কেন? যদি প্রয়োজন হয় তারা আমাকে ডাকবে। আমি মনে করি যে একজন শিল্পী, একজন লেখকের সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো তাঁর 'অহংকার'। অহংকার আত্মমর্যাদাসম্পন্ন লোকেরই থাকে এবং এ অহংকার ভালো অর্থে অহংকার—খারাপ অর্থে না। অহংকার দু ধরনের। একটি ভালো অর্থে, একটি খারাপ অর্থে। আমি বললাম যে আমাকে না ডাকলে, জীবনেও যদি না ডাকে,



প্রথম বই *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*

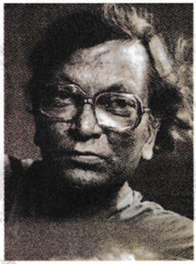


দ্বিতীয় বই *রৌদ্র করোটিতে*

আমি কখনো যেচে গিয়ে বলব না আমাকে একটা প্রোগ্রাম দিন। আমি একটি কবিতা পড়তে চাই।

বেশ কিছুদিন পর রেডিও থেকে এক ভদ্রলোক এলেন। তাঁর নাম বোধ হয় মেজবাহউদ্দিন। তিনি এসে আমাকে একটা কন্টাক্ট পেপার দিলেন। একটি প্রোগ্রামে কবিতা পড়তে হবে। সেই প্রোগ্রামের প্রোডিউসার ছিলেন কবি আবুল হোসেন। তাঁকে আমি প্রোগ্রামে পড়ার জন্য নিয়ে আসা কবিতাটা দিলাম। এটি ছিল *নতুন কবিতায়* প্রকাশিত কবিতা। তিনি কবিতাটি পড়লেন এবং রেখে দিয়ে বললেন যে এটি বোধ হয় *নতুন কবিতায়* প্রকাশিত কবিতা থেকে একটি কবিতা। নতুন কোনো কবিতা নেই? আমি বলি, চেষ্টা করে দেখতে পারি। যদি লেখা হয় তো দেব।

আমার শিক্ষক—তিনি অবশ্য এখন জীবিত নেই, তার নাম ড. অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের ইংরেজি অনার্স ক্লাসে রোমান্টিক কবিতা পড়াতেন। শেলি, বায়রন, ওয়ার্ডসওর্থ এগুলো পড়াতেন। একদিন তিনি আমাকে তাঁর বাসায় নিয়ে যাচ্ছিলেন। যাওয়ার পথে ফুলবাড়িয়া স্টেশন। রেললাইনে কয়েকটি পরিত্যক্ত ওয়াগন ছিল। ওয়াগনে কিছু অবাঙালি উদ্বাস্তু থাকতেন। তারা খুব গরিব। অত্যন্ত গরিব না হলে ওই ওয়াগনে ওই গরমে কেউ থাকতে পারে না। তাঁরা থাকতেন। আমাকে তিনি বললেন যে, এই এদের নিয়ে একটি কবিতা লেখো না? উনি বললেন, আমিও লিখব, তুমিও লেখো। তারপর লেখা হলো। আমার কবিতাটির নাম ছিল 'কয়েকটি দিন ওয়াগনে'। তিনিও একটি কবিতা লিখলেন। তাঁর বাসা তো আমার জন্য অবারিত ছিল। তাঁর একটা খুব চমৎকার লাইব্রেরি ছিল। তিনি বলতেন, তুমি এখানে এসে যেকোনো বই নিয়ে পড়তে পারো। বাসায় নিয়ে যেতে পারো এবং এখানে তুমি আহার করতে পারো। যখন ইচ্ছে তুমি আসতে পারো। তারই বাসায় একটা ছোটখাটো আড্ডা হতো সাহিত্যের আসরের মতোই। সেখানে কবি ও সাংবাদিক সৈয়দ নূরুদ্দিনও উপস্থিত ছিলেন। সৈয়দ নূরুদ্দিন তখন একটি পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা করছিলেন। তিনি খুব নাকউঁচু লোক ছিলেন। তিনি ছিলেন খুবই তীক্ষ্ণ রুচির মানুষ। খুব পড়াশোনা করতেন এবং খুবই বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর পত্রিকা নিশ্চয়ই খুব উঁচু মানের হবে। ওখানে কবিতা পড়া হলো এবং আমার শিক্ষক নূরুদ্দিন ভাইকে বললেন যে আপনি ওর কবিতাটি



হামিদুর রাহমান

ছাপুন। কারণ ওর কবিতাটি আমার চেয়ে অ-নে-ক বেশি ভালো হয়েছে। এটি আমাদের দেশে সচরাচর ঘটে না। এই যে একজন শিক্ষক যিনি আমার চেয়ে বয়সে বড়, অনেক বড়, জ্ঞানে আমার চেয়ে অনেক বড় এবং আমি তো তার ছাত্রমাত্র এবং তিনি যে উদারতার পরিচয় দিয়েছেন, এটি আমার মনে হয় খুবই বিরল। এটি যদি আমাদের অনেকের মধ্যে থাকত তাহলে আমরা অনেক কূপমণ্ডূকতার হাত থেকে রেহাই পেতাম।

নূরুদ্দিন ভাই তার পার্স থেকে পঁচিশটি টাকা খুলে আমাকে দিলেন। আমি লেখার জন্য প্রথম পাঁচ টাকা পাই। তা-ও বেশ জোরাজুরি করে। *দিলরুবা* বলে একটি পত্রিকা ছিল। তাতে আমার কবিতাটি ছাপা হয়েছিল। আমি একদিন সকালে *দিলরুবার* সম্পাদকের বাসায় গেলাম। তিনি তখন উচ্চস্বরে কোরআন শরিফ পাঠ করছেন। কোরআন শরিফ পাঠের পর আমি বললাম যে, ওনাকে খবর দিন আমি এসেছি। খবর পেয়ে তিনি এসে বললেন, কী চান? আমি বললাম যে আমি আমার লেখার টাকা নিতে এসেছি। লেখার জন্য টাকা? এটা শুনে তিনি খুব বিস্মিত এবং যেন একটু ক্রুদ্ধও হলেন। আমি বললাম যে হ্যাঁ টাকা তো দিতে হবে। আমি এটাও বললাম, আমি যদিও তখন খুব বেশি কথা বলতে পারতাম না, তোতলাতাম এবং খুবই ইতস্তত করতাম কী বলতে কী বলে ফেলব, ভয় থাকত সব সময়। তবুও কে যেন আমার ভিতর থেকে বলে দিল যে আপনি পত্রিকা বের করছেন, কাগজ কিনছেন, কাগজ ছাপাচ্ছেন, সেটা বাজারে বিক্রি হচ্ছে, টাকা খরচ করছেন, আমি লিখছি—আমার লেখা নিয়ে বই বেরুচ্ছে, আমাকে টাকা দেবেন না? তো তিনি বোধ হয় আমার যুক্তিতে একটু টললেন। বললেন, পাঁচ টাকার বেশি দেব না। আমি বললাম ঠিক আছে, আমি তা-ই নিব। সে যা-ই হোক, পাঁচ টাকা নিয়ে আমি বাসায় ফিরলাম। এটা আমি শিখেছি বুদ্ধদেব বসুর কাছ থেকে। আমি তো কোনো চ্যারিটেবল ডিসপেনসারি খুলে বসিনি। আমাকে শ্রম দিতে হচ্ছে। আমাকে কষ্ট করে লিখতে হচ্ছে। আমাকে কাগজ কিনতে হচ্ছে। একটা কলম কিনতে হচ্ছে। যদি ফাউন্টেন পেন না থাকে দোয়াত-কলম কিনতে হচ্ছে, তা আমাকে খরচ তো কিছু করতে হচ্ছে। তার বিনিময়ে আমি সম্মানী পাব না কেন? সে যা-ই হোক, নূরুদ্দিন ভাই আমাকে পঁচিশটি টাকা দিলেন। সেই সময়ের জন্য কিন্তু পঁচিশটি টাকা অনেক টাকা। এবং আমি খুব বিস্মিত হলাম, চমকিত হলাম। সেই পত্রিকাটি শেষ পর্যন্ত হয়তো নূরুদ্দিন ভাইয়ের খুঁতখুঁতানির জন্যে বের হয়নি। পরে আমি তাঁর অনুমতি নিয়ে কবিতাটি কলকাতার *নতুন সাহিত্য পত্রিকায়* পাঠিয়ে দিলাম। *নতুন সাহিত্য পত্রিকা* তখন কলকাতায় একটি অত্যন্ত নামজাদা পত্রিকায়। এটির সম্পাদক ছিলেন অনিলকুমার সিংহ। তাঁর সম্পাদনায় কবিতাটি ছাপা হয়েছিল। আমি সে কবিতাটিও কোনো গ্রন্থে সংকলিত করিনি। সে যা-ই হোক, রেডিওতে প্রোগ্রাম করলাম। পরবর্তীকালে আমি টিভিতেও প্রোগ্রাম করেছি। কখনো কখনো করিনি। এখনো করছি।

যত দিন বেঁচে আছি, যদি আমার লেখার কদর থাকে তত দিন, হয়তো পত্রিকাওয়ালারা আমার লেখা ছাপবেন, রেডিও ডাকবেন এবং টেলিভিশনওয়ালারাও আমাকে ডাকবেন। আর যদি না-ও ডাকেন আমার কোনো খেদ নেই। কারণ, আমি প্রথমত নিজের আনন্দের জন্যে লিখি, আমার মধ্যে কিছু কথা জাগরিত হয়, আমি সেই কথাগুলো না লেখা পর্যন্ত স্বস্তি পাই না—যেমন মা তার গর্ভে ধারণ করা শিশুকে জন্ম না দেওয়া পর্যন্ত স্বস্তি পান না, একজন লেখকও তাঁর ভাবনাকে প্রকাশ না করা পর্যন্ত স্বস্তি পান না।

সুতরাং, আমি লিখব যত দিন না কবিতা আমাকে ত্যাগ করে যায়। আমি কী কবি, গৌণ কি মুখ্য, আদৌ কবি কি না; এ নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। সবশেষে একটি কথা বলব, আমি আমাদের এই দেশে অনেক মানুষের ভালোবাসা পেয়েছি। আমি তাঁদের সবার কাছে ঋণী। ❦

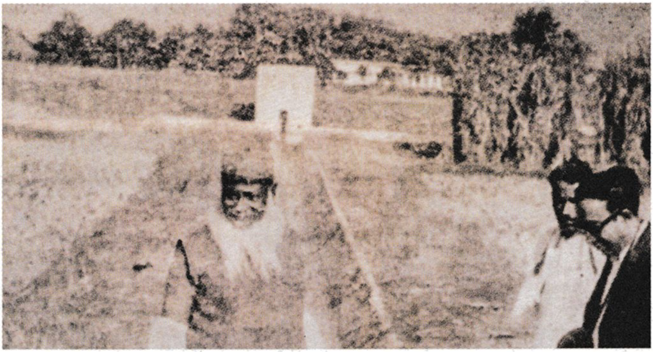


মাওলানা ভাসানী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান; প্রতিকৃতি : শিশির ভট্টাচার্য্য

ফজলে লোহানী

অগ্নিগর্ভ সময়ের সংলাপ

ভাসানী ও বঙ্গবন্ধুর মুখোমুখি



মহীপুরের প্রান্তরে মওলানা ভাসানীর সঙ্গে ফজলে লোহানী

মহীপুরের প্রান্তর

আগামী ১৯ জানুয়ারি ১৯৭০ কৃষক সমিতির আহ্বানে স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনীর যে সম্মেলন শহীদ আসাদ নগরে (সন্তোষ, টাঙ্গাইল) ডাকা হয়েছে, সেখান থেকেই ঘোষণা করা হবে এক নতুন যুগান্তকারী কর্মসূচির কথা, ছিয়াশি বছরের বৃদ্ধ জননেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মধারার একটি দিক এভাবেই প্রকাশ করলেন।

সন্তোষে তাঁর গ্রামের বাড়িতে মাওলানা ভাসানী কয়েকজন সাংবাদিকের সামনে অভিমত প্রকাশ করেন যে, দেশ এখন এক সর্বাত্মক সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সম্মুখীন। পাকিস্তানের উভয় অংশে এই বিপ্লবের ঢেউ জনজীবনকে স্পর্শ করবে। মাওলানা ভাসানী এই বিপ্লবের নামকরণ করেছেন, ইসলামিক কালচারাল রেভল্যুশন বা ইসলামি সাংস্কৃতিক বিপ্লব।

মাওলানা ভাসানী দ্বিধাহীনভাবে বিশ্বাস করেন যে সমাজতন্ত্র বা সোশ্যালিজম মানবকল্যাণকর।

সমাজবাদ ছাড়া এ দেশের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল অসম্ভব, মাওলানা বলেন। আজকাল আমরা যে উন্নয়নের কথা পাকিস্তানে বলছি সে উন্নয়নের ফলাফল সর্বস্তরের মানুষের কাছে কি পৌঁছেছে। দেশের মুষ্টিমেয় বিত্তশালী পুঁজিপতি, শিল্পপতিরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর অবাধ মুনাফা অর্জনের সুযোগ পেয়েছিলেন। শুধু এদেরই আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে আশাতীত রকমে। এ কথা সর্বজনগ্রাহ্য।

গত বছরের (১৯৬৯) প্রথমদিকে একটি বিদেশি পত্রিকায় খবর বের হয়েছিল, কারা পাকিস্তানে পুঁজি একচেটিয়াভাবে নিয়ন্ত্রণ করছেন তাদের সম্পর্কে। পত্রিকাটিতে বলা হয়েছিল যে দেশের শতকরা আশি ভাগ ব্যাংকিং নিয়ন্ত্রণ করে বাইশটি পরিবার। এদের হাতেই রয়েছে দেশের শতকরা ৯৫ ভাগ বিমা ব্যবসা। এদের হাতে যত দিন দেশের অর্থনীতির কলকাঠি থাকবে, তত দিন বৃহত্তর জনসমাজে উন্নয়নের ছোঁয়া লাগবে না, মাওলানা মন্তব্য করেন। মাওলানা ভাসানী পুরোপুরিভাবে ইসলামের ন্যায়নীতি আর সাম্য-মৈত্রীতে বিশ্বাসী। তাঁর কাছে সমাজবাদ ও ইসলাম দুটো বিরোধী মত নয়। তিনি বলেন, পাকিস্তানে ইসলামকে বাদ দিয়ে সমাজবাদ আনা যাবে না। সে জন্য তিনি ইসলামিক কালচারাল বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা

সংগ্রহ ও ভূমিকা : পিয়াস মজিদ

ফজলে লোহানী (১৯২৮-৮৫) ১৯৫০-এর দশকের একজন বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক। তাঁর পিতা আবু লোহানী কলকাতার ইংরেজি সাপ্তাহিক *দ্য মুসলমান*-এর সহকারী সম্পাদক ছিলেন। ফজলে লোহানী ও তাঁর বন্ধুবর্গের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে গত শতকের পঞ্চাশের দশকে প্রকাশিত *অগত্যা* পত্রিকা ব্যঙ্গবিদ্রূপের আদলে পাকিস্তানি রক্ষণশীলতার মূলে আঘাত করেছিল। তিনি ছিলেন *দৈনিক সংবাদ*-এর প্রতিষ্ঠাতা সহকারী সম্পাদক। *সংবাদ* কর্তৃপক্ষ ভাষা আন্দোলনের অনুকূলে প্রতিবেদন প্রকাশ করতে না দেওয়ায় প্রতিবাদে তিনি সেখান থেকে ইস্তফা দেন। পরবর্তীকালে নিয়মিত-অনিয়মিত সাংবাদিকতা করেছেন *দৈনিক আজাদ*, *পাকিস্তান অবজারভার*, *দৈনিক পাকিস্তান*, *পাকিস্তান টুডে* প্রভৃতি পত্রিকায়। বিভিন্ন খবরের কাগজে নিয়মিত সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় লিখতেন। একজন সৃজনশীল লেখক ও সাংবাদিক যখন জননন্দিত রাজনৈতিক নেতার মুখোমুখি হন তখন তা প্রশ্নোত্তরভিত্তিক প্রথাগত সাক্ষাৎকারে সীমাবদ্ধ না থেকে রূপান্তরিত হয় সৃজনশীল রচনায়। ফজলে লোহানী গৃহীত মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই দুটো সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছে।

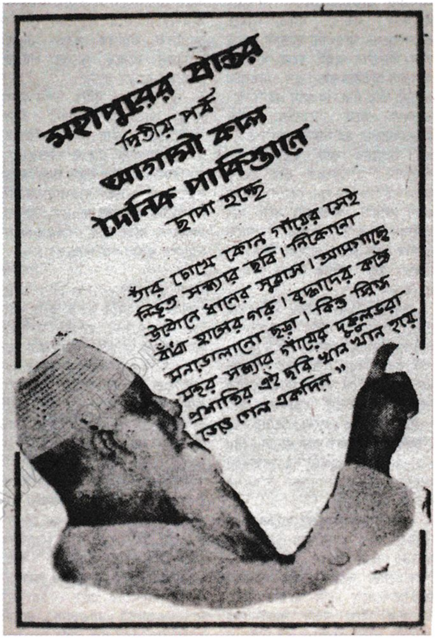
১৯৬৯-এর মার্চে গণ-অভ্যুত্থানের প্রচণ্ডতায় পাকিস্তানে আইয়ুব সরকারের পতন ঘটে এবং এরপর জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সামরিক সরকার দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয়। এর কিছুদিন পর নতুন বছরের শুরুতে অর্থাৎ

উপলব্ধি করেছেন।

মাওলানার কাছে সমাজবাদ হচ্ছে দেশের অর্থনৈতিক মুক্তির উপায়। সকল স্তরের মানুষের সামনে অর্থনৈতিক উন্নতির সমান সুযোগের দ্বার খুলে দেবে সমাজবাদ। দেশের সম্পদ সমাজবাদের মাধ্যমে সবার কল্যাণের জন্য নিয়োজিত হবে এবং এ সম্পদের ফল ভোগ করতে পারবেন সবাই প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী। মাওলানা ভাসানী বলেন, সমাজবাদ রাশিয়ার নয়, চীনের নয়। সমাজবাদ কোনো দেশের একচেটিয়া মতবাদ নয়। মাওলানা ভাসানী মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন সমাজবাদ নিরীশ্বরবাদ নয়। ইসলামের অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে সমাজবাদের কোনো বিরোধ থাকতে পারে না।

স্পষ্ট বোঝা যায়, প্রবীণ মাওলানা এক নতুন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা চিন্তা করছেন। তাঁর নতুন রাজনৈতিক চেতনাবোধের দ্বারা তিনি ইসলাম ও সমাজবাদের সমন্বয় সাধনের একটা কার্যকর রূপ হিসেবে কালচারাল রেভল্যুশনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছেন। এই নতুন রাজনৈতিক চেতনা মাওলানা ভাসানীর কর্মসাধনার এক নয়া দিকনির্দেশন। ব্রিটেনের পরলোকগত ধর্মযাজক রেডডিন অব ক্যান্টারবারি ড. হিউলেট জনসন একবার সমাজবাদী দেশ ভ্রমণ করে এসে বলেছিলেন, খ্রিষ্টান ধর্ম যদি কোথাও সত্যিকারভাবে পালিত হয় সে শুধু সমাজবাদী দেশগুলোতেই হচ্ছে। আমি তার মুখে লন্ডনে শুনেছি তিনি সমাজবাদের কল্যাণময়ী রূপে স্থির বিশ্বাসী ছিলেন। ড. হিউলেট জনসন ধর্ম ও সমাজবাদে কোনো ব্যবধান পাননি। এই মতেরেই অনুসারী মাওলানা ভাসানী।

কয়েক দিন আগে আমি মাওলানা ভাসানীর মহীপুর মিশনে গিয়েছিলাম। সেখানেও তিনি এই নতুন সমাজদর্শনের কথার উল্লেখ করেছিলেন। ষাট একর জমির ওপর পরিকল্পিত এই বিরাট শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক মিশনের চারদিক তিনি পায়ে হেঁটে ঘুরে আমাদের দেখাচ্ছিলেন। ছাত্রদের নির্মীয়মাণ হোস্টেল, ফজলুল হক হাসপাতাল, চিত্তরঞ্জন একাডেমি এই মিশনের অন্তর্গত। ইতিমধ্যেই মিশনের আল্লামা ইকবাল কলেজে পড়াশোনা শুরু হয়ে গেছে। শ তিনেক ছাত্র গত সেশন থেকে কলেজের আর্টস ও কমার্স বিভাগে শিক্ষা শুরু করে দিয়েছেন। কলেজে এখন ৯ জন শিক্ষক অধ্যাপনার দায়িত্ব নিয়েছেন। মহীপুরের এই



দৈনিক পাকিস্তান-এ ভাসানীর সাক্ষাৎকারের বিজ্ঞাপন

১৯৭০-এর ১ জানুয়ারি থেকে আবুল কালাম শামসুদ্দীন সম্পাদিত *দৈনিক পাকিস্তান* (স্বাধীনতার পর পরিবর্তিত নাম *দৈনিক বাংলা*) 'জাতীয় নেতাদের সাথে সাক্ষাৎকার : আত্মা দিয়ে দেখা' শিরোনামে ফজলে লোহানী গৃহীত সিরিজ সাক্ষাৎকার প্রকাশ শুরু করে।

'মহীপুরের প্রান্তর' শীর্ষক প্রথম সাক্ষাৎকারটি ছিল মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর (১৮৮০-১৯৭৬)। তৎকালীন বৃহত্তর বগুড়ার (বর্তমান জয়পুরহাট জেলা) মহীপুরে ভাসানী প্রতিষ্ঠিত হককুল এবাদ মিশনে গিয়ে এই অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকারটি ধারণ করা হয়। ধারাবাহিক এই সাক্ষাৎকার ১, ৩ ও ৫ জানুয়ারি ১৯৭০ সংখ্যা *দৈনিক পাকিস্তান*-এ প্রকাশিত হয়। এতে মাওলানা ভাসানীর জীবনদর্শন, রাজনৈতিক মতামত এবং সাম্যবাদী সমাজের স্বপ্ন বিধৃত হয়েছে। একই সঙ্গে ১৯৭০-এর নির্বাচন প্রসঙ্গে তাঁর ভাবনাও ফুটে উঠেছে। ভাসানীকে বুঝতে আলাপনধর্মী এই সাক্ষাৎকারটি গুরুত্বপূর্ণ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫)-এর ঘটনাবহুল রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাসে যে কয়টি সাক্ষাৎকার পাওয়া যায় তার মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ১৯৭২ সালে ব্রিটিশ সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টের নেওয়া সাক্ষাৎকারটি। ইতালির সাংবাদিক ওরিয়ানা ফাল্লাচি বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর একটি সাক্ষাৎকার নেন, যা তাঁর বই *ইন্টারভিউ উইথ হিস্ট্রি*র (১৯৭৬) অন্তর্ভুক্ত। *দৈনিক পাকিস্তান*-এ ১৯৭০ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিজুড়ে কয়েক সংখ্যায় পাওয়া গেল বিশিষ্ট সাংবাদিক, লেখক ও অনুবাদক ফজলে লোহানীর সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অন্তরঙ্গ আলাপচারিতার একটি সুদীর্ঘ ভাষ্য। 'এই দেশেতে জন্ম আমার' শীর্ষক বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎকারটির গুরুত্ব

প্রান্তরে দাঁড়িয়ে মাওলানা ভাসানী বললেন এখানে গড়ে উঠেছে আমার স্বপ্ন। আমি বেঁচে থাকতে এর বাস্তব রূপ দেখে যাব, এ আমার আকাঙ্ক্ষা।

মহীপুরের মিশনের নাম 'হককুল এবাদ মিশন'। জিজ্ঞেস করলাম, এর অর্থ কী? মাওলানা বললেন, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার মিশন। সাধারণ মানুষকে গভীর মমতা নিয়ে ভালোবাসেন মাওলানা ভাসানী। তাই তাঁর জীবনের স্বপ্নই হচ্ছে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার বাস্তব রূপ। মাওলানা ভাসানী তাঁর স্ত্রীর সব জমি এই মিশনে ওয়াকফ করে দিয়েছেন। এবং জনসাধারণের স্বল্প সাহায্যে গড়ে উঠছে এই মিশনের কাজ ধীরে ধীরে। পুঁজিপতি-শিল্পপতিদের কাছ থেকে আমি এই মিশনের জন্য কোনো সাহায্য গ্রহণ করিনি, মাওলানা বলে যান সাধারণ কৃষক শ্রমিক ছাত্ররা আমাকে তাদের শক্তি দিয়ে, সামর্থ্য দিয়ে এই মিশন গড়ে তোলার কাজে সাহায্য করেছেন।

সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনের অভিজ্ঞতার ছাপ রয়েছে প্রবীণ মাওলানার বলিরেখাঙ্কিত মুখমণ্ডলে। একটি জিনিস লক্ষ করার বিষয়। তিনি এই মিশনের এবং সন্তোষে যে কলেজ ও ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন, কোথাও কোনো প্রতিষ্ঠার সঙ্গে নিজের নাম সংযোগ করে দেননি। তাঁর গড়া সবগুলো প্রতিষ্ঠানের নামকরণ হয়েছে অন্যান্য দেশবরেণ্য নেতাদের নামেই।

সুদূরবিস্তৃত মহীপুরের মাঠের দিকে তাকিয়ে তিনি আবার তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের কথা বলেন। চীনে তিনি গিয়েছিলেন কয়েক বছর আগে। তারপর থেকে তিনি আত্মজিজ্ঞাসার হাতিয়ার দিয়ে নতুন রাজনৈতিক আদর্শের সংজ্ঞা খুঁজেছেন এই দীর্ঘকাল ধরে; পাকিস্তানের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের কাজে যে রাজনৈতিক আদর্শ ব্যবহার করা যেতে পারে। তাঁর মতে, ইসলাম ও সমাজবাদের সংমিশ্রণেই এই আদর্শের উদ্ভব হবে।

তিনি চীনের চেয়ারম্যান মাও সে তুং-এর সাথে সাক্ষাৎকারের কাহিনি বলেন। তিনি বলেন, দেশে ফেরার আগে চেয়ারম্যান মাও-এর কাছে এই ভবিষ্যদ্বাণী করে এসেছেন যে সব জাগতিক উন্নতির পরও মানুষের প্রয়োজন রয়েছে প্রাণের শান্তির। প্রয়োজন রয়েছে ধর্মের।

সুদীর্ঘকালের ধর্মীয় দর্শন মানস নিয়ে মাওলানা ভাসানী জীবন কাটিয়েছেন। তাঁর কাছে সত্যিকার ইসলামের বাণী প্রাণের শান্তির জন্য অপরিহার্য যে হবে তাতে আর আশ্চর্য হওয়ার কী আছে? মাওলানা ভাসানী ইসলামের পূর্ণ এবং অবিকৃত নিরাভরণ বিকাশের মাঝে তাই পাকিস্তানের সব মানুষের মুক্তির পথ খুঁজেছেন।

মাওলানা ভাসানীর নির্দেশিত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে কর্মীরা দেশবাসীর সামনে দৃষ্টান্ত তুলে ধরার চেষ্টা করবেন দেশে ত্রুটিহীন সমাজব্যবস্থা কী করে কায়েম করা সম্ভব হবে। সবার প্রতি আহ্বান জানানো হবে বিলাসিতা বর্জন করার। পোশাক-পরিচ্ছদে, আচার-ব্যবহারে, খাদ্য গ্রহণে বিলাসিতা থাকবে না। সরল-সহজ জীবনযাপনের জন্য সবাইকে উৎসাহিত করা হবে। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী মাদকদ্রব্য বিক্রয়ের স্থানগুলোতে, জুয়োর আড্ডায় এবং জন-অমঙ্গল কাজ যেসব জায়গায় সংঘটিত হয় সেখানে পিকেটিং শুরু করে দেবে। বিলাসদ্রব্য ব্যবহার বর্জন করতে হবে। চোরাকারবারি, ঘুষখোর ও সমাজের দুর্নীতিপরায়ণদের প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। এভাবেই মাওলানা ভাসানী কালচারাল বিপ্লব শুরু করার কথা চিন্তা করছেন।

দেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে মাওলানা ভাসানীকে কয়েকটি প্রশ্ন করা হলো। এর আগেই মাওলানা ঘোষণা করেছিলেন যে কৃষক ও শ্রমিকদের জন্য আসন্ন নির্বাচনে সংরক্ষিত আসন রাখার প্রয়োজন রয়েছে।

কৃষক ও শ্রমিকদের জন্য সংরক্ষিত আসনের কথা কেন তিনি তুলেছেন, এই প্রশ্নের জবাবে মাওলানা বলেন যে আসন সংরক্ষিত না রাখলে দেশের যাঁরা কুটিরশিল্পী, জেলে, কৃষক, শ্রমিক, মাঝি, তাঁতি, ছোট দোকানদার ও জনমজুর তাদের নিজেদের প্রতিনিধি কখনো নির্বাচিত হয়ে দেশের আইনসভায় এদের দাবি-দাওয়ার কথা বলতে পারবেন না।

এই প্রসঙ্গেই মাওলানা বলেন, আমাদের দেশে যে অবস্থা চালু রয়েছে তাতে শুধু বিত্তবান ও তাদের অনুসারী কতকগুলো মুষ্টিমেয় লোক প্রভূত অর্থ ব্যয় করে নির্বাচন দ্বন্দ্বে নামার সুযোগ পান। মাওলানা বলেন, 'আগামী নির্বাচনে ১০০ কোটি টাকার মতো খরচ হয়ে যাবে নানাভাবে। বিত্তহীন ও স্বল্পবিত্তের লোকের পক্ষে এই দ্বন্দ্বে নামার সুযোগ খুবই সীমিত। কারণ টাকা ছাড়া নির্বাচন হয় না এখানে।'

আরেকটি প্রশ্ন করা হলো তাঁকে, নির্বাচন ও ভবিষ্যৎ গঠনতন্ত্রের কাঠামো, যেমন পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট ভেঙে দেওয়া, জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসনসংখ্যা নির্ধারণ, সব প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ইত্যাদি ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ঘোষণা সম্পর্কে মাওলানার মন্তব্য কী?

এ প্রশ্নের জবাবে মাওলানা ভাসানী বলেন যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ঘোষণা অত্যন্ত সময়োচিত হয়েছে। কিন্তু ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী পূর্ণাঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি, বিত্তহীন শ্রেণির জন্য রুটিরুজি, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষার পূর্ণস্বীকৃতির মতো

অনুধাবন করে *দৈনিক পাকিস্তান* ১৯৭০ সালের ১১, ১২, ১৩, ১৪ ও ১৮ জানুয়ারি মোট পাঁচ দিন এর বিজ্ঞাপন-ভাষ্য প্রকাশ করে।

১১ জানুয়ারি ১৯৭০ *দৈনিক পাকিস্তান*-এর বার্তা সম্পাদক বরাতে বলা হয়—

'এই দেশেতে জন্ম আমার' এই পর্যায়ে পূর্ব বাংলার অগ্নিপুরুষ শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে ফজলে লোহানীর সাক্ষাৎকারের বিবরণ দৈনিক পাকিস্তানে আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই প্রকাশিত হচ্ছে। এখানে প্রকাশ করা হলো তারই উপক্রমণিকা।—বার্তা সম্পাদক, *দৈনিক পাকিস্তান।*

১৯৬৯-এর ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বন্দী শেখ মুজিবকে গণ-আন্দোলনের মুখে পাকিস্তান সরকার মুক্তি দিতে বাধ্য হয় এবং এর পরদিন ২৩ ফেব্রুয়ারি তাঁকে ছাত্রজনতার পক্ষ থেকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এ বছরেরই ৫ ডিসেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর স্মরণসভায় বঙ্গবন্ধু বলেন, '...জনগণের পক্ষ হইতে আমি ঘোষণা করিতেছি আজ হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম "পূর্ব পাকিস্তান"-এর পরিবর্তে শুধুমাত্র "বাংলাদেশ"।' ১৯৭০-এর ৬ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু পুনরায় আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। এই পটভূমিতে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধুর ভাষ্যে যেমন তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি ফুটে উঠেছে, তেমনি তাঁর জীবনের নানা অজানা অধ্যায়ও উন্মোচিত হয়েছে গল্পের ঢঙে। একই সঙ্গে বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্ব প্রেক্ষাপটও বর্ণিত হয়েছে তাঁর জবানিতে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রতি তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধার কথা উচ্চারিত হয়েছে বারবার। সাক্ষাৎকারের বিভিন্ন পর্বে আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ দলের রাজনৈতিক দর্শন এবং

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর উল্লেখ প্রেসিডেন্টের ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত ছিল।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান প্রদেশের জন্য ম্যাকসিমাম অটোনমির কথা উল্লেখ করেছেন, সে সম্পর্কে মাওলানা ভাসানী বলেন, 'এই ম্যাকসিমামের সংজ্ঞাটি পুরোপুরি কী হবে, তা এখনই পরিষ্কার করে বলে দেওয়া উচিত।'

'এখনো সময় আছে। আশা করি আগামী নির্বাচনের আগেই জনাব প্রেসিডেন্ট সাহেব এ ব্যাপারে তাঁর মত ব্যক্ত করবেন।'

আগামী নির্বাচন সম্পর্কে আপনার মতামত কী? এ প্রশ্নের জবাবে মাওলানা ভাসানী বলেন, 'আমি একাধিকবার ঘোষণা করেছি যে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কাউন্সিল সভা এই সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। তবে আমার ব্যক্তিগত মত হলো, লাহোর প্রস্তাবানুযায়ী প্রদেশগুলোর পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবি এবং গরিব জনসাধারণের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা ও বিত্তহীনদের অধিকারের পূর্ণ স্বীকৃতি, এই তিনটি বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত প্রেসিডেন্টের প্রকাশ করা দরকার।'

মাওলানা তাঁর বক্তব্যকে আরও পরিষ্কার করে উপস্থিত করার চেষ্টা করলেন এই বলে যে, 'প্রেসিডেন্ট নিজের ক্ষমতাবলে ও নতুন নির্বাচিত গণপরিষদের সাহায্য বা সমর্থন ছাড়াই, যখন এক ইউনিট বাতিল, জনসংখ্যানুপাতিক আসন সংরক্ষণ, প্রত্যক্ষ নির্বাচন, পূর্ণবয়স্কদের ভোটাধিকারের স্বীকৃতি, পার্লামেন্টারি শাসন প্রবর্তনের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে পারলেন, তখন আগের উল্লিখিত তিনটি বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট মত ঘোষণা না করার কোনো কারণ থাকতে পারে না।'



একুশের শহিদ স্মরণে ভাসানী ও শেখ মুজিব যখন প্রভাতফেরিতে

যদিও টেকনিক্যালি ন্যাপের কাউন্সিল সভায় নির্বাচনে পার্টি অংশগ্রহণ করবে কি না, তার সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী, তবুও বেশ বোঝা যাচ্ছে যে মাওলানা ভাসানী নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করবেন না। ন্যাপের কর্মী দলের এক অংশ আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণের যৌক্তিকতা দেখিয়ে বলছেন যে গণপরিষদের ভেতরে এবং তার বাইরে উভয় জায়গায় ন্যাপ জনসাধারণের দাবিদাওয়া নিয়ে সংগ্রাম চালানোর সুযোগ গ্রহণ করবে। পশ্চিম পাকিস্তানে ভাসানীপন্থী ন্যাপ আরিফ ইফতিখারের নেতৃত্বে যে আগামী নির্বাচন দ্বন্দ্বে নামছে তার সুস্পষ্ট ঘোষণা ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে।

প্রশ্ন করা হলো, আপনার দল এককভাবে অথবা প্রয়োজন হলে অন্য দলের সাথে সম্মিলিতভাবে কাজ করার পক্ষপাতী কি না?

মাওলানা ভাসানী এ প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'জনগণের কল্যাণ এবং পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব রক্ষার যেকোনো কর্মসূচিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ

আর্থসামাজিক পরিকল্পনার কথা উঠে এসেছে আর সবশেষে এসেছে শেখ মুজিবের জীবনের প্রায় সমার্থক শব্দ 'কারাবরণ'-এর কথা। দেশের বিভিন্ন জেলে তাঁর কারাভোগ, কারামুক্তি এবং মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে নাটকীয়ভাবে পুনরায় কারাবরণের চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশের পর আসে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কথা।

ধারাবাহিক এই সাক্ষাৎকারটি ১১ জানুয়ারি ১৯৭০ রোববারের *দৈনিক পাকিস্তান*-এ উপক্রমণিকা দিয়ে শুরু হয়ে যথাক্রমে ২১, ২৩, ২৫ ও ২৭ জানুয়ারি এবং ২ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হয়। *দৈনিক পাকিস্তান*-এর প্রথম পাতায় প্রকাশিত বঙ্গবন্ধুর সচিত্র এই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে ২ ফেব্রুয়ারির কিস্তিতে ঘোষণা দেওয়া হয়, 'এই দেশেতে জন্ম আমার, শেষাংশ আগামী পরশু দৈনিক পাকিস্তানে প্রকাশিত হবে।' কিন্তু অজ্ঞাত কারণে 'আগামী পরশু' অর্থাৎ ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭০ কিংবা এরপরের কোনো সংখ্যাতেই ঘোষিত শেষাংশ প্রকাশিত হয়নি।

সাক্ষাৎকারগ্রহীতা ফজলে লোহানী মাওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমানের কাছ থেকে আহৃত তথ্যাবলি আখ্যানের আঙ্গিকে বর্ণনা করেছেন, কখনো কখনো কথাপরম্পরায় উপস্থাপিত হয়েছে ভাসানী ও শেখ মুজিবের মূল সংলাপবাক্য। দুটি সাক্ষাৎকারেই এমন কিছু সাময়িক প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে, যা তৎকালীন প্রেক্ষাপটে বিবেচনায় নিতে হবে। ১৯৭০-এর প্রারম্ভে প্রকাশিত হলেও ধারণা করা যায়, সাক্ষাৎকারদ্বয় গৃহীত হয়েছিল ১৯৬৯-এর শেষ ভাগে।

মাওলানা ভাসানী ও বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎকার দুটো অদ্যাবধি অগ্রন্থিত। ফজলে লোহানীর গৃহীত বিরল সাক্ষাৎকারদ্বয় প্রায় অর্ধশতক পর আজকের পাঠকের কাছে তুলে ধরা হলো।

করে আমি এবং আমার পার্টি যেকোনো রাজনৈতিক দলের সাথে একযোগে কাজ করতে সর্বদা প্রস্তুত ছিলাম ও আছি।'

এ জবাব রাজনীতিজ্ঞসুলভ জবাব, তাই এ জবাব থেকে কোনো সঠিক কর্মপন্থার নির্দেশ পাওয়া সম্ভব নয়।

পূর্ব পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মাওলানা ভাসানী কথা বলছিলেন। সম্প্রতি টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে আসাম ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের মানচিত্র সম্পূর্ণ নয়, সে কথার উল্লেখ করে মাওলানা ভাসানী বলেন যে, 'আসামের জনসাধারণ আজ নির্যাতিত, বঞ্চিত। আসামের প্রকৃত সৌহার্দ্য হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের সাথে। আসামের স্বার্থেই পূর্ব পাকিস্তানের সাথে আসামের রাজনৈতিক অভিন্নতার সূত্র গ্রথিত হবে।'

তাঁর বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বলেন যে আসামের বিরাট সম্পদ আজ অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে। আসামের ভৌগোলিক সান্নিধ্য হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের সাথে। বহির্বাণিজ্যের জন্য আসামের যে বন্দর ও পোতাশ্রয়ের দরকার, সে দরকার সত্যিকারভাবে মেটাতে পারে চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দর।

আসাম সীমান্তবর্তী নাগা ও মিজো অধিবাসীদের অভ্যুত্থানের কথা উল্লেখ করেন মাওলানা ভাসানী।

মাওলানা তাঁর কর্মবহুল জীবনের শেষ অধ্যায় রচনা করছেন। এ অধ্যায় সবচেয়ে গৌরবময় হবে কি না, তা ভবিষ্যৎ সাফল্যই শুধু বলতে পারে।

মাওলানা বললেন, তিনি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নেতৃত্ব থেকে অবসর নিতে চান। পার্টির নিয়ম অনুসারে পরপর দুবারের বেশি পার্টির সভাপতি থাকা যায় না। মাওলানার প্রেসিডেন্টশিপ শেষ হচ্ছে আগামী মার্চ মাসে।

'এরপর কী হবে?'

এর জবাব পাইনি।

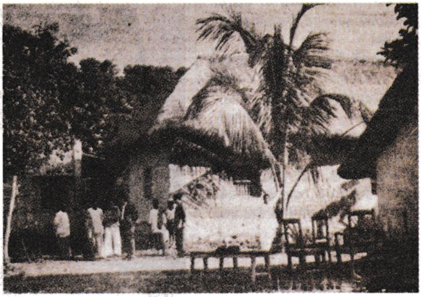
একটি ছোট ছেলে হাসিমুখে এগিয়ে এল আমাদের দিকে।

'আপনারা বসেন। একটু পরে পীর সাহেব আসছেন', ছেলেটি বলল।

কথাবার্তা হচ্ছিল ছেলেটির সাথে। মাওলানা তাকে টাঙ্গাইল থেকে নিয়ে এসেছেন। বাড়ির খুঁটিনাটি কাজ করে। স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে, লেখাপড়া শিখছে সে।

বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন মাওলানা ভাসানী। সবার সাথে হাত মেলালেন তিনি। বসতে বললেন আমাদের সবাইকে।

আমরা যে আসছি সে কথা আগে থেকে জানানো হয়েছিল। কথা ছিল তার



মহীপুরে ভাসানীর বাড়ি

দ্বিতীয় ছেলে গরুর গাড়িটি নিয়ে স্টেশনে যাবে আমাদের জন্য। দিন পরিবর্তনের জন্য সে ব্যবস্থা সম্ভব হয়নি।

'তোমাদের তো আরও আগে আসার কথা ছিল। ভাবছিলাম শেষে আসোই কি না। কিবরিয়া গাড়ি নিয়ে যেত তোমাদের আনতে,' মাওলানা বললেন।

'আটকে পড়েছিলাম ঢাকায়। তাই আসতে দেরি হয়ে গেল।'

মাওলানার দুই ছেলেই বীরপুরের এ বাড়িতে থাকেন। খেতখামার দেখাশোনা করেন। আবুনসর খান, বয়স বোধ হয় তিরিশের কাছে। লেখাপড়া স্কুলের পাঠেই শেষ হয়ে গেছে তাঁর। তাঁর ছোট যিনি, তিনি গোলাম কিবরিয়া খান। খালি পায়ে লুঙ্গি পরে আমাদের সামনে দিয়ে তিনি কাজে চলে গেলেন। কৃষকের নিরহংকার, সরল হাসি তাঁর ঠোঁটের কোণে লেগেই আছে। আমরা যেদিন ফিরে আসি সেদিন তিনি একটা ট্রাক্টরের ডাইনামো কাঁধে করে দু মাইল পথ হেঁটে নিয়ে এসেছিলেন পাঁচবিবি প্ল্যাটফর্মে। ডাইনামোটা মেরামত করার জন্য ঈশ্বরদীতে নিয়ে যাওয়ার দরকার ছিল।

শুনেছি মাওলানার আরেক ছেলে রংপুরে থেকে পড়াশোনা করছেন।

মহৎ ব্যক্তিদের পুত্রদের একটি নিজস্ব ট্র্যাজেডি রয়েছে। পিতার বিরাট ব্যক্তিত্ব হয়তো সব সময়েই খাটো করে দেয় পুত্রের বড় হওয়ার প্রচেষ্টাকে। মহীরুহের ছায়ার নিচে বিশ্রাম নেওয়া যায়, কিন্তু সে ছায়ার তলে তৃণদূর্বাদল ছাড়া আর কোনো উদ্ভিদের জন্ম সম্ভব নয়। উইনস্টন চার্চিলের পুত্র র‍্যানডলফ অনেকবার খেদ করে বলেছিলেন তাঁর ভুবনবিখ্যাত পিতার ব্যক্তিত্বের কাছে তাঁর নিজের সব আশার পরাজয়ের কথা। জানি এ ব্যর্থতার কোনো যথার্থ ব্যাখ্যা নেই। তবুও এই নিজস্ব ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডিটুকুই যেন নিয়ম। রবীন্দ্রনাথের ছেলে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্তালিন পুত্র ভাসিলি। এরা সবাই মহৎ পিতার ব্যক্তিত্বের আবছায়া অন্ধকারে জীবন কাটিয়ে গেছেন।

সকালের নাশতার ব্যবস্থা করলেন মাওলানা।

বললেন, 'এসেছ যখন ঘরের পিঠে খেয়ে যাও।'

নাশতা এল। দুধের পিঠে। ডিম ভাজা আর চা। চা-এ চুমুক দিয়ে গল্প শুরুর উপক্রমণিকা খুঁজছিলাম। বললাম, 'আপনার টেলিভিশন সাক্ষাৎকার সারা পাকিস্তানে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। দেশের লোক এ নিয়ে কথাবার্তা বলছেন।'

মাওলানা চুপ করে শুনছিলেন কথাগুলো।

'আপনি আসামের কথা নিয়ে যা বলেছেন, তা বেশ ফলাও করে কাগজে ছাপাও হয়েছে।'

আসামের কথা শুনে মাওলানা চোখ বুজলেন। মনে হলো কোথায় কোন সুদূর অতীতের কিনারায় হঠাৎ তাঁর মনটা ছুটে চলে গেছে। তাঁর স্মৃতির আঙিনায় বুঝি বহুজনের ধ্বনি একসঙ্গে জেগে উঠেছে।

আসামের কোনো গাঁয়ের সেই নিভৃত সন্ধের চিত্রটা ভাসানী খুঁজছেন। আজানের মাঙ্গলিক শেষ হয়েছে। সারা দিন খেতে হাড়ভাঙা খাটুনির পর গাঁয়ের পুরুষেরা ঘরে ফিরেছে। নিকোনো উঠোনে ধানের সুবাস। হালের গরু বাঁধা হলো আমগাছের খুটের তলায়। লাঙল বাঁশের আড়ে ঝুলিয়ে রেখেছে কেউ। বৃদ্ধারা নাতনি নিয়ে মনভোলানো ছড়া কাটছেন। বৃদ্ধ সুজন থেলো হুঁকায় তামাক নিয়ে বসেছেন। মা শিশুকে

ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে শোনাচ্ছেন। স্নিগ্ধ মন্থর সন্ধ্যায় গাঁয়ের দুকূলভরা প্রশান্তির ছবি।

কিন্তু এ ছবি যেন হাত থেকে ভেঙে খান খান হয়ে গেল।

আসামের পুলিশ এসে গ্রাম ভেঙে দিল। ঘরে আগুন দিল। গ্রামবাসীদের তাড়িয়ে দিল। মানুষের মহৎ এক বসতি মত্ত দানবের পদতলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

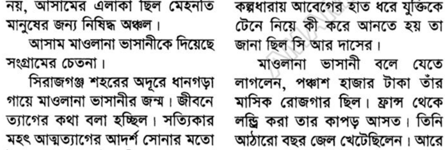
আসামের লাইন প্রথা। যারা ভুখা, যারা নিঃস্ব, গ্রামবাংলার নদীভাঙা কাঙালের দলকে পথ দেখিয়ে মাওলানা ভাসানী নিয়ে গিয়েছিলেন আসামের দুর্গম বনাঞ্চলে। নিঃসঙ্গ আইল্যান্ডে পরিত্যক্ত রবিনসন ক্রুসোর মতো এই সর্বহারার দল নিজ হাতে জঙ্গল পরিষ্কার করে ঘর বেঁধেছিল। জমি কর্ষণ করেছিল। আবাদি বসিয়েছিল। মেহনতি মজুরের পদভারে, শিশুর কলহাস্যে, নারীর কণ্ঠসুধায় ভরে উঠেছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদের অপরিসর আকাশ।

আসাম সরকার এ অবস্থা মেনে নিতে চাইল না। তারা নানা এলাকা থেকে লাইন প্রথার দোহাই দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিল দরিদ্র মানুষের বসতিগুলো।

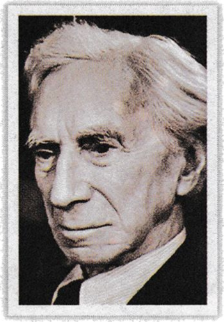
মাওলানা বলে ওঠেন, তখনকার ভারতে যেকোনো প্রদেশের মানুষ অন্য প্রদেশে অবাধে যেতে পারত। যেখানে ইচ্ছে ঘর তুলতে পারত। শুধু আসামেই নয়, আসামের এলাকা ছিল মেহনতি মানুষের জন্য নিষিদ্ধ অঞ্চল।

আসাম মাওলানা ভাসানীকে দিয়েছে সংগ্রামের চেতনা।

সিরাজগঞ্জ শহরের অদূরে ধানগড়া গায়ে মাওলানা ভাসানীর জন্ম। জীবনে ত্যাগের কথা বলা হচ্ছিল। সত্যিকার মহৎ আত্মত্যাগের আদর্শ সোনার মতো উজ্জ্বল। সে কথাই হচ্ছিল। মাওলানা ভাসানী বললেন, আমার আর ত্যাগ কী রয়েছে দেশের জন্যে? আমার বাবার ছিল সাতবিঘা জমি আর একটি দোকান। আমি চিরকালই পান্তা খেয়ে এসেছি। এখনো খাচ্ছি।



সমাজতান্ত্রিক চীনের জনক মাও সে তুং



ব্রিটিশ দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল

তবে দেশের জন্য ত্যাগ করেছেন অন্য দেশপ্রেমিকেরা, তিনি বললেন। নাম উল্লেখ করলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের। হেকিম আজমল খানের। ইসলামের ইতিহাস থেকে ইবরাহিম বিন আদম-এর নাম তুলে ধরলেন, যিনি সবকিছু ছেড়ে দিয়ে কাঠ কেটে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

দেশের প্রয়োজনে সি আর দাশ সবকিছুই ত্যাগ করেছিলেন। তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন জোরদার ব্যারিস্টার। যুক্তি আর আইনের মারপ্যাঁচ। কথার কল্পধারায় আবেগের হাত ধরে যুক্তিকে টেনে নিয়ে কী করে আনতে হয় তা জানা ছিল সি আর দাসের।

মাওলানা ভাসানী বলে যেতে লাগলেন, পঞ্চাশ হাজার টাকা তাঁর মাসিক রোজগার ছিল। ফ্রান্স থেকে লন্ড্রি করা তার কাপড় আসত। তিনি আঠারো বছর জেল খেটেছিলেন। আরে বাপু তাঁর ত্যাগ আর আমার ত্যাগ কখনো সমান হতে পারে?

ব্যক্তিগত ত্যাগের মাপকাঠির কাছে নিজের প্রচেষ্টা অকিঞ্চিৎকর তুচ্ছ বলে হাজির করার চেষ্টা করলেন মাওলানা। তারপর হঠাৎ বলে উঠলেন আমি যখন কিউবা থেকে লন্ডনে এসেছি, লন্ডনের বিমানবন্দরে এলেন পঁচানব্বই বছরের বৃদ্ধা শ্রীযুক্তা কমলা দেবী। সি আর দাসের ইংরেজ স্ত্রী। মহিলাকে বললাম এত কষ্ট করে কেন এলেন মিছেমিছি।

জবাব দিয়েছিলেন কমলা দেবী, অনেক দিন দেখিনি তোমাদের। তাই দেখতে এলাম।

এ দেশের মানুষের প্রতি যে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আর দরদ তাঁর রয়েছে, সুদীর্ঘকালের মহিমায় মহিমান্বিতা কমলা দেবী তো তা ভুলে যেতে পারেননি। তাঁর স্বামীকে যে এ দেশের লোক প্রাণভরে ভালোবেসেছিল। ডেকেছিল তাঁকে দেশবন্ধু বলে। সে কথা তো মিসেস সি আর দাশ কখনোই ভুলতে পারেন না।

মাওলানার রাজনৈতিক চেতনার উৎস আসাম। এখানেই খেতের আলের ধারে বটতলায় কৃষকের আলোচনা সভায় মাওলানার রাজনীতি পাঠের শুরু। মন তাঁর গোড়া থেকেই সংগ্রামী। চুম্বক যেমন করে ইস্পাতকে আকর্ষণ করে, রাজনীতি তেমনি আকর্ষণ করেছিল মাওলানাকে। কোনো বইপুস্তক পড়ে তিনি রাজনীতি শেখেননি। তাঁর রাজনীতির স্কুল বসেছিল দেশের ধানের খেতগুলোর পাশে। সে স্কুলের শিক্ষক ছিলেন তাঁরাই, যাঁরা লাঙল নিয়ে ভূমিকর্ষণ করেন। এখান থেকে মাওলানা ভাসানী পেয়েছিলেন এক গভীর অভিজ্ঞান। তিনি শিখেছিলেন সেই আশ্চর্য উজ্জ্বল প্রভাবতী সত্যদর্শনের কথা। রবীন্দ্রনাথ এই দর্শনের কথাই বলে গেছেন—

চাষী খেতে চালাইছে হাল,
তাঁতী বসে তাঁত বোনে,
জেলে ফেলে জাল—
বহুদূরে প্রসারিত এদের
বিচিত্র কর্মভার,
তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে
সমস্ত সংসার।

এই সমস্ত সংসারের কথাই মাওলানা বলেছেন দেশের প্রকৃত রক্ষক, জাতির মেরুদণ্ড কৃষক সমাজ। তারাই দেশের জনসংখ্যার শতকরা পঁচাশিজন। এদেরই হাড়ভাঙা পরিশ্রমে উৎপাদিত হচ্ছে ধান, পাট, আখ, তামাক। এককথায় এদের রক্ত পানি করে এরা যে সোনার ফসল উৎপাদন করছে তা-ই প্রকৃতপক্ষে দেশের উকিল মোক্তার ডাক্তার শিক্ষক ছাত্র ব্যবসায়ী সরকারি কর্মচারী সংসদ সদস্য মন্ত্রী সেক্রেটারি এমনকি দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের জীবিকা নির্বাহ তথা জীবনধারণের একমাত্র উৎস। মাওলানা লিখেছিলেন এ কথাগুলো উনিশশ বাষট্টি সালে। এ

বক্তব্য সত্যভাষণ। কোনো কথাকেই পোশাক পরিয়ে অপরূপ সাজে তিনি সাজাননি, যাতে কী কথা বলা হয় তাই কেউ বুঝলেন না!

এত ভিক্ষুক এল কোত্থেকে ঢাকায়। নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, রাজশাহীতে, চাটগাঁয়ে। খবরের কাগজে রোজই খবর বেরোয় দেশে ভিক্ষুকের সংখ্যা বাড়ছে আর বাড়ছে। এরা কারা?

এরা তারাই, যাদের কথা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় স্থান পেয়েছিল। এদেরই 'কর্মভার 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।' এদের কথাই ভাসানী বলেছেন, 'যে কৃষক স্বাধীনতার আগে কোনো রকম খাইয়া জীবন যাপন করিত, তাহারা আজ রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষুক ভবঘুরে সাজিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।'

কোথায় যেন যুক্তি কাটা পড়ে যাচ্ছে? কোথায় সমাজের লজিকের একটা বিরাট অসমন্বয় ফুটে উঠেছে। যাদের ওপর ভর করে চলছে সংসার, যাদের বিপুল জনসংখ্যা এ দেশের সব কটি মানুষকে খাওয়াচ্ছে, পরাচ্ছে তারা কেন আজ ভিক্ষুক? এই কেনই বা আজকের সবচেয়ে বড় জিজ্ঞাসা। যে গাছের ফল আমরা সবাই খাচ্ছি, তার যে শেকড় শুকিয়ে গেছে।

পৌষের মিঠে রোদ এসে পড়েছে বৃদ্ধের পিঠে। ছিয়াশি বছরে ছিয়াশিটি শীতের পৌষসকালে এমনি করেই প্রভাকর আলো দিয়ে আসছে এই বৃদ্ধকে। আগামী কোনো শীতে সূর্য ওঠা দেখবে, সে তো আর নেই। ধুলোয় মাখা চেয়ারটি অমনি রেখে কখন সে চলে গেছে।

ইতিমধ্যেই আশপাশের গাঁ থেকে দুজন-একজন করে লোক আসছে। মুরিদ এরা। পায়ে হাত দিয়ে সালাম করছে গভীর শ্রদ্ধায়। একটা করে টাকা হাতে গুঁজে দেয় সবাই। মাওলানা সবার কুশল জিজ্ঞেস করেন। 'খেতের ফসলের অবস্থা কেমন? ধান কত এল এবার ঘরে?' জবাব দিয়ে চলে যায় তারা। সকালেই পুণ্যদর্শনটা সেরে মাঠের পথে নেমে যায়।

আমরা বসে থাকতেই মাওলানার পকেটে সাত-আট টাকার মতো এক টাকার নোট জমা হয়ে গেল।

এবারে এল একজন ভিনগাঁয়ের কৃষক। পায়ে রাবারের জুতো, হাতে একটা অ্যালুমিনিয়ামের বাটি। বাটিতে পানি রয়েছে।

সামনে এসে লোকটা পদধূলি নিয়ে একটা টাকা হাতে গুঁজে দিল মাওলানার হাতে।

'কেমন আছো, জমির?' মাওলানা শুধোয়।

'হুজুর আমার ছোট ছেলেটার আজ তিন দিন ধইরা জ্বর। জ্বর সারছে না। তাই একটু পানি পড়া নিতে আসছি,' লোকটা হাতের বাটি এগিয়ে ধরে।

মাওলানার চোখে দুশ্চিন্তার ছায়া।

'কেন কী হয়েছে? ডাক্তার দেখাইছ?'

'হ হুজুর।'

'ডাক্তার কী কইছে।'

'কী আর কইব। ওষুধ খাইবার জন্যে লেইখা দিছে। ওষুধের দাম পাঁচ টাকা।'

মাওলানা পকেটের ভেতর হাত ঢোকান, সকালে পাওয়া সব কটি টাকা পকেট উজাড় করে জমিরের হাতে তুলে দেন।

'যাও, যাও, তাড়াতাড়ি গিয়া ওষুধ কিনা বাচ্চাটারে দেও। দেরি কইরো না।'

এক হাতে পড়া পানির বাটি আর অন্য হাতে ওষুধের দাম নিয়ে জমির চলে যায়। এক হাতে বিশ্বাস আর অপর হাতে বিজ্ঞান। দুটো মিলে জমির শেখের বাচ্চাকে ভালো করে দেবে।

'সরল মানুষের বিশ্বাসে আঘাত করতে নেই,' মাওলানা আমাদের দিকে তাকিয়ে কথাটা বলেন নিজের মনেই।

আমরা মাঠের ভেতর দিয়ে হেঁটে চলেছি। খেতের মাঝ দিয়ে পথ। দুপাশে আখের খেত। ধানখেতে কাটা ধান পড়ে আছে। হলুদ শর্ষের ফুলে মাঠ ভরে গেছে। মাওলানা ভাসানী এগিয়ে চলেছেন সামনে। পায়ে পুরোনো রাবারের সোল দেওয়া চটিজোড়া যেটি দেখে এসেছিলাম সন্তোষে।

হককুল এবাদ—মানুষের অধিকার। তার জন্যই ষাট একর এলাকা জুড়ে এই মিশন।

'রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের মতো একটা কিছু গড়ে তোলার ইচ্ছে আছে', মাওলানা বলতে থাকেন,



দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

'এখানে আসবে মানুষ দেশের নানা প্রান্ত থেকে। শিক্ষা নেবে তাঁরা। মানুষের সেবা করার সে শিক্ষা।'

কয়েকটি দালানের ভিত্তি ইতিমধ্যেই উঠে গেছে। শিক্ষার্থীদের আবাসের দালান। হাসপাতাল। কারিগরি শিক্ষা কেন্দ্র। সংস্কৃতি ভবন। এসবই থাকবে এখানে।

কতকগুলো গাছের সারি। নতুন বোনা শালের গাছ। কখনো সেখানে শালবন গড়ে উঠবে। একটা পথের ধার দিয়ে কতকগুলো তুঁতেগাছ লাগানো হয়েছিল। সেগুলো বেড়ে উঠছে পৌষের শিশির ভেজা মাটির বুক চিরে।

'এগুলো আমি এনেছিলাম চীন দেশ থেকে। এগুলো দিয়ে ভালো গুটিপোকার চাষ হবে। তা থেকে সিল্ক তৈরি হবে। সেরিকালচার শেখানো হবে এখানে। ছাত্ররা সবকিছু শিখবে এই মিশনে।'

অতি মহৎ সংকল্পের কথা। যেদিন এ গাছে সিল্ক ওয়ার্মগুলো রেশমের সুতো বুনে দেবে, সেদিন এই মহান বৃদ্ধ কোথায় থাকবেন?

পাশের পুকুর থেকে বালতি করে পানি আনা হলো। নিজ হাতে পানি ঢালতে থাকেন প্রতিটি গাছের গোড়ায় মাওলানা ভাসানী।

মাওলানা আগে চলেছেন। সব দেখিয়ে দিচ্ছেন, বুঝিয়ে বলছেন কোথায় বয়নশিল্পীরা বসে কাজ শেখাবে। কোথায় মিশনের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হবে, যেখান থেকে নতুন সংস্কৃতির জোয়ারে অনুপ্রাণিত হয়ে শিল্পীরা রচনা করবেন নাটক, গান, সাহিত্য। মহীপুরের এই প্রান্তর অচিরেই জনপদ হয়ে উঠবে সুখী মেহনতি মানুষের কলরোলে। শিল্পের অনুপ্রেরণার জন্য এমন আর আদর্শস্থান কোথায়?

আমরা পেছনে আসছি। মাওলানা সামনে হেঁটে যাচ্ছেন, আর কথা বলছেন। হঠাৎ থেমে গেলেন তিনি। তারপর পেছন ফিরে তাকিয়ে বললেন, আমি সর্বহারাদের কথা বুঝি ভালো। তোমাদের মতো শহুরে মিডল ক্লাসের লোকদের বাপু আমি বুঝি কম।

মিডিল ক্লাস কোনো ক্লাসই না

তারপর হেসে রসিকতা করে বললেন, আজকাল মিডল ক্লাস কোনো ক্লাসই না। ইন্টার ক্লাসে যে লোক গাড়ি চড়ে সে তো নির্বোধ। ফার্স্ট ক্লাসের মতো আরামও নেই অথচ তৃতীয় শ্রেণির মতো সস্তাও হচ্ছে না।

মাওলানার পরিধানে একটি চেক লুঙ্গি। আর গায়ে কুর্তা। তার ওপর শীতের জন্য উলের হাতকাটা



মাওলানা ভাসানী, মুনীর চৌধুরী, শেখ মুজিব ও অন্যরা

মাওলানা গভীর দরদ নিয়ে শোনেন এসব কথা। সারা জীবন ধরেই তো তিনি এ ধরনের অভাবের কথা শুনে এসেছেন। কী জবাব তিনি দেবেন এদের?

মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করি।

বীরপুরে ফিরে এলাম সবাই। রোদ একটু হেলে পড়ছে। সকালের ছায়াঢাকা ঘাসের জমির ওপর এ বেলায় সূর্যের কিরণ ঝিকমিক করছে। মাওলানা ডাকলেন আমাদের সবাইকে ভেতরবাড়িতে। খাবার আয়োজন হয়েছে বড় ঘরের বারান্দায়। মাদুর পেতে বসে পড়লাম আমরা সবাই। মুরগির তরকারি। মাছের ঝোল। বেগুন ভাজা। আর ডাল।

সোয়েটার। মাওলানা বললেন, আমার একখানা লুঙ্গি, তা সেলাই করতে লাগে মাত্র দু আনা। আর তোমাদের স্যুট তৈরি করতে লাগছে দেড় শ টাকা।

খবর রাখেন বৃদ্ধ সব জাগতিক ব্যাপারেরই, মায় দরজির দোকানে মধ্যবিত্তের সংকটের কথাও তাঁর অজানা নেই।

মাওলানা বলে যান, আমাদের দেশের মেহনতি মানুষের মতো সংগ্রাম করার আদর্শ মানুষ দুনিয়াতে আর কোথাও নেই। দুটো কাঁচকলা সেদ্ধ, নুন আর ভাত। এত সস্তায় এঁরা বেঁচে থেকে সংগ্রাম করে যাচ্ছেন।

একটা টিনের শেড ধরে এসে দেখলাম কয়েক হর্স পাওয়ারের ভারী একটা ডিজেল ইঞ্জিন পড়ে আছে অযত্নে। সঙ্গে কাপলিং করা ওয়াটার পাম্প। চীন থেকে মাওলানা উপহার পেয়েছিলেন তাঁর চীন সফরের পর। ইঞ্জিনটা আনা হয়েছিল মহীপুর প্রান্তরের বিস্তীর্ণ এলাকা সেচন করার জন্য।

এখন আর ইঞ্জিনটা দিয়ে কাজই হচ্ছে না। আমাদের পাকিস্তানি ইঞ্জিনিয়ার এসে নতুন খাল কেটে দিয়ে গেল জমির ধার দিয়ে। কিন্তু খালে পানি আসেনি কখনো, মাওলানা দুঃখ করতে থাকেন।

পাশেই তুলসীগঙ্গা। ঠিক নদী নয়। দিনাজপুরের আসুরাইল বিল থেকে পানি আসে তুলসীতে। কিন্তু শীতের সময় শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। মাঝখানে গাঁয়ের ছেলেরা ডাংগুলি খেলে তখন। কথা ছিল তুলসীগঙ্গা থেকে পানি নতুন কাটা ক্যানাল দিয়ে প্রবাহিত করা হবে। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারদের বাহাদুরি বটে। ক্যানালের ঢালটা হলো ঠিক উল্টো দিকে।

মাওলানা বললেন, কত টাকা নষ্ট হলো অযথা।

রোদ প্রখর হয়ে উঠছে। 'চলো, ফেরা যাক। তোমাদের খিদে লেগেছে নিশ্চয়।'

আমরা ফিরে চলি মিশন এলাকার পথ ধরে।

তাঁর নাম মাওলানা ভাসানী

পথে আসতে মনে পড়ে অনেক কথা। ভাসানীর চরের মাওলানা। আর আজকের মহীপুরের পৌষের দুপুর। কত দশক পেরিয়ে এসেছেন এই বৃদ্ধ। ভাসানীর চর। হামিদাবাদ। মানকারচর। ধুবড়ী। আসামের কতকগুলো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জায়গার নাম। কিন্তু এসব যে সুতো দিয়ে বাঁধা, তাঁর নাম মাওলানা ভাসানী।

কে না জানে, আসামের গরিব মানুষের জন্য মাওলানা কী না করেছেন! এদের মুক্তির জন্য নওয়াব-নাইট-উজিরদের কাছে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে গেছেন একাকী বৃদ্ধ। তাঁর দুঃখরজনীর চলার পথে তিনি অনেক বন্ধু পেয়েছেন, অনেক শুভানুধ্যায়ী পেয়েছিলেন। সেসব বন্ধুর দল কোথায় আজ? কৃষকের পাশে এখনো দাঁড়িয়ে শুধু একটি মানুষ। যুদ্ধ করতে করতে ইনি বুড়ো হয়ে গেছেন। কিন্তু এখনো যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে আসেননি তিনি।

ওপরতলাকার রাজনীতি মাওলানা বোঝেন না।

আমরা হেঁটে এসে আমতলায় বেঞ্চিতে বসে পড়লাম। মাওলানা একটু বিশ্রাম নেন। এরই ভেতর কয়েকজন গ্রামবাসী জড়ো হয়েছিলেন সেখানে। নানা প্রশ্ন ওঠে। দেশের অবস্থা, কৃষকের অবস্থা নিয়ে।

একজন কৃষক জিজ্ঞাসা করেন, 'আমরা তো ভোট দিয়া পাকিস্তান বানাইছি। কিন্তু এত দিনে কী হইল আমাদের? আগে আমাদের একটা ঘর ছিল, তাও আজ আর নাই। দুইটা গরু ছিল, তাও আজ নাই। আগে দিনে এক বেলা অন্তত ডালভাত খাইতে পাইতাম। আজ তাও খাইতে পাই না।'

বাড়িতে সবাই ব্যস্ত

সামনের উঠানে মাটির চুলোয় আরেক হাঁড়ি ভাত চাপিয়ে দিয়েছেন মাওলানার কনিষ্ঠা পুত্রবধূ। তিনি বসে কাঠের আগুন জোগাচ্ছেন। বড় ছেলের স্ত্রী মসলা বাটছিলেন বুঝি। মাওলানার স্ত্রী ভেতরবাড়ির টিউবওয়েলে কল টিপে পানি তুলছিলেন। বাড়িতে সবাই ব্যস্ত মেহমানদের নিয়ে। উঠোনের এক কোণে ধানের স্তূপ। তার ওপাশে জলচৌকিতে নিত্যব্যবহার্য কিছু জিনিসপত্র রাখা। একটা নীল রঙের কাঁথা বাঁশের আড়ে শুকোচ্ছে।

খেতে খেতে রাজনীতির কথা হচ্ছিল।

এক শ আটষট্টির ধাঁধা

মাওলানা বললেন, 'এই যে গণপরিষদটি গঠিত হতে চলেছে। তাতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে থাকবে এক শ আটষট্টিজন সদস্য। এবারে হবে এক শ আটষট্টির ধাঁধা।'

'সেটা কেমন?'

'এঁরা যে এত টাকাপয়সা খরচ করে নির্বাচিত হয়ে যাবেন। এঁরা কি গিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের সব দাবিদাওয়া আদায় করে নিতে পারবেন।' মাওলানা নিজের মনেই হেসে ওঠেন।

ভবিষ্যৎই শুধু এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে। মাওলানা তা জানেন।

খাওয়া শেষে আমরা গিয়ে বাইরে বসলাম। নামাজ সেরে মাওলানা এলেন আমাদের কাছে।

এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিলাম। আর মনে মনে নানা প্রশ্ন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছিলাম। অনেকেই এ কথা তুলেছেন, মাওলানা এখনো কেন নেতৃত্ব দিচ্ছেন? এই বুড়ো বয়সে তিনি কেন সামনে এসে দাঁড়াচ্ছেন সবার আগে?

কই, পূর্ব পাকিস্তানে আর কোন মাওলানা আছেন যিনি খেতমজুরের

মিছিল বের করেন। যিনি রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা নিয়ে জেনেছেন দেশের কৃষক-মজুরের মুক্তিই হচ্ছে সত্যিকার মুক্তির পথ। যে কারণে আজও বার্ট্রান্ড রাসেল লন্ডনের বৃষ্টিভেজা শীতের সন্ধ্যায় ট্রাফালগার স্কোয়ারে বসে ভিয়েতনামের মুক্তিসেনানীদের সাহস জোগাচ্ছেন, বোধ হয় সেই কারণেই মাওলানা ভাসানী বয়সের দাপট তুচ্ছ করে বারবার ছুটে যান প্রমত্ত বন্যার মতো সংগ্রামী মিছিলের পুরোভাগে। পূর্ব বাংলার রাসেল ভাসানী। মনীষী বার্ট্রান্ড রাসেলকে দেখেছি লন্ডনের ট্রাফালগার স্কোয়ারে যুবকদের সাথে জোড় আসনে বসে থাকতে। মাথার ওপর টিপটিপ করে পশলা বৃষ্টি পড়ছে। বৃদ্ধ দার্শনিকের ভ্রুক্ষেপ নেই সেদিকে। শীর্ণ মুখে চোখদুটো আশার আলোয় উজ্জ্বল। *হ্যাস ম্যান এ ফিউচার*-এর লেখক মাটিতে বসে ষোলো বছরের বালকের সাথে সংগ্রাম করছেন ভিয়েতনামের যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিশ্বের জনমত গড়ে তোলার জন্য।

লন্ডন পুলিশের কালো বন্ধ করা প্রিজনভ্যান এসে রাস্তায় দাঁড়াল। কয়েকজন পুলিশ এসে জোর করে ধরে নিয়ে গেল এ যুগের সবচেয়ে মহৎ ইংরেজ ভদ্রলোকটিকে। লর্ড বার্ট্রান্ড রাসেল জেলে চলে গেলেন ভিয়েতনামের মুক্তির গান গাইতে গাইতে।

ছেলেরা গান ধরল সমবেত কণ্ঠে মহান সংগীত—

উই শ্যাল লিভ ইন পিস
উই শ্যাল লিভ ইন পিস,
সামডে

আর আমার পূর্ব বাংলার ব্রহ্মপুত্রের চরে ফুলছড়িতে বারো বছর আগের শীতের রাতে সারা পাকিস্তান থেকে এলেন কৃষাণেরা। ময়মনসিংহ-এর গারো পাহাড় থেকে নেমে এলেন হাজং বীর। বেলুচিস্তান থেকে এসেছিলেন বেলুচ, সীমান্ত থেকে পাঠান। দশ হাজার কৃষাণ আর কর্মী জড়ো হয়েছিলেন ফুলছড়ির চরে। আরেক বৃদ্ধের কথা শুনতে।

দারিদ্র্যকে শেষ করে দাও, শোষণকে নির্মূল করে দাও। সবার মুখে যাতে হাসি ফুটে ওঠে, তার ব্যবস্থা করে দাও। আমার কাজ ফুরিয়ে যাবে তখন।

মাওলানা সেদিনই শুধু হেরে যাবেন। তা না হলে মাওলানা ভাসানী আমাদের সবাইকে ফেলে এগিয়ে যাবেন।

মহীপুরের প্রান্তর থেকে ফিরে এলাম।



শেখ মুজিবের সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন ফজলে লোহানী

এই দেশেতে জন্ম আমার

উপক্রমণিকা

সেদিনকার কথা নিশ্চয়ই মনে আছে সবার।

'কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে বাঁশী সঙ্গীতহারা, অমাবশ্যার কারা। সারা দেশ নিস্তব্ধ।'

মানুষের কণ্ঠরোধ করে দেওয়া হয়েছে। বাংলা দেশ লক্ষ গ্রাম অমাবস্যার কালিমায় ঢাকা পড়ে আছে। এই তো বেশি দিন আগের কথা নয়।

ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের সামনে এসে থামল একটি মিলিটারি গাড়ি। সৈন্যরা নেমে সঙ্গিন উচিয়ে দাঁড়াল জেলগেটের সামনে। একি দুর্যোগের ঘনঘটা।

ভেতরে নিঃসঙ্গ এক বন্দী। নিরাপত্তা আইনে তিলে তিলে দহন করা হয়েছে তাঁকে। এ দহন জ্বালাময়ী, কিন্তু ইস্পাতকে অঙ্গার করতে পারেনি বন্দীশালার সে দহন। নিঃসঙ্গতা এক পলকহীন প্রহরীর মতো প্রতিদিন এসে পায়চারি করেছে লোহার গারদের বাইরে। এমনি করে কেটে গেল দুটো বছর।

তারপর একদিন এল জেলার। বলল, তোমার আজ মুক্তি।

মুক্তবিহঙ্গের মতো যেন পাখা মেলে উড়ে যেতে চায় নিঃসীম আকাশের পানে। তবুও কোথায় যেন এতটুকু অবিশ্বাসের মেঘ ছায়া ফেলে রাখে। অর্ফিয়াসের বাঁশির মতো বেজে ওঠে না কেন মুক্তির গান। বন্দী জেলগেটের বাইরে এসে দাঁড়ায়। সঙ্গিনধারী সৈন্য এসে বলে, এটুকু ছিল প্রহসন। তুমি আবার বন্দী হলে। চলো এবার আমাদের সাথে।

কতদূর? কোথায়? কোন সে সীমানায় নিয়ে যাবে, সুদূরের অন্তরালে? কত দিন রাখবে সেথায়? জবাব মেলে না।

সেই গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে জেলগেটের পথের মাঝে বন্দী একটি ছোট্ট অনুরোধ জানায়।

শুধু এক মুহূর্ত সময় দাও আমায়।

তারপর কারাগারের সামনে এক মুঠি ধুলো তুলে কপালে স্পর্শ করে মোনাজাত জানায় সবার অলক্ষে যিনি আছেন তাঁর উদ্দেশে।

-এই দেশেতে জন্ম আমার যেন এই দেশেতে মরি।

কারাগারের ফটক বন্ধ হয়ে গেল। বন্দী শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে মিলিটারি ট্রাক ছুটে চলল কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টের উদ্দেশে। প্রহসনের এখানেই শেষ নয়। যবনিকা উঠল আরেক প্রহসনের। পাকিস্তানের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় প্রহসনের। পাকিস্তানের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় প্রহসন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা : শুরু হলো।

সেদিন সারা দেশ স্তব্ধ হয়ে দেখছিল এই নাটকীয় অপমানের দৃশ্য।

কিন্তু বছর না ফুরোতে পটপরিবর্তন হলো। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শিক্ষার্থীরা হলেন পদাতিক। ঢাকা নগরী হলো ছাউনি। ব্যারিকেড। বার্বডঅয়্যার। মিছিল, মশাল আর সান্ধ্য আইন। সেদিন বাংলা দেশের আরেক নাম হলো সংগ্রাম। মুক্তিপাগল ছিনিয়ে আনা প্রমত্ত বন্যার মতো জনতা গিয়ে দুহাতে উঁচু করে নিয়ে এল অনেক বন্দীকে। যাত্রাপথের জয়ধ্বনি মৃদঙ্গের মতো ডাক দিয়ে যায়।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে তখন। সারা দিনের কর্মকোলাহলের পর নিঃশেষিত পৃথিবীতে নেমেছে আসন্ন রাতের নিস্তব্ধতা।

এই নিস্তব্ধতা ভেঙে শোনা যাচ্ছে শুধু এক জোড়া পায়ের শব্দ। ভাঙা নদীর

পাড় ধরে একটি ছোট ছেলে দৌড়ুচ্ছে প্রাণপণে। ঘরে ফিরতে হবে তাকে তখনই। সন্ধ্যার শেষ আলোটুকু আকাশে মিলিয়ে যাওয়ার আগেই তাকে পৌঁছাতে হবে গাঁয়ের সীমানায়।

উঁচু পাড় থেকে শুকিয়ে যাওয়া নদীর মাঝখানে ক্ষীণধারা স্রোতটুকু দেখে মনে হয় লাটিমের রুপালি সুতো কেউ ফেলে রেখে গেছে সেখানে। বিশীর্ণ নদীর ভাঙা পাড় থেকে শুরু হয়েছে অসমতল জমির বিস্তৃতি। কোথাও কলাইয়ের খেত। আবার কোথাও বুটছোলার সবুজ শস্যে মাঠ ভরে গেছে। মাঝে মাঝে খড়ের ছাউনিঢাকা রাতপ্রহরীদের টুঙ্গি। শীতের পহর রাতে ঘুমজড়ানো চোখে কিষাণ বসে এখানে পাহারা দেয়। দূরের মাঠে মাঠে ছায়ার মতো লোকগুলো নাড়া পোড়াচ্ছে। অতিকায় এক ঘোড়ার পেখমতোলা পুচ্ছের মতো খড়ের ধোঁয়া আকাশজুড়ে ভাসছে।

কাছের একটি টুঙ্গি থেকে একটি রাখাল ছেলে বেরিয়ে এল। কয়েক গোছা ছোলা তুলে নেয় সে খেত থেকে। নদীর ধারে চারজন লোক বসেছে খড়ের আগুন পোয়াতে।

বুড়ো একজন লোক জিজ্ঞেস করলো, 'কিরে তুই আইজ টুঙ্গিতে থাকবি নাকি রে।'

ছোলা হাতে ছেলেটি এসে পাশে বসে। আগুনে ছোলা পোড়াতে পোড়াতে বলে, 'না বাজান হাটে গেছে। বাজান আইলেই আমি যামুগা।'

নদীর ধার ধরে কৃশকায় ছেলেটি দৌড়ুতে থাকে। এর বেশি শোনার আর সময় নেই তার। সে নিজেও গিয়েছিল হাটে। মাইল তিনেক দূরে শনিবারের হাট বসে। কত দূরদূরান্ত থেকে লোক আসে সেখানে। চালের কারবারি। গুড়ের সওদাগর। নৌকো ঘাটে বেঁধে তক্তার ওপর দিয়ে ভারী পিপেগুলো নামায়, কুলিরা শোরগোল করে। এসব দেখতে বড় ভালো লাগে তার। পারের ওপর দাঁড়িয়ে দুচোখ ভরে দেখে ছোট ছেলেটি এই দৃশ্য। মরসুমের সময় বড় বড় পাটবোঝাই নৌকো পাল তুলে আসে উজান দেশ থেকে। পানি ছুঁয়ে যায় বোঝাই নৌকোর গলুই। ছোট ছেলেটি পারে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে ভাবে, এসব নৌকো ডোবে না কেন।

এমনি তাদেরও নৌকো ছিল। বুড়ো দাদার মুখে সে কত গল্প শুনেছে তাদের নৌকোগুলোর। দুকুড়ি, তিন কুড়ি নৌকোর বহর। ভারী দূরপাল্লার মালটানা বজরার গল্পকাহিনি।

দাদা সাহেব দাওয়ায় বসে ফরাসি হুক্কায় তামাক খেতেন। আর গল্প করে বলতেন বিগত দিনের কথা। তাঁর প্রবল পরাক্রান্ত বাবা শেখ ওয়াসিমুদ্দিনের কথা। ছোট ছেলেটি পাশে বসে সেই সব গল্প অবাক বিস্ময়ে শুনেছে।

শেখ ওয়াসিমুদ্দিনের নৌকো মাল নিয়ে যেত কলকাতায়। ইংরেজের ব্যবসার প্রাণকেন্দ্র তখন কলকাতা শহর। ঢাকা থেকে, ফরিদপুর থেকে, সিরাজগঞ্জ থেকে মাল যেত কলকাতায় নৌকো করে। নীল, রেশম, মসলিন, পাট, গুড়। ওয়াসিমুদ্দিনের বজরা গিয়ে ঠেকত উল্টো ডাঙার ঘাটে। সেখান থেকে মাল উঠত হুগলি নদীর জাহাজে। সাগর পাড়ি দিয়ে যেত বিদেশের বাজারে বাংলা দেশের পণ্য।

'একবার লাগল ঝগড়া ইংরেজ সাহেবের সাথে।' দাদাসাহেব গল্প শুরু করেন।

শুরু হয় মোকদ্দমা। অনেক টাকাপয়সার খরচ। খুলনার আলাইপুর পুল নীলকর সাহেবের চাই। সে যুগে ইংরেজ নীলকর যা চাইত, তাই পেত সে। এ পুল নিজের এক্তেয়ারে আনতে পারলে সাহেব তার ওপর ট্যাক্স বসাতে পারবে। নেটিভদের যাতায়াত বন্ধ করতে পারবে সে ইচ্ছেমতো।

কিন্তু ওয়াসিমুদ্দিন এ ব্যবস্থা মেনে নিতে পারলেন না।

তিনি বললেন, এত বড় অন্যায় হতে দেব না। এ পুল সবার ব্যবহারে লাগবে। সুতরাং আলাইপুরের পুল সাহেবকে দেওয়া চলতে পারে না।

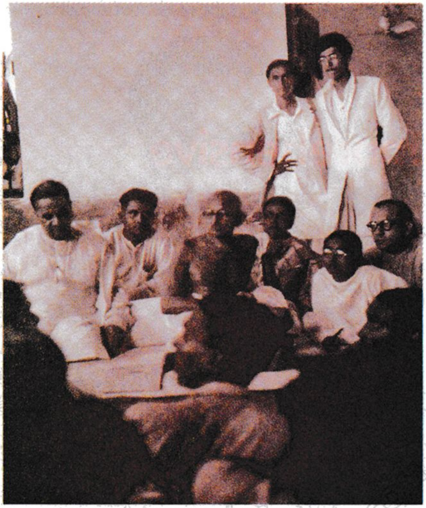
শুরু হলো মামলা। উকিল-মোক্তার এল। চলল সলাপরামর্শ। সাহেব ঝানু লোক। শাসিয়ে গেলেন, গোরার বিরুদ্ধে মামলা করে কখনো জিততে পারবে না।

কিন্তু ওয়াসিমুদ্দিন নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত কেটে নথিপত্র দেখে হাকিম রায় দিলেন ওয়াসিমুদ্দিনের পক্ষে। মামলায় হেরে গেল শ্বেতাঙ্গ সাহেব। ফাইন দিতে হবে তাকে।

ওয়াসিমুদ্দিন কোর্টে দাঁড়িয়ে বললেন, 'অর্থের লোভ আমার নেই। ন্যায়বিচার যে আমি পেয়েছি, তাতেই



টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর আদি পৈতৃক বাড়ির বর্তমান রূপ



মহাত্মা গান্ধী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে তরুণ শেখ মুজিব, ১৯৪৭

আমি খুশি। সে জন্য নমুনাস্বরূপ একটি পাই পয়সা, জরিমানা আমি দাবি করছি।'

কেঁপে উঠল ইংরেজ সাহেবের বুক। এ তো নিদারুণ শাস্তি। ইংরেজ হয়ে একজন কালা নেটিভের জরিমানা তাকে দিতে হবে। সে কী করে হয়।

সাহেব অনুরোধ জানাল ওয়াসিমুদ্দিনকে, 'তোমার যত টাকাপয়সা লাগে আমি দেব তবু আমাকে জরিমানা কোরো না। আমি একঘরে হয়ে যাব ইংরেজ সমাজে। লজ্জায় মুখ দেখাতে পারব না আর কাউকে।'

ওয়াসিমুদ্দিন অটল।

'ইংরেজ সাহেবকে জরিমানা দিতে হয়েছিল শেষ পর্যন্ত। তিনি মেয়ের বিয়ে দিতে পারেননি এই জন্য।' দাদাসাহেব গল্প শেষ করেন।

নদীর ধারে হাটে প্রতি শনিবারেই ছোট ছেলেটি আসত। পিতলের থালা পিঠে শব্দ করে লাঠিয়ালরা খেলা করত হাটের ধারে খোলা মাঠে।

জীবন পরামানিক। সলু শেখ। হাদী দরজি। এরা সবাই লাঠি ধরতে পারত মরদের মতো, মাথায় তাদের থাকত ঝাঁকড়া চুল। সারা গা বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরত। কালো পাথরে খোদাই মূর্তির মতো সুন্দর তাদের দেহ। কত রকমের লাঠির খেলা দেখাত তারা। বনবন করে মাথার ওপর ঘুরত পাকা বাঁশের লাঠি। খটাখট শব্দ উঠত মাঠ থেকে। এ শব্দে যেন জাদু ছিল। ছোট ছেলেটি ছুটে যেত এই শব্দ শুনলেই।

তবে সবার চেয়ে ভালো লাগত তার একজনকে। যার জন্য প্রতি শনিবার স্কুলের ছুটির পর তিন মাইল হেঁটে চলে আসত হাটে। মুকিম মুন্সি ছিল তার কাছে রূপকথার রাজ্যের যুবরাজ। মুকিম হাটুরে গায়েন। সুর করে গান ধরত সে হাটের মাঝে। হাতের একতারায় আঙুলের স্পর্শে মূর্ছনা জাগাত। মাথা নেড়ে নেড়ে সে গান গাইত। অপূর্ব সে গানের সুর। সব কথা না বুঝলেও ছোট ছেলেটির মনে মুকিম মুন্সির গানগুলো গভীর আবেদন সৃষ্টি করত।

মুকিম গাইত এ দেশের গান। এখানকার মাটির মানুষের গান। তাদের সুখদুঃখের গান। ধান কাটার কাহিনি থাকত সে গানে। থাকত কুচবরণ কন্যা আর তার মেঘবরণ কেশের কথা, থাকত তেপান্তরের মাঠ আর পঙ্খীরাজ ঘোড়ার কথা।

বিভোর হয়ে শুনছিল মুকিম মুন্সির মুখের গান ছেলেটি। কখন বেলা ডুবে গেছে টেরই পায়নি সে। ঘরে ফিরতে হবে তাকে সন্ধ্যের আগে।

নদীর ভাঙা পাড় ধরে কলইখেতের পাশ দিয়ে ছেলেটি ছুটতে থাকে। সূর্য তখন নেমেছে পাটে।

চোখে তাঁর পুরোনো দিনের স্মৃতি। শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর অতীত জীবনের হারিয়ে যাওয়া দিনগুলো খুঁজছিলেন মনের আনাচকানাচে। বাইরে শীতের হিমেল সকাল। ভোরের কুয়াশায় ভরে গেছে সামনের রাস্তাটি। সকাল সাড়ে সাতটায় তাঁর বাড়িতে গিয়ে আমি উপস্থিত হলাম। ধানমন্ডির পথে দুএকটা লোক সবে বেরিয়েছে। লেকের পাড়ে গাছগুলোর পাতা ভিজে গেছে। সারা রাত ধরে নিঃশব্দে শিশির পড়েছে মাঠে। লেকের ঢালু কিনারায়।

কথা হচ্ছিল হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সম্পর্কে।

শেখ মুজিবুর রহমান বললেন, 'শহীদ সাহেবকে অনেকে চিনতেন না। কী বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন তিনি।'

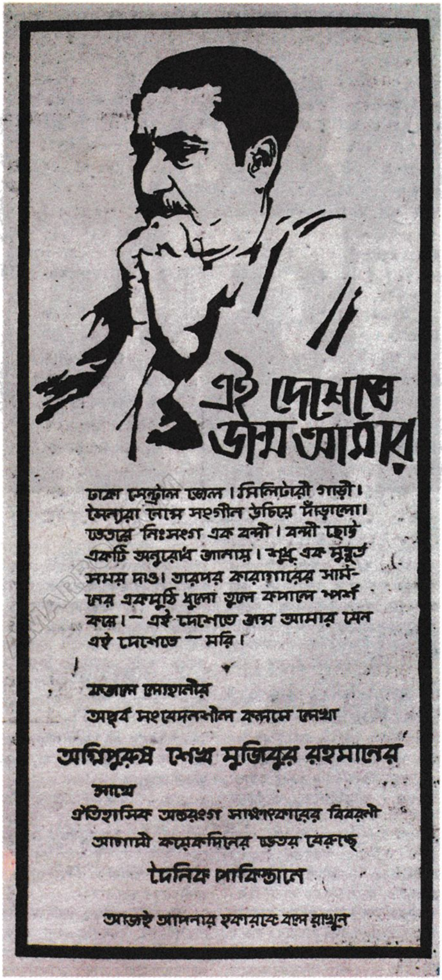
পুরোনো দিনের কথা। পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে যে পুরুষের এতখানি সংযোগ ছিল, যিনি প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় দেশ থেকে বহুদূরে মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁর সম্পর্কে কথা বলছিলেন শেখ সাহেব।

প্রশ্ন করলাম, 'অনেকে বলেন যে শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন ওপরতলাকার মানুষ।'

শেখ সাহেব জবাব দিলেন, 'যিনি শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে ব্যক্তিগতভাবে জেনেছেন তিনি এ ধরনের কথা বলবেন না।'

কত গভীরভাবে যে তিনি সাধারণ মানুষকে ভালোবাসতেন, সে কথা তাঁর সংস্পর্শে যে এসেছে সেই জানে। তিরিশ দশকের কলকাতার কথা। সুপুরুষ অমিততেজ যুবক শহীদকে দেখা যেত কলকাতার শহরতলির বস্তি এলাকা খিদিরপুর, মেটিয়াবুরুজ, রাজা বাজারে। শ্রমিকদের খোলার ঘরে, বস্তির ঘিঞ্জি চা-এর দোকানে। তিনি বসে আছেন বস্তিবাসীর মাঝে। তাঁদের কথা শুনছেন। তাঁদের বিপদে-আপদে এগিয়ে যাচ্ছেন। কাউকে হাসপাতালে নিতে হবে। কারও চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে। শ্রমিক দল গঠন করতে হবে কোথাও, এসব ব্যাপারে শহীদ সোহরাওয়ার্দী রয়েছেন সর্বাগ্রে।

'উনিশ শ সাঁইত্রিশে বাংলাদেশের মন্ত্রিসভায় শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রথম শ্রম দপ্তর বলে পোর্টফোলিওটি খোলেন। এর আগে সরকারের কোনো শ্রম দপ্তরই ছিল না। ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্ট প্রণয়নকারীদের অন্যতম ছিলেন তিনি,' শেখ সাহেব বলতে থাকেন।



দৈনিক পাকিস্তান-এ বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎকারের বিজ্ঞাপন

শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কথা বলতে বলতে শেখ সাহেবের চোখ দুটো আর্দ্র হয়ে আসে গভীর বেদনায়।

'তিনি আমাকে ছেলের মতো ভালোবাসতেন। ১৯৪১-এর পর থেকে আমি সব সময়েই পাশে থাকতাম।'

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বিভাগপূর্ব ভারতে রাজনীতি শিখেছেন। তাঁর রাজনৈতিক প্রেরণার উৎস তিনি খুঁজে পেয়েছেন ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় উদারনৈতিক চিন্তাধারার মাঝ থেকে। সে যুগে ব্রিটিশ পণ্যের সঙ্গে ভারতে এসেছিল স্বাধীনতার মন্ত্রবাণী। মধ্যবিত্ত ভারত বুকে টেনে নিয়েছিল সেই আগুন জ্বালানো কথামৃত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইউরোপীয় শিক্ষার আলো যাঁরা পেয়েছিলেন, তাঁরাই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের পুরোধা হলেন। ব্যারিস্টার মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। তাঁর উত্তরসূরি ব্রিটিশ পাবলিক স্কুলের ছাত্র জহরলাল নেহরু। সিংহলে ছিলেন ব্যারিস্টার বন্দরনায়ক। এ যুগের সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লি কিউ ইয়ন, এরা সবাই ব্রিটেনেই তালিম নেন উদারনৈতিক মতবাদের। এই রাজনীতিরই ধারাবাহক ছিলেন ব্যারিস্টার হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। এরা যুগ উত্তরণের এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করে গেছেন। শহীদ সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় সে যুগেরও পরিসমাপ্তি ঘটল।

শহীদ সাহেবের সাহস, আত্মত্যাগ আর মনোবলের প্রশংসা মাওলানা ভাসানীও করেছেন।

শহীদ সোহরাওয়ার্দী বাংলা দেশের মানুষকে ভালোবাসতেন গভীরভাবে।

শেখ সাহেব বললেন, এ মমত্ববোধ ছিল প্রাণউৎসারী। এতে কোনো খাদ ছিল না।

মৃদু হেসে তিনি বললেন, একটি কবিতা শহীদ সাহেবের খুব প্রিয় ছিল। দূরে কোথাও যাওয়ার সময় গাড়িতে একা একাই তিনি গুনগুন করে গাইতেন, এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি...

গণতান্ত্রিক আন্দোলন আজ নতুন দিকে মোড় ফিরিয়েছে—এ পথের কথা সোহরাওয়ার্দী হয়তো ভেবেছিলেন। কিন্তু তিনি জীবিত থাকতে এই নতুন উত্তরণ দেখে যেতে পারেননি।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে আওয়ামী লীগ সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল নয়। আওয়ামী লীগ আজ সমাজতান্ত্রিক আদর্শের কথা বলছে। কোন পথে সে আদর্শ বাস্তবে রূপান্তরিত হবে, তা শুধু ভবিষ্যৎই বলতে পারে। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই, এককালে সমাজতন্ত্র ছিল এ দেশে একটি নিষিদ্ধ শব্দ। এ নিয়ে যাঁরা চিন্তা করতেন, তাঁরা শাসকের তর্জনীর ভয়ে ছিলেন ম্রিয়মাণ। কিন্তু আজ সর্বসাধারণের প্রকাশ্য বক্তব্যের উপাদান হয়ে দাঁড়িয়েছে শব্দটি।

আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টোতে রয়েছে—আওয়ামী লীগের আদর্শ স্বাধীন, শোষণহীন ও শ্রেণিহীন সমাজব্যবস্থা কায়েম করা।



১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর উন্মূল মানুষের মিছিল

সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মাধ্যমেই বর্তমানের শোষণ, বৈষম্য, অবিচার ও দুর্দশার হাত থেকে দেশকে মুক্ত করা সম্ভব বলে আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকল্পে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা কায়েম করা আওয়ামী লীগের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

প্রশ্ন করলাম, এই আদর্শ হচ্ছে একটি বিপ্লবধর্মী আদর্শ। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ছাড়া এই আদর্শ নির্বাচনের মাধ্যমে বাস্তবে রূপায়িত করা যাবে কি?

শেখ মুজিব বিশ্বাস করেন বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচনই অগ্রগতির পথ। এ মতের সপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে তিনি বলেন যে যুগ বদলে গেছে। দুনিয়ার পরিবর্তন হয়েছে। সোভিয়েত রাশিয়ার কুলাকের অত্যাচার, জারের দুর্জয় শাসন ছিল। অর্থোডক্স চার্চের চরম গুঁড়িতে মানুষকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা হয়েছিল। রাজার বিরুদ্ধে কথা বললে গর্দান যেত। সেখানেই বিপ্লব করে পরিবর্তন আনতে হয়েছে। রাশিয়ার বিপ্লব ছাড়া কোনো উপায় ছিল না।

আজ অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। আজ জনসাধারণ বুদ্ধিসচেতন, শেখ বললেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ঐতিহাসিক যুগ পরিবর্তনের শুরু। চীনে বিপ্লবের মাধ্যমে পুরোনো ব্যবস্থা বদলানো হয়েছে। ভিয়েতনামে মুক্তিযুদ্ধ চলছে। সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে আফ্রিকার পূর্বতন কলোনিগুলো। আলজেরিয়ায় জনগণতন্ত্রের পরীক্ষা চলছে। কিন্তু এসব দেশে সমাজতন্ত্র কায়েম হয়নি এখনো। কিন্তু যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের জোয়ার এসব দেশে এসেছে তাকে ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে না দেখলে ভুল করা হবে। উত্তরণের যুগে এই ধারার পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে কি না, তা যুক্তিসাপেক্ষ।

গত এগারোই জানুয়ারি পল্টনের জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম পেশ করেছেন এই বলে যে, মূল শিল্পগুলো, ব্যাংক ও বিমা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হবে।

আওয়ামী লীগ ম্যানিফেস্টোর শিল্পপর্যায়ের বক্তব্যেও বলা হচ্ছে, ব্যাংক, বিমা, গুরুত্বপূর্ণ যানবাহন ও যোগাযোগ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ জনস্বার্থমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহও জাতীয়করণ করা হবে এবং বৈদেশিক বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্তাধীনে পরিচালিত হবে।

এই ব্যাপারে সুস্পষ্ট একটি ধারণার দরকার রয়েছে। বর্তমান ঘোষণার সূত্র ধরে যদি বলা যায়, পাকিস্তানের বিভিন্ন পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ তাদের নিজস্ব অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বেছে নেবে। তাহলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, বিমা ও মূল শিল্প অন্যান্য প্রদেশেও সম্ভব কি না? জাতীয়করণ ব্যবস্থা কি প্রতিটি প্রদেশেই বিস্তৃত হবে? যেহেতু, প্রদেশগুলো স্বায়ত্তশাসিত এবং কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা একটি প্রদেশ বেছে নেবে, তার অধিকার প্রদেশের রয়েছে। সুতরাং জাতীয়করণ ব্যবস্থা পাকিস্তানের সব অংশের জন্য চালু করার অধিকার কি কেন্দ্রের থাকবে?

এ ব্যাপারে শেখ মুজিব মনে করেন যে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের জনসাধারণও আজ একচেটিয়া পুঁজিপতি ও বুর্জোয়াসামন্ত শ্রেণির হাতে নিগৃহীত।

সেখানেও গণতান্ত্রিক আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠেছে।

তাঁরাও চাইবেন জাতীয়করণের সুফল ও সংগতি পাকিস্তানের সব অংশে পরিব্যাপ্ত হোক, শেখ সাহেব বললেন।

যে রাষ্ট্রের সমাজ বিন্যাসে বুর্জোয়া শ্রেণি ও একচেটিয়া পুঁজিপতির অস্তিত্ব থেকে যাচ্ছে, সেই রাষ্ট্রে এ ধরনের জাতীয়করণ প্রোগ্রামের সত্যিকারের সুফল আশা করা যায় কি?

শেখ মুজিবুর রহমান বললেন, পাকিস্তানে একচেটিয়া পুঁজির যে কার্টেল সৃষ্টি হয়েছে, তা ভাঙার জন্যই ব্যাংক, বিমা ও মূল শিল্পগুলো জাতীয়করণের

কথা বলা হয়েছে। একচেটিয়া ধনতন্ত্রের সর্বগ্রাসী কর্তৃত্ব ভেঙে দেওয়ার প্রথম ব্যবস্থা হবে এর মাধ্যমেই।

একই ধরনের আরও কয়েকটি প্রশ্ন মনে জাগছিল। জিজ্ঞেস করলাম, আওয়ামী লীগ ম্যানিফেস্টোতে কৃষিনীতির ব্যাপারে বলা হয়েছে, সমবায় পদ্ধতিতে দেশে যৌথ চাষাবাদের পালন করতে হবে।

পূর্ণ প্ল্যানিংয়ের মাধ্যমেই আওয়ামী লীগের কৃষিনীতির বাস্তব রূপান্তর সম্ভব হবে বলে শেখ মুজিব অভিমত দেন।

আরেকটি প্রশ্ন করলাম, আমলাতন্ত্র আমাদের দেশে একটি বিশেষ শ্রেণি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই আমলাতন্ত্রের ওপর নির্ভর করে আওয়ামী লীগের পরিকল্পনাগুলো বাস্তবে রূপায়ণ করা কি সম্ভব হবে?

শেখ সাহেব জবাবে বললেন, যে আমলাতন্ত্র জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য কাজ করবে না, তাকে শেষ পর্যন্ত সরে পড়তে হবে।

শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের প্রাথমিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত দেশের রাজনৈতিক অবস্থার মোড় অনেকখানি বদলে গিয়েছে। আওয়ামী লীগের সামনে আজ একটি লক্ষ্য-ওয়েলফেয়ার স্টেট। এ লক্ষ্যে পৌঁছাতে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের হয়তোবা শেষ পরীক্ষা এখন চলছে। আশার বৃক্ষের শাখায় ফল ঝুলছে, এক ফল কে পেড়ে আনবেন, তার সঠিক উত্তর পাওয়া সম্ভব নয়। এ ফল অবশ্য আপনা থেকে যে কখনো টুপ করে পড়বে না, তাও জানা কথা।

বাইঘা নদীর পানি অনেক জায়গায় শুকিয়ে গেছে। গিমাডাঙা স্কুলের টিনের চাল চোখে পড়ে। ছোট ছেলেটি যখন টুঙ্গিপাড়ায় ফিরে এল তখন সন্ধ্যার কালো আঁধারে ঢাকা পড়ে গেছে টুঙ্গিপাড়ার মসজিদ, বাড়ি।

পিতা শেখ লুৎফর রহমান এশার নামাজ শেষে মাদুর গুটিয়ে উঠে পড়লেন। বাইরে পড়ার ঘরে লণ্ঠন বাতি জ্বলছে।

বাড়ির ছেলেরা বাতির চারপাশ ঘিরে গোল হয়ে বসে সুর করে পড়া শুরু করে দিয়েছে।

মুজিবের গলার স্বর শোনা যায়। নামতা পড়ে সুর করে।

তারপর দীর্ঘ সময়ের অতিক্রমণ।

গিমাডাঙা স্কুলের পড়া শেষ। বারো মাইল দূরে গোপালগঞ্জ। মিশন স্কুলে নিয়ে গেলেন পিতা পালক পুত্রকে ভর্তি করার জন্য।

উনিশ শ চৌত্রিশ সাল এল।

সে যুগে বাংলা দেশে এক ধরনের রোগের কথা শোনা যেত। বেরিবেরি। ভিটামিন 'বি'র স্বল্পতার দরুন এ রোগ হতো। হার্ট দুর্বল করে ফেলত এ রোগ। পা ফুলে যেত। আর চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকত। মুজিব তখন মিশন স্কুলের ক্লাস সেভেনের ছাত্র। বেরিবেরির আক্রমণে শয্যাশায়ী হলো বালক ছাত্র। বাবা নিয়ে গেলেন তাকে কলকাতায়। চোখ অপারেশন করতে হয়েছিল তাকে। তিন বছর পড়াশোনা নষ্ট হয়েছিল তার।

রোগমুক্তির পর মিশন স্কুলে আবার ফিরে এল মুজিব।

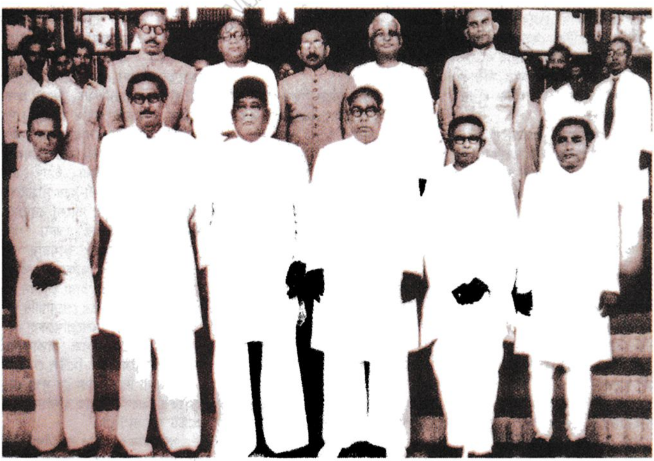
উনিশ শ আটত্রিশ।

বাংলার তখন নবজাগরণের শুরু। উনিশ শ ছত্রিশের ভারত শাসন আইন পাস হয়ে গেছে। প্রদেশে প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে।

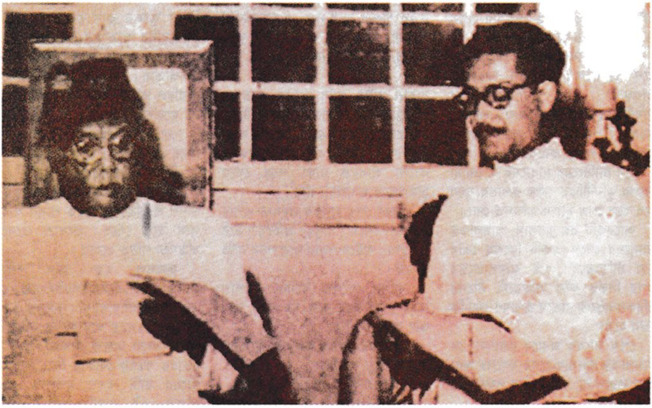
ফজলুল হক আর শহীদ সোহরাওয়ার্দী এলেন গোপালগঞ্জে। সে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। দূরদেশ থেকে খেতচাষী, গেরস্থ আর হাটের কামলারা এল ফজলুল হককে দেখতে। এক শ বছরের ঋণের বোঝার নিচে বাংলার গাঁয়ের চাষি তখন মৃতপ্রায়। হক সাহেব—এই নামটি তাদের কাছে আশার ধ্রুবতারার মতো জ্বলছে। মহাজন আর জমিদারের ঋণ চাষির মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে।

হক সাহেবের সঙ্গে শহীদ সোহরাওয়ার্দী। বয়োজ্যেষ্ঠের সঙ্গে বসেছেন মন্ত্রিসভার নতুন সদস্য।

ঘুরে ঘুরে তাঁরা মিশন স্কুল দেখছেন। হেডমাস্টার ছাত্রদের আগেই তালিম দিয়ে নিয়েছেন। মানপত্র পেশ,



১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা



পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর এ কে ফজলুল হক মন্ত্রী হিসেবে শেখ মুজিবকে শপথবাক্য পাঠ করাচ্ছেন, ১৯৫৬

সংবর্ধনা সভা। সবই বেশ সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এবার মাননীয় অভ্যাগতদের ফিরে যাওয়ার পালা।

কয়েকজন ছাত্র সাথে নিয়ে এসে দাঁড়াল একজন ছিপছিপে কৃষ্ণাঙ্গ কিশোর। মুজিব মেহমানদের পথ আগলে দাঁড়াল।

'আপনাদের যেতে দেব না এখন' নির্ভয়ে কথা বলে ওঠে কিশোর ছাত্র। এত সাহস কোথা থেকে এল মিশন স্কুলের এই ছাত্রটির। হেডমাস্টার বিরক্ত হয়ে ওঠেন বাংলার প্রধানমন্ত্রীর সামনে।

'কী করছ মুজিব, সরে দাঁড়াও। দেখছ না অতিথিরা যাবেন এখন', হেডমাস্টার বলেন।

'না।' অস্বীকার, অগ্রাহ্যের প্রতীক এই 'না'। মিশন স্কুলের বারান্দায় এই শব্দটি যেন এক সঞ্জীবনী নবচেতনায় স্পন্দিত হয়ে ওঠে। সঙ্গী ছাত্রদের প্রাণে আশার সঞ্চার করে শব্দটি। তারাও এগিয়ে এসে দাঁড়ায় মুজিবের পেছনে।

'আমাদের হোস্টেলের ছাদ দিয়ে পানি পড়ছে। আপনারা কথা দিন ছাদ সারিয়ে দেবেন। তারপর এখান থেকে যেতে পারবেন আপনারা।'

এ যে কিশোর ছাত্রের অলঙ্ঘনীয় দাবি। এ দাবি উপেক্ষা করা যায় না।

মন্ত্রী দুজন নীরবে হাসতে থাকেন। দাবি মঞ্জুর।

অভ্যর্থনার শেষে শহীদ সোহরাওয়ার্দী ডেকে পাঠান কিশোর ছাত্রকে একান্তে। মুজিব গিয়ে দাঁড়ায় সোহরাওয়ার্দীর বাংলোর সামনে। এই প্রথম শিষ্য গুরুর সাক্ষাৎ পায়। এ যেন হঠাৎ করে দেখা। সোহরাওয়ার্দী খুঁজছিলেন এমন একজনকে, যাকে সঙ্গে নিয়ে দুস্তর পারাবার অতিক্রম করা যায়।

গোপালগঞ্জের মিশন স্কুলে সেই অপরাহ্নের আশ্চর্য আলোয় একজন অভিজ্ঞ কামার খুঁজে পেলেন একটা ছোট্ট লোহার খণ্ড। একে প্রত্যক্ষ রাজনীতির আগুনে তাঁতিয়ে শাণিত অস্ত্রে পরিণত করতে হবে। সোহরাওয়ার্দী এই প্রথম তাঁর একলব্যকে খুঁজে পেয়েছেন। একে ছাড়া যাবে না কখনো।

কলকাতায় ফিরে গিয়ে তিনি চিঠি লেখেন মুজিবকে। শুরু হয় ছাত্রের রাজনীতি পাঠ।

খণ্ড খণ্ড ঘটনা। তুলির অসংলগ্ন আঁচড়ের মতো মনে হয় জীবনপটে। শহরের পথে এক রুগ্‌ণ বৃদ্ধা পড়ে আছে ধুলোর মাঝে। পথ দিয়ে কত লোক চলে যাচ্ছে। কিন্তু কেউ লক্ষ করছে না তাকে। অমন কত ভিখিরিই তো পথে পড়ে মৃত্যুর অপেক্ষা করে প্রতিদিন।

কিন্তু কী হলো সেদিন। এক নবীন কিশোর এসে দাঁড়াল বৃদ্ধার পাশে।

'মা, তোমার কী হয়েছে? কেন তোমার চোখে পানি?'

অস্পষ্ট দৃষ্টি নিয়ে বৃদ্ধ তাকায় সামনে দাঁড়িয়ে থাকা প্রশ্নকারীর দিকে। কিশোরের প্রশ্নে কত দরদ, কত মমতা রয়েছে ছেলেটির চোখে।

মাটি থেকে রুগ্‌ণ বৃদ্ধাকে তুলে নেয় ছেলেটি। দুহাতে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে সে পরিত্যক্ত ভিখারিনীকে সযত্নে।

'চলো মা তোমায় হাসপাতালে নিয়ে যাই। এখানে পড়ে থাকলে তো আর চলবে না।'

নিঃস্ব নারী অজেয় পুত্রকে আশীর্বাদ করে।

'আল্লাহ্, তোমার ভালো করবেন, বাবা।'

দেশ স্বাধীন হলো। নবাব, নাজির, উজিররা এসে পাকিস্তানের তখ্‌তে বসলেন। তদানীন্তন ভারত সরকারের নয়াদিল্লির অফিসে যাঁরা চাকরি করতেন, তাঁদের ভেতর এমন অনেকেই ছিলেন যাঁরা লোকজন, ভিড়, জনতা মিছিল কখনোই পছন্দ করতেন না। ব্রিটিশ সরকার বাহাদুরের অপূর্ব করুণাকীর্তন করতেই যাঁদের সকাল-সন্ধ্যা কাটত তাঁরা হঠাৎ এসে পাকিস্তানের রক্ষাকর্তা হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁরাই সবার চেয়ে ভালো বোঝেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য দিল্লি কলকাতার সরকারি কামরায় বসে পাখার তলায় যাঁরা থাকতেন, তাঁদের সে ঘাম ব্যর্থ হতে তাঁরা দেবেন না। সংকল্প করলেন সিল্কের শেরোয়ানি পরা, আদ্দির কুর্তা পরা দেশপ্রেমিকেরা।

রাস্তা দিয়ে সবুজ পতাকাবাহী সাধারণ মানুষের কত মিছিল যেত।

জানালা দিয়ে তাঁরা সে দৃশ্য দেখে বলতেন, 'এগেইন দোজ হুলিগানস আর আউট অন দ্য স্ট্রিট।'

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এঁরাই এসে সামনের সারির চেয়ারগুলো দখল করে বসলেন।

কায়েদে আজমের নেতৃত্বে ভারতের দশ কোটি মুসলমানের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সংগ্রাম করে পেয়েছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হলো। উনিশ শ আটচল্লিশে কায়েদে আজম মারা গেলেন।

দেশের জননেতারা তখন কোথায়? পূর্ব পাকিস্তান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে দেশদ্রোহী বলে। মাওলানা ভাসানী এখানকার রাজনীতিতে অপাঙ্‌ক্তেয়।

বই বাজেয়াপ্ত করার হিড়িক পড়ে গেছে দেশে। সংবাদপত্রের বুকে পা রেখে দাঁড়িয়েছে পরাক্রান্ত পুলিশ। মিছিল নিষিদ্ধ। মানুষের মুখ বন্ধ।

কোথায় গেল উড়ে গরিব মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার? নদী শিকস্তি চরের মানুষ, বাংলার গাঁয়ের চাষি, খেতমজুর, গঞ্জ-বাজারের নিঃস্ব দোকানদাররা ভালো করে বুঝে ওঠার সময় পেলেন না তাঁদের সর্বনাশ কী করে হলো।

সাতচল্লিশ থেকে সত্তর। বাইশটি বছরের শেষ। বাইশটি হৃদয় নিংড়ানো, জ্বালাময়ী, ব্যথাদীর্ণ ক্লেশময় বছর। অত্যাচার আর অন্যায়ের একটানা ইতিহাস এ কটি বছরে লেখা হয়েছে।

শেখ মুজিবুর রহমান বললেন, 'সোনার বাংলা নিঃশেষ হয়ে গেছে এ কটি বছরে। বাংলার ঘরে ঘরে আজ আর বাতি দেবার লোক নেই।'

কারা এ দুর্দশার জন্য দায়ী।

তিন বছর আগে বেলুচিস্তানে দেখা হয়েছিল এক পাঠানের সঙ্গে, নিঃস্ব হয়ে সে জনমজুরি করছে কোয়েটার রাস্তায়।

চাখানায় বসে জিজ্ঞেস করলাম ওকে ওর জীবনের কথা। প্রথমে ও কিছু বলতে চায়নি পুলিশের চরের ভয়ে। কোয়েটার বাজারে গুপ্তচর ঘুরে বেড়ায় প্রতিনিয়ত। আশ্বাস দিলাম পাঠান বন্ধুকে।

'ভয় নেই, নির্ভয়ে বলতে পারো তুমি আমাকে সব কথা।'

বেলুচরা সাধারণত সুপুরুষ। উন্নতদেহ এই মানুষগুলো পাহাড় আর শুষ্ক কঠিন মাটির বুকে জীবনের জয়ধ্বজা উড়িয়ে বেঁচে থাকে।

বলল সে তার দুঃখের পাঁচালি।

কোয়েটা থেকে শ খানেক মাইল দূরে তার এক খণ্ড জমি ছিল। ছোট জমির ওপর নির্ভর করে স্ত্রী আর দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে বেঁচে থাকা অসম্ভব। সেই ছোট্ট জমির অংশ একটু একটু করে সে বিক্রি করতে থাকে।

ক্ষুদ্র জমির অংশবিশেষ কেনার মানুষও তাহলে বেলুচিস্তানে আছে। ডিকেড অব প্রগ্রেসের কী অপূর্ব মহিমা।

বেলুচ পাঠান এমনি করেই তার একমাত্র আশার শেষ সম্বলটুকু নিঃশেষ করে ফেলে একদিন। হাতের টাকা ফুরিয়ে যায়। তারপর একদিন রাতের অন্ধকারে সে পালিয়ে এসেছে তার গাঁ ছেড়ে। প্রিয়জনদের পরিত্যাগ করে।

'তোমার ছেলেমেয়ে আর স্ত্রীর খবর কী?'

'কিচ্ছু জানি না।'

'কত দিন ধরে তুমি কোয়েটার বাজারে কুলির কাজ করছ?'

'ছ মাস।'

এই ছ মাসে এই নিঃস্ব পাঠানের প্রিয়জনেরা কী করছে? সংসার ভেঙে গেছে তার চিরতরে। ইতিহাসে বলা হয়েছে আদিযুগের মানুষ প্রথম তার পরিবার পত্তন করেছিল। কোয়েটার বাজারের পাঠান কুলি তার পরিবার



চীনের চেয়ারম্যান মাও সেতুংয়ের সঙ্গে করমর্দনরত শেখ মুজিবুর রহমান



পাকিস্তান আমলজুড়ে গণতন্ত্রকামী মানুষের মিছিলে উত্তাল ঢাকার রাজপথ

হারিয়ে ফেলেছে বেলুচিস্তানের পাহাড়ের অপর পাশে কোনো অনুর্বর ভূমিতে।

ফরিদপুর, রংপুর, পদ্মার ধারের মানুষ। চাঁদপুর আর নোয়াখালীর লোকেরা তাদের গাঁয়ের বধূকে ফেলে পালাচ্ছে। কিন্তু যাওয়ার কোনো পথ নেই।

বেলুচ পাঠান আর পলিমাটির দেশের লোক আজ ভাবছে এ কোন দেশেতে জন্ম আমার?

গল্প শুনে শেখ মুজিবের চোখ ছলছল করে উঠল।

'এ জুলুমের শেষ হবেই।'

গোপালগঞ্জে যে যুগে কংগ্রেসী ছাত্ররা খদ্দরের সাদা টুপি মাথায় দিয়ে 'কুইট ইন্ডিয়া' স্লোগান দিয়ে বেড়াতেন, সেই যুগে শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবনের শুরু। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। কলকাতায় কংগ্রেস ট্রামবাস পুড়িয়ে অসহযোগ আন্দোলন করছে। গোপালগঞ্জের দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার পড়েছে ব্রিটিশ ভারত ছাড়ো। শেখ মুজিব তখন গোপালগঞ্জ মহকুমা মুসলিম লীগ ডিফেন্স কমিটির সেক্রেটারি। আর নির্বাচিত হয়েছেন অল ইন্ডিয়া মুসলিম স্টুডেন্টস ফেডারেশনের কাউন্সিলর হিসেবে।

শেখ মুজিব সে যুগে বাংলার মধ্যবিত্ত মুসলিম ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। এই যুগের ছাত্র আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি থেকেই শেখ মুজিবের রাজনৈতিক চেতনাবোধের উন্মেষ। তখনকার বাংলার মুসলিম লীগের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য যেমন পেশাদার উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, শিক্ষক, সাংবাদিক এগিয়ে এসেছিলেন বিভিন্ন জেলা ও মহকুমা শহরগুলো থেকে। মধ্যবিত্ত মুক্তি আন্দোলনের পরমার্থ খোঁজার জন্য, তেমনি তাঁদের ঘরের ছেলেরাই প্রধানত ছিলেন মুসলিম ছাত্ররাজনীতির পুরোধা।

নবাব সিরাজউদ্দৌলার নাম কলঙ্কিত করে ব্রিটিশ ঐতিহাসিকের কল্পনাপ্রসূত ব্ল্যাকহোল ট্র্যাজেডির স্বাক্ষর বহনকারী হলওয়েল মনুমেন্ট এককালে দাঁড়িয়েছিল ইংরেজ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরী কলকাতার আপিসপাড়া ডালহৌসি স্কোয়ারের মোড়ে। বাংলার বিক্ষুব্ধ মুসলমান ছাত্রসমাজ একদিন সকালে লালদিঘির মোড়ে এসে জমায়েত হলেন।

পনেরো ফুট চওড়া আর পনেরো ফুট লম্বা একটি জায়গা কালো লোহার শেকল দিয়ে ঘেরা। তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে হোয়াইট স্টোনে গড়া হলওয়েল মনুমেন্ট। এখানেই নাকি ছোট কুঠুরিতে বন্দী করে নবাব সিরাজউদ্দৌলার হুকুমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কয়েক শ গোরা সৈন্যকে দম আটকে মেরে ফেলা হয়েছিল। ঘটনাটি সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত। উত্তরকালে প্রখ্যাত দেশীয় ঐতিহাসিকেরা যুক্তি দিয়ে এই মিথ্যাকে অস্বীকার করেছেন। পরবর্তীকালের ইউরোপীয় ইতিহাসবিদেরাও সন্দেহ প্রকাশ করেন ব্ল্যাকহোল ট্র্যাজেডির যৌক্তিকতা সম্পর্কে।

হলওয়েল মনুমেন্ট সেদিন শেষবারের মতো দাঁড়িয়ে ছিল লালদিঘির মোড়ে। সমবেত ছাত্রের দল পাথর ভেঙে কলঙ্ক মুছে ফেলার জন্য এগিয়ে গেলেন কর্ডনরত পুলিশের দিকে।

সেই মুহূর্তে সংগ্রামী মুসলিম ছাত্র জনতার জন্ম হলো বাংলার বুকে। আরও অনেকের সাথে গোপালগঞ্জ থেকে এসেছিলেন নবীন ছাত্রকর্মী শেখ মুজিব। নিজের চোখে দেখলেন সংগ্রামের শুরু কী করে হলো।

পাকিস্তান আন্দোলন মুসলমান ছাত্রসমাজের কাছে ছিল এক অগ্নিমন্ত্র—ছাত্রসমাজ মনে করতেন, এই আন্দোলনের দুটো দিক—যারা বঞ্চিত তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং এই আন্দোলনই ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের আরেক দিক। যুদ্ধোত্তর কলকাতার রাস্তায় রশীদ আলী দিবসে মুসলমান ছাত্ররা ওয়েলিংটন পার্কে বিক্ষোভ করলেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে। তাঁরা লাটভবনে গেলেন বিরাট শোভাযাত্রা নিয়ে।

মুসলমান ছাত্রদের যে অংশ অপেক্ষাকৃত উদার আর প্রগতিশীল মনোভাব নিয়ে আন্দোলন করছিলেন, তাঁদের সঙ্গে শরিক ছিলেন শেখ মুজিব। মুসলিম লীগের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় যাঁরা প্রগতির কথা বলতেন তাঁদের মধ্যে সাপ্তাহিক *মিল্লাত* গ্রুপের কর্মীরা ছিলেন অন্যতম। শেখ মুজিবকে এ সময়ে দেখা যেত কলকাতার রাস্তার মোড়ে *মিল্লাত* বিক্রি করছেন।

উনিশ শ ছেচল্লিশের নির্বাচনে মুসলিম লীগের জয়লাভ। উনিশ শ সাতচল্লিশের সিলেট রেফারেন্ডাম। ব্রিটিশের ভারত ত্যাগ। পাকিস্তানের জন্ম। মুসলিম লীগের অভ্যন্তরে এরপর



বক্তৃতা পাঠরত শেখ মুজিব, পাশে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, ১৯৫৬



ভাসানী ও বঙ্গবন্ধু

কী করে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের প্রভাব বৃদ্ধি এবং সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতা দখল এসব কথা ঐতিহাসিকের দলিলে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

ঢাকার সে যুগের কথা অনেকেরই মনে আছে। সবে পাকিস্তান হয়েছে। তখনো নবস্বাধীনতালব্ধ মানুষ নতুন জীবনে রঙিন স্বপ্ন দেখছেন। সেই সময় কিছুসংখ্যক ছাত্র উপলব্ধি করেছিলেন, এ পাকিস্তান তো তাঁরা চাননি। কোথায় গেল খেতমজুর, শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্তের মুক্তির দেশ পাকিস্তান। সেই যুগে প্রকাশ্যে গণতন্ত্রের মশাল জ্বালালেন মাত্র কয়েকজন ছাত্র।

পুরোনো ঢাকার রক্ষণশীল মহল্লার একটি ছোট ময়দানে সভা ডাকলেন ডেমোক্রেটিক ইয়ুথ লীগ। এই দলের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে একজন ছিলেন শেখ মুজিব। মহল্লার সাধারণ নাগরিকেরা সভা ভেঙে দিল। সেদিন আর আজকের সময়ের ভেতর কত ব্যবধান। নাজিরাবাজার মহল্লার নাগরিকেরা আজ তো গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের অগ্রগামী সৈনিক।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর প্রথম জেলে যান শেখ মুজিব। উনিশ শ আটচল্লিশের ১১ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিনিয়ালস স্ট্রাইক উপলক্ষ করে। এরপর শেখ মুজিবুর রহমান অনেকবারই জেলে গিয়েছেন।

শেখ মুজিবের সমালোচকরা অভিযোগ করেন যে এই জেলে যাওয়াই শেখ সাহেবের রাজনৈতিক জীবনের সম্বল।

এ ধরনের সমালোচনা অর্থহীন ও অপ্রিয়। শাসকের হাতে শেখ মুজিব দীর্ঘকাল নির্যাতিত হয়েছেন, এ কথা অস্বীকার করা রাজনৈতিক প্রজ্ঞার লক্ষণ নয়। যেমন শেখ সাহেব নির্যাতিত হয়েছেন, তেমনি মাওলানা ভাসানীও বন্দী হয়েছেন শাসনকর্তার বন্দিশালায়। তেমনি আরও অনেক সৎ, আদর্শবান এবং মহান আত্মাকে পাকিস্তানের কয়েদখানায় লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে গত বাইশ বছরে।

শেখ মুজিবুর রহমান আমাকে বললেন, 'আমি বলেছিলাম জেলারকে, জুলুম করতে পারো আমার ওপর। কিন্তু আমাকে মারতে পারবে না কখনো।'

বহুদিন আগে মিশন স্কুলের বারান্দায় যে 'না' শব্দটি প্রতিধ্বনিত হয়েছিল, আজও দীর্ঘকাল পরে সেই শব্দেরই অনুরণন শুনলাম শেখ সাহেবের কথায়।

শেখ সাহেবের রাজনৈতিক জীবনের দুটো ভুল হচ্ছে—১৯৫৪ এবং ১৯৫৬ সালে এই দুবার মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা। যে রাজনৈতিক চেতনার ফলে তিনি দীর্ঘকাল সংগ্রাম করে এসেছেন, সেই চেতনাই তাঁকে বলে দিতে পারত, এই সময় মন্ত্রিসভায় গিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বে মলিন ক্ষমতালোভী মঞ্চে উঠে বসা তার উচিত হয়নি। এখানেই উকিল আর মোক্তার পরিবেষ্টিত সংকীর্ণ স্বার্থবাদী রাজনীতির শিকার হয়ে পড়েন। ওই মন্ত্রিত্ব থেকে তিনি দেশকে কী

দিয়েছেন?

আমরা যেখানে বসে ছিলাম, জানালা দিয়ে ভোরের আলো এসে পড়েছে ঘরের দেয়ালে। দেয়ালে উঁচু কোণে এখনো একটি ফ্রেমে বাঁধানো ফটোগ্রাফ ঝুলছে। উনিশ শ বায়ান্ন সালে পিকিং শান্তি সম্মেলনে তোলা সেই ছবিটি। চীনা নেতাদের সাথে হাত মেলানো শেখ মুজিব।

শেখ সাহেব ছবিটির দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'ভুল করলে সংশোধন করতে হবে। এগিয়ে যেতে হবে। দোস হু হেসিটেট উইল বি লস্ট ফর এভার।'

১৯৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের সময় পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্তে যখন দুই দেশের সৈন্য দল আত্মঘাতী লড়াই শুরু করে দিয়েছিল, তখন পূর্ব পাকিস্তান বাইরের দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

সাবেক জাতীয় পরিষদের সদস্য শাহ আজিজুর রহমান সেদিন লন্ডনে। লন্ডনের সান্ধ্য পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে—ইন্ডিয়া অ্যাটাকস পাকিস্তান। টিউব স্টেশনের মোড়ে হকাররা চিৎকার করে কাগজ বিক্রি করছে—গ্রেটেস্ট ট্যাংক ব্যাটল সিন্স এল-আলামীন।

লন্ডন থেকে যেসব পূর্ব পাকিস্তানি নাগরিক দেশে ফিরছিলেন তাঁদের বিমান থেকে নামিয়ে নেওয়া হলো। নো মোর ফ্লাইট টু ঢাকা। টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ঢাকার সাথে সব রকম সংযোগ বন্ধ। শাহ আজিজুর রহমান সপ্তাহখানেক পর অর্ধেক দুনিয়া ঘুরে রেঙ্গুন হয়ে ঢাকায় পৌঁছালেন বোধ হয় শেষ পর্যন্ত। যুদ্ধ চলাকালীন পুরো সময়টা পূর্ব পাকিস্তান বাইরের দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল।

লন্ডনের পাকিস্তান হাইকমিশনে পূর্ব পাকিস্তানিরা ভিড় করতেন প্রতিদিন দেশের খবর জানার জন্য। প্রতিদিন সেই একই জবাব আসত হাইকমিশন থেকে—উই হ্যাভ নো নিউজ ফ্রম ঢাকা। অজানা আশঙ্কায় উদ্বেলিত জনতা ফিরে যেতেন মৌন মুখে।

সেদিন পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় বন্ধুজন হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন যাঁরা, তাঁদের কথা ভুলে যাওয়া উচিত হবে না। চীন তিনবার স্পষ্ট ভাষায় ভারতকে শাসিয়ে দিয়েছিল, ভারত যদি যুদ্ধবিস্তৃতি ঘটায় পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তে, তাহলে বন্ধুরাষ্ট্রের সহযোগিতায় সর্বাগ্রে ছুটে আসবেন তাঁরা। ইরান পাকিস্তানকে পেট্রল সরবরাহ করার পূর্ণ আশ্বাস দিয়েছিল। ইন্দোনেশিয়া তার যুদ্ধজাহাজ পাঠিয়ে দিয়েছিল ভারত মহাসাগরে



হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

টহল দেওয়ার জন্য। তুর্কি সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল সমরসজ্জা দিয়ে। এরাই ছিলেন সেদিনকার দুর্যোগের সাথি। কেউ এসেছিলেন ধর্মীয় ভ্রাতৃবন্ধনের টানে। আবার কেউ এসেছিলেন সব দেশের মানুষের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে সর্বকালের জন্য অটুট রাখার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে।

বাংলার ঘরে কিন্তু সেদিন মানুষের মন যেন নির্বাক হয়ে গিয়েছিল ক্ষণকালের জন্য। কোনো এক আশ্চর্য জিজ্ঞাসায় মথিত হচ্ছিল বাংলার বাতাস। মানুষের প্রাণের ডাক পলিমাটির বুক থেকে নবাঙ্কুরের মতো উদিত হচ্ছিল নীল আকাশের দিকে মাথা তুলে। গগনচুম্বী একটিমাত্র বাক্য জন্ম নেওয়ার পূর্ব মুহূর্তে মৌনতার কুঁড়িতে লুকিয়েছিল শেষবারের মতো।

নারায়ণগঞ্জের মাঠে ১৯৬৬ সালের জনসভা। ওপারে মগরাপাড়া, সোনাকুন্ডা, আরও দূরের গাঁ থেকে এসেছেন জনতা। নতুন কথা শোনার জন্য।

মঞ্চে দাঁড়িয়ে সারা দেশের উদ্দেশে শেখ মুজিব ছুড়ে দিলেন আগুনের জ্বলন্ত ফুলকির মতো একটি বাক্য। আমাদের বাঁচতে দাও। যেমন করে মশালের মুখ থেকে আগুন নিয়ে আরেকটি মশাল জ্বলে ওঠে। যেমন করে শব্দ বহু প্রতিধ্বনিত হয়ে জেগে ওঠে পাহাড়ের গায়ে প্রতিবিম্বিত হয়ে। যেমন করে শিশুর কলহাস্যে বাংলার উঠোন ভরে যায়। যেমন করে মায়ের বুকের গানে গাঁয়ের বাতাস চঞ্চল হয়, তেমনি করেই জন্ম হলো এই একটি বাক্যের।

বাঁচার অধিকার আমাকে দিতে হবে। এ ধ্রুববাক্যের সেদিন জন্ম না হলে ইতিহাস মিথ্যা হয়ে যেত। ইতিহাসবেত্তারা বুঝবেন, সেদিন এ বাক্যের জন্মের জন্য অপেক্ষা করছিল দেশ। ম্যাক্সিম গোর্কি যে জন্য 'মাদার' লিখেছিলেন, জুলিয়াস ফুচিক যে জন্য ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দিয়েছিলেন, গর্সিয়া লোরকা স্পেনের জেগে ওঠার গান যে জন্য গেয়েছিলেন, যে জন্য বরকত ঢাকার রাস্তায় মৃত্যুহীন প্রাণ বিলিয়ে দিয়ে গিয়েছেন, যে জন্য চাটগাঁর রমেশ শীল কবিগান গাইতেন, জসীমউদ্দীন যে মায়ের কথা কবিতায় বলেন, তাঁর অশ্রু ছুঁয়ে এই বাক্যের জন্ম হয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তানকে বাঁচতে দাও।

এ কথা এর আগেও বলে গেছেন অনেকে। কিন্তু এমন জ্বালাময়ী করে এর আগে কেউ বলেননি। তাই ইসলামাবাদ থেকে গর্জে উঠলেন আইয়ুব খান।

দ্য ল্যাংগুয়েজ অব ওয়েপন উইল আনসার দ্য ডিমান্ডস বা দ্য শেখ। আইয়ুব বললেন, সারা দেশে আমি গৃহযুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দেব।

গবর্নর মোনেম খা কালবিলম্ব না করে শেখকে বাদী করলেন।

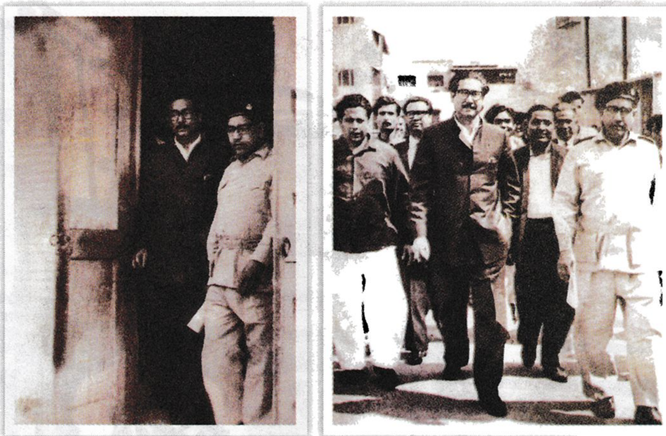
উনিশ শ ছেষট্টির সাতই জুন। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, টঙ্গীর রাস্তায় গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়ল শ্রমিকেরা। সংগ্রামী জনতা বেয়নেটের সামনে প্রাণ দিতে এগিয়ে গেলেন।

লন্ডনের প্রগতিশীল মাসিক পত্রিকা *এশিয়ান টাইড* ঢাকার রক্তাক্ত সাতই জুন সম্পর্কে লিখেছিলেন, আওয়ামী লীগ কোনো রেভল্যুশনারি পার্টি নয়। কিন্তু আজ এই দল আইয়ুব সরকারের জুলুমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে এগিয়ে এসেছে এককভাবে। পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিচ্ছেন এদের দাবির সমর্থনে দেশের জনসাধারণ। এদের সংগ্রামী চেতনাকে অস্বীকার করা রাজনৈতিক অদূরদর্শিতারই পরিচায়ক হবে। পাকিস্তানের বামপন্থী দলগুলো যখন পোলেমিকসের দ্বন্দ্বে বিব্রত, আইয়ুবের বৈদেশিক নীতিতে তথাকথিত প্রগতিশীল লক্ষণকে সমর্থন করতে গিয়ে যখন তারা নির্বাক হয়ে আছেন, তখন আওয়ামী লীগের সংগ্রামী তৎপরতা বিশ্ববাসীর কাছে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

সে সময়কার *এশিয়ান টাইড* পত্রিকার এই মন্তব্য চিন্তা করে দেখার প্রয়োজন রয়েছে।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার এত বড় একটা ভাঁওতা কোনো সরকার কখনো কোনো দেশের ওপর চালিয়ে দিয়েছেন, এমন নিদর্শন দুনিয়ার ইতিহাসে কম।

নাৎসি জার্মানি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ লাগিয়েছিল এমনি ধরনের এক মিথ্যা



জেলখানা থেকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ট্রাইব্যুনালে নিয়ে যাওয়ার পথে শেখ মুজিব, জানুয়ারি ১৯৬৯

ষড়যন্ত্রকে কেন্দ্র করে। জার্মানিতে যুদ্ধের পাঁয়তারা চলছিল হিটলার যেদিন বার্লিনে চ্যান্সেলর হয়ে বসলেন, সেদিন থেকেই। তারপর উনিশ শ উনচল্লিশ এল। সময় হলো প্রতিবেশী দেশ পোল্যান্ড আক্রমণ করার।

জার্মানি-পোলিশ সীমান্ত ছিল জার্মানির একটি ছোট রেডিও স্টেশন। জার্মানির বন্দিশালা থেকে কয়েকজন কয়েদিকে গুলি করে মেরে ফেলা হলো। তারপর তাদের পরিয়ে দেওয়া হলো পোলিশ সৈন্যদের ইউনিফর্ম। এবারের মৃত বন্দীদের নিয়ে গিয়ে সীমান্তের কাঁটাতারের পাশে বিক্ষিপ্তভাবে ফেলে রাখা হলো।

ভোর না হতেই বার্লিন রেডিও থেকে দুনিয়ার সামনে ঘোষণা করা হয়—পোল্যান্ডের সৈন্যরা রাতের অন্ধকারে জার্মান সীমান্ত অতিক্রম করে একটি বেতারকেন্দ্র আক্রমণ করেছে। এ অপমান জার্মানি সহ্য করতে পারে না। সুতরাং যুদ্ধ। দলে দলে ফটোগ্রাফার গিয়ে বিক্ষিপ্ত মৃতদেহের ছবি তুলে নিয়ে ছাপাল জার্মানির কাগজ। পরদিন তেশরা সেপ্টেম্বর জার্মান বাহিনী সীমান্ত অতিক্রম করে পোল্যান্ড আক্রমণ করে। মিথ্যা অপমানের প্রতিশোধ নিতে হিটলার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু করেছিলেন।

এমনি ধরনের মিথ্যা সাজানো মামলা আগরতলার ষড়যন্ত্র। শেখ মুজিবকে পঁচিশ বছর জেলে থাকতে হবে। পল্টনের মাঠে আর কখনো তাঁকে আসতে হবে না। শাসিয়েছিলেন সেদিনকার রক্তচক্ষু শাসকেরা।

কেন শেখ মুজিব তাঁদের একমাত্র দুশমন হয়ে দাঁড়ালেন? বাইশ বছর ধরে যাঁরা চক্রান্তের জাল বুনেছেন তাঁরা আর শেখকে সহ্য করতে পারছিলেন না।

এর আগেই শেখের বিরুদ্ধে তেরোটি মামলা আনা হয়েছিল। আপত্তিকর বক্তৃতা দেওয়া তাঁর অপরাধ। শেখ মুজিব নিজেই এই মামলাগুলো সম্পর্কে বলেছেন, '১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে প্রথমে আমাকে যশোরে গ্রেপ্তার করা হয়। খুলনার এক জনসভায় বক্তৃতা দেওয়ার পর যশোর হয়ে আমি ঢাকা ফিরছিলাম। যশোরে পুলিশ এল। আপত্তিকর বক্তৃতা দেওয়ার অভিযোগে ঢাকা থেকে প্রদত্ত এক পরোয়ানা দেখিয়ে আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়।'

এই উপাখ্যানের শেষ এখানেই নয়।

শেখ সাহেব বলে যান, 'যশোরের মহকুমা হাকিমের সামনে আমাকে হাজির করা হয়। তিনি অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করেন। আমি ঢাকায় ফিরে এলে সদর মহকুমা হাকিম আমার জামিনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু ওই দিনই মাননীয় দায়রা জজ আমার জামিন মঞ্জুর করায় আমি মুক্তি পাই।'

'সন্ধ্যা সাতটায় আমি বাড়ি পৌঁছোই। কিন্তু বিড়ম্বনার শেষ এখানে নয়। এক ঘণ্টা পর রাত আটটায় পুলিশ আরেকটি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নিয়ে আমার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত।' শেখ মুজিবুর রহমান বলতে থাকেন, 'সিলেটে আপত্তিকর বক্তৃতা দেওয়ার অভিযোগে এই পরোয়ানা সেখান থেকে দেওয়া হয়েছে। গ্রেপ্তার করে সেই রাতেই পুলিশ প্রহরাধীনে আমাকে সিলেটে নিয়ে যাওয়া হয়। পরদিন সকালে সিলেটের মহকুমা হাকিম আমার জামিনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করে আমাকে হাজতে পাঠিয়ে দেন। এরপর দিন সিলেটের মাননীয় দায়রা জজ আমার জামিন মঞ্জুর করেন, আমি মুক্তি পাই।'

এ যেন রহস্যরোমাঞ্চ সিরিজের গোয়েন্দা কাহিনি। যুক্তিতর্কের অতীত চরম বিবেকহীনতার এক সুদীর্ঘ বিরতিহীন বর্ণনার মতো শোনায় শেখ মুজিবুর রহমানের মুখের কথাগুলো।

তিনি বলে যান, 'সিলেটের জেলগেটে এক নতুন পরোয়ানাবলে আমাকে আবার গ্রেপ্তার করা হয়। মোমেনশাহীর কোনো জনসভায় আপত্তিকর বক্তৃতা নাকি আমি দিয়েছিলাম। সেদিন রাতেই পুলিশের পাহারায় আমাকে সিলেট থেকে মোমেনশাহী নিয়ে যাওয়া হয়।'

শুরু হয় সেই পরিচিত ঘটনাগুলোর পুনরাবৃত্তি।

শেষে ১৯৬৬ সালের ৮ মে নারায়ণগঞ্জের এক জনসভা থেকে রাতে ফিরে এলে ঢাকার পুলিশ শেখ মুজিবুর রহমানকে দেশ রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করে।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রথম অধ্যায়ের শুরু সেই রাতেই।







সচিত্রকরণ : রফিকুন নবী

সৈয়দ শামসুল হক

আনারকলি

সেটা ছিল এক চূড়ান্ত বেপরোয়া সন্ধ্যা। হাঁটতে হাঁটতে পা ধরে গিয়েছিল, লছমি চওকের কাছাকাছি এসে একটা টাঙ্গা পাওয়া গেল। একটা ধুলোভর্তি ঝাঁকড়া গাছের নিচে যার কোল অবধি রাস্তার আলো এসে পৌছায়নি, ভূতের মতো দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে, ঘোড়াটা থেকে থেকে পা ঠুকছিল পথের পরে। নিসার আলী গিয়ে উঠল তাতে। বসবার সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল আরাম, শিথিল হয়ে এল সারাদিনের পরিশ্রান্ত স্নায়ুগুলো, ভারী হয়ে এল চোখ। আনারকলি মার্কেটের সবসেরা জুতোর দোকান লাহোর শু এম্পোরিয়ামের নব্বই টাকা মাস-মাইনের সেলসম্যান নিসার আলী নিজেকে জাহাঙ্গীর বাদশাহ বলে ভুল করল হঠাৎ। খোশমেজাজে বলল, চলো।

চলোটা কোন দিকে তা বলা নেই। টাঙ্গাওয়ালা লাফ দিয়ে পেছনের সিটে বসল, চাবুক পড়ল ঘোড়ার পিঠে, ঘরঘর ঘুরতে লাগল চাকা। টকাটক টকাটক খুর পড়তে লাগল পিচে। নিসার আলীর চোখের ভেতরে গোটা লাহোর যেন সচল হয়ে উঠল রঙিন নাগরদোলার মতো। আজ একটা দিনের মতো দিন। আজ সারারাত, পরোয়া নেই, লাহোরের পথে পথে ঘুরবে নিসার আলী।

জাহাঙ্গীর বাদশাহর কথা খামোকা মনে পড়েনি তার। অমৃতসরে সেই স্কুলটার কথা মনে আছে নিসার আলীর, আর সেই শিখ মাস্টারজি। তার পিটুনির কথা যে ভুলেছে সে বাপের জন্মিতই নয়! বাপ্‌স! একেকটা ছড়ি পড়ত না গরম লোহার ছ্যাঁকা পড়ত পিঠে। কিন্তু কথা সেটাও নয়। কথা হচ্ছে, দোস্ত মোহাম্মদ আজ সকালেই নিসারকে বলছিল তার আমিনা বেটি বায়না ধরেছে জাহাঙ্গীর বাদশাহ আর তার বেগম নূরজাহানের মকবরা দেখবে। তা দোস্ত মোহাম্মদের সময় কই? গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডে লাহোর-পেশোয়ার বাসের ড্রাইভার সে। আজ গেলে কাল ফেরে না, ফেরে পরশু। তার ওপরে বলতে বলতে লজ্জিত হয়ে দোস্ত মোহাম্মদ মাথা নাড়ে, বিদ্যের দরজায় তো অযাত্রার ঝাড়ু। আমিনা বেটি যদি জাহাঙ্গীরের বাপের নামই জিজ্ঞেস করে বসে তো এই বুড়ো বয়সে আর মুখ দেখাতে পারবে না সে। তার চেয়ে নিসার আলীই নিয়ে যাক, ওই তো একরত্তি মেয়ে, তার কাছে আবার লজ্জা কী? বেশ দেখিয়ে-শুনিয়ে আনবে। আর নিসার আলী তো বলতে গেলে জবরদস্ত আলেম মানুষ, কলেজে পড়েছে না?

কলেজে? সেসব কতকালের একটা পুরোনো দেখা সিনেমার গল্পের মতো মনে হয় নিসার আলীর। কলেজে? হা-হা করে হেসে উঠল সে। হাসতে হাসতে চায়ের কাপ থেকে অর্ধেকটা চা ছলকে পড়ে গেল। তখনো হুঁশ হলোনা তার। থামল, যখন দোস্ত মোহাম্মদ বিব্রত হয়ে কিছু বুঝতে না পেরে তার হাত থেকে কাপটা নিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইল মুখের দিকে।

প্রবল একটা মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে, যেন সে হাসিটাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে করতে নিসার আলী বলল, 'হাঁ, নিয়ে যাব। তা কি আছে? আজই?'

ততক্ষণেও দোস্ত মোহাম্মদ তার হাসিটার ব্যাখ্যা করে উঠতে পারেনি। তাই সন্দেহের দোলায় দুলতে দুলতে সে উত্তর করল,'আরে ছেলেমানুষ তো, বলেছে বলেই কি? যে দিন হয় নিয়ে গেলেই হবে।'

'না, আজই।'

'হ্যাঁ, তাই যাও। আমি বলে দিইগে।'

'আজ আমার ছুটিও।'

ছুটি তো বটেই, তার ওপর মাসের দুই তারিখ। পকেটে মাইনের টাকা সাগর হয়ে আছে। ন বছর লাহোরে থেকে মোরি গেটের কাছে এই গলি আর আনারকলি মার্কেট—এই তো করেছে নিসার আলী। কোথায় কোন আমির বাদশাহর কবর আছে তার খবর রাখেনি কোনো দিন। এক-আধ রোববার লরেন্স গার্ডেন গেছে শুধু, তাও দোকানের ওই ছোকরাটার পাল্লায় পড়ে যে এক চোখ ছোট করে বলত,'খোদার কসম, গার্ডেনে না গেলে জিন্দিগি বেকার। রিয়াল কলেজ গার্ল-এ টইটম্বুর হয়ে থাকে বিকেলবেলাটা।'

তা সেই কলেজ গার্ল দেখার ঝোঁকে পড়ে কদিন যাওয়া হয়েছিল। তাছাড়া মোরি গেট থেকে আনারকলি, আর আনারকলি থেকে মোরি গেট—বছরে তিনশ তিরিশ দিনের কিসসা এই।

অবাক লাগে নিসার আলীর। অথচ ছোটবেলায় একেকদিন বাবাকে সে উত্যক্ত করে তুলত, লাহোর দেখতে যাবে। স্টেশনারি দোকান ছিল বাবার, সওদা করতে আসতেন লাহোরে; নীল বাসে উঠে যেতেন তিনি, আবার কদিন বাদে একেবারে নতুন মানুষের মতো হাসিতে খুশিতে জিনিসে পত্তরে বাড়ি ফিরতেন। যাবার সময় কান্না জুড়ত নিসার, ফিরে এলে সে সব মনেও নেই। রাতে শুয়ে শুয়ে গল্প শোনা। গল্প বলো আব্বা। সেই গল্পটা? হাঁ হাঁ আব্বাজান, বলো না।

লাহোর হাইকোর্টের পেছন দিয়ে উঁচু দেয়াল ঘেঁষে চলেছে টাঙ্গা। টাঙ্গাওয়ালার কণ্ঠস্বরে নিসার আলী চোখ তুলে দেখল আকাশটা এখনো লাল হয়ে আছে। সে জিজ্ঞেস করছিল, কী জিজ্ঞেস করছিল ভালো করে বুঝতে পারল না নিসার। বলল, 'কী বলছ?'

'নতুন?'

'কোথায়?'

'লাহোরে?'

টাঙ্গাওয়ালা ঘোড়ার লাগাম ধরে দুটো বড় টান দিয়ে ঘোড়াকে আরও তেজি করে, মুখ দিয়ে একটা অব্যয় ধ্বনি বার করে আবার জিজ্ঞেস করল, 'নিসার আলী কি লাহোরে এই প্রথম এল?'

কী হলো তার, সে উত্তর করল, মিথ্যে করে, 'হ্যাঁ, নতুন।'

আগুনে কাঠ পোড়ার শব্দের মতো বিড়বিড় করে হাসল টাঙ্গাওয়ালা। শুধাল, 'জনাবে আলি কি ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে করেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঘুরে বেড়াতে। আবার কি?'

একটা সিগারেট বার করে ধরাল নিসার আলী।

আমিনা আর তার ছোট ভাই হাসিব এসেছিল সঙ্গে। তারা চলে গেছে অনেকক্ষণ। হাসিব একটা রঙিন মাফলার দেখে ভারী বায়না ধরেছিল। তাকে সে মাফলারটা কিনে দিয়েছে নিসার।

আজ কী যেন হয়েই গেছে তার, নিসার আলী ভাবল। দোস্ত মোহাম্মদ তার ন বছরের চেনা। ন বছর আগে অমৃতসর থেকে পালিয়ে এসে লাহোরের পথে পথে যখন ঘুরছিল সে, তখন আবার দেখা হয়েছিল দোস্ত মোহাম্মদের সঙ্গে। প্রথম দেখা অমৃতসর-লাহোর বাসে।

ড্রাইভার দোস্ত মোহাম্মদ। একেবারে তার পাশেই বসেছিল নিসার। পথিমধ্যেই একটা সিগারেটও বুঝি দিয়েছিল তাকে। সেই থেকে আলাপ। আলাপ তো নয় খুচরো দু-একটা কথা। অমৃতসরের দাঙ্গার কথা। আগুনের গল্প, হত্যার কাহিনি।

স্টিয়ারিংয়ে হাত রেখে পিচঢালা সোজা সড়কে স্থির চোখ রেখে দোস্ত মোহাম্মদ অমৃতসর থেকে লাহোরের দিকে বাস চালিয়ে চলেছে। নিসার বলছিল, 'আমার আব্বা আর আম্মাকে ওরা ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে বার থেকে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। আর—'

নিসার আলী এইখানে ঢোঁক গিলেছিল। কপালে ফুটে উঠেছিল ঘাম। গলার কাছটাতে ভারী হয়ে উঠেছিল, যেন কেউ হঠাৎ সিমেন্টের পলেস্তারা করে দিয়েছে কণ্ঠের চারপাশে। নিসার আলী বলেছিল, 'আর আমার ভাইটা। সেও নেই।'

'নেই?'

ওই একটা শব্দমাত্র বেরিয়ে এসেছিল দোস্ত মোহাম্মদের ঠোঁট থেকে।

'আমি একাই আছি।'

'তো কী হয়েছে? ক্যাসাদ আর বিপদ তো মরদের জন্যে।'

'সে জানি।'

'কোথায় যাবে?'

'লাহোর।'

প্রশ্নটা অনাবশ্যক। কারণ দোস্ত মোহাম্মদ যে বাস চালিয়ে যাচ্ছে তার গন্তব্য লাহোর। আশ্বাস দিয়েছিল সে নিসারকে, 'লাহোর চমৎকার শহর।'

বড় সংক্ষিপ্ত আশ্বাস। তাতে কী বোঝায় তা দোস্ত

মোহাম্মদই বলতে পারত। আর কোনো কথা বলেনি সে। রাভি নদী পার হয়ে শহরে যখন বাস পৌঁছুল, সন্ধ্যে। নামবার সময়ে নিসারের দিকে তাকিয়ে সে একটু হেসেছিল। সে হাসিটায় না ছিল কোনো অর্থ, না প্রসঙ্গ। কিন্তু বড় নির্ভয় বোধ করেছিল নিসার তখন। মনে হয়েছিল, হ্যাঁ, চমৎকার শহর। আমার ভেঙে পড়বার কিছু নেই।

মাসখানেক পরে ঘুরতে ঘুরতে দোস্ত মোহাম্মদের সঙ্গে আবার দেখা নিসার আলীর, বাসস্ট্যান্ডে।

নিসারকে তখন অতি আপনজনের পক্ষেও একনজরে চেনা মুশকিল। অনাহারে-অনিদ্রায় চেহারা হয়েছে রুক্ষতার প্রতিমূর্তি। পরনের কাপড়ে কতকালের সাবানহীন মালিন্য। যা কিছু দেখে, যেন নতুন দেখছে, এমনি বড় বড় নগ্ন দুই চোখে যেন বিশ্ব গিলতে চায় নিসার আলী। জানালায় একটা জামা মেলতে দিয়েছে কেউ, একেবারে অচেনা লাগে—ওটা যে একটা পাজামা সেই কথাটা উপলব্ধি করতেই যেন এক যুগ লেগে যায়। পথের দুপাশে ফলগাছগুলোতে যখন রোদ এসে পড়ে তার মাথার মধ্যে জাঁতার মতো পাথর যেন ঘুরতে থাকে বনবন করে। গেলাস ভর্তি পানি যখন গলার ভেতর দিয়ে ভেতরে যায় নিসার আলীর তখন মনে হয় একটা সাগর সে পান করে ফেলতে পারবে।

পিঠের ওপর বিরাট একটা হাত। চমকে উঠে প্রথমেই দৌড়ে পালাবার কথা মনে হয়েছিল নিসার আলীর। কিন্তু ঘুরে তাকিয়ে দেখে দোস্ত মোহাম্মদ।

তাকে ঠিক চিনতে পেরেছিল সে।

'কিছু হলো?'

এ প্রশ্নের উত্তর দেবার দরকার করে না। দেওয়া বাহুল্য। উত্তর তার চেহারায়, পোশাকে, ধুলোয়, রুক্ষতায় লেখা।

ডিউটি শেষে ঘরে ফিরছিল দোস্ত মোহাম্মদ। বলল, 'চলো আমার সঙ্গে।'

'কোথায়?'

'দেখা যাক। আপাতত আমার বাসায়।'

'কী হবে?'

'একটা রাত অন্তত ঘুমোতে পারব।'

প্রথম যে প্রতিক্রিয়া হলো নিসার আলীর, তার নাম একটা ভয়। হ্যাঁ, ভয় হলো নিসার আলীর। একটা লোক তাকে ডাকতে পারে, ডেকে বাসায় নিয়ে যেতে পারে, এর ভেতরে যেন কোনো স্বাভাবিকতা নেই। যেন এই ডাকের পেছনে হাঁ করে অপেক্ষা করছে তার অস্তিত্বকে গিলবার জন্যে এক মৃত্যুর শয়তান।

না, সে যাবে না।

প্রবল মাথা নাড়ল নিসার আলী।

'যাব না।'

'কেন?'

এখন ভাবতেই পারে না, সে অমন একটা গোঁয়ার্তুমি করেছিল কেন? নেহাত দোস্ত মোহাম্মদ পাঠানের আওলাদ, একেবারে সরহদ্দি গয়ের মুলুকের মানুষ, তাই অবিচল থেকেছে তার দাওয়াতে। আর কেউ হলে গায়ে পড়ে ওই হাঘরে মানুষটাকে ঘরে তুলতে দশবার দ্বিধা করত।

নিসার আলীর চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পেরেছিল দোস্ত মোহাম্মদ। এরকম একেকটা আশ্চর্য কাণ্ড হয়ে থাকে। তার জন্য পৃথিবীতে খুব বড়সড় পটভূমির দরকার হয় না। একেবারে অপ্রত্যাশিত কোণ থেকে কখনো কখনো আলো এসে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়।

ছ বছরের ছোট মেয়ে আমিনা অবাক হয়ে বলেছিল, 'আব্বা, এ কে?'

'মেহমান।'

'মেহমান বুঝি মানুষ হয়?'

আমিনার কথা শুনে দোস্ত মোহাম্মদ হেসে অস্থির।

'দ্যাখো দ্যাখো মেয়েটা বলে কী। আরে, আমার বেটি তো ভারী বুদ্ধু হয়েছে।'

সেই আমিনা। সেই আমিনা কতবড় হয়ে গেছে। আজ একসঙ্গে না বেরুলে যেন এই প্রকাশ্য সত্যটা জানতেই পারত না নিসার আলী।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই আমিনা।

সারাক্ষণ কেমন ওড়না টেনে টেনে মাথা ঢাকছিল। কানের ফাঁকে গুঁজে দিচ্ছিল। রোদ পড়ে ভারি লাল দেখাচ্ছিল কানের লতিটা। একটা কোকা-কোলার বোতল নিয়ে কী সাধাসাধিই না করতে হয়েছে তাকে।

'আহা, ধরো দিকি।'

'না, না।'

'কেন? বাহ্।'

'আমার পিয়াস লাগেনি।'

'না লাগুক। এটা খুব ভালো। নাও, ধরো। ধরো, ধরো।'

আলগোছে, যেন কত ভয়ে ভয়ে, ডান হাতটা বাড়িয়ে বোতলটা হাতে নিয়েছে আমিনা। হাসিবের বোতল ততক্ষণে শেষ।

নিসার আলী তখন হাসতে হাসতে স্টলওয়ালাকে বলেছে, 'দেখি, আরেকটা। আমাকে।'

সম্রাট জাহাঙ্গীরের সমাধি তোরণের বাইরে ছোট্ট স্টল। সেখানে কলেজ পালানো ছেলেমেয়েরা হা হা করে হাসছে আর বাদাম খুলে খাচ্ছে, কোকা-কোলার বোতল হাতে নাচাতে নাচাতে গল্প করছে। হুস্ হুস্ করে একটা ট্রেন চলে গেল। সেদিকে মুখ করে, নিসার আলীর দিকে পিঠ দিয়ে, আমিনা স্ট্রতে একটু একটু করে ঠোঁট নামিয়ে পান করছে। ভঙ্গিটা ভারী সুন্দর। হঠাৎ কেমন মায়া করে ওঠে। নিসার আলী যেন তন্ময় হয়ে যায়।

আমিনাকে তাড়া দিতে ইচ্ছে করে না। একটা সিগারেট ধরায়। হঠাৎ চোখে চোখ পড়তে নিসার সন্ত্রস্ত হয়ে দৃষ্টি সামলে তাড়াতাড়ি বলে, 'চলো, এবার নূরজাহানেরটা দেখে আসি। কত হলো?'

স্টলওয়ালাকে পয়সা গুনে দিতে দিতে নিসার আলী গুনগুন করে একটা সুর ভাঁজে। রেললাইনটা পেরুলেই নূরজাহানের নিরাভরণ সমাধি।

হঠাৎ গা'টা শিরশির করে ওঠে তার। আরে একি, একেবারে আঁধার এ কোন রাস্তা দিয়ে তাকে নিয়ে চলেছে টাঙ্গাওয়ালা? এদিক-ওদিক তাকায় নিসার আলী। শুধায়, 'কোথায়?'

টাঙ্গাওয়ালা উত্তর করে না কিছু। নিসার তাকিয়ে দেখে, হাসছে। তখন উত্তরটা পাওয়া যায়।

লালা, নতুন এসেছ। জান ভরে দেখে নাও। না দেখলে তো যৌবন গেল চুল বাঁধতে বাঁধতে।

নিজের রসিকতায় নিজেই খিক্ খিক্ করে হাসে টাঙ্গাওয়ালা। কিন্তু কথাটা কানের ভেতর দিয়ে ভালো করে ভেতরেও পৌঁছায়নি তার আগেই শরীরে আগুনের হলকা ছড়িয়ে পড়ে নিসার আলীর। ভারী হয়ে আসে নিঃশ্বাস। দ্রুত পড়তে থাকে। বুকের মধ্যে তোলপাড় করে ওঠে। তাই তো।

তাই তো! এত কাছে। এত কাছে একটা সঙ্গ। একটা সঙ্গ, একটা জীবন্ত, উষ্ণ শরীর এত কাছে হতে পারে—সে ইচ্ছে করলেই! মাথার মধ্যে রিমঝিম করতে থাকে তার। চোখের সামনে একটা-দুটো বাতি। সাইকেলে চড়া একটা লোক, উবুড় হয়ে থাকা গাড়ি, বড় বড় গাছসব একটা সতর্ক সংবাদের মতো মনে হয়। সবকিছুর মধ্যে নিজেকে একেবারে অন্যরকম বোধ করতে থাকে সে। পৃথিবী যেমন তেমনই চলছে, কেবল তারই একটা নতুন কিছু অন্য কিছু যেমন হতে চলেছে এক্ষুনি। এই একটু পরে। এই যখন টাঙ্গা গিয়ে থামবে।

অন্ধকারে কে যেন শিস দিল। নিজের হৃৎপিণ্ড যেন শুনতে পেল নিসার আলী। না, ও কিছু না। নিজেকে নিজে সান্ত্বনা দেয়। কেমন অস্থিরতা পেয়ে বসে। অনাবশ্যক এ-পা ও-পা করতে থাকে বসে বসে। ছাব্বিশটা বছর একটা দরজা, সেই দরজা চূর্ণ চূর্ণ হয়ে যাবে নাকি?

তা মন্দ নয়।

নেশার মতো ঘোর লাগে নিসার আলীর। শুধায়, 'কদ্দূর?'

'ব্যস, আর একটু।'

হঠাৎ ঘণ্টা বাজায় টাঙ্গাওয়ালা। লাগাম নাচাতে নাচাতে চেঁচিয়ে ওঠে, 'আজ ইশারা দেবে কে ভাই?'

এক-আধটা পথের মানুষ ঘুরে তাকায়। না, আরও সামনে। লাগাম ধরে আরেকটা টান দেয় টাঙ্গাওয়ালা। ঘোড়ার কদম আবার জোর হয়ে ওঠে।

আমিনা কি ছেলেমানুষ! কেবল শরীরটাই বেড়েছে। সেই জন্যে যেন আরও ভালো লেগেছিল। যেন হাতের মুঠোয় করে নাচানো যাবে পুতুলের মতো। অবাক কাণ্ড, এক বাড়িতে থেকেও কিছু দেখেনি নিসার আলী। কত বড়টি হয়ে গেছে, তার কোনো খবর রাখে না সে।

আর কী সুন্দর হয়েছে দেখতে। মনটা ছটফট করতে থাকে নিসার আলীর। কেমন অপরাধী মনে হচ্ছিল তখন নিজেকে। তখনবারবার দেখেও যেন বিস্ময় যায় না।

ময়লা, সস্তা, পুরোনো এক জোড়া স্যান্ডেল পায়ে আমিনার। পথ চলতে মিহি ধুলোয় রাঙা পা ভরে উঠেছে। নতুন স্যান্ডেল পায়ে গলিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পরখ করে মেয়েরা যখন তার দোকানে, জীবন্ত একটা ঢেউয়ের মতো মনে হয়। আমিনার জন্য কেমন হয় কাল এক জোড়া স্যান্ডেল এনে দিলে?

কী জানি, দোস্ত মোহাম্মদ আবার কী মনে করে বসে। কেন পাপু, আমার মেয়েকে আমি স্যান্ডেল কিনে দিতে পারি না?

তা দিক না, আমার চেয়ে ভালো কোথায় বিয়ে দিতে পারে আমিনাকে দেখব। নিজের সঙ্গেই ফোঁস ফোঁস করে ওঠে নিসার আলী। সেই তখন থেকেই ভেতরে ভেতরে কী যে হচ্ছিল তার, এতক্ষণে সেটা যেন শান্ত হতে পারবে।

কিন্তু সন্ধ্যে হবার অনেক আগেই বাড়ি ফেরবার জন্য উসখুস করতে শুরু করে দিয়েছিল আমিনা। নইলে আরও অনেকক্ষণ তাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াত সে। গার্ডেনে যেত। ভারী সুন্দর জায়গা। কেমন সবাই বসে থাকে, গল্প করে, হেসে ওঠে, দৌড়য়, সেই রকম।

হাসিব চটে উঠেছিল বোনের ওপর।

'যাহ্, তোর জন্যে আমার বেড়ানো মাটি। তুই খালি বাড়ি যেতে চাস।'

ফিসফিস করে আমিনা কী বলছিল শুনতে পায়নি নিসার। তবু সে হাল ছাড়েনি।

'চলো না। বেলা অনেক আছে। কী হয়েছে?'

মুখে কিছু বলেনি আমিনা, ঠায় দাঁড়িয়ে থেকেছে। নীরবে দাঁড়িয়ে থাকাটাই যেন একশটা কথা বলা। কথা বলেনি বলে, সারাদিন একসঙ্গে অথচ দুএকটা হ্যাঁ-না ছাড়া আর কিছুই বলেনি বলে, আরও যেন ভেতরটা অস্থির লাগে নিসার আলীর। মনে হয় গাল টিপে টিপে যদি কথা বলাতে পারত।

বাসায় দিয়ে এসে তক্ষুনি আবার বেরিয়ে পড়েছে নিসার আলী। আজ একটা অবাক দিন। নয় বছর পরে নিজের দিকে যেন প্রথম চোখ পড়ল তার। নিজেকে একটা সুস্থ শান্ত মানুষ মনে হচ্ছে। জীবনে এত ভালো জিনিস আছে তার কোনো খবরই রাখে না সে। আজ সারারাত সে ঘুরবে। সারা শহরে কোথাও তার জন্য কী যেন রাখা আছে, সেসব খুঁজে খুঁজে বার করবে।

দুলে ওঠে টাঙ্গা। পেছন ফিরে দেখে একটা লোক লাফিয়ে উঠেছে পেছনের সিটে। ঢিলেঢালা কোট গায়, জামার বোতাম খোলা, মুখটা দেখা যাচ্ছে না আঁধারে। সামনে কয়টা দাঁত নেই বুঝি—কথার ভেতর থেকে ফসফস বাতাস বেরুচ্ছে। টাঙ্গাওয়ালাকে বলছে, 'দিয়ে দে ইয়ার। সাহেবকে নিয়ে যাই।'

'তুই বেহদ্দ কথা বলিস। সাহেব নতুন এসেছে। কিচ্ছু জানে না শোনে না। আমার ওপর বরাত দিয়ে বসে আছে।'

'তা আমি কি আস্তাকুঁড়ে নিয়ে যাব? এমন জায়গায় নিয়ে যাব, সাহেব কেন সাহেবের বাপ এলে খুশি হয়ে যাবে।'

'তওবা, তওবা।'

'ওটা কথার কথা ইয়ার।'

একটা ঢালু রাস্তা দিয়ে নামতে থাকে টাঙ্গা। কান খাড়া করে বসে থাকে নিসার আলী। একবার তার মনে হয়, একি করছে সে? ফিরে যাওয়া যায় না?

ঢালু শেষ হতে না হতেই টাঙ্গা থামল। নিসার আলী ঘুরে বলল, 'ফিরে চলো।'

'ফিরে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। এ কোথায় নিয়ে এলে আমাকে? এখানে কে আসতে চেয়েছে?'

সেই লোকটা তখন হঠাৎ আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে নিচু গলায় বলল, 'ভয় করবেন না সাহেব। আমি থাকতে কিচ্ছু গোলমাল হবে না। যাবেন, আসবেন—আঁচড়ের দাগটুকু কেউ ধরতে পারবে না।'

ভয়ের কথা শুনে যেন পৌরুষ লাফিয়ে ওঠে নিসার আলীর। টাঙ্গা থেকে নেমে বলে, 'ভয়ের কথা নয় ইয়ার। আমার চাই ভালো কিছু। এখানে তো সব বাজে মনে হচ্ছে। অন্য কোথাও যাওয়া যায় না?'

'আরে না না।'—

এবারে একেবারে সামনে এসে দুহাত তুলে অভয় দেয় লোকটা, 'দেখবেন, বাজিয়ে নেবেন, পছন্দ না হয় লাথি মেরে চলে যাবেন। এক আধলা গুনাগারি দিতে হবে না। সাফ কথা। কেমন ইয়ার?'

টাঙ্গাওয়ালা বলে, 'হ্যাঁ, সাচ্চা কথা।'

ঠিকই অনুমান করেছিল নিসার, লোকটার সামনে কটা দাঁত নেই। যখন কথা বলছিল রবারের টুকরোর মতো জিবটা লাফাচ্ছিল মুখের মধ্যে। লোকটা খামোকা হাত চালাচ্ছিল তার বিরল চুলে। একহাতে কোটের কলার-টাই ধরেছে শক্ত করে, যেন নিসারের মতো মানুষদের সে কিছুতেই ফিরে যেতে দেবে না। মায়া হলো নিসার আলীর। লোকটার পায়ে কতকাল আগের কেনা রুক্ষ চামড়ার ভারী পাম্প শু। আসল রংটা বিবর্ণ হতে হতে এখন আর কিছু বোঝার জো নেই কী ছিল।

নিসার বলল, 'বেশ, দেখি কোথায়।'

টাঙ্গাওয়ালা হাত পেতে চারটে টাকা পুরোপুরি নিল। যদিও ভাড়াটা দুই টাকার বেশি হবার কথা নয়।

একটা ছোট সিঁড়ি দিয়ে দেয়ালহীন উঠোনে তারা নেমে এল। সেখানে জটলা করছে দু-একজন। সিগারেটের ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। কিন্তু নিস্তব্ধ। যেন বাতাস সরসর করে উঠলেও মনে হয় কোথাও কথা হচ্ছে।

দরজা ঠেলে সেই লোকটা নিসারকে বলল, 'আসুন।'

তাকিয়ে দেখল অন্ধকার একটা সিঁড়ি। কোথা থেকে ম্লান আলো এসে পড়েছে তাইতে ধাপগুলো চেনা যাচ্ছে শুধু, কিন্তু কতদূরে উঠে গেছে তা বলা যাবে না।

এখন আর মাথার মধ্যে কিছু নেই নিসারের। নিজের শরীরটাকেও সে ভালো করে ঠাহর করতে পারছে না। নয় বছর এই শহরে থেকেও শহরের এই অংশটুকু একেবারে অচেনা, যেন অনেক দূরে এক বিদেশিদের দেশে সে পৌঁছে গেছে, সিঁড়ির একটা বাঁক নিলে যদি কেউ তাকে হত্যাও করে তো অবাক হওয়ার কিছু নেই।

আসলে ভয় করছিল তার। ভেতরটা ঘামে ভিজে উঠেছিল এই শীতেও। কিন্তু সেটা টের পাওয়া যায়নি উত্তেজনায়। কেবল চোখের সামনে সিঁড়িটা বাঁকের পর বাঁক ঘুরে উঠে গেছে, আর সে একদিকের দেয়াল ধরে ধরে উঠে যাচ্ছে—এই রকম যাওয়া যেন কোনোদিন শেষ হবে না।

নিসার থামল। লোকটা দরজা ঠেলতেই চোখে পড়ল নিয়ন জ্বলা দুধের মতো আলোয় ধোয়া সুন্দর সাজানো একটা বসবার ঘর। মেঝের পরে সস্তা শতরঞ্চি বিছানো, তার লাল ফুলগুলো; এক পাশে একটা বড় সোফা, ওদিকে আয়না বসানো আলমিরা, তাকে রেডিও—সন্ধ্যার সংবাদ শোনা যাচ্ছে; কারা দাঁড়িয়েছিল ঘরে, অতিথির পদশব্দে তারা চোখ ফেরাল এবং শূন্য করে চলে গেল।

সোফাটা দেখিয়ে লোকটা বলল, 'বসুন।'

নিসার বলল, 'রেডিওটা বন্ধ করো।'

'রেডিও?'

লোকটা একপলকের জন্য যেন বুঝতে পারল না। তারপর তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিল বিনীত দাসের মতো। নিসার যেন এতক্ষণে স্বাভাবিকভাবে নিশ্বাসটা নিতে পারছে। ঘরে পা দিয়েই রেডিও থেকে বেরিয়ে আসা একটানা সংবাদ কারণহীন অস্বস্তিতে তাকে ঠেসে ধরেছিল, এবার সে ঢিলেঢালা হয়ে বসতে পারল।

ভেতরে গেল লোকটা এবং পরমুহূর্তে তিনজন রমণীর সঙ্গে সে ফিরে এল।

দেয়ালে একটা ছবি। কোমল তর্জনীতে বুলবুল নিয়ে নগ্ন পায়ে দাঁড়িয়ে আছে এক মোগল তরুণী। তার স্বচ্ছ ওড়নার ভেতর দিয়ে তারার চুমকি বসানো কাঁচুলি আর ঘাগরার ভেতর দিয়ে চিতাবাঘের বুকের মতো উরুযুগল দেখা যাচ্ছে। মাথার পেছনে খিলান, সেই খিলানের ফাঁকে গাঢ় নীল আকাশে এক ফালি চাঁদ—চাঁদের নিচে দূরের মিনার সরু পেনসিলের মতো মাথা উঁচু করে আছে।

নিসার দেখল, রমণী তিনজন তার সমুখে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর লোকটা একটা টুল টেনে পাশে বসেছে তার। বসতে বসতে একটা খবরের কাগজ হাতে নিয়েছে অনাবশ্যক, সেইটে মোচড়াচ্ছে আর হাসছে—দাঁত নেই বলে বড় নগ্ন ঠেকছে হাসিটা।

তিনজনের মধ্যে যে বয়স্কা সে নিসারের হাত আচমকা দুই হাতে স্পর্শ করে নিজের ঠোঁটে ছোঁয়াল। হাসল। বলল, কি বলল তার এক বর্ণ কানে গেল না নিসারের।

কিন্তু মধ্যমা হাসল না। সবার মধ্যে সে সবচেয়ে ফরসা, তার চোখ দুটো ক্যালেন্ডারের ছবিতে তরুণীর মতো টানা টানা। তারই মতো নগ্ন পা। মাথার পরে গাঢ় নিবন্ধ বেণি সাপের মতো কুণ্ডলী করে বাঁধা। লাল এক জোড়া ঠোঁট তার এতটুকু নড়ল না, এক হাত তুলে আদাব করল সে। তক্ষুনি ঘুরে দাঁড়িয়ে, বাইরে বারান্দার কাছে গিয়ে দুই হাত তুলে মাথার বেণি আদর করতে লাগল।

কনিষ্ঠা একেবারে সরাসরি বাড়িয়ে দিল তার হাত। কিছু দেরি হয়েছিল হয়তো, তখন নিসারের হাতটা নিয়ে সে ঝাঁকুনি দিল সাহেবদের মতো, ব্যাটা ছেলের মতো। বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ, ডিয়ার।'

আর নিজের ইংরেজি শুনে নিজেই হেসে কুটিপাটি হতে হতে বসে পড়ল নিসারের পায়ের কাছে একটা বেহায়া বেড়ালের মতো। হাসতে হলো নিসারকে। সেও ইংরেজিতে যা মুখে এল বলল, 'ইয়েস, ইয়েস।'

লোকটা নিসারের কানে মুখ রেখে শুধাল, 'কেমন?'

'ভালো। ভালোই তো।'

'ভালো মানে? লাখে একটা হয় না।'

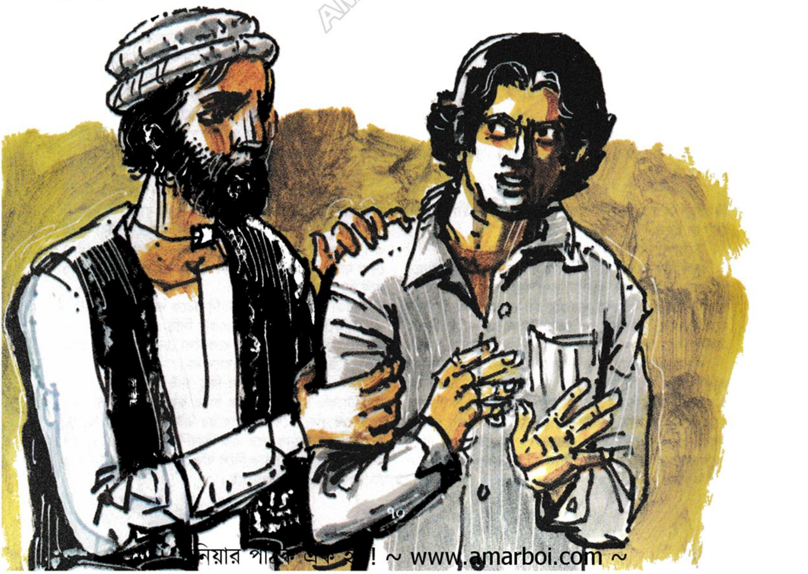
'নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'কোনটা?'

'কোনোটাও না।'

ঘুরতে ঘুরতে দোস্ত মোহাম্মদের সঙ্গে আবার দেখা নিসার আলীর



'না!'

লোকটা যেন আর্তনাদ করে উঠল। ছুড়ে দিল হাতের কাগজটা। টুলটা আরও টেনে নিয়ে নিসারের কাছে সরে বসল। বিশ্বের বিস্ময় নিয়ে বলল, 'একটাও না?'

চকিতে নিসারের দিকে চোখ তুলে তাকাল প্রথমা। শ্যামল, শরীরটা ভরা; হাতে চুড়িগুলো বসে গেছে; নাকের ডগা উজ্জ্বল দেখাচ্ছে তার। কেমন যেন মনে হলো নিসারের। মনে হলো, বহুদিন পরে চেনা মানুষগুলোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে। অথচ কোনো কারণ ছিল না। অমৃতসরে কলেজে যখন পড়ত, তখন তার এক বন্ধুর বোনকে ঠিক এ রকম দেখাত। যেন ওদের বাসায় গিয়ে আবার রুটি খেতে বসে যেতে পারে নিসার। গরম রুটিটা রান্নাঘর থেকে এহাতে ওহাতে এপিঠ ওপিঠ করতে করতে নিয়ে আসবে এখনই। তার নিষেধ সত্ত্বেও থালায় ফেলে দিয়ে বলবে—এ কেমন ছেলে, খেতে ভয় পায়?

প্রথমা কি বুঝল, চোখ নামিয়ে চলে গেল ঘর থেকে। তার চলে যাওয়ার অমন মন্থর ভঙ্গিতে যেন বলে গেল, আর আসবে না। যেন একটা কাজ ছিল তার, সে কাজটা হয়ে গেছে, চলে গেল। কোথায় গেল? মাথার মধ্যে কী হচ্ছে নিসারের, সে ভাবতে চায় না, তবু ভাবছে, গেল কোথায়? গিয়ে কী করছে? কী কাজ তার এখন?

মধ্যমাকে অশ্লীল একটা গালি দিল লোকটা। সেটা শুনে সংবিৎ ফিরে এল নিসারের। বলছে, 'আর তুই তো বসবি কাছে। একটা গান জানিস না? কী শিখিয়ে দেব আমি?'

বলতে না বলতে সে এসে নিসারের পাশে সোফায় এসে বসল। এবং গুনগুন করতে লাগল এক পা আস্তে আস্তে দুলিয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে।

তখন তার জন্য খুব হাসি পেল নিসারের। সে হাসলও। ভাবল, মেয়েটা তো ভারি বোকা। সে একবার থেমে নিসারকে দেখল, এই প্রথম ঠোঁটের ফাঁকে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠতে না উঠতেই মিলিয়ে গেল, আবার গুনগুন করতে লাগল যেখানে থেমেছিল সেখান থেকে।

লোকটা বলল, 'এরা তিন বোন। ওই বড় যে চলে গেল। ওটা আপনার—থাকগে। এ মেজ, আর এইটে ছোট। ছোটটা বেশ ভালো।'

তখনো সে পায়ের কাছে বসে। কথা শুনে আড়মোড়া ভাঙল, কপট একটা হাই তুলে নিসারকে শুধাল, 'আমার তারিফ তো শুনলেন? কিছু বলুন।'

'বলছি, দাঁড়াও।'

আবার হেসে কুটিপাটি হলো মেয়েটা।

'হাসবার কী হলো?'

'কিছু না।'

আমিনার কথা বিদ্যুতের মতো একবার মনে হলো। আমিনা যদি এরকম হাসতে পারত, হেসে একশ টুকরো হতে পারত।

মেয়েটা লাফিয়ে উঠে পালিয়ে গেল। হাঁ করে তাকিয়ে রইল নিসার আলী। হাতের পরে মৃদু চাপ অনুভব করতেই চোখ ফিরিয়ে দেখে মধ্যমা সুগন্ধি নিশ্বাস ফেলে তার ওড়নায় মুখ মুছল।

রোদে পুড়ে যাচ্ছিল আমিনার মুখ, যখন তারা রেললাইন পার হয়ে নুরজাহানের কবরের দিকে চলেছিল। শি ওয়াজ কলড দ্য লাইট অব দ্য ওয়ার্ল্ড। শি রুলড ওভার দ্য এমপেরর।

মধ্যমার হাতটা টেনে নিয়ে নিসার আলী বলল, 'চলো।'

মেয়েটা জিজ্ঞাসু চোখ তুলে তাকাল। নিসার আলী তখন আর কিছুই দেখতে পারছে না এই কামরাতে। সেই লোকটা গেল কোথায়?যে তাকে এখানে এনেছিল?

শরীরটা যখন এক পাওনার আশায় উদগ্র, যখন চোখের ভেতরে সাঁতার কাটছে চারদিকের সমস্ত কিছু দুরন্ত বৃত্তের মতো, তখন মেয়েটা ওরকম জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। লোকটা যেন এতক্ষণ ছিল না, সেও আবার দেখা গেল বসে আছে কাছেই। লোকটা বলল, 'তিরিশ টাকা।'

'তিরিশ!'

'হ্যাঁ।' মেয়েটা বলল।

'বড্ড বেশি।'

'তাহলে যাও।'

যেতে বলছে কিন্তু হাতটা ধরা। নিসার তার হাত সরাল না। মনে মনে একটা অঙ্ক করল।

'কুড়ি।'

'লোকটার পড়ে যাওয়া দুটো দাঁতের শূন্যতা দেখা গেল।'

'যাক, তোমার জন্য কুড়ি। স্পেশাল। আর আমাকে?'

প্রশস্ত হাত পেতে দিল তার। নিসার আলী হাতে যা এল দুটো টাকা দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

মেয়েটা বলল, 'আসুন। এদিকে।'

বসবার ঘরটা পেরিয়ে একটা ছোট্ট বারান্দা পেরিয়ে মেয়েটার পেছনে পেছনে নিসার আলী চলেছে শোবার ঘরের দিকে। একটা ঘরের মধ্যে গিয়ে পড়ল তারা। ইতস্তত বাক্স তোরং আয়না বিছানা। সেখানেও দাঁড়াল না মেয়েটা। সে ঘর কোনাকুনি পার হয়ে একটা দরজা খুলে মেয়েটা আবার ডাকল, 'আসুন।'

সম্মোহিতের মতো নিসার আলী উত্তর করল, 'হ্যাঁ।'

তারা আরেকটি অন্ধকার বারান্দায় এসে পড়ল। ঠিক তখন—আরেকটু হলে চিৎকার করে উঠত নিসার আলী।

একটা বেঁটে অন্ধকার মূর্তি কোথা থেকে লাফিয়ে এসে কোমর জড়িয়ে ধরেছে নিসার আলীর। পাগলের মতো তারস্বরে বলছে, 'যেতি দেব না। না, না, না।'

তাকিয়ে দেখে বারো-তেরো বছরের একটি ছেলে। সাঁড়াশির মতো দুটো হাতে তাকে চেপে ধরেছে, ধাক্কা দিয়ে হটিয়ে দিতে চাইছে, চিৎকার করছে।

'খবরদার, খুন করে ফেলব।'

অসম্ভব শব্দ করে উঠল নিসার আলীর হৃৎপিণ্ড। যেন ফেটে বেরিয়ে পড়বে ওটা, তার হৃৎপিণ্ড; বেরিয়ে লাফিয়ে ছুটতে থাকবে আর ড্রামের মতো বাজতে থাকবে।

'কে? কে?'

কোনো রকমে চেরা গলায় এই দুটো শব্দ উচ্চারণ করতে পারল নিসার আলী। নিজের অজান্তেই সে লড়াই করতে শুরু করে দিয়েছে ছেলেটার সঙ্গে। তাকে ছাড়াতে হবে। যেন জীবন-মরণের শত্রুর সঙ্গে আচমকা সাক্ষাৎ হয়েছে তার।

মেয়েটা ঘুরে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, 'ছেড়ে দে।'

ছাড়ল না। হাঁপাতে লাগল নিসার। মেয়েটা কাছে এসে বলল, 'আমার ভাই। অচেনা লোক দেখলে ওই রকম করে। ওকে একটা টাকা দিলে চলে যাবে।'

'ভাই!'

মেয়েটা মাথা নেড়ে সায় দিল।

বিস্ফারিত চোখে তাকে তাকিয়ে দেখল নিসার আলী। তারপর দুজনকেই হতবাক করে সে নিজেকে মুক্ত করল বিকট চিৎকার করে এবং মুখ ফিরিয়ে যে পথে এসেছিল প্রাণপণে দৌড়ে পালাল।

পেছনে একবার পদধ্বনি শোনা গেল মেয়েটার। নিসার আলী দৌড়াচ্ছে। কে যেন তাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দিচ্ছে। বসবার ঘরে আর দুজন মেয়ে, তারা উঠে দাঁড়াল, তাদের পাশ কাটিয়ে, সিঁড়িগুলো উন্মাদের মতো লাফিয়ে একজন দাঁড়িয়ে থাকা সন্তানকে ধাক্কা দিয়ে নিসার আলী দৌড়ুল। থামল না, একবারও পেছনে তাকাল না। পেছনে যেন মৃত্যুর অসম্ভব নৃত্য চলছে আর কে যেন বলছে, 'পালাও, নিসার আলী পালাও।'

একেবারে বড় রাস্তায় এসে থামল সে। পেছনে তাকাল। না, কেউ আসছে না। যেন কেউ আসবে আশা করছিল সে। তখন বড় উদ্যমহীন মনে হলো নিজেকে। মনে হলো, এক যুগ সে কাঁদে না। এতক্ষণ কী করছিল সে?

সেই ছেলেটার চিৎকার যেন কানে এখনো গরম শিসের মতো ঠেকছে।

'যেতে দেব না। না, না, না।'

আমি যেতে চাই না। বিড়বিড় করে নিজেকেই বলল নিসার আলী। মেয়েটার ভাই! ভাই! আশ্চর্য তো! কেমন আশ্চর্য! ওই নরকে বড় হচ্ছে। জীবনের ভালো কিছু জানবে না, একটা বই পড়বে না, মাথা তুলে মল রোড দিয়ে হাঁটতে পারবে না, আনারকলিতে গায়ে গা মিশিয়ে কেনাকাটা করতে পারবে না কারও সঙ্গে। বড় হলে কী করবে ছেলেটা? ওই লোকটার মতো একদিন তারও সামনের দাঁত পড়ে যাবে। পায়ে থাকবে পাম্প শু, যার রং চেনা যাবে না। সন্ধ্যার অন্ধকারে কানা কাঠবেড়ালির মতো খদ্দের ধরে নিয়ে যাবে—হয়তো তার বোনেরই মেয়ের কাছে। এক চোখ ছোট করে অশ্লীল বর্ণনা দেবে আর চড়া দাম হাঁকবে। পথের পাশে একটা লোহার বেঞ্চ হাতড়ে বসে পড়ল নিসার আলী। আমি এরকম দৌড়ে পালিয়ে এলাম কেন?

পকেটে হাত দিয়ে দেখল সিগারেটের প্যাকেটটা নেই। মেয়েটার ঘরে খুলে খেয়েছিল হয়তো, সেখানে ফেলে এসেছে। তখন টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল নিসার আলী।

চোখ বুজতেই তার নিজের ছোট ভাইটার মুখ ভেসে উঠল মনের মধ্যে। প্রথমে অস্পষ্ট, তারপর জীবন্ত স্থির একটা ছবির মতো।

যখন আমার কোমর জড়িয়ে ধরে চিৎকার করছিল, নয় বছর পরে আমার সেই ভাইটার কথা মনে পড়ে গেল—উচ্চারণ করে করে নিজেকেই শোনাতে লাগল নিসার আলী।—আমি একটা হতভাগা। নইলে ভুলে যাই!

কান্না পেতে লাগল যেন তার। কাঁদতে গেল, পারল না। কুকুরের মতো কুঁই কুঁই শব্দ করতে লাগল, যদি তাতে চোখ সজল হয়ে ওঠে। কিন্তু তাতেও কিছু হলো না। আমি কী করে এতদিন ভুলে থাকতে পেরেছিলাম!

সেই বিকেলটার কথা এখনো মনে হয় যেন কাল বিকেলের কথা। নয় বছরের ব্যবধান যেন মিথ্যে, স্বপ্ন। সেদিন অমৃতসরে লাগল দাঙ্গার আগুন।

কলেজে ছিল নিসার। সবাই বলল, কলেজ ছেড়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, বরং এখানেই নিরাপদ।



রমণী তিনজন তার সমুখে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে ফাঁকা হয়ে গেল কলেজ। হিন্দু আর শিখ অধ্যাপকেরা চুপ করে রইলেন। নিসার আলীরা যখন গিয়ে আবেদন নিয়ে দাঁড়াল, তাদের পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন তারা, অন্তত পুলিশ পাহারা বা কিছু অধ্যাপকেরা এ-ওর মুখের দিকে তাকালেন। তারা নিজেরাই যেন অসহায়। যেন কী একটা প্রচণ্ড আঘাতে বিশ্বাসের দড়িগুলো কেটে গেছে, ভরসার নৌকোয় ফুটো দেখা দিয়েছে। এখন যে যার নিজের বন্ধু, পাশের লোকটিকেও আর আপন মনে হয় না। মনে হয় জামার নিচে ছোরা লুকিয়ে আছে—যেকোনো মুহূর্তে বেরিয়ে পড়ে রক্তপান করবে।

বাইরে থেকে থেকেই ফায়ার ব্রিগেডের ঘণ্টা শোনা যাচ্ছে। অবাস্তব নীরবতা নেমে আসছে তার পরপরই। আবার চিরে যাচ্ছে আরেকটা ঘণ্টার বুক বিদীর্ণ করা শব্দে। এমনি করে সন্ধ্যে হয়ে এল। সেদিন পথের বাতিগুলোও যেন নিস্তেজ আলো বিকিরণ করতে লাগল।

ওটা সাহস ছিল না বা অন্য কিছু। নিসার আলী কেমন করে পথে বেরিয়ে পড়েছিল তা আজ সে নিজেই বলতে পারবে না। কিন্তু যতটা সহজ ভেবেছিল অতটা সহজে বাড়ি পৌঁছানো গেল না।

মন্দিরটাকে পাশে রেখে খানিক দূর এগিয়ে যেতেই নিসার আলী দেখল তিনটে লোক। ছায়ার সঙ্গে মিশে রয়েছে যেন। পদশব্দে খরগোশের মতো উৎকর্ণ হয়ে উঠল তারা। একটা দেয়ালের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল নিসার।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। তারপর যখন দেখল ওরা নেই, এক পা এগোল সে।

তখন একটা মর্মান্তিক চিৎকার শোনা গেল।

দৌড়ে নিসার আলী একটা যে বাড়ি পেল তার দরজায় গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

'খোলো, আমাকে ঢুকতে দাও।'

দরজা খুলতে যেন এক যুগ কাল অতিবাহিত হলে গেল। দরজা যখন খুলল হাতের বইখাতা ছিটিয়ে নিজেই খিল তুলে হাঁপাতে লাগল সে। দারুণ পিপাসা পেল তার হঠাৎ। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল বাড়ির সেই লোকটার দিকে, যে খুলে দিয়েছিল। রাস্তার দিকে হাত তুলে নিসার ফিসফিস করে উঠল, 'ওরা খুন করছে।'

লোকটার কোনো ভাব পরিবর্তন দেখা গেল না, যেন এটা একটা সংবাদ নয়।

ততক্ষণে আরও কয়েকজন এসে দাঁড়িয়েছে তার চারপাশে। আর এই প্রথম নিসার বুঝতে পারল সে একটা হিন্দু বাড়িতে এসে উঠেছে। ভীষণ ভয় করল তার। একবার মনে হলো পালায়। কিন্তু বাইরে চিৎকারটার কথা মনে হতেই পা বরফ হয়ে গেল। চোখের সামনে দেখতে পেল ছায়ায় দাঁড়ানো তিনমূর্তিকে। তখন নিজেই লাফ দিয়ে বারান্দায় উঠে দাঁড়াল নিসার। বলল, 'পানি।'

কে একজন তাকে পানি দিল। আরেকজন তার বইগুলো গুছিয়ে হাতে দিল। এবং আরেকজন বলল, শহরের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ।

তারা তাকে আশ্রয় দিল।

কিন্তু এক ঘণ্টাও যেতে পারল না, দরজায় ডাক শোনা গেল। তখন একজন তাকে বলল, পালিয়ে যেতে পেছনের খিড়কি দিয়ে। বলল, 'ওরা টের পেয়েছে হয়তো।'

দরজায় সেই আঘাত আর দরজা খোলবার জন্য সেই ডাক এখনো স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। বেঞ্চের ওপর উঠে বসল নিসার আলী। বিচ্ছিন্ন ছবির মতো সব মনে পড়ছে। যেন ঘুম থেকে উঠবার পর অসংলগ্ন একটা স্বপ্ন। একটা সিগারেট হলে ভালো হতো। আবার সারা পকেট দেখল। না, নেই। সত্যি ফেলে এসেছে। আমি কেন দৌড়ে এলাম?

হাঁটতে লাগল নিসার আলী। একটা পান দোকান থেকে সিগারেট কিনল। মাথা ধরা সারাবার ওষুধ দেখা যাচ্ছে।

দিনে তো দুটো বড়ি।

খাবে কী করে? কিনে পকেটে রেখে দিল নিসার আলী। তারপর সিগারেট ধরিয়ে আবার বেঞ্চটায় ফিরে গিয়ে দেখে একটা ভিকিরি তা দখল করে আছে।

পা বাড়াল নিসার। আমিনা এতক্ষণ শুয়ে পড়েছে। এত বড়টি হয়ে গেছে, অথচ আশ্চর্য, তার চোখেই পড়েনি।

সেই বাড়ি থেকে খিড়কি দিয়ে যখন বেরুল নিসার আলী তখন রাত আটটা। এক পা এগোয়, থমকে দাঁড়ায়, নিশ্বাস বন্ধ করে নিয়তির অপেক্ষা করে, আবার পা ফেলে। দূর থেকে ঝাপটা হাওয়ার মতো ভেসে আসে হঠাৎ কোলাহল, আবার তা ছেঁড়া মেঘের মতো কোথায় মিলিয়ে যায়। আরেকটু হলেই লাশটা মাড়িয়ে দিত নিসার। একেবারে দেয়ালের সঙ্গে ছেঁটে দাঁড়ায় সে। যেন আশপাশেই আততায়ী অপেক্ষা করছে তার জন্য। এই এক্ষুনি লাফ দিয়ে বেরুবে।

একটা আলোজ্বলা পথ খাঁ খাঁ করছে সামনে। সেটা দৌড়ে পার হয় নিসার।

তার বাড়ির কাছে যখন পৌঁছুল তখন রাত এগারোটা। বোকার মতো তাকিয়ে দেখে আকাশটা লাল। আর আর্তকোলাহল যেন পৃথিবীর শেষ মুহূর্ত উপস্থিত। দৌড়ুল নিসার। মোড়টা পার হতেই তাকে থমকে দাঁড়াতে হলো। তাদের বাড়িটা দাউ দাউ করে জ্বলছে। সামনে কয়েকটা লোক ছুটোছুটি করছে আর ছুড়ে দিচ্ছে বোতল থেকে পেট্রল। কটুগন্ধে ভরে উঠেছে বাতাস।

যেন সিনেমায় দেখছে নিসার আলী। লোকগুলো চিৎকার করছে, সেই চেনা চিৎকার, যে চিৎকার বক্তৃতার সভায় করে, পূজার মণ্ডপে যে চিৎকার শোনা যায়, কলেজে যে চিৎকার হয় ইলেকশনের সময়। অদ্ভুত লাগে নিসারের। সেই একই ধ্বনি, সেই একই উচ্চারণ।

বিশ্বসংসার মুছে যায় তার। কারও কথা মনে পড়ে না। নিজের জন্য ভীষণ ভয় করে ওঠে নিসারের। গা দিয়ে দরদর করে ঘাম ছুটতে থাকে। প্রস্রাব পেতে থাকে ভীষণ বেগে। দৌড়ে গিয়ে ঝোপের ভেতর লুকোয় নিসার আলী। তাদের বাড়ির পাশে সেই বিরাট ঝোপ যেখানে সে ছোটবেলায় খেলছে, খেলতে খেলতে হারিয়ে যাওয়ার ভান করছে, সেই ঝোপে গিয়ে মাটির ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে সে। হাত দিয়ে মাটি চেপে ধরে, দাঁতে দাঁত লাগিয়ে শরীরের ভয়ার্ত কাঁপুনিটা রোধ করার চেষ্টা করে—কিন্তু কিছুতে কিছু হয়না।

আকাশে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে আগুন। অসহ্য গরম হয়ে উঠেছে বাতাস। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে। আমাকে বাঁচতে হবে। আমি বাঁচব। আমি একটা দুঃস্বপ্ন দেখছি—আর কিছুনা।

কোলাহলটা হঠাৎ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। দূরে ঝোপের ওদিকটায় দ্রুত পায়ের শব্দ শোনা গেল। একটা, কয়েকটা। ওরা নিশ্চয়ই আমাকে খুঁজছে।

নিঃসাড় হয়ে মাটিতে মিশে যাওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করল নিসার আলী। এমনকি তার পাশ ঘেঁষে একজন চলে গেল।

তখন নিসার কী করে যেন টের পেল তার অদূরে আরও একজন ঠিক তারই মতো মাটিতে গা মিশিয়ে পড়ে আছে। প্রথমে মনে হলো একটা জন্তু, পরে স্পষ্ট দেখতে পেল—তার ভাই। বয়স তেরো হলে কী হবে, ভারী সুন্দর গড়ন হয়েছিল শরীরের। নিসার একটু এগোবার চেষ্টা করল। কিন্তু সাহস হলো না। সেই মুহূর্তে তার ভাইও বুঝি টের পেয়েছিল তাকে। বোকা ছেলেটা উঠে দাঁড়াল হামাগুড়ির ভঙ্গিতে। নিসার দেখল একটা ছুরি। ছুরিটা কোথা থেকে এসে পলক ফেলতে না ফেলতে আমূল বিদ্ধ হয়ে গেল তার ভাইয়ের পিঠে। একটা চিৎকার শুধু, তাও ভেঙে যাওয়া পেনসিলের মতো মাঝপথে থেমে গেল। আর কিছু না। ধুপ করে মাথাটা নামিয়ে নিল

নিসার।

সেই একটা দুঃস্বপ্নের মতো মুহূর্ত। কিন্তু দেখতে ভুল হয়নি। এখনো নিসার স্পষ্ট দেখতে পারছে আততায়ীকে। আগুনের রক্তিম আলোয় মুখটা সে দেখতে পেয়েছিল। এমনকি ঠোঁটের ওপর কালো বিরাট জন্মের দাগটা। আর ছুরিটা এখনো সে দেখতে পাচ্ছে একটা আধা-বৃত্ত এঁকে নেমে আসছে—যেন এক টুকরো জমাট আলো অন্ধকারে একবার উড়ে এসে আবার বসল অন্ধকারে।

আর নয়, আর নয়।

সামনে একটা স্কুটার পেল, তাতে উঠে বসল নিসার। বলল, মোরি গেট যাব।

স্কুটার তাকে মোরি গেটে নিয়ে চলল। আমি যদি ছবি আঁকতে পারতাম তো এক্ষুনি এঁকে দেখাতে পারতাম আমার ভাইকে যে হত্যা করেছিল। গোল মুখ, নাকটা কলমের মতো তীক্ষ্ণ, ওপরের ঠোঁটে জন্মের দাগ, ছোট্ট তিরতিরে দুটো কান মাথার সঙ্গে লেপ্টে আছে, চিবুকটা লেবুর মতো, মাথার মাঝখানে চেরা সিঁথি।

অনুতাপে পুড়তে লাগল নিসার আলী। এই নয় বছর আমি কী করে ভুলেছিলাম? আমার জন্ম বৃথা, আমি তার যোগ্য ভাই ছিলাম না, আমার রোজ মনে পড়া উচিত ছিল। আমার ক্ষমা নেই।

দোস্ত মোহাম্মদ বাস নিয়ে পেশোয়ার গেছে। কাল বাদে পরশু ফিরবে। দরজা খুলে দিল হাসিব। বলল, 'সিনেমা দেখে এলেন?'

নিসার আলী কোনো কথা না বলে তার খাটিয়া দরজার বাইরে টেনে এনে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। বলল, 'আজ আর রুটি খাব না।'

ফিরে এসে দোস্ত মোহাম্মদ মহাখুশি।

খুব বেশি খুশি হলে লোকটা কিছু বলতে পারে না, চোখ-মুখ ছাপিয়ে সেই ভাবটা উপচে বেরোল। নিসার আলী সেটা বুঝল। আমিনা যেন তার জীবনের ছবিটাই বদলে দিয়েছে। যেন কোথা থেকে একটা রঙিন মোড়ক কে এনে জীবনের সব দুঃখ আর কদর্যকে ঢেকে দিয়েছে। তাই ঝলমল করছে।

খুব ভোরে ওঠে নিসার। উঠে নাশতা মুখে দিতে না দিতে দোকানে যাবার বেলা হয়ে যায়। দুপুরে আনারকলিতেই খেয়ে নেয় নিসার, কষ্ট করে আর এতদূর ফিরে আসেনা। ফেরে যখন, কোনোদিন রাত দশটা, পালা পরব থাকলে তারও বেশি হয়ে যায়। সারাদিন খদ্দেরের পায়ে জুতো লাগানো আর খোলা করতে করতে আঙুল মটমট করতে থাকে। দুহাতের তেলো পুড়ে বার্নিশ আর চামড়ার কটুগন্ধ ভুরভুর করে।

আগেকার দিনগুলোয় বেশ দেরি করে করেই বাড়ি ফিরত নিসার। দোকান বন্ধ হয়ে গেলে সঙ্গী-সাথিদের সঙ্গে গল্প করতে করতে, হাঁটতে হাঁটতে। এখন সেই ধারাটা বদলে গেছে। সন্ধ্যে থেকে মন উসখুস করতে থাকে কখন ফিরে যাবে; ফিরে গেলে আমিনার সঙ্গে দেখা হবে। একেবারে চোখের দেখা না হোক, আড়াল থেকে কাপড়ের খসখস, রুপোর রুলির শব্দ কিংবা পায়ের চলাফেরা।

সন্ধ্যের পর ভিড় বাড়তে থাকে আনারকলিতে। লাহোরের তামাম মানুষ এসে যেন সরগরম করে তোলে এই বাজারটা। সুন্দরীদের জলুসে ম্লান হয়ে যায় দোকানের উজ্জ্বল আলোকমালা। অতিকায় খেলনার মতো নতুন ঝকঝকে মোটরগুলো আলো পোহাতে থাকে রাস্তার ধারে ধারে। চতুর্দিক থেকে মিলিত বিচিত্র একটা শব্দ ওঠে, উঠে আকাশময় ঘুরতে থাকে; বহুদূর থেকে শোনা যায়—আনারকলি জেগে

মাটির ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে সে



উঠেছে সান্ধ্য-অভিসারে।

নিসার আলী একেকজনের সঙ্গে মনে মনে মিলিয়ে দেখে আমিনাকে। একজনের একটা দেখে মনে হয় এইটি যদি আমিনার হতো তাহলে ভারী চমৎকার মানাত। আবার আরেকজনের আরেকটা দেখে মনে হয় এরকম হলে মানাত সবচেয়ে বেশি। সারাক্ষণ মনের মধ্যে এসব জল্পনা চলতে থাকে। একেক সময় মহিলারা বিব্রত হয়ে যান—একি লোকটা জুতো বার করে দেখাবে তো দেখাক, এরকম মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে কেন? নিসার আলী ভারী অপ্রস্তত হয়ে যায় তখন।

দোস্ত মোহাম্মদকে বলতে সাহস হয় না। বলবার কথা মনে উঠলে, মনে হয়—কী আছে তার যে তাকে মেয়ে দেবে? তাও অমন সুন্দর মিষ্টি ফুটফুটে মেয়ে।

নিজে নিজেই মন খারাপ করে বসে থাকে নিসার আলী। দোকানের মালিক মাঝেমধ্যে তিরস্কার করেন।

কী বাবা, সন্তোষকুমার হবার তাল নাকি। দোকানে থাকতে হলে কাজ করতে হবে। আয়েশি করতে হয় স্টুডিওতে নাম লেখাও।

আজকাল কারণে-অকারণে আমিনাকে দেখা যায়। আগে এক রকম তার সামনে বেরুতই না। সেদিন বেরুনোর পর থেকে কী হয়েছে আল্লাহ জানে, আমিনার লজ্জা কমে গেছে যেন। ডাকলে দাঁড়ায় কথা বললে মন দিয়ে শোনে।

বরং ভয় ভয় করতে থাকে নিসারেরই। কেউ যদি কখনো দেখে ফেলে আর একটা কিছু আপত্তি জানায় তো মহা কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে।

ইতিমধ্যে একদিন হাসিব আর আমিনাকে নিয়ে সিনেমা দেখে এসেছে নিসার। হাসিব বায়না ধরেছিল খুব। নিসার বলেছিল যেন চারদিকে তার সমদৃষ্টি, যদি সিনেমা দেখাতে হয় তো সে দু ভাই-বোনকেই দেখাবে।

সেদিন হল থেকে বেরিয়ে এসে পথে দাঁড়িয়ে ওরা মাল্টার রস খাচ্ছিল। আমিনা কাহিনিটা ভালো বুঝতে পারেনি। বুঝিয়ে দিচ্ছিল নিসার।

আরেকদিন নিয়ে গিয়েছিল আনারকলিতে। সেদিনও ছিল নিসারের ছুটির দিন।

এক জোড়া সোনালি স্যান্ডেল চমৎকার মানাত মোমের মতো আমিনার পায়ে। নিজের দোকানে ঢুকতে ভারী লজ্জা করেছে নিসারের। সে তাকে একেবারে আরেক মাথার অন্য এক দোকানে নিয়ে গেছে।

আজ সে সেলসম্যান নয়, একেবারে খদ্দের। চেয়ার টেনে বসে আমিনা আর হাসিবকে বসতে বলে গম্ভীর গলায় বলেছে, 'এদের পায়ে ভালো কিছু স্যান্ডেল দেখান তো।' আমিনা একেবারে অবাক। দোকানের মধ্যে কিছু বলতে পারল না। পা শক্ত করে বসে রইল। একগাদা বাক্স নামিয়ে নিয়ে এসে লোকটা পটপট স্যান্ডেলগুলো বার করল, বার করে চটাচট শব্দ তুলে সাজিয়ে রাখল সামনে।

দেখুন, যেটা পছন্দ। একেবারে হাল ফ্যাশনের জিনিস। দেখতে চমৎকার টিকবে অনেকদিন। এই জোড়াটা দেখুন না।

ঝুঁটিবাঁধা এক জোড়া নীল স্যান্ডেল।

চকচক করে ওঠে আমিনার চোখ। তার শক্ত করে চেপে ধরা পায়ের পাতা শিথিল হয়ে আসে। নিজের বিবর্ণ ছেঁড়া স্যান্ডেলটার জন্য লজ্জা করতে থাকে। অজান্তে পা'টা বাড়িয়ে দেয় আমিনা।

নিসার বলে, 'সোনালি কাজ করা কিছু নেই?'

তার অস্বস্তি করে কেমন—নিজে সেলসম্যান কিন্তু হুকুম করছে আরেকজনকে, অবিকল সেই রকম করে যে রকম তাকে খদ্দেররা করে। তাই নিসারের কণ্ঠস্বর শোনাল কেমন দুর্বল। দ্বিতীয় কথাটা বলতে পারল না। গোঁজামিল দেবার মতো করে হাসিবকে শুধাল, 'তুমি কী নেবে বললে না?'

নীল স্যান্ডেল জোড়াই পছন্দ হলো আমিনার। আর হাসিব নিল রবারের পুরু সোল লাগানো চপ্পল, চওড়া ফিতে বাঁধা।

'কী, হাঁটতে পারবে তো?'

হ্যাঁ, সে খুব পারবে। একবার হেঁটে দেখাল হাসিব। যদি আমিনা তাকে অমনি একবার হেঁটে দেখাত।

বেরিয়ে এসে দেখে সন্ধ্যে তখনো হয়নি। নিসার বলল, 'চলো গার্ডেনে গিয়ে বসি।'

একটা টাঙ্গা নিল ওরা।

টাঙ্গায় বসতেই বুকটা ধ্বক করে উঠল নিসারের। চোর-চোখে একবার তাকাল আমিনারদিকে। সেদিনের কথাটা মনে পড়ছে। কিছুতেই ফেরানো যাচ্ছে না।

বারবার ফিরে আসছে সেই ছবিটা, সেই বসবার ঘর, অন্ধকার বারান্দা, কোমর জড়িয়ে ধরে ছেলেটার চিৎকার, মেয়েটার খিলখিল হাসি।

যদি জানতে পারে আমিনা তাহলে একটা প্রলয় হয়ে যাবে। জানবার কোনো সম্ভাবনাই নেই, তবু ভীষণ ভয় ভয় করতে লাগল নিসার আলীর।

ধরো, যদি এমন হয় যে সেদিনের সেই টাঙ্গাওয়ালার সাথেই এখন দেখা হয়ে গেল।

শুকনো ঢোঁক গেলে নিসার আলী।

একটা সুন্দর ফাঁকা জায়গা দেখে বসে পড়ে ওরা তিনজন। হাসিব আর আমিনা গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে। তাদের সামনে মুখোমুখি নিসার আলী হাত-পা ছড়িয়ে দেয়, দিয়ে একটা সিগারেট ধরায়। অনাবশ্যকভাবে বলে, 'ওই যে দালানটা—ওটা বড় বড় সাহেবদের ক্লাব। ক্লাব মানে আড্ডা দেয়, খেলাধুলা করে, সাহেব-মেমসাহেব কত।'

পাঁপড়ভাজা ডেকে একগাদা পাঁপড় কেনে নিসার আলী। আশপাশে কতজন এরকম পরিবার নিয়ে বসে গল্প করছে, হাসছে, ছেলেরা লাফাচ্ছে, বেলা পড়ে আসছে, আকাশটা লাল দেখাচ্ছে ইতিমধ্যেই। নিজেকে একেবারে নতুন, একেবারে অন্য একটা মানুষের মতো মনে হয় নিসারের।

আমিনার খুব কাছাকাছি বোধ হয় নিজেকে। বুকের মধ্যে খুব ভালো লাগছে এরকম একটা শিরশির করে কী যেন কেবলই ঘুরতে থাকে।

মাটির বানানো টিলাটা দেখিয়ে নিসার হাসিবকে বলে, 'একলাফে ওটার মাথায় গিয়ে উঠতে পারলে চমৎকার একটি বকশিস দেব। দেখি তো?'

হাসিব তড়াক করে উঠে দাঁড়ায়। এতক্ষণ তারও উঠতে ইচ্ছে করছিল। বলতে পারেনি।

আমিনা তাকিয়ে ছিল চলে যাওয়া হাসিবের দিকে। এক দৌড়ে টিলার নিচে পৌঁছে গেছে সে, পেছন ফিরে একবার তাকিয়ে হেসে উঠতে লাগল হাসিব। নিসার আলী অস্ফুট কণ্ঠে শুধাল, 'স্যান্ডেল জোড়া পছন্দ হয়েছে?'

'হুঁ।'

'হুঁ কি। স্পষ্ট করে বলো না।'

'বললাম তো।'

'আমি শুনিনি।'

'আচ্ছা বেশ।'

একেবারে সেই প্রথম দিনে যে বেরিয়েছিল, সেই জড়তার লেশমাত্র নেই আমিনার মধ্যে আর। আসলে, এখনো তো কিশোরী; আর সেই জাতের মেয়ে, যে একবার মুক্ত হলে ভেতরের ঝর্ণা খুলে দেয়। ঝর্ণাটা ছিলই, কেবল দেখা যেত না। নিজেকে বড় সৌভাগ্যবান মনে করে নিসার। খামোকা বলে, 'তুমি কত বড় হয়ে গেছ, আমার চোখেই পড়েনি।'

সলজ্জ হয়ে মুখ নামায় আমিনা। নিসার একটা সিগারেট ধরায়। এই কথাটা বারবার বলে, বারবার বলেও যেন তৃপ্তি হচ্ছে না তার।

কী বলতে কী বলছে। আমিনার হঠাৎ খুব লজ্জা করতে

থাকে কথাটা শুনে। হাত-পা জড়ো করে কাপড় টেনেটুনে বসতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তাতেও যেন কে বাধা দিচ্ছে। খুব অন্যমনস্ক হবার ভান করে আমিনা। চুপ করে থাকাটাও কেমন যেন। তাই শেষ অবধি বলে, 'আপনার দোকানে নিয়ে গেলেন না?'

'আরেকদিন। কেমন?'

'আপনাদের দোকানটা খুব বড়?'

'অ-নেক।'

'আনারকলিতে এত লোক হয়?'

সত্যি সত্যি বিস্ময় নিয়ে আমিনা জিজ্ঞেস করে। আমিনাকে দেখে দেখে যেন তৃপ্তি হয় না নিসারের। একগাদা উথালপাতাল কথা মনের মধ্যে ভাঙতে-গড়তে থাকে। মহা উৎসাহের সঙ্গে নিসার শুরু করে, 'বাজারটা যার নামে তার কথা শুনেছ?'

মাথা নাড়ে আমিনা। বড় বড় দুচোখ মেলে তাকায়।

আনারকলি একটা মেয়ের নাম ছিল। ভারী সুন্দর, একেবারে তোমার মতো দেখতে। অবিকল আনারের মতো। তাই নামটা।

তার মতো শুনে আমিনা ঠোঁট কুঞ্চিত করে বলে, 'ধেৎ।'

'আচ্ছা, তোমার মতো নাই হলো, তোমার চেয়ে একটুখানি মন্দ ছিল দেখতে।'

'যাহ্।'

'হ্যাঁ। তারপর শোনো। সে সব অনেক দিনের কথা। জাহাঙ্গীর তখন হিন্দুস্তানের বাদশাহ নন, তার বাবা আকবর, আর তিনি যুবরাজ সেলিম। ইতিহাসে পড়োনি?'

ইতিহাসের কথা শুনে আমিনা যেন সব ভুলে যায়। একে তার সবচেয়ে ভালো লাগে ইতিহাসের বই পড়তে, তার ওপর এই তো সেদিন সদ্য দেখে এসেছে জাহাঙ্গীরের কবর, নূরজাহানের।

সেলিম ভালোবেসে ফেলল আনারকলিকে। কথাটা বলা খুব সহজ হলো না। নিসার আলী একবার ঢোঁক গিলে খুব দ্রুত উচ্চারণ করল, যেন এটা একেবারে কিছুই নয়, 'সেলিম ভালোবেসে ফেলল আনারকলিকে।'

আবার রাঙা হলো আমিনার মুখ।

কিন্তু আনারকলি সাধারণ মেয়ে, নাচ দেখিয়ে বেড়ায়। আর সেলিম বাদশাহর ছেলে, দুদিন পরে বাদশা হবে। আকবর খুব রাগ করলেন। সেলিম তবু শুনবে না। আনারকলিকে বিয়ে করবেই। মেলা ভালোবাসত কিনা। শেষে আকবর আনারকলিকে বন্দী করে লাহোরে পাঠিয়ে দিলেন। দণ্ড দিলেন মৃত্যুদণ্ড। দেয়ালের সঙ্গে গেঁথে তাঁকে মেরে ফেলা হলো।

'ইশ্।'

অজান্তে আমিনা শিউরে উঠল। নিসার আলী একবার তার হাত ছুঁয়ে দেখবার জন্যে হাত বাড়াল। পরে কী ভেবে থামল। বলল, 'কী কাণ্ড দ্যাখো। অনেক বছর পর জাহাঙ্গীর তখন বাদশা, কাশ্মীর থেকে ফেরবার পথে লাহোরে হলো অসুখ। এখানেই মারা গেলেন। অদ্ভুত না? আসলে ভালোবাসাটা খুব ছিল বলে মরেও আনারকলি টেনে আনল জাহাঙ্গীরকে এই লাহোরেই। আবার দেখো, জাহাঙ্গীরের বেগম নূরজাহান, তাঁর কবরও লাহোরে।'

আজ যেন নিসার আলীর মুখ খুলে গিয়েছে। আমিনা শুনছে কি শুনছে না, শুনলে তার কী প্রতিক্রিয়া হচ্ছে—এসব কিছুই তার ভাবনার ভেতরে আসছে না।

হঠাৎ সে বলল, 'আচ্ছা ধরো আমিনা, আমার যদি খুব বিপদ হয়?'

প্রশ্নটার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারল না মেয়েটা। এতক্ষণ চোখ কান ঝাঁ ঝাঁ করছিল বাদশাহের প্রণয়কাহিনি শুনে, এখন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। শুধাল, 'বিপদ, কী বিপদ?'

'ও কিছু না।'

চুপ করে বসে রইল দুজন। আকাশটা লাল হয়ে আসছে। দূরে খোলা রেস্তোরাঁয় ধুম আড্ডা দিচ্ছে লোকজন। আমিনা বলল, 'হাসিব এখনো আসছে না কেন?'

'সত্যি, দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

উদ্বিগ্ন চোখে আমিনা টিলাটার দিকে তাকিয়ে রইল। আর তো সময় নেই। ফুরিয়ে আসছে সময়। নিসার একটা হাত রাখল আমিনার হাতের ওপর। যেন হঠাৎ লেগে গেছে, ভুলে লেগে গেছে। আমিনা চট করে সরিয়ে নিল। নিসার আলীর ভেতরে তখন বিদ্যুৎ বয়ে যাচ্ছিল, সেটা যেন রুদ্ধ হয়ে গেল। এমন সময় দেখা গেল হাবিসকে। সে ফিরে আসছে।

দিনগুলো চমৎকার যাচ্ছিল। কেবল মাঝে মাঝে জ্বর আসবার মতো করে অনুতাপ আসে নিসার আলীর, সেদিন সন্ধ্যেয় ওই বিশ্রী কাণ্ড করতে গিয়েছিল বলে। প্রায় চুপচাপ বিষাদে ডোবা মধ্যমা মেয়েটার কথা মনে পড়ে—মনে করতে চায়না নিসার। ছোটটির খিলখিল হাসি শুনতে পায়—শুনতে চায় না নিসার। আর অন্ধকারে তার কোমর জড়িয়ে ধরে ছেলেটার চিৎকার কেবলই ঘুরতে থাকে মাথার মধ্যে—মাথাটা ধরে ওঠে নিসারের।

অমৃতসর।

দাঁতে দাঁত চেপে নিসার আলী ভেতরের ক্রোধ আর দুঃখ দমিয়ে রাখবার চেষ্টা করে। খুব সুফল হয় না। একেক সময় মনে হয় তার মাথাটাই বুঝি খারাপ হয়ে যাবে।

দোকানের সহকর্মীরা ঠাট্টা করে।

'আরে, বড্ড উদাস দেখছি যে। প্রেম ট্রেম নাকি?'

'না, না।'

'আলবত। চোখ-মুখ বলছে।'

'চোখ-মুখ বলে নাকি?'

'বলে না?—'

তারা চমৎকার ব্যাখ্যা শোনাতে থাকে নিসার আলীকে।

'ধরো চোখ যদি থমথমে থাকে আর মুখ খুব রোশনাই—তাহলে প্রেম কিন্তু মেয়েটা সাড়া দিচ্ছে না। আর চোখ যদি রোশনাই কিন্তু মুখ থমথমে তাহলে মিয়া বিবি রাজি অথচ বিবির বাবা রাজি নন। আর চোখ-মুখ দুইই থমথমে হলে বুঝতে হবে মন বাঁধা পড়েছে কিন্তু বলবার পথ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সবসেরা যখন চোখ-মুখ দুইই রোশনাই। কেল্লাফতে।'

'থামো, থামো।'

নিসার আলীর হাসিও পায়, ধমক দিতেও ইচ্ছে করে। বলে, 'ওসব কিছু না। এমনিতে। ভাবনায় আছি।'

'ভাবনা কিসের? লাহোরে যোয়ান ছেলের ভাবনা কি? গোটা লাহোর তার প্রণয়িনী। সেই শেরটা শোনোনি?'

শের শোনা আর হয় না। খদ্দের এসে গেছে।

সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

কী দেব বলুন।

বেশ আছে ওরা। একেক সময় ঈর্ষা করতে ইচ্ছে করে। মনে হয়, খোদা বেছে বেছে তার জন্যই যত কষ্ট যত দুঃখ তুলে রেখেছেন। মনে হয়, সে যদি মরে যেত দাঙ্গায়, যেমন তার বাবা গেছে, মা গেছে, ভাই গেছে, তাহলে বেঁচে যেত।

আলবত আমি বেঁচে থাকব। শেষ দেখে যাব। খদ্দের অবাক হয়ে যায়।

'কী বলছেন জনাব?'

'কিছু না। আপনাকে না।'

বিব্রত হয়ে নিসার আলী আমতা আমতা করতে থাকে। পাগল ভেবে খদ্দের পালিয়ে যায়। আজকাল এরকম মাঝেমধ্যেই হচ্ছে। শেষে চাকরিটা না চলে যায়। মালিক তো সেদিন স্পষ্টই বলে দিলেন, 'কাজে মন দেখছি না যে বড়।'

'জি না, মন লাগিয়েই তো কাজ করছি।'

'তাহলে আমার চোখ খারাপ?'

নিসার আলীর ইচ্ছে হয় মালিকের চকচকে মোটাসোটা গলাটা চিপে ধরে। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকে মাথা নিচু করে। একি হয়েছে তার? কিচ্ছু সহ্য করতে পারে না। পৃথিবীটা যেন তার সঙ্গে কেবল ষড়যন্ত্র করে চলেছে, কথায় কাথায় খুন চেপে যায় মাথায়।

পেছনে গিয়ে মাথায় পানি দিয়ে আসে নিসার। আমিনার, কেবল আমিনার কথা যতক্ষণ মনে পড়ে ভারী ভালো লাগে ভেতরটা। এ ভালো লাগা কিছু বলা যায় না, এত বড় এ ভালো লাগা যে বুক ফেটে বেরিয়ে যেতে চায়।

দোস্ত মোহাম্মদকে বলবে। কিন্তু আমিনা যদি নিজেই রাজি না হয়? সেদিন স্যান্ডেল কিনে দিলাম, ঘরে ফিরে বাপের কাছ থেকে টাকা চেয়ে নিয়ে দাম দিয়ে দিল।

দাম কি নিতে চেয়েছিল নিসার আলী? না নিয়ে উপায় ছিল না। যেন দামটা না নিলে তার ভেতরের ইচ্ছেটা আচমকা সবার সামনে খোলামেলা হয়ে পড়বে। যেন একটা অপরাধের কথা সারা মহল্লায় জানাজানি হয়ে যাবে। নিতে হলো। কিন্তু হাসিবেরটা নিল না।

'ওটা ওকে আমি দিয়েছি। আমার ভাই থাকলে দিতাম না?'

দোস্ত মোহাম্মদ বলেছিল, 'জরুর দিতে। তা এ টাকা তুমি রাখো। আমার তরফ থেকে কিছু কিনে নিয়ো।'

'কেন?'

'আমার আরেকটা ছেলে থাকলে দিতাম না?'

একেবারে মাপজোক করা নিখুঁত সত্যি কথা। নিসার আপত্তি করবে, জো কই? পাঠানের আওলাদ ঋণ রাখে না, রক্তের বদলে রক্ত নেবে, দেবে—ভালোবাসার বদলে ভালোবাসা।

কথাটা শুনে আশার আলো দেখতে পেয়েছিল নিসার। হয়তো বললে দোস্ত মোহাম্মদ আপত্তি করবে না। ভয় শুধু আমিনাকে নিয়ে। অথচ কেন এ ভয় তা বলতে পারবে না। শুধু শুধু মনে হয়।

একদিন গরমে ঘুম আসছিল না। দোস্ত মোহাম্মদ সেদিন বাইরে গেছে। ফিরবে পরশু। নিসার আলী তার খাটিয়া নিয়ে বাইরে রাস্তার ওপরে শুতে এল রাতদুপুরে উঠে। তবু খানিকটা

আমিনাকে একেবারে বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছে নিসার



বাতাস পাওয়া যাচ্ছে।

চিত হয়ে শুতেই যেন বুকের ওপর এক লক্ষ তারা চাদরের মতো নেমে এল। খুব বড় মনে হচ্ছে একেকটা তারাকে—এত কাছে যেন তিন-চারতলা বাড়ির ওপরে উপুড় হয়ে তাকে দেখছে আকাশটা। ভারী অবাক তো।

মনটা নরম হয়ে এল নিসারের। তুলোর মতো হালকা পাখায় উড়ছে কত কী ভাবনা, স্মৃতি, ভবিষ্যৎ। কলেজে পড়ত কতকাল আগে—যেন কোনো দিনই পড়ত না। তার কেউ ছিল না। আমিনা যেন তার স্বপ্নের একটা অংশ দিনের আলোয় এই দুচোখ দিয়ে কখনো তাকে দেখেনি নিসার। এক সার নতুন চকচকে জুতো, চপ্পল, কাজ করা স্যান্ডেল মিছিল করে যাচ্ছে চোখের সামনে দিয়ে। এটা ছয় নং সাইজ; দাম সতেরো টাকা পনেরো আনা; ওটা হাতেকাজ করা, চার পাঁচ ছয় নং একই দাম, একুশ টাকা সাত আনা। এটা দেখুন, এর সোল খুব টেকসই, সারা আনারকলিতে এর জুড়ি জুতো মিলবে না। আনারকলির গল্পটা শুনে, আচ্ছা, আমিনা সেদিন কী মনে করল? কিছু বুঝতে পারল? কিছু বোঝে মেয়েটা? নীল স্যান্ডেলটা কেমন মানাল একদিন পরে দেখাল না। দাম দিতে গেল কেন? রোদে পুড়ে যাচ্ছে রেললাইন, ওপারে নূরজাহানের কবর; আমিনা কেন মুখ ফিরিয়ে কোকা-কোলা খাচ্ছে? একটা কথা বলছে না। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। ছেলেটো কোমর জড়িয়ে ধরেছিল আচমকা, ভীষণ ভয় হয়েছিল। সেই গোল মুখ, ঠোঁটের ওপর জন্মদাগ, ছুরিটা—আমার ভাইকে ভালো করে একদিন একটা মিঠে কথাও বলিনি। ও থাকলে ওকে মেডিকেলে পড়তে দিতাম। ডাক্তার হতো। দোস্ত মোহাম্মদকে বলব, ফিরে আসুক। একবার পেশোয়ার যেতে হবে। আমার খুব বেড়াতে শখ ছিল। আচ্ছা, অমৃতসরে গেলে লোকটার দেখা পাওয়া যাবে না? আমি দেখলেই ঠিক চিনতে পারব। উহ্, আগুনে আকাশটা লাল হয়ে উঠেছে।

নিশ্বাস ফেলে ধড়মড় করে চোখ মেলতেই দেখে ল্যাম্প হাতে হাসিব দাঁড়িয়ে আছে। লালচে আলোয় ভূতের মতো দেখাচ্ছে তাকে। লাফ দিয়ে উঠে বসল নিসার।

'কে?'

'আমি।'

হাসিবের গলা কাঁপছে। উঠে দাঁড়িয়ে তার গায়ে হাত দিয়ে নিসার শুধাল, 'কী হয়েছে?'

হাসিব চুপ।

'ভয় করছে?'

কথা বলে না হাসিব। ভয়ের কথা মুখে বলতে কেমন শরম করছে দেখো ছেলেটার।

নিসার হেসে বলল, 'এই কথা। চলো। আমি তো এখানেই আছি।'বলতে বলতে খাটিয়া ভেতরে নিয়ে এল নিসার। বাপ নেই বাড়িতে, নিসারও যদি বাইরে ঘুমোয়, ভয় পাবার কথাই। পাশের ঘরে চোখ রেখে সে জিজ্ঞেস করল, 'আমিনা জেগে নাকি?'

'হুঁ।'

'ও, ভয় তাহলে আমিনা পেয়েছে। ভয় কিসের?দুদশটা চোর ডাকু দেও দানো এক তুড়িতে কাবু করে ফেলব না।'

নিসার এসে একেবারে দরজার কাছে দাঁড়ায়।

দরজা ঠেলে হাসিবকে বলে, 'যাও শোওগে। এ ঘরে আমি আছি।'

দেখে জড়োসড়ো হয়ে আমিনা শুয়ে আছে। একেবারে অবাস্তব লাগছে। আমিনাকে এরকমভাবে দেখবে, যেন কী একটা সৌভাগ্যের দেখা পেয়ে গেছে নিসার। দরজাটা বন্ধ করে না, বরং এক পা আরও ভেতরে এসে বলে, 'কী সব ছেলেমানুষি। এই আমিনা, ঘুমোও।'

আর কাছে যেতে সাহস হয়না নিসারের। বড় ইচ্ছে করছে ল্যাম্পটা তুলে আমিনার মুখ দেখে। বুকের ভেতরটা আবার তোলপাড় করতে শুরু করেছে। নিসার বলে, 'এখন ঘুমোলে, ভয় না করলে, কাল রাত্রিতে নৌকো করে বেড়াতে নিয়ে যাব।'

বলে ফিরে আসে নিজের ঘরে। আমিনা একটা 'হ্যাঁ' 'না' কিছুই বলল না। কেন?—সেই ভাবনায় অনেকক্ষণ ঘুম এল না নিসারের। পরপর দুটো সিগারেট ধরাল। পাশের ঘর থেকে নিশ্বাসের শব্দ আসছে। হাসিব। আমিনা কি নিশ্বাস বন্ধ করে জেগে আছে? আরেকবার তীব্র ইচ্ছে হয় মুখটা দেখতে।

গভীর রাতে উঠে চোরের মতো অনেকক্ষণ আমিনার মুখ দেখে নিসার। গালে বালিশের গভীর লাল ভাঁজ পড়েছে। ঠোঁটটা ফুলে টসটস করছে ঘুমে। ডান দিকে কানের কাছে একটা রক্ত-তিল, কোনো দিন চোখেই পড়েনি তার। নিজের কপালে হাত দিয়ে দেখে ভীষণ ঘামছে নিসার। এক পা এক পা করে ফিরে আসে সে। পরদিন সকালে মনে হয় স্বপ্ন দেখেছিল। সুন্দর স্বপ্ন ছিল ওটা, যার মধ্যে সে তার মুখ দেখেছে ল্যাম্পের আলো ফেলে। হাসিবকে ডেকে বলল,'মনে আছে, আজ রাত্রিতে নিয়ে যাব। বিকেলে তৈরি হয়ে থাকতে বোলো আমিনাকে।' পারলে হাসিব এক্ষুনি তৈরি হয়ে থাকে।

ব্রিজের নিচে সার সার নৌকা বাঁধা। পয়সা দিলে চড়তে দেয়। নিজে ইচ্ছেমতো দাঁড় টেনে যতদূর খুশি চলে যাও। ছোট্ট নৌকো। মুখোমুখি দুজন বসা যায় কেবল। কথা বলো। কলেজ পালিয়ে ছেলেমেয়েরা আসে। সারা দুপুর হই হই করে বিকেলে চলে যায়। কত ছুটির দিনে নিসার আলী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের মজা দেখেছে। একেবারে সিনেমার মতো। যেন অন্য জগতের মানুষ ওরা।

আজ আমিনাকে নিয়ে সে ওইরকম করবে। মুশকিল হাসিবকে নিয়ে। সে তো সঙ্গে আসবেই, সে থাকলে কী কথা বলবে সে আমিনার সাথে। তা সে বুদ্ধিও ভেবে রেখেছে নিসার। বলবে, তিনজন তো ওঠা যাবে না, তার চেয়ে, পয়সা নিয়ে টস্ করা যাক, যে হারবে সে পাড়ে বসে থাকবে; তাকে নিয়ে যাওয়া হবে পরে। ছেলেমানুষকে ফাঁকি দিতে কতক্ষণ। এমনভাবে টস করবে নিসার যে আমিনাই ভাগে পড়বে। হাসিবকে না হয় কিছু খেতে কিনে দেওয়া যাবে।

ছুটি চাইল নিসার। মালিক শুধালেন, 'কেন?'

'কাজ আছে।'

'আর দোকানে কাজ নেই? এখানে কাজ হয় না? এটা আড্ডা দেবার মাইফেল?'

'জি, জরুরি কাজ। একটা বেলা।'

'বিকেলবেলা বিক্রির সময়। হবে না।'

'কোনো দিন তো চাইনি।'

'কোনো দিন চাওনি, তাই দিতে হবে? অ্যাঁ? বাহ্, কোনো দিন মানুষ খুন করিনি, আজ একটা করব, করতে দিন, আর অমনি দিলাম।'

মালিকের কথা বলার ধরনই ওই। অন্যদিন হলে চুপ করে থাকত। আজ চড়চড় করে রাগ মাথায় উঠে গেল। ঠাস্ করে বলেই ফেলল নিসার, 'ছুটি না দেবেন না দেবেন, ত্যাড়া কথা বলছেন কেন? যান, আপনার চাকরি করি না আমি।'

দুম করে চলে গেল নিসার।

'আরে, শোনো, শোনো।'

পেছন থেকে ডাক। অবাক হয় নিসার। কানে ভুল শুনছে না তো! এত মিঠে গলা কোনো দিন শোনেনি মালিকের।

ঘুঘু লোক তিনি। ফুটপাতে জুতো সাজিয়ে বিক্রি করতেন একসময়। ঝোপ বুঝে কোপ, হাওয়া বুঝে গাওয়া—এই করে আনারকলিতে এতবড় দোকান জাঁকিয়ে বসেছেন। সে উন্নতি কি এমনিতে হয়েছে। নিসার ছেলেটা খাটিয়া আছে, ইংরেজি দুচার দশ মিনিট বলতে পারে, দোকানের কাজে লাগে, খদ্দের খুশি হয়। মেয়েদের সঙ্গে তমিজ নিয়ে কারবার করে; পেছনে বিচ্ছিরি কথা বলে না। সে যেতে চাইলেই যেতে দেওয়া যায়?

'শোনো, শোনো।'

'কী?'

'বলি, তোমার ভালোর জন্যই বলি। তা যাও কোথায় যাবে। কাল সকালে আর দেরি কোরো না বাপু।'

নিশ্চিন্ত হলো নিসার। ঝোঁকের মাথায় চাকরি ছাড়বার কথাটা বলে অনুতাপ হচ্ছিল না যে তা নয়। হাসিমুখে বেরুল সে। মোড় থেকে বেশি দামের সিগারেট কিনল এক প্যাকেট। তারপর স্কুটার নিয়ে এল মোরি গেট।

বিষণ্ণ মুখে হাসিব বসে আছে।

'কিরে কী হলো?'

নিসার লাফিয়ে টপকে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে শুধোয়।

'বেড়াতে যাবি না?'

কণ্ঠ থেকে খুশি তার উপচে পড়তে থাকে। হাসিব মৃদুগলায় বলে, 'জানি না।'

'মানে?'

থমকে দাঁড়ায় নিসার। খুশির নদীতে মেঘের ছায়া পড়ে। আমিনার কিছু হয়েছে নাকি? গলা তুলে তাকে ডাকে। অনেকক্ষণ পর তার সাড়া পাওয়া যায়। মন্থর, থমথমে। বলে, 'কী?'

'কাল বললাম যে বেড়াতে যাব, তার কী হলো?'

দরজা ধরে মেঝে পা দিয়ে খুঁটতে থাকে আমিনা। নিসার আবার জিজ্ঞেস করে, 'মনে নেই?'

'যাব না।'বলেই ভেতরে চলে যায় আমিনা। তার চলে যাবার দোলা পেয়ে দরজাটা আছড়ে পড়ে একবার। কিছু বুঝতে পারে না নিসার। বোকার মতো চারদিকে তাকিয়ে নিজেকেই বলে, 'বারে!'

মাথাটা যেন ধরে যায় এক মুহূর্তে। দোকানে ছুটি নেবার জন্যে ঝগড়া, ভালো সিগারেট, কাল সারা রাত আজ সারা সকালের রঙিন কল্পনা—সব অর্থহীন আঁধার মনে হয় নিসারের। মনে হয়, এক নিমেষে সে ফকির হয়ে গেল। বুকের ভেতরে কষ্ট হতে থাকে। আমিনা আমাকে ভালোবাসেনা; বাসলে যেত। আমিনা নিশ্চয়ই টের পেয়েছে তার মনের কথা—নাকি কাল রাতে ওভাবে ওর ঘরে ঢুকেছিল তার অপরাধ নিয়েছে মেয়েটা? শুধু শুধু আমি ঝগড়া করলাম মালিকের সঙ্গে।

মালিকের ব্যঙ্গমুখর চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। পেলে খুন করে ফেলতে পারি। তফাত যাও, নিকাল যাও। রোদে পুড়ে যাচ্ছে রেললাইন, তার ওপারে নূরজাহানের কবর। বেচারি। জাহাঙ্গীর ভালোবাসত আনারকলিকে। আমি কেন অন্য কাউকে ভালোবাসতে পারি না? তাহলে আমিনাকে আমি চোখ তুলেও দেখতাম না। নীল স্যান্ডেল জোড়া কেমন মানায় তাকে? দোস্ত মোহাম্মদের টাকাগুলো দিয়ে একটা ছুরি কিনেছিল নিসার। গিয়েছিল একটা শখের জিনিস, যেমন রুমাল কি চোখে দেবার কালো চশমা কিনবে বলে, পাশের দোকানে শো-কেসে সাজানো ছিল চকচকে ছুরিটা, অনেকগুলো, পছন্দ হয়ে গেল। বালিশের নিচে হাত দিয়ে দেখল নিসার। আছে।

নিশ্বাস পড়ছ দ্রুত। পাশ বদলে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করল নিসার। ন বছর আমিভুলে ছিলাম কী করে? আমার ভাই যখন জখম হলো তখন আমি কিছু করতে পারলাম না। আমি নিজেকে বাঁচাবার জন্যে মাটিতে আরও মিশে গিয়ে চুপ করে ছিলাম। ঠোঁটের ওপর কালো তিল, গোল মুখটা মনে পড়ছে, আগুনের হলকায় এখনো যেন চকচক করছে।

হঠাৎ নিশ্বাস বন্ধ করে কান খাড়া করে নিসার। কার যেন পায়ের শব্দ। সতর্ক হয়ে একপলক অপেক্ষা করে সে। চোখ খুলে দেখে ঘরে রাত্রির অন্ধকার। সন্ধ্যে হয়ে গেছে কখন? এতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল? পায়ের শব্দটা থেমে গেল আচমকা।

লাফ দিয়ে উঠে বসে স্খলিত কণ্ঠে নিসার শুধাল, 'কে?'

উত্তর শোনার দরকার হলো না। অন্ধকারে আমিনা দাঁড়িয়ে আছে। নিসার কিছু বলল না। তেমনি বসে রইল খাটিয়ার ওপর। আর মেয়েটা জানালার কবাটে পিঠ ঠেকিয়ে যেন নিঃশব্দ ক্ষণগুলো গুনছে। এর বেশি কিছু না।

তখন নিসার আবার শুয়ে পড়ল। আস্তে, আস্তে। যেন মৃত্যুশয্যায় যাচ্ছে। আমিনা অনুচ্চ কণ্ঠে উচ্চারণ করল, 'আপনি দুপুরে খেলেন না?'

জবাব দিল না নিসার। আবার একটা অনন্ত নিস্তব্ধ কাল বয়ে গেল তাদের দুজনকে দুপাশে রেখে। বেড়াতে যাবে না শুনে সেই যে নিসার শুয়ে পড়েছিল আর ওঠেনি। হাসিব খেতে ডেকেছিল, তাকে ধমকে পাঠিয়ে দিয়েছে। আমিনার হাতে ওড়নার প্রান্তটা খসখস করে উঠল। যেন কিছু বলবে। কান পেতে রইল নিসার। এতক্ষণে মনে হচ্ছে তার, সত্যি সে অভিমান করেছে। খারাপ লাগছে, আবার কেমন ভালোও লাগছে, যা বোঝা যাচ্ছে না। আমিনা বলল, 'আপনি রাগ করেছেন?'

'কী?'

মেয়েটা তার জবাব দিল না। নিসার শুধাল, 'কী বলছ?'

তবু আমিনা কিছু বলল না। তখন নিসার উঠে এল তার কাছে। এসে অন্ধকারে তার মুখ দেখা গেল না ভালো করে। অস্পষ্ট কান্নার একটা শব্দ শুনতে পেল সে। এক মুহূর্ত দ্বিধা করল নিসার। তারপর সন্তর্পণে নিজের হাত রাখল আমিনার চোখে।

'কাঁদছ? রাগ করিনি। শোনো, ক্ষিদে ছিল না, খাইনি। বেড়াতে গেলে না কেন? গেলেই তো হতো। আমি ছুটি নিয়ে এলাম। এই শোনো, কাঁদে না।'

বলতে বলতে আমিনাকে একেবারে বুকের মধ্যে কখন টেনে নিয়েছে নিসার তা কেউ জানে না। পাগলের মতো তাকে হাতে পিঠে কণ্ঠে গালের দুপাশে আদর করতে লাগল নিসার।

শিউরে উঠল মেয়েটা। সে বলতে পারল না, এই ভয় করছিল সে, তাই বেড়াতে যায়নি, আর তা-ই ঘটে গেল। নিজেকে সে কিছুতেই ছাড়াতে পারছে না। একটা বিস্ময়জড়ানো শঙ্কা নেশার মতো ফুলে ফুলে উঠছে তার ভেতরে। আর কান্না পাচ্ছে আরও, কিন্তু কাঁদতে গিয়ে দেখে এক ফোঁটা অশ্রু নেই চোখে। ছোট্ট একটা পাখি, যার ডানা এখনো সবল হয়নি, তেমনি কাতর কোমলতা নিয়ে অনেকক্ষণ নিসারের বুকের মধ্যে রইল আমিনা।

নিসারই তাকে ছেড়ে দিয়ে বলল, 'হাসিব এসে পড়বে।'

এক মুহূর্তে লজ্জা এসে ভেঙে পড়ল যেন, দৌড়ে পালাল আমিনা।

একা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে তখন নিসার আলী হা-হা করে হাসতে লাগল। প্রাণখোলা অফুরন্ত হাসি। সে হাসি কারও কানে গেলে তাকে পাগল ছাড়া আর কিছুই ভাববে না—এ বোধটুকুও আর নেই। হাসতে হাসতে খাটিয়ায় গিয়ে ধপ করে বসে পড়ল নিসার আলী।

পরদিন পেশোয়ার থেকে ফিরে এল দোস্ত মোহাম্মদ। অন্যদিন হলে নিসার নিজেই কুশল জিজ্ঞেস করবার জন্যে পাশে টুল টেনে বসত, আজ দূরে সরে রইল। কেমন লজ্জা করছে, কাছে যেতে ইচ্ছে করছে অথচ যাওয়া যাচ্ছে না; যতক্ষণ আড়ালে থাকা যায়।

আমিনার তরফ থেকে নিশ্চিত নিসার। ভয় কেবল দোস্ত মোহাম্মদকে নিয়ে। যদি সে রাজি না হয়।

কয়েক দিন বড় অন্যমনস্ক কাটল নিসারের। রাতে দেরি করে ফেরে, একেবারে ভোরে উঠে বেরিয়ে যায়। আবার দুদিনের জন্য বেরুল দোস্ত মোহাম্মদ। তখন যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেল। তখন সেই পুরোনো দিনের মতো সন্ধ্যে হতে না হতেই বাড়ি ফেরা।

ইতিমধ্যে রাভি নদীতে গিয়েছিল আমিনাকে নিয়ে।

দাঁড় বাইতে বাইতে বলেছিল, 'চাচা এবার আসুক। বলতে হবে।'

শরমে তখন কী সুন্দর দেখাচ্ছিল আমিনাকে। কিন্তু বলা সহজ হলো না কিছুতেই। কতবার পাশে বসল, এই বলি বলি করেও বলতে পারল না নিসার। দোস্ত মোহাম্মদ জিজ্ঞেস করে, 'দোকান কেমন চলছে? দুনিয়ার খবর কী? কাশ্মীর?'

ব্যস, কথাবার্তা একেবারে ঘুরে যায়। নিসারের অপরাধ লেখাপড়া করেছে, অতএব বিশ্বের যাবতীয় সংবাদ আর তার ওপরে মতামত যেন হাতের তেলোয় তার। শোনাও দোস্ত মোহাম্মদকে।

একদিন অভাবনীয় সুযোগ হয়ে গেল। পাশাপাশি খাটিয়ায় শুয়ে ছিল দুজন, গরমে ঘুম আসছে না, দোস্ত মোহাম্মদ শুধাল, 'তো কাজকাম ভালোই চলছে?'

'জি'।

'একটা অফিসের চাকরি দেখলেই হয়।'

'সব চাকরিই ওই গোলামি। তার চেয়ে কিছুদিন গেলে একটা নিজের ব্যবসা চেষ্টা করে দেখব।'

উৎসাহে উঠে বসল দোস্ত মোহাম্মদ।

'হাঁ, হাঁ, ঠিক বোলা। গোলামি পারলে করতে নেই। আর ব্যবসার কাছে লাগে কী? এই দেখো না আমাকে। মাসের মধ্যে পনেরো দিন ছেলেমেয়ে ফেলে রাস্তায় ডিউটি করছি। একটু দেখভালই করতে পারি না।'

জি।'

'হ্যাঁ, ব্যবসার খেয়াল রাখো। পুঁজি বানাও। আল্লাহ মেহেরবান।'

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল দোস্ত মোহাম্মদ। অনেকক্ষণ পরে বলল, 'একটা শাদি-বিয়ে করা দরকার। আল্লাহ একা করেছেন, তিনিই এক শ করে দেবেন।'

ভেতরটা স্তব্ধ হয়ে গেল নিসারের। মুখে কোনোরকমে বলল, 'জি।'

'আমার তো শেষ বয়স।'

উৎকর্ণ হয়ে রইল নিসার। দোস্ত মোহাম্মদ আপন মনেই বলে চলেছে, 'হাসিব বড় হলো না। আমিনার কী করি? নিশ্বাসের তো বিশ্বাস নেই কিছু। আজ চোখ বুজলে ওদের আর দাঁড়াবার জায়গা থাকবে না। দাতা সাহেবের দরবারে গিয়ে সময় পেলেই কাঁদি—এরকম গজব যেন না হয়।'

মানুষটার বয়স হয়েছে সত্যি। নিসারের ভেতরটা খুব খাঁ খাঁ করতে থাকে। তার বাবা এ রকম রাতে পাশে নিয়ে জেগে

তার পিঠে আমূল বসিয়ে দেবে দীর্ঘ চকচকে ছুরির ফলাটা



জেগে গল্প করতেন। অন্ধকারে যেন নিসারের ভুলই হয়, তার বাবার কণ্ঠ সে শুনতে পাচ্ছে। বলে, 'ও কি কথা? কিছু হবে না।'

হাসল দোস্ত মোহাম্মদ। তখন নিসার আবার বলল, 'আমি তো আছি। আমি কি ফেলে যাব?' নিজের কানেই কেমন নতুন শোনাল কথাগুলো। জবাব না পেয়ে ভীষণ অস্বস্তি লাগে নিসারের। কী দরকার ছিল? এসব না বলে চুপ করে থাকলেই পারত। নিজের নিশ্বাসের শব্দটা পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে।

হঠাৎ দোস্ত মোহাম্মদ বলল, 'নিসার।'

'জি।'

'আমি মনে করলাম ঘুমিয়ে আছ।'

'না।'

'এই ক-বছরে তোমার ওপর এত মায়া পড়ে গেছে, তোমাকে ছাড়া ভাবতেই পারি না।'

মাথার ওপর দিয়ে একটা উড়োজাহাজ চলে গেল। তার শব্দে দোস্ত মোহাম্মদের শেষ কথাগুলো ডুবে গেল। যখন দিগন্তের শেষপ্রান্তে চলে গেল, উঠে বসল দোস্ত মোহাম্মদ। কুঁজো থেকে পানি খেয়ে এসে দেখে, তার ওঠা দেখে নিসারও উঠে বসে আছে।

খুব বিব্রত দেখাল দোস্ত মোহাম্মদকে। নিসার বলল, 'আপনি না থাকলে লাহোরে আমি না খেয়ে মারা যেতাম। আমার সব ছিল, কিছু নেই। আপনার এখানে আমি এত ভালো আছি, এত ভালো আছি; এত যে এর শোধ দিতে পারব না।'

দোস্ত মোহাম্মদ তখন বলল, 'পাগল তুমি। শোধ কিসের?'

তারপর গলা নামিয়ে যোগ করল, 'ভাবছিলাম, আমার আমিনা বেটিকে তোমার হাতে তুলে দিই। আমার চোখের সামনেই থাকবে। শোধ কিসের?'

অন্ধকারেও তার উদ্বিগ্ন দৃষ্টি চোখে পড়ল নিসারের। যে কথাটা সে নিজে বলবার জন্যে এ কদিন অবিরাম চেষ্টা করে এসেছে, তা এত সহজে হয়ে গেল। একটা প্রচণ্ড খুশি আর সেই সঙ্গে অবসাদ। নিসার মাথা নিচু করে বলল, 'আপনি যা ভালো মনে করেন।'

দোস্ত মোহাম্মদের ইচ্ছে তার একমাত্র মেয়ে, বিয়েটা দেবে খুব উৎসব করে। দেশ থেকে চলে এসেছে বহুদিন, কিন্তু নিকটজনেরা তো সেখানে রয়েছে, তাদের খবর দিতে হবে, তারা আসবে। বাড়িতে একজন বয়স্কা মেয়েমানুষ নেই, দোস্ত মোহাম্মদ ভাবছে তার শাশুড়িকে আনিয়ে নেবে। বউ মরে যাবার পর বহুকাল কোনো খোঁজ নেওয়া হয়নি। কত কাজ।

নিসারের সে বালাই নেই। কিন্তু কাল বা পরশুই বিয়ে হবে ভাবতেও কেমন লাগে। যেন খানিকটা সময় পেলে সেও তৈরি হয়ে নিতে পারত অথচ কী তৈরি করবার আছে তা সে নিজেই বলতে পারবে না। আসলে, জীবনের এত বড় একটা ঘটনাকে একেবারে সাততাড়াতাড়ি পেরিয়ে যেতে দিতে চায় না নিসার। তার স্বাদ একটু একটু করে পেতে চায় সে।

নিজের জমানো টাকাগুলোর হিসাব করে নিসার। আর ভবিষ্যতের কথা ভাবে। আবার তার সব হবে। সংসারের সব স্নেহ-মমতা সে ফিরে পাবে। তার নিজের সংসার হবে। মনে হয়, সে সমস্ত দিন থেকে কতদূরে চলে এসেছে যখন দুঃখের সঙ্গে তার রোজ দেখা হতো।

বিয়ের তারিখ পড়ল দেড় মাস পরে।

আমিনা এখন একেবারে সামনে আসে না। নিসার যেন তার কত অপরিচিত। গলার একটু সাড়া পেলেই দৌড়ে পালায়। আপন মনে হাসে নিসার। অদেখার অসহিষ্ণুতায় অস্থির লাগে। হাসিবের হাতে এটা ওটা কিনে পাঠায়, খবর নেয়; আজকাল হাসিবকেই খুব আদর করতে উঠেপড়ে লেগেছে নিসার আলী।

না, দোকান থেকে এখন বেরিয়ে এলে ভালো হবে না। আরও কিছুকাল চাকরি করলে পুঁজি বাড়বে। আজকাল নানা রকম ব্যবসার খবর নিতে থাকে নিসার। কোনটায় কী লাভ, কী খাটুনি, মারপ্যাঁচ কী।

ইতিমধ্যে মালিক খুশি হয়ে দশ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছেন। এরকম আভাসও দিয়েছেন সে নতুন ব্রাঞ্চ খুলবেন, সেখানে নিসারকে দেখাশোনা করতে হবে। মনে মনে ভাবে, আমিনা আমার সৌভাগ্য নিয়ে এসেছে।

নওরোজ মেলার মতো সারাদিন, সারা সন্ধ্যে গমগম ঝলমল করতে থাকে লাহোরের শৌখিন বাজার আনারকলি। মানুষে, খুশিতে, জলুসে আর আলোর ছটায় যেন কুলান হয় না—উপচে পড়ে আকাশে। মনে হয়, আকাশের অগুনতি ঝকঝকে তারার মালাও আনারকলির অঙ্গসজ্জার অংশ। কখনো একটা চাঁদ ওঠে। যেন সে চাঁদ অবাক হয়ে গালে হাত দিয়ে দোকানে দোকানে জিনিস দেখছে আর একটু একটু করে সরে যাচ্ছে।

নিসারের মনে সারাক্ষণ একটা চাঁদই জ্বলতে থাকে, সে আমিনা। তরুণীদের যখন চলে যেতে দেখে, সৌরভ ছড়িয়ে, হাসতে হাসতে, কথা বলতে বলতে, নিসার তাদের মধ্যে কল্পনায় যেন আমিনাকে দেখতে পায়। আজকাল একটা কিছু খেতে ইচ্ছে করলে, একটা ভালো জিনিস দেখলে, একটা খুশির সাক্ষাৎ পেলে আমিনার কথা মনে পড়ে যায়।

খদ্দেরের পায়ে মোকাসিন জোড়া অ্যালুমিনিয়মের জিবে দিয়ে পরিয়ে চোখ তুলতেই চমকে উঠল নিসার। তার হৃৎস্পন্দন যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। অবিকল সেই মুখ।

সেই গোলমুখ। কালো ঠোঁটের ওপরে জন্ম-দাগ। কয়েক মুহূর্ত কোনো কথা বলতে পারল না নিসার আলী। তার গলার ভেতরে প্রচণ্ড তৃষ্ণায় আগুন জলে উঠল যেন; তারই উত্তাপে ঠোঁট পুড়ে যাচ্ছে।

ন বছর আগে এক আগুন জ্বালা রাতে তার ভাইকে যে লোকটা হত্যা করেছিল সে তার সম্মুখে বসে আছে।

অমৃতসর থেকে কী করে এল লোকটা? বেড়াতে? কি কোনো কাজ? না দুঃস্বপ্ন দেখছে নিসার?

লোকটা উঠে দাঁড়াল। কার্পেটের ওপর আস্তে আস্তে হাঁটল কয়েকবার, একবার ও মাথায় গেল, ফিরে এল, আবার গেল, সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে নিসারকে একবার দেখল লোকটা, তারপর এক পা শূন্যে তুলে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে হেঁটে এসে আবার চেয়ারে বসল।

সেই গোলমুখ। কালো। ঠোঁটের ওপর জন্মদাগ। কোনো ভুল নেই। অন্য সময় হলে নিসার করত কী, খদ্দের জুতো পায়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে সোল্লাসে বলে উঠত, 'বাহ্ কেমন চমৎকার ফিট করেছে দেখুন। তারপর যখন হাঁটত, নিসার ঘুরে ঘুরেই বলত, দিব্যি মানিয়েছে জনাব। নিয়ে যান। সাল দুসাল হেলাফেলায় চলে যাবে।'

আজ তার মুখ দিয়ে একটা শব্দ বেরুল না। লোকটা বলল, 'কত? কত দাম শুনি?' তখন চমক ভাঙল নিসারের। বলল, 'সাতাশ টাকা বারো আনা।'

'একদাম।'

'পাকা কথা।'

লোকটা তখন মোকাসিন জোড়া হাতে নিয়েগভীর মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। ভ্রু গাঁথল। কী একটা বলবার জন্যে ঠোঁট খুলল, কিন্তু বলল না। ঠোঁটের ওপরে জন্মদাগটা নড়ে উঠে স্থির হয়ে গেল।

চলচ্ছবির মতো ন বছর আগের সেই রাতটা দৌড়ে পার হয়ে গেল যেন। আমি কী করে ভুলে ছিলাম এতদিন?

পকেটের ওপরে আস্তে হাত রাখল নিসার। তার ভয় করতে লাগল। আর, সেই ভয় যেন ভুলিয়ে দিল সংসারের সবকিছু। তখন আর কিছুই সত্যি বলে মনে হলো না নিসারের কাছে। সে দাঁতে দাঁত চেপে অপেক্ষা করতে লাগল।

লোকটা বলল, 'আচ্ছা দিন।' নিসার ঠিক করে ফেলেছে কী করবে।

জুতো জোড়া বাক্সে পুরে দিল তার হাতে। লোকটা উঠে দাম দেবার জন্যে কাউন্টারে গেল নিজেই।

তখন পেছন থেকে তাকে দেখে আর কোনো সন্দেহ রইল না তার। অবিকল সেই ভঙ্গি দাঁড়াবার, সেই পিঠের স্থাপনা।

উঠে দাঁড়াল নিসার। পাশে সহকর্মীকে বলল, 'এক মিনিট। আমি আসছি।'

দোকান থেকে দুঃস্বপ্নচালিত মোহগ্রস্ত একটা জন্তুর মতো নিসার আলী বেরিয়ে এল। দুপুরের রোদে পুড়ে যাচ্ছে লাহোর। পথ প্রায় জনশূন্য। অবলীলাক্রমে সেই রোদের প্রচণ্ড হলকার মধ্যেসে দাঁড়িয়ে রইল।

দোকান থেকে বেরিয়ে এল লোকটা। রোদের জন্যে ভালো করে চোখ খুলতে পারছিল না। দোকানের ছায়ায় ছায়ায় মোড় পর্যন্ত হেঁটে এল সে। এমনকি নিসারের একেবারে গা ঘেঁষেই চলে গেল সে। নিসার মুখ ফিরিয়ে নিজেকে যথাসাধ্য লুকোবার চেষ্টা করল। লোকটা তবু তাকে দেখতে পেল, দেখে অস্পষ্ট একটুখানি হাসল, হাঁটতে হাঁটতেই হাসল, হেসেচলে গেল।

যখন অনেকটা দূরে গেল নিসার অনুসরণ করতে লাগল। পেছনে পড়ে রইল দোকান, আমিনা, দোস্ত মোহাম্মদ—একবারও মনে হলো না। যেন এই দুপুর রোদে সে, ওই লোকটা আর একঅন্ধ আকর্ষণ, একটা জ্বালা, একটা প্রতিশোধের মরুভূমি—এছাড়া সব অলীক, অসত্য, দূরবর্তী। এক মুহূর্ত তাকে আমি আড়াল হতে দেব না।

লোকটা রেস্তোরাঁয় ঢুকল। বোধহয় তেষ্টা পেয়েছে। যা খুশি খেয়ে নিক, তার তেষ্টা মিটিয়ে নিক প্রাণভরে। সে রাতে আগুনের হলকায় লোকটার মুখ যত ভয়াবহ মনে হচ্ছিল, আশ্চর্য, এখন আদৌ তেমন লাগছে না। একটা তরমুজের মতোশ্যামল, গোলগাল মসৃণ, নিরেট, ঠান্ডা।

আমিজানি এ রকমটাই হয়ে থাকে। বার থেকে কিছু চেনা যায় না। আমি অনেক দেখেছি। এসব চালাকি আমার সঙ্গেনয়।

একটা সিগারেট ধরাল নিসার।

প্রায় আধঘণ্টা পরে বেরিয়ে এল লোকটা।

শা—। অস্পষ্ট স্বরে গাল দিল নিসার।

আরে একি! লোকটা নতুন মোকাসিন পরে নিয়েছে রেস্তোরাঁয় বসে। বগলে বাক্সটা। তার মধ্যে পুরোনো জোড়া গা ঢাকা দিয়ে আছে। হিন্দুস্তান থেকে এসে মনের সুখে নবাবি করে নিচ্ছে। প্রচুর টাকা বানিয়েছিল নিশ্চয় দাঙ্গার সময়ে। লাহোরে এসেছে কেন?

অদ্ভুত একটা তৃপ্তি হয় নিসারের। এর নাম নিয়তি। তার ভাঙা কপাল টেনে এনেছে লাহোরে। হিসাব দিতে হবে না? রক্তের দাম দিতে হবে না? লাহোরে না এসে উপায় কী?

লোকটা একটা স্কুটার থামাল হাত দিয়ে।

চঞ্চল হয়ে উঠল নিসার। ধারেকাছে আর একটা স্কুটারও নেই যে তাতে উঠে বসবে সে। এক্ষুনি বসে পড়বে লোকটা, দ্রুত বেরিয়ে যাবে স্কুটার, আর ইহজীবনে তার সাক্ষাৎ পাবে না নিসার।

নিসার প্রায় দৌড়ুতে লাগল। এতক্ষণে রোদটা টের পাচ্ছে খানিক। সারা মুখ চড়চড় করছে। স্কুটারে উঠবার সময় লোকটা বলছিল, স্টেশনের দিকে চলো লালা। সেটুকু কানে বাজছে নিসারের। সে আরও জোরে দৌড়ুতে লাগল।

ম্যাকলিয়ড রোড থেকে একটা ট্যাক্সি আসছিল। খালি। হাত তুলে তাকে থামিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে নিসার কোনোরকমে বলতে পারল, স্টেশনের দিকে চলো।

ট্যাক্সি ঘোরাতে বেশ খানিকটা সময় চলে গেল। অসহিষ্ণু হয়ে নিসার সিটের পিঠে চাপড় দিয়ে বলল, 'জলদি, লালা।'

দুপাশের দালান দোকান গাছ হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দৌড়াতে শুরু করল উল্টো দিকে। একেকটা স্কুটার শাঁ করে পেছনে পড়ে যায় আর নিসার ঘুরে দেখে। পায় না। আবার সামনে তাকায়। আক্রোশে নিজের শরীরটা জখম করে ফেলতে ইচ্ছে করে তার। আবার চাপড় দিয়ে চিৎকার করে ওঠে।

বহুৎ তেজ, লালা।

ড্রাইভার গতি বাড়ায় না। বরং কমিয়ে দিয়ে চোখ না ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'বাৎ কেয়া হ্যায়?'

তার গম্ভীর গলা শুনে চমকে ওঠে নিসার। আমি কি অসতর্ক হয়ে পড়েছি? কিছু টের পেয়েছে? না, আমি উত্তেজিত হব না।

আমার ভাইর খুব অসুখ।

নিসার সন্ধানী চোখে পথ দেখতে দেখতে উত্তর করল। তখন গতি আরও খানিকটা বাড়ল ট্যাক্সির।

প্রায় না দেখতে পেয়ে চলেই যাচ্ছিল ফেলে। কি, দেখেও চকিতে চিনতে পারেনি। কিছুদূরে এসেই নিসার চেঁচিয়ে উঠল, 'রোকো রোকো।'

লোকটা স্কুটার থেকে নেমে পয়সা নিয়ে তর্ক করছে।

অবশেষে একটা রফা হলো। পয়সা চুকিয়ে হোটেলের ভেতরে চলে গেল সে। সঙ্গে সঙ্গে নিসার গেল এগিয়ে। দাঁড়াল ঠিক দরজার সামনে। দেখতে পেল লোকটার পা জোড়া—নতুন মোকাসিন পরাকাউন্টারের পাশে সিঁড়ি দিয়ে উঠে মোড় নিল।

নাম জানবার জন্যে ভারী ক্ষোভ হলো নিসারের। কিন্তু নিজেকে সংযত করল সে। একবার ট্যাক্সিওয়ালা প্রায় সন্দেহ করে বসেছিল। আবার সে রকম বোকামি করতে রাজি নই আমি।

কাউন্টারের পাশে ছোট্ট একটা রেস্তোরাঁ—হোটেলের ডাইনিং রুম। নিজেকে যথাসাধ্য স্বাভাবিকভাবে টেনে নিয়ে নিসার একটা চেয়ারে বসল। এখান থেকে আড়াআড়ি পেছনে তাকালে সিঁড়িটা চোখে পড়ে।

বসে ভাবতে লাগল, এখন কী করা যায়? কীভাবে এগোবে সে? দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। ফটফট শব্দ হচ্ছে। আর লোকের কোলাহল। একবার আমি মাথা মাটিতে নামিয়ে নিয়েছিলাম, পাছে ওরা আমাকে মেরে ফেলে, এবার মাথা উঁচু রাখব।

আমাকে চিনতে পারেনি। স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি, যাকে সে হত্যা করেছিল আমি তার ভাই, তারই পায়ে জুতো পরিয়ে দিচ্ছি, দাম বলছি সাতাশ টাকা বারো আনা।

'একদাম?'

'পাকা কথা।'

মনে মনে আবৃত্তি করল নিসার। এক দাম—একদাম—একদাম। এক পাই কম নয়, বেশি নয়। কড়ায় গন্ডায় এক দাম।

আমাকে ওর বন্ধু হতে হবে। কথা বলতে হবে। ওর সঙ্গে আমার আলাপ হওয়া দরকার। ও জানতেই পারবে না আমি তার ছোট ভাই। আমি যখন কথা বলব, খুব হাসব আর ফুর্তির কথা বলতে থাকব যাতে কিছুই সন্দেহ করতে না পারে।

বেয়ারা এসে বলল, 'হুকুম?'

আখের রস পেটের মধ্যে টিমটিম করছে। কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। বরং ভেতর থেকে সব উল্টে আসতে চাইছে যেন। ভীষণ প্রস্রাব পেল তার হঠাৎ। জিজ্ঞেস করল, 'বাথরুম কোনদিকে।'

দেখিয়ে দিল বেয়ারা।

উঠতে গিয়ে মনে পড়ল, যদি এই ফাঁকে বেরিয়ে যায় লোকটা। আর ওঠা হলো না। পকেটে হাত দিয়ে যা উঠে এল একটা আধুলি, বেয়ারার হাতে দিয়ে বলল, 'রাখো তোমার কাছে। বাইরে বড্ড গরম, তাই বসব খানিকক্ষণ।'

আধুলিটা নিয়ে হাই তুলতে তুলতে চলে গেল বেয়ারা। কাউন্টার থেকে একজন তাকে অলস চোখ তুলে দেখল একবার। তারপর আবার হাতের সস্তা বইটা পড়তে লাগল। চকিতে আবার চোখ তুলে দেখল নিসারকে। নিসার ভারী অস্বস্তি বোধ করতে লাগল তখন। সে মুখ ফিরিয়ে নিল। অনেকক্ষণ পরে তাকিয়ে দেখে বই হাতে নাক ডাকাচ্ছে সে।

প্রায় এক যুগ পরে নেমে এল লোকটা। আরেকটু হলেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠেছিল নিসার। এতক্ষণ পরে লোকটাকে দেখে যেন তার ভেতরের স্নায়ুগুলো একসঙ্গে সচল স্বাধীন হয়ে উঠেছিল, তাকে স্থির করে নিসার নিশ্বাস বন্ধ করে আড়চোখে দেখতে লাগল।

কোর্তা পাজামা পরেছে লোকটা। গোসল করেছে বোধহয়—সারা গা ভিজে ভিজে দেখাচ্ছে। মোকাসিন জোড়া পরেনি। পায়ে কাটছে বুঝি। লোকটা রুমের চাবি ঝনাৎ করে কাউন্টারে ফেলে বাইরে বেরুল।

উঠে এল নিসার। লোকটা স্টেশনের ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এবারে আর ভুল করব না আমি। নিসার দ্রুত হেঁটে লোকটার পাশ কাটিয়ে স্ট্যান্ডের দিকে গেল, একটা ট্যাক্সি নিল, নিয়ে মাথা নিচু করে সিগারেট জ্বালাবার অছিলায় অপেক্ষা করতে লাগল। ড্রাইভার ট্যাক্সি লাইন থেকে বার করে পথ ধরতেই নিসার মিথ্যে করে বলল, 'আরে রাখো দেখি একটু। কী যেন ফেলে এসেছি। বলে খামোখাই সে এ পকেট সে পকেট হাতড়াতে লাগল। কিন্তু চোখ তার সারাক্ষণ চঞ্চল হয়ে অনুসরণ করতে থাকল লোকটাকে। যখন দেখল, সেও একটা ট্যাক্সিতে গিয়ে বসল, ড্রাইভার মিটার নামিয়ে স্টার্ট দিল, তখন নিসার বলল, 'না, ঠিক আছে।' ততক্ষণে লোকটার ট্যাক্সি নিসারকে অতিক্রম করে গেল। নিসার বলল, 'চলো।'

মল রোডে এসে নামল লোকটা। শুকনো ফোয়ারার এদিকে ট্যাক্সি দাঁড় করাল নিসার।

সন্ধ্যে হতে আর বড় বেশি বাকি নেই। ইতিমধ্যে দোকানে দোকানে আলো জ্বলে উঠেছে। পথের বাতি আরও খানিক পরে জ্বলবে। আকাশটালাল টকটকে দেখাচ্ছে। সারাদিনের অসহ্য গরমের পর খানিকটা ঠান্ডা হাওয়া বইছে। তার লোভে পথে আর ঠাঁই হচ্ছে না যেন।

ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে লোকটা মন্থর পায়ে চারদিকে অলস চোখ ফেলে হাঁটতে লাগল। নিসার চলল তার পেছনে রক্তমাংসের ছায়ার মতো। উল্টোমুখো মানুষের জন্যে একেকবার পেছনে পড়ে যায়, কনুই ঠেলে সেটুকু তাড়াতাড়ি পুষিয়ে নেয় নিসার। এমনি করে চলতে থাকে।

চলতে চলতে একেবারে ওয়াই-এম-সি পেরিয়ে বড় পোস্টাফিস পর্যন্ত চলে যায় লোকটা। সেখানে রাস্তার মোড়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে কতক্ষণ। তারপর পথ পার হয়ে ওদিকের ফুটপাত ধরে ফিরতি পথে চলে। গির্জার বিশাল গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ভেতরে উঁকি দিয়ে মেয়েমানুষ দেখে খানিকক্ষণ। তারপর আবার এগোয়। এগিয়ে পেছন ফেরে একবার, চট করে মুখ ফিরিয়ে নেয় নিসার। লোকটা চোখ তুলে গির্জার উচ্চতা মাপবার চেষ্টা করে, অনেকক্ষণ, অবশেষেকী বুঝল সেই জানে বড় পরিতৃপ্তির সঙ্গে পা টেনে টেনে হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে একেবারে সেই শুকনো ফোয়ারার কাছে গিয়ে পৌঁছাল লোকটা—ঠিক যেখানে ট্যাক্সি থেকে নেমেছিল।

কোথায় যাবে, কী চায়, তার মতলব কিছু বুঝতে পারল না নিসার। কম করে হলেও দেড় মাইল হাঁটিয়েছে তাকে। টনটন করতে থাকে নিসারের পা। রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরায় সে।

যাবে নাকি? গিয়ে কথা বলবে? তারপর মিঠে কথায় দোস্তি হতে কতক্ষণ?

প্রায় পা বাড়িয়েছিল নিসার। কিন্তু থামল। যদি সন্দেহ করে? যদি ঘাবড়ে যায়? হইচই করে?

লোকটা আবার চলতে শুরু করে দিয়েছে। পথ পেরিয়ে আবারও ফুটপাথে গিয়ে আবার সেই আগের মতো হাঁটছে লোকটা। নিসার দাঁত ঘষে শক্ত গাল দিল মনে মনে।

আবার সেই রকম। একেবারে বড় পোস্ট অফিস পর্যন্ত গেল লোকটা। থামল, ফিরল, এবার আর পথ পেরুল না, একই ফুটপাত ধরে উল্টোমুখো চলতে লাগল। একটা পান দোকানে থেমে দুটো বড় পান মুখে পুরে চিবোতে চিবোতে এগোল সে। আবার গালি দিল নিসার—মনে, মনে। পেয়েছ কি? সারারাত জাঁতার মতো ঘুরবে নাকি?

হঠাৎ লোকটা টাঙ্গা নিল একটা।

তখন আঁধার হয়ে এসেছে চারদিক। নিসার একটা স্কুটার নিয়ে তাকে অনুসরণ করতে লাগল।

অন্ধকারে আরও উন্মত্ত হয়ে উঠছে তার রক্ত। পকেটটা শক্ত করে ধরে নিসার।

টাঙ্গা ঘুরতে ঘুরতে বেপাড়ায় গিয়ে দাঁড়াল। নিসারের আর বুঝতে বাকি রইল না। স্কুটার ছেড়ে দিয়ে সে টাঙ্গার পাশে এল। লোকটা ইতি-উতি তাকাচ্ছে। জিব দিয়ে ভিজিয়ে নিচ্ছে ঠোঁট।

মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল নিসারের। একদিন তাকে এ পাড়ায় পথ চিনিয়ে নিয়ে এসেছিল একজন। আজ সেই দাঁত পরা দালালের ভূমিকায় সে। আঁধারে মুখ ঢেকে নিসার শুধাল, 'লাগবে জনাব?'

লোকটা মাথা নেড়ে সায় দিল। স্খলিত কণ্ঠে বলল, 'ভালো?'

'এক নম্বর।'

ইতস্তত করে নামল লোকটা। নিসার আগে চলতে চলতে বলল, 'আসুন আমার সঙ্গে একেবারে আনকোরা জিনিস দেব। জীবনভর ইয়াদ রাখবেন।'

লোকটা তাকে অনুসরণ করতে লাগল। দ্রুত। অভ্যেস আছে নিশ্চয়ই। শা—, লাহোরে এসেছে ফুর্তি লুটতে।

সেই বাড়িতে নিয়ে গেল নিসার যেখানে সে একদিন এসেছিল, এসে আবার দৌড়ে পালিয়ে গিয়েছিল।

সেই অন্ধকার সিঁড়ি। লোকটাকে ইশারায় কাছে আসতে বলে নিসার প্রায় গা ঘেঁষে উঠতে লাগল তার। লোকটা আরেকবার জিজ্ঞেস করল, 'ভালো জিনিস তো?'

নিসারের মনে পড়ে গেল সেই মধ্যমার কথা। দেয়ালে মোগল তরুণীর ছবিটা স্পষ্ট দেখতে পেল যেন। নিশ্বাসের দ্রুততা শাসন করে সে উত্তর করল, 'দেখে নিন। পছন্দ না হয় লাথি মেরে চলে যাবেন।'

পকেটে হাত ঢোকাল নিসার।

তারপর লোকটা যখন এক ধাপ এগোল, হঠাৎ থেমে গিয়ে নিসার তার পিঠে আমূল বসিয়ে দিল দোস্ত মোহাম্মদের পয়সা দিয়ে কেনা দীর্ঘ চকচকে ছুরির ফলাটা। তীব্র আর্তনাদে খানখান হয়ে গেল রঙ্গপাড়ার জৌলুশ। দৌড়ুতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে ফিরে গেল নিসার। লোকটা গড়িয়ে এসে তার গায়ের ওপরে পড়ে স্থির হয়ে গেল অত্যন্ত প্রবল একটা শিহরণের পর।

চিনিয়টের ব্যবসায়ী শেখ আবিদ জানকে হত্যার অপরাধে গ্রেপ্তার হয়ে হাজতে রইল নিসার আলী। বেচারা বেড়াতে এসেছিল লাহোরে। দোস্ত মোহাম্মদ খোদাকে শোকর জানালেন। কী তাজ্জব। ন বছর একসঙ্গে থেকেও নিসারের কুচরিত্র তার মালুম হয়নি। আমিনা বেটির ওপর নেক নজর আছে আল্লার। ❦

সৈয়দ শামসুল হকের ২৮ বছর বয়সে লেখা উপন্যাস 'আনারকলি' প্রকাশিত হয়েছিল সৈয়দ মোহাম্মদ পারভেজ সম্পাদিত *চিত্রালী* পত্রিকার বার্ষিক সংখ্যা ১৯৬৩-তে। এখন পর্যন্ত অগ্রন্থিত এ উপন্যাস পাওয়া গেছে অনুপম হায়াতের সৌজন্যে।

গল্প



আফজাল হোসেন

শ্রীময়ী জয়তুন মহল

কেউ কলবেল বাজাল। রূপা তখন ক্যামেরার ব্যাগ খুলে দেখে নিচ্ছে সব নেওয়া হয়েছে কি না। ভেতর ঘর থেকে রোজা এসে বারান্দায় গেল, তারপর ফিরে এসে রূপাকে বলল, 'আপু, তোমাকে ডাকছে।' কে ডাকছে প্রশ্ন করেছে রূপা, ভেতরের দিকে যেতে যেতে রোজা জানিয়ে যায়, চেনে না।

রূপা গিয়ে মানুষটাকে দেখল। সালাম দিয়ে একটা বাদামি রঙের লম্বা খাম এগিয়ে দেয়। সামনের গাছটায় দুটো কাক অনেকক্ষণ ধরে ঝগড়া করছে। লোকটা সালাম দিয়ে রাস্তায় মোটরসাইকেলে অপেক্ষা করা একজনের পেছনে উঠে বসে।

খামখানা হাতে ঘরে ফিরে এল রূপা। ভেতরে কী রয়েছে সে জানে। খামটা এক পাশ থেকে ছিঁড়ে বের করে

সচিত্রকরণ : আফজাল হোসেন

আনে চিঠিটা। কী লেখা রয়েছে তাও জানা। মাথা ঠান্ডা রেখে চিঠির ভাঁজ খোলে। মাঝখান থেকে চোখ বুলিয়ে আসল জায়গাটা পেয়ে সেই অংশটুকু পড়ে বার তিনেক। মা ঘরে ঢুকে আবার রোজার ডাকে ফিরে গেলেন।

এসবের কিছুই দেখে না আবীর। খেলায় মেতে থাকলে খেয়াল তার কোনো দিকেই ফেরে না। বাইরে গাড়ির শব্দ। হর্ন বাজে। উঠে দাঁড়ায় আবীর।

'চলো যাওয়া যাক' বলে ক্যামেরার ব্যাগ, পাশে রাখা নিজের ব্যাগপ্যাক তুলে নেয়। নড়াচড়ায় তাড়া আছে। রূপা যেখানে ছিল, সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। তাড়াহীন।

চিঠি আসা, কার চিঠি, সে চিঠিটাতে কী লেখা সে বিষয়ে জানলে সোফায় আটকে থাকত আবীর। বসা থেকে উঠতে পারত না। চোখে-মুখে অসহায় ভাব জেগে উঠত।

নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে রওনা দিয়েছে। যদি দরজার কাছে গিয়ে আবার কোনো কারণে ঘুরে তাকাত, দেখতে পেত রূপা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানটাতেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাতে চিঠির খাম আর একটা চিঠি।

ফোনে কথা হয়েছে, ওরা বাসস্টপেজের কাছাকাছি।'

তারপর রূপাকে না দেখে প্রশ্ন করতে যাবে রূপা কোথায়। করা লাগল না। রূপাকে দরজা দিয়ে বের হতে দেখা গেল তখনই।

রূপা যখন গ্রিলের পাল্লার কাছে বারান্দা থেকে নামছে তখন সামনে থেকে 'স্লামালায়কুম আন্টি' শুনতে পায়। দেখতে পায় মোকাররমের সশব্দ সালামের সঙ্গে তাহেরও নিঃশব্দে বারান্দার দিকে তাকিয়ে সালাম ঠুকছে। রূপা পেছনে না তাকিয়েও বুঝতে পারে গাড়ির শব্দে মা বেরিয়ে এসেছেন।

মা কপালে হাত তুলেছেন। 'ভালো সবাই' প্রশ্ন করলেন। প্রশ্ন হাসিমুখের কিন্তু সে হাসির পেছনে অস্বস্তি, বিরক্তি লুকিয়ে রাখা, তা ভালো করেই জানে রূপা।

গাড়ি চলছে। মোকাররম রূপার জন্য সামনের সিট ছেড়ে বসেছে পেছনে। তিনজনের অবিরাম কথা চলতে থাকে। উৎসাহ, কথা বলাবলি নতুন লেন্স নিয়ে। রূপা ফোনে জেনেছিল, ব্যাংকক থেকে তার বোন-দুলাভাই লেন্স কিনে এনে দিয়েছে

> আমি সামনের সিটটা রূপার জন্য ছাড়লাম, একটা থ্যাংকসও বলেনি রূপা।

বারান্দার গ্রিলের পাল্লা খুলে নিচে নামতে সামনে দাঁড়ানো গাড়ির ড্রাইভিং সিট থেকে তাহের দরজা খুলে নেমে আসে। খানিকটা দেরি হয়ে গেছে আসতে, তার কারণ জানায়। হড়বড় করে বলে, অনেকটা পথ এসে খেয়াল করেছে ওষুধ আনতে ভুলে গেছে, ওষুধ ছাড়া তো দিন কাটানোর উপায় নেই, তাই আবার ফিরতে হয়েছে।

পেছন থেকে নামল ড্রাইভার। বোঝা গেল তাড়াতাড়ির জন্য নিজেই চালিয়ে এসেছে তাহের। মোকাররম সামনের সিটে বসে ফোনে কথা বলায় ব্যস্ত। আবীর ঘড়ি দেখে আবার। গাড়ি ছাড়তে আরও পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাকি। গাড়ি ধরতে পারবে কি পারবে না হিসাব করে দেখে। মনে হয় পারা যাবে কিন্তু না পৌঁছানো পর্যন্ত অস্থিরতা থাকবে, আরামের হবে না।

ফোন শেষ করে তাহেরও ঘড়িতে সময় দেখে, 'টেনশন কোরো না আবীর। পেয়ে যাব গাড়ি। অলীক, মুনিয়া আমাদের আগে পৌঁছে যাবে।

মোকাররমকে। এ খবর একই দিনে একের পর এক তিনজন জানিয়েছে তাকে ফোনে।

আবীর পেছন থেকে লেন্সটা বাড়িয়ে ধরে, 'দেখবে রূপা?'

ডান দিকে ঘুরে রূপা লেন্সটা হাতে নেয়। ক্যামেরার লেন্স নিয়ে আহামরি জ্ঞান তার নেই। তবু নেড়েচেড়ে দেখছে।

'আমি সামনের সিটটা রূপার জন্য ছাড়লাম, একটা থ্যাংকসও বলেনি রূপা।'

মোকাররমের কথায় রূপারও মনে হলো, বলা হয়নি।

'সরি বলা হয়নি। অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'কোনো কারণে কি আপনার মন খারাপ?'

তাহেরও যোগ করে, 'মনটা বোধ হয় ওর খারাপ।'

ঠিক এ সময়ে রূপার ফোন বেজে ওঠে। সে আশা করেছিল মা ফোন করবে। ফোন বের করে দেখে মা নয়, ফোন করেছে মুনিয়া, 'তোমরা কত দূর?'

'আমরা কত দূর? মুনিয়া ফোন করেছে।' রূপা জানতে চায়।

তাহের জানায়, 'পৌঁছে যাব, রাস্তা খালি রয়েছে।'

ঢাকা থেকে সাতক্ষীরা অনেকটা পথ। আরিচা ফেরিঘাটে অপেক্ষা করতে হয়নি তারপরেও সাত ঘণ্টা লেগে গেছে। সাতক্ষীরায় পৌঁছে যাত্রা শেষ নয়। মুনিয়ার মামার বাড়ি শহর থেকে আরও দক্ষিণে, পারুলিয়া গ্রামে। সেখানে যেতে আধা ঘণ্টা-চল্লিশ মিনিট লেগে যাবে শুনেছিল সবাই। মামার বাড়ি থেকে একজন এসেছে মাইক্রোবাস নিয়ে। মুনিয়া সবার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেয় 'নাম চিত্তরঞ্জন, আমরা দাদা বলে ডাকি।'

জানা গেল চিত্ত দাদা বা চিত্তরঞ্জন বহু বছর ধরে মুনিয়ার মামাদের পরিবারের জমিজমা দেখাশোনা করে থাকেন। বয়স পঞ্চাশের কোঠায় কিন্তু হালকা-পাতলা গড়নের আর বেশ ফিটফাট বলে দেখায় আরও কম।

দাদা গাড়িতে সামনের সিটে বসে একটা প্লাস্টিকের বাক্স এগিয়ে দেন পেছনে। মুখে বেশ আন্তরিক একখানা হাসি 'নেন বাড়ির তৈরি পিঠে, খিদে লাগলি খাতি পারেন।'

মাঝের সিটে রূপা আর মুনিয়ার পাশে বসেছে আবীর।

বাক্স সামনে আসামাত্র 'আমার খিদে পেয়েছে' বলে সেটা হাতে নেয় সে।

দাদার উচ্চারণ শুনে মুনিয়া সবার উদ্দেশে বলে, 'এখানে, মামার বাড়ির এলাকায় পিঠাকে বলে পিঠে, লাগলেকে বলা হয় লাগলি আর খেতে পারেনকে বলা হয় খাতি পারেন। এ রকম আরও অনেক কিছু শুনবে, প্রস্তুত থেকো।'

আবীর ততক্ষণে বাক্স খুলে একটা পিঠাতে কামড় বসিয়েছে। কালচে লাল রঙের গোলাকার পিঠা। মনে হলো ঢাকায় এই পিঠাকে বলে তেলের পিঠা। খেয়েছে আগে কিন্তু কখনো এমন স্বাদের মনে হয়নি। বাক্সটা প্রথমে পাশে বাড়ায় তারপর পেছন দিকে, 'খাবে কেউ? ভারি মজার পিঠা।'

সামনের সিট থেকে দাদার গলা শোনা যায়, 'গরম খাতি পারলি আরও মজা লাগে।'

'এদিকে এ পিঠার কী নাম দাদা,' আবীর জানতে চায়।

'এদিকি বলে পাকান পিঠে।'

মামাদের বেশ বড়সড় সাদা রঙের বাড়ি। পুরোনো আমলের নকশা করা দোতলা বাড়ির সামনে বিরাট উঠোন।

উঠোনের এক পাশে খড়ের ছাউনি দেওয়া বড় ও ছোট দুটো গোলাকৃতির ঘর। মাটি দিয়ে তৈরি আনুমানিক আড়াই ফুট উচ্চতার ভিত্তির ওপর ঘর দুটো দাঁড়িয়ে। মুনিয়া ছাড়া সবাই ক্যামেরা বের করে বামে-ডানে ঘুরে দুটো ঘরের ছবি তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

মুনিয়া জানায়, 'এ দুটোকে বলে গোলাঘর। এর ভেতর ধান রাখা হয়।'

রূপাকে মুগ্ধ করেছে বাড়িটা। পুরোনো বাড়িটার বেশ কয়েকটা ছবি তুলেছে। তাকিয়ে দেখতেও ভালো লাগছে। কলকাতার অনেক ছায়াছবিতে এমন বাড়ি দেখা যায়। চারকোনা স্বাস্থ্যবান পিলারের মাথায় অর্ধগোলাকৃতির খিলান। প্রতিটি খিলানের মাঝখানে সুদৃশ্য লতা ও ফুলের নকশা। ওপরের বারান্দায় পুরোনো আমলের কালচে সবুজ রঙের লতানো গ্রিলের রেলিং। কার্নিশে কবুতর। খুবই ব্যস্ত তারা। উড়ে যাচ্ছে, এসে বসছে, বাকুম বাকুম করছে। মনে হয় এরা এ বাড়িটার প্রাণস্পন্দন। এদের ছাড়া এ বাড়িটার সৌন্দর্য সম্পূর্ণ হতো না।

একটু আগে দোতলা বাড়িটার মাথার ওপর ছাদের মাঝখান বরাবর যে মুকুটের মতো নকশা, তার ছবি তুলেছে রূপা। মুখোমুখি দুটো অদ্ভুতদর্শন পাখির নিচে লেখা 'শ্রীময়ী জয়তুন মহল'। তার নিচে লেখা 'স্থাপিত ১২৪৩ বঙ্গাব্দ'। বাড়ির নাম, প্রতিষ্ঠাকাল, কবুতর—সব মিলিয়ে মনে হয় এখানে প্রেম থাকে।

পাশে এসে দাঁড়ায় মুনিয়া, 'বাড়িটার বয়স কত অনুমান করতে পারো?'

'অনুমানের দরকার কী? লেখাই তো রয়েছে।' আঙুল তুলে দেখায় রূপা।

'প্রশ্নটা কেমন বোকা বোকা হয়ে গেল। বাড়ির নামটা দেখেছ?'

'হুম জয়তুন মহলের আগে শ্রীময়ী। সেটা খুব বিশেষ মনে হয়েছে।'

'আমার নানাভাইয়ের দাদিমা ছিলেন জয়তুন আরা। শোনা যায় পরির মতো দেখতে ছিলেন তিনি।'

'তেমন দেখতে বলে নামের আগে শ্রীময়ী?'

'না, তা নয়। নামের আগে শ্রীমান, শ্রীযুক্ত, শ্রীময়ী—এসব লেখার চল ছিল তখন।'

শুনে অবাক লাগে রূপার। কেমন করে মানুষে মানুষে, মানুষের ভাবনায় বিচ্ছিন্নতা এসেছে। বদলে যাচ্ছে মানুষ। মানুষ বদলে যায় পাওয়ার জন্য। পাওয়া হচ্ছে, মানুষের এসব অর্জন, প্রকৃতই অর্জন কি না ভাবনায় আসে না। স্ত্রীর নামে বাড়ি। সেই ১২৪৩ বঙ্গাব্দের মানুষের প্রেম। পুরোনো, সেকেলে কি বলা যায়? মুনিয়ার কাছ থেকে শোনা, জয়তুন আরা ঘরে বসে ইংরেজি পড়তে, লিখতে ও বলতে শিখেছিলেন। স্বামী সে গৌরবে বাড়ি বানিয়ে স্ত্রীর নামে নাম রাখেন। মনে প্রশ্ন জাগে, কতটুকু এগোল মানুষ?

চিত্ত দাদা দূরে ছিলেন, কাছে এসে বলেন, 'আপনাদের দুজনের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে ওপরে।' ভেতর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে মুনিয়ার মামিমা। একই সঙ্গে বাইরে থেকে মোটরসাইকেলে এসে হাজির হলেন মুনিয়ার মামা।

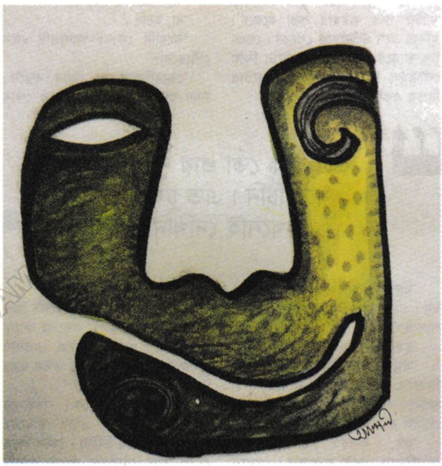
সবাই ভেবেছিল বড় মামা রাশভারী ধরনের কোনো মানুষ হবেন। তা নয়, খুব চটপটে আর হাসিখুশি মনে হলো।

যায়। এট্টা নিয়মকানুন আছে না।' বারান্দায় ঘোমটা দিয়ে দাঁড়ানো নিজ স্ত্রীকে লক্ষ করে হাসেন, 'উনি কিন্তু তুমি করে বলতে পারবেন না, আমাকেও এখনো আপনি করে বলেন।'

সে কথায় মামি হাসলেন, লজ্জা পেলেন মনে হলো না। বোঝা গেল মামার এমন হালকা মেজাজি কথাবার্তা, আচরণে অভ্যস্ত তিনি।

'মামিমা, আপনি কি মুনিয়াকে আপনি করে বলেন?' মোকাররমের সে প্রশ্নে সব্বাই হেসে ওঠে। হাসলেন মামিমাও। বড় একটা হাসিমুখ নিয়ে মামিমার পাশে গিয়ে দাঁড়ান চিত্তরঞ্জন, চিত্ত দাদা।

মামার ঠাট্টা-তামাশা শেষ হয়নি,



মামা উঠোনে এসেই পরিচয়-টরিচয়ের অপেক্ষা না করে তাড়াহুড়ো লাগিয়ে দিলেন, 'এ বাড়ি, গোলাঘর—সবই জায়গামতো আছে, থাকবে। ছবি তোলা পরে হবে। সবাই আগে হাতমুখ ধুয়ে নেন, পেটে কিছু পড়ুক, এতটা পথ আসতি হলো, এট্টু বিশ্রামও দরকার, কাইল সকালেই সুন্দরবন যাবার ব্যবস্থা করা আছে।'

মামাকে থামায় মুনিয়া, 'সবাই আমার বন্ধু, আপনি করে বলছেন কেন মামা?'

জবাব যেন মুখে তৈরি ছিল, 'তুমি করেই বলব, সেডা কি প্রথম প্রথম বলা

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে মোকাররমের প্রশ্নের জবাব দেন, 'মুনিয়াকে সে তুমি করেই বলে, ছোট থেকে দেখে আসছে তো, আমাকে বা তোমাদেরকে তো ছোট থেকে দেখেনি' বলেই হা হা হাসেন মামা। সেই হাসির মধ্যে মামিমার গলা শোনা গেল, 'এসো সবাই, হাত-মুখ ধুয়ে নাও, খাবার ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

দোতলায় উঠে খুব ভালো লাগে রূপার। রোদের তাপ, তেজ কমেছে। চারদিকে কমলা রঙের আভা ছড়িয়ে পড়েছে। হাওয়ায় চড়ে আরাম ভেসে বেড়াচ্ছে আর অচেনা একটা গন্ধ মনে

সুখ-সুখ অনুভূতি ছড়িয়ে চলেছে।

সিঁড়িঘর পেছন দিকে। ওপরে উঠলে বড় ছাদ। ছাদ পেরিয়ে ঘরের দিকে যেতে হয়। ঘরগুলোর সামনে বারান্দা। তিনটে ঘর। মামা-মামির ঘরটা উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। সে ঘরের দরজার সামনে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বি আরও দুটো ঘর। একটাতে রূপা আর মুনিয়ার থাকার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। সর্ব পশ্চিমের ঘরটায় তালা লাগানো। সারা বছর সেটা নানা জিনিসপত্রে ঠাসা থাকে। গুদাম।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে সামনে তাকালে দেখা যায় দুটো গোলাঘরের মাথা। দুটো মাথাতেই গোলাকার দুটো মাটির পাত্র উপুড় করে রাখা। বুঝতে পারে সেখানে গোলাকার ছাউনির কেন্দ্র। পানি যেন না ঢুকতে পারে সে জন্য মাটির পাত্র ব্যবহার করা হয়েছে। মুনিয়া এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে। ভেজা চুল ঝাড়ছে। মাটির পাত্র দুটো নিয়ে কৌতূহল রূপার, 'ওই পাত্র দুটোর নিশ্চয় একটা নাম আছে?'

> তোমাকে তো প্রায় দুই বছর ধরে চিনি। এত চুপচাপ কখনোই দেখিনি।

'মালসা। আরও বড় আকৃতিরও হয়। গ্রামে নানা কাজে লাগে। ভালো লাগছে?'

'হুম মালসা, না!'

'আরে মালসা নয়, তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, ভালো লাগছে? লম্বা জার্নিতে একটু টায়ার্ড তো হতেই হয়। গোসল করে নাও, ভালো লাগবে।'

'হুম, করব। ছাদটা ঘুরে দেখছিলাম, খুবই চমৎকার। পেছনে শজনেগাছটায় অজস্র সজনে ঝুলে আছে, অনেক দিন পর দেখা হলো এমন সুন্দর। সুন্দর ঠেকছে সবই। চারপাশে কত রকম গাছ, কত রকম সবুজ। কোনো ফুল বা পাতার উতলা করা গন্ধ বয়ে নিয়ে আসছে হাওয়া। কত রকম পাখির ডাক। গাছেরা দুলছে, নাকি পরস্পরের সঙ্গে অনেক কথায় মেতে আছে! এ একটা আলাদা জগৎ।'

'এটাকে কী বলে জানো?'

তাকায় রূপা। মুনিয়া হাতের গামছাটা দেখাচ্ছে, যেটা দিয়ে চুল ঝাড়ছিল। না হেসে পারে না রূপা, 'গামছা চিনব না মুনিয়া, অতটা শহুরে আমি নই।'

গামছাটা বারান্দায় মেলে দেয় মুনিয়া, 'এ বাড়িতে এলে আমি তোয়ালে আনি না। গামছার একটা আলাদা আনন্দ রয়েছে। তোমার জন্যও একটা রাখা আছে, ব্যবহার করে দেখতে পারো।'

অস্পষ্ট স্বরে শোনা গেল 'দেখব'।

মুনিয়া তার কাঁধে হাত রাখে, 'তুমি কি ঠিক আছো রূপা?'

'ও-কথা জিজ্ঞেস করছ কেন?'

দুই ভ্রুর মাঝখানে ভাঁজ তুলে চোখ সরু করে মুনিয়া ভালো করে দেখে রূপাকে, 'তোমাকে তো প্রায় দুই বছর ধরে চিনি। এত চুপচাপ কখনোই দেখিনি।'

ঘরের ভেতর থেকে তার ফোন বেজে ওঠে। তাকায় সেদিকে, 'বোধ হয় মা।'

'আসবার পর কথা হয়নি?'

'না, হয়নি।'

'করোনি ফোন? জানাওনি এসে পৌঁছেছো?'

'ভেবেছিলাম মা ফোন করবে। সারা পথ ভেবেছি ফোন আসবে, ফোন আসবে। ফোনই করল না।'

'ঝগড়া হয়েছে নাকি?' বলেই জিভ কাটে 'তুমি তো ঝগড়া করতেই জানো না। যাও, ধরো। আরও একবার বেজেছিল, তুমি বোধ হয় তখন ছাদে ছিলে।'

রূপা ঘরে ঢোকে। বিছানায় হাতব্যাগটা রাখা। ওটার সামনের পকেটে সকালের চিঠিটা। ফোন নিতে ব্যাগে হাত ঢোকালে আগে বাদামি রঙের খামটা হাতে ঠেকে, 'মা-ই ফোন করেছে।'

বারান্দা থেকে মুনিয়াকে বলতে শোনা যায়, 'রূপা তৈরি হলে নামছি আমরা।'

নিচে, উঠোনে বোধ হয় ছেলেরা জড়ো হয়েছে। সেখান থেকে গলা উঁচু করে কেউ একজন কিছু একটা বলল। কী কথা তা ঘর পর্যন্ত পরিষ্কার হয়ে পৌঁছায় না। মুনিয়াকে আবার বলতে শোনা যায়, 'আন্টির ফোন এসেছে, কথা বলছে।'

ফোনে মায়ের প্রশ্ন, 'সকালবেলা কেউ একজন এসেছিল চিঠি নিয়ে। কী চিঠি, কার চিঠি, কিছুই বলে গেলি না।'

চিঠিটার বিষয়ে এখন কিছু বলতে ইচ্ছা হয় না রূপার।

মায়ের মনে অস্থিরতা, 'চুপ করে আছিস যে?'

মুনিয়া এসে দরজায় দাঁড়িয়েছে, 'ওরা সবাই উঠোনে।'

তাড়া বুঝতে অসুবিধা হয় না, 'ঠিকমতো পৌঁছেছি, ভালো আছি। এখন যেতে হবে মা। এসে ফোন করব।'

ঘরে ঢুকে আলো জ্বালিয়ে দেয় মুনিয়া, রূপার কাছ থেকে ফোন নিয়ে বলে, 'আন্টি, আমরা এখন নৌকা চড়তে যাচ্ছি। ভাববেন না, সবাই একসঙ্গে রয়েছি।'

বাড়ি থেকে বেরিয়ে পশ্চিম দিকে পাঁচ-সাত মিনিটের পথ হাঁটলে একটা নদী। ঝাঁকড়া মাথার একটা বটগাছের নিচে ঘাট। অনেক নৌকা বাঁধা। চিত্ত দাদা আগে থেকেই সেখানে ছিলেন। মাঝির সঙ্গে নিজেও হাত ধরে সবাইকে নৌকায় উঠতে সাহায্য করেন। দেখা গেল ভয়ে ভয়ে নৌকায় উঠছে সবাই। মুনিয়া আলাদা। এমনভাবে ওঠে যেন সেটা তার প্রতিদিনকার কাজ। সবচেয়ে হাসাহাসি হলো মোকাররমের নৌকায় ওঠা দেখে। ঢাকা শহরে যে মানুষটা প্রবল আত্মবিশ্বাসী মোটরসাইকেলচালক, নৌকায় ওঠার সময় সে মানুষটা ভিতুর ডিম। ভয়ে চিৎকার দিয়েছে তিনবার।

দাদা বললেন, 'দেরি হয়ে গেছে, খানিক পরে অন্ধকার নেমে আসবে। এর মধ্যি যা দেখার দেখে নিতি হবে।'

মোকাররম বসেছে মেপেজুকে নৌকার ঠিক মধ্যখানে। নৌকা সামান্য কাত হলেই উফ্ উফ্ করছে। সে দুপাশের পাটাতন শক্ত করে ধরে আছে। বিপদে পড়া চেহারা, 'দাদা, সুন্দরবনের সব ব্যবস্থা কি আপনি করেছেন?'

সকলে নৌকায় বসা, একমাত্র দাদা দাঁড়িয়ে। সবিনয়ে হেসে উত্তর করেন, 'আমি যেয়ে সব ঠিকঠাক করিছি। কিন্তু সরকারি অফিসারকে ফোন করে দেছে মামা। আপনাদের কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে। বলেছেন, ঢাকা থেকে অতিথিরা আসবেন ছবি তুলতি।'

মোকাররমের জানার বিষয় অন্য কিছু। মাঝি হালে মোচড় দিলে নৌকা একটু দোল খায়, তাতেই তার মুখের সব পেশি শক্ত হয়ে আছে আর গলা ঠেকছে শুকনো। সুন্দরবনে নৌকায় করে যেতে হলে তা হবে খুবই বিপত্তির। না জিজ্ঞাসা করে পারল না, 'দাদা, সুন্দরবনে কি নৌকায় যেতে হবে?'

'না না' করে ওঠেন দাদা।

'আপনাদের জন্যি লঞ্চ বুক করা হয়েছে। নয়ডায় চড়বেন, ছয়ডা পর্যন্ত। খাওয়াটাওয়া সব লঞ্চে।'

স্বস্তি পেল মোকাররম।

সন্ধ্যা নেমে গেলে গ্রামের অন্ধকার একটু ভারীই হয়ে থাকে। গ্রামে বিদ্যুৎ এসেছে কিন্তু শহরের মতো সর্বত্র আলো নেই। এখানে-ওখানে ছিটেফোঁটার মতো আলো জ্বলে আছে। সে আলোয় জোরও তেমন নেই। নৌকাভ্রমণ তেমন দীর্ঘ হয়নি, হতে পারেনি। তাতে সবচেয়ে খুশি হওয়ার কথা যার, সে মানুষটা নৌকা থেকে নেমে চিত্ত দাদার সঙ্গে সবার আগে দ্রুত পা চালিয়ে যাচ্ছে, কথা বলছে অনর্গল। কী বিষয়, দূর থেকে পরিষ্কার শোনা যায় না।

দূরে কোথাও শিয়াল ডেকে ওঠে। আবীর ঘুরে দেখে সবার পেছনে একলা হয়ে হাঁটছে রূপা। দাঁড়ায়। পাশে এল রূপা, 'শিয়ালের ডাক শুনে ভয় পাব ভেবেছ আবীর? আমি কিন্তু ছোটবেলায়, মানে ক্লাস সেভেন পর্যন্ত গ্রামেই ছিলাম।'

'তাই?'

'হুম, বলিনি কখনো?'

হোঁচট খায় রূপা। রাস্তার মাঝখানে হঠাৎ একটা জায়গা উঁচু। আবীর কাছে ছিল বলে তার হাত ধরে সামলে নিতে পারে, 'সাবধানে দেখে চলতে হবে, মাটির রাস্তা উঁচু-নিচু থাকবেই।'

ফোন থেকে টর্চলাইটটা জ্বেলে আবীর এগিয়ে দেয়, 'এটা হাতে নিয়ে হাঁটো।'

রূপা ফোনটা হাতে নিয়ে এত আস্তে করে থ্যাংকস বলে, তার শব্দ অন্য কারও কানে পৌঁছানোর কথা নয়।

'ব্যথা পেয়েছ নাকি?'

উত্তরের বদলে রূপার হঠাৎ মনে হলো টর্চের আলো রাস্তা থেকে তুলে আবীরের মুখে ফেলে। সাত-পাঁচ না ভেবে ইচ্ছে হয়েছে, করলও তাই। হঠাৎ আলোর ঝটকা থেকে চোখ বাঁচাতে মুখ ঘুরিয়ে নেয় আবীর। টর্চের তীব্র আলোর সে ঝটকায় অন্ধকার বেড়ে গেছে মনে হলো।

রূপাকে ছায়ার মতো দেখায় কিন্তু কানে বাজে তার হাসি। একটু অবাকই হয় আবীর। এমন ছেলেমানুষি বা এ রকম কাণ্ড রূপা করতে পারে, ভাবেইনি। ভালো লাগে তার। রূপা হাসছে। হাসলে সুন্দর দেখায় তাকে কিন্তু অধিকাংশ সময় হাসি ও মুখে অনুপস্থিত থাকে।

'আমি চোখে অন্ধকার দেখছি কিন্তু হাসছ শুনতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে শুনতে পারাও একরকম দেখা।'

সে কথায় হাসির মাত্রা বাড়ে। অন্ধকার ভেদ করে রূপার হাসি সামনের দিকেও দৌড়ে যায়। মোকাররম, তাহের একসঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ে। কম কথা বলা অলীক ছিল ওদের দুজনের পেছনে। জানতে চায়, 'হাসছে কে?'

ওদের পরে আবীরের সামনে মুনিয়া। হাসির শব্দে সেও অবাক, 'এমন করে রূপা হাসছে?'

'রূপা হাসছেন মানে নিশ্চয় বড়সড় কোনো হাসির ঘটনা। সেটা কী জানতে পারি?' মোকাররম খানিকটা কৌতুক মিশিয়ে রূপার হাসির কারণ জানতে চায়।

চোখ থেকে অন্ধকার অনেকটা সরেছে আবীরের। দেখতে পায় হাসি উধাও করে দিয়ে মাথা নেড়ে অনুরোধের ভঙ্গিতে ঘটনা জানাতে না করছে রূপা।

'রূপা হোঁচট খেয়েছে' আবীর ঘটনার প্রথম অর্ধেকটার কথা বলে।

হোঁচট খেয়ে রূপা হেসেছে। এ কথা সবাইকে হাসায়। হাসির সঙ্গে হাসি যুক্ত হলে সে হা হা হি হি সহজে থামতে

আমি চোখে অন্ধকার দেখছি কিন্তু
হাসছ শুনতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে
শুনতে পারাও একরকম দেখা।

চায় না।

রাতে খাওয়ার পর খোলা ছাদে মাদুর বিছিয়ে চলে আড্ডা। সেই আড্ডায় হঠাৎ প্রস্তাব উঠল, সবাইকে হোঁচট খাওয়ার গল্প বলতে হবে। যে প্রস্তাবকে মোকাররম ব্যাখ্যা করে। আমরা শহর অর্থাৎ ভান-ভণিতা আর অজস্র মিথ্যের জায়গা থেকে এসেছি। এখানে মাথার ওপর খোলা আকাশ। পুরোটা চাঁদ থাকলে চাঁদের আলোয় সবাই সবাইকে ঝলমলে দেখতে পেতাম। অর্ধেক চাঁদের আলোয় দূর অস্পষ্ট হলেও নিকটের মুখ ও মানুষগুলো অতটা অস্পষ্ট নয়। আমরা পরস্পরের নিকটজন। ক্যামেরা, সৌন্দর্যের প্রতি আগ্রহ আমাদের এক করেছে। চিন্তাভাবনা, ধারণায় আমরা সবাই আলাদা। আবার প্রেম, ছবি তোলার প্রেমে আমরা এক। এই যে সবাই নিজের ঠিকানা ছেড়ে একটা গন্তব্য, ঠিকানাকে সবার করেছি, তা বিশ্বাস আর ভরসায়। এই বিশ্বাস আর ভরসা সুদৃঢ় হবে যদি আমরা মন খুলে দেখতে পারি, দেখাতে পারি। তা-ই দেখাব আমরা, যা আগে কখনোই দেখানো হয়নি। চলো, বলার সাহস জোগাড় করে পরস্পরকে বলি, হৃদয়ের হোঁচট খাওয়ার গল্প।

লম্বা-চওড়া কথাগুলো শেষ হতে মুনিয়া জোরে চেঁচিয়ে ওঠে, 'তালি'। তারপর হা হা হি হি করে হাসি আর হাততালি চলে কিছুক্ষণ।

মামা খানিকটা দূরে চেয়ারে বসে হাতপাখায় বাতাস খাচ্ছিলেন। বুদ্ধিমান মানুষ। উঠে ঘরের দিকে চলে গেলেন। যাওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করলেন, 'এতগুলো মানুষের জন্য ওই একটা টেবিলফ্যানে কি কাজ হচ্ছে?'

দু-একজন বাদে সবাইকে বলতে শোনা যায়, 'হচ্ছে মামা, হচ্ছে।'

'আমি একটু আসছি' বলে উঠে দাঁড়ায় রূপা।

হই হই করে ওঠে মোকাররম, 'কেটে পড়লে চলবে না রূপা, আজ আমরা সবাই বলতে চাই হৃদয়ের হোঁচট খাওয়ার গল্প।'

কপট বিরক্তি প্রকাশ করে রূপা, 'উফ্ কেন যে আমি তখন হোঁচট খেয়েছিলাম। অনেক রাত হয়েছে, মাকে ফোন করব বলেছিলাম, করা হয়ে ওঠেনি। কথা বলে আসছি।'

তাহেরের গলা শোনা গেল পেছন থেকে, 'কাউকে ছাড়া কারও হোঁচটের গল্প হবে না। জেনে রাখো।'

মানুষকে জানা, চেনা সবচেয়ে কঠিন কাজ মনে হয় রূপার। আবার মোকাররমের কথাগুলো কানে বাজতে থাকে—'অর্ধেক চাঁদের আলোয় দূর অস্পষ্ট হলেও নিকটের মুখ ও মানুষগুলো অস্পষ্ট নয়।'

বুককুঠুরি থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস চড়ুইয়ের মতো উড়ে বেরিয়ে গেল। রূপার মনে হলো, মানুষের পক্ষে মানুষকে বোঝা, জানা, চেনা সত্যিই দুঃসাধ্য। ভালোবাসা যদি থাকে, দূর হয় নিকটের। তা যদি না থাকে মানুষ নিকটে থেকেও নিকটের মানুষ হয় না, হতে পারে না।

মাকে ফোন করতেই মায়ের প্রশ্ন, 'জিয়াদ ফোন করেছিল?'

তার জবাব না দিয়ে সে যে অন্ধকারে হোঁচট খেয়েছে, বুড়ো আঙুলে ব্যথা, সে কথা জানায় রূপা। কানে তুললেন না মা, 'তুই জিয়াদকে ফোন



করেছিলি?'

রূপা সে প্রশ্ন পাশ কাটিয়ে জানতে চায়, 'তোমরা খেয়েছ?'

'অনেক রাত হয়েছে। না খেয়ে বসে থাকার কথা না। জানিস, তবু অযথা প্রশ্ন করছিস।'

এ কথার পর কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকে মা এবং মেয়ে উভয়েই।

'আমি ফোন করেছিলাম ওকে।'

ছ্যাঁৎ করে ওঠে বুকের নিচে। ওকে মানে কার কথা বলছেন মা, বুঝতে না পারার কথা নয়।

শিরদাঁড়া বেয়ে হঠাৎ বিদ্যুৎ প্রবাহের অনুভূতি জেগে ওঠে। তা ছটফট করে পৌঁছে যায় মগজে। চোখে জ্বালা অনুভব করে। মুখমণ্ডলের চামড়ার নিচে উষ্ণতা বেড়ে যায় রক্তের। বিরক্তবোধ তার গলার স্বর চড়িয়ে দেয়, 'তুমি ওকে ফোন করতে গিয়েছিলে কেন?'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করলেন না মা। মেয়ে বিরক্ত হয়েছে বুঝতে পারেন। রাগ তাঁর নিজের মনেও রয়েছে কিন্তু সামলে নেন মেয়ে দূরে রয়েছে। গেছে অচেনা জায়গা, অচেনা মানুষদের সঙ্গে। চোখের সামনে নেই তাই মাথা ঠান্ডা রাখা উচিত বিবেচনা করেন। মেয়েকে বুঝিয়ে বলার ঢংয়ে জানান, 'অনেক দিন জিয়াদ আসে না, তাই ভাবছিলাম রাতে খেতে আসতে বলব।'

এই পর্যন্ত বলে কয়েক সেকেন্ড চুপ থাকেন মা। ওই কয়েক সেকেন্ডকে মনে হয় অন্তহীন থমথমে সময়। সে থমথমে সময়জুড়ে নড়ে না চড়ে না, অপেক্ষায় থাকে রূপা। অপেক্ষা, তারপর মা কী বলবেন। কী কথা হলো তারপর? কী কথা? নৈঃশব্দ ভাঙে দীর্ঘ অপেক্ষার পর, 'বলতে পারিনি, ওর ফোন বন্ধ পেলাম।'

পাহাড় সমান ভার বুকে চাপ দিয়ে রেখেছিল। সে ভার সরে গেল। জানালাভর্তি নীলচে মেঘের নীল রং হাসি। বুকভরে শ্বাস নেয় রূপা।

খোলা ছাদে খোলা গলায় অলীক গান ধরেছে, 'প্রাণ চায় চক্ষু না চায়'। তার সঙ্গে প্রথমে কণ্ঠ মেলায় মুনিয়া। মনে মনে গুনগুন করতে করতে অন্য সবাইও একসময় গলা মেলায় সে গানে। নীল আভা ছড়িয়ে অর্ধেক চাঁদটা মন দিয়ে সে গান শুনতে চায়, তার মনোযোগ কাড়ার চেষ্টায় মেতে ওঠে ছাই, কালো, সাদা রঙের ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘেরা।

একই চাঁদ ঢাকা শহরের মেঘে মন খারাপ করে ঝুলে আছে। নিচতলার বারান্দা থেকে দুটো উঁচু বিল্ডিংয়ের মাঝখানে তাকে দেখা যায়। গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন রূপার মা। মন ভালো নেই। মেয়েরা বড় হয়ে গেছে, বড় হচ্ছে। সবাই চলে, বলে নিজের নিজের মতো করে। নিজের ভালো নিজের মতো করে দেখে। সব বলতে হয় না, করতে হয় না, তা কাউকে বোঝানো যায় না। বুঝতে চায়ও না কেউ। আজকাল প্রায়ই শোনা যায়, এর সঙ্গে তার, অমুকের সঙ্গে তমুকের ছাড়াছাড়ি

হয়ে গেছে। রূপার কথা ভেবে বুক কেঁপে ওঠে আমিনা খাতুনের। মাত্র তেইশ বছর বয়স মেয়েটার। ঘরে বিবাহযোগ্য দ্বিতীয় একটা মেয়ে, রোজা। তার ভবিষ্যৎ নিয়ে সংকট অনুভব করে।

রাতে আর হোঁচট খাওয়ার গল্প হয়নি। প্রস্তাবক নিজেই নতুন প্রস্তাব দেয়, 'সে গল্প শোনা হবে আগামী রাতে'। ভোরবেলা উঠে সুন্দরবন রওনা দিতে হবে বলে আসর পেছানো হলো। ছেলেরা সবাই চলে গেল নিচে। ছাদে হাঁটাহাঁটি করে মুনিয়া। রূপা বসে দূরের অন্ধকার দেখে। অন্ধকার দেখার বিষয় নয়, তবু মাঝে মাঝে মানুষ যা দেখার নয়, দেখে।

'আমার ঘুমোতে ইচ্ছে করছে না রূপা। ঢাকায় তো এমন রাত মেলে না।'

'ঘুমোতে ইচ্ছে করছে না আমারও।'

শূন্য পড়ে থাকা মাদুরে গিয়ে বসে রূপা। মনে মনে গুনগুন করে এখানে বসে সবাই যা গাইছিল, 'প্রাণ চায় চক্ষু না চায়'।

কোমরসমান উঁচু করে গাঁথা ছাদের তিন পাশ। একটু দূরে, সে গাঁথুনিতে ভর দিয়ে সামনে তাকিয়ে রয়েছে মুনিয়া। হঠাৎ তার প্রশ্ন, 'তুমি ভূত বিশ্বাস করো রূপা?'

'হঠাৎ ভূত?'

তখন হাত তুলে মুনিয়া উত্তর-পূর্ব দিকে দেখায়, 'ওই দিকে মামাদের বিরাট বাঁশঝাড় আর একটা দিঘি রয়েছে। রাতের বেলা ওদিকটায় কেউ যায় না। লোকে বলে, ভূতেরা ঘোরাফেরা করে, তাদের এলাকায় মানুষের চলাচল তারা পছন্দ করে না।'

মনটন ভালো নেই রূপার। তবু কৌতুক করতে ইচ্ছা হয়, 'দিনের বেলা ওদিকে মানুষ যায় না?'

'হ্যাঁ, যায়।'

'তো দিনের বেলা ভূতগুলো থাকে কোথায়?'

'কী জানি বাবা, লোকে বলে তাই শুনি। ভূত আছে কি নেই, তা নিয়ে ভেবে আমি কী করব?'

হাসে রূপা, 'ভূত আগে ছিল মুনিয়া, এখন মানুষেরাই ভূত।'

এগিয়ে কাছে আসে মুনিয়া, 'বারান্দা থেকে দাঁড়িয়ে মামাদের মসজিদ দেখা যায়। বাম দিকে, দেখেছ তুমি?'

'না, দেখিনি তো।'

'গোলাঘরের পাশে গাছ দুটো আকারে বেড়েছে বলে দেখা যায় না, একসময় তোমাদের দেখাতে নিয়ে যাব। মসজিদের বিশ গজ দূরে একটা মন্দির রয়েছে, প্রায় দুই শ বছরের পুরোনো।'

'মসজিদের পাশে মন্দির?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুনিয়া বলে, 'আগে তো এমনই ছিল। মসজিদটা নিয়ে একটা গল্প প্রচলিত রয়েছে, তোমাকে বলি। আমার নানার দাদা স্বপ্নে দেখলেন সাদা আলখাল্লা পরা লম্বা শরীরের একজন বলছে, "তোর বাড়ি সুন্দর হয়েছে খোদা বক্স, সুন্দর করে একটা মসজিদ বানা।" নানার দাদা দেরি করেননি। মিস্ত্রি নিয়ে এলেন মুর্শিদাবাদ থেকে, বানিয়ে ফেললেন মসজিদ। সেই লম্বা আলখাল্লাওয়ালা আবার আসে স্বপ্নে। তোকে আশীর্বাদ করছি যমজ ছেলে হবে তোর, তারপর ঘরে আলো করে আসবে যমজ মেয়ে।'

'সত্যি তাই হয়েছিল নাকি?'

মুনিয়া ওপর-নিচে মাথা নেড়ে জানায়, 'ঠিক ঠিক তা-ই হয়েছিল। এবার তোমাকে চমকে দেওয়ার মতো আর একটা ঘটনা বলি। এই গ্রামের সবাই জানল মসজিদটায় শুধু মানুষেরা নামাজের জন্য যায় না। আসে অন্যরাও, যাদের মানুষ দেখতে পায় আবার পায় না। মসজিদে মধ্যরাত থেকে জিকিরের শব্দ ভেসে আসত। আর দূর থেকে দেখা যেত ভেতরে মানুষ নেই। কিন্তু ভেতরটা আলোকিত হয়ে আছে। তখন তো হারিকেন আর হ্যাজাকবাতি ছিল শুধু। কিন্তু যে আলো দেখা যেত তা হ্যাজাক বা হারিকেনের নয়। সবাই বলত, সে আলো মানুষের জ্বালানো কোনো আলো নয়। যারা জিকিরে আসে, সেই জিনদের পবিত্রতার আলো।'

মানুষ ও জিনের গল্পে বিশ্বাস-অবিশ্বাস দুই-ই রয়েছে। তাদের ঠোকাঠুকির দিকে মন না গড়িয়ে মন গড়িয়ে যায় পৃথিবীর রহস্যময়তার দিকে। প্রকাণ্ড আকাশের নিচে সামান্য একটা ছাদ, তার ওপর ছোট্ট একটা মাদুরে দুটো মানুষ বসা। রূপা আর মুনিয়া। দুজন নিঃশব্দে ডুবে যায়। এমন নিঃশব্দ চারপাশের ঝিঁঝির ডাক খুবই স্পষ্ট শোনা যেতে থাকে।

'মসজিদটায় এখন তাদের যাওয়া-আসা নেই? সেই অলৌকিক আলো দেখা যায় না আর?'

মুনিয়া জানায়, 'শোনা গল্প, আমরা কী দেখব, সেদিনের মেয়ে আমরা।'

আবার ঝিঁঝি পোকার ডাক। কথা নেই। দুজনের কেউ কিছু বলছে না। দুজনের চুপচাপে অনেকটা সময় কেটে গেল। নতুন কিছু বলার মতো পেয়ে যায় মুনিয়া। নড়েচড়ে বসে, 'জানো, এখন এ গ্রামের অনেক মানুষ ওই মসজিদটাতে নামাজ পড়তে যায় না!'

ভ্রু কুঁচকে তাকায় রূপা, 'নামাজ পড়তে যায় না মানে?'

'আমার নানাভাইকে গ্রামের লোকজন বলেছিল, "কাদের বক্স সাহেব, মসজিদের পাশে ভাঙাচোরা মন্দির, সেটা ভেঙে ফেলা ভালো। আপনার দুটো সন্তান অকালে মারা গেল। কারণ বোঝার চেষ্টা তো করবেন।" বোঝার চেষ্টা করেননি নানাভাই। বলেছিলেন, "এ বাড়ি, মসজিদ বানিয়েছিলেন আমার দাদাজান। মন্দির তখনো সেখানে ছিল। মন্দিরের পাশে মসজিদ বানানো হয়েছে বলে তাঁর কোনো সন্তানাদি মরেনি।" বলেছিলেন, "এত দিন ধরে মন্দিরটা ওখানে রয়েছে। আমার, আমাদের জমিতে বলে আমার পূর্বপুরুষেরাও তো তা ভাঙেননি। আমিও ভাঙব না। মন্দির যাদের, তাদের শ্রদ্ধা-ভক্তির জায়গাটা আমি নষ্ট করব কেন?" নানাভাইকে মন্দির নিয়ে আর কেউ কিছু বলেনি। তবে সেই একই বলা অনেক দিন পর আবার শুনতে হয়েছে মামাকেও। মামাও একই কথা বলেছেন। বলেছেন, নানাভাইয়ের থেকে আরও খানিকটা বাড়িয়ে। "কতকাল আগের মন্দির আমার হাতে তা যদি ভাঙা হয়, তা আমার পূর্বপুরুষদের জন্য অসম্মানের। তা ছাড়া আজ যদি এ অন্যায়টা আমি করি, ভবিষ্যতে সময়-সুযোগ এলে মসজিদ ভাঙার জন্যও তো মানুষেরা জড়ো হবে।" এই কথা বলার পর থেকে কী হয়েছে জানো?'

রূপা টের পায় মানুষের অসাধারণত্বের গল্প শুনে তার ভেতরটায় আনন্দের বন্যা বইতে শুরু করেছে। মন বলে সে আনন্দের বিপরীতে নিশ্চয়ই রয়েছে কোনো বেদনা। সত্যি কি তা আছে? তারপর কী কী হয়েছে, জানতে অস্থিরতা জাগে।

সব শুনে মলিন মুখে বিষণ্ন স্বরে রূপা জানায়, 'এই মসজিদে গ্রামের অধিকাংশ মানুষ এখন নামাজ পড়তে আসে না। বয়কট করেছে মসজিদ, আল্লাহর ঘর যাকে বলা হয়।' মন খারাপ হওয়ার মতো কথা। মুনিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে রূপা। পলক পড়ে না। উদাস করুণ হয়ে তাকিয়ে রয়েছে মুনিয়া। তাকিয়ে রয়েছে শূন্য দৃষ্টি মেলে। নিজের সঙ্গে কথা বলার মতো বলে, 'গ্রামটা আগে কেমন ছিল, এখন হয়েছে কেমন, ভাবতে পারি না।'

হঠাৎ তার অন্য একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে শূন্য দৃষ্টি ফেরে রূপার দিকে, 'জানো, বছর তিনেক আগে কী ঘটেছিল? মানুষ দলে দলে নানাভাইদের গোরস্থানে এসেছিল হাতুড়ি-শাবল নিয়ে কবর ভেঙে ফেলবে।'

'কবর ভেঙে ফেলবে কেন?'

হাতুড়ি-শাবলের কারণ ব্যাখ্যা করে মুনিয়া, 'ওই যে বাড়ির নাম দেখেছ শ্রীময়ী জয়তুন ভিলা, আগের নিয়ম অনুযায়ী নানাভাইয়ের দাদা-দাদির কবরেও যে নামফলক রয়েছে, তাতে নামের আগে যুক্ত করা হয়েছে শ্রী অমুক, শ্রীমতী অমুক। এখনকার অনেক মানুষের কাছে তা খুবই অস্বস্তির। এ নিয়ে গুজগুজ ফুসফাস গ্রামে চলছে। তা মামাদের কান পর্যন্ত এসেছিল। গরজ করেনি কেউ। হঠাৎ একদিন শুক্রবার নামাজের শেষে অনেক মানুষ হইচই করতে করতে কবরস্থানে হাজির। নামের আগের শ্রী আলাদা করে ফেলবে। মুসলমানদের নামের আগে শ্রীযুক্ত, শ্রীমতী বা শ্রীময়ী কেন থাকবে? কী অদ্ভুত ভাবনা! উত্তর আছে এ প্রশ্নের। এ প্রশ্নের উত্তর নেইও। আগে তো এদিকটাতে এমন রীতিই ছিল, তুমি বাড়ির নামটা দেখেছ? শ্রীময়ী জয়তুন মহল। কী অসুন্দর লাগছে, অধর্ম রয়েছে নামে?'

অকস্মাৎ মনে হলো, বসে থাকতে ভালো লাগছে না। উঠে দাঁড়ায় রূপা। অস্থির হয়ে পায়চারি করতে থাকে। চোখ যায় আকাশে। সেখানে আধখানা চাঁদের মুখে সম্পূর্ণ হাসি। চাঁদ যেন বলছে, তোমার গল্পই জগতের গুরুত্বপূর্ণ গল্প নয়। আরও বড়, আরও শোকের গল্প রয়েছে। চাঁদ যেন বলে, তুমি অনেক ভালো আছো রূপা। তিনবার তাকাল চাঁদের দিকে। তিনবারই একই কথা বলল চাঁদ।

রূপা চাঁদের কথায় হালকা বোধ করে, 'আমরা নিজের দুঃখ, বেদনা, কষ্টকে বড় করে দেখি, দেখতে ভালোবাসি। ভালোবাসি দুঃখে গলে যেতে। চারপাশে অজস্র বড়সড় দুঃখের ঘটনা রয়েছে, তুলনা করে দেখলে, দেখতে পারলে মনে হবে নিজের যে কষ্ট তা কত ছোট।'

চুপ করে থাকা মুনিয়া দেখে, উঠে ঘরের দিকে যাচ্ছে রূপা, 'ঘুমোতে যাচ্ছো?'

'না, আসছি। আজ ঘুমাব না। উদ্‌যাপন করব।' যেতে যেতে উত্তর দেয় রূপা।

মুনিয়া তার যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে। বুঝতে পারে না কী বলে গেল সে। কিসের উদ্‌যাপন।

চাঁদের আশপাশে এখন কোনো মেঘ নেই। নীলচে মেঘে টিপের মতো হেসে আছে চাঁদ। আধখানা চাঁদ। অন্ধকার ছিঁড়ে ভেসে আসে রাতচরা পাখির ডাক। তক্ষক ডেকে ওঠে দূরে। খানিকটা হাওয়া এসে জানিয়ে দিয়ে গেল, রাত জাগিয়ে রেখেছে অনেককেই।

ফিরে এসেছে রূপা। হাতে কিছু একটা দেখা যায়। সেটা নেড়ে দেখায়, 'এটা কী জানো?'

'একটা খাম।'

'এটা ডিভোর্স লেটার। আজ সকালে আমাকে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।'

মুনিয়া নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না।

'জিয়াদ কখনোই আমার ছবি তোলার ভালো লাগাকে পছন্দ করেনি। এই যে সবার সঙ্গে এভাবে ছবি তুলতে বেরিয়ে পড়া, এমন উত্তেজনা আনন্দকে অসভ্যতা মনে করেছে। দিনের পর দিন তা নিয়ে আমাকে কম অপমান করা হয়নি। ডিভোর্স লেটার। এটা হাতে পাওয়ার পর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েনি। নিজের ওপর বিরক্ত হয়েছি, নিজেকে নিজেই ঠকিয়েছি মনে হয়েছে। জানতাম, একদিন এ রকমই হওয়ার কথা। তা যদি ভেবেই থাকি, তাহলে আমি এই লেটার পাওয়ার বদলে তাকে নিজেই তো এমন একটা পাঠাতে পারতাম। এ চিঠি পাওয়ার জন্য না, আমি কেন তাকে দিতে পারিনি সে কারণে আজ সারাটা দিন খুব মনঃকষ্টে কেটেছে। মনঃকষ্ট এই জন্য, সুন্দরকে ভালোবাসি, তার অবমাননা এমন হওয়া উচিত ছিল না। ছিল না কিন্তু ঘটেছে। ভেবেছি, যে অপমান আমাকে করা হলো, এভাবে না করে কেউ কি আছে যে আমার অনুভূতি, আমার আমিকে নিয়ে ভাববে, বেদনার্ত হবে? এ ঘটনায় সবাই দোষী ভাববে আমাকে। মা, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন—কেউই বিবেচনা করবে না, আমার জীবন আমার, পছন্দ আমার, অধিকার আমার।'

বেদনার কথা বলে যায় রূপা, কিন্তু মুখে তার হাসি। মুনিয়া দেখতে পায় চাঁদও হাসছে।

রূপা বলে যেতে থাকে, 'আমি হাত-পা ঝাড়া হয়ে গেছি মুনিয়া, মুক্ত হয়ে গেছি। সকাল থেকে অপমানের পীড়নে কষ্ট পাচ্ছিলাম। এখন মনে হচ্ছে আমি অতি ক্ষুদ্র একজন মানুষ, আমার প্রতি যে অন্যায়-অবিচার তা খুব বড় ঘটনা নয়। চারপাশে আরও কত পীড়ন। কত মাথা নত করে দেওয়া ঘটনা, মানুষের অন্যায়ের, শোকের, হতাশার। তার চেয়েও শোক-হতাশা রয়েছে আজ জানলাম, মানুষেরা অন্যায় করে ধর্মের সঙ্গে, ধর্মস্থানের সঙ্গে। মানুষেরা মৃতের কবরে হামলে পড়েও ধর্মের চরিত্র ঠিক রাখতে চায়।'

রাতের নির্জনতা ভেঙে নিঃশব্দ চুরমার করে দেয় রূপার ক্ষোভ। টুকরো থেকে টুকরো হতেই থাকে নির্জনতা। নির্জনতার গুঁড়ো ঝরে পড়তে থাকে। রূপা হতাশা বোধ করে, 'এ পৃথিবী বড়ই কৌতুকময়। ছোট কাজ করে মানুষেরা বড়র গৌরব পেতে চায়, বড় কাজকে নিজজ্ঞানে মনে করে ছোট কাজ। মানুষ পরিচয়ের মানে বোঝে না, মানুষ সম্মানও রক্ষা করতে শেখেনি। অথচ ভেবে দেখো মুনিয়া, শত শত বছর আগে মানুষের মনে কত প্রেম ছিল, ছিল কেমন সৌন্দর্যবোধ! তোমার নানাভাইয়ের দাদা চমৎকার এ বাড়িটা বানিয়েছেন, বানিয়ে নাম রেখেছেন স্ত্রীর নামে—শ্রীময়ী জয়তুন মহল। এই সৌন্দর্যবোধ, প্রেম, প্রেমের আনন্দ কেন মানুষদের মুগ্ধ করেনি? ভাঙার তাড়নায় চিরকাল মানুষ কোমর বাঁধে, দল বাঁধে, হামলে পড়ে। সর্বনাশ ঘটানোর জন্য যতই দল বাঁধবে মানুষ, যুগে যুগে কালে কালে, সৌন্দর্য তবু হারবে না।'

হাতের চিঠিটা ছিঁড়ে কুচি কুচি করে রূপা, রূপালী রওশন। হাঁসছে চাঁদ। চাঁদের হাসির সঙ্গে তার হাসি মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। এমন রূপাকে এর আগে কখনোই দেখা হয়নি। মুনিয়া হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। তার বলা গল্পগুলো শুনে কোথায় চলে গেছে রূপা! অবাক বোধ হয়, গল্পগুলোতে ছিল কিছু তিক্ততা। কিন্তু এ গল্পের ভেতরে এমন সম্পন্ন অনুভব ছিল কোনো দিন টের পাওয়া হয়নি।

আধখানা চাঁদের নিচে শ্রীময়ী জয়তুন মহলের ছাদে দুজন মানুষ। একজন বসে অন্যজন দাঁড়িয়ে। একজন কথা খুঁজে পেয়েছে, খুঁজে পেয়েছে নিজেকে। অন্যজন উল্টো, বাক্যহারা। অপলক দেখছে একজন, দেখছে অবাক হয়ে অনেক দিনের চেনা এক মানুষকে—পরিপূর্ণ করে চেনা হলো বুঝি আজ তাকে।

> এটা ডিভোর্স লেটার। আজ সকালে আমাকে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।



শিল্পীর তুলিতে পলাশীর যুদ্ধ, ১৭৫৭

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ

পলাশীর প্রত্যক্ষদর্শী

এক ইংরেজ সৈনিকের কালপঞ্জি

বাঙালির জীবনে স্মরণকালে যে দুটি ঘটনা ইতিহাসের বাঁক ফিরিয়ে দেয়, পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭) তার একটি; অন্যটি ইখতিয়ারউদ্দীনের বঙ্গবিজয়। পলাশীর যুদ্ধ ও সমকালীন ঘটনাবলি নিয়ে রচিত ইতিহাসগ্রন্থ বহু। এর রচয়িতাদের মধ্যে রয়েছেন বাঙালি, ভারতীয়, ইংরেজসহ ইউরোপীয় ইতিহাসবিদেরা। ক্লাইভ ও অন্য ইংরেজদের চিঠিপত্র এবং নানা দলিল ও চুক্তিপত্র থেকেও এ সম্পর্কে জানা যায়।

পলাশীর যুদ্ধে অংশ নেওয়া একজন ইংরেজ সৈনিকের একগুচ্ছ চিঠি পাওয়া গেছে অর্ধশতকেরও কিছু আগে প্যারিসে। সৈনিকের নাম জন করনেইলি। তিনি ১৭৫৪ সালে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং ওই বছরেই ভারতবর্ষে আসেন। সুইজারল্যান্ড থেকে ব্রিটেনে আসা করনেইলি পরিবারের অনেকেই সেনাবাহিনীতে কাজ করতেন। তাঁর বাবাও ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর মেজর ছিলেন। করনেইলি তাঁর ভারতযাত্রা ও ভারতের জীবনযাপন নিয়ে মাঝে মাঝেই দীর্ঘ পত্র

লিখতেন বাবাকে। লন্ডনের ফলিও সোসাইটি ১৯৬৬ সালে এই পত্রগুলো সম্পাদনা করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে। গ্রন্থের নাম *জার্নাল অব মাই সার্ভিস ইন ইন্ডিয়া*।

করনেইলির পত্রে বিধৃত শতকটি ছিল ভারতবর্ষের ক্রান্তিকাল। ১৭০৭ সালে মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের সুবাদাররা কার্যত স্বাধীন নবাব হয়ে ওঠেন, যদিও তাঁরা সম্রাটকে কর দিতেন। ১৭৩৮ সালে মারাঠারা মোগল সাম্রাজ্যের প্রায় অর্ধেক নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয়। পরের বছর পারস্যের নাদির শাহ দিল্লি জয় করে ফিরে যান। পূর্ব প্রান্তে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে নবাবী শাসন।

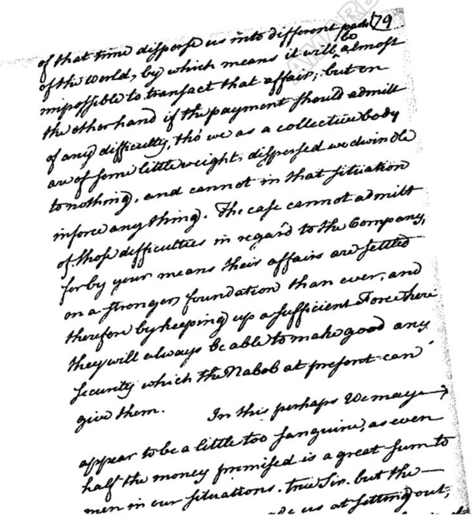
ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দের আগমন অবশ্য এর দুই শ বছর আগে থেকেই। ইউরোপের নববিকশিত পুঁজিবাদ তখন উপনিবেশ স্থাপনে আগ্রাসী হয়ে উঠেছে। ভাস্কো-দা-গামার পথ ধরে ভারতে প্রথম পৌঁছে পর্তুগিজ বণিকেরা। তাদের অনুসরণে মসলার ব্যবসা করতে আসে ওলন্দাজরা। ১৭০৮ সালে গ্রেট ব্রিটেনের রানি অ্যানির সনদ পায়। লন্ডনের লিডেনহল স্ট্রিটে তাদের প্রধান দপ্তর। মসলার সঙ্গে তাদের ব্যবসায় যুক্ত হয় রত্ন ও পাথর, নীল, কর্পূর, গন্ধক এবং আরও পরে ঢাকাই মসলিন ও চা। ফরাসি বণিকেরাও প্রায় একই সময়ে ভারতবর্ষে বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করে এবং ইরেজদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। এই দ্বন্দ্বের সূত্রেই দেশীয় রাজন্যদের সঙ্গে ইংরেজ ও ফরাসি মৈত্রী ও ষড়যন্ত্রও এগিয়ে চলে।

আঠারো শতকের প্রথম দিকে ভারতবর্ষে ইংরেজদের প্রধান ঘাঁটি ছিল চারটি—মাদ্রাজের সেইন্ট জর্জ দুর্গ, কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম এবং সুরাট ও বোম্বাইয়ের দুর্গ। এ ছাড়া মাদ্রাজের শখানেক মাইল দক্ষিণে কুডালোর শহরের উল্টো দিকে সেইন্ট ডেভিড দুর্গ এবং বঙ্গোপসাগর, মালাবার ও করমণ্ডলে তাদের সেনাবসতি ছিল। দুর্গ এবং তার চারপাশে সংরক্ষিত অঞ্চলে প্রধানত ইংরেজ বণিকেরা বাস করত। প্রথম দিকে তাদের সংখ্যা ছিল স্বল্প এবং আহার-বাস ছিল একসঙ্গে। কিশমিশ-বাদামমিশ্রিত বিলাসী খাবার এবং বিশাল প্রমোদভবন তাদের আয়েশি করে তোলে। সম্পদ ও দায়িত্ব বিবেচনায় তাদের বিভক্তি ছিল চার বর্গে—রাইটার, ফ্যাক্টর, জুনিয়র মার্চেন্টি ও সিনিয়র মার্চেন্টি। রাইটাররা প্রধানত করণিক বা মুনশি; কলকাতার রাইটার্স ভবন তাদেরই স্মৃতি। ফ্যাক্টররা সম্ভবত কুঠি ও কারখানার তদারক করতেন। সিনিয়র মার্চেন্টরা একটা পরিষদ গঠন করে একজন গর্ভনর নিযুক্ত করতেন। গভর্নর প্রশাসনের প্রধান, বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রক, দেশীয় রাজাদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকারী এবং বিচারসভার প্রধান। তাঁর সশস্ত্র দেহরক্ষীর সংখ্যা ৮০, রাস্তায় চলার সময় তাঁর সামনে চলত একদল যন্ত্রসংগীতবাদক। আবার কোম্পানির বাইরে ইংরেজ বণিকেরা ফ্রি মার্চেন্টদের পৃথক পরিষদ তৈরি করেছিল, যার শীর্ষে থাকতেন মেয়র।

মোগল শক্তির দুর্বলতার কারণে বণিকদের নিয়ন্ত্রণহীন মুনাফা অর্জনের সুযোগ তৈরি হয়, যা ইংরেজ ও ফরাসিদের অল্প সময়ের মধ্যে অবিশ্বাস্য মাত্রায় ধনী করে তোলে। তারা দ্রুত বিলাসী খাদ্য, ভারতীয় রাজাদের পরিধেয় বস্ত্র এবং ভারতীয় 'জেনানা' সংস্কৃতিকে রপ্ত করে ফেলে। কিছু ইংরেজ রমণীর আগমন ঘটলেও তারা ছিল মূলত সিনিয়র মার্চেন্টদের কবজায়। জুয়াখেলা ও বাজি ধরা এত প্রকট হয়ে উঠেছিল যে কেউ ১০ পাউন্ডের বেশি বাজি ধরলে কোম্পানি শাস্তি দিত।

দুর্গ ও সংরক্ষিত অঞ্চলের বাইরে ছিল ভারতীয়দের বসতি। এদের অবস্থাপন্ন অংশ ছিল ইংরেজদের বাণিজ্যের মধ্যস্বত্বভোগী। ইউরোপে চালান দেওয়া কাঁচামাল কেনার সময় উৎপাদকদের ঠকিয়ে বড় মুনাফা যেত এদের ঘরে। ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের চারপাশে বিকাশমান কলকাতা নগরের জগৎ শেঠ, উমিচাঁদ, রাজবল্লভ—এরা এ বর্গের পরিচিতজন। তার সঙ্গে ছিল বিপুল ক্ষুদ্র দোকানদার ও মজুর। মাদ্রাজ অঞ্চলে এসব বিকাশমান নগরের ভাষা ছিল লৌকিক পর্তুগিজ। কলকাতা অঞ্চলে অনেকটা লৌকিক অ্যাংলো-ইংরেজি। এ সুযোগে আবার গড়ে উঠেছিল একদল দোভাষী, যারা ইংরেজি, ফারসি ও স্থানীয় ভাষার সমন্বয়ে এক বিচিত্র বুলি ব্যবহার করতেন।

১৭৪৬ সালে ইউরোপে ইংরেজ-ফরাসি যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ভারতবর্ষে সশস্ত্র ইংরেজ সেনারা ছিল মূলত দুর্গের পাহারাদার ও রাস্তার টহলদার। এসব বাহিনী গঠন করা হতো ইংরেজ অফিসার এবং মিশ্র পর্তুগিজ ও ভারতীয় সেনা নিয়ে। ইউরোপের সংঘর্ষ ভারতবর্ষে বিস্তৃত হলে ইংরেজরা প্রথমে পণ্ডিচেরির ফরাসি বাণিজ্য কুঠি আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। কিন্তু কর্ণাটকের নবাব এতে ইংরেজদের নিবৃত্ত করেন। এ সুযোগে ফরাসি নৌ-সেনাপতি লা বর্দোনে মাদ্রাজের ইংরেজ


of that time disperse us into different parts 79
of the world, by which means it will be almost
impossible to transact that affair; but on
the other hand if the payment should admitt
of any difficulty, tho' we as a collective body
are of some little weight, dispersed we dwindle
to nothing, and cannot in that situation
inforce any thing. The case cannot admitt
of those difficulties in regard to the Company,
for by your means their affairs are settled
on a stronger foundation than ever, and
therefore by keeping up a sufficient Force there
they will always be able to make good any
security which the Nabob at present can
give them. In this perhaps we may
appear to be a little too sanguine, as even
half the money promised is a great sum to
men in our situations. true Sir. but the—

জন করনেইলির হাতে লেখা দিনলিপি



নবাব সিরাজউদ্‌দৌলা

দুর্গ অধিকার করে নেন। কর্ণাটকের নবাবের সৈন্যদলও ফরাসি সেনাপতি দুপ্লের কাছে পরাজিত হন। কিন্তু ফরাসি নৌবহর মরিশাসে এক ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত হলে তাদের বাহিনী দুর্বল হয়ে যায়। ১৭৪৮ সালে ইংরেজরা পণ্ডিচেরির ফরাসি দুর্গ দখল করে নেয়। পরে অবশ্য ইংরেজ-ফরাসি সন্ধি হয়।

এই যুদ্ধের পর ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ইংরেজ সেনার সংখ্যা ও সেনাবাহিনীর শক্তি বাড়ানোর কাজ শুরু হয়। কোম্পানিও তার সামরিক বাহিনী গঠনে মনোযোগ দেয়। ১৭৪৮ সালে দ্রুত গড়ে তোলা আট কোম্পানি সৈন্য ও গোলন্দাজ অ্যাডমিরাল বস্‌কাওনের নেতৃত্বে মাদ্রাজে অবস্থান নেয়। ব্রিটেনে সেনাবাহিনীতে নিয়োগ বাড়তে থাকে। এ রকম একটা পরিস্থিতিতে জন করনেইলি ৩৯তম প্রথম রাজকীয় রেজিমেন্টে যোগ দেন। এর অধিনায়ক ছিলেন কর্নেল অ্যালডারক্রন। ১৭৫৪ সালের শুরুতে এই বাহিনীকে আদেশ দেওয়া হয় 'ইস্ট ইন্ডিজ' যাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে। জন করনেইলির পত্র-বিবরণের শুরু এখানেই।



সিরাজের সমাধি

এই সেনাদলকে বহন করে নিয়ে যাবে ছয়টি রণতরির বহর। কেন্ট, ইগল, ব্রিস্টল, সেলিসবারি, ব্রিজওয়াটার ও কিংফিশারের মূল শক্তি মোট আড়াই শ কামান; পরে এর সঙ্গে যুক্ত হয় কাম্বারল্যান্ড ও টাইগার। সেনারা যাবে কর্ক থেকে কিনসালে, সেখানে অ্যাডমিরাল ওয়াটসনের নেতৃত্বে রণতরিগুলো অপেক্ষমাণ। কোম্পানির জাহাজ ব্রিটানিয়ায় চড়ে করনেইলিরা কিনসালে পৌছেন। তবে ২৬ মার্চ প্রবল স্রোতে নোঙর তুলতে না পারায় জাহাজ ছাড়ে একদিন দেরিতে। এবং এদিনে এক মর্মন্তুদ ও কৌতুককর ঘটনা ঘটে। জাহাজ ছাড়ার আগে কাপ্তান জানতে পারেন যে যাত্রীদের মধ্যে পুরুষবেশে একজন নারী রয়েছেন। কিন্তু ধৃত যাত্রী নিজেকে পুরুষ বলে দাবি করেন। অবশ্য উত্তমাঙ্গ উন্মুক্ত করতে বলা হলে তাঁর আর উপায় থাকে না। সৈনিকেরা চাঁদা তুলে তাঁর ফেরতযাত্রার ব্যবস্থা করেন। পরে জানা যায় যে ভদ্রমহিলা সদ্যবিবাহিতা এবং তাঁর স্বামী এ জাহাজের যাত্রী একজন সৈনিক। স্বামীর সঙ্গে থাকার প্রলোভনেই মহিলা এ ধরনের ঝুঁকি নিয়েছিলেন। অবশেষে ২৭ মার্চ ক্যাপ্টেন নেভিল নরওয়ের নেতৃত্বে ব্রিটানিয়া জাহাজে করে তাঁদের যাত্রা শুরু হয়।

২৩৭ জন যাত্রী ও পর্যাপ্ত রসদ নিয়ে জাহাজ চলতে শুরু করে। করনেইলির মনে হলো যে এই ছকবাঁধা জীবনে পানি ও আকাশ ছাড়া চারদিকে আর কিচ্ছু নেই; শুধু মাঝে মাঝে বজ্র, বিদ্যুৎ ও বৃষ্টি। কবুতরের মতো একদল পাখি জাহাজের পেছনে পেছনে উড়ে বেড়ায়, পুচ্ছে তাদের প্রায় এক ফুট লম্বা দুটো পালক। প্রায় ১০০ গজ উড়াল দিতে পারে উড়ন্ত মাছ, যার পরিণতি পাখির আহার হওয়া। হলুদ, লাল, সবুজ ও আকাশি রঙের ডলফিনরা নেচে বেড়ায় জাহাজের চারপাশে। এর সঙ্গে রয়েছে হাঙরের দল। এগুলো মানুষখেকো। আফ্রিকা থেকে ক্যারিবিয়ানে আনার সময় যেসব দাস জাহাজে মারা যেত, তাদের সমুদ্রে ছুড়ে ফেলা হতো হাঙরের খাদ্য হিসেবে। পথে কিছু দুর্ঘটনাও ঘটল। একজন সৈনিক বালতি দিয়ে পানি তুলতে গিয়ে পা পিছলে সবার চোখের সামনেই সমুদ্রে ডুবে গেল। এসবের মধ্যে ত্রিনিদাদ ও উত্তমাশা অন্তরীপ পার হয়ে ১২ জুলাই জাহাজ নোঙর করে মরোনডাভায়।

টানা প্রায় পাঁচ মাস পর জাহাজ থেকে নেমে করনেইলিরা উৎফুল্ল। কিন্তু খরস্রোতা নদীতে খাবার পানি সংগ্রহ করতে গিয়ে বিপদে পড়লে তারা সে স্থান ত্যাগ করে দুদিন পরে মাদাগাসকারে নোঙর করেন। বন্দুক হাতে মাদাগাসকারের বন-বনানীতে ঘুরে তাঁরা দেখতে পান যে দাসব্যবসা এখানকার ধনীদের প্রধান বাণিজ্য। দাস দিয়ে এঁরা পেতেন বন্দুক, ছুরি-কাঁচি, লোহার তাল, কাপড় প্রভৃতি। স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে মিশে করনেইলির মনে হয়েছে যে আফ্রিকা সম্পর্কে ইউরোপীয়

প্রচার বানোয়াট তথ্যে ভরা।

আগস্টের প্রথম দিকে আবার যাত্রা শুরু করে জাহাজ। পাঁচ দিন পর তাঁরা পৌঁছেন জোহান্নায়। কিন্তু প্রচণ্ড বজ্র ও বৃষ্টিপাতে কমলালেবুর ঘ্রাণে ভরা এ দ্বীপে তারা নামতে পারেননি। মাসের শেষ দিকে জাহাজে বসেই সিংহল দ্বীপের দারুচিনির ঘ্রাণ পাওয়া গেল। সেপ্টেম্বরের প্রথম দিন সন্ধ্যায় জাহাজ সেন্ট ডেভিড দুর্গ থেকে তিন মাইল দূরে নোঙর ফেলল। তখনই একজন কালা আদমি কড়িকাঠের ভেলায় করে এসে তাদের পরিচয় ও আগমনের হেতু জানতে চাইল। তাকে আসলে এ কাজে পাঠানো হয়েছিল।

পরদিন সকালে লেফটেন্যান্ট কর্নেল বাগ শ করনেইলিকে মাদ্রাজের কোম্পানির গভর্নরের কাছে পাঠালেন। তাঁদের বিবেচনার বিষয় ছিল এই নৌবহর ও সৈন্যদের ঘাঁটি কোথায় হবে? আলাপ অনুযায়ী জাহাজগুলো থেকে সৈনিকেরা সেন্ট ডেভিড দুর্গের মাইলখানেক দূরে কুডালোর শহরে অবস্থান নেয়। কয়েক দিনের মধ্যে কর্নেল অ্যালডারক্রন ও অ্যাডমিরাল ওয়াটসনও তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন।

কোম্পানির ওই অঞ্চলের প্রধান দপ্তর সেন্ট ডেভিড দুর্গ ইংরেজদের কেনা জমির ওপর নির্মিত। দুর্গের চারদিকে এক কামানের গোলা যতদূর যায় তাকে মান ধরে এর সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছিল। মারাঠারা এর মূল্য হিসেবে নিয়েছিল ২০ হাজার পাউন্ড। সুরক্ষিত দুর্গের পর দুই বর্গমাইল জায়গাজুড়ে ছিল কুডালোর শহর। ইংরেজদের কিছু পাকা দালান, মধ্যস্বত্বভোগী কালা আদমিদের ছোট ছোট টিনের ঘর, কয়েকটা প্যাগোডা—এই নিয়ে কুডালোর।

কর্নেল অ্যালডারক্রনের সচিবের দায়িত্ব পড়ে করনেইলির ওপর। প্রায় শ তিনেক কামানসহ রণতরি এবং সাড়ে আট শ পদাতিক ইংরেজ অবস্থানকে পোক্ত করে। কিন্তু করনেইলি বুঝতে পারেন যে এতে কোম্পানির বড় কর্তারা খুশি নন। এর একটা কারণ যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব বাণিজ্যের জন্য ক্ষতিকর। দ্বিতীয়ত, রাজকীয় বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি পেলে কোম্পানির কর্তাদের গুরুত্ব কমে যাবে। এর মধ্যে সেনাদের ভাতাও নির্দিষ্ট হয়ে যায়। কর্নেল পান প্রতিদিন ৪০ শিলিং, সঙ্গে চারজন চাকর; করনেইলির ভাগে পড়ে মাসে তিন পাউন্ড চার শিলিং ও একজন চাকর।



রবার্ট ক্লাইভ

কোম্পানির গভর্নর টমাস স্যানডার্সের সঙ্গে ফরাসি গভর্নর শার্ল বরার্ট গদিহেউর এক অনাক্রমণ সন্ধিচুক্তি হয় ১৭৫৪ সালের ১১ অক্টোবর।

এবার করনেইলিকে নিয়ে কর্নেল বেরিয়ে পড়েন মাদ্রাজের পথে। আট বেহারার পালকি, ঘণ্টায় পাঁচ মাইল বেগে চলে। ফরাসিদের প্রধান স্থাপনা পণ্ডিচেরি, সাদরাজের ওলন্দাজ বসতি, পর্তুগিজ আবাস সেন্ট টমাস প্রভৃতি পার হয়ে পৌঁছেন মাদ্রাজে। প্রবেশমুখে ১৩ বার তোপধ্বনি করে তাঁদের স্বাগত জানানো হয়। করনেইলির বিবরণে মাদ্রাজ শহরে ইংরেজদের সংরক্ষিত অঞ্চল নতুন ইটের দালানে পূর্ণ। সাত মাইল দূরে পাহাড়ের পাদদেশে আবার তাদের বসন্ত-নিবাসের ভিলা। কালা আদমিদের অংশে ঘরবাড়ি শ্রীহীন। রাস্তাঘাটও অপরিচ্ছন্ন।

এর মধ্যে আরকটের নবাব মুহম্মদ আলী খানের সঙ্গে বকেয়া খাজনা নিয়ে কোম্পানির বিবাদ বাধে। লেফটেন্যান্ট কর্নেল হেরন খাজনা আদায়ে অত্যাচার করলে কোর্ট মার্শালের দ্বারা তাকে শাস্তি দেওয়া হয়। খাজনা দানে অক্ষম বিলাসী নবাব হাতি, উট ও ঘোড়ার বাহিনী নিয়ে সেন্ট ডেভিড দুর্গে ১০ দিন থেকে অ্যাডমিরাল ওয়াটসন ও কর্নেল অ্যাডলারক্রনকে কৃতজ্ঞতা জানান এবং কোম্পানির কাছে তাঁর রাজ্যের অধিকাংশ সমর্পণ করেন। বছরের শেষ দিকে কোম্পানির গভর্নর স্যানডার্স ইংল্যান্ডে ফিরে যান। কর্নেলও দেশে ফেরার আরজি জানান। এ সুযোগে করনেইলি কর্নেলের সচিবের পদ থেকে অব্যাহতি চেয়ে নেন।

মুক্তি পেয়ে এবার তিনি বাগানবাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন ১৭৫৫ সালের ২৮ নভেম্বর। ত্রিচিনোপলিতে থাকেন বন্ধু কেইল্যান্ড। চিদাম্বরামের শিবমন্দির দেখে কলেরুন নদী পার হয়ে ত্রিচিনোপলি হয়ে যান শ্রীরঙ্গম। হঠাৎ করে ডাক আসে রেজিমেন্ট থেকে। ৪২ ঘণ্টা পালকি চড়ে ফেরেন সেন্ট ডেভিড দুর্গে। জানা গেল, ভেলোর দুর্গের কিল্লাদার আরকটের নবাবকে কর দিতে অস্বীকার করেছে। নবাব ইংরেজদের সহায়তা চেয়েছেন। কিল্লাদার ফরাসি সহায়তা নিতে পারেন। তাই যুদ্ধপ্রস্তুতি। কোম্পানির ৪০০ সেনা নিয়ে মেজর কিলপ্যাট্রিক কিল্লাদারকে দমন করলেন।

তবে অন্যদিকে যুদ্ধ বাধল। বোম্বাইয়ের মালাবার উপকূলে ঘেরিয়া দুর্গে জলদস্যু আংগ্রিয়ার ঘাঁটি। অ্যাডমিরাল ম্যাথুস ইতিপূর্বে তাকে দমনে ব্যর্থ হয়েছেন। এবার রাজকীয় গোলন্দাজ বাহিনী আনা হয়েছে ইংল্যান্ড



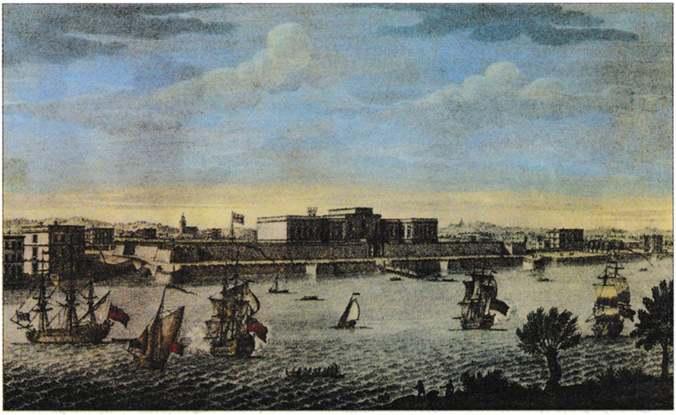
ইংরেজ প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলছেন মোগল সম্রাট শাহ আলম

থেকে। কর্নেল ক্লাইভের নেতৃত্বে এ বাহিনী ঘেরিয়া দুর্গ আক্রমণ করবে। নৌবহর থেকে তাঁকে সহায়তা করবেন অ্যাডমিরাল ওয়াটসন। স্থানীয় মারাঠারাও ইংরেজদের সাহায্য করবে। করনেইলির বৃত্তান্তে এই প্রথম ক্লাইভের উল্লেখ পাওয়া গেল। দুদিন অবরুদ্ধ থাকার পর আংগ্রিয়া পালিয়ে যায়। তার পরিজনেরা বন্দী হয়। দুর্গে পাওয়া যায় নগদ এক লাখ পাউন্ড ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী। শর্ত ছিল, দুর্গটি পাবে সহায়তাকারী স্থানীয় মারাঠারা। কয়েক দিন টালবাহানা করলেও শেষ পর্যন্ত সে শর্ত মানতে হয় ইংরেজদের। ১৪ মে সেনাবাহিনী ফিরে আসে জাহাজে। কর্নেল ক্লাইভ এই অঞ্চলের ডেপুটি গভর্নর নিযুক্ত হন। পদাতিকদের মধ্যে ২৮০ জনকে বিভিন্ন নৌবহরে দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়। করনেইলি তাঁর নতুন কাজে যোগ দেন। ২০ জুলাই জাহাজ মাদ্রাজ পৌঁছে।

করনেইলি তাঁর দিনলিপিতে করমণ্ডল অঞ্চলের নানা বিবরণ দিয়েছেন। ঘূর্ণিঝড়ে গবাদিপশুসহ প্রায় পুরো গ্রাম উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া অথবা মশা, সাপ, ইঁদুরের জ্বালাতনও তাতে বাদ যায়নি। বর্ষার পরে সবুজ প্রকৃতি, বটগাছের ছায়া বা আমের সুমিষ্ট স্বাদ, দেশীয় মদিরা, পান চিবানো, নর-নারীর পোশাক—সবই রয়েছে তাঁর জার্নালে। দেবদাসীদের নৃত্যের কথা এবং গরিব প্রজাদের ওপর লাঞ্ছনার কথা বলেছেন সবিস্তার। সোনালি ও রুপালি মসলিন তাঁর নজর কেড়েছিল। হাতি, উট, বাঘ ও শিয়ালের কথা আছে। আছে মোষের গাড়ি ও দেশীয় জলসিঞ্চনযন্ত্রের বিবরণ। এর মধ্যে মারা গেছে অফিসারসহ মোট ৮৭ জন সৈনিক। করনেইলির হিসাবে এর ৬৭ জনেরই মৃত্যু হয়েছে অতিরিক্ত মদ্যপান ও যৌনরোগগ্রস্ত নারীসঙ্গের কারণে। তাঁর মতে, ইউরোপীয় চিকিৎসা ভারতের পরিস্থিতিতে অচল।

১৭৫৬ সালের জুলাই মাসে শান্ত করমণ্ডল অঞ্চলে হঠাৎ করে যুদ্ধের শঙ্কা দেখা দেয়। ইংরেজ দুর্গগুলোতে নতুন করে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়। মনে হলো যে মারাঠাদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হবে। এমন সময় খবর এল বাংলায় সংকট দেখা দিয়েছে। করনেইলি বাংলার বিবরণে প্রথমেই বলেছেন যে বাংলা একটা সম্পদশালী অঞ্চল। মোগল সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত নবাব আলীবর্দী খান এ অঞ্চল স্বাধীনভাবে শাসন করেন। এ অঞ্চলে ইংরেজ, ফরাসি, ওলন্দাজ ও দিনেমারদের কারখানা ও বাণিজ্যকুঠি আছে। ইংরেজ কুঠিগুলো ছিল সমৃদ্ধ, তারা অন্যান্য স্থানে রসদ জোগাত। কলকাতা ছাড়াও কাশিমবাজার, পাটনা ও ঢাকায় (Decka) ইংরেজদের কুঠি ছিল। করনেইলি আলীবর্দী খানের সামরিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রশংসা করেছেন। ঢাকায় বাংলার নবাবের প্রতিনিধি ছিলেন রাজবল্লভ। তিনি খাজনার সংগৃহীত অর্থের হিসাব না দিলে নবাব তাকে মুর্শিদাবাদ ডেকে পাঠান। রাজবল্লভ পুত্র কৃষ্ণদাসসহ কলকাতায় ইংরেজদের আশ্রয় নেন। করনেইলির মতে, ইংরেজদের সঙ্গে নবাবের বিরোধ এভাবেই শুরু।

১৭৫৬ সালের ৯ এপ্রিল সিরাজউদ্দৌলা বাংলার নতুন নবাব হয়ে রাজবল্লভকে মুর্শিদাবাদে ফেরত দেওয়ার বার্তা দিয়ে কলকাতায় দূত পাঠান। ইংরেজরা রাজবল্লভকে ফেরত দিলেও তার সম্পদ ফেরত দিতে ইচ্ছুক ছিল না। ফলে গভর্নর ড্রেক নবাবের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন এবং দূতকে প্রহার করে শহর থেকে তাড়িয়ে দেন। ইংরেজদের আচরণে নতুন নবাব ইতিমধ্যে অসন্তুষ্ট হয়ে উঠছিলেন। এ ঘটনায় তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হন। নতুন নবাব তখন পূর্ণিয়ার নবাব শওকত জঙ্গকে আক্রমণ করার জন্য সৈন্য সজ্জিত করছিলেন। সে বাহিনীর একাংশ নিয়েই তিনি ৫ জুন ইংরেজদের



ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ, শিল্পী : রবার্ট সয়্যার, ১৭৫৪, ব্রিটিশ মিউজিয়াম সংগ্রহ

কাশিমবাজার দুর্গ আক্রমণ করে সহজেই দখল করে নেন। মাদ্রাজে এ খবর পৌঁছে আগস্ট মাসে। মেজর কিলপ্যাট্রিক ২০০ সেনা নিয়ে কলকাতা যাত্রা করেন। ইতিমধ্যে নবাব এক লাখ সেনা নিয়ে গঙ্গা নদী পার হয়ে ৬ জুন কলকাতা পৌঁছেন। হতভম্ব ইংরেজরা দুর্গ রক্ষার কোনো চেষ্টাই করেনি। কলকাতা শহরে দুই বর্গমাইল জায়গাজুড়ে তারা একটি প্রতিরোধ গড়ে তোলে। নবাবের গোলন্দাজদের আক্রমণে ইংরেজরা একটি দীর্ঘ দেয়ালের অপর পারে আশ্রয় নেয়। সেখানে আক্রান্ত হলে গভর্নর রজার ড্রেক তীরবর্তী জাহাজে আশ্রয় নেন। অনেক ইংরেজ সেনাও নৌকা করে ওই জাহাজে পালিয়ে যায়। সামান্য কয়েকজন ইংরেজ দুর্গে আটকা পড়ে। চার দিন অবরোধের পর ১৭৫৬ সালের ২০ জুন নবাব কলকাতা দুর্গ অধিকার করেন।

করনেইলির বর্ণনা অনুসারে নবাব প্রথমে কোনো ইংরেজকেই বন্দী করেননি। পরাজিত হলেও তারা শহরে যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তাদের কয়েকজন অতিরিক্ত মদ্যপান করে কতিপয় মুসলমান সেনাকে লাঞ্ছিত করে। নবাবের কানে এ অভিযোগ পৌঁছালে তিনি তাদের দুর্গের একটি ঘরে বন্দী করার আদেশ দেন। ১৪৬ জন ইংরেজ সেনাকে একটি কক্ষে বন্দী করা হয়। ঘরটি ছিল এতজন মানুষের জন্য অত্যন্ত ক্ষুদ্র, তাতে একটিমাত্র জানালা ছিল। ফলে পরদিন সকালে দেখা যায় ১২৩ জন বন্দী মারা গেছে। এটিই ইতিহাসের বহুল আলোচিত 'অন্ধকূপ হত্যা'।

ইউরোপীয় ইতিহাসবিদেরা অন্ধকূপ নিয়ে যেসব বৃত্তান্ত তৈরি করেছেন তাতে নবাব সিরাজউদ্‌দৌলাকে একচেটিয়া দোষারোপ করা হয়েছে। কিন্তু করনেইলির বিবরণে ভিন্নমত পাওয়া যায়। তিনি মনে করেন যে কলকাতা দুর্গে বন্দী রাখার জন্য ওই ঘরটিই নির্দিষ্ট ছিল। সুতরাং অন্য যেকোনো সেনাপতি যে আদেশ দিতেন, নবাব সে আদেশই দিয়েছেন। তবে বন্দীদের দায়িত্বে থাকা নবাবের কর্মকর্তার উচিত ছিল এর ধারণক্ষমতা খেয়াল রাখা। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে নবাব সকালেই জীবিত বন্দীদের মুক্তির আদেশ দেন। শুধু কয়েকজন কুঠিপ্রধানকে আটকে রাখা হয়। অন্যদিকে, জাহাজে অবস্থানকারী ইংরেজ সেনারা নদীপথে ৬০ মাইল দূরবর্তী ফুলতা নামক স্থানে পৌঁছায়। সেখানে তাদের অস্ত্রশস্ত্র জব্দ করা হয়। কিন্তু তাদের বন্দী করা হয়নি। করনেইলি মনে করেন যে ইংরেজ বিতাড়ন নবাবের উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন তাদের বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে। এই বিবরণে দেখা যায়, পুরো সংঘর্ষকালে ফরাসি ও ওলন্দাজরা চুপ হয়ে বসে ছিল। ইতিমধ্যে মেজর কিলপ্যাট্রিকের বাহিনীও ফুলতায় ইংরেজ সেনাদের সঙ্গে যোগ দেয়।

কলকাতায় বিপর্যয়ের পুরো খবর মাদ্রাজের ইংরেজ দুর্গে পৌঁছাতে প্রায় দুই মাস লেগে যায়। মাদ্রাজ থেকে সেনা পাঠানোর সিদ্ধান্ত হলেও তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে দীর্ঘ সময় বিতর্ক চলে। প্রথমে ঠিক হয় যে কর্নেল অ্যাডলারক্রনের অধীনে রাজকীয় সেনাদলের একটি বাহিনী পাঠানো হবে। আবার কোম্পানির কর্তারা লেফটেন্যান্ট কর্নেল ক্লাইভের অধীনে নিজেদের একটি বাহিনী পাঠাতে চান। পরে ঠিক হয় যে পুরো নৌবহরই পাঠানো হবে। প্রায় ৩০০ কামান নিয়ে ৬০০ ইউরোপীয় সেনা যাত্রা শুরু করে ১৭৫৬ সালের ১৬ অক্টোবর। দুটো পৃথক জাহাজে প্রায় দুই হাজার ভারতীয় সেনা নেওয়া হয়। এই সেনারা ওই বর্ষায় সমুদ্রযাত্রা 'নাস্তি' বলে আপত্তি তোলে। কোম্পানি মোটা বকশিশ দিয়ে কয়েকজন পুরোহিত জোগাড় করে পূজা-অর্চনা করিয়ে পরিস্থিতি অনুকূলে আনে। প্রতিকূল বাতাস ও আবহাওয়ায় যাত্রা শুরু করে ইংরেজ নৌবহর। করনেইলিরও যাত্রা শুরু হয় বঙ্গের পানে।

নৌবহরের সামনে ছিল কেন্ট; অ্যাডমিরাল পকোক তাতে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। পেছনে কাম্বারল্যান্ডে ছিলেন করনেইলি। খারাপ আবহাওয়া, বিপরীত স্রোত, কখনো অগভীর জল ইত্যাদি মিলে নৌবহর এগোতে পারছিল না। সিংহল দ্বীপ পার হতেই সপ্তাহখানেক লেগে গেল। এর মধ্যে সেলিসবারির পাটাতন ছিদ্র হয়ে পানি ঢুকে গেল। কামানের গোলার সংকেত দিয়ে জাহাজ থামিয়ে তা মেরামত করা হলো। এদিকে করনেইলির হিসাবে ২২৫ জন অসুস্থ হয়ে পড়েছে। জাহাজে পানি ও রসদ আছে এক সপ্তাহের.

অ্যাডমিরাল পকোক বিশাখাপট্টমে তিনটি জাহাজ ভেড়ানোর আদেশ দিলেন।

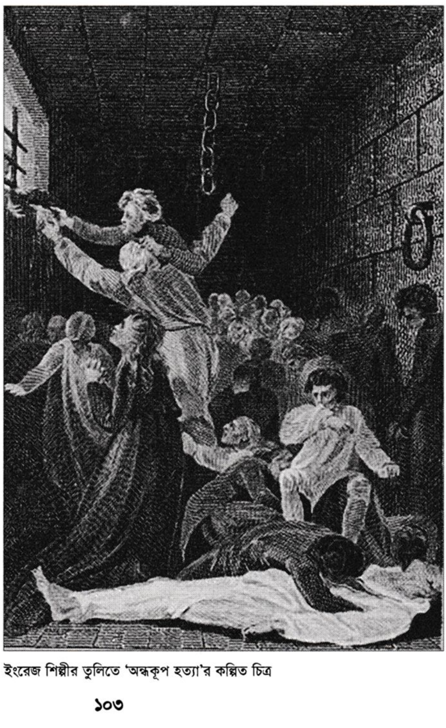
গোলকুণ্ডা অঞ্চলের মধ্যে বিশাখাপট্টমে ইংরেজদের ঘাঁটি। ছোট একটা সেনাদল, একজন ঘাঁটিপ্রধান, তার সহকারী ও একজন রাইটার থাকেন সেখানে। তিনটি জাহাজের ৭৩০ জন যাত্রীর মধ্যে ৬৮০ জনই স্কার্ভিতে আক্রান্ত। জাহাজ থেকে নামানোর সময় বেশ কয়েকজন মারা গেল। ৮ ডিসেম্বর বিশাখাপট্টমে নেমে হাঁফ ছাড়লেন করনেইলি। দুর্গ থেকে নতুন কাপড়, ঝরনার পানি আর তাজা খাবার দেওয়া হলো। আশপাশের পার্বত্য উপত্যকায় ঘুরে বেড়াল সেনাদল। করনেইলিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল অন্নমন্ত উপত্যকার সুমাত্তা প্যাগোডা। এ এলাকার হনুমান দেখে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন। নরওয়ে নামের একটা ছোট দুর্গও তাঁর চোখে পড়ে। এটি সম্ভবত খ্রিষ্ট-মিশনারিদের আস্তানা। এ এলাকার তুলা ও তামাকের চাষ, স্বাস্থ্যবান গবাদিপশু, রংবেরঙের পাথর করনেইলিকে মুগ্ধ করেছিল। তত দিনে অবশ্য নৌবহরের বেশ কিছু অংশ বঙ্গের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।

বিশাখাপট্টমে থাকাকালেই আবার ফরাসি-ইংরেজ যুদ্ধের খবর পাওয়া গেল। দুর্গের প্রধান বি জি সাহেব এতে ভীষণ আতঙ্কিত; কেননা এ অঞ্চলে ফরাসিদের সামরিক শক্তি অনেক বেশি। তিনি অ্যাডমিরাল পকোককে অনুরোধ করলেন দুর্গের জন্য কিছু সেনা দিতে। পকোকও হিসাব করে দেখলেন যে এত দিন পর ওয়াটসনের সাহায্যের জন্য যাওয়া অর্থহীন। তিনি ১০০ সেনা দুর্গের জন্য রেখে ৫ ফেব্রুয়ারি বিশাখাপট্টম ছেড়ে ২১ তারিখ মাদ্রাজ ফিরলেন।

মাদ্রাজ পৌঁছে কলকাতার বিস্তারিত খবর পাওয়া গেল। করনেইলি তাঁর জার্নালে এর বিবরণ দিয়েছেন। অ্যাডমিরাল ওয়াটসনের নৌবহর ফুলতায় পৌঁছে প্রথমে বিধ্বস্ত ইংরেজ বাহিনীকে চাঙা করে তোলে। ইতিমধ্যে বহু ইংরেজ সেনা মারা গেছে। ২৪ ডিসেম্বর রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে নৌবহর ও পদাতিক বাহিনী নবাবের বুজবুজ দুর্গ আক্রমণ করে অধিকার করে নেয়। ১৭৫৭ সালের জানুয়ারির ৩ তারিখে এই বাহিনী কলকাতা পুনর্দখল করে। এতে ইংরেজদের ক্ষয়ক্ষতি ছিল সামান্য। পরের দিন ২০ কামানের ব্রিজওয়াটার, সেনাবাহী কিংফিশার ও বেশ কিছু নৌকা নিয়ে ইংরেজ বাহিনী হুগলি আক্রমণ করে ও নবাবের দুর্গ অধিকার করে নেয়। তবে ব্রিজওয়াটার তীরে আটকে যাওয়ায় এতে তিন দিন সময় লাগে। এ সুযোগে ধনী হুগলিবাসী কিছু সম্পদ নিয়ে সটকে পড়ে। তিন দিন পর ইংরেজ বাহিনী সমগ্র হুগলি শহরকে তছনছ করে দেয়। করনেইলির ভাষায় এ ছিল 'প্রতিহিংসামূলক নির্দয় নৃশংসতা'। খবর পেয়ে নবাব তাঁর সৈন্যদের নিয়ে ফেব্রুয়ারির প্রথম দিন কলকাতার প্রান্তে পৌঁছেন এবং ইংরেজ শিবিরে রসদ বন্ধের আদেশ দেন। এতে ইংরেজ শিবির নাজুক অবস্থায় পড়ে। তাদের সামনে দুটো পথ—বশ্যতা স্বীকার অথবা আক্রমণ করা।

কলকাতার প্রান্তে নবাব যেখানে শিবির করেছিলেন তার সামনে কেল্লার চারপাশের মতো উঁচু ঢিবি, তার সামনে গভীর খন্দক। মারাঠা বর্গীদের ঠেকাতে এই নিরাপত্তাবেষ্টনী তৈরি করেছিল ইংরেজরাই। ইংরেজ সেনাদলে তখন নাবিকসহ ১২০০ ইংরেজ আর ৮০০ ভারতীয় সেপাই। নবাবের শিবির থেকে তাদের অবস্থান মাত্র তিন মাইল দূরে। ক্লাইভ ঠিক করলেন আকস্মিকভাবে নবাবের তাঁবুতে আক্রমণ করে তাঁকে হত্যা করতে হবে। তাহলেই একমাত্র জয় সম্ভব।

৫ ফেব্রুয়ারি, ১৭৫৭ গভীর রাতে মাত্র কয়েকজন পাহারাদার শিবিরে রেখে সেনাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন রবার্ট ক্লাইভ এবং ভোরের আলো ফোটার আগেই ঢুকে গেলেন নবাবের ছাউনিতে। কিন্তু ঘন কুয়াশায় নবাবের তাঁবুর পথ ভুল করল তারা। ইংরেজ বাহিনী পড়ে গেলে ঢিবি ও খন্দকের সামনে। তাদের পেছন দিকে নবাবের কামানের বহর। আকস্মিক আক্রমণে হতভম্ব হলেও শিগগিরই নবাবের কামানগুলো গর্জে উঠল। ইংরেজ সেনারা হতাহত হতে থাকল। এর মধ্যে নবাবের অশ্বারোহী দল ইংরেজদের আক্রমণ করে। এবার ঘন কুয়াশা ইংরেজদের সহায়ক হয়। অন্ধকারে বেয়োনেটের আঘাতে নবাবের অধিকাংশ অশ্বারোহী নিহত হয়। ক্লাইভ

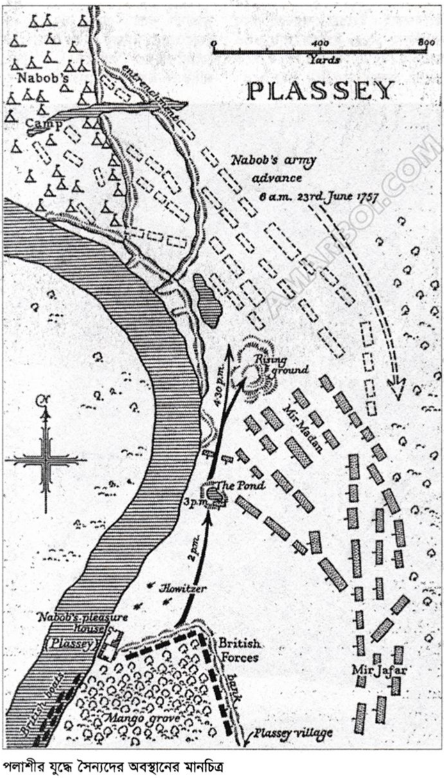


ইংরেজ শিল্পীর তুলিতে 'অন্ধকূপ হত্যা'র কল্পিত চিত্র

এ অবস্থায় খন্দকের পথ ধরে তার বাহিনী নিয়ে পলায়ন শুরু করে। ইতিমধ্যে ১৯৪ জন ইংরেজ সেনা নিহত হয়েছে।

এই আকস্মিক সংঘর্ষে নবাব শিবিরেরও বিপুল ক্ষতি হয়। তাদের দেড় হাজারের বেশি সেনা নিহত হয়। এ ছাড়া আক্রমণের আকস্মিকতা ও তীব্রতায় নবাব ও সেনাপতিরা হতভম্ব হয়ে যান। সিরাজউদ্‌দৌলা সে রাতেই ছাউনি ত্যাগ করেন এবং ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপনে সম্মতি দেন। ১৭৫৭ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি সম্পাদিত সন্ধিপত্রে নবাব স্বীকার করে নেন যে মোগল সম্রাটের ফরমান অনুযায়ী কোম্পানি যেসব জায়গির ও খাজনার অধিকার পেয়েছে নবাব তা মেনে নেবেন। কোম্পানির পণ্যের চলাচলে তিনি কোনো বাধা দেবেন না এবং ইতিপূর্বে জব্দকৃত মালামালসহ কোম্পানির কুঠিগুলো ফেরত দেওয়া হবে। এ ছাড়া কোম্পানি তার নিজস্ব মুদ্রা ব্যবহার করে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারবে এবং কলকাতা শহরে দেয়াল নির্মাণ করতে পারবে। নবাব স্বহস্তে এবং কোম্পানির পক্ষে অ্যাডমিরাল চার্লস ওয়াটসন ও কর্নেল রবার্ট ক্লাইভ এতে স্বাক্ষর করেন। আট মাস পর কলকাতার ওপর কোম্পানি ও ইংরেজদের দাবি আবার জোরদারভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। অ্যাডমিরাল ওয়াটসন সেখানে আরও কিছুদিন থাকা জরুরি মনে করলেন।

মাদ্রাজে এ খবর পৌঁছালে অ্যাডমিরাল পকোক তাঁর নৌবহর নিয়ে আবার যাত্রা শুরু করেন ১৭৫৭ সালের ১ মার্চ। এবার অনুকূল আবহাওয়ায় মাত্র পাঁচ দিনে তাঁরা কলকাতা থেকে ১০০ মাইল দূরে গঙ্গার মুখে পৌঁছে যান। পথিমধ্যে বোম্বাই থেকে ৫০০ সেনা তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। এর আগেই ১৪ ফেব্রুয়ারি গঙ্গামুখ থেকে ৩০ মাইল দূরে চন্দননগরের ফরাসি ঘাঁটিতে ইংরেজরা আক্রমণ করে। অ্যাডমিরাল পকোক ও ক্যাপ্টেন লাথামের নেতৃত্বে টাইগার নৌযান এতে অংশ নেয়, কেন্ট নৌযানও তার সঙ্গে ছিল। চন্দননগর যথেষ্ট শক্ত দুর্গ হওয়া সত্ত্বেও ফরাসিরা হেরে যায়। টাইগারের ৮০ জন ও কেন্টের ৫৮ জন সেনা মারা যায়। দশটি ফরাসি নৌযান বিধ্বস্ত ও ৩০০-৪০০ সেনা বন্দী হয়। দুর্গে ৯,৬০০ পাউন্ড মূল্যের অর্থ ও অন্যান্য যুদ্ধসামগ্রী পাওয়া যায়।



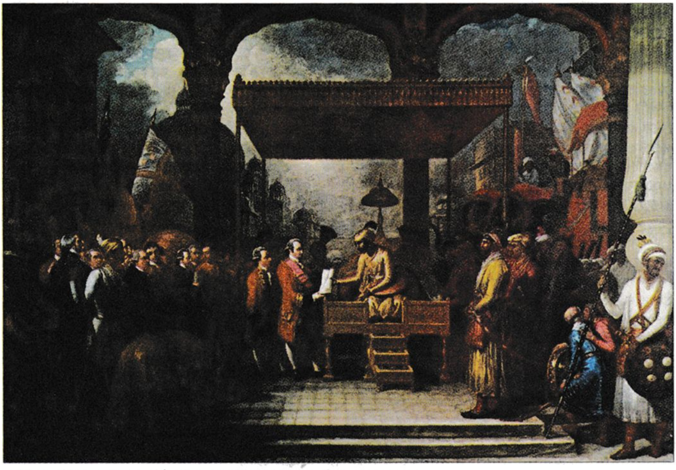
পলাশীর যুদ্ধে সৈন্যদের অবস্থানের মানচিত্র

নবাব-ইংরেজ সংঘর্ষে ফরাসিরা নবাবের পক্ষ নিলে কোম্পানি তখনই হয়তো পর্যুদস্ত হতো; ফরাসিদের এ পরিণতি ভোগ করতে হতো না। ইংরেজদের এ বিজয়ের পর করনেইলির বঙ্গবাস শুরু হয়।

১৭৫৭ সালের ২৩ মার্চ ফরাসি ও ইংরেজদের মধ্যে এক সন্ধিচুক্তি হয়। এতে ফরাসি সৈনিকদের যুদ্ধবন্দীর মর্যাদা দেওয়া হয় এবং ফরাসি পক্ষের ভারতীয় সেপাইদের মুক্তি দেওয়া হয়। ফরাসি ধর্মযাজকেরাও মুক্তি পান। করনেইলিসহ একদল ইংরেজ সেনা চন্দননগর দুর্গে বাস স্থাপন করেন। ২৭ মার্চ ক্লাইভ করনেইলিকে ক্যাপ্টেন পদে পদোন্নতি দেন।

কলকাতা ও সন্নিহিত অঞ্চলে তখন ইংরেজরা একক শক্তি। তাদের হাতে কয়েকটি নৌবহর, গোলন্দাজ বাহিনী, ৮০০ ইউরোপীয় সেনা, দুই সহস্রাধিক দেশীয় সেপাই। এবার তারা নবাবের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণে মনোযোগ দেয়। এর প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তারা মুর্শিদাবাদ দরবারের ক্ষমতাধর ব্যক্তি মীর জাফর আলী খানের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁকে ভবিষ্যৎ নবাব হওয়ার প্রলোভন দেখায়। করনেইলির বিবরণে দেখা যায় যে ভালো মানুষ হওয়া সত্ত্বেও মীর জাফর এ প্রলোভন এড়াতে পারেননি। তিনি ইংরেজদের জানান যে আপাতত প্রকাশ্যে নবাবের বিরোধিতা করবেন না। তবে নবাব হতে পারলে তিনি ইংরেজদের দশ লাখ পাউন্ড উপঢৌকন দেবেন।

নবাবের লক্ষাধিক সেনা ও বাহিনীর শক্তি সম্পর্কে ইংরেজরা জানতেন। কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদের ১০০ মাইল পথ, বিশেষত নদী ও বর্ষা নিয়ে তাদের ভয়ও ছিল। তবে তারা বুঝতে



মোগল সম্রাট শাহ আলম রবার্ট ক্লাইভের কাছে বাংলার দেওয়ানি হস্তান্তর করছেন

পেরেছিল যে নবাবের বাহিনীতে শৃঙ্খলা নেই এবং প্রজারা তাঁর ওপর সন্তুষ্ট নয়। অন্যদিকে দেরি করলে ফরাসিদের উসকানিতে নবাবই তাদের আবার আক্রমণ করতে পারেন। তাই একজন শত্রু-নবাবের স্থলে বন্ধু-নবাবকে সিংহাসনে বসানো তাদের জন্য জরুরি হয়ে পড়ে। সিরাজউদ্‌দৌলাকে উৎখাতের এ ষড়যন্ত্র সম্পর্কে প্রথমে জেনে ফেলে ফরাসিরা। শ-খানেক ফরাসি সেনা বিভিন্ন জায়গা থেকে পালিয়ে তখন কাশিমবাজারে একত্র হয়েছিল। করনেইলির ভাষ্যে মনে হয় যে নবাব এ সম্পর্কে জানতে পারলেও ব্যাপারটিতে কোনো গুরুত্ব দেননি। ফরাসি সেনাদেরও তিনি প্রকাশ্যে আনতে চাননি, কেননা এতে কোম্পানির সঙ্গে করা চুক্তি ভঙ্গ হতো।

১৭৫৭ সালের ১৩ জুন ইংরেজ বাহিনী মুর্শিদাবাদের পথে মার্চ শুরু করে। তাদের এক দল নদীপথে নৌবহর নিয়ে এবং অন্য দল পাশাপাশি নদীতীর দিয়ে চলতে শুরু করে। করনেইলিরা জানাচ্ছেন যে পথিমধ্যে বহু সংখ্যক প্রজা তাদের দেখতে পায়। অথচ প্রজাদের মধ্যে কোনো রকম প্রতিরোধের চেষ্টা দেখা যায়নি। এমনকি তাদের ইংরেজদের প্রতি বিরূপ বলেও মনে হয়নি।

১৮ জুন ইংরেজ বাহিনী নবাবের সুরক্ষিত দুর্গ কাটোয়ায় পৌঁছে। ইংরেজরা ইতিমধ্যে জেনেছিল যে দুর্গপ্রধান নবাবের ওপর খুশি নন। তিনি নামমাত্র প্রতিরোধ করলেও তা খুব দীর্ঘ হবে না। মেজর আইরি কোটের নেতৃত্বে ইংরেজ বাহিনী কাটোয়া দুর্গ অবরোধ করে। দুর্গের ভেতর থেকে সারা রাত গোলাবর্ষণ করা হয়। কিন্তু এতে একজন শত্রুও হতাহত হয়নি। তাতে স্পষ্ট যে এই গোলাবর্ষণ ছিল লোকদেখানো। সকালে নবাবের সেনারা দুর্গ ছেড়ে পালিয়ে যায়। সমগ্র ইংরেজ বাহিনী কাটোয়া দুর্গে অবস্থান নেয়। বৃষ্টিবাদল না থাকলেও তারা তখন যথেষ্ট পরিশ্রান্ত।

এ দুর্গেই ক্লাইভ যুদ্ধপরিষদের সভা ডাকেন। তিনি জানান যে নবাবের দরবারে তাদের বন্ধুরা এখনো প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করতে অপারগতা জানিয়েছেন। যদিও নবাবের বাহিনীর তুলনায় ইংরেজ বাহিনীর শক্তি অনেক কম, তবুও আক্রমণ করা ছাড়া তাদের সামনে অন্য কোনো উপায় নেই। কেননা দেরি করলে নবাবই তাদের আক্রমণ করবেন এবং ফরাসিরা নবাবের পক্ষে যোগ দেবে। এ ছাড়া সেনাবাহিনী নিয়ে পশ্চাদপসরণ করার সময় প্রজারা ইংরেজদের আক্রমণ করতে পারে। সুতরাং মুর্শিদাবাদ আক্রমণই একমাত্র পথ।

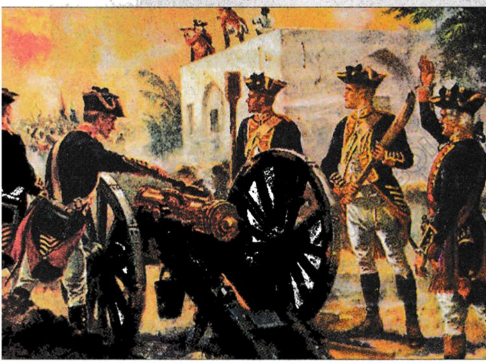
মুর্শিদাবাদ গঙ্গার দুটি স্রোতের তীরে অবস্থিত। এত দিন পর্যন্ত ইংরেজ সেনা দূরবর্তী স্রোতের তীর ধরে অগ্রসর হচ্ছিল। ২২ জুন এই বাহিনী নদী অতিক্রম করে নিকটবর্তী পারে আসে। এখানেও ইংরেজ সেনাকে কেউ বাধা দেয়নি। এভাবে তিন মাইল দীর্ঘ সেনাদলের মিছিল পলাশীর আম্রকাননে পৌঁছে। দুজন ক্যাপ্টেনের নেতৃত্বে ২০০ সেনার একটি দল বিনা বাধায় নবাবের পলাশীর বাগানবাড়ি দখল করে নেয়। এরপর পরিশ্রান্ত সেনাদল বাগানের মধ্যে কোনো বিছানাপত্র ছাড়াই ঘুমিয়ে পড়ে। করনেইলি মনে করেন যে এ সময়ে তিন চার শ শত্রুসেনাই পুরো ইংরেজ বাহিনীকে তছনছ করে দিতে পারত। আর নবাবের বিশাল বাহিনী এর মাত্র দুই মাইল দূরে ইতিমধ্যে ছাউনি ফেলেছিল।

১৭৫৭ সালের ২৩ জুন। ভোর ছয়টায় খবর পাওয়া গেল নবাব তার সৈন্যদল নিয়ে আক্রমণের জন্য যাত্রা করেছেন। ইংরেজ শিবিরও দ্রুত তৈরি হলো। পুরো বাহিনীকে দুটো ব্যাটালিয়নে ভাগ করে আম্রকাননের ডান ও বাম দিয়ে কুচকাওয়াজ শুরু হলো। দুটোর সঙ্গেই কামানসহ পর্যাপ্ত গোলন্দাজ দেওয়া হলো। করনেইলি ছিলেন ডান পাশের ব্যাটালিয়নে। তাদের বামে পলাশীর বাগানবাড়ি। আমগাছের আড়ালে সেনাদল অনেকটা নির্বিঘ্নে এগোচ্ছিল। ৪০০ গজ দূরেই ছিল একটি বড় দিঘি ও তার উঁচু পাড়। বাঁধটি ছিল ইংরেজ সেনাদলের জন্য রক্ষাকবচের মতো।

এর মধ্যে নবাবের কামানের গোলা

আসতে শুরু করে। সামনে থাকা দুজন ইংরেজ পদাতিক তৎক্ষণাৎ নিহত হয়। সেনাদলকে পশ্চাদপসরণ করে আম্রকাননে বাঁধের পেছনে আশ্রয় নেওয়ার আদেশ হয়। নবাবের বাহিনী দিঘিটি দখল করে নেয় এবং সেখান থেকে একই সঙ্গে ৯, ২৪ ও ৩২ পাউন্ড ওজনের কামানের গোলা ও বন্দুকের ছররা গুলি নিক্ষেপ করতে থাকে। আম্রকাননের মধ্যে বাঁধের আড়াল না থাকলে ইংরেজ সেনারা সেদিন রক্ষা পেত না।

পলাশীর পুরো সমতলজুড়ে তখন নবাবের সেনা—পদাতিক, গোলন্দাজ ও ঘোড়সওয়ারের সঙ্গে উট ও হাতির দল, ওর সঙ্গে যোগ দিয়েছে অর্ধশত ফরাসি গোলন্দাজ। ইংরেজদের ৬ পাউন্ডি গোলার কামানগুলোকে এবার ২০০ গজ সামনে নিয়ে গোলাবর্ষণ করা হলো। কিন্তু তখনই মনে হলো, নবাবের



পলাশী যুদ্ধের রাজকীয় ইংরেজ আর্টিলারি

ঘোড়সওয়াররা কামানসহ ইংরেজ বাহিনীকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছে। এর মধ্যে বৃষ্টির আভাস দেখা যায়, যাতে খোলা জায়গায় থাকলে গোলাবারুদ ভিজে যেতে পারে। ইংরেজ সেনাদলকে কামানসহ আবার আম্রকাননে পশ্চাদপসরণের আদেশ দেওয়া হয়।

দুপুর ১২টার দিকে খবর আসে যে নবাবের সেনারা ইংরেজদের পারাপারের নৌযানগুলো ধ্বংস করে দিচ্ছে। সেনাদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। নৌযানগুলো ছিল আম্রকানন থেকে মাত্র সিকিমাইল দূরে এবং সামান্য কয়েকজন নিরাপত্তা প্রহরীর পাহারায়। একদল সেনাকে দ্রুত নৌযান রক্ষার জন্য পাঠানো হয়। শিগগির জানা যায় যে খবরটি গুজব। প্রেরিত সেনাদল দ্রুত ফিরে আসে। এদিকে নবাবের শিবির থেকে গোলাবর্ষণ কমতে কমতে একসময় থেমে যায়। এরপর ঘণ্টা দুয়েকের চুপচাপ নীরবতা চলে পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে।

দুপুর দুটোর দিকে খবর পাওয়া গেল নবাবের সেনাদের একটা অংশ শিবিরে বিশ্রাম নিচ্ছে এবং অন্যরাও শিবিরের দিকে ফিরে যাচ্ছে। ইংরেজ বাহিনী এই সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে। প্রথম ব্যাটালিয়নের সম্মুখবর্তী পদাতিকেরা কয়েকটি ছোট কামান নিয়ে কোনো ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই সামনের দিঘিটি অধিকার করে নেয়। এরপর চার প্লাটুন সেনা নিয়ে ওই অগ্রবর্তী বাহিনী নবাব শিবির থেকে মাত্র ২০০ গজ দূরের একটি সেনা ফাঁড়ি দখল করতে অগ্রসর হয়।

ইংরেজদের অগ্রযাত্রা দেখতে পেয়ে নবাবের বিশ্রামরত সেনাদল ঘুরে দাঁড়ায়। তাদের ঘোড়সওয়াররা আবার আম্রকাননের দিকে অগ্রসর হতে থাকে এবং পুকুরের নিকটবর্তী উঁচু সমতল অঞ্চল দখল করে নেয়। এতে একদিকে ইংরেজদের অগ্রবর্তী বাহিনী ও মূল শিবির বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়, অন্যদিকে নবাবের বাহিনী ইংরেজদের ক্ষুদ্র কামানের গোলার আওতার মধ্যে চলে আসে। এ অবস্থায় পুরো ইংরেজ সেনাদলকে প্রথমে আম্রকানন থেকে বেরিয়ে আসার আদেশ দেওয়া হয়। তবে এ রকম হলে নবাবের সেনারা আম্রকাননের সব অস্ত্র দখল করে ফেলতে পারে—এমন আশঙ্কায় দুটো কামান নিয়ে চার প্লাটুন সেনাকে বেরিয়ে আসতে বলা হয়। এ সময়ে নবাবের বাহিনী দিঘির পার্শ্ববর্তী সমতল থেকে বন্দুকের গুলি এবং শিবিরের সামনে থেকে কামানের গোলা ছুড়তে থাকে। ইংরেজ বাহিনী এর উত্তরে ছোট কামান থেকে গোলা ছুড়লে নবাবের বাহিনী বেকায়দায় পড়ে যায়। কেননা ছোট কামানগুলো নিয়ে ইংরেজরা দ্রুত ও বারবার জায়গা বদল করছিল অথচ নবাবের ভারী কামানগুলোর দিক বা স্থান পরিবর্তন ছিল অসম্ভব। ফলে নবাবের গোলন্দাজ বাহিনী প্রায় অকার্যকর হয়ে যায় এবং ইংরেজরা একতরফা গোলাবর্ষণ করতে থাকে।

এরপর আধঘণ্টার নীরবতা। করনেইলি পরে জানতে পারেন যে নানা দিক থেকে কামানের গোলা আসার ফলে নবাব বাহিনী শত্রুদের অবস্থান সম্পর্কে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। এই গোলার আঘাতে নবাবের একজন প্রধান সেনাপতি মীর মদন নিহত হলে এবং চারটি হাতি মারা গেলে নবাবের সেনারা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এ সময় ইংরেজ গোলন্দাজরা পদাতিকদের নিয়ে দিঘির নিকটবর্তী সমতল থেকে নবাবের সেনাদের বিতাড়ন করে। নবাবের সেনারা কোনো বাধা না দিয়ে ছাউনির দিকে পালিয়ে যেতে থাকলে ইংরেজ সেনারা তাদের তাড়া করে। ইংরেজরা সমতলভূমির সমস্ত কামান দখল করে নেয়। অন্যদিকে জানা যায় যে নবাবের ঘোড়সওয়ার বাহিনী মীর জাফরের অধীন এবং এ জন্য লোক দেখিয়েও তারা শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের আক্রমণ করেনি। এ অবস্থায় ইংরেজ সেনারাও ঘোড়সওয়ারদের প্রতি গোলাবর্ষণ বন্ধ করে দেয়।

এবার পুরো ইংরেজ বাহিনী আম্রকানন থেকে বেরিয়ে আসে। বিকেল পাঁচটি পর্যন্ত তারা পায়ে হেঁটে নবাব বাহিনীকে ধাওয়া করে। কেননা ইংরেজ বাহিনীতে কোনো ঘোড়সওয়ার ছিল না। তাদের দখলে আসে ৫০টি ভারী কামান, যার কোনো কোনোটি টেনে আনতে শ-খানেক ষাঁড়-মহিষ ব্যবহার করা হয়েছিল। সন্ধ্যা হয়ে এলে পলাশী থেকে ছয় মাইল দূরে এক অজানা গ্রামে ইংরেজ বাহিনী ছাউনি ফেলে। করনেইলি শুয়ে শুয়ে ভাবেন, পলাশী যুদ্ধের ইতি হয়েছে। এক চরম বিভ্রান্তির মধ্যে কামান-উট-হাতি-ঘোড়া নিয়ে নবাবের পঞ্চাশ হাজার সেনা ইংরেজদের হারাতে পারেনি। ৫০০ সেনা মারা যাওয়ার পরই তারা পশ্চাদপসরণ করেছে। ইংরেজ পক্ষে নিহত হয়েছে ১৮ জন সেনা, আহত ৪৫।

২৩ জুন, ১৭৫৭-এর রাত পোহালে



পলাশী যুদ্ধের পর রবার্ট ক্লাইভের সঙ্গে পরামর্শরত মীর জাফর

ইংরেজ বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে। মীর জাফর আলী খাঁ এলেন ইংরেজ ছাউনিতে। কর্নেল রবার্ট ক্লাইভ বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নতুন নবাবকে স্যালুট করলেন। এরপর মীর জাফর যাত্রা করলেন মুর্শিদাবাদের পথে।

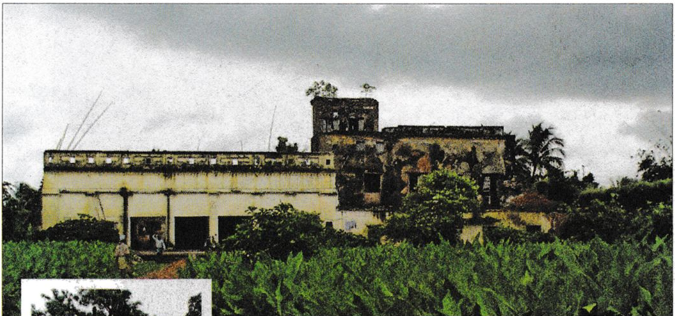
ওদিকে আগের দিনই মীর মদনের মৃত্যুর পর সিরাজউদ্দৌলা মুর্শিদাবাদ চলে যান। করনেইলির বর্ণনা অনুসারে তিনি খাজাঞ্চিখানা খুলে বিপুলসংখ্যক অর্থ ও মণিমুক্তা নিয়ে মুর্শিদাবাদ থেকে নদীপথে বেরিয়ে পড়েন। তাঁর সঙ্গে ছিল অল্প কয়েকজন সহচর ও কয়েকজন প্রিয় রমণী। কিন্তু একদল অনুসরণকারী তাঁকে ধাওয়া করে। এই অনুসরণকারী ও তাঁর সহযাত্রীদের কয়েকজন মিলে নবাবের সব সম্পদ কেড়ে নেয় এবং তাঁকে বন্দী করে। একদল ফরাসি সেনা তাঁকে উদ্ধারের জন্য রওনা দিয়েছিল। কিন্তু নতুন মসনদ দখলকারী মীর জাফরের পুত্র তার আগেই ক্ষমতাচ্যুত নবাবকে মুর্শিদাবাদ নিয়ে যায়। ১৭৫৭ সালের ৪ জুলাই তাঁকে হত্যা করা হয় যখন তাঁর বয়স মাত্র ২০ বছর। করনেইলি মন্তব্য করেছেন যে এভাবে মোগল সম্রাট কর্তৃক একদল বিদেশিকে সশস্ত্র অবস্থানের অনুমতির খেসারত দেন সিরাজউদ্দৌলা।

২৮ জুন ইংরেজ সেনাদল কাশিমবাজার পৌঁছায়। পরের দিন বিজয়ী ক্লাইভ যাত্রা শুরু করেন মুর্শিদাবাদের দিকে। তার সামনে প্রায় ২০০ জনের একটি বাহিনী গার্ড অব অনার দিতে দিতে চলে। এভাবে পাঁচ মাইল দূরে মুর্শিদাবাদ শহরে পৌঁছেন তাঁরা।

নতুন নবাব শুরুতেই প্রতিশ্রুত উপঢৌকন নিয়ে বিপত্তিতে পড়েন। দেখা যায় যে দশ লাখ পাউন্ডের অর্ধেক অর্থও কোষাগারে নেই। সুতরাং প্রথমে অর্ধেক অর্থ এবং বাকি তিন বছরে অবশিষ্ট অর্থ প্রদানের প্রস্তাব আসে। এই অর্থের প্রথম ভাগীদার হন কলকাতার কোম্পানির বড় কর্তারা, যাঁরা কোনো যুদ্ধ করেননি। এর ফলে সেনাদের মধ্যে অসন্তোষ শুরু হয়।

এ সময়ে আল্লাহ্ ও নবীর নামে নতুন নবাব জাফর আলী খান বাহাদুর অ্যাডমিরাল ওয়াটসন, কর্নেল ক্লাইভ ও গভর্নর ড্রেকের সঙ্গে এক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। সে অনুযায়ী ইংরেজের সব শত্রুকে শত্রু ঘোষণা করে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সব ফরাসি কুঠি ও বাণিজ্য ইংরেজদের দান করেন এবং এ অঞ্চলে ফরাসিদের ব্যবসা নিষিদ্ধ করেন। এ ছাড়া যুদ্ধ ও বাণিজ্যে ক্ষতির জন্য কোম্পানিকে এক কোটি রুপি, কলকাতার ইংরেজদের ৫০ লাখ রুপি, কলকাতার স্থানীয় বণিকদের ২০ লাখ রুপি এবং আর্মেনীয় রায়তদের সাত লাখ রুপি ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়। করনেইলির হিসাবে সে সময়ে ১ রুপির মূল্যমান ২ শিলিং ৬ পেন্স। এ ছাড়া কলকাতায় মোরত্তা খন্দকের চারপাশে ৬০০ গজ দূরত্ব পর্যন্ত সব জমিদারি এবং কলকাতার দক্ষিণে কল্পি পর্যন্ত জমিদারি ইংরেজদের হাতে সোপর্দ করা হয়। এ ছাড়া নতুন নবাব কলকাতা থেকে হুগলি পর্যন্ত কোনো দুর্গ তৈরি না করার ঘোষণা দেন।

নৌবাহিনী ও সেনাদের জন্য যে ৫০ লাখ রুপি বরাদ্দ করা হয়, বর্তমানে তার অর্ধেক পাওয়া যাবে বলে ঘোষণা দেওয়া হয়। তবে এতে 'অন্যান্য' যুক্ত করা বাহিনী-বহির্ভূত কিছু লোক ভাগ বসাতে চাইলে সেনাদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। কর্নেলের কাছে সেনাদের লেখা ৩ জুলাই ১৭৫৭-র একটি চিঠি করনেইলি তাঁর জার্নালে উদ্ধৃত করেছেন। তাতে সেনারা বলছেন যে পরের তিন বছরে প্রাপ্য বাকি অর্ধেক টাকা আদৌ পাওয়া যাবে না এবং যুদ্ধের আগেই ভাগের অনুপাত ঠিক না করে অন্যায় করা হয়েছে। চিঠিটা প্রথমে সবার স্বাক্ষর করার কথা থাকলেও ক্যাপ্টেন গ্র্যান্টের সঙ্গে মতবিরোধের ফলে বেনামিতে পাঠানো হয়। রাতের খাবার ও সকালের নাশতার সময় অসন্তোষ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ নিয়ে যুদ্ধপরিষদের বৈঠক বসে, যাতে একটি জটিল ও বিস্তৃত বাঁটোয়ারানামা তৈরি করা হয়। করনেইলি এতে রাজকীয়



মীর জাফরের বাসভবন



মীর জাফরের সমাধি

বাহিনীর প্রতিনিধিত্ব করেন। অধিকাংশ অফিসার এ বাঁটোয়ারা মানতে অস্বীকার করে। এ বিভাজনে কয়েকজন অফিসার প্রত্যেকে ১২ হাজার পাউন্ড পর্যন্ত পাওয়ার ব্যবস্থা করেন। কর্নেল ক্লাইভ বণিকদের কাছ থেকে চাঁদা নিয়ে অর্থ পরিশোধের আশ্বাস দিলেও সেনারা তা মানতে চায়নি। এভাবে লুটের টাকার বাঁটোয়ারা নিয়ে সুশৃঙ্খল ইংরেজ বাহিনী বিভক্ত হয়ে পড়ে।

ইতিমধ্যে ক্যাপ্টেন কোট তাঁর বাহিনী নিয়ে ১২০ সেনার ফরাসি বাহিনীকে তাড়া করেন ৬ জুলাই। কিন্তু মুর্শিদাবাদ থেকে পাটনা পর্যন্ত গিয়েও তাঁদের ধরা যায়নি। ওদিকে জুলাইয়ের মাঝামাঝি খবর আসে যে ২৫ জুন বিশাখাপট্টম দখল করে ফরাসিরা পুরো গোলকুণ্ডা অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। ইংরেজরা সেখানে কোনো প্রতিরোধই গড়তে পারেনি।

এদিকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার জমিদাররা মীর জাফরের শাসন মেনে নেয়। ইংরেজ সেনাদের উপস্থিতিতে এটি অত্যন্ত সহজ হয়। ৬ আগস্ট, ১৭৫৭ ক্লাইভ কলকাতা ফিরে যান। করনেইলিসহ রাজকীয় বাহিনী ২৩ আগস্ট থেকে চন্দননগরে বাস স্থাপন করে। কাশিমবাজার থেকে চন্দননগর যাওয়ার পথেই করনেইলিরা অ্যাডমিরাল ওয়াটসনের মৃত্যুসংবাদ পান। সদ্য ভাগে পাওয়া তিন লাখ রুপিসহ বিপুল সম্পদের মালিক ওয়াটসন বাংলার অপরিচিত আবহাওয়ায় অসুস্থ হয়ে মারা যান। তাঁর জায়গায় পকোক নৌবহরের প্রধান হন।

কর্নেল ক্লাইভ কলকাতায় গিয়ে সেনা ও নৌবাহিনীর সদস্যদের বিরূপ সংবর্ধনার মধ্যে পড়েন। ২৯ আগস্ট আবার মুর্শিদাবাদ গিয়ে সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি তিনি নবাবের কোষাগার থেকে সুদে সাড়ে ১২ লাখ টাকা ঋণ নেন। করনেইলিসহ ক্যাপ্টেনরা তার থেকে ৩০০০ পাউন্ড পর্যন্ত পান। এর মধ্যে নাবিক ও সেনাদের মধ্যে বাঁটোয়ারা নিয়ে আবার অসন্তোষ দেখা দেয়। কর্নেল ক্লাইভ ও মেজর কিলপ্যাট্রিক নিজেদের সম্পদ থেকে টাকা দিয়ে এর সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু এ বিষয়ে ব্যবস্থা সম্পন্ন হওয়ার আগেই ৬০ হাজার পাউন্ডের সম্পদ রেখে মেজর কিলপ্যাট্রিক মারা যান।

২৭ আগস্ট খবর আসে রাজকীয় বাহিনীর দেশে ফেরার আদেশ আসছে। কিন্তু ক্যাপ্টেন গ্র্যান্টের কাছে কর্নেল অ্যাডলারক্রনের কোনো আদেশ না আসায় কার্যত কিছুই হয় না। এর মধ্যে দূর প্রদেশে বিদ্রোহ শুরু হলে নবাব মীর জাফর ক্লাইভের সাহায্য চেয়ে পাঠান। ক্লাইভ রাজকীয় বাহিনী নিয়ে অভিযানে যেতে চান। কিন্তু চন্দননগরে প্রতিদিন মরতে মরতে রাজকীয় বাহিনীর ২৭০ জনের মধ্যে ১২০ জন মাত্র অবশিষ্ট। ওদিকে অ্যাডমিরাল পকোক ক্যাপ্টেন গ্র্যান্টকে আদেশ দেন কলকাতা নৌবহরে সেনা বৃদ্ধি করতে। ক্লাইভ এতে বিস্মিত হন। পরে ঠিক হয় যে স্বেচ্ছাভিত্তিতে রাজকীয় সেনারা দুভাগে বিভক্ত হবে। করনেইলি চিঠি লিখে ক্লাইভের সঙ্গে যেতে সম্মতি দেন। ক্লাইভও প্রত্যুত্তরে তাঁকে স্বাগত জানান। এই চিঠি চালাচালির মধ্যে কর্নেল অ্যাডলারক্রনের আদেশ আসে। তাতে বলা হয় যে যেসব সেনা স্বেচ্ছায় কোম্পানির সঙ্গে থাকতে চায় তারা ছাড়া বাকিরা ইউরোপে ফেরার প্রস্তুতি নিতে পারে।

ক্লাইভকে অবশ্য দূর বঙ্গে তেমন অভিযান চালাতে হয়নি। তবে বাহিনীর একাংশের অভিযানে যাওয়া ও অন্য অংশের দেশে ফেরার প্রস্তুতির মধ্যে চন্দননগরের বন্দী ফরাসিরা শহর লুণ্ঠন করে পালিয়ে যায়। ক্লাইভ এসে তাদের আর ধরতে পারেননি। করনেইলি মনে করেন যে ফরাসিদের ওলন্দাজ দুর্গ চিনসুরা থেকে চন্দননগরে আনা উচিত হয়নি। অন্য ফরাসি বন্দীদের তখন মাদ্রাজ পাঠানোর জন্য জাহাজে তোলা হয়। জাহাজের অধিনায়ক কলকাতায় থেকে যান। দুজন ইংরেজ ও কিছু ভারতীয় সেপাই নিয়ে জাহাজ মধ্য সমুদ্রে পৌঁছালে ফরাসিরা জাহাজের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। ফলে মাদ্রাজের বদলে জাহাজ চলে যায় করমণ্ডলের মসুলিপট্টমে।

ওদিকে কলকাতার উপকূলে ইউরোপযাত্রী তিনটি জাহাজ। এর প্রথমটি মার্লবরো, যাতে করনেইলিসহ রাজকীয় বাহিনীর স্থান। বালাশোর রুট দিয়ে যাত্রা শুরু হবে। শেষ পর্যন্ত যাওয়া হবে তো? ওখানেই মোটামুটিভাবে করনেইলির বৃত্তান্ত শেষ।

দীর্ঘ বৃত্তান্ত শেষে বাবাকে উদ্দেশ করে করনেইলি আবার লিখছেন, সামান্য থেকে অনেক লেখা হয়ে গেল। যদি ভালো না লাগে পাতাগুলো পুড়িয়ে ফেলতে পারেন। যদি আনন্দ পান, তাহলে করনেইলির জীবন ধন্য। ❦

গল্প



আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

ডাইনি

আতঙ্কের ব্যাপারটা যে সত্যি সত্যি ঘটে গেছে সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হতেই ভয়ের একটা হিমস্রোত তানিশার মেরুদণ্ড বেয়ে সোজা নিচের দিকে নেমে এল। নির্ধারিত সময়ের দিন সাতেক পরেই প্রথম ওর মনে এ নিয়ে খটকা বেঁধেছিল। সাত দিন চলে যাচ্ছে, কিন্তু...। তবু ব্যাপারটাকে তখনো ও ততটা গুরুত্ব দেয়নি। এমন তো অনেকবারই হয়েছে। সাত দিন কেন, পনেরো-ষোলো, এমনকি একবার আঠারো দিন পরেও হয়েছিল। এই সামান্য দেরিতে কী এসে যায়। কিন্তু দ্বিতীয় সপ্তাহ পার হলে ওর কপালে কিছুটা দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়ল। তবু নিজেকে ও এ বলে বুঝ দিল যে নানা শারীরিক কারণে অনেক সময় দুই সপ্তাহও পার হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি সত্যি বিপদ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল তিন হয়ে চার সপ্তাহ পেরিয়ে যাবার

সচিত্রকরণ : মাসুক হেলাল

পর। না, আর তো কোনো যুক্তিই টেকে না। বিশেষ করে তখন চার সপ্তাহ আগে আবরারের সঙ্গে যখন তার শেষ দিনের সম্পর্কটি ঘটেছিল পুরো অরক্ষিত অবস্থায়। কাজেই দ্বিতীয়-তৃতীয় সপ্তাহের পর থেকে তার মনে যে দুর্ভাবনা পাথরের মতো ভারী হয়ে চেপে বসছিল ছয় সপ্তাহ পার হলে তা যেন একটা মূর্তিমান দুঃস্বপ্ন হয়ে তার বুকের ওপর চেপে বসল। ছয় সপ্তাহ পার হবার পর ডাক্তারের কাছে গিয়ে তানিশা ও আবরার নিশ্চিত হলো যে তানিশা অন্তঃসত্ত্বা।

বিবাহিত মেয়েদের অন্তঃসত্ত্বা হওয়া এমন কোনো ঘটনা নয়। কিন্তু সমস্যা তানিশার স্বামী সাব্বিরকে নিয়ে। গত বছর তাদের প্রথম সন্তানের জন্মের পর সে ধনুকভাঙা পণ করেছে যে পাঁচ বছরের মধ্যে সে কিছুতেই সন্তান নেবে না। তার ধারণা, দুই সন্তানের মধ্যে অন্তত বছর পাঁচেকের একটা ব্যবধান থাকা ভালো। তা নাকি সন্তানদের সুস্থ মানসিক বিকাশে সাহায্য করে। তার ধারণা, বয়সের এই পার্থক্যের ফলে ছোট সন্তানের জন্য বড়জনের মধ্যে একধরনের দায়িত্ব ও মমতাবোধ তৈরি হয়। এতে তাদের সম্পর্ক যেমন হয় নিবিড়, তেমনি পরস্পরনির্ভরশীল। সাব্বির একটা বইয়ে এ সম্বন্ধে পড়ে ও ওর একজন চাচাতো ভাইয়ের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বয়সের পার্থক্যের এই ব্যাপারটি দেখে এই সিদ্ধান্ত এসেছে। না, কেবল আসেনি, ধারণাটা ওর মনে রীতিমতো বদ্ধমূল হয়ে গেছে।

সাব্বির একরোখা স্বভাবের মানুষ। কোনো কিছু একবার ঠিক করে বসলে তা থেকে তাকে সরানো অসম্ভব। কিন্তু সন্তানদের বয়সের পার্থক্য সম্বন্ধে তানিশার ধারণা ভিন্ন। ওর মত হলো দুই সন্তানের প্ল্যান থাকলে তা পরপর হয়ে যাওয়াই ভালো। এতে প্রথম দু-চার বছর বাবা-মায়ের ওপরে কিছুটা বাড়তি ঝামেলা পড়লেও ওরা একটু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাপ-মা ঝামেলামুক্ত হয়ে যায়। যা হোক এ নিয়ে তাদের মধ্যে বচসা আর ঝগড়াঝাঁটি কম হয়নি। কিন্তু শেষ অব্দি সাব্বির পুরো গোঁ ধরায় তানিশাকে সাব্বিরের ব্যবস্থাটাই মেনে নিতে হয়েছে। তানিশা মেনে নিয়েছে, কিন্তু ওর হাবভাব দেখে ওর ওপর সাব্বিরের পুরো আস্থা আসেনি। সাব্বিরের আশঙ্কা যেকোনো মুহূর্তে সন্তান প্রতিরোধব্যবস্থায় ও ঢিলে দিয়ে বসতে পারে, তাই এ দায়িত্বের পুরোটাই ও নিজের ওপর নিয়ে নিয়েছে। আর যাই হোক অন্তত কারও কোনো ভুল বা গাফিলতির জন্য যেন এ ধরনের কোনো উটকো ঘটনা না ঘটে, তাই নিয়ে সে যেমন উদ্বিগ্ন, তেমনি সতর্ক। কাজেই আচমকা তানিশার এভাবে অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার ব্যাপারে সাব্বিরের কাছে এখন তানিশার ব্যাখ্যা কী? একটা অভূত ভয় ওকে ঘিরে ধরে। হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসে।

সন্দেহ নেই যে, যে সন্তানটিকে এই মুহূর্তে সে লালন করছে আসলে সে আবরারের। দূর ভবিষ্যতে কোনো দিন সন্দেহ করে সাব্বির যদি সন্তানটির ডিএনএ টেস্ট করে তবে সঙ্গে সঙ্গেই ধরা পড়ে যাবে গোমরটা। কিন্তু তানিশা জানে চরম সন্দেহজনক কিছু হাতে না এলে এমন কিছু ঘটবে না। কিন্তু সন্দেহের প্রমাণ তো আজ সাব্বিরের হাতের মুঠোয়।

সাব্বিরের মন এমনিতে সন্দেহপ্রবণ নয়। সংসার, স্ত্রী আর বাচ্চাকাচ্চার এই ছোট্ট ঘের-দেওয়া জায়গাটুকুই তার জীবনের মক্কা। এই একরত্তি সবুজ পৃথিবীর অল্প কটা মানুষকে ভালোবেসে আর বিশ্বাস করে সে তার নির্ঝঞ্ঝাট জীবন কাটাতে চায়। হুজ্জত, ঝামেলা, প্রশ্ন-অবিশ্বাস এসব নিয়ে উথালপাতাল হতে হলে ও হাঁফিয়ে ওঠে, ভেঙে পড়ে। কিন্তু এবার সে ভারসাম্য কতটুকু টিকবে?

২.

তানিশার চাওয়া-পাওয়া, শৈশব-কৈশোরের গল্প, গত সাতাশ বছরের ইতিহাস-ভূগোল সবই প্রায় সাব্বিরের উল্টো। ছোট পরিবেশ বা নির্জলা স্বস্তি ওকে প্রায় অসুস্থ করে তোলে। তানিশার বাবা-মা একেবারেই সাদামাটা গোবেচারা মানুষ। সারা জীবন দুজন দুজনার প্রতি অনুগত থেকে পরস্পরকে ভালোবেসে জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। এমন নিরীহ বাবা-মার রক্তের ধারায় এমন আগুনের ফুলিঙ্গ কী করে জন্মাল, তা নিয়ে তানিশা নিজেও ভেবেছে। হয়তো পিতা-মাতার কাছ থেকে নয়, দূর অতীতের কোনো অচেনা পূর্বপুরুষ বা আদিম মাতৃকার জ্বলন্ত রক্তকণা থেকে তার ভেতর এ আগুন নেমে এসেছে।

যা ওকে সারাক্ষণ টানে তা হলো জীবনের বহুমুখী স্বাদ ও নতুনত্বের আকর্ষণ। বিশেষ করে পুরুষ মানুষের ব্যাপারে। কলেজজীবন পার হওয়ার আগেই সে টের পেয়ে গিয়েছিল যে কোনো পুরুষের মধ্যে আলাদা বা জ্বলজ্বলে কিছু দেখলেই সে তার ব্যাপারে অদ্ভুতভাবে অসহায় হয়ে পড়ে, তা সে মানুষটি স্বর্গীয়, আদিম, জান্তব যাই হোক। এ দুর্বলতার কোনো ব্যাখ্যা সে দিতে পারে না। এরপর সে কেবল টের পায় নিজের অজান্তে, পায়ে পায়ে সে সেই অনিবার্য নিয়তির দিকে অন্ধের মতো হেঁটে যাচ্ছে। কিন্তু স্বস্তির কথা অবস্থাটা চলে অল্প দিনের জন্য। ওই স্বাদ একবার জানা হওয়ামাত্র অদ্ভুতভাবে সে ওই মানুষটির মদির আকর্ষণ থেকে অব্যাহতি পেয়ে যায়। মানুষটি তখন শীতের পাতার মতো কুঁকড়ে মিইয়ে তার পায়ের কাছে পড়ে থাকে। তার সহজাত প্রকৃতি তাই তাকে আজ পর্যন্ত কারও ব্যাপারে পুরো অনুগত বা সুস্থির—কোনোটাই হতে দেয়নি।

৩.

ওর স্বামী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক, ও নিজেও একটা মোবাইল ফোন কোম্পানিতে চাকরি করে। ওর জন্য স্বামীর ভালোবাসাও খাদহীন। স্বামীকে সে কিছুটা পছন্দও করে, কিন্তু মানুষটা নেহাতই যেন ফাঁপা হাঁড়ি। জীবন্ত মানুষের কোনো অনুভূতিই যেন নেই তার মধ্যে। তানিশার পিপাসা চোখ হয়তো আজও তাই জোছনা অরণ্যের কামান্ধ চিতার মতো কারও জীবন্ত পায়ের ছাপ অনুসরণ করে ঘুরে বেড়ায়।

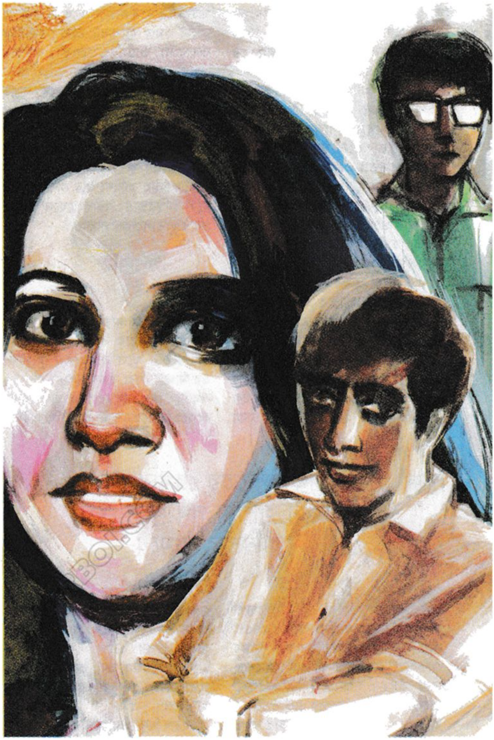
তানিশা গতানুগতিক সুন্দরী নয়। যা দিয়ে পুরুষের কাছ থেকে সাফল্য সে আদায় করে তা তার মোহময় দেহবল্লরী। তার শরীরের বাঁকে বাঁকে রয়েছে কামনার বিদ্যুৎবহ্নি—যা পুরুষ-হৃদয়কে কাঁদায়, দাহ দেয়। খবরটা সে ভালো করেই জানে। তাই কচি কচি রক্তমাখা তরুণ হৃদয়ের ওপর দিয়ে ছোট্ট সুন্দর পা ফেলে হেঁটে যেতে

> তানিশা গতানুগতিক সুন্দরী নয়। যা দিয়ে পুরুষের কাছ থেকে সাফল্য সে আদায় করে তা তার মোহময় দেহবল্লরী

কোনো বিকারে ভোগে না। এর আগে এমনি আরও দুজন মানুষ তার জীবনে এসেছে। কিন্তু কারও সঙ্গেই ওর সম্পর্ক দুচার মাসের বেশি টেকেনি। কিছুদিন যেতে না যেতেই সেই পুরুষ শরীরের জান্তব গন্ধ তাকে ক্লান্ত করে তুলেছে। নানা অসুবিধা আর বিপদের বাহানা তুলে একটু একটু করে সরে এসেছে সে। প্রথম যে পুরুষটি তাকে এমনি জান্তবভাবে ডাক দিয়েছিল সে জাতীয় ক্রিকেট দলের একজন সাড়া জাগানো খেলোয়াড়। ঘটনাটা তার বিয়ের আগের। তানিশার বয়স তখন সবে বিশ। কাঁচা জীবন তখনো যৌবনের বুনো গন্ধে ভরা। সে বুঝতে পারেনি কেন খেলোয়াড়টি তাকে অমন চুম্বকের মতো টেনেছিল। শুধু নিয়তি নির্ধারিতের মতো তার দিকে সে এগিয়ে গেছে। শুধু টের পেয়েছে একদিকে মানুষটির তারকাখ্যাতি, অন্যদিকে দীর্ঘ বলিষ্ঠ শরীরের গন্ধ আর বেপরোয়া বাসনা যেন প্রায় শেকল পরিয়ে তাকে দুই বাহুর ভেতর টেনে নিয়েছে। কিন্তু মাস তিনেক যেতে না যেতেই এমন আদিম আকুতিও ফিকে হয়ে উঠল। সে টের পেল খেলার মাঠের এই চৌকস, ক্ষিপ্র খেলোয়াড়টি জীবনের সূক্ষ্ম অলীক আর গভীর জায়গাগুলোয় কী হাস্যকর রকমের ফাঁপা।

বিয়ের পর প্রথম যার আকর্ষণে সে আবার মরিয়া হয়ে উঠল সে সেনাবাহিনীর নতুন পদোন্নতি পাওয়া এক চৌকস মেজর। একবার অফিসের ট্যুরের অছিলা ধরে তার সাথে রাঙামাটি গিয়ে কাটিয়ে এসেছিলও দিন কয়েক। কিন্তু এবারেও আত্মবিশ্বাসে ভরা এই উজ্জ্বল মানুষটির ব্যাপারে শীতল হয়ে পড়তে তার মাস তিনেকের বেশি লাগল না। না, একেবারে ছোবড়ার মতো শুকনো। কিচ্ছু নেই ভেতরে। জীবনের শুরুতেই নিজের এই অদ্ভুত চরিত্রটি দেখে চিন্তিত হয়ে পড়েছিল সে। কেন কোনো কিছুই তাকে বেশিদিন ধরে রাখতে পারে না। কী চায় সে একজন পুরুষের কাছে। সত্যি কী চায়? অন্যদের সঙ্গেও কি এমনটাই ঘটবে, সে কি নিজের মধ্যে মরে যাবে, না অন্যেরা তার কাছে ফুরিয়ে যাবে।

কিন্তু এই আবরার মানুষটা যেন তার সমস্ত বুদ্ধিকে বোকা বানিয়ে ফেলেছে। ওদের মোবাইল ফোন কোম্পানিটায় ও নিজে কাজ করে জনসংযোগ শাখায়, আবরার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে। বছর দেড়েক হলো ওদের পরিচয়। চমৎকার রবীন্দ্রসংগীত গায়। বছর খানেক আগে ওদের এক বন্ধুর বাসার ছাদের ছোট্ট ঘরোয়া অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে



জোছনারাতটাকে যেন পুরো সোনালি করে তুলেছিল। আবরারের সেদিনের সে গান তানিশাকে চন্দ্রাহত করে দিয়েছিল। সে রাত থেকেই মানুষটার ভেতরকার জোছনাধারাকে স্পর্শ করার জন্য একটা বিনিদ্র তাগিদ ওকে যেন মরিয়া করে রেখেছে।

আবরার ধানমন্ডি এলাকার অভিজাত পরিবারের ছেলে। থাকে শান্তিনগর এলাকায় ফ্ল্যাট নিয়ে। গত এক বছরে সেই ফ্ল্যাটেই ওরা অনেকবার ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ নিয়েছে।

কিন্তু আবরারের বিস্ময় তানিশা যেন কিছুতেই শেষ করতে পারে না। বরং টের পায় দিনের পর দিন ওর কাছে মানুষটা আরও অচেনা আর দুর্ভেদ্য হয়ে উঠছে। আবরার কোনো কিছু চাইলে তা না দেবার শক্তিই যেন ওর ভেতর নেই। প্রতিটি দিনের সান্নিধ্যের পর তিন-চার দিন পর্যন্ত যেন এক অদ্ভুত সুখের ঘোরে কাটে ওর। মনে হয় ওই মানুষটার সজীব মিষ্টি অস্তিত্ব সারাক্ষণ যেন ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে।

ওদের শেষ দিনের বিশেষ মুহূর্তটি মনে পড়ছে। অফিস পালিয়ে দুজন চলে এসেছিল আবরারের ফ্ল্যাটে। আহ, কী স্বপ্নে ভরা মিষ্টি মুহূর্ত। আচ্ছা, এর চেয়ে অপার্থিব কিছু মানুষ কি জীবনে পায়। আচ্ছা সেদিন ও কেন সতর্ক হলো না? এসব ব্যাপার এতভাবে জানাবোঝার পর ওর তো পরিণামটা বোঝা উচিত ছিল। তাহলে কি শরীর-মনের আনন্দের অতিরিক্ত কিছু চেয়েছিল আবরারের কাছে? আরও দীর্ঘমেয়াদি আর গভীরতর কিছু? তা ছাড়া কী করবেই বা সে? প্রায় বুনো আবেগে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আবরার ওকে যে পুরো তছনছ করে ফেলেছিল।

সেই অপার্থিব মুহূর্তটা কাল সাপের মতো ভয়াল ফণা তুলে এখন দাঁড়িয়ে আছে সামনে। বিরক্তিতে আশঙ্কায় ওর ভুরু কুঁচকে ওঠে।

আচ্ছা আমি না হয় অসতর্ক ছিলাম। কিন্তু ও তো সতর্ক হতে পারত। ও কেন পাগলের মতো করল। আমিও তো ওকে সতর্ক হতে বাধ্য করতে পারতাম। কেন করিনি? আমিও কি ওর মতোই শিশিরের মতো গলে গিয়েছিলাম? মরে গিয়েছিলাম?

ডান হাতের নরম দীর্ঘ আঙুল চুলের ভেতর চালিয়ে নিজের মনকে কিছুটা সংযত করে ও।

এ যুগে এসব উটকো ঝামেলা সামাল দেওয়া আবার একটা ব্যাপার নাকি?—মনে মনে ভাবল তানিশা। দেরি না করে গাইনির কোনো ভালো ডাক্তারের কাছে গেলেই তো সুরাহা হয়ে যাবে। কিন্তু কোন ডাক্তারের কাছে যাবে ও? ওর ছেলে অমিতের জন্ম হয়েছিল ড. জরিনের হাতে। তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজের সহযোগী অধ্যাপক। চাইলে তাঁর কাছেও যাওয়া যায়। কিন্তু অমিত হবার সময় প্রতিবারই ওরা স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে গেছে তাঁর কাছে। দুজনকেই ভালো করে চেনেন তিনি। সাব্বিরের এক বড়লোক আত্মীয়েরও তিনি পরিচিত। তাঁর কাছে একা গিয়ে কী করে এমন প্রস্তাব দেবে।

ওর ভেতরের মন হঠাৎ যেন অসুস্থ হয়ে উঠল।

ড. জরিন না হলে আর কার কাছে তো যেতে পারে? কিন্তু এই ব্যাপারের আর কোনো ডাক্তারকে তো ও চেনে না। চিনতে চাইলে অন্তত কাউকে না কাউকে তো জিজ্ঞেস করতে হবে। একজন বলতে না পারলে পাঁচজনকে জিজ্ঞেস করতে হবে। কিন্তু কেউ যদি কিছু একটা সন্দেহ করে বসে? কারও কাছে ফাঁস করে দেয়? যদি অনেকের মধ্যে জানাজানি হয়ে যায়? কথাবার্তা শুরু হয়?

ওর মনে হয় সারা পৃথিবী চারদিক থেকে ওর দিকে তাকিয়ে হি হি করে হাসছে।

তা ছাড়া ডাক্তার না হয় পাওয়া গেল। কিন্তু তার চেম্বারে একদঙ্গল রোগীর সঙ্গে যে অন্তত দুটো দিন দু-তিন ঘণ্টা করে বসে থাকতে হবে, তখনই যে কথায় কথায় ব্যাপারটা অন্য কেউ আঁচ করবে না, তার নিশ্চয়তা কী? অপরাধ এড়ানো এত সোজা নয়। তা ছাড়া পরিচিত কেউ যদি দেখে ফেলে, কাছে এসে আসল সমস্যা নিয়ে কথা শুরু করে। যদি ডাক্তারের চেম্বারে ওর যাবার কথা সাব্বিরের কোনো আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবের কাছে কোনোভাবে গিয়ে পৌঁছায়! নাহ তানিশা আর ভাবতে পারে না। অস্থিরতায় শরীর ঘেমে ওঠে। সবকিছু তালগোল পাকায়।

৪.

ব্যাপারটা আন্দাজ করার সপ্তাহ খানেকের মাথায় তানিশা আবরারকে পরিস্থিতিটা খুলে বলেছিল। দুশ্চিন্তায় ওর মাথার শিরা তখন দপদপ করছে। কথাটা শুনে আবরারের মুখ হঠাৎ কাগজের মতো সাদা হয়ে গিয়েছিল।

> হঠাৎ বিদ্যুতের রেখার মতো একটা আশার পথ খুলে যেন তানিশার সামনে

ব্যাপারটা নিয়ে তার আশঙ্কা থাকলেও তা যে ঘাতকের মতো এত চটজলদি বুকের ওপর চেপে বসবে তা ও ভাবেনি। উৎকণ্ঠা আর ভয় নিয়ে বলল, বলো কী। এখন? ওর মুখ পুরো ফ্যাকাশে।

হঠাৎ বিদ্যুতের রেখার মতো একটা আশার পথ খুলে যেন তানিশার সামনে। হ্যাঁ, যেমন করেই হোক এক বা দুই সপ্তাহের মধ্যে এভাবে একটা বিহিত করতেই হবে। যেভাবে, যেমন করে হোক, করতেই হবে সেটা। ও ছাড়া বাঁচার পথ নেই। ওর সমস্ত জেদ যেন এখন মরিয়া।

আপাতত পরিকল্পনাটা আবরারকে বলা নিরর্থক। সবকিছু ঠিকমতো না এগোলে বলে কী হবে। কিন্তু এটা কি আদৌ সম্ভব? ভাবে তানিশা। সাব্বির সাদাসিধা মানুষ, আর ওরকম বলেই না যত সমস্যা। একবার কোনো কিছু নিয়ে গোঁ ধরলে তাকে আর তা থেকে তো সরানো যায় না।

সেদিন থেকে দেখা গেল তানিশার পুরো নতুন চেহারা। সাব্বিরের সঙ্গে কয়েক দিন ধরে যুক্তি-তর্ক, অনুরোধ-উপরোধের এক অন্তহীন পর্ব। সে যুক্তির মূল কথা : ও ভালো কেরিয়ার করতে চায়। এ জন্য এখনই 'বাবু-পর্ব' শেষ করা দরকার। তাতে কেরিয়ারের প্রথম দিকে কিছুটা কষ্ট হলেও চাকরির ওপরের দিকে ফ্রি হয়ে নিশ্চিত মনে কেরিয়ারে সময় দিতে পারবে। পাঁচ বছর পর আবার বাচ্চা নিতে গেলে সারা জীবন ছেলেমেয়ে মানুষ করাতেই শেষ হবে। সাধারণ মানুষদের মতো তুচ্ছ পরিচয় নিয়ে ও পৃথিবী থেকে মুছে যেতে চায় না। জীবনে ও উন্নতি চায়। খ্যাতি, সম্মান, মর্যাদা চায়। আর বাচ্চা হলেও তাকে মানুষ করার ঝক্কি তো আর সাব্বিরকে সামলাতে হবে না। এ তো মা হিসেবে তানিশাই দেখবে। তাহলে সাব্বিরের অসুবিধা কী? ওর জীবনের এই সম্ভাবনার মূল্য সাব্বির না দিলে আর কে দেবে? তাহলে এখন বাবু হতে বাধা কোথায়!

কিন্তু সাব্বিরের সঙ্গে পরপর তিন দিন তুলকালাম ব্যর্থ কথা-কাটাকাটির পর ও একসময় পুরো নীরব হয়ে গেল। তার জায়গায় শুরু হলো একটানা কান্না। সাব্বির দেখতে পেল তানিশা বিছানায় অন্যদিকে ফিরে সারা রাত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সে কান্নার যেন শেষ নেই। গোঁয়ার সাব্বির তখনো গোঁ ধরে আছে। সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছেলেখেলা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু দ্বিতীয় রাতেও ওকে একইভাবে কাঁদতে দেখে সাব্বির কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ল। একজন মানুষকে এভাবে কাঁদতে দেখলে কাঁহাতক সহ্য করা যায়? তৃতীয় রাত পেরিয়ে চতুর্থ রাত এলে ও একেবারে যেন ভেঙে পড়ল। 'না, এত ছোট্ট একটা ব্যাপার নিয়ে এভাবে পারিবারিক কলহ বাধিয়ে রাখা উচিত নয়, এর শেষ করতে হবে।' মনে মনে বলল ও।

রাত বারোটার দিকে তানিশাকে বুকের ভেতর টেনে নিয়ে সাব্বির বলল, ঠিক আছে, তোমার কথাই রাখছি।

পরের সন্ধ্যায় আবরারের বাসায় হঠাৎ হাজির তানিশা। প্ল্যানটার কথা এর মধ্যে আরবারকেও জানিয়ে রেখেছিল। দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে আবরার, ওর চোখে-মুখে উৎকণ্ঠা আর আশঙ্কা। বিজয়ীর ভঙ্গিতে তানিশা বিদেশি কায়দায় ডান হাতের বুড়ো আঙুল ওর দিকে অর্থপূর্ণভাবে উঁচিয়েই চোখ মেরে প্রতীক্ষারতা রমণীর আহ্বান নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

'হুররা' বলে খুশিতে পাগলের মতো ছুটে গিয়ে আবরার তানিশাকে কোলে তুলে নিয়ে শোবার ঘরে ঢুকে বিছানার ওপর মেলে দিল। খিলখিল করে কুটিল হেসে তানিশা বলল, ভয়ের দিন গেছে। তোমার বাবু এখন সাব্বিরের।

অভিযাত্রী

মুহাম্মদ লুৎফুল হক

চন্দ্রবিজয়ীদের বাংলাদেশ জয়

প্রতীক্ষায় ছিল সবাই। দেশের পত্রপত্রিকায় প্রতিদিনই ছাপা হচ্ছিল তাঁদের নিয়ে খবর। অবশেষে ১৯৬৯ সালের ২৭ অক্টোবর ঢাকা বিমানবন্দরে অবতরণ করল তাঁদের বিমান। হাজার হাজার উৎফুল্ল মানুষ তখন বিমানবন্দরে হাজির। তাদের হর্ষধ্বনিতে পুরো এলাকা কম্পিত। এই অবস্থায় প্লেনের দরজায় দেখা গেল একে একে তিন নভোচারীর মুখ।

উপস্থিত জনসাধারণ চোখের সামনে দেখতে পেল নীল আর্মস্ট্রং, মাইকেল কলিন্স আর এডউইন অলড্রিনকে।

এই বিশাল জনসমাগম চমৎকৃত করেছিল নভোচারীদের।



তিন চন্দ্রবিজয়ী :
নীল আর্মস্ট্রং,
মাইকেল কলিন্স ও
এডউইন অলড্রিন

আর্মস্ট্রংয়ের পরনে ছিল পীত বর্ণের স্যুট, কলিন্সের অনেকটা সাদা এবং অলড্রিনের ধূসর বর্ণের। প্লেন থেকে নেমে এলে সরকারের প্রধান প্রটোকল অফিসার ইশরাত হোসেন চন্দ্রবিজয়ীদের অভ্যর্থনা জানান। এরপর পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্য সচিব শফিউল আজম অতিথিদের সরকারের পক্ষ থেকে স্বাগত জানান। তখন ছোট ছোট মেয়েরা অতিথিদের ফুলের মালা ও তোড়া উপহার দেয়। বিশেষ বিমান থেকে অতিথিদের গাড়ি পর্যন্ত লালগালিচা বিছানো ছিল। গালিচার পাশে দাঁড়ানো ছিলেন শহরের গণ্যমান্য সরকারি ও বেসরকারি ব্যক্তিরা, মার্কিন চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স জেমস ডব্লিউ স্পাইক ও ঢাকায় মার্কিন কনসাল জেনারেল লেসলি অ্যালবিয়ন স্কোয়ার্স। পাকিস্তানের অনেক মার্কিন নাগরিকও বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন।

এখানে মুখ্য সচিব ও আর্মস্ট্রং সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। মুখ্য সচিব অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে বলেন, 'আপনারা আমাদের এই ঐতিহাসিক শহরকে ভ্রমণ তালিকায় রাখার জন্য সম্মানিত বোধ করছি। যত দিন এই পৃথিবীর বুকে মানবজাতির অস্তিত্ব থাকবে তত দিন চন্দ্রবিজয়ের এই সাফল্য তাদের মনে রোমাঞ্চ ও অনুপ্রেরণা জাগাবে এবং ভবিষ্যৎ বংশধরেরা এর থেকে পথের সন্ধান পাবে।'

আর্মস্ট্রং তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'আমাদের বিজয়কে সমগ্র বিশ্বমানবতার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা ভোগ করতে চাই, সেটাই আমরা আমাদের এই সফরের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করতে চাইছি। কাছ থেকে এই মনোরম দেশটিকে দেখতে পেয়ে আমরা আনন্দিত। মহাশূন্য থেকে যখন পৃথিবীর দিকে তাকিয়েছিলাম তখন আমরা পাকিস্তান, তার নদ-নদী, ব্রহ্মপুত্র ও সিন্ধু নদ [পশ্চিম পাকিস্তানে] দেখতে পেয়েছিলাম। আপনাদের কাছে আমাদের চাঁদে যাবার কাহিনি বলার সঙ্গে সঙ্গে আমরা পাকিস্তান সম্পর্কেও অনেক কিছু জানতে পারব।'

বিমানবন্দর থেকে ঢাকা শহর প্রদক্ষিণের জন্য বের হলেন তাঁরা। রাস্তাজুড়ে শুধু মানুষ আর মানুষ। সে বর্ণনা দেওয়ার আগে একটু পেছন ফিরে তাকালে ভালো হয়।

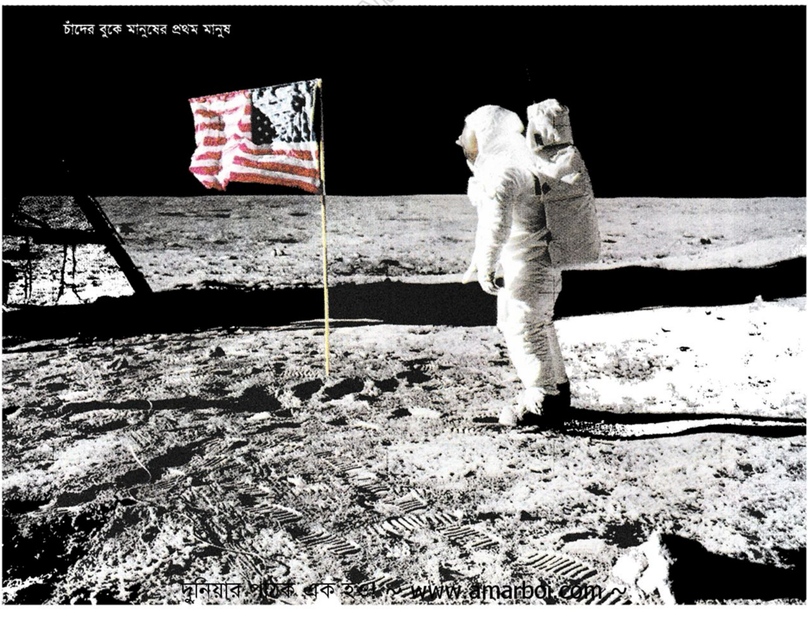
প্রজেক্ট জায়ান্ট স্টেপ

১৯৬৯ সালের ২৪ জুলাই হচ্ছে সেই ঐতিহাসিক দিন, যেদিন অ্যাপোলো ১১-এর তিন নভোচারী লে. কর্নেল নিল এ আর্মস্ট্রং, মাইকেল কলিন্স ও এডউইন ই অলড্রিন চন্দ্র বিজয় করে পৃথিবীতে ফিরে আসেন। এরপর ২১ দিন তাঁদের রাখা হয় তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে। মহাশূন্যে বা চাঁদে অবস্থানকালে নভোচারীদের শরীরে কোনো রোগ সংক্রমণ হলো কি না তা পরীক্ষা ও প্রতিরোধের জন্যই ছিল এই কয়ারেনটিন। এরপরই শুরু হয়ে যায় চন্দ্রবিজয়ের আনন্দ উৎসব।

উৎসব শুরু হয় চন্দ্রবিজয়ীদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের অভ্যর্থনা দিয়ে। দিনটি ছিল ১৩ আগস্ট। অনুষ্ঠানটি হয়েছিল লস অ্যাঞ্জেলেসের সেঞ্চুরি প্লাজা হোটেলে। এরপর ১৪ আগস্ট নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হয় টিকারটেপ প্যারেড (একধরনের জাঁকজমকপূর্ণ অভ্যর্থনা মিছিল)। ১৯ সেপ্টেম্বর হোয়াইট হাউস থেকে জানানো হয় যে চন্দ্রবিজয়ের অভিজ্ঞতা বর্ণনা এবং আমেরিকার মহাশূন্য অভিযানের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সবার সাথে ভাগাভাগি করার জন্য চন্দ্রবিজয়ীরা বিশ্বভ্রমণ করবেন। বিশ্বভ্রমণের নামকরণ করা হয় 'প্রজেক্ট জায়ান্ট স্টেপ'।

এই প্রজেক্ট শুরু হয় ২৯ সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটন ডিসি থেকে। এদিন চন্দ্রবিজয়ীরা তাঁদের প্রথম গন্তব্য মেক্সিকো সিটিতে এসে পৌঁছান। বিভিন্ন দেশে ঘুরে 'প্রজেক্ট জায়ান্ট স্টেপ'-এর শেষ গন্তব্য ছিল টোকিও শহরে, সেখানে তাঁরা পৌঁছান ৪ নভেম্বর। আর, ৫ নভেম্বর আলাস্কা হয়ে ফিরে আসেন ওয়াশিংটন ডিসি।

চাঁদের বুকে মানুষের প্রথম মানুষ





ঢাকার মাটিতে চন্দ্রবিজয়ীদের আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানানো হচ্ছে, সৌজন্য : *লাইফ*

কত দেখা, কত না মানুষ

২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ নভেম্বর, এই ৩৮ দিনে তাঁরা সফর করেন মোট ২৩টি দেশের ২৭টি শহর। এর মধ্যে ছিল ল্যাটিন আমেরিকার ৫টি, ইউরোপের ১৩টি, আফ্রিকার ১টি, এশিয়ার ৬টি ও অস্ট্রেলিয়ার ২টি শহর। সফরসূচিতে আরও ছিল আমেরিকার টেরেটরি গুয়ামের রাজধানী আগানা এবং আলাস্কার এলমেনড্রফ শহর। সফরসূচিতে প্রতিটি দেশের একটি করে শহর থাকলেও, ব্রাজিল, অস্ট্রেলিয়া ও স্পেনের ছিল দুটি করে শহর। যুদ্ধ ও সংঘাতে অস্থির মধ্যপ্রাচ্য এবং কমিউনিস্ট দেশসমূহের মধ্য থেকে কোনো শহরকে সফরসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি (যুগোস্লাভিয়ার বেলগ্রেড ছাড়া)। হাঙ্গেরির বুদাপেস্ট শহর তালিকায় থাকলেও, হাঙ্গেরির অনীহার কারণে শেষ পর্যন্ত তা সফরসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

নিউইয়র্ক টাইমস-এর সাংবাদিক নেন রবার্টসনের তথ্য মতে, চন্দ্রবিজয়ীরা এই সফরে ২০ জন রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে মিলিত হন, ২২টি সংবাদ সম্মেলন করেন, কমপক্ষে দশ কোটি মানুষকে দর্শন দেন, ২৫ হাজার ব্যক্তির সঙ্গে হাত মেলান, অর্জন করেন ফরাসি 'লিজিয়ন অব অনার' ও 'মেডাল দ্য ভার্মেইল', কঙ্গোর 'অর্ডার অব দ্য লেপার্ড', জাপানের 'অর্ডার অব দ্য কালচার', ব্রাজিলের 'ন্যাশনাল অর্ডার অব দ্য সাদার্ন ক্রশ', বেলজিয়ামের 'ডিগ্রি অব অফিসার ইন দ্য অর্ডার অব লিওগোল্ড'সহ অসংখ্য ভূষণ। উপঢৌকন হিসেবে পেয়েছেন বিটোফেনের রেকর্ড সেট (জার্মান), স্বর্ণমুদ্রা (জার্মান ও ভ্যাটিকান), স্বর্ণপদক (পাকিস্তান), ষাঁড়ের লড়াইয়ের পোশাক (স্পেন) ইত্যাদি।

এই সফরের আগে আমেরিকা বা অন্য কোনো দেশের নভোচারীরা কেউ কখনো এভাবে বিশ্বভ্রমণ করেননি। এটিই ছিল নভোচারীদের প্রথম বিশ্বভ্রমণ।

স্টেট ডিপার্টমেন্ট ও প্রেসিডেন্টের স্টাফদের সহযোগিতায় নাসা এই সফরের পরিকল্পনা করেছিল। পরিকল্পনাপর্বের কাজটি মূলত স্টেট ডিপার্টমেন্টে বসেই করা হয়। প্রেসিডেন্ট নিক্সন ব্যক্তিগতভাবে এই সফরকে সফল করার জন্য সব ধরনের সহযোগিতা করেন।

এটা ছিল এয়ারফোর্স ওয়ান

এই সফরে ব্যবহার করা হয় প্রেসিডেন্টের বিলাসবহুল বোয়িং ডিসি-১৩৭বি-সংশোধিত ৭০৭ বিমানটি, যার টেইল নম্বর ছিল ৮৬৯৭০। আমেরিকার বিমানবাহিনীর বেতার যোগাযোগব্যবস্থায় এই বিমানের কল সাইন 'এয়ারফোর্স ওয়ান', এ কারণে বিমানটি সবার কাছে 'এয়ারফোর্স ওয়ান' নামেই বেশি পরিচিত।

স্টেট ডিপার্টমেন্ট সফরের জন্য শহরসমূহ ও বিমানের ক্রুদের নির্বাচন করে। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে পরিকল্পনার খুঁটিনাটি বিষয়গুলো সম্পন্ন করা হয়। প্রতিটি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানকে উপহার দেওয়ার জন্য চন্দ্রবিজয়ীরা চাঁদের মাটিতে যে ফলক রেখে এসেছিলেন তার একটি করে নকল সঙ্গে নেন। এই ফলকে লেখা ছিল, 'এখানে পৃথিবী থেকে আসা মানুষ চাঁদের বুকে প্রথম কদম রাখে। জুলাই ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দ। সকল মানবজাতির পক্ষ থেকে আমরা শান্তির জন্য এসেছি।' এর নিচে তিন চন্দ্রবিজয়ীর এবং তারও নিচে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের স্বাক্ষর ছিল। লেখা অংশের ওপরে পূর্ব ও পশ্চিম গোলার্ধের মানচিত্র ছিল। ফলক ছাড়াও প্রত্যেক রাষ্ট্রপ্রধানকে উপহার দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপ্রধানদের বাণী ও স্বাক্ষরসংবলিত যে সিলিকন ডিস্ক চাঁদে রেখে আসা হয়েছিল, তারও একটি করে নকল নেওয়া হয়।

যাঁরা ছিলেন যাত্রী

এয়ারফোর্স ওয়ানের যাত্রী ছিলেন মাত্র ছয়জন, চন্দ্রবিজয়ী তিনজন এবং তাঁদের স্ত্রীত্রয় জেনেট আর্মস্ট্রং, পেট্রিসিয়া কলিন্স ও জোয়ান অলড্রিন। সফরের সহযোগী যাত্রী ছিলেন ২১ জন, যার মধ্যে ছিলেন কয়ারেনটিনে নভোচারীদের সাথে অবস্থানকারী চিকিৎসক ডা. উইলিয়াম কার্পেন্টিয়ার এবং নাসা, ইউএসআইএস

ও ভয়েস অব আমেরিকার কর্মীরা। বিমানে ক্রু ছিলেন ২৪ জন, যার মধ্যে ৬ জন ১৫ অক্টোবর রোমে এসে এয়ারফোর্স ওয়ানে যোগ দেন। বিমান ক্রুরা সবাই আমেরিকার বিমানবাহিনীর সদস্য ছিলেন। বিমানের অধিনায়ক ছিলেন লে. কর্নেল কার্ল এ পেডেন।

১৯৬৯ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট নিক্সন হোয়াইট হাউস থেকে দলনেতা আর্মস্ট্রংকে টেলিফোনে বিদায়ী শুভেচ্ছা জানান এবং ৫ নভেম্বর সফর শেষ করে ফেরত আসার পর হোয়াইট হাউসে নৈশভোজের দাওয়াত দেন। ২৯ সেপ্টেম্বর এয়ারফোর্স ওয়ান অ্যান্ড্রু বিমানঘাঁটি থেকে উড়ে জনসন স্পেস সেন্টারে এসে নভোচারী ও তাঁদের স্ত্রীদের নিয়ে বাংলাদেশ সময় রাত ১০টা ১০ মিনিটে মেক্সিকো সিটির দিকে উড়ে যায়। এভাবেই শুরু হয় তাদের এ সফর।

ঢাকা যখন সরব হলো

২ অক্টোবর দৈনিক *পূর্বদেশ*-এ প্রথম প্রকাশ পায় যে চন্দ্রবিজয়ীরা ২৭ অক্টোবর ঢাকা সফরে আসছেন, তাঁরা ঢাকায় এক রাত অবস্থান করে পরদিন ব্যাংককের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করবেন। ১৬ অক্টোবর ঢাকায় চন্দ্রবিজয়ীদের সংবর্ধনার প্রস্তুতি নিয়ে সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ পায়। বিজ্ঞপ্তির বরাতে ১৭ অক্টোবর *পূর্বদেশ* পত্রিকায় নিচের সংবাদটি প্রকাশ পায় :

> চন্দ্রবিজয়ীদের যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে সংবর্ধনা জানানোর উদ্দেশ্যে ঢাকায় এক ব্যাপক প্রস্তুতিপর্ব চলছে। অ্যাপোলো ১১-এর তিনজন নভোচারী আগামী ২৭ অক্টোবর এখানে আগমন করবেন।
>
> নভোচারী নেইল আর্মস্ট্রং, এডুইন অলড্রিন ও মাইক্যাল কলিন্স্ একটি মোটর গাড়ি করে ঢাকার রাজপথ অতিক্রম করবেন। এতে অধিক সংখ্যক লোক তাদের দেখতে ও সম্বর্ধনা জানাতে সুযোগ পাবে।
>
> প্রাদেশিক চীফ সেক্রেটারী ও অভ্যর্থনা কমিটির সদস্যরা বিমান বন্দরে নভোচারী ও তাদের স্ত্রীদের অভ্যর্থনা জানাবেন। তারা ঢাকায় মাত্র একদিন অবস্থান করবেন এবং সেই দিনই প্রাদেশিক গভর্নর প্রদত্ত এক সম্বর্ধনায় যোগ দেবেন। চন্দ্রবীররা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা করবেন।
>
> তাদের দেখার উদ্দেশ্যে স্কুলের ছেলেমেয়ের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। চন্দ্রবীরেরা পরের দিন ঢাকা ত্যাগ করবেন।

যে পথে যাত্রা, যেভাবে প্রস্তুতি

১৭ অক্টোবরের *দৈনিক পাকিস্তান* ও অন্যান্য পত্রিকা থেকে জানা যায় যে মহাশূন্যচারীদের অধিক সংখ্যক লোক যাতে দেখতে ও সংবর্ধনা জানাতে পারে, তার জন্য তাঁদের গাড়িতে করে দীর্ঘ পথ পরিক্রমণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

চন্দ্রবিজয়ীরা তেজগাঁও বিমানবন্দরে অবতরণের পর, তাঁদের ময়মনসিংহ রোড (এয়ারপোর্ট রোড), শাহবাগ এভিন্যু, সাবেক গভর্নর ভবন (বাংলা একাডেমি) রোড, আবদুল গনি রোড, জিন্নাহ এভিন্যু (বঙ্গবন্ধু এভিন্যু), আদমজী কোর্ট, পাকিস্তান স্টেট ব্যাংক রোড, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, তোপখানা রোড, পার্ক এভিন্যু, হেয়ার রোড ও মিন্টো রোড হয়ে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে নিয়ে আসা হবে। বিমানবন্দর ও রাস্তায় স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা যাতে মহাশূন্যচারীদের দেখতে পায় তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নভোচারীদের যাত্রাপথের মধ্যে কমিশনার ভবন থেকে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল পর্যন্ত এলাকা কেবল ছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হবে। তাঁদের স্বল্পকালীন সফরে তাঁরা গভর্নর প্রদত্ত সংবর্ধনায় যোগ দেবেন এবং একটি সংবাদ সম্মেলন করবেন। ২৮ অক্টোবর মহাশূন্যচারী ও তাঁদের স্ত্রীরা ঢাকা ত্যাগ করবেন। *দৈনিক পাকিস্তান*-এ আরও উল্লেখ করা হয় যে চন্দ্রবিজয়ীদের অভ্যর্থনার জন্য একটি অভ্যর্থনা কমিটি গঠন করা হয়েছে।

চন্দ্রবিজয়ীদের জন্য নির্বাচিত শোভাযাত্রার পথটি ঢাকা শহরের একাংশের মধ্য দিয়ে যাওয়ায় অধিকাংশ ঢাকাবাসী তাদের একনজর দেখা থেকে বঞ্চিত হবেন। ফলে অনেকের কাছেই

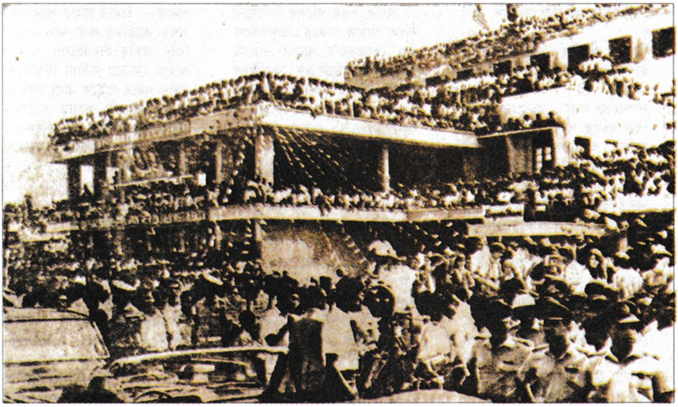
চন্দ্রবিজয়ীদের নিয়ে একটি কবিতা

মানুষ চন্দ্র বিজয় করেছে, চন্দ্রবিজয়ীরা ঢাকা আসছেন, এ সংবাদে অনেকেই বেশ উৎফুল্ল হলেও সবাই যে উল্লসিত হননি তার প্রমাণ নিচের কবিতাটি। কবি সাইদা চৌধুরীর নিচের কবিতায় ভিন্ন অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। কবিতাটি প্রকাশিত হয় ২১ অক্টোবর *পূর্বদেশ* পত্রিকায়।

প্রতীক্ষায়

যে মুহূর্তে অন্য পৃথিবী ভাবে
চাঁদে পা রেখে মঙ্গল গ্রহের;
ঠিক তক্ষুণি আমার দেশে
পেটেপিঠে বিলীন যুবকটি
বৈদ্যুতিক বাতিটা লক্ষ্য করে ভয়ে
আঁতকে ওঠে, বুঝিবা আগুন লেগেছে ঘরে।
ডাস্টবিন থেকে যখন, আগামী দিনের
নাগরিকটি খুঁটে খুঁটে খাবার খায়
তখনও অবজ্ঞার চোখে—
বালকটিকে করে ঘৃণা, কেউ বা
করুণা...তবুও দাঁড়ায় না কেউ কাছে
এসে। কিংবা নিয়ে গিয়ে দেয় না খাবার।
পাশের বাড়ীর লোকটি যখন ক্ষয় কাশে
ক্ষয়ে ক্ষয়ে এগিয়ে যায় মৃত্যুর দিকে—
দশটি সন্তান ঘরে তার, তারা ঘুরে
বেড়ায় ফুটপাত থেকে ফুটপাতে, লা-
ওয়ারিশ কুকুরের মত...। এদের দিকে
চেয়ে আমার বলবার থাকে না কিছুই...
শাসনের নিষ্পেষণে আমি, দফতরের
কেরানীর মত...মাসের শেষে পঞ্চাশটি
টাকা হাতে...পঁচিশ টাকায় কিনে ঔষধ
বাড়ী ফেরার পথে...বাকী দিনগুলো ফেলে
ঈশ্বরের কাঁধে, নিজেকে মুক্ত ভাবতে চাই...
তক্ষুণি রোল্‌স্-রয়েস ছুটে যাওয়া
কাদায় নেয়ে শুধু একটি বিদ্রোহের
জন্য আমি অপেক্ষা করি...বিদ্রোহ, বিদ্রোহ
চাই, এবং চাই বাঁচবার অধিকার ॥





চন্দ্রবিজয়ীদের অভ্যর্থনা জানাতে সুসজ্জিত বিমানবন্দরে জনতার ঢল

বিষয়টি কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই গমনপথটি পরিবর্তন এবং আরও কিছু সুপারিশসহ ঢাকার রোজী হোসেনের একটি চিঠি ১৮ অক্টোবর *মর্নিং নিউজ*-এ প্রকাশ পায়। চিঠিতে রোজী চন্দ্রবিজয়ীদের শোভাযাত্রার জন্য যে পথটি অনুসরণের সুপারিশ করেছিলেন, তা ছিল—বিমানবন্দর থেকে আইয়ুব গেট (আসাদ গেট), মিরপুর রোড, শাহবাগ হোটেল, অ্যাটমিক এনার্জি সেন্টার, নিউ মার্কেট, আজিমপুর কলোনি রোড, ইডেন গার্লস কলেজ, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কার্জন হল, আবদুল গনি রোড, জিন্নাহ এভিন্যু, গভর্নমেন্ট হাউস রোড, টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, মতিঝিল কলোনি, তোপখানা রোড হয়ে রেসকোর্স বা প্রেসিডেন্ট হাউস (অতিথি ভবন 'পদ্মা') রোড ধরে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল। রোজী বলেন, এতে বেশিসংখ্যক মানুষ চন্দ্রবিজয়ীদের দেখার সুযোগ পাবে। তিনি আরও সুপারিশ করেন যে ২৭ অক্টোবর বিকেলে চন্দ্রবিজয়ীদের রেসকোর্স ময়দানে ঢাকা পৌরসভার তরফ থেকে নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া যেতে পারে। এতে এক সাথে অনেকে চন্দ্রবিজয়ীদের দেখতে পাবেন। শেষে তিনি টেলিভিশন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেন, যেন চন্দ্রবিজয়ীদের শোভাযাত্রাটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত টেলিভিশনে সরাসরি প্রচার করা হয়। এতে লাখ লাখ মানুষ ঘরে বসে চন্দ্রবিজয়ীদের লাইভ দেখতে পাবে।

ইতিমধ্যেই চন্দ্রবিজয়ীদের অভ্যর্থনার জন্য ঢাকা শহরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুসজ্জিত করার কাজ শুরু হয়ে যায়। ২১ অক্টোবর *পূর্বদেশে*-এ প্রকাশ পায় :

> চন্দ্রলোক থেকে ফেরা তিন জন মার্কিন মহাশূন্যচারী বিশ্ব সফরে আগামী ২৭শে অক্টোবর ঢাকায় আসছেন। আর এই উপলক্ষে শহরের রাজপথগুলোকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও ঝকঝকে করে তোলা শুরু হয়েছে। কোথাও রাস্তার আইল্যান্ডগুলোর পাকা সীমানাগুলোয় চুন দেয়া হচ্ছে, কোথাও ভাঙাচোরা জায়গাগুলো সিমেন্ট বালি দিয়ে মেরামত করা হচ্ছে, আবার কোথাও ফুটপাতের উপর থেকে ময়লা আগাছা লতাগুল্ম ঘাসপাতা পরিষ্কার করা হচ্ছে এবং কোথাও কোথাও রাস্তার পাশের নোংরা দেয়ালগুলো ঘসে মেজে পরিষ্কার করা হচ্ছে, চুনকাম করে ঝকঝকে করে তোলা হচ্ছে। ঢাকা শহরের নতুন পুরাতন এলাকার রাস্তাঘাটে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার প্রচেষ্টা এমনিতে বড় একটা দেখা যায় না।

দিন আসে কাছে

২৪ অক্টোবরের বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকা থেকে জানা যায়, চন্দ্রবিজয়ীদের নিয়ে এয়ারফোর্স ওয়ান বিমানটি ২৭ অক্টোবর দুপুর সোয়া বারোটায় বোম্বে (বর্তমানে মুম্বাই) থেকে তেজগাঁও বিমানবন্দরে এসে পৌঁছাবে। পূর্ব পাকিস্তানের চিফ সেক্রেটারি শফিউল আজম অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাবেন। সেখানে আরও উপস্থিত থাকবেন যুক্তরাষ্ট্রের অস্থায়ী চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স জেমস ডাব্লিউ স্পেন, ঢাকায় মার্কিন কনসাল জেনারেল লেসলি স্কোয়ার্স ও শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

বিমানবন্দরের সংক্ষিপ্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের পর অভ্যর্থনা কমিটির সদস্যগণ এবং রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা শোভাযাত্রাসহ অতিথিদের নিয়ে ধীরগতিতে নতুন ঢাকার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করবেন।

পত্রিকায় উল্লেখ ছিল, 'প্রায় নয় মাইল দীর্ঘ পথে এক ঘণ্টা স্থায়ী এই মোটর শোভাযাত্রাটির পরিকল্পনা অতি সযত্নে প্রণয়ন করা হয়েছে যাতে মহাশূন্যচারীবৃন্দ যথাসম্ভব সর্বাধিক সংখ্যক পাকিস্তানি জনগণকে অভিবাদন জ্ঞাপন করতে পারেন।' শোভাযাত্রা প্রায় নয় মাইল দীর্ঘ পথটি এক ঘণ্টায় প্রদক্ষিণ করবে এবং ঢাকাবাসী চন্দ্রবিজয়ীদের অভিবাদন জানাতে সক্ষম হবে। এ দিন বিকেলে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ভাইস অ্যাডমিরাল এস এম আহসান অতিথিদের গভর্নর হাউসে সংবর্ধনা জানাবেন। অনুষ্ঠানে পূর্ব পাকিস্তান ভূগোল সমিতি চন্দ্রবিজয়ীদের স্বর্ণপদক প্রদান করবেন। চন্দ্রবিজয়ীরা অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেবেন।

স্ত্রীরাও ছিলেন আগ্রহের কেন্দ্রে

২৫ অক্টোবর *ইত্তেফাক* পত্রিকা চন্দ্রবিজয়ী ও তাঁদের স্ত্রীদের বিষয়ে একটি বড় প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

সেই প্রতিবেদনের অংশবিশেষ ছিল এমন :

মিসেস আর্মস্ট্রং : নীল ও আমি ইণ্ডিয়ানার পার্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে মিলিত হই। আমার সহিত সাক্ষাতের জন্য অনুরোধের তিন বৎসর পূর্বেই নীল আমাকে জানিত। আমাদের এই সাক্ষাৎকার খুব একটা অসঙ্গত বলিয়া মনে হইত না, যদি না আমাদের বিবাহের পর নীলের জনৈক রুমমেট আমাকে জানাইতেন যে, প্রথম আমার সঙ্গে দেখা করার পর নীল বাসায় ফিরিয়া উক্ত রুমমেটকে বলে যে, আমিই সেই মেয়ে যাহাকে সে বিবাহ করিতে যাইতেছে। নীল তেমন লোক নয় যে, না ভাবিয়াই কিছু করিয়া বসিবে। আমার মনে হয় আসলে একটি নৈশভোজেই প্রথমবারের মত আমাদের সাক্ষাৎ হয়। আমি সে কথা স্মরণ করিতে পারি, কারণ সেই রাত্রে আমার সাঁতার শিখিতে যাওয়ার কথা ছিল এবং আমি নৈশভোজের যে খাবার দেওয়া হয় তাহা খাই নাই।

নীল আমাকে তা সামান্য খাওয়ার জন্য অনুরোধ করে এবং পরে সে আন্তরিকতা প্রদর্শনপূর্বক আমাকে গাড়ীযোগে মহিলাদের ব্যায়ামাগারের পুকুরে পৌছাইয়া দেওয়ার প্রস্তাব করে। সাঁতার দেওয়া সর্বদাই আমার সবচাইতে আকর্ষণীয় হবি।

মিসেস অলড্রিন : প্রথমে আমি নিউজার্সির ডগলাস কলেজে অধ্যয়ন করি পরে নিউইর্য়কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নাট্যকলায় মাস্টারস ডিগ্রী লাভ করি।

ইহার পরই বাজের [অলড্রিন] সহিত আমার পরিচয়। প্রকৃতপক্ষে এক ভোজসভায় মায়ের সহিতই তাহার প্রথম পরিচয় হয়। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহার কোরিয়া যাইবার কথা। মা তাহাকে নৈশভোজের আমন্ত্রণ জানান। এ সময় আমাদের মধ্যে কিছুই ঘটে নাই।

বাজ যুদ্ধে গেল আর আমি ফিরিলাম আমার নাট্য জীবনে। এ সময়ের মধ্যে আমাদের মধ্যে কোন পত্রালাপ হয় নাই। অতঃপর বাজ ফিরিয়া আসিয়া লাস ভেগাসের নেলিস বিমানঘাঁটিতে যোগ দিল। এই সময়েই আমরা চিঠিপত্রের আদান-প্রদান শুরু করিলাম।

সে আমাকে 'এ' চিহ্নসূচক একটি প্রতীক উপহার দিয়াছিল। বাবা বলিতেন ইহা বাগদান অঙ্গুরীয়। ইহার এক বৎসর পর ছুটিতে লাসভেগাসে বাজকে দেখিতে যাইবার জন্য বাবার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। অবশেষে ছুটি ফুরাইবার শেষ রজনীতে বাজ বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিল।

আমাদের সাক্ষাতের পঞ্চমবারেই আমরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই। আমার নিকট ইহা অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল যে, আমি একজন বৈমানিককে বিবাহ করিয়াছি। কারণ আমার মা একটি বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাইয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি আমি বাজকেই বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলাম কারণ আমার মনে হইত বাজের বৈমানিক হওয়াটা নেহাৎই এক দুর্ঘটনার ব্যাপার।

মিসেস কলিন্স : তাঁহার সহিত আমার প্রথম দেখা হয় বিমান ঘাটি অফিসার্স ক্লাবে (ফ্রান্সের চাম্বল শহরে)। তাঁহার সহিত সাক্ষাতের প্রথম রাত্রিটির কথা মনে পড়ে। তিনি প্রস্তাব দিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত মোটরে করিয়া নিকটবর্তী কোন শহরে যাইতে এবং সেখানে একত্রে ফরাসী খাবার খাইতে। আমি এরকমটিই চাহিয়াছিলাম। এরূপ একটি ভ্রমণের জন্য সানন্দে আমি যে কাহারও সহিত যাইতে রাজী ছিলাম। প্রথম রাতে মাইক তাহার ভ্রমণ কাহিনীর অনেক কিছু আমাকে শুনাইলেন।...

বিবাহ করার ব্যাপারে মাইক এবং আমাকে অনেক কষ্ট করিতে হইয়াছে। সেখানে আমেরিকার কোন লোক কোন ফরাসী মহিলাকে বিবাহ করিতে চাহিলে কি করিতে হইবে সে সম্পর্কে নিয়মকানুন ছিল। কিন্তু কোন আমেরিকান যুবক কর্তৃক কোন আমেরিকান রমণীর পাণি গ্রহণের ব্যাপারে কোন নিয়ম তখনও করা হয় নাই। বিবাহের ব্যাপারে সম্মতিসূচক স্বাক্ষর গ্রহণ করার জন্য কয়েক মাস আমাকে বিভিন্ন অফিসে দৌড়াদৌড়ি করিতে হয়। সিটি হলের মেয়র আমাদের বিবাহ পড়ান। তিনি অনুষ্ঠানে ফরাসী ভাষা ব্যবহার করেন, যার জন্য আমাদের খুবই অসুবিধা হইয়াছিল।

চূড়ান্ত প্রদক্ষিণ পথ

২৫ অক্টোবর রাতে পাকিস্তান টেলিভিশন কর্পোরেশনের ঢাকা স্টেশন সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানায় যে ২৭ অক্টোবর দুপুর ১২.৫ মি. থেকে আধ ঘণ্টার জন্য চন্দ্রবিজয়ীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ও শোভাযাত্রা সরাসরি প্রচার করা হবে। নভোচারীদের আগমন উপলক্ষে 'চাঁদের দেশে অ্যাপোলো' নামে একটি সচিত্র বাংলা বই প্রকাশ পায়। ২৬ অক্টোবর থেকে বিভিন্ন পত্রিকায় বইটির বিজ্ঞাপন প্রকাশ পায়। বইটির সুলভ সংস্করণের মূল্য ছিল এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা। ২৬ অক্টোবর *পূর্বদেশ* চন্দ্রবিজয়ীদের ঢাকা আগমন উপলক্ষে ২৭ অক্টোবরে 'বহুবর্ণে শোভিত' বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশের ঘোষণা দেয়।

২৬ অক্টোবর প্রকাশ পায় যে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে চন্দ্রবিজয়ীরা ২৭ অক্টোবর বেলা দুইটায় সংবাদ সম্মেলনে অংশ নিবেন। *পূর্বদেশ*-এর ভাষায়, 'ঢাকার ইতিহাসে এটি বৃহত্তম সংবাদিক সম্মেলন হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।' এদিন চন্দ্রবিজয়ীদের শোভাযাত্রার চূড়ান্ত প্রদক্ষিণ পথ প্রকাশ পায়। পূর্বে প্রকাশিত যাত্রাপথের কিছু



নারী সাংবাদিকদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু চন্দ্র বিজয়ী তিন নভোচারীর স্ত্রীরা

কিছু অংশ ছেঁটে যাত্রাপথটিকে কিছুটা সংক্ষিপ্ত করা হয়। চূড়ান্ত প্রদক্ষিণ পথের একটি নকশাও বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ পায়।

চূড়ান্ত প্রদক্ষিণ পথটি ছিল বিমানবন্দর থেকে পরিষদ ভবন (বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়) গেট, পলিটেকনিক স্কুল, কাওরান বাজার (কাওরান বাজার রেলওয়ে ক্রসিং), পাক মোটর (বর্তমানে বাংলা মোটর), শাহবাগ, জিন্না এভিন্যু (বর্তমানে বঙ্গবন্ধু এভিন্যু), ডিআইটি এভিন্যু, দিলকুশা রোড, স্টেট ব্যাংকের সামনের রাস্তা, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, মর্নিং নিউজ অফিস, তোপখানা রোড হয়ে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল।

পত্রিকাজুড়ে চন্দ্রাভিযান

২৭ অক্টোবর, চন্দ্রবিজয়ীদের ঢাকা আগমনের দিন, প্রতীক্ষায় রয়েছে ঢাকাবাসী। ২৬ অক্টোবরের *পূর্বদেশ*-এ প্রকাশ পায় :

> এই তিন দুরন্ত দামাল মানব সন্তানকে বীরোচিত সম্বর্ধনা জানানোর জন্যে ঢাকায় ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ সমাপ্ত হয়েছে। উন্মুখ হয়ে প্রতীক্ষা করছে লক্ষ লক্ষ নাগরিক তাদের দু'হাত বাড়িয়ে সাদর সম্ভাষণ জানাতে।

এ দিনের সবগুলো জাতীয় পত্রিকা চন্দ্রবিজয়ীদের শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে একাধিক বিশিষ্টজনের লেখা, সম্পাদকীয় আর প্রতিবেদন প্রকাশ করে। বেশির ভাগ জাতীয় পত্রিকা চন্দ্রবিজয়ীদের আগমন উপলক্ষে এদিন বর্ণিল ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে। ক্রোড়পত্রগুলোতে চন্দ্রবিজয়ীদের জীবনী, দাম্পত্য জীবন, চন্দ্রবিজয়ের ইতিহাস, চাঁদ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য, আকাশ ভ্রমণ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের ওপর রচনা প্রকাশ পায়। ক্রোড়পত্রগুলোতে চন্দ্রবিজয়ীদের স্বাগত জানিয়ে বেশ কিছু সংস্থার বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এর মধ্যে নাবিস্কো বিস্কুটের বিজ্ঞাপনটি অনেকের নজর কাড়ে। চন্দ্রবিজয়ীদের উদ্দেশে সেখানে লেখা ছিল—'আমরা পারলাম না...তোমাদের চন্দ্রবিজয়ের এ দফার খাদ্যতালিকায় যুক্ত হতে! হয়তো এ অবস্থা দীর্ঘদিন এ রকম থাকবে না।' ২৭ অক্টোবর সরকারি ছুটি থাকায় ২৮ অক্টোবর কোনো পত্রিকা প্রকাশ পায়নি। ফলে চন্দ্রবিজয়ীদের আগমনের যাবতীয় সংবাদ ২৯ অক্টোবর প্রকাশ পায়।

২৭ অক্টোবরের *পূর্বদেশ*-এর সাংবাদিক কামাল লোহানী লিখেছিলেন :

> ওরা তিনজন—চাঁদের মানুষ আজ ঢাকায় আসছে। ওরা অলোকের সন্তান, আসছে হেমন্তের শিশিরস্নাত এই রূপসী বাংলার বুকে।
>
> ইতিহাসের তিনজন অবিস্মরণীয় পুরুষ, অনাবিষ্কারের শিকল ছিড়ে নিঃসীম শূন্যে পাড়ি জমিয়েছিল গগন অঙ্গন পেরিয়ে চিরলোকের স্বপ্নময় চাঁদের ধূলি ধূসরিত নিস্তরঙ্গ শান্তির সমুদ্রে, উড়িয়ে দিয়েছিল বিজয়-কেতন গৌরবের ওই স্বর্ণশিখরে। মানব সভ্যতার সেই দুঃসাহসী নাবিকেরা—নীল আমস্ট্রং, এডউইন অলড্রিন আর মাইকেল কলিন্স বিস্ময়ের আনন্দরাশি নিয়ে আজ আসছে নদী মেঘলা ছায়া সুনিবীড় এই বাংলার বুকে।...
>
> তোমাদের আগমন আনন্দে আকাশে আজ জোৎস্নার মেলা। মাটির এ ধরাতলে হাসির কলরোল। তাই আহ্বান জানাই সবাই মিলে—নতুন জীবন গড়ি আয়। আমরাও তোমাদের সাথে স্বপ্নীল—সোনার কামনায়।
>
> হেমন্তের এদেশে এখন আমরা ভরবো খামার—তোমাদের তারই আনন্দে জানাই স্বাগতম, এই বাংলার মাটির বুকে। এ শুভলগ্নে নতুন পৃথিবী চায় শিল্পীর বরাভয়। নবসৃষ্টির শুভলগ্নে। তোমরা এসো এই সোনালী বাংলার বুকে, এসো জনতার মুখরিত সখ্যে, এসো দুঃখতিমির ভেদ করে, দুর্গম ধ্বংসের নিষ্ঠুর ভয় চূর্ণ করে, এসো প্রাণের ভুবন কর পূর্ণ।...
>
> ওরা তিন মানবশ্রেষ্ঠ আজ দুপুরে আসছে রাজধানীর শহর সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের এই ঢাকা নগরীতে। হাজার হাজার মানুষ আজ আকুল আগ্রহে অধীর প্রতীক্ষায় ক্ষণ গুনছে তোমাদের প্রাণ ভরে জানাবে অভিনন্দন, জানাবে প্রাণপর্শী সংবর্ধনা।



গভর্নমেন্ট হাউজের সংবর্ধনা সভায় নভোচারীরা

২৭ অক্টোবরের *দৈনিক পাকিস্তান*-এ প্রকাশ পায় :

> মানুষের যুগযুগান্তরের সংস্কারকে ভেঙ্গে দিয়ে যে তিনজন মাটির মানুষ চন্দ্রপৃষ্ঠে বিচরণ করে ফিরে এসেছেন, সেই চন্দ্রবিজয়ী বীর মার্কিন নভোচারী নীল এ আর্মস্টং, এডউইন ই অলড্রিন ও মাইকেল কলিন্স আজ সোমবার ঢাকা আসছেন।
>
> মানব ইতিহাসে যুগান্ত সৃষ্টিকারী অ্যাপোলো-১১ অভিযানের চন্দ্রবিজয়ী এই বীর সন্তানদের আজ ঢাকা নগরীর মানুষ প্রাণঢালা অভিনন্দন জানাবে। এই উপলক্ষে ঢাকা নগরকে উৎসবের বেশে সাজানো হয়েছে। এই মহাশূন্যচারীদের চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের মুহূর্তটির জন্য যেভাবে মানুষ গভীর আগহে প্রতীক্ষা করেছিল তাদের একনজর দেখার জন্যও আজ এখানকার লক্ষ লক্ষ মানুষ উন্মুখ হয়ে আছে।...
>
> ঢাকা বিমানবন্দরে প্রাদেশিক চীফ সেক্রেটারী জনাব শফিউল আজম তাদের অভ্যর্থনা জানাবেন। নেতৃস্থানীয় এবং গণ্যমান্য নাগরিকবৃন্দ এবং পাকিস্তানস্থ মার্কিন কূটনৈতিক মিশনের সদস্যগণও বিমানবন্দরে উপস্থিত থাকবেন।

২৭ অক্টোবরের *ইত্তেফাক* পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হয় :

> 'কালের যাত্রার পদধ্বনি' চকিত বিস্ময়ে স্তব্ধ করিয়া দিয়া রূপকথার চাইতেও বিস্ময়কর রূপকথার সৃষ্টি করিয়া নতুন যুগের নতুন ইতিহাসের দ্বার উম্মোচনকারী বীর নভোচারীত্রয় আজ ঢাকার মাটিতে পদার্পণ করিবেন। মানব জাতির শত সহস্র বৎসরের ধ্যান ধারণাকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া সন্দেহে-বিশ্বাসে দোদুল্যমান কোটি কোটি পৃথিবীবাসির আগ্রহচঞ্চল বক্ষের দুরু দুরু স্পন্দন ক্ষণিকের জন্য থামাইয়া দিয়া আজ হইতে প্রায় তিনমাস কাল পূর্বে এমনি এক সোমবারের বেলা দ্বিপ্রহরে মর্ত্যভূমির যে তিন "অমৃতস্য পুত্রাঃ" চন্দ্রের প্রশস্ত বুকে বিজয় কেতন উড্ডীন করিয়া ইতিহাসের সকল রোমঞ্চকর অভিযানের কাহিনীকে নিষ্প্রভ করিয়া দিতে



হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের সংবর্ধনায় অভিযাত্রীরা, আলোকচিত্র : সাইদা খানম

পারিয়াছেন, অ্যাপোলো-১১-এর সেই দুঃসাহসী সারথীদের অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য পূর্ব পাকিস্তান আজ তাহার সবুজ শ্যামলিমার স্নিগ্ধতা লইয়া অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে।...

তাঁহাদের বিজয়কে আমরা শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজয় মনে করি নাই। যুগে যুগে দেশে দেশে যত বৈজ্ঞানিক, যত কারিগর, যত শিল্পী সাধক, যত চিন্তাবিদ সভ্যতার গতিপ্রবাহে বিন্দু বিন্দু বারিসিঞ্চন করিয়াছেন, যত শ্রমিক, যত কৃষক শ্রমের মূল্যে নব নব সংযোজনে সমৃদ্ধির ভান্ডার ভরিয়া তুলিয়াছেন, এ বিজয়কে তাহাদের সমবেত প্রচেষ্টার চূড়ান্ত ফসল মনে করিয়াছি। তাই তাঁহাদের সাফল্যকে মানব সভ্যতার ইতিহাসে নতুনতম অধ্যায়ের সূচনা হিসাবে আমরা অভিনন্দিত করিয়াছি। আজ তাহারা আমাদের কাছে আসিতেছেন। আমরা তাহাদের প্রাণঢালা স্বাগত জানাই।

মর্নিং নিউজ ২৭ অক্টোবরের সম্পাদকীয়তে লেখে :

আজ ঢাকার জন্য বস্তুত একটি গুরুত্বপূর্ণ দিবস হতে যাচ্ছে, কারণ এ পর্যন্ত বিশ্বের মাত্র কয়েকটি শহর এ মানুষগুলিকে অভ্যর্থনা জানানোর সৌভাগ্য অর্জন করেছে, যারা কিনা যুগযুগ ধরে লালিত মানুষের স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করে মানব ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা করেছে।

২৭ অক্টোবর *মর্নিং নিউজ* পত্রিকায় চন্দ্রবিজয়ীদের সম্ভাষণ জানিয়ে ঢাকা থেকে লেখা এস এ আলমের একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। তিনি লেখেন :

চলুন আমরা যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাপোলো ১১-এর নভোচারীদের অভিনন্দন জানাই, যারা চাঁদে প্রথম পদার্পণ করে ইতিহাসের সৃষ্টি করেছে।

আসুন তাদের পাকিস্তান সফরকালে আমরা তাদের ঐতিহাসিক কৃতিত্বের জন্য অভিনন্দন জানানোর সুযোগ নেই। অজানাকে জানার জন্য মহাশূন্য জয়ে তাদের মহাকাব্যিক সফলতা যেন মানব জাতি ও প্রাচ্যের মানুষের সেবায় অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে।

আমরা আশা করবো যে এই অভিযান ও সফলতা আমাদের বিবাদগ্রস্থ বিশ্বে সভ্যতা এবং মানুষের সুখ ও শান্তির পথে অগ্রযাত্রায় সহায়তা করবে।

নভোচারীদের রাত্রিনিবাস

চন্দ্রবিজয়ীদের ঢাকায় অবস্থান ও রাত্রিযাপনের জন্য সে সময়ের একমাত্র পাঁচতারকা হোটেল, ১১তলাবিশিষ্ট হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালকে বেছে নেওয়া হয়। হোটেলের মোট ২৯৬টি কামরার মধ্যে ৬৭টি চন্দ্রবিজয়ী ও তাদের সফরসঙ্গীদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়। চন্দ্রবিজয়ীদের কামরাগুলোকে হিউস্টনে তাঁদের বাসগৃহের পরিবেশে সাজানো হয়। স্থানীয় শিল্পীদের আঁকা ছবিও কক্ষসজ্জায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। হোটেলে কড়া নিরাপত্তাব্যবস্থা নেওয়া হয়।

চন্দ্রবিজয়ীদের আগমনের পর থেকে বিদায় গ্রহণ পর্যন্ত হোটেলে প্রবেশের জন্য বিশেষ পাস বরাদ্দ করা হয়। ২৭ অক্টোবর সকাল থেকে চন্দ্রবিজয়ীদের হোটেল ত্যাগ করা পর্যন্ত বিশেষ পাস ছাড়া হোটেলে প্রবেশ সীমিত করা হয়। চন্দ্রবিজয়ীদের মাত্র একদিনের খাওয়ার প্রস্তুতির জন্য হোটেল কর্তৃপক্ষ মার্কিন ও ইউরোপীয় পাচকের ব্যবস্থা করে, তবে খাদ্যতালিকায় পাশ্চাত্য মেন্যুর পাশাপাশি উপমহাদেশীয় মেন্যুও রাখা হয়।

পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকার বিত্তশালী ও উৎসাহীরা চন্দ্রবিজয়ীদের কাছ থেকে দেখা ও পাশাপাশি থাকার আগ্রহে ঢাকায় আগমনের ফলে ২৭ অক্টোবরের আগেই হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের সব কামরা ভাড়া হয়ে যায়। লাহোর ও করাচি থেকে অনেক মার্কিন নাগরিকও ঢাকা

আগমনের ফলে বিমানের টিকিট ও মানসম্পন্ন হোটেলে কামরা পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

২৭ অক্টোবর *ইত্তেফাক* পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায় যে চন্দ্রবিজয়ীদের শোভাযাত্রার জন্য নির্দিষ্ট পথে দুপুর সোয়া ১২টা থেকে বেলা সোয়া দুইটা পর্যন্ত গণপরিবহন ও অন্যান্য যানবাহনকে চলাচল না করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। একই পত্রিকা থেকে আরও জানা যায় যে চন্দ্রবিজয়ীদের ঢাকা সফরের ওপর একটি বিশেষ টিভি প্রতিবেদন পশ্চিম পাকিস্তানের টেলিভিশনে ২৮ অক্টোবর প্রদর্শন করা হবে।

সেই মাহেন্দ্রক্ষণ

২৭ অক্টোবর দুপুর ১২টা ১৫ মিনিটে চন্দ্রবিজয়ীদের নিয়ে 'এয়ারফোর্স ওয়ান' ঢাকার মাটি স্পর্শ করে। নভোচারীদের সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য এ সময়ে দশ হাজারেরও বেশি উৎফুল্ল জনতা বিমানবন্দরের বিমান ভবন, টারমাক ও আশপাশের এলাকায় উপস্থিত ছিল। জনতার বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে প্রথমে আর্মস্ট্রং ও তাঁর পেছনে পেছনে অলড্রিন, কলিন্স, মিসেস কলিন্স ও মিসেস অলড্রিন বিমান থেকে নেমে আসেন। মিসেস আর্মস্ট্রং অসুস্থ থাকায়, তিনি বিমানেই অবস্থান করেন।

পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্রের ছোট ছোট পতাকা দিয়ে বিমানবন্দরকে চমৎকারভাবে সাজানো হয়। বিমানবন্দরের প্রবেশপথে নভোচারীদের তিনটি বিরাট ছবিও টাঙানো ছিল। একটি বিরাট ব্যানারে লেখা ছিল, 'আপনাদের সাফল্যে সমগ্র মানবজাতি গৌরবান্বিত'।

বিমানবন্দরের ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে ২৯ অক্টোবরের *দৈনিক পাকিস্তান*-এ প্রকাশ পায় :

> সোমবার রাজধানী ঢাকা শহর উৎসব মুখর বেশ ধারণ করে। সকাল হতেই রাস্তার দুপাশে জনতার ভীড় বাড়তে থাকে। বিমানবন্দরের আশপাশে এবং ছাদে তিল ধারণের স্থান ছিল না। দুপুর সোয়া বারোটায় হোয়াইট হাউজের বিশেষ বিমানটি যখন বিমানবন্দরের টারমাকে এসে থামে তখন পুলিশের বেস্টনি ভেঙে উৎসাহী জনতা বিমানের সিড়ির দিকে দৌড়াতে শুরু করে। পুলিশ অনেক চেষ্টা করেও এদের পুরোপুরি আয়ত্তে আনতে পারেনি। পুলিশ প্রায় ৫ মিনিট ধরে অনেক চেষ্টার পর মহাশূন্যচারীদের বিমান থেকে আসার জন্য পথ করে দেন। আর্মস্ট্রং, কলিন্স ও অলড্রিন এবং তাদের পত্নীরা বিমান থেকে বেরিয়ে এলে বিরাট জনতা হর্ষধ্বনি করে তাদের অভিনন্দন জানায়। নভোচারীরাও হাত উঠিয়ে জনতাকে তাদের অভিনন্দনের জবাব দেন।

বি বার্নস নভোচারীদের সাথে 'প্রজেক্ট জায়ান্ট স্টেপ'-এ অংশ নিয়েছিলেন এবং বাংলাদেশে এসেছিলেন। ঢাকায় বিমান থেকে অবতরণের পর তাঁর অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলেন :

> এর চেয়েও কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার অভিজ্ঞতা হয়েছিল ঢাকায় (পূর্ব পাকিস্তান)। আমরা যখন বিমানাঙ্গনের দিকে এগোচ্ছিলাম তখন বিমানবন্দরে নভোচারীদের দেখার জন্য অপেক্ষমাণ জনতাকে দেখা যাচ্ছিল। নামার সাথে সাথে ক্রুদের বিমানের ইঞ্জিন বন্ধ করে দিতে হয়, কারণ জনতা সকল নিয়ন্ত্রণব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলে বিমানাঙ্গনের দিকে দৌড়ে আসতে থাকে। যেহেতু আমরা টার্মিনাল পর্যন্ত যেতে পারলাম না, তাই হোটেল পর্যন্ত আমাদের শোভাযাত্রায় অংশ নেওয়ার জন্য মটরগাড়িগুলোকে বিমানের কাছে পাঠানো হলো। দিনটি উষ্ণ ছিল। বেশ উষ্ণ।

চন্দ্রবিজয়ীগণ একটি খোলা শেভ্রলে গাড়িতে ওঠেন। গাড়ির ডান দিকে আর্মস্ট্রং, বাঁ দিকে অলড্রিন আর মধ্যে কলিন্স বসেন। পেছনের গাড়িতে ছিলেন নভোচারীদের পত্নীদ্বয়। তদের পেছনে নিরাপত্তা বাহিনীর গাড়ি আর তারপর সাংবাদিকদের বাস। চন্দ্রবিজয়ীদের গাড়ির সামনে ছিল ফটোগ্রাফারদের জন্য খোলা ট্রাক। শোভাযাত্রা বেরিয়ে যাওয়ার কিছু পরে অসুস্থ মিসেস আর্মস্ট্রং সরাসরি হোটেলে চলে আসেন।

নভোচারীদের গাড়ির মিছিল ময়মনসিংহ রোড (বর্তমান এয়ারপোর্ট রোড) ধরে যাত্রা শুরু করে। পথে সর্বত্র হাজার হাজার জনতা বিপুল হর্ষধ্বনি ও করতালি দিয়ে তাঁদের অভিনন্দন জানায়। রাস্তার দুপাশের মানুষ পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা আন্দোলিত করে সংবর্ধনা জানাবার সময় অনেকে গাড়ির পাশে ছুটে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে করমর্দন করেন।

মহাশূন্যচারীদের মোটর শোভাযাত্রা যখন রাস্তা অতিক্রম করছিল, তখন উচ্ছ্বসিত যুবক-যুবতীরা কেউ ফুলের মালা, কেউ ফুলের তোড়া, কেউ ফুলের পাপড়ি তাঁদের দিকে ছুড়ে দেয়। কেউ কেউ আবার বাছাই করা কয়েকটি ইংরেজি শব্দ তাঁদের লক্ষ্য করে উচ্চারণ করে। যারা পথের পাশে জায়গা পায়নি তারা বাড়ির দোতলা বা তিনতলার বারান্দায়, ছাদে, পাঁচিলে, এমনকি গাছে দাঁড়িয়ে করতালি দিয়ে তাঁদের অভিনন্দন জানায়। নভোচারীরাও হাত নেড়ে তাদের অভিনন্দন গ্রহণ করেন। এ দিন ঢাকার কর্মচঞ্চল জীবন সম্পূর্ণভাবে স্তব্ধ হয়ে যায়। জনতা নভোচারীদের একটুখানি পরশ পাওয়ার জন্য পুলিশ বেষ্টনী ভেদ করে বহু জায়গায় তাঁদের গাড়ি ঘিরে ফেলে। কারওয়ান বাজারের কাছে এক যুবতী অলড্রিনের সাথে হাত মেলাতে পেরে অপার আনন্দে রাস্তায় রীতিমতো নাচ শুরু করে দেয়। কারওয়ান বাজার পেরিয়ে আর একটু আগে গেলে আরও দুই যুবতী রাস্তার পাশ থেকে ছুটে এসে অলড্রিনের সাথে হাত মেলান। অলড্রিন যুবতীদ্বয়ের হাত ছুঁয়ে নিজের হাতে চুমু খান।

জনতার উচ্ছ্বাস দেখে ২৯ অক্টোবর *দৈনিক পাকিস্তান*-এ প্রকাশ পায় :

> রাস্তার দুপাশের মানুষ হাত বাড়িয়ে তাদের একটুখানি স্পর্শ করার জন্য প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ার উপক্রম। যেন আকাশের চাঁদ তারা হাতে পেয়েছে এমনি ধরনের একটা অবস্থা সবাই তা নিয়ে লোফালুফি করতে চাচ্ছে।

পাকিস্তান রেডিওর শাহবাগ অফিসের কাছে নভোচারীদের পত্নীদের গাড়ি বিকল হয়ে গেলে তাঁরা অপর একটি গাড়িতে আরোহণ করেন। নভোচারীদের পত্নীদের গাড়ি বদলের বর্ণনা দেন জেনেভা বি বার্নস :

> আমি যে গাড়িতে ছিলাম সেখানে নভোচারীদের পত্নীদের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা একজন কর্মী আসেন এবং জানান যে তারা আমাদের গাড়িটি নভোচারীদের পত্নীদের ব্যবহারের জন্য নেবেন, এ কারণে আমাদের গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার অনুরোধ করেন। সহৃদয়তা দেখিয়ে, অন্য গাড়ির সন্ধান করতে লাগলাম যা কিনা খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ল, কারণ জনতা সবগুলি গাড়ির মধ্যে মিলেমিশে গিয়েছিল। অপরিহার্যভাবে, চালকেরা পূর্বের গাড়িকে অনুসরণ না করে নিজেদের চেষ্টামতো পথ বের করে নিচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত আমরা একটা ছোট গাড়িতে জায়গা পেলাম এবং এর পিছনের আসনে ঠাসাঠাসি করে একে অপরের কোলে বসলাম। সম্ভবত এটিই আমার সবচেয়ে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা ছিল। আমি মাটিতে পড়ে যাওয়ার মতো ভয় পেয়েছিলাম।

প্রহরায় থাকা পুলিশের বেশির ভাগ



ঢাকার লাট ভবনের সংবর্ধনায় চন্দ্রবিজয়ীরা

জ্ঞাপন করেন। প্রায় এক ঘণ্টা সফরের পর নভোচারীরা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে এসে পৌছান। বিমানবন্দরে ও নভোচারীদের নির্দিষ্ট ৯ মাইল পথে প্রায় দুই লক্ষ লোক নভোচারীদের দেখার জন্য ভিড় করেছিল বলে *পূর্বদেশ*-এ প্রকাশ পায়। আসিফ সিদ্দিকী নামের একজন বাংলাদেশি একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আর্মস্ট্রং-এর সঙ্গে যোগাযোগ করলে আর্মস্ট্রং ঢাকা সফরের মোটর শোভাযাত্রা নিয়ে মন্তব্য করেন :

> আমি এখনো আমার ঢাকা সফরের কথা মনে করতে পারি, আমি যদি ভুল না করে থাকি তবে তাকে পূর্ব পাকিস্তান বলা হতো। হয়তো কখনো ঘটে থাকতে পারে তবুও কদাচিৎ, আপনি যে মোটর শোভাযাত্রার কথা উল্লেখ করলেন তা দেখার জন্য জনতার মধ্যে একধরনের প্রবল উৎসাহ লক্ষ করেছি।

সদস্য নিজেদের দায়িত্ব ভুলে দর্শককে রূপান্তরিত হওয়ায় পথের বিভিন্ন জায়গায় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় এবং সংযত দর্শকদের পক্ষে নভোচারীদের দেখা কষ্টকর হয়ে পড়ে। একপর্যায়ে মোটর শোভাযাত্রা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। জেনেভা বি বার্নসের মতে, 'জনতার ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না।'

কিছুক্ষণ নিখোঁজ

নভোচারীদের বহনকারী গাড়িটি মূল শোভাযাত্রা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এ বিষয়ে ২৯ অক্টোবরের *পূর্বদেশ* লেখে :

> বিশ্বের ইতিহাসে যাদের নাম অনন্য, সেই তিন চন্দ্রবিজয়ী মানব প্রাচ্যের এক ক্ষুদ্র শহর ঢাকায় প্রায় দশ মিনিটের জন্য হারিয়ে গিয়েছিলেন। অন্তত তাঁদের পত্নীদের কাছে তাঁরা হয়েছিলেন নিখোঁজ। আর্মস্ট্রং, অলড্রিন আর কলিন্স সোমবার বিমানবন্দর থেকে মোটর মিছিল যোগে শাহবাগের চৌমাথার নিকট এসেই তাঁরা নিখোঁজ হয়ে যান। সে সময় তাঁদের স্ত্রীদের বহনকারী গাড়িটি বিকল হয়ে পড়ায় মোটর মিছিলটি থেমে যায়। কিন্তু নভোচারীদের বহনকারী খোলা গাড়িটি থামেনি। তাঁরা সবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। পত্নীদের কাছে তাঁরা তখন নিখোঁজ। নভোচারীদের গাড়িটি দ্রুতবেগে শহরের নির্দিষ্ট পথে ছুটতে থাকে—অবশ্য সিকিউরিটি বা প্রহরার অভাবেই তাঁদের দ্রুতবেগে এগোতে হয়েছিল। সে সময় তাঁদের প্রধান প্রহরীর কাজ করেছে ছয়টি স্কুটারের বারজন দুঃসাহসী যুবক। প্রায় দশ মিনিট কাল-ব্যাপী নভোচারীগণ তাদের প্রহরায় শহরের পূর্ব নির্ধারিত পথে ঘুরে বেড়াবার পর তাঁদের সন্ধান মেলে।
>
> এই সময়ের মধ্যে নভোচারীদের পত্নীগণই ছিলেন সবচেয়ে বেশী উদ্বিগ্ন—এমনকি হয়তো হোয়াইট হাউজের ব্যক্তিদের চেয়েও বেশী।
>
> আর সেই স্কুটারধারী যুবকগণ বিমান বন্দর থেকেই নভোচারীদের গাড়ির পেছন পেছন আসছিল। তারা ইচ্ছাকৃতভাবে কর্তৃপক্ষের পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচী নাকচ করে দিয়ে মোটর মিছিলের মধ্যে নিজেদের স্থান করে নেয়। বহু নিষেধের পরও দুর্ঘটনার আশংকা থাকা সত্ত্বেও তারা এক স্বঘোষিত দুঃসাহসিক আনন্দাভিযান চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারাই হয়ে দাঁড়ায় 'নিখোঁজ নভোচারীদের প্রহরী।'

স্মৃতি হাতড়ে আর্মস্ট্রং

এদিন শহরের অধিকাংশ শিক্ষায়তন অঘোষিতভাবে বন্ধ হয়ে যায়। শিক্ষকদের সাথে ছাত্রছাত্রীরা রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। হাইকোর্ট হতে পার্ক এভিন্যু ও মিন্টো রোড হয়ে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল পর্যন্ত পথে স্কুল-কলেজের ছাত্রী ও মহিলারা সুশৃঙ্খলভাবে নভোচারীদের সংবর্ধনা

কর্মব্যস্ত সময়

পাকিস্তান টেলিভিশনের ঢাকা কেন্দ্র অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান ও শোভাযাত্রার ওপর ভিত্তি করে আধ ঘণ্টার প্রোগ্রাম সরাসরি টেলিকাস্ট করে। সন্ধ্যায় রেডিও পাকিস্তান চন্দ্রবিজয়ীদের ঢাকা সফরের ওপর একটি বিশেষ অনুষ্ঠান পরিচালনা করে।

হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে পৌছানোর পর নভোচারীরা আনুমানিক আড়াইটার সময় হোটেলেই পত্রিকা, রেডিও ও টেলিভিশন সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় যোগ দেন। এক ঘন্টার এই সভায় নভোচারীরা সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। সভায় চন্দ্রাবতরণের একটি প্রামাণ্যচিত্রও প্রদর্শন করা হয়, বিভিন্ন পর্যায়ে নভোচারীরা ছবির ধারাবিবরণী দেন।

দৈনিক *ইত্তেফাক* এই সম্মেলনকে 'ঢাকার ইতিহাসে বৃহত্তম সংবাদিক সম্মেলন' বলে উল্লেখ করে। বাংলাদেশের প্রথম মহিলা ফটোসাংবাদিক সাঈদা খানম সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁর স্মৃতি থেকে উল্লেখ করেন :

> দেখলাম (সংবাদ সম্মেলনে) বেশ কড়াকড়ি। প্রেস ফটোগ্রাফার হিসেবে আমাকে ঢুকতে দেয়। স্বল্পমেয়াদি অনুষ্ঠানে সংক্ষেপে তারা অভিজ্ঞতার কথা বলে। ফটো তুলে কিছুক্ষণ পর বাইরে বেরিয়ে এদিক ওদিক ঘুরতেই দেখি গাড়ির মধ্যে মাইকেল কলিন্স একা বসে রয়েছেন। হাতে একটা গোলাপ ফুল নিয়ে গভীরভাবে নিরীক্ষণ

করছেন। একটু অবাক হয়ে গেলাম, চাঁদের রহস্য উদ্‌ঘাটনের পর ফুলের ভেতর কী রহস্য খুঁজছেন। যে এই ফুলটি দিয়েছে সে কিন্তু ধন্য।

সংবাদ সম্মেলনের প্রশ্ন-উত্তর নিয়ে ২৯ অক্টোবর দৈনিক *ইত্তেফাক*-এ একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন প্রকাশ পায়। তার কিছু প্রশ্নোত্তর এ রকম :

প্রশ্ন : পাকিস্তানের এই অঞ্চল সফর এবং চন্দ্র অভিযান সম্পর্কিত ছবি প্রদর্শনের জন্য এদেশের সাংবাদিকদের পক্ষ হইতে আমরা উপস্থিত সাংবাদিকরা আপনাদের—মানবজাতির কৃতী সন্তানদের—কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আমাদের জনগণ আপনাদের যে সম্বর্ধনা জানাইয়াছে, সে সম্পর্কে আপনাদের মনোভাব কি?

উত্তর : সর্বত্রই উৎসাহী জনতার সাক্ষাৎ পাইলেও আমাদের সফরের পথে কোথাও জনতার মধ্যে এত উদ্দীপনার পরিচয় পাই নাই। ঢাকার জনগণ আমাদের যে প্রাণঢালা সম্বর্ধনা জানাইয়াছেন, উহাতে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। পরে গভর্ণরের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে মিলিত হইতে পারিয়া আমরা আরও খুশি হইব। অবশ্যই ইহা এদেশে আমাদের সর্বশেষ সফর হইবে না। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে এ সফর অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। অ্যাপোলো ১২-এর ব্যাপারে আমাদের ১৪ই নভেম্বরের মধ্যে ফিরিয়া যাইতে হইবে। সে কারণেই আমরা সমস্ত কর্মসূচী সংক্ষিপ্ত করিতে বাধ্য হইয়াছি। তবে আজ এখানে আসিতে পারাটা আমাদের কাছে আনন্দদায়ক হইয়াছে—আমরা এই দিনটিকে প্রাণ ভরিয়া বরণ করিয়া নিতেছি।

প্র : মিঃ আর্মস্ট্রং, আপনি কি মনে করেন যে, আপনাদের বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত মহাশূন্যযানের সাহায্যে এই মুহূর্তে চন্দ্র ছাড়া অন্য গ্রহ-গ্রহান্তরের অভিযান পরিচালনা সম্ভব?

উ : আমাদের বর্তমান মহাশূন্যযানের বহিরাকৃতি চন্দ্র ছাড়া অন্য গ্রহে যাওয়ার উপযোগী নয়। তবে আমাদের বিশ্বাস, অন্ততঃ চন্দ্রের নিকটবর্তী গ্রহে অভিযান পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক ধারণা আমাদের রহিয়াছে। আগামী দশকের মহাশূন্য অভিযান কর্মসূচীতে আমরা এই ধরনের সম্ভাবনা অন্তর্ভুক্ত করার আশা রাখি। আমাদের রাষ্ট্রপ্রধান জাতিসংঘে এবং অন্যান্য কয়েক জায়গায় প্রদত্ত ভাষণে মহাশূন্য অভিযানে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন। আমরা মনে করি, বিশ্বের মানুষের কল্যাণে এই প্রচেষ্টায় জ্ঞান ও দক্ষতা দিয়া সহযোগিতার সঙ্গে কাজ করার জন্য বিশ্বের বিজ্ঞানীদের ইহা একটি আশ্চর্য সুযোগ।...

...প্র : আপনারা আজ অত্যন্ত জনপ্রিয়। আপনাদের পক্ষে কি রাজনীতিতে পদার্পণ করিয়া জনমত সংগঠনের মাধ্যমে সরকারকে শান্তির সপক্ষে আরও সক্রিয় করিয়া তোলা সম্ভবপর?

উ : একটি উত্তম প্রস্তাব।...এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকিবে।

প্র : মিঃ আর্মস্ট্রং, আপনি বহু দেশ সফর করিয়াছেন। কোন দেশ আপনাকে সবচাইতে বেশী আকৃষ্ট করিয়াছে?

উ : এই সফরের পথে পথে আমরা হরেক রকমের দেশ, বিচিত্র মানুষের দেখা পাইয়াছি। কিন্তু আমরা দেশ-দেশান্তরের জনসাধারণের মধ্যে পার্থক্যের চাইতে মিল বেশী দেখিতে পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছি। তাহাদের মধ্যে দেখিয়াছি বন্ধুত্বসুলভ মনোভাব, সহযোগিতা ও একত্রে কাজ করার এবং সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হওয়ার প্রবণতা।...

সহধর্মিণীরাও ছিলেন ব্যস্ত

একই সময় হোটেলের আর একটি কক্ষে চন্দ্রবিজয়ীদের স্ত্রীদ্বয় (মিসেস আর্মস্ট্রং ব্যতীত) পূর্ব পাকিস্তানের ৩০ জন মহিলা সাংবাদিকের সাথে ঘরোয়া আলাপচারিতায় মগ্ন হন। অনুষ্ঠানের শুরুতে ঢাকায় ইউএসআইএসের পরিচালক ব্রায়ান বেলের স্ত্রী মিসেস সুই বেল উপস্থিত সাংবাদিকদের সাথে নভোচারীদের স্ত্রীদ্বয়কে পরিচয় করিয়ে দেন। পরবর্তীকালে আলাপচারিতার একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি ইউএসআইএসের সূত্রে ৩০ অক্টোবরের *পূর্বদেশ*সহ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ পায় :

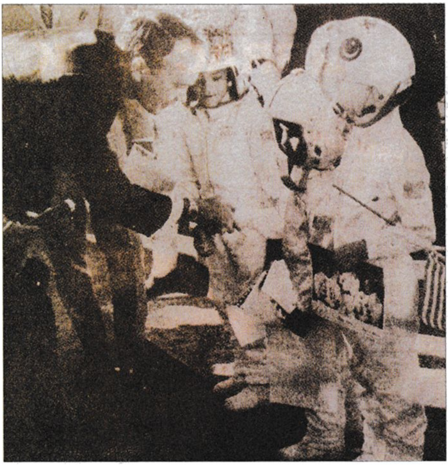
মিসেস প্যাট্রিসিয়া কলিন্স ও মিসেস জোয়ান অলড্রিন গত সোমবার ঢাকায় এক ঘরোয়া সংবাদ সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় ৩০ জন সাংবাদিকের স্ত্রী ও মহিলা সাংবাদিকদের কাছে মহাশূন্যচারীদের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে ও মহাশূন্য অভিযানকে নভোচারীদের স্ত্রীরা কোন দৃষ্টিতে দেখেন তার বর্ণনা দান করেন। মিসেস জ্যানেট আমস্ট্রং কিছুটা অসুস্থ ছিলেন বলে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পারেননি। মহাশূন্যচারীদের স্ত্রীরা স্বীকার করেন যে, তাদের স্বামীদের মহাশূন্য অভিযানকালে তারা সকলেই 'উত্তেজনা কিন্তু আনন্দ' অনুভব করেছেন। মিসেস অলড্রিন বলেন, সেই চরম মুহূর্তটির বেলায় আমরা সকলেই অনুভব করেছি যে, 'সমগ্র বিশ্ববাসী এক'। তিনি বলেন যে তাদের স্বামীরা যে তথা থেকে আর প্রত্যাবর্তন নাও করতে পারেন তারা জানতেন। তবে তিনি বলেন যে, মহাশূন্যচারীদের তিনজনই টেস্ট পাইলট ছিলেন এবং তারা সামরিক বাহিনীতেও ছিলেন। মিসেস অলড্রিন বলেন, সেই সময় আমরা কিছুকাল যাবত এক প্রকার অনিশ্চয়তার মধ্যেও কাটিয়েছি।

তিনি উল্লেখ করেন যে, এডউইন অলড্রিন বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তে তার সাথে টেলিফোনে কথা বলেছিলেন এবং তা ছিল শেষ বিদায় নেওয়ার মতই।

মিসেস কলিন্স ও মিসেস অলড্রিন উভয়েই জানান যে, তারা সমগ্র বিশ্বের জনগণের নিকট থেকে হাজার হাজার চমৎকার পত্র লাভ করেছেন এবং এখনও এইরূপ পত্র ও টেলিফোন কল পাচ্ছেন। তাদের টেলিফোন নম্বর এখনও সাধারণ টেলিফোন বুক-এ তালিকাভুক্ত রয়েছে এবং বর্তমান সফরে বের হওয়ার সময় পর্যন্তও তা এরূপ তালিকাভুক্ত ছিল।

সংবর্ধনা

বিকেলে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ভাইস অ্যাডমিরাল এস এম আহসান গভর্নর হাউসে (বর্তমান বঙ্গভবন) চন্দ্রবিজয়ী ও তাঁদের পত্নীদের সংবর্ধনা জানান। গভর্নর হাউসের উত্তরের খোলা চত্বরে এই আড়ম্বর ও জাঁকজমকপূর্ণ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে 'খ' অঞ্চলের (পূর্ব পাকিস্তান) সামরিক শাসক লে. জেনারেল শাহেবজাদা ইয়াকুব খান, বিশ্ববিদ্যালয়সহ শহরের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও ছাত্রগণ, উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তারা, রাজনৈতিক, শ্রমিক ও ছাত্রনেতারা, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বয়স্কাউট ও গার্ল গাইডস এবং শহরের বিশিষ্ট নাগরিকেরাসহ কয়েক শত মানুষ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে মহিলা ও শিশুদের উপস্থিতিও নজর কাড়ার মতো ছিল।



ব্যাংককের উদ্দেশ্যে ঢাকা ছাড়ার আগে বিমানবন্দরে মাইকেল কলিন্স হাত মেলাচ্ছেন নভোচর সেজে আসা তিন কিশোরের সঙ্গে

গভর্নর হাউসের উত্তরের বারান্দা থেকে মাঠ পর্যন্ত চন্দ্রবিজয়ীদের প্রবেশপথে লালগালিচা বিছানো হয়। ফ্যানফেয়ারের মাধ্যমে নভোচারীদের আগমনবার্তা জানানো হলে মহিলা ও শিশুরা গালিচার দুপাশে এসে দাঁড়ান। গভর্নর সমভিব্যাহারে নভোচারী ও তাঁদের পত্নীরা খোলা প্রাঙ্গণে এসে পৌঁছালে সকলে দাঁড়িয়ে করতালি দিয়ে তাঁদের অভিনন্দন জানান। প্রথমে, গভর্নর নভোচারীদের উদ্দেশ্যে স্বাগত ভাষণ দেন।

ভাষণ শেষে পূর্ব পাকিস্তান জিওলজিকাল সোসাইটির পক্ষ থেকে তিনি নভোচারীদের একটি করে স্বর্ণপদক উপহার দেন। পূর্ব পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে নভোচারীদের পত্নীদেরও প্রীতি উপহার দেওয়া হয়। এরপর নভোচারীরা বক্তব্য দেন।

বক্তৃতা শেষে আর্মস্ট্রং গভর্নরকে চাঁদে রেখে আসা একটি ডিস্কের রেপ্লিকা ডিস্ক উপহার দেন। চাঁদের পিঠে রেখে আসা মূল ডিস্কটিতে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানসহ ৭৩ জন বিশ্বনেতার বাণীসহ স্বাক্ষর ছিল। ডিস্কের লেখাগুলো খুব ছোট হওয়ায় তা পড়ার জন্য কলিন্স গভর্নরকে একটি আতশি কাচ দেন। অলড্রিন গভর্নরকে চাঁদে রেখে আসা নিক্সন, আর্মস্ট্রং, কলিন্স ও তাঁর নিজের স্বাক্ষর করা বাণীর একটি নকল দেন। পরবর্তী সময়ে গভর্নর এবং নভোচারী ও তাঁদের পত্নীরা অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের মধ্যে ঘুরে বেড়ান। শিশু-কিশোরসহ অনেক অটোগ্রাফশিকারি নভোচারীদের কাছে এসে অটোগ্রাফ নেওয়ার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হয়। অনুষ্ঠান চলাকালে নেপথ্যে সেনাবাহিনীর বাদক দল জনপ্রিয় কিছু সুর বাজাতে থাকে। এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে ২৯ অক্টোবরের *মর্নিং নিউজ*-এ লেখা হয় :

> বোধ হয় সাম্প্রতিক সময়ে গভর্নর হাউজের কোন সংবর্ধনা সভায় এটিই ছিল সর্বোচ্চ সংখ্যক অতিথির উপস্থিতি। মনে হয় যে যাদের আমন্ত্রণ করা হয়েছিলো তাঁরা সবাই এসেছিলেন। কোন টেবিলেই বিশেষ কোন চেয়ার খালি দেখা যায়নি।

২৭ অক্টোবর দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যাংক, হাবিব ব্যাংক, তিন নভোচারীকে তাদের পক্ষ থেকে একটি করে রৌপ্যপদক উপহার দেয়। পদকে উৎকীর্ণ ছিল, 'এটা একজন মানুষের ছোট পদক্ষেপ হলেও গোটা মানব জাতির জন্য বিরাট উত্তরণ।' হাবিব ব্যাংকের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, 'এই সামান্য উপহার হাজার হাজার হাবিবিয়ানের অন্তর নিঃসৃত প্রীতি ভালোবাসার প্রতীক।'

সংবর্ধনা শেষে চন্দ্রবিজয়ীরা ফিরে আসেন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে এবং রাত যাপন করেন। পরদিন সকালে তাঁরা ব্যাংককের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন।

বিদায়কালে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল থেকে তেজগাঁও বিমানবন্দর পর্যন্ত রাস্তার দুধারে প্রায় দশ হাজার মানুষ দাঁড়িয়ে ছিল। নভোচারীরা তাদের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় তারা উল্লাস করে। বিমানবন্দরেও সহস্র জনতার ঢল নামে। বিমানবন্দরের টার্মিনাল বিল্ডিংসহ সর্বত্র জনতা ভিড় জমায়। বিদায় অনুষ্ঠানে তিনজন শিশুকে চন্দ্রবিজয়ীদের সাজে সজ্জিত হয়ে নভোচারীদের সাথে হাত মেলাতে দেখা যায়।

ওহ! অটোগ্রাফ!

অটোগ্রাফশিকারিদের জন্য প্রথম দিনটি ছিল অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। তাদের পক্ষে নভোচারীদের অটোগ্রাফ সংগ্রহ করা, চন্দ্রবিজয়ের চেয়েও অনেক কঠিন হয়ে পড়ে। সেদিন বিমানবন্দর থেকে শুরু করে গভর্নর হাউসের অনুষ্ঠান পর্যন্ত সব জায়গাতেই অটোগ্রাফশিকারিরা নভোচারীদের ঘিরে ধরেছিলেন। এদের মধ্যে নারী-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো সবাই ছিলেন। কিন্তু তাঁরা কোথাও সুবিধা করতে পারেননি। নিরাপত্তায় নিয়োজিত ব্যক্তিরা অটোগ্রাফপ্রার্থীদের চন্দ্রবিজয়ীদের ধারে-কাছে আসতে দেননি। পরের দিন নভোচারীরা যখন ঢাকা ত্যাগ করছিলেন, তখন কয়েকজন অটোগ্রাফশিকারি সফলতার মুখ দেখেন। তবে অটোগ্রাফ লাভে ভাগ্যবান ব্যক্তিদের বেশির ভাগই ছিলেন নিরাপত্তা রক্ষার কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি। নভোচারীরা অটোগ্রাফ দিচ্ছেন দেখে একটি ৮-৯ বছরের বালক তার অটোগ্রাফের খাতা হাতে করে বিমানের সিঁড়ির কাছে জায়গা করে নিতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু সরকারের জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বালকটিকে কয়েকবার নিরস্ত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তিনি যতবারই বালককে নিরস্ত করার চেষ্টা করেন ততবারই সে মানুষের ফাঁক-ফোকর দিয়ে ঢুকে পড়ে। বালকের এই কাণ্ড দেখে শেষে কর্মকর্তা আর তাঁর হাসি ধরে রাখতে পারেননি।

২১ ঘণ্টা ঢাকায় অবস্থানের পর বিদায়কালে নভোচারীরা বলেন যে ঢাকা সফরের সুযোগ লাভ করে তাঁরা আনন্দিত হয়েছেন এবং এখানে আন্তরিক ও স্বতঃস্ফূর্ত সংবর্ধনা পেয়ে সম্মানিত বোধ করছেন। নভোচারী ও তাঁদের স্ত্রীগণ সবার সাথে করমর্দন করেন ও আনুষ্ঠানিক বিদায় জানিয়ে বিশেষ বিমানে আরোহণ করেন।

উপন্যাস





সচিত্রকরণ : সৈয়দ ইকবাল

নাসরীন জাহান

সিসেমের দ্বিতীয় দরজা

সাঁই সাঁই শব্দের সমান্তরালে ঢেউ উড়ছে। নিঃসীম রাত্রির গভীরতা ফুঁড়ে লঞ্চের ডেকে একটি ছায়া হয়ে সে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে অন্ধকার জলের দিকে। মগজের দপদপ শিরা, দেহের উচ্ছ্বসিত কম্পন শান্ত হয়ে এসেছে। চারপাশে আলোছায়ার সঙ্গম।

চোখ দুটি জ্বালা জ্বালা করছে ওর। মুহূর্তে ঘাই দিয়ে জল ফুঁড়ে জেগে ওঠে সুবর্ণা।

ফের চমকে পেছনে ফেরে। এক পা এক পা করে যেন সে জলের একেবারে কাছে গিয়ে বাতাস দিয়ে মুখ ধুয়ে নিতে চায়।

রাত জেগে ছবি দেখার প্রভাবে স্বপ্নেই বুঝি খুন করেছে সে।

তাই বলে বাস্তবে এমন টাটকা একটা খুন সেরে মধ্যরাতের পথ ধরে পালাবে, ঘটনাটি ঘটার আগে তার কল্পনায়ও ছিল না। সে এমন মানুষই না।

না না, এ স্বপ্নে ঘটেছে। নিজেকে নিজে চিমটি দিয়ে নিশ্চিত হয় মুনতাসির। গ্রীবা উচ্চকিত করে কালো ধোঁয়ার ফেনায় ঢাকা আসমানটার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, এই যে আমি একটা জাহাজে চড়ে নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি দিচ্ছি, এটা আমার দেখা স্বপ্ন নয়তো?

স্বপ্নেও আমি নিজেকে নিজে কত চিমটি দিই। চিমটিতে তাই বিশ্বাস নেই। হে সৃষ্টিকর্তা, এ যেন স্বপ্নই হয়। এমন অমানবিক ভয়ংকর বাস্তবের ঘানি টানা আমার পক্ষে অসম্ভব।

দমভাঙা এক অসহায়বোধে সে ছটফট করে কিছুক্ষণ।

ঘুমই যদি হয়, তবে ভাঙুক। সে এই গলাময় তেতো আর মাঝে মাঝে কেঁপে ওঠার ভয়ার্ত অনুভূতিটা কিছুতেই নিতে পারছে না।

পুরো ঘটনাটি ঘটা, এরপর আঁধার পথ পেরিয়ে ট্যাক্সি ক্যাবের ভাড়া মিটিয়ে লঞ্চের টিকিট কাটা, এসব করেছে সে একটা উদ্‌ভ্রান্ত বোধের মধ্যে।

আদৌ কি সে খুন করেছে?

এই মৃত্যুকাণ্ডকে খুন হিসেবে বিবেচিত করা যায়?

খুন তো মানুষ ঠান্ডা মাথায় প্ল্যান করে করে। সে তো হত্যার আগে সুবর্ণাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবে, এমন কোনো বোধের কথা কল্পনাতেও আনতে পারত না।

দেখতে রোগা-পটকা শ্যামলা চেহারার মিনমিনে স্বভাবের মুনতাসিরের মনটা নাকি ইঁদুরের মতো ছোট?

দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর নিজেদের বাইরে বেশি মানুষের সঙ্গে চলা ঠিক নয়, এমন মতবাদ যে নিজের মধ্যে ধারণ করে তার মনকে আর কী বলা যায়?

আপনিও আমার মতো।

আঁধারের মধ্যে একটি সুন্দর নারীকণ্ঠ ঝনঝন করে ওঠে।

জল থেকে ঘাড় ঘোরায় মুনতাসির।

আসমানে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। লঞ্চের ডেকে হুঁশই ছিল না মুনতাসিরের। বিদ্যুচ্চমকে আবছা দেখা যায় মেরুন শাড়ি পরা ফরসা মুখের কোনো মহিলার অবয়ব।

মুনতাসির গলা পরিষ্কার করে, কী বললেন? আপনার মতো? কী আপনার মতো, বলেই চেতনায় ঠোক্কর খায়, মহিলাও একাকী কি? তার মতো?

তাই তো মনে হচ্ছে। নইলে এত রাতে কোনো পুরুষের সঙ্গে সেধে এসে গল্প করে?

সুবর্ণার কথা ভেবে আমার এ মহিলার ব্যাপারে চূড়ান্ত নির্বিকার থাকা উচিত। অথবা ঘটনা এড়িয়ে যাওয়া, ভেবে বাঁক ঘুরতেই—নীল হয়ে আসা সুবর্ণার মৃত মুখ ভেসে ওঠে।

ভেতরটা হিম হয়ে আসে। এমন মুহূর্তে কারও সাহচর্য থাকা মন্দ নয়।

সাঁই সাঁই শব্দ নয়, চিকন-তিক্ত গানের সুর।

স্রোত থেকে কান সরিয়ে সেও মহিলাটির মতো উচ্চকণ্ঠে প্রশ্ন করে, আমিও আপনার মতো? আপনি কী বলতে চাইছেন?

লক্ষ করছি অনেকক্ষণ ধরে কেমন ভূতের মতো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন।

শিরদাঁড়া দিয়ে কী একটা বয়ে যায় যেন।

যেন বহুকালের খাতির-পরিচয়, মহিলার কণ্ঠের মধ্যে এমন একটা তুমুল জড়তাহীন ভাব।

আপনিও কি একা একা জল দেখছিলেন, আমার মতো? চাঁদহীন রাতে কি লঞ্চ থেকে জল দেখা যায়? মহিলা উৎকণ্ঠিত হয়ে বলে, কেবিনে চলে আসুন, এক্ষুনি বৃষ্টি নামবে।

যেন তিতিরের কুহু—এমন একটা বাক্য মাথায় আসতে স্তম্ভিতবোধে নিস্তব্ধ হয়ে ওঠে সে। লঞ্চের মধ্যে এমন ছায়াচ্ছন্ন মধ্যরাতের মেঘডম্বুর আবহে একাকী এক মহিলা কীভাবে আরেকটি অপরিচিত মানুষের সঙ্গে কথা বলে?

এসব কী হচ্ছে আমার সঙ্গে? ভেবে চিমটি কাটতে যাবে, অমনি ফের হিম হয়ে এল শরীর, নিশ্চিত এ মেয়েটি দু নম্বরি...।

সঙ্গে সঙ্গে রোমকূপ খাড়া হয়ে আসে মুনতাসিরের। সে দারুণ ভয় পায় এ ঘরানার মহিলাদের। একবার একজনের পাল্লায় পড়েছিল। বড়মা বুঝিয়েছে, এ যে সেই ঘরানার মেয়ে।

ওদের আর্ট স্কুলে পেইন্টিং করবে—এই ছলে মেয়েটা কীভাবে জানি ঢুকে পড়ে ব্যবসার ধান্দা করছিল।

পেইন্টিংয়ের প্রতি আগ্রহ ছোটবেলা থেকেই। তাই বড়মার প্রভাবে একটা স্কুলে পেইন্টিং শেখাত সে।

কীভাবে শেখাতে হয় তার পুরোটাই অন্য একজন আর্ট টিচারের মাধ্যমে বড়মা শিখিয়েছিল। কিন্তু স্কুলে গিয়ে স্বপ্ন আর বাস্তবের মধ্যে নিজেকে গুলিয়ে ফেলে ক্লাসের সিস্টেম নষ্ট করত মুনতাসির।

বড়মার প্রভাবের কারণে এটুকু সহ্য করতেই হতো তাদের।

বড়মা-ই তাকে শৈশব থেকে এই অব্দি কী থেকে কী হয়, কীভাবে কী হয় তা তক্কে তক্কে থেকে তুমুল করে শিখিয়েছে।

অনেক জানা মানুষের চেয়ে মুনতাসির জানে বেশি।

এ ছাড়া অত্যন্ত স্পর্শকাতরও সে।

নিজের মধ্যে নিজে কুঁকড়ে গিয়ে সে বিরক্তি নিয়ে ডেকের পাশ থেকে সন্তর্পণে কেবিনের দিকে ফিরতে থাকে, আপনি একা একটি লঞ্চে...আশ্চর্য!

কেন, আপনিও তো একাই লঞ্চে, আলো-আঁধারি থেকে শব্দ ছুটে আসে। আশ্চর্য আমি বলিনি তো? মাথা ঘুরিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল মুনতাসির, ছায়ার ভেতর থেকে একটি নারীর পূর্ণ অবয়ব মূর্ত হতে থাকে। প্লিজ, বলবেন না, আপনি পুরুষ তাই...। এ রকম নারী নারী শুনে কান পচে গেছে।

এমনিতেই মাঝেমধ্যে নিজেকে মূক-বধিরের ন্যায় বোধ করছে মুনতাসির। যখনই সুবর্ণার কথা মনে পড়ছে, তখনই...অবশ্য বেশির ভাগ সময়ই সে নিজেকে একটা উড়ন্ত বেলুন ভেবে রাস্তায়-লঞ্চে ওঠার পরের সময়টায় ভাসানিয়া থেকেছে।

ছায়া মহিলার অবয়ব থেকে ঘ্রাণ আসছে।

কোথায় পালানো যায়?

শৈশবে ফিরে গিয়ে তেমন একটা ঘাপটির উদ্দেশে উড়াল পা বাড়াতেই ছায়া নারীটি যেন উড়ে এসে তার আশ্চর্য দুটি চোখ দিয়ে মুনতাসিরকে গেঁথে ফেলে।

এত বড় একটা কাঁসাবাটি চাঁদ মেঘের এমন তুমুল আড়ালে লুকিয়েছিল, কে জানত?

কেবিনে মানুষ ঘুমন্ত।

কেউ কেউ ঘোরাফেরা করছে ডেকে। এ নিয়ে অস্বস্তিবোধ করার অবকাশটুকুও পায়নি মুনতাসির। মেঘের ডাক বন্ধ হয়ে চাঁদটা বেরিয়ে চারপাশটা ডাবের পানির মতো হিমহিম করে তুলল।

আর অদ্ভুত দুটি চোখ, যেন জাদুজানা কোনো পরি বা বুড়ির, মুনতাসিরের দিকে তাকিয়ে বলল, এইবার আমাকে চিনেছেন?

বলে কী?

কেবিনের সামনের আলোয় পুরো মেরুন অবয়বে দুটি সাংঘাতিক চোখ ছাড়া আর কিছু মূর্ত হয় না।

না, নিজেকে ধাতস্ত করে শ্যামলা মুখটাও দেখা হয়ে যায়, এ মেয়েকে সে চেনে না।

পুরো জীবনের স্বপ্ন-বাস্তব ঘেঁটেও মুনতাসির দিব্যি দিয়ে বলতে পারবে, এ চোখ সে জীবনে আগে কখনো দেখেনি।

নারীটি কি সিনেমায় দেখা নায়িকাদের মতো তার বাহুতে অনড় হয়ে আছে?

হকচকিত বোধ করে নিজের হাত-পা ঝাড়ে।

নারীটি এক অদ্ভুত কায়দায় এমনভাবে মাথা কাত করে আছে, যাতে তাঁর মুখ-চোখ স্পষ্ট মুনতাসির দেখতে পায়।

চারপাশটায় ঘাবড়ে তাকায়।

কিছু লোক জোটবদ্ধ হয়ে তাদের পর্যবেক্ষণ করছে।

প্লিজ, আমাকে বাঁচান, এই লোকগুলো আমাকে একা ভেবে পিছু নিয়েছে। আমি তাদের বোঝাতে চাইছি, আমার সঙ্গে আপনি আছেন।

মুনতাসির তাজ্জব, একা ভেবে পিছু নিয়েছে, মানে? আপনি একা? তবে যার সঙ্গে এসেছেন?

আমাকে ফেলে চলে গেছেন।

বাষ্পরুদ্ধ হয়ে ওঠে নারীর চোখ-মুখ।

আমি গ্রামের সহজ-সরল মানুষ, শহরের প্যাঁচ এত কি বুঝি। আমাকে মিথ্যে প্রলোভনে...সব বলছি, আপনার কেবিনে একটু নিয়ে যাবেন?

এতক্ষণ এত কথা মহিলার চোখের ঘোরে পড়েও হুঁশ না হারিয়ে মুনতাসির বলেছে।

বলে কী এ নারী?

আমার নাম পূর্বাশা।

এ কি আত্মার শব্দ পড়তে পারে?

ফাতনার মতো কিঞ্চিৎ কাঁপে মুনতাসির, পূর্বাশা গ্রামের মেয়ে? বললেই হলো?

জানি কী ভাবছেন, গ্রামের মেয়ে মনে হচ্ছে না, তাই তো? না, আমি খারাপ মেয়ে মানুষ নই।

তেমন কিছু হলে আপনি ঘাড় ধাক্কা দিয়ে আমাকে কেবিন থেকে বের করে দেবেন।

অপ্রস্তুতবোধে মুনতাসির একবার কেবিন একবার পূর্বাশার দিকে তাকায়।

আপনি আর একফোঁটা সময় নিলে আপনাকে আমার স্বামী বলে চিল্লাচিল্লি শুরু করব, প্লিজ জলদি করেন?

আমাকে স্বামী বলে মানে—?

মুনতাসিরের তোতলামির ওপর যেন পতঙ্গের মতো ঝাঁপ দেয় পূর্বাশা এবং মুনতাসিরের হাত ধরে তার কেবিনমুখী যেতে যেতে উচ্চকণ্ঠে বলে, এতবার সরি বলছি, তা-ও তোমার রাগ যায় না। পারোও।

এই অত্যাশ্চর্য কাণ্ডে মাথা থেকে মৃত্যুখুন সব উধাও হয়ে ফের মুনতাসিরের বোধে সংশয় জমা হতে থাকে।

তবে কি এটা স্বপ্ন? গায়ে চিমটি দিয়েও, যথারীতি ধন্দ লেগেই থাকে।

মনে পড়ে, কৈশোরে এক রাতে বড়মার সঙ্গে ঘুমিয়েছিল। আচমকা কী এক হিমহিম বোধে ঘুম ভেঙে যায়।

মুনতাসির আলো ছাড়া ঘুমোতে পারে না। আচমকা তার চোখে পড়ে, তার ঠিক পা বরাবর ছোবল তুলে গোখরো বসে আছে।

তারা বাংলোবাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল।

ভয়ে আত্মা শুকিয়ে দেহ স্ট্যাচু হতে থাকলে মনে পড়ে যায়, এমন সময় একফোঁটা নড়াচড়াই মৃত্যু, বড়মা বলেছে একদিন। এখন কী করবে সে? ধীর হাত বড়মার মাথায় ধাক্কা দিতে পাঠাতে গিয়েও অনুভব করে, হাতে যেন রক্ত জমে আছে, হাত পুরোপুরি শক্তিহীন।

এরপর বহু কষ্টে যেন ঝিঁঝিঁ ধরা হাতটাকে বড়মার চুল ধরে টান দিতে পাঠিয়ে দম আটকে বড়মাকে দেখে, উনি তাকানো মাত্র পায়ের নড়াচড়া বন্ধের কথা যাতে বলতে পারে এবং বড়মা চোখ মেললে তা সে করেও।

কিন্তু এ কি? পায়ের কাছে সাপ-টাপ এসব কিছু নেই।

মুনতাসিরের স্বপ্ন-বাস্তব রোগটা জানলেও মাঝেমধ্যে বড়মা অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন।

সেদিনও হয়েছিলেন। এমন মুহূর্তগুলোয় নিজের সঙ্গে নিজের প্রচণ্ড ক্রোধ হতে থাকে। অসহায় এক বোধ তাকে ক্রোধের দিকে টানে, স্পষ্ট দেখলাম সাপ...।

এরপর সবাই শুয়ে পড়লে মেঝের দিকটায় চোখ গেলে হিম হয়ে আসে দেহ।

সাপটা কী জানি কোন পথে বেরোচ্ছে, তার লেজের বড় অংশটা যখন যাচ্ছে তখন চিৎকারে সাতবাড়ি এক করতে গিয়ে তীব্র অভিমানে কী করে যে জীবনের অমন অবস্থায় আত্মার গতিটা অভিমানে গিলে চুপ করে থাকতে পেরেছিল, নিজেই কল্পনা করলে অবাক হয়। তার মনে হয়, বড়মা উঠতে উঠতে সাপটা দিব্যি চলে যাবে।

ফের ফাউল প্রমাণিত হবে সে।

সেদিন কি ইয়া বড় সাপটা সত্যিই এসেছিল?

বাংলো এলাকা হলেও চারপাশ ছিমছাম। অরণ্যে দিন-রাত মানুষের চলাচল।

এমন কোনো সাপ এখানে থাকা সম্ভব? এমন স্বপ্ন কেন সে দেখবে যা হুবহু বাস্তবের মতো?

না না, এই সাপের ব্যাপারটাই শুধু না।

সে জীবনে আরও কয়েকবার এমন স্বপ্ন দেখে বিভ্রান্তির ফাঁদে আটকা পড়েছে।

২.

যা হোক আজকের ব্যাপারটা কী?

এককণাও কি বাস্তবের মতো?

নয় কেন?

তবে কে? চেনার কথা বলল কেন—ইতস্তত বোধ নিয়ে রুমের ভেতর ঢুকে দেখে, কেবিনের বিছানায় নিশ্চুপ পা তুলে বসে আছে পূর্বাশা।

যেন বাপের বাড়ির অধিকার—ঘরে ঢুকেই পা দুটি ভেঙে যাচ্ছে রে বলে বিছানায় পা তুলে বসতে কী আজব ভঙ্গিমায় অনুমতি চাওয়া, একটু পা উঠিয়ে বসি? প্লিজ? যেন কত মতামতের তোয়াক্কা করছেন উনি।

চেয়ার টেনে বসে নিজেকে ধাতস্ত করতে চায় সে।

এবার মেয়েটির চোখ স্বাভাবিক, জাদুকরি রশ্মি বেরোচ্ছে না। আপনার বিষয়টা বলুন তো, গলা ঝাড়ে মুনতাসির। আমার পেছনে পড়েছেন কেন?

পূর্বাশা জোরে হাসতে গিয়েও নিজেকে থামায়, আপনার পেছন পড়েছি মানে, তাই মনে হচ্ছে?

আপনার কি মনে হচ্ছে আপনার প্রেমে পড়েছি?

এত কিছু মনে হচ্ছে বলিনি, মুনতাসিরের কণ্ঠে ক্রোধ। তবে আপনি আমার পেছনে পড়েননি তা বলতে চাই, আপনি আরেকটু সুন্দর করে বলুন। পূর্বাশার মুখের ভঙ্গি সুন্দর হয়, পিছে পড়া—কেমন খারাপ শোনায় না? আমি আপনার হেল্প নিতে অমন মরিয়া হয়েছি।

কেমন হেল্প?

এই যে নিচ্ছি। রাতে যখন এলেন তার কিছু আগে যেকোনো কারণেই হোক বাড়ি থেকে রেগে মাথা গরম করে এসে এই লঞ্চে উঠেছিলাম। কিন্তু মেয়েদের, বিশেষ করে সুন্দরী মেয়েদের, একাকী অন্তত রাত্রি সফরের ঝুঁকি নেওয়া যে ঠিক না এখানে এসে ছেলেদের টিপ্পনী খেয়ে বুঝলাম, বলে তাকায় সে সন্তর্পণে মুনতাসিরের দিকে, আমি শ্যামলা হলেও সুন্দরী তো? কী বলেন?

তো আপনি লঞ্চ থেকে নেমে গিয়ে কী বুঝে আমায় ভরসা করলেন? আবার বলছেন চেনেন, এমন ভান-ভণিতা আমি একেবারে সহ্য করতে পারি না।

প্রথমত, লঞ্চ থেকে নামতে পারিনি, ছেলেগুলোকে যখন দেখি লঞ্চ ছেড়ে দিয়েছে। দ্বিতীয়ত, আপনি। আমি খুঁজছিলাম একলা একজন পুরুষ। ভালো পুরুষ। বয়স, দেখার ভঙ্গি, আচার দিব্যি মিলে গেল আপনার সঙ্গে। আপনি এসেই পৃথিবীর সব ছেড়ে বাইরে জলের দিকে চেয়ে আছেন। অস্থির হয়ে মাথার চুলে বিলি কাটছেন। আপনি একটা সিগারেট পকেট থেকে বের করে কয়েকবারের চেষ্টায় ঠিকমতো জ্বালাতে পারলেও টান দিয়ে কেশে ফেলে দিয়েছিলেন।

ওরেব্বাস। ভেতরে ভেতরে তেতে ওঠে মুনতাসির।

কেউ একজন তার এত কিছু পর্যবেক্ষণ করেছে? তা-ও একজন সুন্দরী নারী?

এতে কী বোঝা গেল?

মুনতাসিরের এ প্রশ্নে হাসতে থাকে পূর্বাশা। সব ব্যাপার সাহেব যুক্তি দিয়ে বোঝানো যায় না। আমি কী দেখেছি কী বুঝেছি, নিজেই কি জানি ছাই। আমার মনে হয়েছে আপনাকে ছাড়া আর কাউকে ভরসা করা যায় না।

এই পর্যন্তই—হন্তদন্ত দাঁড়ায় মুনতাসির, এই পর্যন্তই থাক, আপনি এখন যান। আপনি আমার পরিচিত বলেছিলেন, এখন সেটা জিজ্ঞেস করলে অন্য গল্প ফাঁদবেন।

অন্য গল্প? গ্রীবা উঁচু করে পূর্বাশা। এতক্ষণ যা বললাম তা গল্প ছিল?

তা না, গলা নামায় মুনতাসির, এখন আমাকে চেনা নিয়ে যে কথাটা বলবেন তার ব্যাখ্যা কী?

ওটা আপনাকে ভড়কে দিতে বলেছিলাম।

আশ্চর্য! ভড়কে দিতে পেরেছিল, ওই আপনার দুটি আশ্চর্য চোখ...।

এখন সেই চোখ নেই তো?

আমার ভেতরে রূপকথা নামে একটা বাক্স আছে। আমি আমার অনেক অভিব্যক্তির সুন্দরতা সেখানে জমা রেখেছি, জাত অভিনেত্রীকে অমন অনেক রাখতে হয়, যখন যেটা দরকার বের করি।

মুনতাসির কিছু বলতে যাচ্ছিল তক্ষুনি দুহাত ওপরে তুলে ও জানায়, দোহাই বলবেন না, টিভি-সিনেমা দেখেন না তাই চেনেন না। আমি জানি সেটা। আমি—আমি তা বলতে চাইনি।

হাঁসফাঁস করে মুনতাসির, আপনি আপনার রূপ অভিব্যক্তির বাক্স গোপন রাখেন। যখন দরকার হয় বের করেন—এমনভাবে কোনো নারী তার সৌন্দর্যের চাবিকাঠি বলে দেয়? যে বলে আর যে শোনে দুজনের জন্যই ব্যাপারটা অস্বস্তির নয় কি? এরপর আপনি যদি সেই লুক দেন বা আরও কিছু সঞ্চিত রয়েছে তা বের করেন, আমার মধ্যে ন্যূনতম ক্রিয়া হবে?

এবার তুমুল হাসে পূর্বাশা।

কী হচ্ছে এসব?

এবার মরিয়া হয়ে ওঠে মুনতাসির। আপনি আপনার রুমে চলে যান, প্লিজ। আমি ঘুমোব।

সত্যিই আপনি ঘুমোবেন? ঘুম আসবে আপনার?

বিশাল চমকে হিম হয়ে আসে মুনতাসির।

কে এই নারী, মুনতাসিরের হত্যাকাণ্ড বিষয়ে জানে কিছু? কী জানে?

আমার ঘুম হবে না কেন? তোতলায় মুনতাসির।

কিছুক্ষণ রহস্যময়ভাবে চুপ থেকে মুনতাসিরের ধড়ফড় আত্মার তুঙ্গে গিয়ে পূর্বাশা বলে, আপনি কিছু একটা বিষয় নিয়ে অস্থির আছেন। আপনি আপনার অস্থিরতা, ভেতরের কিছু বোধ লুকাতে পারেন না।

বলে কী মেয়েটা এই অল্পক্ষণের পরিচয়ে? বড়মা আজন্ম তাকে এই ব্যাপারে সতর্ক করে করে কত যে বিরক্ত হয়েছেন। নিজের ভেতরের কোনো অনুভূতি বাইরের কেউ যেন বুঝতে না পারে।

এই খুনটার পর মুনতাসিরকে বাইরে পাঠাতে গিয়েও কোরআন শরিফ স্পর্শ করিয়েছে। এ ব্যাপারটা মুনতাসির যেন আত্মায় গাঁথে—

কোরআন শরিফকে সমীহের ব্যাপারটা ছোট থেকে মুনতাসির জানে।

যেনবা দীর্ঘ বলয় থেকে নেমে আসে মুনতাসির, আমার স্থিরতা-অস্থিরতা নিয়ে আপনি মাথা ঘামানোর কে? প্লিজ, আপনি চলে যান। কেউ এলে মুশকিল হয়ে যাবে, আমি তার কাছে নিজেকে আপনার হাজবেন্ড বলতে পারব না।

সেইটাই পারতে হবে, প্লিজ।

প্লিজ বলে আমাকে আদেশ দিচ্ছেন নাকি? আপনি বেরোন।

তাহলে আপনি যে কুকর্মটা করে এসেছেন, সবাইকে ফাঁস করে দিই?

যেন জোঁকের মুখে নুন পড়ল।

ফের গায়ে চিমটি কাটে। কে এই নারী? বাস্তব, না অশরীরী? নাহ! এখনো অশরীরীর মতো তেমন কিছু করেনি। তবে যে ঘটনা বড়মা, রাখাল আর মুনতাসির ছাড়া কাক-পক্ষীও জানে না তা ও কী করে জানল।

কী? কী কর্ম? নিজের মধ্যে ধস নামতে থাকে।

অথচ এসব মুহূর্তের জন্য বড়মা কোরআন ছুঁইয়েছিলেন। এই ভাবনায় দেহে শক্তি সঞ্চারিত হয়। কী কুকর্ম করেছি? আপনি আমার কী জানেন?

সব জানি...বলে যেন পাটকেল ছুড়ে দেয় মুনতাসিরের মস্তকে।

মাথা চেপে বুকের ভারে উবু হয়ে যায় মুনতাসির। এরপর পুলিশ, কারাগার—কী সাংঘাতিক বিষয়।

মুনতাসির মরলেও ওখানে থাকার কথা ভাবতে পারে না। এ ছাড়া ফাঁসির বিশাল চান্স তো রয়েই গেছে।

কী করে এতক্ষণ এসব ভুলে সে অন্য ভাবনায় ঢেউ খেতে পারছিল?

এত রাতে লঞ্চের বাইরের কিছু লোক দেখেছে তাদের। পূর্বাশার মতো আর কেউ লক্ষ করেনি মুনতাসিরকে।

পূর্বাশা কে?

দরজায় ধাক্কা আসছে না কেন?

মুনতাসির কী চাইছে? দরজায় ধাক্কা আসুক?

না না, এই অবস্থায় না। সে জানে না, এই পূর্বাশা তাকে কতটা জানে, তার সম্পর্কে কী জানে? এই নারী আসলে কে? নইলে এমনিতে মানুষের মধ্যে ওকে ছেড়ে দিলে মুনতাসিরের বাহ্যিক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। প্লিজ, আপনি বসুন, মুনতাসিরের ভেতর বেড়াল বেরিয়ে পড়তে চায়।

আপনি আমার বড়মাকে চেনেন?

কেন চিনব না, বলে ভ্রু পল্লবে ঢেউ তুলে উঠে দাঁড়ায়। আমি আপনাকে ব্ল্যাকমেল করে আপনার এখানে থাকব না। এই যে আপনি কিছু একটা ব্যাপারে আমাকে ভয় পাচ্ছেন, এটাই আমার সহ্য হচ্ছে না। জীবনে যা হওয়ার হয়েছে, আপনি বাস্তবতার ওপর শক্ত ভর দিয়ে দাঁড়ান।

তার মানে?

কেন, জানেন না, কী করে এসেছেন? বলে চোখ বাড়িয়ে দেয় মুনতাসিরের দিকে। ফের একটা স্বপ্নাচ্ছন্ন ঘোরের মধ্যে পড়ে যায় মুনতাসির।

এরপর মুনতাসির সম্পূর্ণ অন্যমনস্কতার মধ্যে নিজেকে কীভাবে ছেড়ে দিয়েছিল জানে না। মেয়েটি বিপজ্জনক, তাকে অনুসরণ করছে অথবা নিছক হেঁয়ালির দোলনায় নিজের সাথে মুনতাসিরকেও দোল খাওয়াচ্ছে। সুবর্ণার নীল মুখ, পূর্বাশাকে বলতে হবে। ওই ভয়ংকর স্বপ্নের কথা ওকে বলতে হবে। বাস্তবে এ কাজ, মুনতাসির যেমন মানুষ, মরলেও করতে পারে

না। ভেবে পূর্বাশার দিকে তাকাতে যায়।

এর মধ্যেই পূর্বাশা যেন অনন্তে হারিয়ে যায়।

৩.

কিছুক্ষণ টানা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে মুনতাসির।

দেহ থেকে যখন বরফের টাটানি ছুটতে থাকে, উষ্ণ তরল স্রোতের সান্নিধ্য মিলতে থাকে, তখন সবেগে দাঁড়ায় মুনতাসির, পূর্বাশাকে খোঁজার জন্য।

পরক্ষণেই পায়ের জোর কমে যায়। বাতাসে লটকাতে থাকে স্ত্রীর দেহ। অথচ সিলিং ফ্যানে মৃত্যু নয়, আঘাত পেয়ে শুয়ে পড়ে ছটফট করেছিল। তার স্ত্রী সুবর্ণা। কীভাবে যে একদিন উড়ে এসে ওর পেইন্টিং ক্লাসে ঢুকে পড়েছিল। সাদামাটা চেহারার মেয়েটার মধ্যে কেমন যেন একটা সরল ব্যক্তিত্ব আছে, বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে ছিল মুনতাসির, না, তা-ও না, পরক্ষণেই আবিষ্কার করে মায়ের মতো রূপ যদিও নেই কিন্তু ওর কোনো একটা আদল মায়ের মুখের মতো।

ছেলেরা কি আজীবন স্ত্রীর মধ্যে মায়ের আদল খোঁজে—অনেকবার শোনা এ কথাটা কানে শব্দ করে। এরপর সুবর্ণা নিজেও কীভাবে জানি মুনতাসিরের সঙ্গে মিশতে মিশতে তাকে ভালোবেসে ফেলে। বলত, যে স্বপ্নরোগ নিয়ে মুনতাসির ভীত থাকে, নিজেকে দুর্বল মনে করে, তা-ই সুবর্ণার সবচেয়ে ভালো লাগে। সেই সুবর্ণা...।

না, আর ভাবতে পারে না সে। কেবিন থেকে বেরিয়ে চক্কর খায়। কোথাও পূর্বাশা নেই। লঞ্চ থেকে তো নামার উপায় নেই। কোথায় ঘাপটি মেরে আছে কে জানে? মুনতাসিরকে সমূলে এড়াচ্ছে কেন? সে সব জানে, সব বুঝে সে তো সহসাই মুনতাসিরের কাছে এসেছিল। এত আছারি-বিছারি করে থাকতে চাইল। তবে মুনতাসির কি বেশি খারাপ ব্যবহার করে ফেলেছে?

না, আগাগোড়া মুনতাসিরের ব্যবহারে স্থিততা ছিল। বরং সে 'সব জানে' এমন একটা ভয় মুনতাসিরের সামনে লটকে দিয়ে চলে গেছে।

যে নিজে লুকায় তাকে পায় কার সাধ্য?

ঘরে ফিরে এসে কিছুটা সময় পেরোলে পুরোটা ধাতস্ত হওয়ার পর আচমকা নিজের অবয়বে চোখ বুলিয়ে হাসি পায়।

সে তো তার স্বাভাবিক দেহে মুনতাসিরই আছে। তবে মাঝরাতে লঞ্চে সুন্দরী নারী...হা হা ইয়ার্কি নাকি? রহস্য উপন্যাস পড়তে দেন না বড়মা। তা-ও আর্ট ক্লাসে গিয়ে পড়েছে। হুবহু এমন কাহিনি, যেন সেটা লঞ্চ না হয়ে ট্রেন ছিল। যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে।

বিছানায় দুহাত মাথার নিচে দিয়ে নিজেকে আমূল ছেড়ে শোয়। এ ঘরে একটা সুন্দর ঘ্রাণ...কিছু আগে এ কক্ষে নারীর উপস্থিতি স্পষ্ট অনুভব করে কান্না পেতে থাকে মুনতাসিরের।

স্বপ্ন যদি এত ভয়ংকর আর এত দীর্ঘ হয়, এমন জীবন নিয়ে সে বাঁচে কী করে? তবে কি, সুবর্ণার মৃত্যুটাও স্বপ্ন? ভাবতেই ক্ষণিক আনন্দের ফল্গুধারা প্রাণে শিহরণ দিলেও পরক্ষণেই ঠান্ডা হয়ে যায়। কিছু আগেও বড়মা ফোন দিয়ে তাকে সাবধান করেছেন। বলেছে, ওদিকের খুন, পুলিশ সব সামাল দিচ্ছেন উনি। মুনতাসির যেন কারও সঙ্গে কথা না বলে।

তখন ঘরে পূর্বাশা ছিল।

এ কারণেই তাকে তাড়াতে আরও বেশি মরিয়া ছিল সে। বড়মার কথামতো লঞ্চঘাট থেকে তাকে নিতে আসবে বাদশা পুতু। এ নিয়ে মুনতাসিরের কোনো টেনশন নেই। সে ঘাটে কি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবে, বাদশা পুতু তাকে খুঁজে নেবে? শীত শীত, জ্বর জ্বর লাগছে।

সুবর্ণা, একজন নারীর সঙ্গে জীবনের প্রথম শরীরী সম্পর্ক। নিজ দক্ষতার সঙ্গে নারীলজ্জার মিশেল ঘটিয়ে দুই-তিনবারের চেষ্টায় ব্যাপারটার পূর্ণ আনন্দ উপভোগ করেছিল মুনতাসির।

জীবনের প্রথম প্রেম।

মুনতাসিরের কত স্বপ্ন আর বাস্তবের ফেরে ঢেউ খাওয়াকে অত্যন্ত সন্তর্পণে সুন্দর সামলেছে সুবর্ণা।

বড়মার ক্ষেত্রে যা হয়, কেউ মুনতাসিরের পুরো দখল নিচ্ছে, এটা মানা তাঁর জন্য কঠিন ছিল, তাই সুবর্ণাকে তিনি পছন্দ করতেন না।

কিন্তু সারা জীবনের জন্য সুবর্ণাকে চাই—মুনতাসিরের এ আকুল কাঙ্ক্ষা তিনি ফেলতে পারেননি।

ভেসে ওঠে অপুর মুখ। সুবর্ণার সাথে উচ্ছ্বসিত হয়ে মিশত সে। একসময় অপুকে তার অসহ্য ঠেকতে লাগল, অপুর সঙ্গে জীবনেও যেন সুবর্ণা আর না মেশে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়। ছায়া নেমেছিল সুবর্ণার মুখে।

কী দোষ করেছে ও? তুমি কারও সাথে কারও সুন্দর সম্পর্ক ভাবতে পারো না কেন? বড়মা এত কিছু শিখিয়েছেন, মন ছোট-বড় শেখাননি?

সাবধান, বড়মা নিয়ে কিছু বলবে না। বলে ক্রোধে সবেগে নিজের দিকে টানে, ওর সাথে তোমার সুন্দর সম্পর্কের দরকার নেই। এতে মন ছোট-বড়র কিছু নেই, ওকে দেখলে আমার ভয় করে।

কী? ক্রমশ নিভতে থাকে সুবর্ণার ক্রোধ-কষ্ট। ভয় হয়? কেন? তোমাতে ওর প্রাণ বাস করে?

ও আমার কাছ থেকে তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে।

অচেনা মতো হয়ে যাওয়া মুখটার দিকে বিস্মিত চোখে তাকায় সুবর্ণা। প্লিজ, এভাবে বোলো না। কতবার বলছি ও আমার ভাই ছাড়া কিচ্ছু না। প্লিজ, ওতে তুমি জেলাস হয়ো না।

না না, ওর সঙ্গে সম্পর্ক রেখো না।

শেষ পর্যন্ত তুমিও, তুমিও জেলাসি হলে? অন্যভাবে নিলে ওকে?

এরপরও মুনতাসিরের তীব্র গোঁয়ার্তুমিতে ব্যাপারটা অমীমাংসিতই ছিল।

এ নিয়ে তর্কযুদ্ধের পূর্ণ সময়টায় বড়মার সাপোর্ট মুনতাসিরের দিকে থাকায় সুবর্ণা ব্যাগপত্র গুছিয়েছিল।

সঙ্গে সঙ্গে যেন চেতনা থেকে ফিরে আসে মুনতাসির। প্রচুর আদর করে মাফ চেয়ে ওকে আটকেছিল।

বিয়ের পর তারা বালি গিয়েছিল বেড়াতে। বড়মা এত দূরে ছেলেকে নিজের কাছে ছাড়া আর কাউকে ভরসা করতে পারছিল না। সেও যেতে চাইছিল, মুনতাসিরও নিতে চাইছিল।

তখন শান্ত মাথায় মুনতাসিরের চুলে বিলি কেটে সুবর্ণা জানায়, হানিমুন মানেই তো যুগলের ভ্রমণ। সেখানে ভ্রমণ রোমাঞ্চের মাঝখানে তৃতীয় কেউ থাকলে সেই স্বাদটা পাওয়া যায় না। আমরা সুন্দর সুন্দর জায়গায় ঘুরব, নিজ জীবন নিয়ে মত্ত থাকব, এর সঙ্গে বড়মাকে নিয়ে...।

আমি বুঝেছি, বুঝেছি।

সুবর্ণার হাতে আলতো চুমু খায় মুনতাসির। আমি এর আগে এভাবে দূরে কোথাও যাইনি।

এ ছাড়া বড়মা কিন্তু তোমাকে চেপে ধরবে, সুবর্ণা ফের সতর্ক করে। উনি তোমাকে এখনো ভরসা করতে পারছেন না, আমাকেও না।

বালির সমুদ্র, প্রতিটি মন্দিরের সৌন্দর্য মাথা ঘুরিয়ে দিতে থাকলেও বৃক্ষপল্লবিত এক মন্দির-সংলগ্ন সমুদ্রের সামনে এক স্বপ্নের ফেরে পড়ে গিয়ে মুনতাসির বহু সময় একটা আচ্ছন্নতার মধ্যে কাটায়।



আপনি আপনার রুমে চলে যান, প্লিজ

মন্দিরের সৌকর্য আর সমুদ্রের উচ্ছ্বাস, ঢেউয়ের বিমূঢ়তায় আচমকা চোখে পড়ে কলা পাতা পোশাক পরে সুবর্ণা যেন সমুদ্রকন্যা—জল থেকে উঠে আসছে।

ওকে অলৌকিক আর বহুবর্ণিল লাগছিল। দুজন দুজনকে আমূল আবেগে জড়িয়ে সমুদ্রের ওপর ভাসতে থাকে। আচমকা সুবর্ণার প্রশ্ন। আমার জন্য মরতে পারো?

পারি।

তবে সমুদ্রের তলায় চলে যাও।

সত্যি সত্যি ঘোরাচ্ছন্ন মুনতাসির হেঁটে গিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দেবে, মুহূর্তে কিছু লোক তাকে ধরে ফেলে। এলাকার লোক, ওখানকার প্রশাসনের লোক, অনেকের অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে হাজার পাকের শেওলা খসিয়ে তবে তাদের দেশে ফেরা হয়েছিল।

সবার এক প্রশ্ন। আত্মহত্যা কেন করতে চাইছিল মুনতাসির?

আমি পারব, তোমার জন্য সব পারব, মরতে পারব, এই সব বলছিল মুনতাসির।

সেদিন উদ্‌ভ্রান্ত সুবর্ণার বুকে তীব্র ভয়ে মুখ লুকিয়েছিল মুনতাসির। এ স্বপ্ন হতে পারে, এ আমার কল্পনার বাইরে। তার ভয়কাতর অবস্থা দেখে নিজেকে স্থিত করে সুবর্ণা যখন আমূল জড়িয়ে নেয় নিজের সঙ্গে, তাকে তাজ্জব করে মুনতাসির প্রশ্ন করে, আসলেই তুমি কলা পাতা পোশাক পরোনি?

একটা বয়সে এসে বাবার দারুণ অন্ধত্ব ছিল মুনতাসিরের প্রতি। ত্রিসংসারে তার একমাত্র উত্তরসূরির আহ্লাদের সীমা ছিল না। মুনতাসিরও বাবা বলতে অস্থির ছিল। শৈশব থেকেই স্বপ্ন বিভ্রম নিয়ে অনেক বিপত্তির মধ্যে কাটাতে হয়েছে মুনতাসিরকে। তা-ও বাবা কোনো মানসিক ডাক্তার দেখাননি, বলেছেন আমার ছেলে পাগল না। ও স্বভাবে ব্যতিক্রম। কিন্তু বাবার মৃত্যুর পর বড়মা একজন ডাক্তার দেখান নিয়মিত মুনতাসিরকে। এই মানুষটা মাকে একটা কক্ষে বন্দী রেখেছে, এই সত্য জানার পর মা নামক সেই মানুষটির চোখ-মুখের কান্নামিশ্রিত সান্নিধ্য ঘটেছিল মুনতাসিরের। সেই সান্নিধ্যে মুনতাসিরের মধ্যে যে প্রগাঢ় অনুভব হয়েছিল, তা এই জন্মে আগে কখনো হয়নি। বাবার মৃত্যুর পর সেই দরজা খুলে দিলে মা মুনতাসিরের কাছে না এসে নিজ বাড়িতে পালাল কেন? কিছুই জানে না মুনতাসির। কোথায় তার বাড়ি? আসলে তিনি অনেক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। মুনতাসিরকে তিনি শিশুর মতো আদর দিয়েছিলেন।

এসব বিষয়ের নিগূঢ় সত্য সব জানত মুনতাসিরের কেয়ারটেকার, বন্ধু রাখাল। রাখাল এই যাত্রায় মুনতাসিরের সঙ্গী হয়েছে। যা হোক মা-ছেলের এই মিলন আর সত্য ফাঁস হওয়াতে বড়মা এমনিতেই ক্ষিপ্ত ছিলেন। বাবার মৃত্যুর পর তিনি শকুনের থাবায় টেনে নিলেন মুনতাসিরকে।

বলতে চাইত সুবর্ণা, তোমার মাকে এক অর্থে বড়মা-ই মেরেছে। কিন্তু অর্ধেক শুনেই এত ক্ষিপ্ত হতো মুনতাসির, বলত, তোমাকে অকপটে সব বলাই ভুল হয়েছে। তোমার মনটাকে আমি আরও অনেক বড় ভাবতাম। সুবর্ণার ভেতরে ভেতরে এক দুঃখী ছায়ার বিলোড়ন বইত।

বড়মার ভয়ংকর ঈর্ষা, জীবনের অজরুরি এত কথা বলেছেন মুনতাসিরকে, অথচ মায়ের ব্যাপারটা দিব্যি চেপে গেছেন।

এ ছাড়া সুবর্ণাকেও তার রাজ্যির ঈর্ষা। আর কিছু বুঝুক না বুঝুক মুনতাসির ঈর্ষা ভালো বোঝে।

রাখালের মাধ্যমেই নিজের মায়ের ব্যাপারটা জেনেছিল মুনতাসির, এ জন্য তাকে মারতে বাকি রেখেছিলেন বড়মা।

এখন একটা খুন হয়েছে।

৪.

মুনতাসিরকে বড়মা পাঠাচ্ছেন বাবার সহোদর বাদশা চাচার বাড়ি। সবাই তাকে বাদশা পুতু বলে ডাকে।

এই বাদশা পুতু লোকটা দারুণ আজব কিসিমের দেখতে। চারপাশে কদমছাঁট ফাঁকা ফাঁকা চুলের মাঝে চকচকে টাক, চোখ দুটো মাছের মতো। পাপড়ি পড়তে দেখেছে, মুনতাসিরের মনে পড়ে না। ঠোঁটটা থুতনির দিকে ঝুলে আছে। দেহটা ভারসাম্যহীন, মোটা-চিকন আদলে গড়া।

ব্যাটাকে বড়মার সঙ্গে গল্প করতে শুনেছে মুনতাসির। সেই আগ্রহেই এই লঞ্চযাত্রা। নইলে হাজার ফাঁসির ভয় থাকলেও মুনতাসির ওই ব্যাটার সঙ্গে দিন-রাত কাটানোর কথা ভাবতে পারত না। বড়মা রাখালকে মুনতাসিরের সঙ্গে দিয়েছিলেন। মুনতাসিরকে যাতে তক্কে তক্কে রাখে, এ কথা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

এই কেয়ারটেকার ছোকরাটাকে বাদশা পুতু দিয়েছে। মুনতাসিরের ব্যাপারে বাবা অতিসচেতন থাকায় পড়াশোনা জানা রাখাল নামের ছেলেটাকে বাড়িতে বরাদ্দ করেন ঠিকই কিন্তু এ বাড়ি এসে সে বাড়ির সঙ্গে সঙ্গে মুনতাসিরেরও দেখভাল করে, এ জন্য ভদ্রতার প্রচুর কায়দা, বহু কিছু শিখতে হয়েছে তাকে। রাখাল ব্যাটা সেই কখন নিজ কেবিনে ঘুমের রাজ্যে হারিয়ে গেছে কে জানে। এই রাখাল না থাকলে মুনতাসির মায়ের দেখা পেত না। কেন তুমি লুকিয়েছ আমার মাকে? কান্নাজড়িত কণ্ঠে বড়মার দিকে ঝাঁপ দিয়েছিল মুনতাসির।

বড়মা সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিমূর্তি, তোমার মা? আমি ছাড়া তোমার আবার মা এল কোত্থেকে? অনেক ধামাচাপার চেষ্টার পর স্বপ্ন বলেও চালানোর শেষ চেষ্টা করতেই রাখাল মুখ খোলে। রাখাল বড়মাকে বলে, আমাকে মারেন, তাড়িয়ে দেন, তারপরও মাকে নিয়ে সন্তানের এই মিথ্যা সহ্য করব না।

মাথা নত করেছিলেন বড়মা।

রাখালকে বিদায় করতে পারেননি মুনতাসিরের জন্য।

পাশাপাশি বড় হওয়া মুনতাসিরের বন্ধু সে, যে আবার মুনতাসিরকে দুর্দান্ত কন্ট্রোল করতে পারে। বলেছিল মুনতাসির, রাখাল যেকোনো অছিলায় এখান থেকে বিদায় হলে আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব।

সবকিছু কি বড়মার কাছ থেকে শেখা যায়? কত কিছু সে রাখালের কাছ থেকে শিখেছে। রাখাল তার ঘাটতিগুলো না ঢাকলে, নানা পরামর্শ না দিলে সুবর্ণাকে সে পেত? এমনভাবে চলত তারা, যেন একে অন্যের পরিপূরক। এরপরও যে ভয়টা মুনতাসির পেয়েছিল সেটা পায়। সুবর্ণা রগরগে কণ্ঠে, হেসে বলেছিল, তুমি সারাক্ষণ একটা বডিগার্ড নিয়ে ঘোরো কেন, তোমার মহান বাবা তো আর বেঁচে নেই। তিনিই তো বরাদ্দ করেছিলেন শুনেছি। ব্যাপার কী?

প্রথমে সরমিন্দাবোধে চুপ হয়ে তোতলামিতে কিছু বলতে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে রাখাল লুফে নেয়, বলো আমরা দুজন বন্ধুর চেয়েও বেশি। আমি কোনো কেয়ারটেকারফেকার না। আসলে শৈশব থেকে আমাদের এত ঘনিষ্ঠতা, একজনকে ছেড়ে আরেকজন থাকতে পারি না।

সুবর্ণাকে বুঝিয়েছে মুনতাসির, এই রাখালের সোর্সেই সে মায়ের সান্নিধ্য পেয়েছিল। মাকে সেই অল্পক্ষণের দেখা আজীবনের সম্পদ হয়ে থাকবে। কিন্তু মায়ের কাছে যাওয়া বাবা-বড়মা কঠোর প্রতিরোধে নিষেধ করে রেখেছে, তাদের আশঙ্কা মা সবার বিরুদ্ধে উল্টাপাল্টা কথা বলে মুনতাসিরকে দিকভ্রান্ত করবে। এই সব শুনে বুঝে সুবর্ণা মুনতাসিরের প্রতি প্রগাঢ় প্রেমে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল।

রাত কটা হলো?

এর মধ্যে দুবার বড়মার ফোন এসেছে। রাখাল প্রথমেই সাবধান করেছিল, পুলিশ বড়মার ফোনকে ট্র্যাক করতে পারে। ওনার এখানে ফোন না করাই উচিত। ফোনটা কি ফেলে দেবে? এমন একটা ইতস্ততার মাঝে লঞ্চের নারীটাকে মনে পড়ে। এভাবে পরির মতো এসে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল এক নারী?

ইশ্! রাখালকে ডাকলেই হতো। এখন বললে বলবে, স্বপ্নে দেখেছিলে। অবশ্য রাখাল মুখে এই ভাব লটকে রাখবে, মুনতাসির যা বলছে, বিশ্বাস করছে।

এ সময়গুলোয় এক অসহায় গোঁয়ার্তুমি তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে। কেন আমি এমন হলাম? কেন আর দশটা মানুষের মতো স্বাভাবিক হলাম না।

আমি কি অস্বাভাবিক? নিজেকে ফের প্রশ্ন করে গ্রীবা উঁচু করে, না, আমি ঠিকই আছি, আমাকে আসলে কেউ বুঝতে পারে না।

কেউ না?

বড়মা, সুবর্ণা, রাখাল?

না, কেউ না।

এক অস্থির বোধের উল্লম্ফনে রুমে খানিক ঘোর খায়। মেয়েটা যেন দশ জনমের চেনা, এই অল্প সময়ে এসে এই বোধ দিয়ে গেছে মুনতাসিরকে।

তুমি কি তাকে ভালোবেসে ফেলেছ।

অলৌকিক এই প্রশ্নে সটান বর্ম টেনে দেয় সামনে। কিছুতেই না, আমি সুর্বণা ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসতে পারি না।

ঝাপসা লাগছে চারপাশে।

ফের চশমা রেখেছে কোথাও।

কোথায় আর রাখবে? এটা ছাড়া তার জীবন অনেকটাই অচল, তাই পকেটে হাত দেয়।

ঘর থেকে স্থায়ী হয়ে যাওয়া ঘ্রাণটা সরছে না।

বিছানায় শুয়ে পড়ে মুনতাসির। শ্রান্তিতে ক্লান্তিতে দেহ-মন কুঁকড়ে আসছে।

ধেয়ে আসে সুবর্ণা।

প্রথম প্রথম মুনতাসিরের দুর্দান্ত আড়ষ্টতা দেখে বলেছিল, আমাকে ছুঁতে ইচ্ছা হয় না?

সলাজ মুনতাসির হাত বাড়াত, এই তো ছুঁলাম।

হাসিতে গড়িয়ে পড়ত সুবর্ণা, মানুষকে কখনো ছোঁয়া যায়? এ শুধু মানুষের স্বপ্নকে ছোঁয়ার দুর্মর চেষ্টামাত্র। জানো একজন ঋষিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, নারীদেহ কী? সে বলেছিল, প্রখর সূর্য, চোখ খুলে দেখেছ তো ছাই। পতিতাপল্লি থেকে বেরোনো যুবক বলল, এক এক চৌবাচ্চা, যেখানে নিজেকে উপুড় করে হালকা হওয়া যায়।

বিমূঢ় হয়ে শুনছিল মুনতাসির, তারপর?

এক বৃদ্ধকে প্রশ্ন করা হলো, সে বলল, ও শরীর? ও মনকে ধারণ করার বাক্সমাত্র।

সেই সুবর্ণা এই পৃথিবীতে নেই। তাকে আমিই—। মাথার শিরা দপদপ করে, না স্বপ্ন, পুরোটাই স্বপ্ন দৃশ্যত ভেবে প্রাণে একটু স্বস্তির আরাম পেতে যায়, অমনি যুক্তি এসে সামনে দাঁড়ায়। বড়মা দুবার ফোন করে বলেছেন, ও দিকটা সামাল দিচ্ছেন। মুনতাসির যেন ঘুণাক্ষরেও কাউকে কিছু না বলে। তিনি ক্ষণে ক্ষণে রাখালের কাছ থেকে খোঁজ নিচ্ছেন। তিনি ধমক দেন, এ সময় তুমি রাখালকে আলাদা রুমে রাখলে কেন?

আমি কারও সঙ্গে রুম শেয়ার করতে পারি না, জানোই তো।

তাহলে সুবর্ণার সঙ্গে কীভাবে?

এ নিয়ে কেউ কোনো কথা কয় না।

ফেসবুক ওপেন করে। তেমন কেউ নেই তার। সুবর্ণা



সুবর্ণার হাতে আলতো চুমু খায় মুনতাসির

সেট করে দিয়ে কিছু বন্ধু তৈরি করে দিয়েছিল।

মুনতাসিরের মনটা যাতে প্রসারিত হয় সে জন্য সুবর্ণা আরেকজন সুবর্ণা নামের মেয়েকে জোর করে মুনতাসিরের বন্ধু বানিয়েছিল।

আর্ট স্কুলে সুবর্ণা পাকাপাকি হলে মুনতাসির অনেকটা ছুট নেয়। ঘরে বসে সুবর্ণার সঙ্গে চ্যাটিংয়ে সে তাজ্জব বোধ করে, তার স্ত্রী সুবর্ণার সঙ্গে এর অনেক মিল। এ ছাড়া বাড়তি আছে এ নারীর মধ্যে, তুমুল রহস্যময়তা। যখন ওর কথা উচ্ছ্বাসে বলত, সুবর্ণা কপট রাগের ভঙ্গিতে বলত, ওর প্রেমে পড়ে যাওনি তো? তখন অন্য এক বোধ থেকে ছাই হয়ে আসত মুনতাসিরের মুখ।

তুমি আমাকে অন্যদিকে ঠেলছ নিজে যাতে অপুর সঙ্গে নির্দ্বিধায় সম্পর্ক রাখতে পারো?

যেন ত্রিকাল বেয়ে আঁধার নামে। জলস্রোতা নাচের মুদ্রা ছেড়ে বৈরী বাতাসের ঢেউ তোলে। দুহাত ওপরে তুলে রাবার ব্যান্ড দিয়ে সিল্কি চুল বেঁধে চোখ-মুখে বিষাদ আর গম্ভীরতার স্রোত তুলে যেন ছাই হয়ে যাওয়া মুখ নিয়ে সুবর্ণা বলে, আমি একটা দিগন্তকে বিয়ে করেছি ভেবেছিলাম। প্লিজ, তুমি এই একটা প্রসঙ্গ, প্লিজ বলো না। এই একটা প্রসঙ্গ নিয়ে এক জীবনে কতবার? আমার অসহ্য ঠেকে, জেদ লাগে।

এক জীবনে কতবার মানে? মুনতাসিরের এই অবাক হওয়া প্রশ্নে সুবর্ণা পাশ কেটে অন্য মোড়ে নিয়ে যায় বিষয়টিকে। আসলে আমি এমন ছিলাম না।

নিজের দিকে সুবর্ণাকে টানার অপচেষ্টা করে মুনতাসির। সুবর্ণাকে বলে যখনই প্রেমে পড়লাম, বিয়েটা কেমন হুড়মুড় করে করেছিলাম মনে আছে? স্থিত মুখে ম্লান হাসে সুবর্ণা, মনে থাকবে না আবার? তারপরও তোমাকে একটা কথা স্পষ্ট বলে রাখি মুনতাসির, অপু যতই আমার জীবনে অন্ধকার তৈরি করুক, ওকে আমি এই জীবনে ফেলতে পারব না। আমরা এক মা-বাবার ছায়ায় সহোদর-সহোদরার মতো বড় হয়েছি।

বড় হয়েছি বন্ধুর মতো, ওর সাথে আমার সম্পর্ক পবিত্র, তোমার যেমন সুবর্ণা।

এই ভয়, এই ভয়টাই আমি পাচ্ছিলাম। বলেই মুনতাসির মোবাইল ছুড়ে ফেলেছিল মেঝেতে। অনেক কষ্টে সে যুদ্ধ মিটেছিল।

অপু। জন্মের পর থেকে সুবর্ণা আর অপু পিঠোপিঠি ভাইবোন। কিন্তু অপুকে নিয়ে খোঁচা দিলে কেন সুবর্ণা মাত্রাছাড়া ভেঙে পড়ত, কেন বলত, শেষ পর্যন্ত তুমিও, তুমিও? আমার এই জীবনটাও চুরচুর হয়ে যাবে? অপু কী? আমার রাহু? মুনতাসির তাল পেত না।

সেই ভাইয়ের প্রতি সুবর্ণার ছিল মাত্রা ছাড়ানো ভালোবাসা। শৈশব থেকে বড় হওয়া অব্দি একজন আরেকজনের সঙ্গে যাচ্ছেতাই ফাজলামো করে। এই ছেলেটাকে বিয়ের সময় দেখেনি মুনতাসির। তবে সুবর্ণার কাছে ওর গল্প শুনে মুখস্থ হয়ে গেছে।

যৌবন শুরুর প্রারম্ভে সে বিদেশ চলে যাওয়ার দিন কীভাবে আসমান ফাটিয়ে কেঁদেছিল সুবর্ণা—

এসব কী ভাবছি আমি?

আমার একটু ঘুম দরকার।

মাথা চেপে বিছানার মধ্যে নিজের সমস্তটা ছেড়ে দেয় মুনতাসির।

কিন্তু সুবর্ণার কথা মনে পড়ে।

সুবর্ণার মৃত্যুর পর অজানা একটা জায়গা খুঁজছিলেন বড়মা, মুনতাসির ছিল পুলিশের কাছে ধরা দেওয়ার পক্ষে। কিন্তু বড়মা তাকে ঘরবন্ধ করে এর শাস্তির লোমহর্ষক বর্ণনা দেন। শিশুর মতো ভয় পেয়ে গিয়েছিল মুনতাসির। মুনতাসিরের ফেসবুক পেজেও রাখালই শেষে সুবর্ণার ঠিকানা বের করে দেয়। সুবর্ণা এত ঘটনা জানে না, মুনতাসির গিয়ে

কদিন থাকতে চাইছে, বৃদ্ধ পিতা নিয়ে বাসরত সুবর্ণা রাজি হয়ে যায়।
রাখাল বড়মাকে জানিয়েছে বাদশা পুতুর বাড়িই যাচ্ছে, কিন্তু সবচেয়ে নিরাপদ সুবর্ণার বাসা, তাই এখানেই নিজ দায়িত্বে ঠিক করে বাদশা পুতুকেও বুঝিয়েছে।
আশ্চর্য, বাদশা পুতুরই এলাকা। বাদশা পুতু মেয়েটাকে চেনে না?
বাদশা পুতু স্বভাবতই নিশ্চুপ।
এখন এমন একটা কাণ্ডের পর বাদশা পুতুর সঙ্গে সুবর্ণাদের বাড়ি যাচ্ছে তারা।
গলায় কান্নার স্রোত উঠে আসে। এই সুবর্ণার সাথে মুনতাসিরের স্ত্রী-ই...।
একসময় ঘুমের তলায় তলিয়ে যায় সে। পরদিন ঘুম ভাঙে রাখালের ধাক্কাধাক্কিতে। স্বভাবতই কিছু ঘুম কিছু জাগরণের মধ্যে উদ্ভাসিত হয় বাদশা পুতুর মাথা।
এরপর মফস্বলের চিকন পথঘাট পেরিয়ে রিকশা এসে ঠেকে শহরতলির এক পুরোনো বাড়িতে।
ব্রিটিশদের বানানো লাল ইটের বাড়ি।
পেঁচানো সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে মুনতাসিরের মনে হয় অনন্তের দিকে উঠছে।
যেন চেতনা ফেরে, এটাই সুবর্ণার বাড়ি কি না।
রাখাল আশ্বস্ত করে, এটাই। সুবর্ণা কিছু পরে আসবে।
বড় বড় পর্দা উড়ছে। ঘরের আসবাবপত্র থেকে সমস্ত অবয়বে একটা রাজবাড়ি রাজবাড়ি গন্ধ। বিমূঢ় হয়ে দেখতে দেখতে ঘরের এক পাশের কুশন বিছানো কার্পেটে বসে পড়ে মুনতাসির, জায়গাটা এমন, যেন এক্ষুনি এখানে কোনো বাইজি এসে নাচতে শুরু করবে। শরবত, প্রাথমিক নাশতা, সব আপ্যায়ন বাদশা পুতু করছে দেখে চক্ষু চড়কগাছ মুনতাসিরের। লঞ্চ থেকে পুরো পথটা কী ঘোরে আচ্ছন্ন ছিল সে জানে না।
এসেও কোন ঘোরে ডুবেছে, এতসব কাণ্ড যে হচ্ছে হুঁশই নেই তার।
বাদশা পুতু তাদের নামিয়ে বিদায় নেওয়ার কথা। কিন্তু তিনি রয়ে গেলেন, সুবর্ণার পাত্তা নেই।
এতক্ষণে প্রযুক্তিতে চেনা একটা মেয়েকে দেখার টেনশনে বুক ধড়ফড় করে।
ঠা ঠা দুপুরটা হেলান দেয় বিকেলের গায়ে। বিকেল রাত্রির।
সুবর্ণার খবর নেই।
অবশ্য এ নিয়ে আগ্রহ অনেকটাই থিতিয়ে এসেছে মুনতাসিরের। বিকেলে যখন অপমানবোধে চলে যেতে চাইছিল মুনতাসির আচমকা বাদশা পুতু কঠিন হয়ে ওঠে। শান্তভাবে সবাইকে বসতে বলে ধীর কণ্ঠে জানায়, সুবর্ণা তারই মেয়ে। এটা মুনতাসিরের স্ত্রী সুবর্ণা জানত।
কেমন এলোমেলো হয়ে যায়। যতবার সুবর্ণার জন্য বুক উপচে কান্না আসতে চায়, ততবার অপুর মুখ—। এবার বাদশা চাচার মেয়েকে নিয়ে ফাজলামো? এমন আর কত গোপন খেলা খেলেছে সে মুনতাসিরের সাথে, নিজ ঘরে গিয়ে বাতি নিভিয়ে একটু বিশ্রাম করে একা হয়ে যায় মুনতাসির।
অন্ধকারে চোখ মেলে রাখে।
বাইরে থেকে আসা আলো দেয়ালে অদ্ভুত ছায়া ফেলেছে। সেই ছায়ায় কত ছবি, অনেকটা আকাশের মতো, কখনো মানুষের, কখনো বিড়ালের।
হামাগুড়ি দিয়ে অনন্ত নামছে।
এ কোথায় এসেছি আমি?
সুবর্ণার সঙ্গে দেখা করার স্বাদ তলানিতে।
আশ্চর্য মিথ্যুক। তার স্ত্রী না করেছিল বলেই এমন খেলাটা খেলল?
যেহেতু বাদশা পুতু আছে, ওখানে অনেক ঝামেলা বলে বড়মা রাখালকে নিজের কাছে নিয়ে গেলেন। মুনতাসির কেন ফোন রেখে দিল, বাদশা পুতু থাকতে মুনতাসিরের কোনো চিন্তা নেই—বাদশা পুতুর ফোনে এই সব বড়মা যখন বলছিল তখন মুনতাসিরের মাথায় চক্কর দিচ্ছিল ঘুণপোকা, আমি যদি এখান থেকে বেরিয়ে কোনো সমুদ্রে নিজেকে ভাসিয়ে দিই?
কলাপাতা শাড়ি পরে সুবর্ণা আসে।
ফের হিমহিমে কুয়াশায় মিলিয়ে যায়।
এ বাড়িতে কেউ কি নেই?
একটি পোকা চলার শব্দও হচ্ছে না যে?
আচমকা একটা সুন্দর আত্মা উড়ানিয়া সেতারের শব্দে হুঁশ ফেরে মুনতাসিরের। সে বিছানা থেকে মেঝেতে দাঁড়ায়।
সমস্ত পরিবেশকে কবজা করে এমন আকুলে বাজছে সেই সুর, মুনতাসির সে সুরে সমর্পিত হয়ে আচ্ছন্নের মতো হাঁটে।
নিজেকে তার প্রাচীন বাড়ির রাজার মতো অনুভূত হয়, যে দরবার সেরে বাইজির ঘরে যাচ্ছে।
সুরের মোহ ধরে ধরে সে হেঁটে সিঁড়ি বেয়ে একটি কক্ষের দরজায় দাঁড়ায়। এখানেই কেউ আচ্ছন্নের মতো বাজিয়ে যাচ্ছে।
দরজার পর্দা উড়তে থাকলে সে কক্ষের ভেতর পা বাড়ায়, ঘরের মধ্যে উজ্জ্বল আলো থাকলেও আঁধারির খেলা আছে।
মিউজিকের কি ঘ্রাণ আছে?
সুরের সঙ্গে সঙ্গে একটা ঘ্রাণ ছড়াচ্ছে।
সে কক্ষে ঢোকামাত্র সেতার বন্ধ হয়ে যায়।
যে বাজাচ্ছে, এত নিমগ্নতার মধ্যে কীভাবে বুঝল ঘরে কেউ ঢুকেছে।
সামনের বিছানাতেই সেই নারী।
নিঃশব্দে সেতার সরিয়ে রাখছে।
আচমকা দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে হিমস্রোত বয়ে যায়। আরে এ যে পূর্বাশা।
এই আমার সর্বনাশের শুরু হলো, মনে মনে ভাবতে থাকে মুনতাসির।
এই এখন আমি স্বপ্ন-বাস্তবতার ভেদ হারাচ্ছি।
যেন সাঁতারহীন জলে পড়েছে, এই অনুভবে সে কিছুক্ষণ নিজের মধ্যে মোচড় খেয়ে সামনে এগিয়ে যায়, তোমার নাম কী?
ধীরে নিশ্বাস নিয়ে ঠোঁটচাপা উত্তর আসে, সুবর্ণা।
না, না এ হতে পারে না।
ফেসবুকে দেখেছি। অন্য মুখ। তুমি বাদশা পুতুর মেয়ে, এখন বলছ...তোমাদের সবটাই মিথ্যা, সব ভুয়া। আমার মতন একজন মানুষের সঙ্গে এসব খেলা খেলে কী মজা পাও তোমরা? তুমি রাতে লঞ্চে গেলে কী করে? সুবর্ণা এইবার বিছানা থেকে নেমে ঝেড়ে দাঁড়ায়।
নিজেকে বিন্যস্ত করে বলে, মুনতাসির, সরি, আমি পুরো দিন আপনার সামনে আসিনি। আমার শৈশবের এক বন্ধু মারা গেছে। আমি সারা দিন তার ওখানে ছিলাম। এসে শুনলাম, আপনারা আমার কোনো খোঁজ করেননি। এরপর জানলাম রেস্ট নিচ্ছেন, তাই সেতার নিয়ে বসলাম।
ঘুমে ডিস্টার্ব করলাম?
এই সব কী বলছেন মেয়ে হিবিজিবি?
আমাকে পাগল মনে করেছেন? দিব্যি লঞ্চে আমার সাথে—বলে বিরক্তির তুঙ্গে যাবে যেই মুনতাসির,...ওপরে হাত উঠিয়ে সুন্দর ভঙ্গিতে সুবর্ণা বলে, ঠিক আছে, তুমি যা বলছ তাই।
তুমি বাচ্চাদের মতো আমার সঙ্গে তাল দিচ্ছ, তুমি জানো আমার অ্যাবনরমাল ব্যাপারটা, তাই, তাই—।
আমি আপনার অ্যাবনরমাল কিছু জানি না, আপনি না সরি তুমি, আমরা তুমি করে কথা বলতাম।

না, আমি তোমাকে তুমি করে বলতাম না। তুমি লঞ্চে একা একা কী করছিলে? কেন আমার কাছে গেলে? সব বাদ, তুমি ফেসবুক প্রোফাইলে নিজের আসল চেহারা দাওনি কেন?

তোমার কথার উত্তর আমি দিতে পারব না। তবে প্রোফাইলে অনেকেই নিজের আসল ছবি দেয় না। আমি চাইনি পাবলিক প্লেসে আমার ছবি আসুক। তোমরা সবাই ধাপ্পাবাজ।

আমি এখন চলে যাব, বলে মুনতাসির ঘুরতে যাবে, আচমকা একটা আলো এসে সুবর্ণার মুখে পড়ে এবং সুবর্ণা আশ্চর্য ঘোর চোখ নিয়ে মুনতাসিরের দিকে তাকায়, আকুতি জানায়, প্লিজ এভাবে যেয়ো না, আমাদের কোথাও মস্ত গন্ডগোল হচ্ছে।

তাজ্জববোধে মুনতাসির দেখে এই চাহনিতেও চুম্বক টান আছে, তবে এ চাহনি পূর্বাশারই। তবে সেই মাদকতা নেই, অন্য রকম। এ নারী কত রকম কী জানে বিভ্রমে সে চক্কর খেয়ে ওঠে। সে ঘোর কণ্ঠে বলে, সত্যটা কী তবে?

সত্যটা কী তা জানার জন্য এত অস্থির হচ্ছ কেন, মুনতাসিরকে ডিঙিয়ে সামনে আসে সুবর্ণা। আমার নিজেরই আশ্চর্য সব জগৎ আছে। তোমাকে সব বলব, প্লিজ তুমি ঘরে আসো।

মোহগ্রস্তের মতো ওর পেছন পেছন গিয়ে ফের বাঁক ঘুরে নিজ ঘরে বজ্রাহতের মতো বসে থাকে সে।

এসব কী হচ্ছে তার সঙ্গে?

এই মেয়ে পূর্বাশাই আর পূর্বাশা হলে যত সে প্রশ্ন করবে সাতঘাটের জল খাওয়াবে। তার চেয়ে এই সব বিষয় চেপে যাওয়াই ভালো।

স্ত্রী সুবর্ণাকে বোধের কোষে কোষে তীব্রভাবে মনে পড়ায় নেতিয়ে পড়ে সে।

লঞ্চেও লক্ষ করেছিল সুবর্ণার প্রায় সবকিছুর সঙ্গে এই পূর্বাশারও অনেক মিল। লক্ষ করে দেখেছে ও ওর হাঁটা, কথা বলার ভঙ্গি সব স্ত্রী সুবর্ণার মতো।

সুবর্ণার সঙ্গে ফেসবুক সুবর্ণারও মিল ছিল। রাতের লঞ্চে সেভাবে এগুলো চোখে পড়েনি।

আসলে এও এক ভ্রম।

মুনতাসির সুবিশাল এক ভ্রমচক্করে পড়েছে।

সুবর্ণাকে আকুলভাবে মনে পড়ে তার।

যখন ধর্ম, জন্ম, মৃত্যু এসব নিয়ে বিভ্রমে পড়ে যেত তখন সুবর্ণা তাকে যুক্তি দিয়ে বোঝাত। আমি কে, কোত্থেকে এলাম, এসব ভাবতে গেলে যেকোনো একটা শক্তির কাছে মাথা নত করতেই হয়। নিঃসীম মৃত্যুকে সামনে রেখে কী না ঘটছে? স্বার্থের লড়াই, অস্ত্রবাজি, হানাহানি। আসলে এসব জীবনকে ভুলে রাখার প্রক্রিয়া।

এখন কেন এত জীবন-মৃত্যু নিয়ে ভাবছে মুনতাসির। তার অবচেতনে অজান্তে কোথাও কি মনে হচ্ছে এই মেয়েটি পূর্বাশা, সুবর্ণা কেউ না। এ এক অশরীরী ছায়া?

ছায়া কোত্থেকে আসে?

মৃত্যুর পর।

সারা জীবন এমন অনেককে তার ছায়া মনে হয়েছে। এ নিয়ে দ্বন্দ্বে ধর্ম নিয়ে, আত্মা নিয়ে প্রশ্নে কত কথা বলেছিল সুবর্ণা। এই যে হত্যা, হানাহানি, এসবই জীবনকে ভুলে থাকার প্রক্রিয়া।

যে জীবনের প্রতি এত প্রেম তাকেই ভুলে থাকার এক কায়দা। নিঃসীম মৃত্যুকে সামনে রেখে কী না ঘটছে? মানুষের কাছে মহামূল্যবান তার প্রাণ। মৃত্যুর পর সৃষ্টিকর্তার কাছে যা দর-কষাকষি তা সেই প্রাণের স্বার্থেই।

আর এই যে আত্মারা মানুষ হয়ে ঘোরে—

এসব বাজে কথা। এ তোমার মনের বিভ্রম। তুমি মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলো। পৃথিবীতে এমন আত্মা বলে কিছু নেই।

নীল হয়ে আসছে সুবর্ণার মুখ।



মাথা চেপে বিছানার মধ্যে নিজের সমস্তটা ছেড়ে দেয় মুনতাসির

ধীরে ধীরে নিঃসাড় হয়ে গেল তার দেহ।

বিছানায় হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে বসে। ধীরে ধীরে আত্মার মধ্যে কেমন যেন তেতো জল জমতে থাকে। মনে হয় স্পষ্ট, এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি। পুরোটাই একটা স্বপ্ন।

কোনো কারণ ছাড়া লাগামহীনভাবে এত কঠিন হয়ে ওঠে সেই সত্য, হাতড়ে হাতড়ে ফোন খুঁজে বিমর্ষবোধ করে।

ঘরের মধ্যে আলোছায়ার চক্করণ। একটা উত্তুঙ্গ উচ্ছ্বাস পায়ের পাতা থেকে মাথা পর্যন্ত শিরশিরে বোধ এনে দেয়।

তবে ওটা যদি সত্যই হয় তবে সে এখানে কেন? ঘর বা তাসের ইথারে ইথারে মুনতাসিরের প্রশ্ন ছড়িয়ে পড়ে।

আচমকা সব উত্তাপে নুন পড়ে।

বাদশা পুতু ঘরে আসে।

আমি একটু মাঝশহরে যাচ্ছি। তুমি ঘর থেকে কোথাও বেরিয়ো না। অত্যন্ত সাবধানে থাকবে।

এর মানে কী?

কিছু স্বপ্ন নয়।

সুবর্ণা কেন তুমি আমার সঙ্গে এমন করলে? আমাদের জীবন সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল সুবর্ণা, যখন অপু-পর্বটা ছিল না। কী অত্যাশ্চর্য মধুর দাম্পত্য ছিল আমাদের। আমরা দুজনই জীবনের কী সব বিষাদ বিস্ময় নিয়ে নেতিয়ে পড়লেও কী সুন্দর আমরা একজন আরেকজনকে টেনে তুলতাম।

তোমার জীবনের অতীতের দুঃসহ পাণ্ডুলিপি নাই-বা খুলতে আমার সাথে? তোমার আগের জীবনটা নষ্ট করার পরও এই জীবনটাও নষ্টের ঝুঁকি নিতে পারলে জাস্ট অপুর জন্য?

আগের ভাঙনের পরই তো তোমার জীবন থেকে অপুর বিচ্যুত হওয়ার কথা, ছিটকে যাওয়ার কথা তার, কেন যেতে দিলে না? কেন আঁকড়ে রাখলে ওকে?

এরপর আমি আর কী বুঝব।

৫.

মুনতাসিরের সঙ্গে বিয়ের আগে সুবর্ণার জীবনটা সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে বইছিল।

মফস্বলে রেললাইনের পাশে তাদের বাড়ি ছিল।

বাড়ি ঘেঁষে মেথরপট্টি।

ট্রেনের ঝিকঝিক শব্দ কানে বৃষ্টির সুখ এনে দিত। মাগরিবের সময় ঘরে ঘরে বাতি জ্বালানো আর ভোরে উঠে জানালা খুলে শুদ্ধ বাতাসের উষ্ণাসনে নিজেকে ভিজিয়ে নেওয়া তার দারুণ প্রিয় ছিল। নিজের মধ্যে সারাক্ষণ কচ্ছপের মতো গুমরে থাকত।

এই রেললাইন দিয়েই স্কুল-কলেজের কত পথ মাড়িয়েছে।

কলেজজীবনে অপু যখন দেশের বাইরে তখন অন্তর্মুখী সুবর্ণার জীবনটা তুমুল একাকিত্বে ঢেউ খাচ্ছিল। তখন কলেজের ফাইনালে পড়া গান-নাটকে দক্ষ এক ছেলের প্রেমে অনেক মেয়েই পড়ছিল।

সুবর্ণা এড়াত তাকে।

একদিন কলেজেরই এক প্রোগ্রামে সুবর্ণাকে যৌথ উপস্থাপনার সঙ্গী হতে বলে।

এইভাবে পরিচয়।

প্রেমে গড়াল কিছুদিনের মধ্যে।

কিন্তু মুশকিল ওর প্রেমে অনেক মেয়েই পড়ে। এবং ছেলেটি বিশেষ কাউকে এড়িয়ে যায় না, ভালোও বাসে না। এই যে এড়িয়ে যায় না, এতেই সুবর্ণার মাথায় উত্তুঙ্গ আগুন জ্বলে। ছেলেটির নাম অন্তু। ঘোর বৃষ্টিতে একটি ছোট রেস্টুরেন্টে অন্তুর সঙ্গে খেতে খেতে ফের যখন রিকশায় তারা দেহের সঙ্গে দেহ লাগায় তখন বিদ্যুৎ বিচ্ছুরণ ঘটে।

সরোবরে একটি মেয়ে ধর্ষিত হয়েছে।

একসময় সে মৃত্যুবরণ করে। কাণ্ডটি ঘটিয়েছে এক মেষপালক। মেয়েটি কী করে মরে গেল? মেয়েটির বাবার সীমাহীন যন্ত্রণা।

চাবুকের আঘাতে নিজেকে নিজেই পিটিয়ে রক্ত বের করছেন—একটা ছবিতে দেখেছিল সুবর্ণা। কেন সেই দৃশ্য তখন মনে পড়ল জানে না।

তারা যখন রিকশায় ভীষণ বৃষ্টি শুরু হলো। সুবর্ণা অন্তুর গা ঘেঁষে বলল, আমার ভীষণ ভয় করছে।

অন্তুর ভেজা শরীর তার সঙ্গে লেপটে যাচ্ছিল।

অন্তু তুমি স্নেহার সঙ্গে মিশবে না।

মানে? দপ করে জ্বলে উঠেছিল অন্তু, এই রিকশা ঘোরাও।

রিকশা ঘোরাচ্ছ কেন? তুমি আমার পুরো কথাটা শোনো।

এই স্নেহাকে অন্তু বন্ধুর নাম করে অনেকটা মনোযোগ দেয়।

দেখতে সুশ্রী ওই মেয়েটার দিকে ঝুঁকে গাঢ় কণ্ঠে যখন কথা বলে অন্তু, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সুবর্ণা। ফের একটা বড় রেস্টুরেন্টে গিয়ে অন্তু বলে আমি আজ পরিষ্কার করে বলছি—।

তাকে আটকে দেয় সুবর্ণা।

চারপাশে ঘোর বৃষ্টি। দুজনেই আধভেজা। নিজের ওড়নাটি নিয়ে অন্তুকে মুছতে চেয়েছিল, অন্তু খেপে ছিল। করতে দেয়নি।

ভেতরটাও হিরহির কাঁপে সুবর্ণার, তুমি পরিষ্কার করে এ-ই বলবে তো, স্নেহার সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব পবিত্র। এ থেকে বিচ্যুত হতে পারবে না। তবে তুমি আমার সঙ্গে ছিন্ন করো। বলেই ভেতরে ধস নামে।

এ কী বলল সে? এখন মেজাজ খারাপ করে যদি অন্তু মেনে নেয়, সুবর্ণা কী করে বাঁচে?

সুবর্ণাদের ছিমছাম পরিবার। এক ভাই, এক বোন। কিন্তু বাবা-মার দাম্পত্যের টানাপোড়েন দুই ভাইবোনের সম্পর্ক মজবুত করলেও তাদের জীবনে অন্ধকার নামিয়ে এনেছিল। সুবর্ণার মায়ের এক চাচাতো ভাই ইমরান মামাকে নিয়ে মা আর বাবার মধ্যে অহর্নিশ আগুন জ্বলত।

সুবর্ণা ভাবত, মা কেন সম্পর্কটা থেকে আলাদা হতে পারছে না? মা বলত, তোর ইমরান মামার মৃত্যুরোগ, কিছুদিন পর মানুষটা পৃথিবীতে থাকবে না। এমন অবস্থায় কীভাবে আমি বিচ্ছিন্ন হই?

বাবা বলতেন, ওসব ছুতো। ক্যানসার-ফ্যানসার কিছু নেই। পরে জীবনের একটা প্রান্তে বুঝেছে, এক প্রজন্মের দায় আরেক প্রজন্ম বয়। আর পৃথিবীতে সন্দেহের চেয়ে খারাপ কিছু নেই। তারপরও সন্দেহ কেন? কেন স্নেহাকে নিয়ে সুবর্ণার মনে এত ভয়, এত বিষ? জানে না সুবর্ণা।

আর অপুকে নিয়ে সুবর্ণাকে সন্দেহ?

সেই জন্ম থেকে, যেদিন জন্মাল সুবর্ণার এক বছর। মনে হতো যমজ আরেকটা হয়েছে। ছোট পুতুল ভাইটাকে নিয়ে ঘুরত নিজের দেহের ওজনের ধার না ধেরেই।

দুজনের বায়নাও একই ছিল। শৈশবে এই মাকে পেয়ে নিজের আপন মায়ের শূন্যতা বলে কিছু ছিলই না সুবর্ণার মধ্যে। তারা নিজেরাই এমন কঠিন বন্ধু ছিল বাইরের জগতে তাদের কোনো বন্ধু ছিল না।

ক্রমশ তারা বড় হতে থাকল।

সত্যিই যেন যমজ।

এভাবেই বেড়ে উঠছিল তারা।

সবই ঠিক চলছিল।

সংকটটা বাধে একদিন।

সেদিন সুবর্ণারও জন্মদিন ছিল। তাদের বয়স তখন

বারো। অপুর জন্মদিনের সেই পার্টিতে সুবর্ণার ফুপু দুই ভাইবোনের উচ্ছ্বাস দেখে বয়সের ভেদাভেদ ভুলে বলে, ভালোই তো বিয়ে করে দুজন এক বাড়িতে থেকে গেলেই হয়। কাউকে দূরে যাওয়ার কষ্ট পেতে হলো না।

ঘরে বজ্রপাত হলো।

পলায়নপর বাতাসের কোষে কোষে কী যেন কি ভিনদেশি পোকাদের ওড়াউড়ি। চিকন প্রদীপ শিখা কেটে কেটে যায় আত্মার নহর।

হে অন্ধকার, তুমি জাগ্রত হও।

জাগ্রত হয় সুবর্ণার জীবনে বিপন্নতা শুরুর প্রথম অধ্যায়।

তাকে বাবা-মা ডাস্টবিন থেকে কুড়িয়ে পেয়েছিল।

কোন সেই পিতা-মাতা মহাশূন্যের পৃথিবীর নর্দমায় তাকে একাকী ফেলে চলে যায়?

মাথাটায় এত বড় বজ্রপাত পড়ত না। সত্যটা যদি ফুপুর কুৎসিত ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে জানা না হতো। বাবা-মা আমূল জড়িয়ে বলে তুই-ই আমাদের সন্তান। কিন্তু সুবর্ণার পৃথিবীটা অর্থহীন হয়ে যায়।

সে অপুর সঙ্গে আর সহজভাবে মিশতে পারছিল না। কিন্তু অপুর অবিশ্রান্ত মিনতি আর চেষ্টায়ই তার সঙ্গে পুরোনো আবেগে মিশতে শুরু করেছিল সুবর্ণা। তার জীবনের অনেক কিছুই জানে না মুনতাসির।

জন্মদিনের ঘটনাটা জেনেই অপুকে নিয়ে দুজনের মধ্যে আচমকা বিষের দহন ঢুকেছিল। মুনতাসিরের ডাক্তার আর বড়মা সুবর্ণাকে বলেছিল, এমন কোনো বিষয় মুনতাসিরকে বলা ঠিক না যা তার মাথা নিতে পারে না। অতীতের কোনো জটিল অধ্যায় তাকে না বলাই ভালো। এত কিছু মাথায় নেওয়ার মতো অবস্থা মুনতাসিরের নেই। কিন্তু প্রচণ্ডভাবে বলতে চাইত সুবর্ণা। ভেতরটা একেক সময় খাক হয়ে যেত বলার তৃষ্ণায়। আচমকা ওই অধ্যায় ছেড়ে সুবর্ণা যেন এই চক্রের বিলোড়ন থেকে পালাতেই নিজেকে অন্য অধ্যায়ে নিয়ে ফেলতে চায়।

সুবর্ণার বুক ধুকপুক থামিয়ে সস্নেহে মুঠো চেপে বলেছিল অন্ত, আমি তোমার ভেতরকার সৌন্দর্যের উদারতা দেখেই তোমার কাছে এসেছি। তুমিও যদি অন্য দশটা মেয়ের মতো—।

অন্তর ভেজা শরীর লেপটে যাচ্ছিল তার গায়ের সঙ্গে। দিগ্‌বিদিক আছড়ে পড়ছে জল, শীতে দাঁত ফেটে যাচ্ছে। কোঁকড়ানো চামড়া ভিজে উঠছে ছিটানো জলে।

রিকশাওয়ালা পেড়ে উঠছে না বাতাসের সঙ্গে, আঙুলের চিমটি থেকে উড়ে যেতে চাইছে অয়েলক্লথ। সেই হিমজলের ঘর্ষণেও উত্তপ্ত হয়ে উঠছে সুবর্ণার দেহ।

সে কথা হারিয়ে ফেলে, সিগ্রেট খাবে?

অন্তর এ কথায় অনড় সুবর্ণা ভেঙে পড়ে, তারপরও স্নেহাকে ছাড়তে পারবে না?

ছাড়ার জন্য যুক্তি থাকতে হবে তো। উত্তপ্ত শোনায় অন্তর কণ্ঠ, তাকে ছাড়লাম মানে শিকার করে নিলাম আমাদের সম্পর্কে অসততা ছিল। তার চেয়ে বলো না সুবর্ণা আজকের বৃষ্টিটাকে দুজন ভাগ করে নিলাম।

এভাবেই বিয়ে হয়ে যায় একদিন।

বিদেশ থেকে ফিরে বিষ খায় অপু।

সেই বিষ সংসারকেও বিষাক্রান্ত করে তোলে।

তার আগে দুজনের দাম্পত্যে কি সুখটাই না ছিল।

সুবর্ণার চোখ দেহ ছুঁয়ে ছুঁয়ে বলেছিল অন্ত, আমার সাতপাহাড়ের গম্বুজ, আমার এক অনন্ত পৃথিবী, সমুদ্রের কাছে গিয়ে সে কী দেহমন নিবিড়তার বিস্ফোরণ। অপুর বিষের খবর পেয়ে হাসপাতালে সারা দিন ছিল সুবর্ণা। ফোনের সুইচ বন্ধ করে।

অপুকে নিয়ে শুনেছে অন্ত।

কিন্তু আত্মহত্যা কেন করতে গেছে সে, জানেনি, সুবর্ণাও বলেনি। কারণ সুবর্ণা জানেনি। সে জানত বিদেশ থেকে প্রচুর দুরবস্থাগ্রস্ত হয়ে ফিরেছে। এরপর এমন কাণ্ড।

ফের জন্মদিনের বাতাসটা নতুন চাউরে গরম হলো। মাথার শিরা দপদপ করত সুবর্ণার। লোকে যা বলছে বলুক। এত নোংরা হতে পারে মানুষ। কিন্তু তারপরও কেন, সে ব্যাপারটা টেরই পায়নি, অথবা না জানিয়ে মৃত্যুর পথে গেল।

অপু শুধু দেউলিয়া হয়ে এসেছে বলে?

কিছুতেই মানতে পারছিল না, আর কোনো যোগসূত্র খুঁজেও পাচ্ছিল না।

এ নিয়ে দাম্পত্যের প্রথম বড় কলহটা হলো। চারপাশে জাঁকিয়ে নেমেছে শীত। ক্রোধ কম্পিত অন্ত বলে, তুমি যেভাবে ওর গল্প আমার কাছে করেছ, তাতেই আমার মনে হয়েছে, তোমাদের দুজনের মধ্যে কিছু আছে। সে বিষ খেয়েছে আর সেখানে গিয়ে তুমি পাত্তাহীন, ফোনও বন্ধ করে রেখেছ, আমি কী বুঝব?

সুবর্ণার ভেতরটা হিমহিম স্রোতে কাঁপছিল।

যেনবা বৈরী বাতাসের হুল্লোড়ে আত্মার আগল ছিঁড়ে যাচ্ছিল।

এক সাথে ভাইবোন হয়ে আমরা বড় হয়েছি। একটা জন্মদিনে কে কী বলল তাতেই আমাদের সম্পর্কটা বদলে গেল? ভাইবোন তো হাস্যকার লাগছে এখন তোমার কাছে, ওটা বাদ দিলেও একটা ছেলে আর মেয়ের সম্পর্ক মানেই খারাপ কিছু?

আমি খারাপ কিছু বলেছি? সিগ্রেটের ধোঁয়া ফোঁস ফোঁস ছাড়ে অন্ত। ছেলেমেয়ের সম্পর্ক খারাপ হবে কেন? বিয়ের পর প্রেম থাকলেই খারাপ। তুমি বিয়ের আগেই স্নেহাকে মানতে চাওনি।

এই নিয়ে তুমুল দ্বন্দ্বের তিন দিন পর অপুর জ্ঞান ফিরল। সেদিন অফিস যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল সুবর্ণা।

অন্তও তার ব্যবসার কী এক কাজে শহরের বাইরে যাচ্ছিল। মা ওদের দাম্পত্যের মধ্যে অপুর ব্যাপারটা নিয়ে অশান্তি তা জানতেন না, তিনি এসে ভেঙে পড়েন, জ্ঞান ফিরতেই তোমার নাম নিচ্ছে, দোহাই, তুমি একবার চলো।

ভূমিকম্প হলো ঘরে।

তুমুল অস্বস্তির পীড়নে নিজ ফাঁসে নিজেই ঘোর চক্কর খায় যেনবা সুবর্ণা, অন্তর দিকে তাকিয়ে সে খেই হারাতে থাকে। এসব কী বলছেন? সে এভাবে আমাকে খুঁজবে কেন? শকুনের মতো সুবর্ণার দিকে মুখ তাক করে বসে ছিল অন্ত। তখন মা সহজ কণ্ঠে বলেন, সে কী! তুমি তার এত কাছের বন্ধু। কেন এসব করেছে। কী বৃত্তান্ত তোমাকে বলবে না তো কাকে বলবে?

ঘরের মধ্যে প্রচ্ছায়া পড়ে।

যাও, গিয়ে বৃত্তান্ত শোনো, হিমহিম কণ্ঠ অন্তর ।

'এত যদি সরল-গভীর বন্ধুত্ব, কেন বিষ খাচ্ছে, খাওয়ার আগে জানাতে পারেনি? আপনারা সবাই সব জানেন, আমাকেই যত অন্ধকারে রাখা।'

সেদিন কঠিন কষ্টে সারা দিন অতিবাহিত করেও সুবর্ণা হাসপাতালে যায়নি।

বরং অর্ধেক অফিস করে ঘর গোছাতে গিয়ে অন্তর শার্টের পকেটে দুটো সিনেমার টিকিট দেখে।

এইভাবে আরেক দিন পকেটে আটকে থাকা কানের দুল।

দাম্পত্য জীবনের বাতাস থেকে রংধনু উড়ে যায়। একজন অপুকে নিয়ে, আরেকজন স্নেহাকে...এই করে জীবন ওদের কখনো ভোঁ করে আসমানে তোলে, পাহাড়ে ধাক্কা দেয়, কখনো মাটিতে আছড়ায়। এক ভোরে অনেক নিভৃতে একটি ভ্রূণ আবিষ্কার করে সুবর্ণা।

সুবর্ণাকে টানে হেমন্ত, শহর পেরোনো ধানখেত, ঋতুর



অন্তর ভেজা শরীর তার সঙ্গে লেপটে যাচ্ছিল

প্রচ্ছন্ন শিশির, শৈশবের নৈঃশব্দবোধ, সার সার ছোট কাঁথার কারুকার্য।

এত অশান্তির মধ্যে গর্ভে আসা এই শিশুটিকে নিয়ে কেন যে এত আকুতির জন্ম হয়েছিল, সুবর্ণা নিজেও জানত না।

তখন সে আচমকাই মায়ের বাড়ি আসে। উচ্ছ্বাসে, উল্লাসে রেললাইনের স্লিপার টপকে গর্ভের শিশুর সঙ্গে কথা হয়, হেই তুই আমাকে তেপান্তরে নিয়ে যাবি, হেই তুই আমাকে সাত আসমানের রংধনু দেখাবি, এরপর মেথরপট্টিতে, পূজামণ্ডপ দেখতে দেখতে কত কথা।

জানিস, শৈশব থেকেই এখানে পূজা দেখতে আসি। কোনো দিন কল্পনাও করিনি তোকে নিয়ে আসব।

এর মাঝে সংসার চলতে থাকল সাত সাগরের ঢেউয়ে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে।

৬.

শুনেছিল সুবর্ণা, অপুর বিপর্যস্ত হওয়ার সত্যটা। বিদেশ গিয়ে আসার আগে আগে অন্য একটা অসুখের কারণে টেস্ট করাতে গিয়ে ধরা পড়েছিল, সে আর বাবা হতে পারবে না। সুবর্ণার বিয়ের খবর সে জানত। এ কারণে সে সুবর্ণাকে কিছু শেয়ার করতে পারছিল না। এসে জানিয়েছিল ব্যবসায় বিশাল ধরা খেয়েছে। সে সামলে উঠতে পারছে না।

সুবর্ণা কার সাথে অপু যে বাবা হতে পারবে না কোনো দিন, এটা কীভাবে শেয়ার করে?

একদিন রাতে আত্মার সাঁকো ভেঙে পড়ে। ধীরে, যেন প্রেমের গল্প করছে এভাবে শুরু করে অন্ত, তুমি লাস্ট কবে অপুর সাথে দেখা করতে গেছিলে?

ও আমার ভাই, এ কথা বলতে বলতে গলায় রক্ত উঠলেও বলব সে আমার ভাই, নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলে সুবর্ণা। অন্ত ঝাঁজ মেশানো কণ্ঠে বলে, আমি কী এমন বললাম যে তুমি কৈফিয়ত দিচ্ছ আগেই।

তোমার এই কণ্ঠ আমি চিনি। সুবর্ণা বলে, তুমি এ দিয়ে শুরু করেছ, ওর প্রসঙ্গ তুমি তোলা মানেই তা তাল থেকে মহাতালে যেতে বাধ্য।

তার মানে কী? বিছানায় ছড়িয়ে শুয়ে ছিল অন্ত, উঠে বসে, তোমার ভাইকে নিয়ে এ সংসারে কথা বলা যাবে না?

এক অঙ্কুরিত স্ফুলিঙ্গ ছায়াহীন কোন ইথার দিয়ে যে উড়ে উড়ে যায়।

সুবর্ণার রক্তকণিকায় কান্না জমে, তুমি যেভাবে ভাই শব্দ উচ্চারণ করলে তাতে করে...।

ঠিকই ধরেছ...ঘরের স্তব্ধ বাতাসে হিমহিম গুঞ্জরণ, শব্দহীন।

বলো, যে খারাপ কথাগুলো বলার জন্য অপুর নাম নিয়েছ, সেই কথাগুলো বলো।

এত দাপট নিয়ে থাকো কেন। রাস্তার কাছে পড়ে থাকা কার না কার পাপ তুমি। পরগাছা হয়ে মানুষ হয়ে ফের যারটা খেয়েছ—।

অন্ত!

ক্রোধ আর অসহায় চিৎকারের সঙ্গে অনেকগুলো ধ্বনি বেরিয়ে আসে।

তখন সবেগে এমনভাবে অন্ত এসে দাঁড়ায় যেন তলোয়ার,

ধমক দিয়ে কী বলতে চাইছ? আমি মিথ্যে কিছু বলছি? সারাক্ষণ এমন একটা মৌজের মধ্যে কেন ঘোরো বুঝি না? আমি তো তোমার সাথে আজকাল সন্ধ্যায় থাকিই না, বাচ্চাটা আসলে কার?

পুরোটাই ভেঙে যেন দশ টুকরো হয়ে পড়ে।

আর কোনো ভার, কোনো শব্দ, কিছু নেওয়া যায় না। এ নিয়ে তর্কবিতর্ক তিক্ততা এমন জায়গায় গিয়ে ঠেকে, এককথায় ঝগড়া মারামারিতে গিয়ে পৌঁছালে অন্তর লাথি গিয়ে পড়ে সুবর্ণার পেটে।

চাক চাক রক্তস্রোত বেরিয়ে আসে।

কঠিন আঁধারময় ঘুলঘুলিতে ছেয়ে সমাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে দৃশ্য।

মাথার মধ্যে স্বপ্নপোকাটা শৈশবেই ঘুরত। এই সব পাকে পড়ে বিপর্যস্ত অপু দিশাহীন হয়ে যায়। কিন্তু সন্তানটা নষ্টের পর সুবর্ণা অন্য পৃথিবীতে চলে গেল।

কেমন ভাবলেশহীন, উত্তুঙ্গ বাতাসে উড়ো উড়ো। ছবি আঁকার ক্লাসে যাওয়া বন্ধ করল।

ঢাকায় আসার পর নতুন একটা জীবন ফিরে পেল মুনতাসিরের সান্নিধ্যে এসে।

আশ্চর্য সরল একটা ছেলে। পৃথিবীর পঙ্কিলতা যাকে এক ছিটে গ্রাস করতে পারেনি।

সুবর্ণা যেখানে থাকত তার পাশেই আর্ট ক্লাস। তার আর্টের অভিজ্ঞতায় সেখানে কাজ পায়।

পৃথিবীর সব মানুষ, পরিবেশ—সবকিছুর প্রতি এক অদ্ভুত বিবমিষা তৈরি হয়েছিল সুবর্ণার।

চারপাশে...জলে-স্থলে-নক্ষত্রে, সে তার শিশুকে উড়তে দেখত।

একাকী কক্ষের দেয়ালে হামাগুড়ি দিত সেই শিশু।

অদ্ভুতভাবে মুনতাসিরের মধ্যে সেই শিশুকে পেয়ে গেল সে।

এক অভাবনীয় আশ্চর্যবোধ। সুবর্ণা আর্ট খাতায় নিজের সন্তানের শৈশব, কৈশোর, যৌবন, সব রূপই এঁকে রেখেছিল। একেক বয়সে কেমন লাগতে পারে তার সন্তানকে, সবই মূর্ত করে রেখেছিল ছবিতে। নানা সময় সেই ছবিগুলো দিন-রাত উল্টেপাল্টে দেখত সে।

একসময় আর্ট ক্লাসে মুনতাসিরকে দেখে চমকে উঠল সে।

এ যে তার পেইন্টিংয়ের সেই যুবক অবয়ব রূপ।

অবশ্য তখন সুবর্ণাই অনেকটা ভারসাম্যহীন দিন কাটাচ্ছে। স্কুলটার মালিক সুবর্ণার বাবার বন্ধু। দূরে সরে যাওয়া সুবর্ণাকে কাছে নিয়ে আসতে দিশেহারা বাবা-মা তখন রাজধানীতে চলে আসে। পৃথিবীতে কারও সাথে কথা বলত না সুবর্ণা।

বাবা-মা প্রচুর মানসিক ডাক্তার দেখিয়েও কিছু করতে পারল না। সুবর্ণা তাদের সাথেও কথা বলত না। এদিকে ওকে সবচেয়ে ভালো বোঝে যে অপু, সে-ও তখন দেশের বাইরে।

চারপাশে হরিদ্রাভ ছায়ার হলাহল।

ভয়ানক নীরবতায় বিকট স্তব্ধ পরিবেশ।

বেদনার কাঠামো, সীমা-পরিসীমাহীনতায় ধাবিত।

যাযাবর ছায়াগুলো কোত্থেকে কোথায় উড়ে যায় কে দেখে?

মুনতাসিরকে দেখেই প্রাণবন্ত উচ্ছ্বাসে কথা বলে উঠল সুবর্ণা। সে তার সন্তানের বাবার যে কল্পিত অবয়ব এঁকেছিল, তা সেই ছোট্ট শিশুর মতোই। ফলে, তার কল্পনার শিশু আর তার বাবা দুটোর অস্তিত্বই মুনতাসিরের মাঝে দেখে বিমূঢ় বিস্ময়ে আবেগের স্রোতে ভাসানিয়া হয়ে ওঠে সুবর্ণা।

অন্য দিক থেকে নিজ জগতে চক্কর খাওয়া মুনতাসির তার পৃথিবীর বাইরে একমাত্র সুবর্ণাকে দেখেই গভীর আবেগে তার হাত ধরে বলে, গতকাল রাতে তাহলে তুমিই এসেছিলে? বড়মা আমাকে বললেন স্বপ্ন। কিন্তু আমি তো দেখছি সত্যি। সত্যিই, তুমি আমাকে এত ভালোবাস?

ভীষণ অপ্রস্তুত বোধ করার কথা সুবর্ণার, কিন্তু সে করেনি। এসব তার জীবনের আচমকা ঘটা বিস্ময়কর এক স্বাভাবিক প্রক্রিয়া মনে হচ্ছিল।

মাথার মধ্যে বড় হচ্ছিল ভ্রূণটি।

সে সুবর্ণার মাথাতেই জন্ম নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আকৃতি নিয়ে বড় হয়েছে।

দিন-রাত এই আঁকিবুঁকির মধ্যেই পড়ে থাকত সে। অন্তুকে তার সন্তানের বাবা কখনোই মনে হতো না। কিন্তু সুবর্ণার ছবির রাজ্যেই কিশোর সন্তান জিজ্ঞেস করেছিল, আমার বাবা নেই? স্কুলে সবাই টিপ্পনী কাটে আমি বাবাহীন, আরও খারাপ খারাপ কথা বলে।

তখনই সন্তানের কল্পিত চেহারার আদলে বাবারও একটা রূপ আবিষ্কার করেছিল। পেইন্টিংয়ের ক্লাসে যখন যায় তখন একজন ভালো ডাক্তারের চিকিৎসায় ছিল সুবর্ণা।

সে তার ছবির মানুষকে পেয়ে আপ্লুত।

মুনতাসির তার স্বপ্ন দেখা মানুষ।

একটা অদ্ভুত সূর্যের রংতুলিতে করা পেইন্টিং নির্মিত হয়ে গেল যেন।

সুবর্ণাকে বাস্তবে দেখার আগে এক রাতে স্বপ্ন দেখেছিল মুনতাসির, সে ছাদ থেকে পড়ে গেছে। অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।

নার্স হয়ে সেবা করেছিল সুবর্ণা। তারা স্বপ্নে অনেক ঘনিষ্ঠও হয়েছিল।

বাবা সব শুনে ঠান্ডা মাথায় বোঝায়, মুনতাসির তোমার পেইন্টারের ছবি না, ছবির মতো, আর স্বপ্নে মুনতাসির যাকে দেখেছে, সে তুমি নও, তোমার মতো।

বাবা চাইছিলেন না এমন মানসিকতা নিয়ে নিয়েই সুবর্ণা ফের কোনো নতুন জীবনে যুক্ত হোক। কিন্তু বাবা-মার প্রতিও তীব্র অভিমান ছিল সুবর্ণার। কেন দত্তক নেওয়ার ব্যাপারটি তারা গোপন করল?

বুক হু হু করত জন্মদাতা-জন্মদাত্রীর কথা ভেবে।

সন্তান গর্ভে এসে নষ্ট হলে জন্মদাত্রীর প্রতি ক্রোধ কমে যায় সুবর্ণার। মনে হয়, নিশ্চয়ই তার মায়েরও অন্তুর মতো কোনো হাজব্যান্ড ছিল। সে মায়ের গর্ভ থেকে চুরি করে নর্দমায় তাকে ফেলে গেছে।

মানুষ নিজের জীবনটা দিয়েই অন্যের জীবনটা মাপে।

এর মধ্যে সবচেয়ে ফাঁপরে পড়ে গিয়েছিল অপু।

এদিকে সুবর্ণার স্পন্দনহীনতা মুনতাসিরকে উন্মাদপ্রায় করে তোলে।

তার উদ্‌ভ্রান্তি মাত্রা ছাড়ালে রাখালের মাধ্যমে খোঁজ নিয়ে সুবর্ণার কাছে যায় বড়মা।

ছায়াচ্ছন্ন ঘর। হু হু বাতাস চারপাশে গুমর খাচ্ছে। বিছানার মেহগনি চাদরে রাজ্যির ধুলো নেমেছে। বড়মা নিম্নকণ্ঠে যথাসম্ভব অতি অস্বাভাবিক বোধগুলো বাদ দিয়ে মুনতাসির সম্পর্কে বলেন। মহিলা যত মুনতাসির সম্পর্কে বলেন, আশ্চর্যভাবে পেটের ডানের শিশু বাঁয়ে হামা দেয়, তার জন্ম হয়, সে বড় হতে হতে মুনতাসিরের আকৃতি নেয়।

ঢেউ রোমাঙ্গে কাঁপতে কাঁপতে সুবর্ণা প্রশ্ন করে, মুনতাসির মেনে নেবে তো, সে আমার সন্তানের বাবা?

তোমার সন্তান কই?

আমি রাখালকে সব বলেছি।

তুমি মুনতাসিরকে না বলে রাখালকে কেন বলেছ?

আমি বলতে চেয়েছিলাম, রাখাল আমাকে আটকেছে।

ভালো করেছ, আর শোনো মেয়ে, তোমার গর্ভে কোনো সন্তান নেই। এসব পাগলামি দিয়ে আমার অবুঝ ছেলেটাকে

দয়া করে পাগল কোরো না।

এসব কথোপকথনে ঘর উষ্ণ হয়ে উঠতে থাকলে সুবর্ণার হাত চেপে ধরেন তিনি। যেন সুবর্ণা কিছুতেই সন্তান নষ্ট হওয়া, সন্তানের বাবা এ প্রসঙ্গটা মুনতাসিরের সামনে না তোলে। শিশুর মতো মাথা মুনতাসিরের, সে এসব জট-জটিলতা বুঝবে না। মাঝখান থেকে ওর অবস্থা আরও খারাপ হতে পারে।

ছায়া পড়ে সুবর্ণার মুখে। এমন একটি চরম ব্যাপার গোপন করে কী করে সে মুনতাসিরের সাথে যুক্ত হয়?

এ ছাড়া এই ছবির মুখ, এ তো খুলে বলা হয়নি মুনতাসিরকে। যদ্দুর বলেছে, মুনতাসির বোঝেনি।

ধীরে ধীরে সব ঠিক হয়ে যাবে। বুদ্ধিমতী মহিলা রহস্যকণ্ঠে বলেন, তোমার এই হারানো শিশুটাই মুনতাসিরের ঘরে জন্মাবে...।

যেন তুরুপের টেক্কা।

দারুণ প্রভাবিত সুবর্ণা আত্মনিমগ্নতায় ঘোর খেতে লাগল, সত্যিই এ হতে পারে?

অপু বাবার রাখা প্রপার্টি নিয়ে কিছু একটা করায় ব্যস্ত হয়ে গেল।

এদিকে সুবর্ণার মাথা ছায়াশূন্য।

সে আর মুনতাসির দুজন বুঝ-অবুঝ মানুষ এক বাতাসে ঢেউ খায়, এক রঙিনে ওড়ে।

ইতিমধ্যে চিকিৎসায় অনেকটা ধাতস্থ হয়ে এসেছে সুবর্ণা।

বাবার সেই বন্ধু বিনা টাকাতেই সুবর্ণার চিকিৎসা করাত।

ধীরে ধীরে তার আঁকা স্কেচের মতো মুনতাসিরের মুখ অপহৃত হতে থাকলে মুনতাসিরের প্রতি প্রগাঢ় এক অনুভব তৈরি হয়ে গেছে বুঝতে পেরে সুবর্ণা আর সরতে পারে না।

ফের আরেকবার বিয়ের চক্করে আবদ্ধ হয় সুবর্ণা।

৭.

এ কেমন কারাগার? মুনতাসির ভাবে, একটি কক্ষে প্রহরের পর প্রহর কেটে যাচ্ছে একাকী।

পরক্ষণেই সংবিৎ ফেরে, সে কি কারও সঙ্গ চাইছে? না না—ভেতর আত্মায় তুমুল প্রতিবাদ ওঠে।

তবে কি সুবর্ণার সঙ্গ?

না, না, সুবর্ণা পূর্বাশা যে-ই হোক, কারও সঙ্গ চায় না মুনতাসির।

ধীরে ধীরে তাকে গ্রাস করতে থাকে ছায়া। সে জানালার পর্দা টেনে বিন্যস্ত হয়ে সোফাতে বসে। তার বুকের ভেতর হু হু বাতাসের কী এক অজানা রোদন ধ্বনি...কী একটা জন্ম, বেড়ে ওঠা, মাকে বন্দিনী এক চক্কর দেখে আজন্ম তার মায়ায় গেঁথে তাকে আর দেখতে না পাওয়া।

এসেছিল একজন সোনার কন্যা হয়ে, পুষ্পরিত করেছিল তার জীবন। প্রেম কী দেহ কী, স্বর্গ কী...কিন্তু একি—লৌহশলাকা হয়ে উঠছে মুনতাসিরের আঙুল। ক্রমশ তা ফুলতে ফুলতে ইয়া বড় দৈত্যাকৃতি রূপ নেয়।

না। অস্ফুট চিৎকার করে ওঠে সে।

এই পৃথিবীতে সুবর্ণা নেই, ভাবতেই বুক ফাঁকা হতে হতে এই সুবর্ণার কথা ভাবে সে। স্ত্রী সুবর্ণার প্রতি এত ক্ষোভ তার, এই সুবর্ণাকে ঘিরে তা হচ্ছে না কেন?

এ রকম একটা ভাবনা মগজে কেউ ছুড়ে দিলে বিমূঢ় হয়ে গভীর ভাবনার নিমজ্জনে উত্তর আসে, আসলে সুবর্ণাই পূর্বাশা, বাড়ি থেকে বেরোনোর পর এমন এক নতুন বিভ্রমে পড়েছে সে আগের জনমের সাথে যার মিল নেই।

ইতিমধ্যেই দুবার দুই স্বপ্নে তার বোধে স্থিত হয়েছে, হত্যা ব্যাপারটি পুরো স্বপ্নে ঘটেছে।

যেন জীবন ফিরে পেয়েছে, এই বোধ উল্লম্ফনে মুনতাসির বাড়ি যাওয়ার জন্য ব্যাগ গোছাতেই বাদশা পুতু আসে, তার কাছ থেকে জানে হত্যাটা স্বপ্নে ঘটেনি। অস্থির বোধে ফোন দিয়ে রাখালকে নক করেও একই উত্তর পায়।

বাদশা পুতু চলে গেলে হু হু করে কাঁদে মুনতাসির, কেন এমন হলো আমার জীবন? কেন তুমি দুটো পুরুষের জীবনের সাথে খেললে। কী লাভ হলো, যাকে চাইছিলে পেলে? বরং গোড়া থেকে ওকেই নিয়ে নিতে নিজের জীবনে। অথবা প্রথম বিয়ের পর, কেন মানুষ বোঝে না কোন সময়ে কী করলে কটা জীবন বাঁচে?

কেন বিয়ের পরে সব লুকিয়ে একসময় সুবর্ণা সব মেলে ধরল মুনতাসিরের সামনে? লুকোনোটা চালাকি, না বলে দেওয়াটা সরলতা? মাথা চেপে ধরে মুনতাসির, কিছু জানতাম না, সেই ভালো ছিল। একটা ছেলে এত কাঙ্ক্ষিত সুবর্ণার কাছে? সে দুটো দাম্পত্য ধ্বংস করল, তাকে ছাড়তে পারল না, তাকে জীবনে গ্রহণও করল না।

না, মুনতাসির কিছুতেই সুবর্ণার মৃত্যুর সময়টা স্মরণ করবে না। এ দৃশ্যের সামনে দাঁড়ানো কঠিন। সুবর্ণা কোথাও আছে বা নেই, সুবর্ণার প্রতি ক্ষোভ—আপাতত এগুলোই চলুক।

চারপাশের বহুবিধ বিষয় নিয়ে ঘন মিশালি রাত্রি আসে।

৮.

মাথা গুঁজে রাখছিল মুনতাসির।

প্রথমে টুংটাং, এরপর ধীরে ধীরে সরোদের শব্দ। তার রোমকূপ খাড়া হয়ে ওঠে। এক অদ্ভুত মহুয়ার ঘ্রাণ...এ-ঘর ও-ঘর ক্রমে ক্রমে সিঁড়ি টপকে নিচে নামে।

আসমানটা ইয়া বড় হয়ে তাকে টানতে চায় যেন। সে ঊর্ধ্বমুখী তাকায়, ইয়া বড় চন্দ্রটায় কি কামড় বসিয়েছে কেউ?

তারপরও তীব্র জ্যোৎস্না রাশি রাশি।

সামনে একটা লম্বা পদ্মপুকুর।

তার ঘাটে, হ্যাঁ, ওই তো লঞ্চের পূর্বাশা, হুবহু সেই শাড়ি...ধীরে ধীরে কাছবর্তী হয়...সাজ। না, সে পূর্বাশার প্রেমে পড়েনি। প্রেমে পড়তে পারে না। কিন্তু পূর্বাশায় তাকে এমন জাদুর ফেরে ফেলে, সে আটকে যায়, চক্ষু দেখে মনে হচ্ছে আজও ফেলছে—তুমি কেন আমাকে নিয়ে এমন—বলতে বলতেই সে পূর্বাশার ঘোরের মধ্যে পড়ে যায়।

ক্রমে ক্রমে মাথার কোষ অন্যদিকে ধাবিত হয়।

একে কখনো সুবর্ণা বলে বোধ হচ্ছে, কখনো পূর্বাশা—

আচম্বিতে মনে পড়ে, পূর্বাশা বলেছিল, সে অভিনয় দিয়ে নিজেকে আমূল পাল্টাতে পারে।

তবে কি সে টানা সময়টা সুবর্ণার মুখোশে নিজেকে আবৃতর অভিনয় করেছিল?

অভিনয় দিয়ে এতটা পাল্টানো সম্ভব?

হি হি বাতাস বয়ে যায়। অথবা নীল স্রোত মুনতাসিরের চামড়ার নিচ দিয়ে, সেই হিম স্রোতে স্পষ্ট প্রতিভাত করে স্ত্রী সুবর্ণার চেহারাভঙ্গি।

পাশাপাশি স্থাপন করে এ সুবর্ণাকে।

যেন রঙের কৌটায় ডুবেছে দুটো পাঁচমিশালি তুলি।

কৌটার রঙের মতো হয়ে যায় মুখ দুটি।

এক ঝিম ধরা বিকেলের মতো বিমূঢ়তার মতো মাথা চেপে বসে থাকে মুনতাসির।

লঞ্চের পূর্বাশাকে ঘন করে স্মৃতিতে আনার চেষ্টা করে। নাহ্, স্পষ্ট হয় না কিছু।

ধরা যাক এই মেয়ে পূর্বাশাই।

কিন্তু কী করে পূর্বাশা সুবর্ণার পুরোটা অবয়ব ধরে এই বাড়িতে আসে।

কটা রূপ ধরা সম্ভব পূর্বাশার?

ক্রোধ হিসহিস মুনতাসির পুরো ঘরে চক্কর খায়। ওই যে অভিনয় জানে বলেছিল, সব মন্তর ওই জাদুসূত্রেই প্রোথিত?

তাই বলে অভিনেত্রীরা জাদু জানে?

সুবর্ণা মুখোশ পরেনি, মুখোশ ছাড়া কারও মুখের বদল ঘটে?

অসম্ভব?

তবে কি?

কেন পূর্বাশার এই খেলা?

সে তো মুনতাসিরের কাছে কাম প্রেম কিছু চায় না, তবে কেন এই বিভ্রমের বিমোহন।

যেসব কাণ্ড টিভিতে দেখেছে, বইয়ে পড়েছে, তেমনই এক আজব জগতে পড়ে সে তার সহজাত ব্যবহার হারিয়ে ফেলে।

সামনের দিঘি, চন্দ্রখণ্ডও কই উধাও হলো?

ঘোড়াসহ টমটম এসে দাঁড়াল।

আমি কোথাও যাব না, বলে মুনতাসির, তুমি কে আগে বলো।

বলব, বলে পূর্বাশা হাত টানলে মুনতাসির উঠে যায়।

ধীরে ধীরে একি!

সামনে সমুদ্র।

কলাপাতা শাড়ি...বহুবর্ণ স্মৃতি, পাহাড় আর পাহাড়, সমুদ্রদের ভিড়...কিন্তু এখানের সমুদ্রটাকে মনে হচ্ছে একটা বুভুক্ষু নগরী বা মানুষের সামনে হঠাৎ দাঁড়ানো প্রাণ।

নেমে পা ভেজায় পূর্বাশা, জলকেলি করে উচ্চ হাস্যে। টমটমে পূর্বাশার দিকে ফেরেনি মুনতাসির।

পূর্বাশাও যেন কী এক ধ্যানে বিমূঢ় ছিল। কিন্তু মাঝে মাঝে ওর গা থেকে সুবর্ণার গায়ের গন্ধ এলে চমকে যাচ্ছিল মুনতাসির।

এখন তাকে জলের সাথে এমন খেলতে দেখে ভ্রম দূর হয়; না, এ সুবর্ণা হতেই পারে না।

ইশারা করে নামতে মুনতাসিরকে, যেন পূর্বাশা নয় কোনো মৎস্যকন্যা।

ঘোরগ্রস্ত হয়ে নামে মুনতাসির। স্রোত এসে তার পায়ের কাছে ধাক্কা খায়।

সমস্ত চন্দ্রের আলোয় সমুদ্রের বিস্তারিত স্রোত ফেনা পুঞ্জ হিরের মুকুটের মতো জ্বলজ্বল করছে।

চারপাশে নিঃসীম শূন্যতা।

এ কোন জীবনে এসে আমি পড়লাম? এ নির্ঘাত স্বপ্ন...ভেবে ঘামতে থাকে মুনতাসির। এ স্বপ্ন তাকে এখন কোন ফেরে নিয়ে ফেলবে? কোন আসমানে ওড়াবে, কোন পাতালে তলাবে?

চরাঞ্চল ছড়িয়ে হাসছে পূর্বাশা, নাকি কাঁদছে?

তুমি কে?

দুজন নরনারী ছিল।

যেন গান গাইছে, সমুদ্র গর্জনেও এমনভাবে বলে পূর্বাশা, স্পষ্ট শুনতে পায় মুনতাসির।

তারা দুজনকে দুজন খুব ভালোবাসত।

একজন, মানে ছেলেটার আর্থিক অবস্থা খুব ভালো ছিল। দেখতে সুন্দর, আর চরাঞ্চল দাপিয়ে ছুটত সে।

মেয়েটা ক্লাসে মেধাবী, কিন্তু ঘুঁটেকুড়ানি, হা হা...বলে ওপর দিকে জল ছুড়ে দেয় পূর্বাশা।

অসহিষ্ণু বোধ করে মুনতাসির, তুমি হেঁয়ালি করছ।

আমি অন্য কারও জীবন শুনতে চাইনি, তোমার কথা বলো।

সমুদ্রের জল হু হু করতে করতে এসে চরাঞ্চলে ধাক্কা খায়।

এদের গল্পের মধ্যেই আমার সত্তা লুক্কায়িত। তুমি ধৈর্য ধরে একটু শোনো।

চুপ হয়ে যায় মুনতাসির।

পূর্বাশা শুরু করে, ঘুঁটেকুড়ানি না, মানে, আর্থিকভাবে খারাপ অবস্থা ছিল তার।

সে কী সুগভীর প্রেম তাদের। যথারীতি ছেলেটির পরিবার রাজি হয় না, তার প্রতিবাদে ফুঁসে দাঁড়ায় ছেলেটি।

মেয়েটি তাকে বোঝায়, আমরা আমাদের সামাজিক দূরত্ব মেনে চলো আলাদা হয়ে যাই।

ছেলেটি এই কথা কিছুতেই মানে না।

চাঁদটা মধ্য আকাশে ছিল, না তারা আসার পরই এসেছে, কিন্তু সমুদ্র সেখান থেকে যেন আলো শুষে যুবতী হয়ে জৌলুশময়ী হচ্ছিল।

এখন চাঁদটা হেলান দিচ্ছে।

সমুদ্রের এক পাশ ছায়া হয়ে এলে মুনতাসিরের কেমন যেন গা ছমছম করে ওঠে। আচমকা সেই ছায়ায় প্রতিভাত হয় সুবর্ণার মুখ। তার সন্তানের অবয়ব...কেমন যেন গোঙানির মতো চিৎকার আসতে চায় ভেতর থেকে।

তোমার খারাপ লাগছে? প্রশ্ন করে পূর্বাশা, হ্যাঁ, আমি ফেরত যাব, আর এক মুহূর্তও না। ফের হাসতে থাকে পূর্বাশা, গল্পটা আর একটু বাকি আছে। সেটা শেষ করেই।

আমার কিচ্ছুতে আর আগ্রহ নেই, তুমি কে? একটা আলোকস্তম্ভের ওপর জাদুকরি ভঙ্গি নিয়ে দাঁড়ায় পূর্বাশা।

যথারীতি ভাষা হারিয়ে ফেলে মুনতাসির।

নরনারী সিদ্ধান্ত নেয় বিয়ের।

ইতিমধ্যে মেয়েটির গর্ভে সন্তান আসে।

মেয়েটি ভীত এবং বিহ্বল হয়ে পড়ে।

আশ্চর্যজনকভাবে ছেলেটির মধ্যে পরিবর্তন আসে।

সে সন্তানটিকে নষ্ট হওয়ার পরামর্শ দেয়।

মহাবিস্ময়ে হতাশার অতলান্তে তলিয়ে যায় মেয়েটি, কিন্তু কিছুতেই গর্ভ নষ্ট করতে রাজি হয় না।

তুমি দেখতে অপ্সরা, নিয়ে এসেছ আমাকে স্বপ্নরাজ্যে, এসব কী বলছ? তীব্র অস্বস্তি নিয়ে প্রশ্ন করে মুসতাসির।

সমুদ্র থেকে কাছবর্তী এগিয়ে আসে পূর্বাশা। ক্রমশ নিভে যেতে থাকে তার চোখের জাদু। সে আলটপকা ক্লিপ টেনে তার চুল খুলে দিয়ে বলে, ছেলেটি মেয়েটিকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

চরম দারিদ্র্য, অসুস্থ অবস্থায় সে বেহুঁশ থাকে দাদির ঘরে, সেই ঘরের যে সন্তানটিকে দাদি রাস্তার কোণে ফেলে রেখেছিল, সেই শিশুটিই আমি। খোলা চুলে সুবর্ণার তুমুল ঘ্রাণে অসাড় হয়ে পড়ে মুনতাসির।

৯.

এর মধ্যে রাখাল আসে।

অস্থির হয়ে মুনতাসির বলে, আমি এখান থেকে চলে যাব।

তখন রাখাল যেন দুটি মস্ত বাদুড়ডানার ঝাঁপির বাতাসে মুনতাসিরকে শান্ত করে। তুমি দেখছি তোমার মাকে বেমালুম ভুলে বসে আছ?

তাই তো? এসব পূর্বাশা-সুবর্ণা স্বপ্ন-বাস্তবতার টানাপোড়েনে সত্যিই সে মাকে আমূল ভুলে বসেছিল। পুরো জীবনে একবার মায়ের স্পর্শে যাওয়া আর সেই অলৌকিক অনুভূতি তার স্মরণে আসে।

কিন্তু হঠাৎ মায়ের প্রসঙ্গ কেন?

ইউটার্ন নেয় মুনতাসির, রাখালের মুখভঙ্গি দেখে বোধ



সুবর্ণার পিঠে চুমু খাচ্ছে অপু

হয়, আসলে রাখাল মুনতাসিরের আচমকা অস্থিরতা থামাতে এ প্রসঙ্গ তুলেছে।

জানতে ইচ্ছে করে না তোমার মা সম্পর্কে? এবার সিরিয়াস রাখাল, তোমার মা বছর বছর একটি কক্ষে...তুমি জীবিত থাকতেও তার কোলে বড় হতে পারলে না, এসব কেন ঘটল, কী তার ইতিবৃত্ত জানতে ইচ্ছে করে না?

সোফায় বসে ছিল দুজন।

নিজের মধ্যে নিমগ্ন ছিল মুনতাসির।

আচমকা আত্মার আঁকশিতে যেন বড়শি পড়ে।

অসহায়ের মতো তাকায় সে রাখালের দিকে। বড় মাকে অনেকবার প্রশ্ন করেছি এ নিয়ে, তিনি বলেছেন, এসব কিছু বাবা ছাড়া আর কেউ জানে না।

মিথ্যা কথা। সোফা থেকে দাঁড়িয়ে পড়ে রাখাল। সবাই সব জানে। জানি কিছু করতে পারবে না, তা-ও মানুষ হিসেবে জেনে রাখো তোমার পূর্বজদের কহন। আমি এসেই বাদশা পুতুকে কষে ধরেছি। তিনি তোমাকে সবকিছু বলবেন।

তাই? রাখালের হাত চেপে ধরে মুনতাসির।

ক্রমে ক্রমে বাদশা পুতুর বয়ানে আসে অপূর্ব সুন্দরী কমলা রানীর আখ্যান।

সে এক স্বপ্নের মতো গ্রাম।

সবুজে শস্যে আকীর্ণ বিলোড়নের ছায়াচ্ছন্নতা যেখানে প্রগাঢ় হয়ে আছে।

সেই গ্রামে রচিত হয়েছিল এক প্রগাঢ় নিবিড় প্রেমগাথা।

চিরায়ত প্রেমগাথায় যা হয়, অপূর্ব রূপের ছটা নিয়ে বড় হতে থাকে কমলা রানী।

আর একই গ্রামের কুদ্দুস মিয়া চরাঞ্চলের বংশীবাদক। দিনে দূর দূর গ্রামে বাঁশি বাজিয়ে উপার্জন করে ঘন রাতে বসে বকুলগাছের তলায়। বকুলের হু হু ঘ্রাণ পুরো গ্রাম সমাচ্ছন্ন করতে থাকলে বাঁশির ডগায় ফুঁ দেয় কুদ্দুস বাঁশিওয়ালা।

সে কী সুরের ঘোর তার।

সবুজ পাতা, গাছের শাখা, মেঠো পথ, নদীর জল সব যেন বিভোর হয়ে আসে।

কমলা রানী দুকান প্রাণপণে চেপে ঘুমানোর চেষ্টা করে।

ছায়াঘরে বসে ছটফট করতে করতে একসময় তার দুপা নিয়ন্ত্রণবিরুদ্ধ হয়ে ওঠে।

ক্রমে ক্রমে সমস্ত গ্রামে ছড়ায়িত হয়ে ওঠে তাদের প্রেমগাথা।

ধর্ম তাদের মস্ত এক দেয়াল হয়ে মাঝখানে দাঁড়ায়। ছিটকিনিবন্ধ হয় কমলা রানী।

এরই মাঝে কোনো একদিন ছিটকিনি খোলা হলে ভাইজানের প্রহরায় ঘাটে যায় কমলা রানী।

প্রভাবশালী যাচ্ছিল নদীর পাশ দিয়ে, এত রূপ দেখে চক্কর খেয়ে যায়।

বিয়ের প্রস্তাব পাঠায় সে।

এমন একজন প্রভাবশালী, হোক সে ধর্মে ভিন্ন, ছিন্নকুটিরে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছে।

ধন্য ধন্য পড়ে যায়।

বিষ পান করে কমলা রানী।

সে যাত্রায় বেঁচে গেলেও ব্যাপারটাকে তুমুল অসম্মানের চোখে দেখে প্রভাবশালী।

তাকে বিয়ে করবে না বলে কন্যা বিষপান করে? এত্ত বড় অপমান?

এই চক্করে দিনগুলো যেতে থাকলে এক রাতে নিঃশব্দে ঘর থেকে কায়দা করে বেরিয়ে কুদ্দুসের কাছে ছুটে যায় কমলা রানী।

কুদ্দুস তখন বাঁশি বাজাচ্ছিল।

সেই সুরে বুকের বিষাক্ত যন্ত্রণা যেন ধূম্র বরণ হয়ে চরাচরকে কান্নায় প্লাবিত করছিল। কমলা রানীকে দেখে ভূতের মতো চমকে পরক্ষণেই নিজেকে স্থিত করে, চলে যাও তুমি, সর্বনাশ হয়া যাবে।

আমি ফিরা্যা যাইতে আসি নাই বলে কুদ্দুসের হাত ধরে টান দিলে যেন আন্ধারে লুক্কায়িত ছিল তস্কর...এক ছোঁতে টেনে নেয় প্রভাবশালী তাকে, সঙ্গে লাঠি হাতে আরও লোকজন থাকায় কুদ্দুস বেকায়দায় বিপন্ন হয়ে পড়ে।

এরপর থেকেই মাকে বন্দী করে রাখে বাবা। কেননা জীবনের কয়েক স্তরে মা বাবার বাড়ি থেকে ভাগতে চেষ্টা করেছে।

তার মানে মাকে বিয়ে করেনি বাবা?

করেছিল, মৃত্যুর কিছুদিন আগে। চেহারার কোথাও একটা নিজের মিল পেয়ে—বাদশা পুতু কাশতে থাকে।

নিজের মিল পেয়ে মানে?

থাক না ওসব প্রসঙ্গ, বলে বাদশা চাচা চুপ মেরে যেতে চাইলে তাকে সজোরে চেপে ধরে, তার মানে আমার জন্মের সময় আমি অবৈধ ছিলাম? আমার আর সুবর্ণার জন্মের কোনো তফাত নেই? আমার বাবা সেই বংশীওয়ালা?

অস্থির মুনতাসিরকে ক্রমে ক্রমে শান্ত করে বাদশা পুতু। ঘরের মধ্যে ফের এক অদ্ভুত প্রচ্ছায়া ভর করে। এক ভয়ানক নীরবতায় বাদশা পুতুর কণ্ঠ কাঁপতে থাকে।

তোমার মাকে বিয়ের এক মাসের মাথায় সে গর্ভিনী হয়। তোমার বাবা জোর করে তার সঙ্গে থাকত, কিন্তু মায়ের মন বাঁশিওয়ালার কাছে পড়ে ছিল বলে জেদ করে বাবা বিয়ে করেনি। এক মাসের মাথায় সন্তান এলে বাবার সন্দেহ হয়, এ সন্তান বংশীওয়ালার।

কিন্তু মা এ প্রসঙ্গেও চুপ। অস্থির বেপরোয়া নারীর সংসার-সন্তান কিচ্ছুতে মন নেই। বাবা শিশুর মতো কাঁদতে থাকে মায়ের কাছে গিয়ে। তুমি আমাকে এভাবে ঠকালে?

বাবার দিশেহারা অবস্থার দিকে স্থিত চোখ মেলে মা বলেছিল, এ সন্তান তোমার।

তাতেই এত আরাম হয়েছিল পরাণে বাবার। বাবা বাদ্যি-বাজনাসহ ভূমিষ্ঠ সন্তানসহ মাকে বিয়ে করার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

শকুন ছোঁতে বাবাকে নিজ বগলে নিয়ে যায় বড়মা, আমি ছেলের নখচোখ সব খুঁটে দেখেছি, তোমার কোনো চিহ্ন নাই।

এ ছাড়া সে নিজের সন্তানকে বাঁচাতে একটা কথা বলল, আর তুমি বিশ্বাস করলা? এত বোকা হলে সংসার রাজ্য চলে?

এরপর মুনতাসির সেই যে নিঃসন্তান বড় মায়ের গর্ভে এসে পড়ল, মা কত কাকুতি-মিনতি করেছে, বড়মা দেয়নি।

অসাড় ছায়াচ্ছন্নতার মধ্যে মিশে যেতে থাকে মুনতাসিরের অস্তিত্ব। হা জীবন!

তবে কি এদ্দিন সে সরল ছিল না?

তাকে প্রভাবশালীর ঐতিহ্য, জৌলুশ ছেঁকে ধরেছিল? অন্তর সঙ্গে সুবর্ণার সম্পর্কটা ভাঙার সঙ্গে সুবর্ণার জারজ জন্মটাকেও একটা সূত্র মনে করেনি মুনতাসির যে এমন যার জন্ম, সে এমন কাণ্ড করতেই পারে।

নিজের জন্ম নিয়ে হাজারো পাগলামির মধ্যেও তলায় অহংকার কি ছিল না?

এখন সে যদি সত্যিই বংশীবাদকের সন্তান হয়?

না না, নিতে পারছি না। এক বোবাবোধে গুমরে আর্তনাদ করতে থাকে মুনতাসির।

এ ঘর থেকে বাদশা পুতু, রাখাল বহু আগেই চলে গেছে। সুবর্ণাকে বড় কাছে পেতে ইচ্ছে করে, মনে হয়, তার দশাটা একমাত্র সুবর্ণা বুঝবে।

একজন আরেকজনকে জড়িয়ে খুব একচোট কেঁদে নেয়। ধীরে ধীরে অপুর সঙ্গে দৃশ্যটা প্রগাঢ় হতে থাকে।

সরোষে ঘুরে দাঁড়ায় মুনতাসির।

দেশে-বিদেশে মিলিয়েই থাকত অপু। তার ওপর অদেখা অপুর সম্পর্কে মুনতাসিরের একটা ভালো লাগাই তৈরি হয়েছিল সুবর্ণার বর্ণনায়। ফলে দেশ-বিদেশ আসা-যাওয়া করা অপুর প্রতি পরম স্নেহ বন্ধুত্বই অনুভব করত মুনতাসির।

ছেলেটা এলে সুবর্ণা ছেলেমানুষ হয়ে যায়। শিশুসারল্যে ওদের মধ্যে ঝাঁপ দিতেও দ্বিধা হয় না মুনতাসিরের।

তাদের এসব গড়ায়িত দিনরাত্তিরে ফের গর্ভবতী হয় সুবর্ণা।

কী যে হয় সুবর্ণার, সম্পূর্ণ এলোমেলো। যখন গর্ভের সন্তান তার এই বোধে রোমাঞ্চ নিতে শিখছে, তখন এলোমেলো সুবর্ণা গান গাওয়ার মতো বলে চলে—আবার সে এসেছে, যাকে আমি এঁকেছিলাম, ওই তো তার জনক তোমাকেও দেখতে পাচ্ছি, যাকে আমি এঁকেছিলাম।

তার এই ঘোর বসন্তের কোনো নাগালই ধরতে পারে না মুনতাসির।

দাম্পত্য জীবনটা এমনিতেই পাল্টি খাচ্ছিল মুনতাসিরের স্বপ্ন আর বাস্তবতার বিচ্ছুরণ বেদিশায়।

এর মাঝে কী বুঝে এক রাতে ভেঙে পড়ে সুবর্ণা। আমি তোমাকে আর গোপন করতে পারব না। বলে তার জীবনের সব স-ব ঢেলে দেয় সুবর্ণা। মাথাটার মধ্যে ঝিঁঝিঁ ধরে যায় মুনতাসিরের। তার আগে একটা বিয়ে-সন্তান সব ডিঙিয়ে তার ভাবনা গিয়ে পেরেকবিদ্ধ হয় এক স্থানে, জন্মদিনে অপুকে নিয়ে কথা ওঠা এবং তাকে কেন্দ্র করে অন্তর সন্দেহ।

তাহলে অপুকে সন্দেহ করা যায়। অপু তো সুবর্ণার গর্ভজাত ভাই নয়? অদ্ভুত এক মনোবিকল সমস্ত গল্পের মাঝে—কেন এত বড় সত্য লুকাল—এই ঘোরের চেয়ে প্রগাঢ় করে মুনতাসিরকে নিয়ে ফেলল অন্তর সন্দেহের জায়গায়। তাই তো সুবর্ণার জন্য নিজের প্রাণটা যেমন দিতে পারে মুনতাসির, তেমনি অপুও তো তা-ই পারে। কৈশোরে নিজের কিডনি দিয়েছিল যে। অপুর ব্যাপারে ভেতরে-ভেতরে মুনতাসিরও অন্তর মতো বিষাক্ত এক অনুরণনে রঙিন হতে থাকে।

সুবর্ণাও কেন এত নিখুঁতভাবে নিজের জীবনের সব বলতে গেল, যার শেষ নাগাল সে ধরতে পারল না। অপুর আত্মহত্যার উদ্যোগকে কেন্দ্র করে অন্ত কী কারণে ঈর্ষাতুর হয়? জেলাসি, পোকাটা তখনই ঢোকে ওর ভেতরে। কিন্তু যখন অন্তর মতো মুনতাসিরও সুবর্ণাকে জিজ্ঞেস করে অপু আত্মহত্যা কেন করতে গিয়েছিল, যথারীতিই কুলুপ এঁটে যায় সুবর্ণার মুখে।

অপু পুরুষত্বহীন—এটা যেমন বলতে দ্বিধা হয়, নিজের সহোদরাকে এ জানিয়েছে এ বলতেও দ্বিগুণ তোতলামিতে পড়ে। সমস্ত কথা বলার পর অপুকে নিয়ে কথোপকথন, মুনতাসিরের বিদ্ধ করা প্রশ্নে আহত সুবর্ণা।

যেন-বা তিরবিদ্ধ বিষে ছটফট করে ওঠে সুবর্ণা। তুমিও এই ব্যাপারটাকেই টার্গেট করছ, তুমিও? এত কিছু শোনার পরও?

মস্ত এক রহস্যের আবছায়া পাহাড় নামে কক্ষজুড়ে। ভয়ানক নীরবতা পিষে ফেলতে চায় দুটি আত্মার দহনকে।

সামনে ছায়াপথ রাশি। ঝিরি ঝিরি বিষ জমছে শিরাতে।

তুমুল আহত ভেঙে পড়া কণ্ঠ সুবর্ণার। আমি তোমাকে আমার আগের এক বিয়ে, সন্তান এসব লুকিয়েছি। এ নিয়ে

তোমার কোনো বিকার নেই?

তোমাকে বলেছি একটি সৎ-সুন্দর সম্পর্ককে নষ্ট চোখে দেখত অন্তু। এ নিয়ে আমার বিপন্নতা, অসহায়ত্ব, এ নিয়ে তার পেষণ সব বলার পরও তুমি সহানুভূতির জায়গায় না দাঁড়িয়ে অন্তর জায়গাটাকে আঁকড়ে ধরবে?

এরপর উপর দিকে তাকিয়ে সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশে বলে, আমি মরে যাই না কেন?

যা এদ্দিন পারেনি তাই পারে সুবর্ণা। সমস্ত ব্যাপারটাই অপুকে বলে ভেঙে টুকরো টুকরো হতে হতে।

স্তব্ধ প্রস্তর হয়ে বসে থাকে অপু। তার ভেতর কি-না-কি বিলোড়ন হয়। সে হাঁটুতে মাথা গুঁজে নীল বর্ণ ধারণ করতে করতে আর অস্ফুটে বলতে বলতে, এবার গেলে আর ফিরব না।

এভাবে দিনগুলো যাচ্ছিল।

কী এক স্বপ্নের ঘোরে বিভ্রান্ত এলোমেলো মাথা নিয়ে ঘরে ফিরেছিল সেদিন মুনতাসির। পুরো বাড়িতে যেন শ্মশান-শূন্যতা। বিকেলের ছায়া নামছি নামছি করে সন্ধ্যার ঝালর ধরেছে। সমস্ত ছায়া ছায়া ঘরের মধ্যে ধাতব আলোর এক ধবল উজ্জ্বলন স্থিত। তক্ষণি বাঁ পাশের ঘরে যেন একটা হুজ্জোত ওঠে। চিৎকার অথবা শীৎকার ধ্বনিই শোনা যায় সুবর্ণার।

রোমকূপ শক্ত হয়ে ওঠে মুনতাসিরের।

ধীরে পা বাড়ায়।

বুকের মতো হাতুড়ির শব্দ কানের পর্দা স্পর্শ করছে। নিশ্বাস বন্ধ করে দরজায় পা রেখে জমে যায় সে, পেছনের আঁচল সামনের দিকে, অপু উবু হয়ে মুখ দিয়ে চেপে রেখেছে জায়গাটা না কী করছে, তার মাথা আর চুলের জন্য দেখা যায় না।

এই তো স্পষ্ট প্রতিভাত হচ্ছে, সুবর্ণার পিঠে চুমু খাচ্ছে অপু আর সুবর্ণা কী এক বোধে ছটফট করছে।

মাথার রক্তকণিকায় ছোটাছুটি শুরু হয়। দিব্যস্বপ্নে সে অপুর সঙ্গে সুবর্ণার সঙ্গমদৃশ্য দেখেছে। ভাবে সে, সেটাও কি স্বপ্ন ছিল তাহলে।

এরপর কী যে ভর করে শরীরটায়।

চিলের মতো ছোঁ দিয়ে সুবর্ণাকে তুলে নিজ ঘরে নিয়ে যায়। তার মধ্যে অশুরের শক্তি ভর করে। হতভম্ব হয়ে এক জায়গায় স্থির বসে থাকে অপু।

বন্ধ ছিটকিনির ওপারে বড়মার চিৎকার।

দেহের পুরোটা চাপ সুবর্ণার কণ্ঠে বসিয়ে দেয়।

ক্রমে ক্রমে নীলাভ, নিথর হয়ে আসে সুবর্ণা।

তার দেহ বিছানায় ঢলে পড়লে মাটিতে সটান শুয়ে ছটফট করে কিছুক্ষণ মুনতাসির।

এরপর দরজা খুলে দেয়।

যেন মাত্র ঘটনাটা ঘটেছে একটা বিশাল ঝাঁকুনি খেয়ে জানালার কাছ থেকে ছুটে আসে মুনতাসির।

এ কোথায় এসে উঠল সে?

১০.

সুবর্ণা বা বাদশা চাচার খোঁজে ঘর থেকে যে-ই পা বাড়াবে অমনি দেখে এক যুবক তার ঘরের দিকে আসছে ছুরি দিয়ে আপেল ছিলতে ছিলতে। দেখতে যুবক হলেও অতিচেনা ছেলেমানুষি ভঙ্গি তার হাঁটার গতির মধ্যে।

কাছে এসে হাত বাড়ায়, আপনি মুনতাসির?

ইতস্তত করে হাত বাড়ায় মুনতাসিরও, হ্যাঁ, আপনি?

অপু।

বলতেই ভূমণ্ডলে কম্পন ওঠে।

চিমটি কাটে দেহে।

না, চেহারা হুবহু নয়, শুধু ভঙ্গি, যেমন সুবর্ণার সাথে তার স্ত্রী সুবর্ণার।

বিছানায় বসে দুজন।

সিগ্রেট ধরায় অপু, যেন গানের মতো বলতে থাকে, জন্মের পর থেকে বাবা-মা থাকতেও আমি বাবা-মা নয়, আমার নিশ্বাসের বাতাস, আমার প্রাণের সব বলতে সুবর্ণাকে পেয়েছি।

আমার সহোদরা।

সে আমার পিঠাপিঠি হলেও আমাকে দেখত একটা খুদে পুতুলের মতো। প্রায় এক বয়সী হয়েও আমরা একজন আরেকজনের দায়িত্ব নিয়েছিলাম। আমার মনে হতো মায়ের গর্ভে আমরা শত বছর একসঙ্গে ছিলাম। এমন একটা বোন পেয়ে আমার পৃথিবীটা হয়েছিল স্বর্গের মতো। আমার বাবা-মা আমার স্পর্শ পেতেনই না প্রায়, আমি দিন-রাত নাছোড়ের মতো আমার বোনের কাছে পড়ে থাকতাম। সে মায়ের মতো শাসন করত আমাকে। আমরা একে অন্যের চুল-কাপড় ধরে টানাটানি করতাম বয়সের ভেদ ভুলে। আমি কি আপনাকে বিরক্ত করছি?

এরপর সেই দিন এল।

ঘরের মধ্যে কি মেঘ জমেছে? ঘরের প্রান্তর ধরে বন্ধ বাতাসের ফড়ফড়ানি।

আমি আমার দিদিকে হারিয়ে ফেললাম।

শৈশব থেকেই সুবর্ণা আর বাবা-মার সঙ্গে অপুর ছিল প্রগাঢ় ভালোবাসার নৈকট্য। সে এমনই এক পাগল ছেলে, বিদেশ গিয়ে টিকতে পারেনি, ছুটতে ছুটতে চলে এসেছে।

তারা দুই ভাইবোন কাপড়-চুল টানাটানি, কিছু একটা নিয়ে কাড়াকাড়ি শৈশবের মতো যৌবনেও করত।

এসব দিক দিয়ে অপু ছিল রাজ্যির অবুঝ।

অনেক ছেলেমানুষি দিয়ে তার পুরো সত্তাটা ঠাসা। ফলে জন্মদিনে এমন একটি প্রসঙ্গ ওঠায় অপু কথাগুলোকে বাতাসে উড়িয়ে নিজ ঘরে গিয়ে মুভি খেলায় লেগে যায়।

যুদ্ধটা বাবা-মা আর সুবর্ণা করেছিল।

হাঁপ ছেড়েছিল সুবর্ণা যে, অপু সেদিনের এসব ব্যাপার সেভাবে শুনতে পায়নি।

একটা আচমকা ভয়ানক নীরবতা নামে অস্তিত্বের ওপর। জীবনের ছায়াপথের যেন মোড় ঘুরে যায়। আঁধারগুচ্ছ রাশি রাশি জমতে থাকে শিরাতে। সুবর্ণা অটুট সিদ্ধান্ত নেয়, কিচ্ছুর বিনিময়ে সে অপুকে ছাড়বে না। আর যদ্দূর সম্ভব এসব আঁধার থেকে অপুকে দূরে রাখবে।

তার মনে হয় তার নিজের ব্যক্তিত্বের দুর্বলতাই অন্তর সংসারে তাকে এতটা নিচে নামাতে পেরেছিল।

তার রক্তের কোষে কোষে অপু তার সহোদর। এই ব্যাপারটা নিয়ে তীব্রভাবে দাঁড়াতে পারল না কেন সে অন্তর সংসারে?

শুধু কি সহোদর?

কিশোর বয়সে দুটি কিডনিই ড্যামেজ হয়ে গিয়েছিল সুবর্ণার। বাবা-মা দিশেহারা হয়ে চতুর্দিকে যখন খোঁজ করছে, ছেলেমানুষ কিন্তু জেদি অপু তার কিডনিও টেস্ট করাল। তাজ্জব জীবনের বাস্তবতা, ভাইবোন না হয়েও দুজনের ব্লাড গ্রুপ, টিস্যু সব ম্যাচ করে গিয়েছিল। বিছানায় শুয়ে সুবর্ণার আঙুল নিয়ে খেলে অপু, আগের জনমে আমরা একসঙ্গে এক মায়ের পেটে ছিলাম।

আর বাবা-মা?

কারও নিজের বাবা-মাও এমন হয়? দত্তক মেয়ের জন্য নিজের ছেলের কিডনি দিতে পরোয়া করে না।

বাবা-মা অপুর সঙ্গে শক্ত গেরোয় আটকালেও দিনে দিনে এক ভয়ানক ভারসাম্যহীনতা তাকে অতলের দিকে টেনে নিতে

থাকে।

বাবা, মা, অপু অসহায় বোধ করে। অপু স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইনালে পড়ছে। দেশ-বিদেশ করে তার গ্যাপ গেছে প্রচুর। যা হোক, আচমকা মুনতাসিরকে নিয়ে মানসিক অবস্থার এমন ঘোরে দুজনই পড়লে বাবা-মা তাদের কাছ থেকে সন্তর্পণে সাবধানে অপুকে লুকিয়ে রাখেন। কিন্তু সুবর্ণা কিছুতেই অপুকে গোপন করা মানতে চাইত না।

এর মধ্যে একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে।

একটা অ্যাকসিডেন্টে বাবা-মা দুজনই মারা যান।

পাগলের মতো হয়ে ওঠে অপু আর উদ্‌ভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যায় সুবর্ণা।

সে নিজের ভারই নিজে নিতে পারছিল না, এমন একটি দুর্বিপাকে কয়েকবার আত্মাহুতির চেষ্টা করে সুবর্ণা।

মাথার ওপরটা ফাঁকা হয়ে যায়।

সেখানে চিলেদের কী ভীষণ ওড়াউড়ি।

শুনে মুনতাসির আঁকড়ে ধরে সুবর্ণাকে। কোনো কিছুর বিনিময়ে তুমি আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না।

কেমন যেন ফড়ফড় এক শুকনো পাতার মতো উড়তে থাকে সুবর্ণা। মা-বাবার মৃত্যু, তার পেইন্টিং শেখানোর যুবকের সঙ্গে আর কারও কোনো মুখ মিলে যাওয়া, সবকিছু অসাড় করে তোলে।

অপু নিঃশব্দে একটি ভাঁজ করা চিঠি এগিয়ে দেয় মুনতাসিরের সামনে।

আজকাল চিঠি?

এমনিতেই এলোমেলো চক্রফাঁদে মাকড়সার মতো ঝুলছে সে, এর মধ্যে এই চিঠি? মুনতাসির চশমা হাতড়ায়।

ভাঁজ খুলতেই খুলে যায় এক সরল বিষাদ অনুভব—মুনতাসির, আলো ভালোবাসতাম, এখনো বাসি। স্টুডেন্ট লাইফে মাগরিবের আজানের আগে ঘুরে ঘুরে ঘরের সব আলো জ্বালাতাম। আর সকালে জানালা খুলে দিতাম। এই দুইটা কাজ আমি খুব পছন্দ করতাম।

অন্তু আমাকে নরকের দরজা খুলে ধাক্কা দিলে আমি ঢাকায় এসে একলা একটা অন্ধকার ঘরে থাকতাম। আকাশ দেখা যায় না, কি সকাল কি রাত বোঝা যায় না। সেই সময় তুমি আমার জীবনে এলে। অন্তুর ঘটনার পর কোনো পুরুষ তো দূরের কথা, আমি পৃথিবীর আর কোনো আলোই দেখতে চাইনি। আমার গর্ভের ভ্রূণটা মাথার মধ্যে বড় যত হতো, তত আমি দিশেহারা বোধে অবুঝের মতো নিঃশব্দে কাঁদতাম।

এত যুদ্ধচক্রেও আমি অপুকে ছাড়িনি, বিশেষ করে অন্তুর জঘন্য কাজের পর তো অপুকে আমূল আঁকড়ে ধরা আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে গেল।

আমি যদি ওর সাথে বিচ্ছিন্ন হই তাহলে মানুষের কথা আর অন্তুর সন্দেহকে সত্য বলে প্রমাণ হিসেবে মেনে নিতে হয়।

এ আমার ব্যক্তিত্বের ধাতে নেই। যা হোক, সেই আলোহীন, বই-গানহীন পৃথিবীতে তুমি এলে এক স্ফটিক আলোর উজ্জ্বলতা নিয়ে। তোমাকে যেকোনো একজন পুরুষ, আর নোংরা জগতের মানুষ ভাবার কোনো প্রশ্নই এল না আমার মধ্যে। যেন ঋষিশৃঙ্গ, এমন একটা পবিত্র মস্ত এক শিশু হিসেবে তোমাকে পেয়ে ভালোবেসেছি তোমার পুরুষ রূপকেই, যে মিশ্র আদলে তৈরি। আমি প্রগাঢ় প্রগাঢ়ভাবে তোমাকে ভালোবাসতে শুরু করলাম, যার চেয়ে অনেক কম বেসেছিলাম অন্তুকে।

হায়, সেই তুমিও এই এক অপুকেই সন্দেহ করছ? অপু কী? আমার রাহু? যত এসব হবে, আমি পুরো জীবনে যদ্দিন বাঁচি তত অপুকে আঁকড়ে ধরব আরও প্রবলভাবে এবং হাড়ে-মজ্জায় প্রমাণ দিয়েই ছাড়ব ও আমার সহোদর।

মুনতাসির প্লিজ তুমি আমার হাতটা ছেড়ো না।

চিঠির নিচে নিজের নাম লিখেছিল, মানে ইতি—সুবর্ণা।

কেমন নেতিয়ে পড়ে মুনতাসির, এ চিঠি তোমার কাছে? আমাকে দিল না কেন সুবর্ণা?

অপু সক্রোধে বলে, কীভাতে দিত? আপনি বাড়িতে ফিরে এসেই তো...কীভাবে দেবে? এমন ভুল বুঝলেন।

মুনতাসিরের রক্তকণিকা হিম হয়ে আসে। পরক্ষণেই বিবর্তিত হয়ে হয়ে তা এক হিংস্র রূপ নিতে থাকে, সে বলতে চায়, আমি নিজে দেখেছি।

ঘরে ঢোকে সুবর্ণা। আর ধীরে ধীরে চূড়ান্ত এক নস্টালজিয়ায় ডুবতে থাকে মুনতাসির। ঘরের পরিবেশ, বাতাস হুবহু যেদিন সুবর্ণা খুন হয়েছিল সেদিনের মতো। যেন চেয়ারে দর্শক মুনতাসির আর মঞ্চের আলো জ্বলে উঠল, অপু আর সুবর্ণার মধ্যে আলোছায়ার বিচ্ছুরণ। ব্লাউজ টেনে পিঠটাকে প্রায় উদ্‌ভ্রান্তের মতো উদোম করছে সুবর্ণা আর চিৎকার করছে বিছা, নিশ্চিত বিছা, আমি যমের মতো ভয় পাই। এই সবই বলছিল সুবর্ণা ভয়ে দাঁতকপাটি লেগে বিড়বিড় করা মানুষের মতো।

এই তো হুবহু সেদিনের দৃশ্য। পুরো অবয়বটি একই, শুধু আজ ব্যাপারটি স্পষ্ট করে প্রস্ফুটিত হচ্ছে। সেদিন বাইরে থেকে এসে হুট করে মুনতাসির ভয়ে দাঁতকপাটির ব্যাপারটি খেয়াল করেনি আর সে কারণেই হয়তোবা কোনো শব্দ তার কানে যায়নি। আর প্রায় উদোম পিঠে মুখ নামিয়ে-উঠিয়ে অপু চুমু খাচ্ছে, না কিছু একটা খুঁজছে তাও স্পষ্ট হয়নি। আসলে অপু নামটি বিষপিপড়ার মতো মাথায় ঘুরত, তাকে সেদিন এই অবস্থায় দেখেই...। কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়ায় মুনতাসির। সুবর্ণা ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

যেন মঞ্চ থেকে নেমে আসে অপু এবং প্রবল শক্তির জোরে মুনতাসিরকে সে বসিয়ে রাখে। বলে, আমি একদিন বিদেশ যাব বলে বিদায় নিতে এসেছিলাম দিদির কাছে। দিদি পাথরের মতো বসে ছিল। আচমকা দিদি ত্বরিত গতিতে লাফিয়ে যায়, প্রচণ্ড ভয় পায় এমন এক পোকার আশঙ্কায় সে কাঁধ থেকে শাড়ি খুলে পিঠের কাছটা আমাকে দেখতে বলে...

মুনতাসিরের দেহের হিম রক্ত জল ছেড়ে দেয়। অপুর কণ্ঠ যেন ইথারে ইথারে ভাসতে থাকে, খুল যা সিম সিম।

সেদিন প্রথম দরজায় সব নরক, সব অশ্লীল হয়ে দেখা দিয়েছিল, আজ দ্বিতীয় দরজায় প্রস্ফুটিত হোক শুদ্ধ সুন্দর সত্য।

কাট কাট করে সুবর্ণার বহু ভঙ্গি অস্তিত্বের চারপাশে উড়তে থাকে। আলোছায়ার সঙ্গমের মাঝে তার মাথাটা বোঁ বোঁ চক্কর খেতে থাকে।

বমি উগরে আসে।

ওইটা সুবর্ণাকে অপুর চুমু দেওয়া ছিল না।

হ্যাঁ অপু, এই তো, দৃশ্যটা তো এমনই।

সেদিন আমার চোখে পুরো ব্যাপারটাই এত অশ্লীল আর অসম্ভব লাগছিল কেন?

প্রচণ্ড ঘাম জমতে থাকে কপালে আর অদ্ভুত বমিবোধে মনে হয় তার টুঁটি কেউ চেপে ধরেছে, হ্যাঁ হ্যাঁ ঘটনাটা এমনই পবিত্র আর নির্মল ছিল।

তার রক্তকণিকায় সেদিন কেন এটাকে এত হিংস্র অশ্লীল লেগেছিল? কেন? কেন?

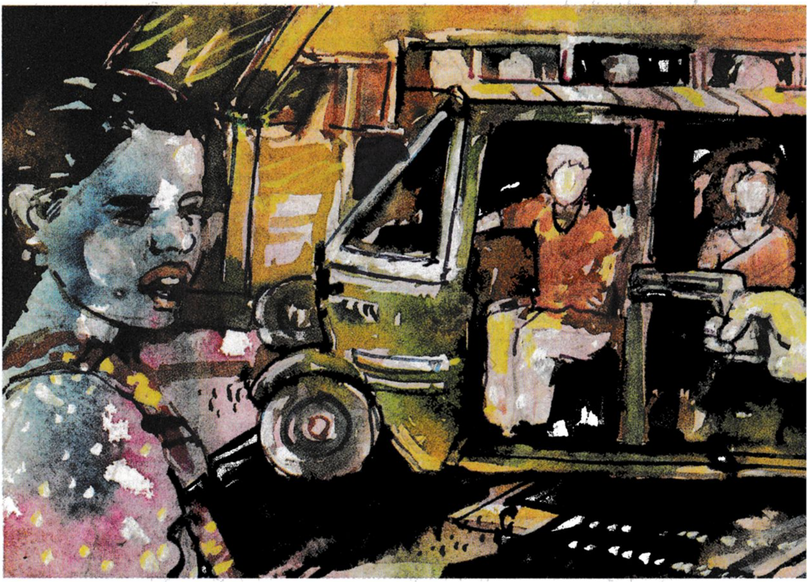
আ আ...অপুর দিকে মুখ করে গোঙানির মতো হয় মুনতাসিরের।

সাঁই করে অপুর আপেল ছেলার ঝকঝকে ছুরিটা সান্ধ্য বাতাসে ঝলসে ওঠে।

চরাচর প্রকম্পিত হয় ঝাঁক ঝাঁক রক্তবিন্দুতে।

নিশ্বাসের শেষ দিয়ে মুনতাসির অনুভব করে, তাকে টলে পড়তে দেখেও নির্বিকার ভঙ্গিতে নিঃশব্দে ঘর থেকে চলে গেছে অপু। ●

গল্প



সচিত্রকরণ : রনজিৎ দাস

রেজাউর রহমান

চাকরি

ভোররাতে ঢাকামুখী প্রথম যে বাসটা ছাড়ে, তাতে উঠে বসে কিরণ। লক্কড়ঝক্কড় গাড়িটার বিরক্তিকর চলতির মধ্যেও সে কিছুটা সময় ঝিমুনিতে কাটিয়েছে। ঘন আবছায়া কালো গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে ফিকে সাদা আভা উঁকি দিচ্ছে এখন। সে ভাঙা কাচের জানালা ছাড়িয়ে দূরে চোখ মেলে। টের পায় পুব আকাশে সূর্য ওঠার ইশারা দেখা দেওয়ার খুব একটা দেরি নেই।

বুকপকেটে হাত রাখে কিরণ, যেখানটায় মানুষের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় শরীরযন্ত্রটি সারাক্ষণ দুক দুক, দুক দুক করে। হাত দিয়ে সে অনুভব করে, ভাঁজ করা কাগজটা জায়গামতোই আছে। আর প্যান্টের পকেটে আছে মায়ের দেওয়া সামান্য কিছু টাকা। সে আশ্বস্ত হয়।

একটু পরই টের পায়, অনেক ওপর দিয়ে কিচিরমিচির...কিচিরমিচির একটা মৃদু মিষ্টি আওয়াজ ভেসে চলেছে। তার মনে হলো, বেলে হাঁসজাতীয় একদল উড়োপাখির আঁকাবাঁকা লহর উড়ে যাচ্ছে। কিন্তু

কোনদিকে তা সে ঠিক ঠাওর করতে পারছে না। একবার মনে হলো, পাখির দল বুঝি তার গ্রামের দিকেই গেল। যেখানে আছে দিগন্তছোঁয়া চষা খেত, সবুজ মাঠ, গাছগাছালির বন, বাঁশবনের বিস্তার। আছে নদীর বাঁক। সেখানে বক পাখিরা রাতের আস্তানা খোঁজে। এসবের ফাঁকে ফাঁকে আছে মানুষের বসতবাড়ি নিয়ে এককেটি গ্রাম। আর সেই গ্রামে আছে পারুল নামের এক উচ্ছলা কিশোরীও।

তার মনে হয়, পারুল আছে সব জায়গায়। শিমুলের ডালে। কিংশুক ফুলের গোছায়। আমের বোলে। গাছের পাতায় পাতায়। মনটা তার কেঁদে উঠতে চায়। একবার ভাবে, বাস থামিয়ে নেমে পড়বে নাকি?

তরগাঁও থেকে ঢাকা খুব দূরের পথ নয়, তবুও সে যে ওখানে গেছে খুব একটা মনে পড়ে না তার। পরক্ষণেই একটা প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়ে। সে তো পারুলকে কথা দিয়েছে। মায়ের চিকিৎসার কথা মনে পড়ে কিরণের। রোজগেরে একজন হয়ে তবেই সে ফিরবে গাঁয়ে। তার আগে নয়।

শীতলক্ষ্যা নদী পারের গুদারা ধরে এখানকার স্বল্প পরিসরের নদী পার হয়ে কাপাসিয়া বাজার। বাজার ছাড়িয়ে দক্ষিণমুখী কিছুদূর হাঁটলেই কানে আসে বাস কন্ডাক্টরদের হাঁকাহাঁকি। আইয়েন আইয়েন...ঢাকা-ঢাকা, গাজীপুর-জয়দেবপুর-বোর্ডবাজার-টঙ্গী। কন্ডাক্টরের বিশ্রী চিৎকার কিরণের কানে এখনো বাজছে।

মাকে ফাঁকি দিয়ে রাতের অন্ধকারে পারুলও তো এসেছিল শীতলক্ষ্যার পারে। তাকে বিদায় জানাতে। তার মনে ভরসা জোগাতে।

দুই

কিরণ জন্মে বাবাকে দেখেনি। তাই বাবার আদর পাওয়ার সহজাত যে আকাঙ্ক্ষা শিশুদের থাকে, তা তার তেমন ছিল না। তার যা কিছু ছিল, আহ্লাদ-রাগ, মান-অভিমান, পাওয়া না-পাওয়া সবই তার মাকে ঘিরে। মায়ের খুব ইচ্ছে ছিল, এই পিতৃহীন শিশুটিকে লেখাপড়া শিখিয়ে বড় করবে। কিন্তু তার সংসার সচ্ছল ছিল না। স্কুলের মাস্টারদের নিয়মমাফিক বেতন-খরচের অতিরিক্ত কোচিংয়ের উপরি চাহিদা মেটাতে না পারায় তার বছর বছর ওপরের ক্লাসে উত্তীর্ণ হওয়ার যে পালা তা বাধাগ্রস্ত হয়। ক্লাস সেভেন থেকে এইটে উঠতে পারেনি। তাদের ফসলি জমিও তেমন ছিল না। মা অসহায় হয়ে পড়েন। চেষ্টাচরিত্র করে বাজারের তেল কারবারির আরতে সামান্য মাসোহারায় কাজ নেয় কিরণ। কারবারি আশ্বাস দিয়েছেন, ভালো কাজ দেখাতে পারলে তার বেতন বাড়বে।

মা-বেটার জীবন কোনোমতে চলছিল। তাও একদিন অচল হয়ে গেল। দিনের শেষে আরতে রাতের শেষ গোনায় এক টিন তেলের হিসাব মেলাতে পারেনি কিরণ। কারবারির আরতে অনেক কর্মচারী। কিন্তু সন্দেহের তালিকায় তার নামই সবার আগে উঠল। সে চাকরি হারাল। সে হন্যে হয়ে অন্য কোনো একটা কাজ ধরার চেষ্টা করছিল। কিন্তু এ বাজারে তা সম্ভব হলো না।

> মাকে ফাঁকি দিয়ে রাতের অন্ধকারে পারুলও তো এসেছিল শীতলক্ষ্যার পারে।

বাজারের বয়োজ্যেষ্ঠ হোমিওপ্যাথি ডাক্তার বিপিন সরকারের কাছে কিরণের মা আসতেন চিকিৎসা করাতে। একদিন তিনি তাঁর দোকানে কিরণকে ইশারায় ডাকেন।

'তুমি কিরণ না?'

'হা...ডাক্তার সাব।'

'তোমার মার শরীরের তরিকা তেমন ভালা না। ঢাহার ভালো ডাক্তারের পরামর্শ নিতে পারলে ভালো অইত। আমার বিদ্যায় তো আর দরতাছে না।'

'ডাক্তার সাব...আমার কাজটা গেছে গা...এহন টাহাপয়সা ছাড়া ঢাহা যাই কেমনে?'

কিছুক্ষণ ভাবেন ডা. বিপিন সরকার।

'তাইলে তুমি আগে ঢাহায় যেকোনো একটা কাজ জোগাড় করার চেষ্টা করো। তহন তোমার মারে নেওয়া সহজ অইব।'

'কিন্তু ঢাহায় আমারে কেডা কাজ দিব।'

'আচ্ছা চিন্তা করি...। আগামীকাল আইয়ো একবার।' পরের দিন ডাক্তারসাব কিরণকে দুই টুকরা কাগজ দেন।

'তুমি তো তেমন লেখাপড়া করো নাই...ভালো কাজ পাওয়া মুশকিল। তবে দুইডা বিজ্ঞাপন পাইলাম...দেখতে পারো। চেষ্টা করতে করতে হয়তো কিছু একটা অইয়াও যাইতে পারে। চেষ্টা ছাড়া...।'

ডা. বিপিন সরকার তরগাঁও বাজার গ্রামের তৃতীয় ব্যক্তি, যিনি ঢাকার দুটি পত্রিকা রাখেন এবং সারা দিনের অবসরে বসে বসে পড়েন।

তিন

একদিন হঠাৎ রাতের বেলায় কিরণের মায়ের অবস্থা খারাপ হতে থাকে। গায়ে প্রচণ্ড জ্বর। বমি হচ্ছে। তাদের পাড়ার শেষ সীমানায় তার এক ফুপু থাকে। বেগতিক দেখে কিরণ তাকে ডেকে আনে। পরে তারা বাকি রাত পালা করে মাথায় পানি ঢালতে ঢালতে আজানের শব্দ পায়। মায়ের গায়ের তাপ তখন কিছুটা কমের দিকে। ফুপু তাকে দু-তিন চামচ চিনি লেবুর শরবত খাওয়ায়। ফুপু তাগিদ দেয়, 'যা তো কিরণ বিপিন ডাক্তারের বাড়ির দিকে দ্রুত পা চালা...তারে ধইরা নিয়া আয়...।'

অন্ধকারপ্রায় পথঘাট ধরে কিরণ অল্প আলোর টর্চ ধরে কোনোমতে এগিয়ে চলে ডাক্তারের বাড়ির দিকে। এক রকম বিছানা থেকে সে ডাক্তারকে ডেকে তোলে। ডাক্তারের স্ত্রী ব্যাপারটা ভালো চোখে না দেখলেও ডা. বিপিনের রোগী হিসেবে কিরণের মায়ের প্রতি একটা টান ছিল। তাঁর জানামতে এই রোগীর আয়ু বেশি দিন নেই।

ডাক্তার তার হ্যান্ডব্যাগ নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে তা কিরণের হাতে দেন।

কিরণ বাড়ি ফিরে দেখে ফুপু তার মায়ের কাছে নেই, সেই জায়গায় বসে আছে পারুল। পারুলের কোলে তার মায়ের গামছা মোড়ানো মাথা। মা পারুলের হাত ধরে রেখেছেন। মা কষ্টের মধ্যেও প্রশান্ত-হালকা গলায় তার সাথে কথা বলছেন। পারুলও তাকে কী একটা বলছে, হাসি চেপে।

ঘরে ঢুকে ডা. বিপিন হেসে বলেন, 'কৈ রে কিরণ তোর মা তো দিব্যি আছে। মেয়ের কোলে মাথা রেখে হেসে হেসে দিব্যি কথা বলছে। অসুখ তো পালিয়ে গেছে। ওই কিশোরীর অছিলায়। সবকিছুর একটা অছিলা লাগে...।'

পারুল সলজ্জ হাসে।

'না ডাক্তার বাবু...আমি চামচে তুইল্লা একটু একটু শরবত দিতাছি তো...তার গতরটা এহন ভালো লাগছে।'



ডাক্তার রোগীর শিরা দেখেন। চোখ উল্টিয়ে দেখেন। কিরণের দিকে চেয়ে তিনি আশাবাদী হন।

'তোর মার অবস্থা এহন অনেক ভালো। তাও আমি খানিক ওষুধ দিচ্ছি। তার আরও ভালো লাগবে।'

ডাক্তার ওঠেন।

'কিরণ আমি যাই।'

আর তিনি নির্দিষ্ট করে বলেন, 'এই মেয়ে, আমার বইনরে কিন্তু তুমি রাইক্কা চইল্লা যাইবা না। আমি এহন বুঝলাম, তুমিই তার ডাক্তার...তার ওষুধ। আমি না।'

'আর কিরণ তুমি ঢাহা যাইতাছ কবে?'

'কাইল।'

'ভালো। চেষ্টা করো। ফল পাইবা। আইজ না হয় কাইল।'

ডাক্তার সাহেব উঠান ছেড়ে নেমে গিয়ে আবার ফিরে আসেন। কিরণের মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ান।

'মাইয়াডারে ছাইড়েন না। ধইরা রাইক্কেন...মা লক্ষ্মী সরস্বতী। ভগবান সহায়।'

কিরণ পারুলের দিকে চেয়ে থাকে মুগ্ধ নয়নে। সেও মনে মনে বলে, 'আল্লাহ সহায়।'

চার

ফুলবাড়িয়া বাসস্ট্যান্ডে নেমে খানিক নিশ্চিন্ত হয় কিরণ। যাক...ঢাকাতক তো আসা গেল। এখন বাকিটা? কিরণ বুকপকেট থেকে পত্রিকা কাটা বিজ্ঞাপন বের করে। প্রথমটার ঠিকানা, স্যার সৈয়দ রোড, মোহাম্মদপুর। এই অ্যাডটি এক ব্যক্তিমালিকানা বস্ত্রশিল্প কারখানার। কোম্পানি দুদলে গার্ড নিয়োগ দেবে। দিনের ও রাতের। তারা অস্ত্র চালনার পূর্ব অভিজ্ঞতা চেয়েছে। কিরণ খানিক চিন্তিত হয়। এটা যে তার নেই। যাক, এরপরও চেষ্টা তো করতে হবে।

ঠিকানাটা পথচারী একজনকে দেখায় কিরণ। লোকটা ভালো। তিনি জানান, তা তো এখান থেকে অনেক দূর। আপনাকে মোহাম্মদপুরের বাস ধরতে হবে। নামতে হবে আসাদগেট।

কিরণ জিজ্ঞেস করে করে গুলিস্তান থেকে মোহাম্মদপুরের বাস ধরে। আসাদগেট নেমে আবার তার জিজ্ঞেস করার পালা। স্যার সৈয়দ রোডের নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছাতে পৌঁছাতে বেলা অনেকটা পেরিয়ে যায়। দুপুর হয়ে এসেছে। সেই কমপ্লেক্স বিল্ডিংয়ের দারোয়ান তাকে জানায়, ইন্টারভিউ শুরুর সময় বিকেল ৪টায়। তখন সেখানে দাঁড়িয়ে থাকার আর কোনো অর্থ হয় না। হাঁটতে হাঁটতে একটা ছাপরা হোটেলে সামান্য কিছু খেয়ে পেট ভরে পানি খায় কিরণ। কিন্তু ইন্টারভিউয়ের ভয়-শঙ্কা-আশঙ্কা তাকে ছাড়ে না। সব ছাপিয়ে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, চাকরি একটা পেতেই হবে তাকে।

তখন তার চোখের সামনে ভাসে রুগ্‌ণ মায়ের কায়ক্লিষ্ট চেহারা, ভাসে ফুরফুরে উরু উরু কালো চোখের পারুলের কথা। তারা যে অপেক্ষায়...।

বিকেল ৪টায় নির্দিষ্ট বিল্ডিংয়ের সামনে এসে দেখে ততক্ষণে সেখানটায় চাকরিসন্ধানী লোকজনের একটা ছোটখাটো জমায়েত হয়ে গেছে। সে তাদের সাথে শরিক হয়।

রাত ৯টায় তার ডাক পড়ে। তারা তাকে নানা কথাবার্তা জিজ্ঞেস করে। তারা তার কাছে ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট চায়। স্থানীয় চেয়ারম্যান কিংবা প্রভাবশালী কারোর চরিত্র-সনদ চায়। তখন সে বুদ্ধি করে জানায়, দু-একদিন সময় দিলে সেটা সে আনতে পারবে।

রাত ১০টার দিকে ইন্টারভিউ শেষ হয়। এর খানিক পরে অফিসের ভেতর থেকে কাগজ হাতে একজন বেরিয়ে আসে। সে ১৫ জনের নামের তালিকা পড়ে শোনায়। তারা ছাড়া বাকি সবাইকে চলে যেতে বলে।

কিরণ আশ্চর্য হয়ে শুনেছে, এ পনেরো জনের মধ্যে তার নামও আছে।

কিরণ মনে মনে আল্লাহকে ডাকে। হে আল্লাহ চাকরিটা যেন হয়ে যায়।

আধা ঘণ্টা পরে আবার তার ডাক পড়ে। তারা তার কাছে দুই লক্ষ টাকা চায়। আগামীকাল টাকা দিতে পারলে পরশু থেকে ট্রেনিংয়ে যোগ দিতে পারবে।

কিরণ আকাশ থেকে পড়ে। সে আমতা আমতা করে।

'স্যার আমি নিতান্তই গরিব মানুষ। আমার কোনো টাকা দেয়ারই ক্ষমতা নেই।'

'তাহলে যেতে পারো। এখানে তোমার চাকরি হবে না।'

সেখান থেকে বেরিয়ে এসে নিজেকে বড় অসহায় মনে হয় কিরণের। সে আনমনা হয়ে অন্ধকারে হাঁটে। তার চোখের সামনে ভাসে কোলে মায়ের মাথা নিয়ে বসে আছে আশাবাদী পারুল। হাঁটতে গিয়ে আবার ফিরে আসে। গার্ডকে জিজ্ঞেস করে, রাইতের জন্য থাহার জায়গা আছে কাছে কিনারে?

গার্ড হাসে। 'কেন পাঁচতারা হোটেল?' পড়ে সমবেদনশীল হয় সে।

'মনে তো অইতাছে সাথে তেমন কোনো টাকাপয়সাও নাই। তাইলে এক কাজ করেন, আসাদগেট থেইকা বাস ধরেন। চইল্লা যান কমলাপুর রেলস্টেশন, না অয় সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল। যাত্রী সেজে শুয়ে-বসে রাত কাটাইয়া দিতে পারবেন। আর কী করার থাহে গরিবের?'

> এই ছুকরি দেরি করতাছ যে...ভাইজানরা রাগ করতাছে।

পাঁচ

আসাদগেট কিরণের কাছে কিছুটা পরিচিত। সকালে বাস থেকে এখানেই নেমেছিল সে। আসাদগেট বাসস্ট্যান্ডে তখন যাত্রীর ভিড়। ভিড় আরও বাড়ে। রাতও বাড়ে। হুড়োহুড়ি করে পরপর কয়েকটা বাস এসে চলে যায়। যাত্রীর ভিড়ও কমে। কমতে কমতে একেবারে কমে যায়। সে ছাড়া সেখানে দাঁড়িয়ে আর একজন যাত্রী। তাও একটা মেয়ে। শাড়ি পরা।

কিরণ চিন্তিত হয়। তার মনে হয়, তার কোথাও ভুল হয়েছে। হয়তোবা সরাসরি কমলাপুর বা সদরঘাটে বাস যায় না। মাঝপথে কোথাও বাস বদলাতে হয়। এ অবস্থায় তার যে কারও সাহায্য নিতে হবে। কিন্তু বাসস্ট্যান্ডে লোকজনও নেই। শুধু ওই শাড়ি পরা মেয়েটি ছাড়া। অগত্যা কিরণ এগিয়ে যায় মেয়েটির দিকে। মেয়েটিও এগিয়ে আসে, 'ভাইজান...আপনি আমার ধর্মের ভাই...আমি বড় বিপদে পাইড়া...একা...।'

'আপনি যাইবেন কই...এত রাইতে!'

'এই বিপদ থেইক্কা আমারে রক্ষা করেন ভাইজান।'

'আমি কী করতে পারি?' তাকে বিভ্রান্ত দেখায়।

'আপনি আমার সাতে একটু আইয়েন। এই কাছেঐ।'

'কিন্তু আমার বাস?'

'বাস হারা রাইত চলে...আপনি আইয়েন আমার লগে।'

'এত রাতে অচেনা একটা মেয়ের কথায় তার সাথে...। আবার সে ভাবে, এই অসহায় মেয়েটির কথাও ফেলা যায় না...হয়তো তারই মতো সেও বিপদগ্রস্ত, গ্রাম থেকে এসেছে...।'

কিরণ মেয়েটির অনুরোধও ফেলতে পারে না। সে মেয়েটির কাছাকাছি হয়ে হাঁটে। রাত বাড়ছে। বেশ কিছুদূর হাঁটার পর মেয়েটি ডানে মোড় নেয়। সেও তাকে অনুসরণ করে। ধানমন্ডি সাতাশ নম্বর রোড ধরে এগিয়ে একটি রেস্তোরাঁ বরাবর বাঁয়ে মোড় নিয়ে গলির মুখে দাঁড়ায়। মেয়েটি মুখে কাপড় টেনে বলে যায়, 'পেটের দায়ে আমার গতর খাটাতে হয়। এক ক্ষ্যাপে ৫০০-১০০০ টাকা আয়। কয়েকটা খদ্দের পেয়ে গেলে দুই-আড়াই রোজগার হয়ে যায়।'

কিরণ মেয়েটির কথার ধরন-ধারা কিছুই বুঝতে পারে না।

'দুই-আড়াই মানে ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'মানে দুই-আড়াই হাজার টাকা আয় হয়।'

'কেমনে?'

'ওই যে বললাম, গতরে খাইট্টা...।'

ততক্ষণে একটা নাইটগার্ড এগিয়ে আসে। মুখ খিঁচড়ে বলে, 'এই ছুকরি দেরি করতাছ যে...ভাইজানরা রাগ করতাছে।'

'আইজ আমার লগে কিন্তু ভাই আছে। আগে লেনদেন...। নাইলে আপনেরা আমারে ঠগাইয়া দেন। তার হাতে টেকা দেন আগে...।'

'এই মাগি নে...' গার্ড কিরণের হাতে একটা পাঁচ শ টাকার নোট ধরিয়ে দেয়।

'ভাই আপনি খাড়ান আমি আইতাছি এখখনঐ।'

গার্ড ও মেয়েটি লাইটপোস্টের উজ্জ্বল আলো ছাড়িয়ে ধানমন্ডি লেকের পাড় ধরে একটা বড় ঝাঁকড়াগাছের আড়ালে চলে যায়। তখন কিরণ বুঝতে শুরু করে, এ মেয়েটি দেহব্যবসার সাথে জড়িত...হয়তো এ শহরে এ ছাড়া তার কোনো বিকল্পও নেই। গরিবের মেয়ে...।

কিরণ ভীতচকিত-হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এই রাত-বিরাতে মেয়েটিকে একা ফেলে সে যায় কীভাবে? আধো অন্ধকার-আলোতে সে দাঁড়িয়ে থাকে। দুরু দুরু বক্ষে এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায় খোঁজে। কিন্তু সে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। টাকার নোটটা সে সাইড পকেটে যত্ন করে রাখে। কষ্টের পয়সা।

খানিক পরে মেয়েটির চড়া গলার চিৎকার শুনতে পায় কিরণ। '...এই যে...এই যে...আমার পয়সা না দিয়া হারামখোরেরা চইল্লা যাইতাছে। দুই দুইডা মানুষ...' সে তাদের পেছন পেছন বিবস্ত্র হয়েই ছুটছে। গায়ে শাড়ি পেঁচানোর সময় পায় নাই?

কিরণ লাইটপোস্টের ঝটকা আলোতে স্পষ্টই দেখতে পায়, উলঙ্গ অসহায় মেয়েটি ছুটছে ছেলেদুটোর পেছন পেছন। সে ভেবে পায় না, এখন তার কী করণীয়? দুর্ভাবনা আশঙ্কার জটাজালে জড়িয়ে সে যন্ত্রচালিত হয়েই যেন হঠাৎ করে অসহায় মেয়েটির পেছন পেছন ছুটতে থাকে। দিগ্বিদিকজ্ঞান হারিয়ে কিরণ ছুটতে ছুটতে হঠাৎ দেখে, সেই নাইটগার্ডটা তার পথ আগলে দাঁড়িয়েছে। আর সাথে সাথে তার মাথায় লাঠির প্রচণ্ড এক ঘায়ে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কিরণ।

ছয়

কখন, কোথায় কয়দিন পর কিরণের জ্ঞান ফিরেছে সে বলতে পারবে না। অন্ধকার ঘরে দুয়ার ফাঁক করার আলোয় প্রথমটায় সে কিছুই দেখতে পায় না। সব অন্ধকার-অন্ধকার লাগতে থাকে। শুধু সে দেখে, দুয়ার আগলে কে একজন দাঁড়িয়ে। মাথা-গায়ে তার তখন প্রচণ্ড ব্যথা।

কিরণের মুখ দিয়ে অস্ফুট বেরিয়ে আসে, 'আপনি ভাই কে...আমাকে একটু পানি দিবেন...বড় পিয়াস...কলিজা ফাইট্টা যাইতেছে। আমারে বাঁচান।'

দুয়ার আরও খোলে। কিরণ দেখে কাল রাতের সেই নাইটগার্ড। তার হাতে এক বোতল পানি। সে তা এগিয়ে দেয়।

প্রাণভরে পানি খায় কিরণ। বোতল শেষ করে।

গার্ড তাকে সেই অন্ধকার পচা ছালায় ভর্তি ঘর থেকে বেরিয়ে আসার ইশারা করে। মুখে কিছু বলে না।

কিরণ হাঁটু ভেঙে কোনো রকমে উঠে বসে। ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। তার হাঁটতে কষ্ট হয়।

গার্ড তাকে রিসেপশন রুমে নিয়ে যায়। সেখানে দুটি ছেলে। কম বয়সী। তারা কী নিয়ে জানি ইংরেজিতে আলাপ করছে।

কিরণকে দেখে একজন তাকে কাছে ডাকে।

'শরীর ভালো?'

'জি না।'

'জালাল ভাই ওকে ফার্মেসিতে নিয়ে যাও। কিছু খেতে দাও।' গার্ড তাকে নিয়ে বেরিয়ে যায়।

ডিসপেনসারির লোকটি তাকে ওষুধ দেয়। আর সাবধান করে 'মাথার চোটটা গভীর। একটা শক্ত কিছুর আঘাত লেগেছে।'

হোটেলে আটা-রুটি-হালুয়া খেতে খেতে কিরণের মনে হলো, কত দিন যে সে খায়নি। রুটি শেষ না করেই আবার ঢকঢক করে পানি গেলে সে।

ওরা ফিরে এলে রিসেপশনে বসা একজন বলে, 'জালাল ভাই ওর জিনিসপত্রগুলো ফিরিয়ে দেন।'

কিরণের ব্যাগ, পকেটের কাগজপত্র ও সামান্য কয়েকটা টাকা গার্ড তাদের সামনে রাখে।

'কই একটা পাঁচ শ টাকার নোট না ছিল?'

গার্ড তা তার পকেট থেকে দেরিতে বের করে।

'আমার নাম হীরা আর ও হলো তাজু। তোমার কাগজপত্র দেখে মনে হচ্ছে, তুমি চাকরির খোঁজে বেরিয়ে কোনো দুর্ঘটনায় পড়েছিলে?'

কিরণ মাথা নাড়ে। 'জি হ্যাঁ'।

তাজু বলে, 'তোমার চাকরি আমরা দেব। তুমি ভেবো না।'

সে টেবিলে পড়ে থাকা পাঁচ শ টাকার সাথে আর একটা নোট যোগ করে কিরণের দিকে বাড়িয়ে দেয়।

'এক হাজার টাকা রাখো। আর ওষুধ খেয়ে গার্ডরুমের চৌকিতে বিশ্রাম নাও। সন্ধ্যার দিকে আমরা বেরুব। তোমাকে আমরা কাজ দেব।'

হীরা বলে, 'কাজ ভালো হলে দিনে দিনে তোমার আয় বাড়বে...বুঝলে?'

কিরণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা খুঁজে পায় না। তার ব্যথাকাতর মুখে হাসি ফোটে। এত সহজে সে চাকরির সন্ধান পেয়ে যাবে ভাবতে পারেনি। সে তাদের সালাম জানিয়ে গার্ডরুমের দিকে হেঁটে যায়।

চৌকিতে শুতে গিয়ে কিরণ বুকপকেটে রাখা পাঁচ শ টাকার নোট দুটিতে হালকা হাত বোলায়। সে ভাবতে পারে না, তার কাছে আজ এক হাজার টাকা। সাথে আবার চাকরির আশ্বাস। তার কাছে সব স্বপ্নের মতো মনে হতে থাকে। এও কি সম্ভব! হয়তো শিগগিরই সে অনেক টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারবে। যেখানে অপেক্ষা করে আছে তার মা আর পারুল। তরগাঁয়ে ফুলেফলে ভরা গাছগাছালি। শীতলক্ষ্যার পাড়।

কিছুটা ভারমুক্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে কিরণের মনে পড়ে, একটা অসহায় উলঙ্গ মেয়ের সাহায্যে এগিয়ে ছুটতে গেলে তার মাথায় প্রচণ্ড এক আঘাত লাগে। এরপর তার আর কিছু মনে নেই।



সাত

দুপুর গড়িয়ে গেলে গার্ড এসে কিরণকে ডেকে তোলে।

'চলো খাইতে চলো...খালি ঘুমাইলেই চলব?'

বিছানা ছেড়ে উঠতে গেলে সে টের পায় তার শরীরে একটু আরাম হয়েছে। সে ঝটপট ওঠে, ঘরসংলগ্ন বাথরুমের কলে হাতমুখ ধুয়ে গার্ডের সাথে বেরিয়ে যায়। গার্ড দ্রুত হাঁটে। মেইন সড়ক পার হয়ে তারা ওপারে যায়। গোছানো একটা হোটেলে গিয়ে বসে তারা। গার্ডই খাবারের অর্ডার দেয় আর বিড়বিড় করে বলে, 'মহাজন যহন কড়ি ফেলে তহন কম খাইমু কেন?'

বয় তার কাছ থেকে অর্ডার নিয়ে চলে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে টেবিলে খাবার আসে। ভাত-গরুর মাংস-সবজি-ডাল।

গার্ড প্লেট টেনে খেতে শুরু করে। কিরণ পুরো আয়োজন দেখে খানিকটা ঘাবড়ে যায়। আবার না তাকে পয়সা দিতে হয়?

গার্ড টের পেয়ে হাসে। 'তাজু ভাই টাকা দিছে মন ভইরা খা...।'

খেতে খেতে কিরণের মনে হতে থাকে, এমন খাবার সে জীবনে খায়নি। আবার ভয়ও পায় সে। একেবারে যে

জামাই আদর। ওষুধ-পত্তর, বিশ্রামের ঘর, খাওয়া-দাওয়া, টাকা...মনে মনে চিন্তাটা তাকে কিছুটা জটিল করে তোলে। কোনো এক অজানা ভীতি এসে তাকে চেপে ধরে। খেয়ে এসে কিছুটা সময় কাত হয়েছিল কিরণ। গার্ড তাকে ডেকে তোলে, 'এই যে প্যান্ট-গেঞ্জি-ক্যাডস রইল...ঘণ্টা খানেকের মধ্যে পইরা রেডি থাকবা। তাজু ভাইরা বাইর অইব। তাগোর লগে কাজে যাইবা।'

কিরণ বিস্ময় প্রকাশ করে।

'এতসব ভালো কাপড়ের দরকার কী ছিল?'

'ছিল...দরকার হয়। কোরবানির আগে যে গরুরে সাজায় দেখছস না?' গার্ডের খামখেয়ালি কথাবার্তা তার ভালো লাগে না। সে কিছুটা হকচকিত হয়ে থাকে।

বেলা চারটার পরপর হবে হয়তো তাজু-হীরা বেরিয়ে আসে ভালো পোশাকে। চোখে কালো চশমা। ড্রাইভার গাড়ি বের করে। তারা দুজন পেছনে বসে আর কিরণ ড্রাইভারের পাশে। তারা কোনদিকে ছুটে চলেছে কিরণ বলতে পারবে না। এ শহর তার পরিচিত নয়।

শহরের জ্যাম-ভিড়ভাট্টা কাটিয়ে ঘণ্টা খানেক চলার পর তারা বড়সড় এক বাড়ির সামনে থামে। সাথে সাথে ভেতর থেকে রোলার টানা মেইন গেট খুলে যায়। তারা বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ে। সেখানে ঘণ্টা খানেক সময় কাটায়। ততক্ষণে পশ্চিমে সূর্য ডুবছে শহরে, পথে-ঘাটে হালকা অন্ধকার জমতে শুরু করেছে। তারা গাড়ি রেখে বাড়ি থেকে বের হয়। বের হতে গিয়ে হীরা কিরণকে বলে, 'তুই শুধু দেখবি আমরা কী করি। তোকেও তা-ই করতে হবে। আজ তোর চাকরির প্রথম দিন।'

কিরণের বুক ধড়ফড়িয়ে ওঠে। না জানি কী ধরনের চাকরি, কী কাজ তার?

কিরণ তাদের পেছন পেছন হাঁটে। একটা চৌরাস্তা ছাড়িয়ে ডান পাশে মোড় নিয়ে তারা থামে। সড়কের পাড় ধরে বেশ কিছুটা জায়গা ফাঁকা। এরপর একটা ছোটখাটো ঝোপঝাড়ের মতো জায়গা। বেশ কিছু গাছপালায় ঘেরা। সেখানে তারা থামে। তারা ইংরেজিতে কথা বলে খানিকক্ষণ।

একটু পরে তাজু বলে, 'ওই যে পশ্চিমমুখী রোড দেখছিস, ওইখানের যানজটে আমাদের কাজ। সিএনজিতে একা মহিলা, কিংবা পুরুষ যাত্রী থাকলে দুদিক থেকে আমরা দুজন ঢুকে যাব। মেয়ে হলে ভ্যানিটি ব্যাগ-গহনা, গলার চেইন-চুড়ি-কানের দুল ছিনিয়ে নিবি। পুরুষ হলে মানিব্যাগ, মোবাইল ইত্যাদি পকেটে যা পাবি হাতিয়ে নিয়ে আমার কাছে পাস করে দিবি। চিৎকার করতে চাইলে পেছন থেকে আমি তাদের মুখ চেপে ধরব। সব খুব দ্রুত করতে হবে। ঠান্ডা মাথায়। কাজ হয়ে গেলে আমাকে ফলো করবি...ব্যস। তোর কাজ দেখে বেতন।' তাজু পকেট থেকে পিস্তল বের করে। ঠিকঠাক আছে কি না দেখে নেয়।

আট

কিরণের হাত-পা কাঁপতে থাকে। সারা শরীরে ঘাম দিয়ে ওঠে। সে তার সাধারণ বিচার-বুদ্ধি দিয়ে বুঝে নেয়, সে এক মহাবিপদে জড়িয়ে পড়েছে। এর থেকে তার যে ছুটে যাওয়ার উপায় নেই। একবার ভাবে, প্রাণপণে দৌড়ে কোনো দিকে ছুটে যাবে কি না? আবার ভেবে দেখে, তা যে সম্ভব নয়! তাদের হাতে যে অস্ত্র...।

তারা ঝোপের ধারে উৎকণ্ঠিত হয়ে দাঁড়িয়ে কিছুটা সময় কাটায়। ইংরেজিতে আলাপ করে। কিরণের তা বোঝার কোনো উপায় নেই।

তাজু একসময় তৎপর হয়ে পায়চারি করতে করতে বলে, 'হীরা রেডি হ বিজয় সরণিতে যানজট লাগল বলে...সাথে সাথে না, আমরা একটু দেখে নেব। সময় সময় তা আবার ঝটপট ছুটেও যায়। গাড়ির বহর চলতে শুরু করে। সেসব অবস্থায় অনেক বিপদ হয়।'

তারা কিছুটা সময় দেখে, সড়কের যানজটের দিকে এগিয়ে যায়। সামনে হীরা, মাঝে কিরণ, পেছনে তাজু। তারা সড়কে থেমে থাকা সিএনজির লাইন ধরে এগিয়ে যায়। তাজু হীরাকে ইশারা করে...।

হীরা কাছের একটা সিএনজির উল্টো দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ে। তাজু কিরণকে কাছের দরজা দিয়ে ধাক্কা মেরে ঢুকিয়ে দেয়। হীরা একা মহিলা যাত্রীকে মোলায়েম স্বরে জানায়, 'খালা যা আছে আপনার কাছে দিয়ে দেন। আমরা বড় অভাবী...আর ড্রাইভার তুমি নড়াচড়া করবে না।' তাজু তার মাথায় পিস্তল ঠেকায়।

একা মহিলা কেঁদে ফেলে, 'বাবারা আমার যা আছে নিয়ে যাও' বলে ভ্যানিটি ব্যাগটা এগিয়ে দেয়।

'খালা গলার হার, হাতের চুড়ি...।'

'এই নাও...তাও নাও।' মহিলা তার গায়ের সব গহনা-অলংকার খুলে দেয়।

'এই তো লক্ষ্মী খালা...।' তারা চট করে সেখান থেকে সরে পড়ে অন্ধকার অন্য এক জায়গায়। রাস্তার ওপারে।

অল্পক্ষণ পরে, তারা আগের সিএনজির কাতারে চলে আসে। তারা ধরে নেয়, এই যানজট ছুটতে দেরি হবে। এটাই সুযোগ।

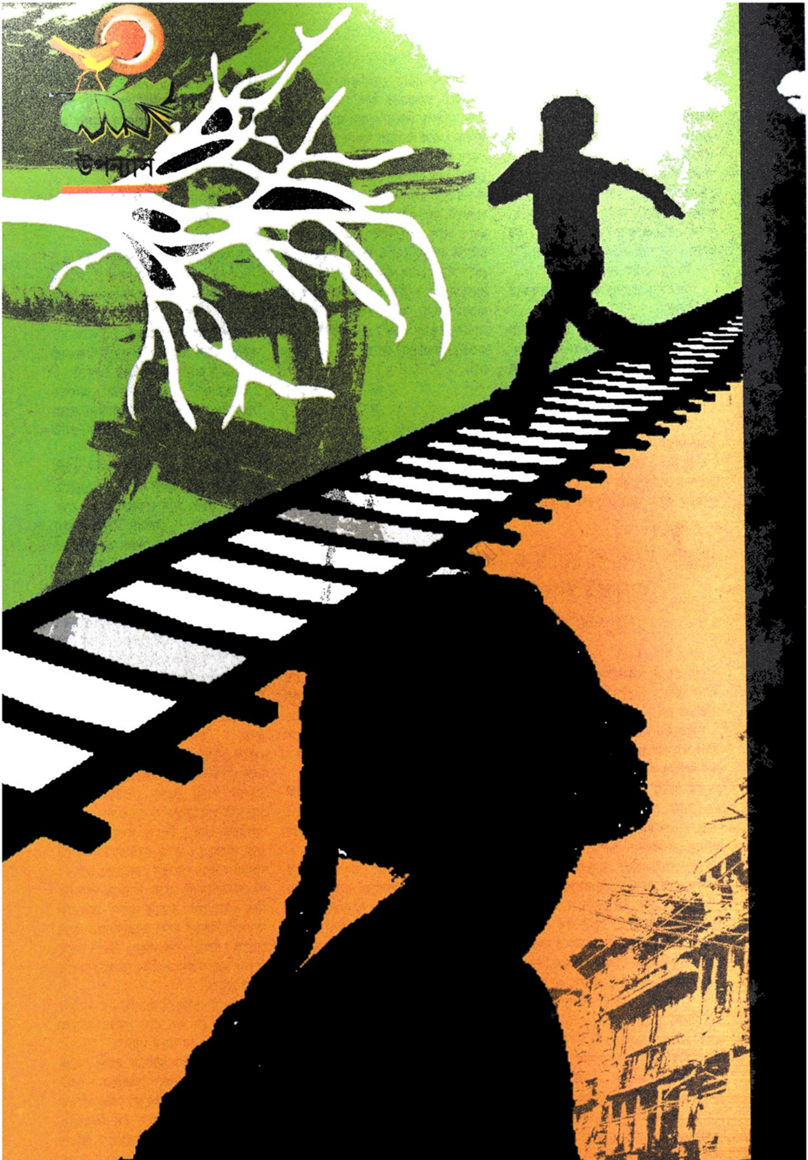
কিরণের হাত-পায়ের কাঁপুনি ছাড়ে না। আর আল্লা আল্লা করে। সে ভাবতে থাকে, আজ যদি কোনোমতে রক্ষা পেয়ে যায়, সোজা ফুলবাড়িয়া বাসস্ট্যান্ডে। সেখান থেকে কাপাসিয়ার বাসে চড়ে বসবে। ঢাকায় আর এক মুহূর্ত থাকা নয়।

আর একটা সিএনজি বেছে নেয় তারা। সেটাতে বয়স্কা একজন বসে। হীরাকে ইশারা করে তাজু। হীরা এক দরজা দিয়ে ঢুকে যাত্রীর হাতঘড়ি ছিঁড়ে নিয়ে তার পকেটে হাত দেওয়ার সময় কিরণকে অন্য দরজা দিয়ে তাজু ঢোকাতে গেলে শক্তিধর সিএনজিচালক তার হাত মটকে ধরে ফেলে—'ছিনতাইকারী...ছিনতাইকারী' বলে চিৎকার শুরু করে দিলে হীরা চটপট গাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখে, মারমুখী সব ড্রাইভার-লোকজন ধর ধর শালাকে, ধর...বলতে বলতে জমতে শুরু করেছে। তাজু ড্রাইভারের সাথে সুবিধা করতে পারেনি। সে সরে আসে। কিরণ হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে কিছু বলার চেষ্টা করতে থাকে। জনতার মারমুখী ভিড়ের মধ্যে তাজু-হীরাও এসে ঢোকে। তারা লক্ষ করে, কিরণ জমে যাওয়া লোকজনকে কিছু একটা বলার চেষ্টা করছে।

এবার তাজু-হীরার টনক নড়ে। এই ছেলে যে সব বলে দেবে। তাকে লোকজন থানায় নিয়ে যাবে।

হীরা তাজুকে ভিড়ের মধ্যে থেকে ইশারা করে। তাজু সাবধানে পকেট থেকে পিস্তল বের করে। অন্ধকারের নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে সে কিরণের মাথা লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। কিরণ গুলি খেয়ে ড্রাইভারের হাত থেকে ছিটকে পড়ে যায়।

> “হীরা রেডি হ বিজয় সরণিতে যানজট লাগল বলে...সাথে সাথে না, আমরা একটু দেখে নেব।”


উপন্যাস





সচিত্রকরণ : পীযূষ দস্তিদার

ইমদাদুল হক মিলন

ফেলে আসা গলিঘুচি



লৎফন যখন-তখন আমাকে ডাকে।

আজ ডাকল দুপুরের পর। ওই মিলু, যাবি?

খানিক আগে ভাত খেয়েছি। এখন চৌকিতে উঠে রাস্তার দিককার জানালায় দাঁড়িয়ে আছি। পরনে খাকি রঙের ইংলিশ প্যান্ট আর স্যান্ডো গেঞ্জি। গেঞ্জির রং কোরা। প্যান্টের পেছন দিকে ইলাস্টিক, সামনের দিকে বোতাম। ওই বরাবর দুটো বোতামের নিচের দিককারটা নেই। কবে খুলে পড়ে গেছে কে জানে। পেচ্ছাপ করতে হলে অন্য বোতামটা খোলার দরকারই হয় না। বোতাম ছাড়া জায়গা দিয়ে ছেড়ে

দিলেই হলো।

প্যান্ট যেমন ময়লা, গেঞ্জিও তেমন। বুকের কাছটায় ফেঁসে গেছে। ভাত খাওয়ার ফলে পেট ফুলেছে। পেটের দিকে গেঞ্জি এখন টাইট।

গলির ওপারে দুটো বাড়ির পর সেরুদার বাসা। লুৎফন হচ্ছে সেরুদার শালী। কিছুদিন ধরে বোন দুলাভাইয়ের কাছে আছে। সেজাল খাঁর ছোট মেয়ে। ভারি তুরতুরা। বাসায় থাকতেই চায় না। এই এদিকে যাচ্ছে, এই ওদিকে যাচ্ছে। আমাদের বাসায় আসছে যখন-তখন।

এখনো আসছিল।

জানালায় আমাকে দেখে বাসায় ঢুকল না। ওই কথা বলল।

লুৎফনের পরনে ছিটকাপড়ের ফ্রক। শ্যামলা গোলগাল মুখ। মোটা নাক সব সময় ঘামছে। চোখ ডাগর না, পিতিপিতি। মাথায় আধা কোঁকড়ানো উড়ু উড়ু চুল। মা তাকে দেখলেই বলেন, ওই ছেমড়ি, মাথায় তেল দেছ না?

লুৎফন হাসে। সব সমায় দেই না। মাথায় তেল দিতে আমার ভাল্লাগে না। কেমুন উসপিস উসপিস লাগে।

লুৎফন আমার চেয়ে বছর দেড়েকের বড়। মনির সমান। মনিকে ডাকে মনু।

মনি ছিল বারান্দায়। সবাই মিলে খেতে বসেছিলাম। আমার তাড়াতাড়ি খাওয়ার অভ্যাস। শুরু করি সবার সঙ্গে, উঠি সবার আগে। ঠিক বুঝতে পারি না, কোথায় যেন আমার একটা তাড়া থাকে।

খাওয়া শেষ করে মনি আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মনিকেও একই রকম কথা বলল লুৎফন। যাবিনি মনু?

কই?

রেললাইনে?

না।

ক্যা?

আমার ঘুম আসতাছে। আমি অহন ঘুমামু।

দুপুরে আমার ঘুম আসে না। আমি একা একা এদিক-ওদিক চলে যাই। ধূপখোলা মাঠের কোনায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। চৈত্র মাসের শেষ দিক। তবু গরম লাগে না।

মাঠের এদিকটায় গাঢ় সবুজ ঘাস। তিন-চারটা মাথান্যাড়া শিমুলগাছ। বুড়াধুড়া গাছগুলোর কোনো কোনোটায় ম্যাড়া ম্যাড়া দুয়েকটা লাল ফুল। ফুলের পাশে চুপচাপ বসে থাকে বুলবুলি পাখি।

ঘাস আর গাছের দিকে তাকিয়ে আমার মনে পড়ে মেদিনীমণ্ডলের কথা। হাজামবাড়ি, ঠাকুরবাড়ির কথা, হালদারবাড়ি, খাইগোবাড়ির কথা। নতুন পুকুর আর বিলের বাড়ির কথা। মাওয়ার বাজার আর কালিখিলের কথা। দুপুর রোদে মাঠে নামে ঘুঘুপাখি। মানুষের পায়ের শব্দে পাখায় শাং শাং শব্দ তুলে উড়ে যায় ছাড়াবাড়ির দিকে।

দুপুর রোদে ধূপখোলা মাঠে দুয়েকটা শালিক চড়ে। গরমে হাঁ করে ধীর পায়ে হাঁটে। ক্লান্ত কাক শিমুলগাছে বসে ডাকে। একটু হাওয়াও যেন আছে। সেই হাওয়া আমার গায়ে লাগে না। আমি উদাস হয়ে মাঠপারে দাঁড়িয়ে থাকি।

পাঁচ দিন হলো ঢাকায় এসেছি। জিন্দাবাহার ছেড়ে সেই যে মেদিনীমণ্ডলে চলে গিয়েছিলাম, দেড়-পৌনে দুই বছর আর ঢাকায় আসা হয়নি। আব্বার চাকরি ছিল না। তিন-চার মাস হলো মিউনিসিপ্যালিটির পুরোনো চাকরি নতুন করে হয়েছে। দিন ফিরেছে আমাদের। শেষ হয়েছে অভাব-অনটন আর দুঃখ-কষ্টের দিন। এক বেলা খেয়ে আরেক বেলা না খেয়ে থাকার দিন। মা, বুজি আর পুনুআম্মার বিষণ্ন মুখ খানিকটা ঝলমলে। আমাদের অনাহারি মুখ খানিকটা সতেজ। অনেকগুলো দিন হাসতে ভুলে গিয়েছিলাম আমরা, হইচই খেলাধুলা আর আনন্দ করতে ভুলে গিয়েছিলাম। এখন আমরা হাসি, ভাইবোনরা খুনসুটি আর আনন্দ করি। মারামারিও করি। দুষ্টুমির জন্য মায়ের হাতে পিট্টি খাই। যেন মরে যাওয়া চারজন নারী-পুরুষ আর পুনুআম্মার মেয়ে রিনাকে নিয়ে নয়টি শিশু ধীরে ধীরে জীবন ফিরে পাচ্ছে। বেঁচে উঠছে।

চাকরি ফিরে পাওয়ার মাসখানেকের মধ্যেই শফিউদ্দিন দাদার আশ্রয় ছেড়েছেন আব্বা। গেন্ডারিয়ায় বাসা নিয়েছেন। জিন্দাবাহারের সেই রুমের চেয়ে ছোট এক রুমের বাসা। জিন্দাবাহারের দালানটা ছিল পুরোনো আমলের। এই বাড়িটা নতুন। চারদিকে ইটের দেয়াল, মাথার ওপর ঢেউটিনের চালা। দশ ফুট বাই দশ ফুট হবে ঘরের সাইজ। একটা চৌকি ফেলার পর ফাঁকা জায়গা বলতে তেমন কিছু আর নেই। চার-পাঁচ ফুট চওড়া একটা বারান্দা আছে। দেয়াল তোলা বারান্দা। বারান্দার দরজা টিনের, ঘরের দরজা কাঠের।

বারান্দায় রান্নাবান্নার ব্যবস্থা। রাতের বেলা আব্বার সঙ্গে আমি আর ডলি বারান্দার মেঝেতে শুয়ে থাকি। আমাদের সংসারে আরেকটা বোন এসেছে। উষা। সে শুয়ে থাকে মায়ের বুকের কাছে। চৌকিতে।

এই বাড়িটা জামাল সর্দারের। নামাপাড়ার জামাল সর্দার। আমরা বলি জামাল মিয়ার বাড়ি। পাঁচ-ছয় কাঠা জমির চারদিকে স্কুলঘরের মতো চারটা লম্বা ঘর। সেই ঘরে সাইজ করে করে দেয়াল তুলে একেকটা কামরা। একেক কামরায় একেক পরিবারের বাস। বাড়িতে ঢোকার গেট আমাদের ঘরের পুব পাশে। বাড়ি থেকে বেরোলেই পুবে পশ্চিমে গলি। পুব দিকে ধূপখোলা মাঠ, পশ্চিমে গলি গিয়ে শেষ হয়েছে উত্তর-দক্ষিণ দিকে চলে যাওয়া আরেক গলির পেট বরাবর। ওই গলির উত্তরে মুরগিটোলা, দক্ষিণে সোজা চলে গেলে ধূপখোলার ওদিক থেকে এসেছে রাস্তা। গলির উত্তরমুখে তেলের মিল, তারপর ধোলাইখাল, কাঠের পুল। তেলের মিলের দক্ষিণে ভাট্টিখানা। পুরোনো আমলের লাল ইটের দালান, সামনে একটুখানি মাঠ, একটা ঝাপড়ানো বটগাছ।

গেন্ডারিয়াতেও গলিঘুচির অন্ত নেই।

তখনো পর্যন্ত গলিঘুচি সব চিনে উঠিনি। মন পড়ে থাকে মেদিনীমণ্ডলে। কাজির পাগলা হাইস্কুলে ক্লাস টুতে ভর্তি হয়েছিলাম সেই অভাব-অনটনের দিনে। এবার ক্লাস থ্রিতে উঠেছি। কদিন পর স্কুলে শুরু হবে 'আম-কাঁঠালের ছুটি'। তার আগেই ঢাকায় চলে এসেছি। বুজি, পুনুআম্মা আর রিনা আসেনি। মা এসেছেন আমাদের সব ভাইবোন নিয়ে। সেরুদা গিয়ে নিয়ে এসেছেন। চাকরির বয়স তিন-চার মাস হয়নি তার মধ্যেই একটা সমস্যা হয়েছে আব্বার। চাকরি-সংক্রান্ত সমস্যা না, একেবারেই অন্য রকম সমস্যা।

যাকে নিয়ে সমস্যা তাকে আমরা সবাই চিনে গেছি। দক্ষিণ দিককার একটা ঘরে থাকে। দুটো ছেলেমেয়ে আছে ছোট ছোট। মহিলার স্বামী সদরঘাটের ফুটপাতে বসে কাটা কাপড় বিক্রি করে। সকালে বেরিয়ে ফেরে অনেকটা রাত করে। লোকটাকেও চিনেছি। অতি গোবেচারা নিরীহ ধরনের লোক। ডোরাকাটা পুরোনো লুঙ্গি আর ঝুলপকেটওয়ালা ফুলশার্ট পরে। শার্টের হাতা সব সময়ই গোটানো। লুঙ্গি-শার্ট দুটোই সস্তা, ময়লা। তবে লোকটার চেহারায় সুখী সুখী একটা ভাব আছে। সকালবেলা কাপড়ের গাট্টি কাঁধে নিয়ে বেরোয়। মুখে পান থাকে। বউ পোলাপানের দিকে তেমন নজর আছে বলে মনে হয় না। সারা দিন দোকানদারি করে রাতের বেলা ওই গাট্টি কাঁধে ফিরে আসে।

এই লোকের বউয়ের নাকি চোখ পড়েছে আব্বার দিকে। জামাল মিয়ার বাড়ির একমাত্র ভদ্রলোক আমার আব্বা, 'কেরানি সাব'। একা একা থাকেন। সকালবেলা গোসল-টোসল সেরে বাসা থেকে বেরোন। লক্ষ্মীবাজারের অফিসের ওদিকে গিয়ে নাশতা করেন। দুপুরে অফিসে খান, রাতে হোটেলে খেয়ে বাসায় আসেন। মহিলা আব্বার দিকে নজর

দিয়েছে। সে এসে নাকি সকালের নাশতা বানিয়ে দিচ্ছে কিছুদিন ধরে, রাতের ভাত রান্না করে দিচ্ছে। ব্যাপারটা সেরুদার ভালো লাগেনি। সে বলেছে তার বউকে। সেরুদার বউ আর আমার মায়ের একই নাম। এ জন্য বোধ হয় আমার মায়ের জন্য বউটার একটু বেশি টান। সেরুদাকে সে মেদিনীমণ্ডলে পাঠিয়ে দিয়েছে মাকে নিয়ে আসার জন্য। সেরুদা গিয়ে সব বলার পর বুজি খুবই চিন্তিত হলেন, মা, পুনুআম্মাও চিন্তিত। আমাদের নিয়ে সেরুদার সঙ্গেই মাওয়ার লঞ্চে চড়লেন মা। ঢাকার এটুকু বাসায় এসে উঠলেন।

এসব নিয়ে অবশ্য মাকে গত কয়েক দিনে দেখিনি ওই মহিলার সঙ্গে কোনো কথা বলতে বা আব্বার সঙ্গে কোনো কথা বলতে। শুধু কুয়ারপারে মহিলা যখন ধোয়াপাকলার কাজ করে, মহিলাকে দেখি আড়চোখে আমাদের ঘরের দিকে চায়। মাকে কখনো কখনো দেখি তিনিও ও রকম চোখ করেই মহিলাকে দেখেন। একেবারেই হেজিপেজি মহিলা। হাজামবাড়ির বউ-ঝিদের মতন দেখতে।

আমরা আসায় আব্বা খুব খুশি। সকালবেলা চটের ব্যাগ হাতে সূত্রাপুর বাজারে চলে যাচ্ছেন। বাজার রেখে গোসল করে, গরম ভাত খেয়ে চলে যাচ্ছেন অফিসে। বিপুল উৎসাহে চাকরি করছেন। কোনো কোনো সন্ধ্যায় আমাদের পড়তে বসাচ্ছেন। যদিও আজাদ, মনি আর আমি কয়েক দিনের মধ্যেই চলে যাব। আমরা দুই ভাই পড়ি কাজির পাগলা হাইস্কুলে, মনি পড়ে খাইগোবাড়ির প্রাইমারি স্কুলে। মনির আর আমার একই ক্লাস। এবার থ্রিতে উঠেছি।

বাড়ির গোসলখানা আর পায়খানা পুব দিককার দেয়াল-লাগোয়া। দুটো পায়খানাঘর, দুটো ঘরে গোসলখানা। চারদিকে দেয়াল, মাথার ওপর ঢেউটিন। টিনের দরজা নীল রং করা। রান্না শেষ করে মা আমাদের কুয়ারপারে নিয়ে গোসল করান। বাড়ির পোলাপান ওখানেই গোসল করে। পুরুষ-মহিলারা করে গোসলখানায় ঢুকে।

আমাদের বড় তিন ভাইবোনকে সঙ্গে আনতে চাননি মা। আজাদ, মনি আর আমি। আমাদের স্কুল খোলা। ঢাকায় যাওয়ার দরকার কী? কিন্তু আমাদের বিপুল উৎসাহ। এতগুলো দিন মরার মতো জীবন কেটেছে। এখন অবস্থা ফিরেছে। যাই না একটু ঢাকায়! আজাদ বড় হয়েছে, ক্লাস ফাইভে পড়ে, আব্বার দিকে কার নজর সেটাও তার বোঝা দরকার। সব মিলিয়ে আমরাও লেখাপড়া ভুলে এসে উঠলাম জামাল মিয়ার বাড়িতে।

সেরুদার বাড়িটাও জামাল মিয়ারই। একই কায়দার বাড়ি। তার ঘরটাও আমাদের ঘরের মতোই। তবে আমরা এতগুলো মানুষ আর তার বাসায় শুধু বউ আর শালী। আজাদ, মনি ও আমি কখনো কখনো গিয়ে সেরুদার ঘরে থাকি। বউটা এত চুপচাপ, নরমশরম, বোকাসোকা, তবে রান্না করে খুব ভালো। বেশ লম্বা, শ্যামলা রং গায়ের। নীল আর নয়তো সবুজ সুতির শাড়ি পরে থাকে। কথা তার মুখে শুনিই না।

অন্যদিকে লুৎফন বোনের একেবারে উল্টো। একটা মুহূর্ত স্থির নেই। এই করছে, ওই করছে। সেরুদাকে দেখলাম একদিন ভালো রকম ধমক দিলেন শালীকে। এই ছেমড়ি, বাইত্তা ইন্দুরের লাহান তুরতুর করছ ক্যা?

লুৎফন একপলক তার দিকে তাকিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। কোন দিকে গেল, কে জানে!

আব্বা চাকরি ফিরে পাওয়ার পরপর, সেরুদা আর আব্বা প্রায় একই সময়ে গেন্ডারিয়ায় এসে দুই বাড়িতে ঘর ভাড়া নিলেন। আব্বার সঙ্গে কী কারণে যেন বুজির খুবই মনোমালিন্য চলছে। আব্বা অনেক দিন রাগ করে মেদিনীমণ্ডলে যান না। বুজি আমাকে নিয়ে ঢাকায় এলেন। উঠলেন সেরুদার বাসায়। আব্বার বাসাটা সেরুদা আমাকে চিনিয়ে দিলেন। আমি একা একা সেই বাসায় গিয়ে হাজির। আব্বা বারান্দায় বসে মাগরিবের নামাজ পড়ছিলেন। মাত্র মোনাজাত ধরেছেন। আমি গিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। মোনাজাত শেষ করে আব্বা আমার দিকে তাকালেন। এমন মায়াবী এক হাসি ফুটল তাঁর মুখে! দুহাত বাড়িয়ে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। রাতের বেলা আমি আব্বার কাছে থেকে গেলাম। আব্বার গলা জড়িয়ে, তাঁর কোমরের ওপর পা তুলে ঘুমালাম।

কিন্তু বুজির সঙ্গে আব্বার মনোমালিন্য মিটছে না।

আমি একবার আব্বার বাসায় যাচ্ছি, একবার সেরুদার বাসায়। আব্বা খুবই নরম, নিরীহ মানুষ। তবে একবার রেগে গেলে সেই রাগ পড়তে সময় লাগে। সেরুদার বাসায় বসে কান্নাকাটি করেন বুজি। সেরুদা এসে খালুজান খালুজান করে নানা রকম বুঝ দেন আব্বাকে। তারপরও দিন চারেক লাগল আব্বার রাগ কমতে। পরে অনেক কেনাকাটা করে, সদরঘাটে এসে বুজিকে আর আমাকে এক সকালে লঞ্চে চড়িয়ে দিলেন।

আব্বার বিষণ্ন আর দিশেহারা মুখ দেখেছি জিন্দাবাহারের বাসায়। এখন আব্বার মুখে আশ্চর্য এক প্রশান্তি। যেন নতুন জীবন শুরু হয়েছে তাঁর। এই দেড়-পৌনে দুটো বছর গেল, আমরা মেদিনীমণ্ডলে, আব্বা ঢাকায় তাঁর চাচার বাসায়, সেই দিনগুলোর কথা খুব মনে পড়ে আমার। যখন-তখন মনে পড়ে। আমি একটু ভাবুক প্রকৃতির, একটু একা একা থাকি, এ জন্য আমার মনে পড়ে সব কথা। কত অনাহারি দিনের স্মৃতি, কত বিষণ্ন বিকেলের কথা।

ধান কাটা শেষ হয়েছে কবে। মিয়াদের ছাড়াবাড়ির পুব দিককার জমিতে কাটা ধানের শুকনো ডাঁটি পড়ে আছে। সেই ধানের গোড়ায় গোড়ায় পড়ে আছে কিছু কাটা ধানের ছড়া। অনেক জমিতেই এভাবে পড়ে থাকে কিছু ছড়া। হাজামবাড়ির হাফিজদ্দি ও রব—ওরা সেই ছড়া কুড়াতে যায়। তছি যায়, কুট্টি যায়। ওরা বলে 'ধান লোড়া'। ও রকম কুড়িয়ে কাড়িয়ে এক-দেড়-দুশের ধানও পাওয়া যায় কখনো কখনো।

অনাহারি মুখে একদিন সকালের দিকে গেছি হাজামবাড়ি। দেখি হাফিজদ্দি আর রব যাচ্ছে ধান লোড়তে। আমাদের ঘোর অভাবের কথা চারপাশের সবাই জানে। হাফিজদ্দি, রবরা আমার বয়সী। তবে ভালো রকম পাকনা। রব না হাফিজদ্দি কে যেন বলল, ওই মিলু, ল ধান লোড়তে যাই।

হাফিজদ্দির মাও উৎসাহ দিল। হ যা বাজান। ধান পাইলে তগো সংসারে কামে লাগব।

গেলাম ওদের সঙ্গে। মিয়াদের ছাড়াবাড়ির লাগোয়া জমিতে ঘণ্টাখানেক ওদের সঙ্গে ধান লোড়ার চেষ্টা করলাম। দু-চার ছড়া ধান পেলামও। তারপর ওরা গেল সড়কের পুব পাশের জমিতে। ধান লোড়তে লোড়তে কামাড়বাড়ির ওদিক পর্যন্ত গেলাম ওদের সঙ্গে। ঘণ্টা দু-আড়াই ধরে কাজটা করলাম। রোদে পুড়ে মুখ লাল হয়ে গেছে। ধান যেটুকু পেয়েছি শুকনা নাড়া দিয়ে বেঁধে বুকের কাছে ধরে বাড়ি নিয়ে এসেছি। মা বুজি পুনুআম্মা অবাক। এইটুকু ধান আমি কোত্থেকে আনলাম? ঘটনা শোনার পর মা হু হু করে কেঁদে ফেললেন। বুজি আমাকে বুকে চেপে ধরলেন।

আরেক দিন স্কুল থেকে ফিরেছি বিকেলের মুখে। সকালে কী খেয়ে গিয়েছিলাম মনে নেই। এমন খিদা লেগেছে! বাড়ি এসে দেখি, বুজি পুনুআম্মা কেউ নেই। ভাইবোনদের কাউকেও দেখি না। মা উদাস হয়ে বসে আছেন রান্নাঘরে। চুলায় মাটির হাঁড়িতে ভাতে মাত্র বলক এসেছে। নিশ্চয় ঘরে চাল ছিল না। চাল জোগাড় করতে দেরি হয়েছে। এ জন্য রান্না বসাতে দেরি হয়ে গেছে। এই ভাত কখন ফুটবে, কখন ফ্যান গালবে ভাতের, কখন খাব? তরকারিও তো কিছু দেখছি না।

আমার এমন কান্না পেল!

মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। মা একপলক আমার দিকে তাকিয়ে আমার মাথাটা বুকে জড়িয়ে ধরলেন। কারও মুখে কোনো কথা নেই। মাও কাঁদছেন, আমিও কাঁদছি। অথচ

এই বাড়ির রাজকন্যা ছিলেন মা। নানাদের তিন ভাইয়ের বড়জন আমার নানা। জাহাজের সারেং ছিলেন। নদী-সমুদ্রে ঘুরে বেড়ানো মানুষ। জাহাজের নাম ছিল 'জনার্দন'। কোম্পানির অফিস কলকাতায়। বিস্তর টাকা ছিল নানার, বিস্তর জমি ছিল। ভাইবোনদের মধ্যে বড়। ছোট দুই ভাইকেও জাহাজের চাকরি দিয়েছিলেন। নিজের টাকায় জায়গা-সম্পত্তি কিনে ভাইদের ভাগ করে দিয়েছেন। এই বাড়িও তাঁরই কেনা, কিন্তু সমান তিন ভাগে ভাগ করা। মেজো নানা, ছোট নানাও বাড়ির সমান অংশের মালিক। তাঁদের কারও সংসারে অভাব নেই। অভাব শুধু আমাদের সংসারে। আমার মায়ের রাজকন্যার জীবন হয়ে গেছে ভিখিরিনির জীবন।

এ রকম জীবন হওয়ার রহস্য অনেক।

বুজি হচ্ছেন নানার দ্বিতীয় স্ত্রী। প্রথম স্ত্রী একমেয়ে রেখে মারা যান। সেই মেয়ে সেরুদার মা। ভালো পাত্র দেখে বড় মেয়ের বিয়ে দিয়ে জামাইকে জাহাজে চাকরি দিয়েছেন নানা। মেয়েকে বাড়ি করার জায়গা দিয়েছেন হাওলাদার বাড়িতে। সেই বাড়ির এক অংশের মালিক নানার এক বোন, মন্নাফ মামার মা। চকে কিছু জমিও দিয়েছেন মেয়েকে। পরের ঘরে আমার মা, পুনুআম্মা আর টগর নামে আমার এক মামা ছিল। মধ্যবয়সে নানার মাথায় গন্ডগোল দেখা দিল। সেই সময় মারা গেলেন আট-নয় বছরের টগর মামা। তার কদিন পর নানাও চলে গেলেন। বাপ-ছেলের কবর হলো বাগানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে।

বুজি একার চেষ্টায় দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। টাকাপয়সা, সোনাদানা যা ছিল অনেকটাই গেল দুই মেয়ের বিয়েতে। চকে, বিলে জমি যা ছিল সেগুলো ছিল বর্গা দেওয়া। ধান, পাট, তিল, কাউন মিলে ফসল পেতেন ভালোই। সংসার চলত আরামসে। আব্বা নিরীহ গৃহী মানুষ। বউ, পোলাপান ছাড়া কিছু বুঝতেন না। পুনুআম্মার স্বামী উল্টো। ঢাকায় থেকে কলেজে পড়েন। পড়ার খরচ চালান বুজি। পরে শোনা গেল লেখাপড়া সে করে না, করে রাজনীতি। আমরা যখন জিন্দাবাহারে তখন একবার জেলও খেটেছেন কয়েক দিন।

বুজি মাসে মাসে টাকা পাঠাতেন ছোট মেয়ের জামাইকে।

অন্যদিকে আমার মায়ের বছর বছর বাচ্চা হচ্ছে। আব্বার কেরানির চাকরি। বেতনে কুলায় না। বুজি নাতি-নাতনিদের জন্য পাগল। অভাব দেখা দিলেই জমি বিক্রি করেন, দুই মেয়ের সংসার চালান। আসলে চালান একটাই সংসার। পুনুআম্মার তো শ্বশুরবাড়িই নেই! আমার মায়ের যা-ও আছে পয়সা গ্রামে সেখানে আব্বার নেই এক শতাংশ জমি। সবই বেচাবিক্রি করেছেন বিভিন্ন সময়ে। এক অর্থে তিনিও ঘরজামাই। আব্বা যদিও রোকনপুরে বাসা নিয়েছিলেন বিয়ের পরপর, তারপর জিন্দাবাহারে, কিন্তু আবদুল মজিদ, আমরা ডাকতাম মজিদ মামা, রিনার বাবা, তিনি ছিলেন ঠিকানাহীন মানুষ। বাড়িঘর ছিল না। ঢাকায় মেসে থাকতেন। পুনুআম্মার কোনো দিন সংসার হয়নি। বুজি, পুনুআম্মা আর আমরা সবাই মিলে এক সংসার। রোজগারের মানুষ মাত্র একজন। আব্বা।

এই যে এতগুলো দিন আব্বার চাকরি নেই, ঢাকার জীবন গুটিয়ে আমরা চলে গিয়েছিলাম মেদিনীমণ্ডলে, দিনগুলো কীভাবে কেটেছে এতগুলো মানুষের?

একটা করে জমি বিক্রি করতেন বুজি, সেই টাকা টিপে টিপে খরচা করে যত দিন চালানো যায়। তারপর আরেক জমি বিক্রি। সোনাদানা, টাকাপয়সা যা ছিল হাতে সবই গেছে। এখন যাচ্ছে জমি।

মজিদ মামা হঠাৎ হঠাৎ শ্বশুরবাড়িতে এসে ওঠেন। কয়েক দিন পোলাও আর মোরগের রান খেয়ে নগদ কিছু টাকা নিয়ে চলে যান। আব্বা আসেন শুকনা মুখে। কোনো দিন সন্ধ্যার দিকে মাওয়াঘাটে এসে লঞ্চ থেকে নামেন। সন্ধ্যার পরপর বাড়ি। হাতে চটের ব্যাগ। ব্যাগে একটা লুঙ্গি একটা শার্ট। পরনে পায়জামা আর ঝুল পকেটের সাদা শার্ট। দুটোই ধূলিধূসর। পায়ের সস্তা স্যান্ডেলে পলিশ নেই। কখনো একটা-দুটো বড় সাইজের পাউরুটি আনেন ছেলেমেয়েদের জন্য। দুধে ভিজিয়ে ওই পাউরুটি খেতে কী যে স্বাদ! মনে হয় এর চেয়ে সুখাদ্য পৃথিবীতে আর কিছু নেই।

আব্বা বাড়ি এলেই আমি প্রথমে তাকাতাম তাঁর হাতের ব্যাগটার দিকে। পাউরুটি দেখা যায় কি না। পাওয়া যায় কি না পাউরুটির মনোহর গন্ধ। থাকলে চোখ চকচক করে, লালায় ভরে যায় মুখ। কখন দুধে ভিজিয়ে পাউরুটি খাব। না থাকলে মন খুব খারাপ হয়।

কোনো কোনো দিন শ্রীনগরের লঞ্চে আসেন আব্বা।

শ্রীনগরে নেমে হেঁটে আসেন পাঁচ-ছয় মাইল পথ। আমি হয়তো নতুন পুকুরের ওদিকটায় দৌড়াদৌড়ি করছি আলমগীর মামার সঙ্গে, কিংবা একা উদাস হয়ে দাঁড়িয়ে আছি বারবাড়ির মুখে, হঠাৎ দেখি সেজালা খাঁ ফকিরের বাড়ির ওদিক থেকে চক পাথালে হেঁটে আসছেন একজন মানুষ। হাতে চটের ব্যাগ।

আব্বার মতন লাগে না!

সারেংবাড়ির ওদিককার হালটে ওঠার পর স্পষ্ট হয় মানুষটি।

আব্বাই তো!

আব্বায় আইছে, আব্বায় আইছে বলে আমি একটা দৌড় দেই। বাড়িতে একটা হুড়াহুড়ি পড়ে।

আব্বা এসে বাড়িতে ওঠেন। যথারীতি শুকনা মুখ। চাকরি হয়নি। দুখানা পাউরুটি কোনোরকমে ছেলেমেয়েদের জন্য এনেছেন। রান্নাঘরে বসে বুজির সঙ্গে তামাক খেতে খেতে দুঃখ-কষ্টের কথা বলেন। আবার জমি বিক্রির চেষ্টা।

বুধবার বিকেলে জশলদিয়ায় একটা হাট বসে। আমরা বলতাম 'জশিলদার হাট'। সেই হাটে সস্তায় মিষ্টি আলু বিক্রি হয়। পাঁচ সের মাপের আলু হচ্ছে 'এক পাড়ি আলু'। ছয় আনা, আট আনায় পাওয়া যায় এক পাড়ি আলু। বুজি আমার হাতে একটা আধুলি ধরিয়ে দিয়ে বললেন, জশিলদার হাটে যা। এক পাড়ি আলু লইয়া আয়।

চটের বস্তাকে আমরা বলি 'ছালা'। ছোট একটা ছালা নিয়ে 'মেলা' দিলাম আমি। হয়তো স্যান্ডো গেঞ্জি পরা, হয়তো খালি গা। হাওলাদার বাড়ি ছাড়িয়ে বিলের ভেতর দিয়ে মেঠোপথ চলে গেছে দূরের গ্রামে। গ্রামের নাম কান্দিপাড়া। সেই গ্রামের ভেতর দিয়ে গেছে একটা খাল। খালপারে নিবিড় বাঁশবন। খরালিকালে খালে পানি থাকেই না। খটখটে শুকনা। বর্ষায় মুখে মুখে পানিতে ভরে যায়। তখন বাঁশের একটা সাঁকো দেওয়া হয়।

বিলের ভেতর দিয়ে একা একা হেঁটে জশলদিয়ার হাটে যাই আমি। সাত-আট বছরের একটা শিশু। হাতে ছালা। যাওয়ার সময় ভয় করে না। বিলের এদিক-ওদিক দু-চারজন লোক থাকে। বিস্তর তরমুজ আর বাঙ্গি হয় বিলে। খেত পাহারায় কেউ না কেউ থাকেই। 'কউপটাহার' নামে বিলের মাঝখানে একটা পুকুর। এই পুকুর নিয়ে অনেক গল্প-কাহিনি। নির্জন দুপুরে কিংবা সন্ধ্যায়, অমাবস্যা বা পূর্ণিমার রাত হলে তো কথাই নেই, তেনাদের কেউ পথ আগলে দাঁড়াবেন। ঘেটি ধরে কউপটাহারে চুবিয়ে মারবেন।

খালপারের বাঁশবনেও তেনাদের বাস। বিকেলবেলা গৃহস্থ লোকেরা টুকটাক কাজ করে ওদিকে। গরু-বাছুড় নিয়ে বাড়ির দিকে ফেরে। সন্ধ্যাবেলা নিডাল, নির্জন জায়গা। চৈত্র মাসের হাওয়ায় শন শন করে বাঁশবন।

হাটের একপাশে মাটিতে ভুর দিয়ে রাখা মিষ্টি আলু। ব্যাপারী লোকগুলোর কারও মুখে পান, কারও হাতে বিড়ি। খালি গা, মাজায় গামছা আর কোছড়ে তবিল বান্ধা। এক পাড়ি কত?

মুলামুলি করে দুই পয়সা এক আনা কমাই। সাড়ে পাঁচ আনা, পাঁচ আনায়ই কিনে ফেলি এক পাড়ি। আড়াই আনা তিন আনা পয়সা বাঁচাতে পারলে মা, বুজি, পুনুআম্মা তিনজনেই খুশি হবেন।

ব্যাপারী লোকটা খুব ভালো। এক পাড়ি আলু মেপে ছালায় ভরে দেয় নিজেই। ছালার মুখটা কাতা দিয়ে আঁট করে বেঁধে আমার মাথায় তুলে দেয়। টুকটাক দুয়েকটা কথা বলে। কোন গেরামের পোলা তুমি? বাপের নাম কী?

আলুর বস্তা মাথায় খালপারের ভাঙনের দিকে নামি, ওপারে গিয়ে সাবধানে উঠি ওপরে। বাঁশবনে অন্ধকার জমছে। পশ্চিমে পদ্মা নদী। নদীতে ডুবছে কমলা রঙের সূর্য। বাঁশবনে শনশনে হাওয়ার সঙ্গে ডাকাডাকি করছে কত পদের পাখি।

পাখিগুলো কি পাখিই, নাকি...

আমার গা ছমছম করে। দ্রুত হেঁটে জায়গাটা পেরিয়ে যাই।

চকের ধারে এসে আরেক ভয়। কতক্ষণে পেরিয়ে যাব চক? সন্ধ্যার আগে আগে কউপটাহার ছাড়িয়ে যেতে পারব তো!

'এক পাড়ি' মিষ্টি আলুর বোঝা মাথায়, যত দ্রুত সম্ভব হাঁটতে থাকি। দুয়েকজন গৃহস্থ লোক ওদিকের রাস্তায় যায়। তাদের পিছু পিছু যাই। সঙ্গে লোক থাকলে ভয় কিসের? একসময় দেখি লোকগুলোর কেউ নেই। এদিক-ওদিককার গ্রামের লোক। যে যার বাড়িতে চলে গেছে। মেদিনীমণ্ডলের লোক কেউ নেই নাকি? আজ হাটে আসেনি কেউ?

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। চকে, বিলে না আলো না অন্ধকার এমন একটা ভাব। কেমন মন খারাপ করা একটা হাওয়া আছে। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে দিন শেষের পাখি। আমার ঘেটি টনটন করে। সেদিকে খেয়াল নেই। আমি ছুটছি, ছুটছি। এই মিষ্টি আলু বাড়ি নিয়ে গেলেই এক-দেড় সের পরিমাণ আলু চুলায় ফেলা হবে। সারা দিন চুলায় জ্বলেছে নাড়া। নাড়ার আগুন তলার দিকে ধিকিধিকি জ্বলে। সেই আগুনে রাতভর পুড়বে আলু। ভোরবেলা ছাই সরিয়ে তোলা হবে। এত সুন্দর পুড়বে আলু! মিষ্টি একটা গন্ধ বেরোবে। চোকলা ছাড়িয়ে সেই পোড়া আলুতে আমাদের নাশতা হবে। সঙ্গে হয়তো এক-দুমুঠ মুড়ি থাকবে। মুড়ি আর মিষ্টি আলু, এই তো নাশতা।

সন্ধ্যা প্রায় বসে গেছে, এমন সময়ে আলুর বস্তা মাথায় আমি বাড়ির উঠানে। মা কিংবা পুনুআম্মা বস্তা নামিয়েছেন মাথা থেকে। বুজি নামাজ পড়তে বসবেন। পুনুআম্মাকে বললেন, অর ঘেটিটা একটু দোয়াইয়া দে। পোলাপান মানুষ এত দূর থিকা পাঁচ সের আলু মাথায় কইরা আনছে...

পুনুআম্মা আমার ঘাড়ে একটু হাত বুলিয়ে দেন।

দুই

দুপুর শেষের রোদে ঝিমঝিম করছে ধূপখোলা মাঠ।

শিমুলগাছগুলোর ওদিকে ছেঁড়া ছেঁড়া ছায়া পড়েছে। একটা গাভিন ছাগল সেই ছায়ায় বসে জাবর কাটছে। আমার বয়সী দুটি ছেলে সাইকেল চালানো শিখছে। একজন বসেছে সাইকেলে, আরেকজন পেছন থেকে ধাক্কা দিচ্ছে। সাইকেলের হ্যান্ডেল ঠিক রাখা যাচ্ছে না। এলোমেলো চলছে সাইকেল। এই কাত হয়ে পড়ল। শিমুল ডালে হাঁ করা কাক বসে আছে। গরমে অতিষ্ঠ। মাঠে চড়ছে শালিক পাখি। তাদেরও ঠোঁট হাঁ।

আমরা মাঠ পাথালে হাঁটা দিলাম। শালিক পাখি দৌড়ে দৌড়ে সরে গেল। একটা উড়াল দিল।

মাঠের পশ্চিম দিকে আমাদের বাসা। মাঠ ঘেঁষে অনেক বাড়িঘর। কোনোটা দালানবাড়ি, কোনোটা টিনের। কোনোটা অর্ধেক দালান, অর্ধেক টিন। আম-জামের গাছ আছে কোনো কোনো বাড়িতে। দুয়েকটা রিকশা যায় টুংটাং ঘণ্টি বাজিয়ে। বাড়ির বারান্দায় বসে হাতপাখায় নিজেকে বাতাস করছে খালি গায়ের বিশাল ভুঁড়িওয়ালা এক লোক। সাদা লুঙ্গি পেটের অনেক নিচে। বাড়ির সামনে মাঠপারে হইচই করছে কয়েকটা বাচ্চাকাচ্চা। একজন মিস্তি বোঝা মাথায় হেঁটে যাচ্ছে উত্তর দিকে।

লুৎফন তো হাঁটছে না, ছুটছে। দৌড়াচ্ছে। আমি ওর সঙ্গে হেঁটে পারি না। ইলাস্টিক ঢিলা হওয়া প্যান্ট কোমর ছাড়িয়ে নামছে। ছুটতে ছুটতেই লুৎফন আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। এই মিলু, তর নুনু দেহা যায়। হি হি।

আমি লজ্জা পেয়ে প্যান্ট টেনে তুলি। অসভ্য কথা কবি না। তাইলে তর লগে যামু না।

আইচ্ছা আর কমু না। ল।

আমি ছুটি লুৎফনের পেছন পেছন। চারদিকে তাকাই আর ছুটি।

মাঠের চারপাশেই বাড়িঘর। শুধু উত্তর দিকটার অনেকখানি ফাঁকা। মানুষের ঘরবাড়ির পাশে উত্তর-পুব দিকে আখখেত। আখখেতের পেছন দিয়ে বয়ে গেছে ধোলাইখাল। তখন পর্যন্ত ওদিকটায় যাওয়া হয়নি। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি। আধা গ্রাম আধা শহর। পুব কোণে নামাপাড়া। ছড়ানো-ছিটানো ঘরদুয়ার, একতলা-দোতলা পুরোনো দালানবাড়ি। দুয়েকটা মুদি দোকান, চায়ের দোকান। পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকানও আছে। পুব-দক্ষিণ দিকে মাঠ ঘেঁষে বাড়িঘর, গলির পর গলি ঢুকে গেছে। সেসব গলির ভেতরও নতুন-পুরোনো বাড়ি। ঠেলাগাড়ি ভরে ইট-বালু যাচ্ছে মাঠপাড়ের রাস্তায়। দক্ষিণ কোণে টিনের রং করা সুন্দর দু-তিনটা ঘর। মাঠের একেবারে কোণে। সামনে পাতাবাহারের ঝোপ, চটির বেড়া দেওয়া ছিমছাম পরিবেশ। ইস্ট এন্ড ক্লাব।

ইস্ট এন্ড ক্লাবের সামনের মাঠে জার্সি পরা ছেলেরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। খেলতে নামবে রোদ পড়ে এলে। একজনের হাতে ফুটবল।

লুৎফন আমাকে নিয়ে নামাপাড়ার দিকে যাচ্ছে।

মাঠ পেরিয়ে খোয়া ফেলা রাস্তায় উঠেছি। দুজনেরই খালি পা। নামাপাড়ার মুখে চারটা সরু রাস্তা চারদিকে চলে গেছে। উত্তরে ধোলাইখাল, পুবের গলিটা গিয়ে উঠেছে রেললাইনে। গলির দুই পাশে ঘরবাড়ি। আখখেতের দিককার রাস্তা চলে গেছে মুরগিটোলার দিকে। দক্ষিণেরটা দীননাথ সেন রোডের দিকে। পশ্চিম-দক্ষিণ আর পুব দিকটা ডিস্টিলারি রোড। মাঝখানে ধূপখোলা মাঠ।

লুৎফনের নাক ঘামছে। ডান হাত দিয়ে ঘষে নাক মুছল সে। তখনো নামাপাড়া জায়গাটা আমি চিনি না। সে আমাকে চেনাল। এই জাগার নাম নামাপাড়া। এই রাস্তা দিয়া গেলে রেললাইনে ওঠন যাইব।

আমি কথা না বলে লুৎফনের সঙ্গে হাঁটতে থাকি। ঢিলা প্যান্ট দেখিয়ে লুৎফন অসভ্য কথা বলেছিল। তারপর থেকে আমি সাবধান। এক হাতে প্যান্ট ধরে রেখেছি।

নামাপাড়ার গলিতে ধীরে ধীরে ফুরিয়ে যাচ্ছে দুপুর। রোদ নরম হচ্ছে। ঘরবাড়ির ছায়ায় বসে দুজন বয়স্ক লোক গল্প করছে। একজন দাঁত খিলাল করতে করতে বলল, জবরদস্ত খাওন দিছি মিয়া। খাস্‌সির গোস আর ডাইল। দুই থাল মাইরা দিছি।

অন্য লোক বলল, আমিও মিয়া আইজ গোস খাইছি। গরুর গোস। লও, অহন এক কাপ কইরা চা খাইয়াহি। তার বাদে সিকারেট খামু নে। কাইল থিকা ওস্তাগরি কামে লাগুম। লও।

সেই দুই লোকের পাশ দিয়ে আমরা হেঁটে যাই।



বাঁয়ে একতলা ছোট্ট দালানঘরে ইমাম সাহেব থাকেন

রেললাইনের ধারে এসে দাঁড়াই।

মানুষের ঘরবাড়ির কোমর ছাড়িয়ে উঠেছে রেললাইন। হলুদ লালচে মাটি। কলার খোসা, ডাবের খোসা, কাগজ ন্যাকড়া, মোটা কয়েক লাদি মানুষের গু পড়ে আছে। গোবর, ছাগলের দানা দানা গু, নর্দমার পচা পানির গন্ধ, সব মিলিয়ে বিচ্ছিরি জায়গা।

আমি নাক চেপে বললাম, ওই লুৎফন, কই আইলি? এই রেললাইনে আমি যামু না।

লুৎফন নির্বিকার। আগে রেললাইনে ওট ছ্যামড়া, তার বাদে দেকবি কেমুন লাগে।

ময়লা বাঁচিয়ে লুৎফনের সঙ্গে রেললাইনে উঠলাম। উঠে সত্যি ভালো লাগল। আগে বিনাখালাদের বাড়ির ওদিক থেকে রেললাইন দেখেছি, রেলগাড়ি দেখেছি কিন্তু রেললাইনে কখনো ওঠা হয়নি। গভীর বিস্ময়ে রেললাইন দেখতে থাকি। চকচকা লাইনের মাঝখানে আড়াআড়ি ফেলা কাঠ, কাঠের এপাশ-ওপাশে, পুরো লাইনজুড়েই ছোট ছোট পাথর ফেলা। লাইনের দুপাশে নানা রকম ঝোপঝাড়, কাঁটাগাছ। অচেনা ফুল ফুটে আছে কোনো কোনো ঝোপে। কী একটা ফুলের ঝাঁজালো গন্ধও পেলাম।

রেললাইনের পুব পাশে পুকুর ডোবা আর ধান আখের খেত, ছড়ানো-ছিটানো ঘরবাড়ি। টিনের ঘর, ছাপড়াঘর। একেবারেই গ্রাম। গরু-ছাগল আছে গৃহস্থবাড়িতে, পাখি ডাকছে। বিকেল হয়ে আসা রোদের তেজ কমিয়ে দিচ্ছে ফুরফুরে হাওয়া।

প্রথমে খেয়াল করিনি হঠাৎ যেন দেখি, আরে রেললাইন তো দুটো। এই একটা, খানিক দূরে আরেকটা। একেবারে পাশাপাশি। বাহ্, একসঙ্গে দুই রেললাইন। বিনাখালাদের বাড়ি থেকে কি দুটো রেললাইন দেখেছি?

না, মনে পড়ে না তো!

লুৎফন বলল, দুইডা রেললাইন ক্যান, জানচ?

না। ক্যা রে?

একটা দিয়া ঢাকা থিকা নারিণগুঞ্জ যায় রেলগাড়ি, আরেকটা দিয়া নারিণগুঞ্জ থিকা আহে।

আমি বিস্মিত। ও।

ওই যে দেক, ধোলাইখালের উপরে রেলপুল।

তাই তো। আমরা যে রেললাইনে উঠেছি এই লাইনের পুলটা বোঝা যায় না। খালের ওপর দিয়ে সোজা চলে গেছে উত্তরে। দুপাশে কোনো রেলিং নেই। শুধু লোহার লাইন আর এক 'কাইক' পরপর আড়াআড়ি কাঠ ফেলা। অন্য লাইনটার দুপাশে ইট রঙের দেয়ালের মতো লোহার রেলিং।

আমি গভীর বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি।

উত্তরে হরদেও গ্লাস ফ্যাক্টরি হয়ে রেললাইন চলে গেছে

ফুলবাড়িয়া স্টেশনে। দক্ষিণে গেন্ডারিয়া স্টেশন, পাগলা তারপর নারায়ণগঞ্জ। আমরা রেললাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই ফুলবাড়িয়া থেকে ঝিকঝিক করে এল একটা রেলগাড়ি। আমাদের লাইনে না। এল ওদিককার লাইন দিয়ে। অনেক লম্বা রেল। যাচ্ছেই, যাচ্ছেই। আর যেন ফুরায়ই না। রেলের জানালায় মানুষের মুখ। পুরুষ-মহিলা। পোলাপানও আছে।

ইশ্ কী ভাগ্য মানুষগুলোর! রেলে চড়ে যাচ্ছে!

লুৎফন বলল, আমি একদিন রেলগাড়িতে চড়ুম।

কেমতে?

আমগো আত্মীয় থাকে নারিণগুঞ্জ। দুলাভাইরে কমু রেলগাড়িতে কইরা আমারে য্যান নারিণগুঞ্জ লইয়া যায়।

হিংসায় বুক জ্বলে যায় আমার। লুৎফনের ভাগ্য কত ভালো। সেরুদা ওকে রেলগাড়িতে করে নারায়ণগঞ্জ নিয়ে যাবে।

আমি কি আব্বাকে বলব, আব্বা, আমারে একদিন রেলগাড়িতে চড়াইবেন? রেলগাড়িতে চড়নের বহুত শখ আমার।

এ কথা লুৎফনকে বলি না। চুপ করে থাকি।

লুৎফন বলল, ওই মিলু, ল একখান কাম করি।

কী?

খালের ওই পারে যাই।

কেমতে?

রেলপুল দিয়া।

না রে, আমার ডর করে।

কিয়ের ডর?

যদি রেলগাড়ি আইয়া পড়ে?

এই পুল দিয়া যামু না তো।

তয়?

ওই পুল দিয়া যামু। ওই যে রেলগাড়ি গেল, ওই পুল দিয়া। ওই পুলে অহন আর রেলগাড়ি আইব না। একটা গাড়ি গেছে না? আর ওই পুলে রেলগাড়ি আইলেও ডরের কিছু নাই। পুলের দুইপাশে দেখতাছস না রেলিং দেওয়া আছে, ওই রেলিংয়ের সামনে খাড়াইয়া থাকুম। আমি একদিন গেছি তো!

কার লগে?

আমার ছোট ভাই আওলাদের লগে। ল, ডরের কিছু নাই। আমি আছি না? কিয়ের ডর? আমি বেবাক চিনি। আয় আয়।

আমি কথা বলার আগেই আমার হাত ধরে ওপারের ঢালুতে নেমে গেল লুৎফন। অন্য রেললাইনটায় উঠলাম আমরা।

এই লাইনের অবস্থাও ও রকমই। দুপাশে ময়লা-আবর্জনার অন্ত নেই। লালচে হলুদ মাটি। হাওয়ায় কেমন একটা গন্ধ।

রেললাইনে উঠে পুব দিককার গ্রাম, খেতখোলা, মাঠঘাট, পুকুর, ডোবা সব আরও পরিষ্কার দেখতে পাই। খালের পাশে ঘরবাড়ি, গাছপালা ঝোপঝাড়। কোনো কোনো ঘাটে নৌকা বাঁধা আছে। পশ্চিম থেকে আসছে নৌকা, পুব থেকে যাচ্ছে। একেবারে গ্রাম। রেললাইন আর দু-চারটা দালানবাড়ি না থাকলে কে বলবে এটা ঢাকা শহর?

আমার তখনো ভয় করছে। যাব লুৎফনের সঙ্গে? নাকি আমি এপারে দাঁড়িয়ে থাকব, লুৎফন একা গিয়ে ঘুরে আসবে?

কথাটা বললাম লুৎফনকে। সে এমন রাগল, ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, তুই কেমুন পোলা? আমি মাইয়া হইয়া যাইতে পারুম আর তুই পোলা মানুষ যাইতে ডরাছ? যা ছ্যামড়া, তরে লইয়া আহনই আমার ঠিক হয় নাই। আমি একলা আইলেই ভালো হইত।

লুৎফনের কথায় আমি খুব শরম পেলাম। ডরভয় ফেলে বললাম, আইচ্ছা, ল যাই।

লুৎফন খুশি হলো। ডরাইলে আমার হাত ধরিছ। কিচ্ছু হইব না। দেখবি রেলপোলে উটলে কত মজা লাগে।

লাইনের মেঝেতে ফেলা এক কাঠ থেকে আরেক কাঠে পা দিয়ে আমরা দুজন উত্তরমুখী হাঁটা দিই। বড় মানুষদের জন্য এক কাঠ থেকে আরেক কাঠের দূরত্ব ঠিক আছে। আমাদের মতো পোলাপানের জন্য ঠিক নেই। পা একটু বেশি ফাঁক করতে হয়। একটু অস্বাভাবিক হাঁটা। দুয়েকবার পা বেশি ফাঁক করতে গিয়ে পাথরকুচিতে পাড়া পড়ল। দেখে লুৎফন বলল, বড় কইরা 'কাইক' দে, ছেমড়া। এই যে দ্যাখ আমি কেমনে দেই।

আমি দেখি, লুৎফন আসলে 'কাইক' দেয় না। লাফ দিয়ে এক কাঠ থেকে আরেক কাঠে যায়।

আমিও লুৎফনের মতো লাফ দিয়ে দিয়ে চললাম। রেলপুলের মুখে এসে দাঁড়ালাম।

লুৎফন বলল, নিচমিহি চাবি না। চাইলেই ডর লাগব। তয় আবার ডরেরও কিচ্ছু নাই। তুই তো সাঁতর জানচঐ। খালে পইড়া গেলে সাঁতরাইয়া উটবি।

এ আবার কেমন কথা? যদি মা, আব্বা শোনেন আমি রেলপুলে উঠেছিলাম আর সেখান থেকে খালে পড়ে গেছি তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। আব্বা গায়ে হাত তুলবেন না, রাগারাগি করবেন কিন্তু মা তো বেদম পিট্টি দেবেন। লুৎফনের সঙ্গে মিশতেই দেবেন না। সেরুদাকে অথবা তাঁর বউকে বলে লুৎফনকেও পিট্টি খাওয়ানোর ব্যবস্থা করবেন। মিথ্যা কথা যে বলব সেই উপায়ও নেই। খালে পড়লে তো প্যান্ট, গেঞ্জি ভেজা থাকবে!

জিন্দাবাহারের ওদিককার ইসলামপুর রোডে একবার রিকশার নিচে পড়ে গিয়েছিলাম। তেমন কিছু হয়নি। একটু ছিলেটিলে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরে বাসায় ফিরে দেখি বাদলের জ্বর। মা, পুনুআম্মা ওর মাথায় পানি দিচ্ছেন। আমার দিকে কেউ ফিরেও তাকাননি। কিন্তু ভেজা জামা কাপড়ে দেখলে...

না, কিছুতেই খালে পড়া যাবে না। আর খালে কত নৌকা। যদি পানিতে না পড়ে কোনো নৌকার ওপরে গিয়ে পড়ি?

খাইছে আমারে, তাইলে আর রক্ষা নাই।

রেলপুলের ধারে এসে আল্লাহর নাম নিয়ে প্রথম কাইকটা দিলাম। দেখি ভালোই পারছি। লুৎফন বলেছে নিচের দিকে না তাকাতে। কিন্তু আমার চোখ বারবারই নিচের দিকে যাচ্ছে। জোর করে চোখ সরিয়ে এক কাঠ থেকে আরেক কাঠে পা ফেলি। শরীর একটু নড়বড় করে। ঢিলা প্যান্ট ধরে রাখতে হয়েছে এক হাতে, প্যান্ট ছ্যাল ছ্যাল করে নিচে নামলে লুৎফন আবার সেই অসভ্য কথাটা বলবে। ওই মিলু, তর নুনু দেহা যায়। হি হি হি।

লুৎফন আমার আগে আগে যাচ্ছে। কোনো ডরভয় নেই। যেন এ রকম পুল পেরিয়ে যাওয়া কোনো ব্যাপারই না। এক্কাদোক্কা খেলার কায়দায় লাফ দিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। কিছুদূর গিয়ে আমার দিকে তাকায়। তর এত দেরি লাগে ক্যা? তাড়াতাড়ি আয়। দেহচ না আমি কত তাড়াতাড়ি যাইতাছি?

আমি একটা কাঠের ওপর দাঁড়িয়ে বললাম, আমি তর মতন তাড়াতাড়ি পারি না। তুই যা, আমি আইতাছি।

না, আমি খাড়াই। তুই আয়। একলগে ওই পার যামু, একলগে ফিরত আমু।

আইচ্ছা।

আমি আমার ভঙ্গিতে, নড়বড়ে শরীরে একটা একটা করে কাঠ পেরিয়ে লুৎফনের কাছে চলে আসি।

এবার লুৎফন আমার হাত ধরল। আমি তর হাত ধরতাছি। অহন আর অসুবিধা নাই। একলগে পোল পার হমু।

লুৎফনও তারপর আমার ভঙ্গিতে একটা একটা করে কাঠ



মুখে কালো দাড়িমোচ, মাথায় টুপি, মুসল্লি ধরনের বিনয়ী মানুষ সে

পেরিয়ে যায়। আমি নিচের দিকে তাকাই। নিচে কাচের মতো স্বচ্ছ পানি ধোলাইখালের। খাল বয়ে যাচ্ছে খালের মতো। উত্তর-পশ্চিম পারে কয়েকজন দিনমজুর ধরনের মানুষ নাইতে নেমেছে। কেউ সাঁতার কাটে, কেউ ডুব দেয়। একটু আগে-পিছে দুটো ডিঙি নৌকা যাচ্ছে। এক নৌকার পেটভরা বাঙ্গি আর তরমুজ। মিষ্টিকুমড়াও আছে।

ওপারে এসে লুৎফন বলল, এই জাগার নাম দয়াগুঞ্জ। সোন্দর না জাগাডা?

আমি তাকিয়ে তাকিয়ে জায়গাটা দেখি। সৌন্দর্যের কী আছে বুঝতে পারি না। ওপারের মতোই খালপারে মানুষের ঘরবাড়ি, ঘাটলায় নৌকা বাঁধা আছে। মহিলারা ধোয়াপাকলার কাজ করছে যার যার সীমানার খালের পানিতে। বাঁশঝাড় আছে, আম, জাম, শিরীষ, গাব আর বটগাছ আছে। নিমগাছ আছে খুব বড় একটা। বাঁশের বেড়া আর বাঁশ বিক্রির একটা দোকান রেললাইনের ধারে। একটু দূরে অনেক পুরোনো দোতলা একটা দালানবাড়ি। সীতারামপুরের তালুকদার বাড়ির মতো। কিছু দোকানপাট ওদিকটায়। পুবে-পশ্চিমে রাস্তা। রিকশা যাচ্ছে, ঠেলাগাড়ি, গরুর গাড়ি, সাইকেল চলছে। লোকজনে বেশ একটা গমগমে ভাব।

লুৎফন বলল, ল ওইমিহি যাই।

ক্যা?

ঘুইরা আই।

না, অতদূর যাওনের কাম নাই। ল যাইগা।

আরে না, কিচ্ছু অইব না।

না আমি যামু না।

ধুর ছেমড়া, তুই একটা ডরহিয়াইল্লা।

রেললাইনের ধারে ধুতরাগাছের জঙ্গল। কাঁটাওয়ালা ধুতরা গোটা ফলে আছে। অচেনা একটা ঝোপে ফুটে আছে সাদা ছোট ছোট ফুল। দুয়েকটা মৌমাছি উড়ছে। ফুলে কোনো গন্ধ নেই। একটু দূরে এক বাড়ির আঙিনায় একটা শজনেগাছ। গাছতলায় দাঁড়িয়ে বাড়ির অল্পবয়সী বউমতন এক মহিলা আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

লুৎফন বলল, আমি এইপারে অনেকবার আইছি।

একলা একলা?

হ। পয়লা দিন আইছিলাম আওলাদের লগে। তার বাদে আইছি একলা একলা।

কির লেইগা আইছস?

আইতে ভাল্লাগে। বাসায় আমার মন টিকে না। খালি এইমিহি ওইমিহি চইলা যাইতে ইচ্ছা করে।

একটু উদাস হলো লুৎফন। তয় আমি কইলাম খালি দয়াগুঞ্জের মিহিই আই না, গুন্টিঘরের মিহিও যাই। একদিন গেনডইরা ইস্টিশানেও গেছিলাম গা। কতদিন রেললাইনের

ধারে আইয়া খাড়াইয়া রইছি। রেল যায় আর আমি চাইয়া চাইয়া দেহি। আমার খালি ইচ্ছা করে একদিন একলা একলা একটা রেলগাড়িতে চড়ুম। ফুলবাইড়ার ওইমিহিই যামুগা, নাইলে নারিণগুঞ্জ যামুগা।

কচ কী? একলা একলা গেলে যুদি হারায়া যাচ? যুদি আর ফিরত আইতে না পারচ?

হারায়া গেলে হারায়া যামু! ফিরত আইতে না পারলে আমু না!

যাহ!

হ। আমার এমুন ইচ্ছা হয়।

তর মাথায় ছিট আছে।

থাকতে পারে।

ল অহন যাই। বিয়াল হইয়া গেছে।

আমরা আবার রেলপুলে উঠি। কয়েকটা কাঠ পেরিয়ে যাওয়ার পর লুৎফনকে দেখি কেমন চিন্তিত। আমার হাত ধরে বলল, খাড়া মিলু।

আমি দাঁড়ালাম। কী হইছে?

পুল কেমুন কাঁপে না?

কো?

হ কাঁপে। খেল কর।

আমি খেয়াল করার চেষ্টা করি। হ্যাঁ, কেমন মৃদু, অতিমৃদু একটা কাঁপন যেন লাগছে পুলে। বললাম, হ রে, ইট্টু ইট্টু কাঁপে।

খাড়া খাড়া।

লুৎফন একটা কাঠের ওপর বসে একদিককার লাইনে কাত হয়ে শোয়ার মতো করে কান পাতল। কয়েক মুহূর্তমাত্র। তারপর লাফিয়ে উঠে ভয়ার্ত গলায় বলল, রেল আইতাছে। দৌড় দে, তাড়াতাড়ি দৌড় দে মিলু।

এই পুলে কেমন করে দৌড় দেওয়া যায় আমি ঠিক বুঝতে পারি না। ভয়ে বুক ধড়ফড় করছে, গলা শুকিয়ে গেছে। যদি হুড়মুড় করে এসে পড়ে রেলগাড়ি কী হবে আমাদের? লাফ দিয়ে খালে পড়ব নাকি দেয়ালের মতো রেলিংয়ের ধারে গিয়ে দাঁড়াব। ওখানে কোনোরকমে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা যাবে। যদি না যায়? যদি পা পিছলে যায়? যদি রেলগাড়ির ঠিকরে আসা হাওয়ায় তাল সামলাতে না পারি?

লুৎফন তখন লাফ দিয়ে দিয়ে একটা করে কাঠ পেরোচ্ছে। আমার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। অনেকটা আগে চলে গেছে।

কী করব?

আমি এখন কী করব?

জবাই করা মুরগির মতো দাপড়াদাপড়ি করছে কলিজা। গলা শুকিয়ে একেবারেই কাঠ। রেল এসে পড়লে দুই কাঠের ফাঁক দিয়ে খালে পড়বই। তার আগে ছাতু হয়ে যেতে পারে মাথা।

না, আমি আর ভাবতে পারি না। লুৎফনের কায়দাটা ধরি। লাফ দিয়ে দিয়ে একটা করে কাঠ পেরিয়ে যাই। ওপারে এসে মাত্র হাঁফ ছেড়েছি, দেখি গুন্টিঘরের ওদিকে রেলের ইঞ্জিন দেখা যাচ্ছে। মাথার ওপর দিয়ে বেরোচ্ছে সাদা ধোঁয়া। কু ঝিকঝিক শব্দটা এগিয়ে আসছে।

দৌড়ে রেললাইন থেকে নেমে এলাম। কয়েক মুহূর্ত পর রেলের ঠিকরে আসা হাওয়া আমাদের এলোমেলো করে দিল। পাশ দিয়ে দাঁড়াশ সাপের কায়দায় ছুটে গেল অনেক বগিওয়ালা একটা রেলগাড়ি। নারায়ণগঞ্জ থেকে এসে ফুলবাড়িয়ার দিকে যাচ্ছে।

আমার তখন কলিজা ধড়ফড়ানি কিছুটা কমেছে। শুকনা মাটির মতো হয়ে যাওয়া গলা কিছুটা স্বাভাবিক হয়েছে। লুৎফন দু-তিনবার নিজের বুকে থুতু ছিটাল। আল্লায় বাচাইছে। আইজ রেলের নিচে পইড়া মরতাম আর নাইলে খালে পড়তাম। খালে পড়লে মরতাম না। সাঁতরাইয়া বাঁচতাম।

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, তর লগে আমি আর কোনো দিন কোনোহানে যামু না। অহন ল বাসায় যাই।

লুৎফন বলল, তুই এত চেতছস ক্যা? আমরা তো মইরা যাই নাই! কিচ্ছু হয়ও নাই।

যুদি হইত?

আরে না, হইত না।

তয় তুই এত ডরাইলি ক্যা?

লুৎফন হাসল। লাইনে কান লাগাইয়া যহন বুঝলাম রেল আইতাছে তহন আতকা এমুন ডরাইলাম! কী কমু তরে? পরে চিন্তা করলাম, রেল একদোম কাছে আইয়া পড়লে তর হাত ধইরা খালে লাফ দিমু...হি হি।

চুপ কর ছেমড়ি। হাসবি না। তয় এই কথা কইলাম কেঐরে কইচ না লুৎফন। তাইলে সেরুদায় তরে দ্যাশে পাডাইয়া দিব। ঢাকায় আর থাকতে পারবি না। মায় আমারে মারব, আব্বায় বকা দিব। তর লগে আর মিশতে দিব না।

ধুরো বলদা ছ্যামড়া, এই কথা কেঐরে কওন যাইব নি? আমি এত বলদি না, কেঐরে কমু না।

নামাপাড়ার রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে লুৎফন বলল, তয় আমি একদিন একলা একলা রেলগাড়িতে কইরা কোনোহানে যামুগা। কেঐ আমারে বিচড়াইয়া পাইব না। দেহিছ।

তিন

আজ রোববার।

আব্বার অফিস নেই। নাশতাপানি খেয়ে নিজ হাতেই তামাক সাজিয়েছেন। কলকিতে তামাক চেপে চেপে বসিয়ে চিমটা দিয়ে চুলার আগুনে পুড়িয়েছেন টিকা। তারপর নারকেলের হুকায় আরামসে টানছেন। নাকমুখ দিয়ে ভুর ভুর করে বেরোচ্ছে তামাকের ধোঁয়া। তামাকের মাদকতাময় গন্ধ ভাসছে বারান্দায়।

মা তাড়া দিলেন। বেইল হইয়া গেল! বাজারে যান না?

মায়ের দিকে তাকালেন না আব্বা। তামাক টানার ফাঁকে বললেন, যাইতাছি। তামুকটা খাইয়া লই।

কুনসুম যাইবেন, কুনসুম আইবেন আর কুনসুম আমি মাছ-তরকারি কুইট্টা রান্ধন চড়ামু?

আব্বা আরও কয়েক টান দিয়ে উঠলেন। কলকির নিভে আসা টিকা, পোড়া তামাক এসব উপুড় করে ফেললেন বারান্দার বাইরে, একপাশে। হুকা যত্নে দাঁড় করিয়ে রাখলেন দেয়ালের সঙ্গে। খুবই প্রিয় জিনিস আব্বার। নিজেই হুকার দেখভাল করেন।

আব্বার তামাক খাওয়াটা আমার খুব ভালো লাগে। শুধু তামাক খাওয়া কেন, সবকিছুই ভালো লাগে। পায়ের স্যান্ডেল আর নয়তো পাম শু, সাদা পায়জামা আর ঝুলপকেটওয়ালা শার্ট, বুক পকেটে ভাঁজ করা কাগজপত্র আর কালো রঙের ফাউনটেন পেন। কলমটা মোটা ধরনের। সোনালি ক্লিপ আছে। নাম 'প্রেসিডেন্ট'। দু-তিন দিন পরপর সেলুন থেকে মুখ কামিয়ে আসেন আব্বা। তখন মুখটা চকচকে, পরিষ্কার। অন্য সময় খোঁচা খোঁচা মোচদাড়ি মুখে। মাথার চুলে তেল দেওয়া, স্কুলে পড়া সুবোধ বালকের ভঙ্গিতে চুল আঁচড়ানো। আর মুখটা কী স্নিগ্ধ, মায়াবী!

আমি তাকিয়ে তাকিয়ে আব্বাকে দেখি আর ভাবি, আমি আব্বার মতো হব। আব্বার মতো করে মাথা আঁচড়াব, ও রকম ঝুলপকেটের শার্ট পরব, পায়জামা পরব। পায়ে 'দোয়াল' দেওয়া স্যান্ডেল পরব আর নয়তো পাম শু। বুকপকেটে ও রকম কলম আর ভাঁজ করা অনেক কাগজ থাকবে। আব্বার মতো করে বাজারে যাব, অফিসে যাব।

যাওয়ার আগে নিজের তামাকটা নিজে সাজিয়ে খাব।

মেদিনীমণ্ডলে একদিন, আমাদের ওই অভাবের দিনে, বাইরে খুব বৃষ্টি সেদিন। বর্ষাকাল। রান্নাঘরে বসে বুজি আর আব্বা চিন্তিত মুখে কথা বলছেন। বুজির হাতে হুকা। নিজে খানিক টেনে আব্বাকে দিলেন। তার আগে হাতের চেটোয় নারকেলের ফুটো জায়গাটা মুছে দিলেন। 'লোল' লেগে আছে। আব্বা হুকা নিয়ে টানতে লাগলেন। আমি বড় ঘরের ওদিককার দরজায় দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখছি।

রান্নাবান্না হয়ে যাওয়ার পর বড় ঘরের খাটালে, খাটের ওপর ভাত খেতে বসেছেন আব্বা। মা, বুজি, পুনুআম্মা সবাই এই ঘরে। ভাইবোনরাও খেতে বসেছে। ওই যে আমার তাড়াতাড়ি খাওয়ার অভ্যাস, তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে চুপিচুপি গেলাম রান্নাঘরে। হুকাটা বেড়ার সঙ্গে দাঁড় করিয়ে রাখা। তামাক আর লাকড়ির কয়লা তখনো কলকিতে। পরিষ্কার করা হয়নি। আমি এদিক-ওদিক তাকিয়ে নারকেলের ফুটোয় মুখ লাগিয়ে টানতে লাগলাম।

টানি কিন্তু ধোঁয়া বেরোয় না। হুকার পানি এসে ঢুকল মুখে। বিচ্ছিরি একটা স্বাদ সেই পানির। বমি আসে আসে দশা। তবু চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। বুজি দেখে ছুটে এলেন। করতাছ কী মিয়াভাই? পোলাপানে উক্কা খায় না।

আমার হাত থেকে হুকা ছিনিয়ে নিলেন।

কথা গেল আব্বার কানে, মা-পুনুআম্মার কানে, ভাইবোনদের কানে। সবাই খুব হাসল। আব্বা আমাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, এমুন আর কইরো না বাজান। পোলাপান হুক্কা টানে না। ওইডা বড়রা খায়।

আব্বা যা বলেন আমি তাই শুনি, তাই করি। আর কোনো দিন হুকার দিকে তাকিয়ে দেখিনি।

সেই বর্ষায় তীব্র অভাব চলছে আমাদের। একদিন রান্না হয়, একদিন হয় না। কোনো কোনো দিন শুধু জাউ খেয়ে থাকি, বউয়া বা লেটকা খিচুড়ি খেয়ে থাকি। ঘরে কিছু নেই। সকালবেলা কোনো কোনো দিন শুধু দুয়েক মুঠ আউশ চাল ভাজা। চাপটি জিনিসটার বিক্রমপুইরা নাম 'মউলকা'। ওই জিনিস খাওয়া হয়। দেশগ্রামে আটা পাওয়া যায় না। আটা পাওয়া যায় ঢাকায়। আব্বা দুয়েকবার ছালার ব্যাগ ভরে নিয়ে গেছেন। আটা দেখে মা একবার খুব কাঁদলেন। আটা গরিব-দুঃখীরা খায়। ভদ্রলোক বাড়ির মানুষ আটা খাবে কেন?

খুদের জাউ, বউয়াও আমাদের কোনো কোনো দিনের খাবার। শাকপাতা, কচুঘেঁচু...

সোনাদানা তো সব গেছেই, জমি বিক্রির চেষ্টা চলছে। কয়েক দিনের মধ্যেই কেরায়া নৌকা করে দিঘলী গিয়ে জমি রেজিস্ট্রি করে দিতে হবে।

ওই আরেক উৎসবের দিন আমার। বুজির সঙ্গে আর কেউ যাক না যাক, আমি যাবই। হাজামবাড়ির আবদুল বা মজিদ যাবে। দলিল মামা, মন্নাফ মামা বা জহুদা নজুদা যাবেন। রেজিস্ট্রি হয়ে যাওয়ার পর দিঘলী বাজার থেকে বড় বড় রসগোল্লা কেনা হবে। ওই রসগোল্লা দুখানা খেলে আর কিছু লাগে না।

রসগোল্লা খাওয়ার লোভে আমি পাগল হয়ে থাকি।

বর্ষাকালে ছইওয়ালা নৌকা নিয়ে একধরনের দোকানদাররা আসত গ্রামে। মুদি, মনিহারি জিনিসপত্র থাকত তাদের কাছে। কেরোসিন তেল, ম্যাচ, চিনি, মিঠাই, সাদাপাতা, নারকেল তেল, সাবান, সোডা, সরিষার তেল। বিস্কুট, লেবেনচুষও থাকত। বর্ষায় দ্বীপের মতো হয়ে যাওয়া একেকটা বাড়ির কাছে আসে তারা, গৃহস্থবাড়ির বউ-ঝিরা ডেকে ডেকে দরকারি জিনিসটা কেনে।

এই দোকানদাররা অন্য আরেকটা ব্যবসাও করে। কাঁসা-পিতলের পুরোনো জিনিস অল্প দামে কিনে নেয়। ভাঙারির কারবার।

মোসলেম নামে কাজির পাগলার ওদিককার একজন দোকানদার আছে। একদিন দুপুরের পর আমিনুল মামাদের বাড়ির ওদিকে দেখা গেল তার নৌকা। নিজেই নৌকা বেয়ে দোকানদারি করে। মুখে কালো দাড়িমোচ, মাথায় টুপি। মুসল্লি ধরনের বিনয়ী মানুষ। মা ছাড়া গৃহস্থবাড়ির বউ-ঝিদের সঙ্গে কথা বলে না। লোকটাকে আমরা আগেও দেখেছি। খরালিকালেও একই কারবার সে করে। মাথায় বড় একটা চাঙারি বোঝাই নানা রকম জিনিস, গ্রামে গ্রামে ঘুরে বিক্রি করে।

সেই বর্ষায়, এই তো গত বর্ষার আগের বর্ষায় মোসলেমকে দেখা গেল আমিনুল মামাদের বাড়ির ওদিকে। মা উদাস হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন দক্ষিণের দরজায়। পেছন দিককার উঠানটাকে আমরা বলি বাগান। বাগান উপচে বর্ষার পানি ঘরে ঢোকার চেষ্টা করছে।

আমি দাঁড়িয়ে আছি মায়ের পাশে। মা বললেন, দোকানদাররে ডাক দে।

আমি চিৎকার করে ডাকলাম। ও দোকানদার, দোকানদার...

চারদিক নিঝুম-নির্জন। এক ডাকেই মোসলেম শুনতে পেল। নৌকার মুখ ঘুরিয়ে দ্রুত বইঠা চালিয়ে আমরা যেখানটায় দাঁড়িয়ে আছি ঠিক সেই দরজায়। মুখে অমায়িক হাসি। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, কী কিনবা বাজান?

আমি কী বলব, কথা বললেন মা। কাঁসা-পিতলের জিনিস কিনবেন?

হ কিনুম। আমি তো ভাঙারির কারবারও করি। কী কী বেচবেন মা?

থাল বাসন, বদনা কলসি। লোটাও আছে দুইখান। পিতলের।

আনেন।

তয় একখান কথা আছে, আমগো ঘরের জিনিস যে কিনছেন কেঐরে কইয়েন না।

লোকটা মায়াবী চোখে মায়ের দিকে তাকিয়ে রইল। গভীর করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। না গো মা, কমু না। আমি আপনেগো খবর জানি। তয় সবই আল্লাহপাকের খেলা। আইজ রাজা থাকে মানুষ, কাইল ফকির হয়। আবার এক রকম দিনও যায় না সব সময়। দিন বদলায়। আল্লাহপাকের ইশারাতেই বদলায়। আপনেগো দিনও বদলাইব। দোয়া করি মা, দোয়া করি।

ততক্ষণে বুজি আর পুনুআম্মাও এসে দাঁড়িয়েছেন ওই দরজায়। বুজি বিষণ্ন মুখে বললেন, হায় হায় রে, ঘরের টুমটামও বেচতে হইব?

পুনুআম্মার দিকে তাকিয়ে মা বললেন, পুনি, কারে উঠ। পিতল, কাঁসার যা আছে বেবাক লইয়া আয়।

পুনুআম্মা সিঁড়ি ভেঙে কেবিনে উঠলেন, কেবিনের কোনায় লম্বা সিঁড়ি বেয়ে কারে উঠলেন।

বুজি আমাকে উত্তর দিককার দরজা লাগিয়ে দিতে বললেন। ঘটনা বুঝলাম। বাড়ির অন্য কারও চোখে যেন না পড়ে আলতাবউদ্দিন সারেংয়ের ঘরের তামা, পিতল, কাঁসার জিনিসও বিক্রি হয়ে যাচ্ছে।

আজ হঠাৎ করে ঘটনাটা মনে পড়ল। মোসলেম মুদির মুখটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। লোকটার দোয়া কাজে লেগেছে। দিন বদলেছে আমাদের। এই যে আব্বা ব্যাগ নিয়ে বাজারে গেলেন সুখী মানুষের ভঙ্গিতে। ব্যাগভর্তি বাজার নিয়ে ফিরবেন। বড় একটা ইলিশ মাছের লেজ বেরিয়ে থাকবে ব্যাগের মুখের দিকে। মিষ্টিকুমড়ার ফালি, গোলালু, পটোল, বেগুন কত পদের তরকারি। মিষ্টিকুমড়া ফালি ফালি করে কেটে ইলিশ মাছের সঙ্গে ঝোল করে রাঁধবেন মা। থালাভর্তি গরম জামির চালের ভাত আর ইলিশ মাছ, মিষ্টিকুমড়া, আমরা

পেট ভরে খাব। আমার স্যান্ডো গেঞ্জির পেটের কাছটা টাইট হয়ে যাবে।

দুপুরের পর দেখি আজাদ আর মনি ছেঁড়া রেক্সিনের ব্যাগে জামাকাপড় ভরছে। আমি অবাক। কই যাবি তরা?

মনি বলল, টুনু মামাগো বাসায়।

আমিও যামু।

না, মায় তরে যাইতে দিব না। দাদায় আর আমি যামু।

আমারে যাইতে দিব না ক্যা?

আমি কেমতে কমু? মারে জিগা।

মাকে গিয়ে ধরলাম। ও মা, আমিও টুনু মামাগো বাসায় যামু।

ভাত খেয়ে উষাকে ঘুম পাড়াচ্ছেন মা। কঠিন গলায় বললেন, না।

ক্যা?

আজাদ মনি বড়। অরা যাইব।

আমিও তো বড় হইছি!

ইশ্ বড় হইছে! তুই গেলে আমি দোকানপাটে পাডামু কারে? সংসারে এইডা-ওইডার দরকার হয় না? কারে পাডামু দোকানে?

রোববার দুপুরে ভাত খেয়ে কোনো কোনো দিন চৌকিতে শুয়ে ঘণ্টা-দেড় ঘণ্টার একটা ঘুম দেন আব্বা। আজ সেই ঘুমটা দিচ্ছেন। একবার ঘুমিয়ে গেলে আব্বার আর খবর থাকে না। এখনো খবর নেই। তাঁর পাশেই যে মা আর আমি কথা বলছি, আব্বার কানেই যাচ্ছে না।

আজাদ বলল, মায় যা কয় হেইডা হোন মিলু। মায়ের কথা হোনতে অয়।

আমি আজাদকে একটা বকা দিতে গিয়ে থেমে গেলাম। বড় ভাইকে বকা দিয়েছি, তাও মায়ের সামনে, শুনলেই মা ঠাস করে চটকানা মারবেন।

আমার মন এত খারাপ হলো! ইশ্ কত দিন টুনু মামাগো বাসায় যাই না! কত দিন বিনাখালারে দেখি না!

চোখের সামনে দিয়ে আজাদ আর মনি টুনু মামাদের বাড়ি যাচ্ছে, কয়েক দিন থাকবে, ব্যাগে জামা-কাপড় নিয়েছে। এই দৃশ্য তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলে আমার কান্না পাবে। তারচে' না দেখা ভালো।

আমি বাসা থেকে বেরিয়ে গেলাম।

আজ আর ধূপখোলা মাঠের দিকে গেলাম না। উল্টো দিকে হাঁটতে লাগলাম। দুটো বাড়ির পর হাতের ডান দিকে সেরুদার বাসা। ঢুকব নাকি ওই বাসায়? লুৎফনকে ডেকে আনব? এদিক-ওদিক কোনো দিকে চলে যাব লুৎফনকে নিয়ে?

সেদিনের পর লুৎফনের সঙ্গে আর কোথাও যাইনি। আজ যাব? নাকি একা একাই ঘুরব এদিক-ওদিক?

কিন্তু লুৎফনের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল।

সেরুদার বাসার গেটে দাঁড়িয়ে আছে লুৎফন। গেটের একটা কপাট ধরে উদাস হয়ে আছে। আমাকে দেখে হাসল। কী রে মিলু, কই যাচ?

আমি থমথমে গলায় বললাম, কইতে পারি না।

লুৎফন লাফ দিয়ে রাস্তায় নামল। বুজছি।

কী বুজছস?

তর মন খারাপ।

হ।

লুৎফন আদুরে ভঙ্গিতে আমার হাত ধরল। ক্যা রে?

হাত ধরাতে আমার মন নরম হলো। মনে হলো খুব প্রিয় একজন মানুষ আমার হাত ধরেছে। খুবই আন্তরিক গলায় জানতে চাইছে, আমার কী হয়েছে?

ঘটনা বললাম লুৎফনকে। শুনে সে হাসল। অরা বেড়াইতে গেছে যাউক, ল, অহন তুই আর আমি বেড়াতে যাই।

আমার বুকটা ধক করে উঠল। না না, রেললাইনে যামু না।

ধুরো ছ্যামড়া, ঘোরনের জাগা খালি রেললাইন নি?

তয়?

গেনডাইরায় আরও কত ঘোরনের জাগা আছে। হেদিনের পর আমারও ডর লাগছে রে। আমিও আর রেললাইনে যামু না।

তুই না বলে রেলে কইরা কই জানি যাবি গা...

লুৎফন হাসল। হেইডা কবে না কবে যামু কে জানে! তয় যামু। তুই লগে থাকলে তরেও লইয়া যামু।

আমরা ততক্ষণে পশ্চিম দিককার রাস্তার পেট বরাবর এসে দাঁড়িয়েছি। এই রাস্তা উত্তর-দক্ষিণে। চিপা রাস্তা। রাস্তার দুপাশে বাড়িঘর, মুদি দোকান, চায়ের দোকান। দক্ষিণে রাস্তা গেছে কাঠেরপুলের দিকে, উত্তরে মুরগিটোলার দিকে।

লুৎফন বলল, ল মুরগিটোলা যাই।

তুই মুরগিটোলা চিনস?

আরে আমি বেবাক চিনি। পুরা গেনডাইরা একলা একলা ঘুইরা আইতে পারুম।

আমরা ডান দিকের রাস্তায় মুরগিটোলার দিকে হাঁটা দিলাম।

একটা, দুটো রিকশা আছে রাস্তায়, লোকজন আছে দু-চারজন। হাতের বাঁ দিকে স্কুলঘরের মতো একটা মেসবাড়ি। উল্টো দিকে লম্বা দালানের পুরোনো বাড়ি। ঢালাই করা ছাদের দালান, ঢেউটিনের বাড়িঘর, বাঁশটিনের ঘরও আছে। ওই যে একটা ঘরের চালায় নতুন টেউটিন লাগানো হয়েছে। দুপুরের রোদ সেই চালায় পড়ে ঠিকরে উঠছে। তাকালে চোখে ঝিলিক লাগে।

ডান দিককার কোনায় একটা চায়ের দোকান। এখন দোকানে তেমন লোকজন নেই। চুলায় চায়ের কেটলি, একপাশে চায়ের কাপ-পিরিচ। একটা বড় অ্যালুমিনিয়ামের থালায় সকালবেলা বানানো কয়েকটা শুকনা, শক্ত পরোটা বেঁকাত্যাড়া হয়ে আছে। দোকানের সঙ্গে সরু ড্রেন। ড্রেনের ধারে ভেজা ছোবড়া ছোবড়া চা-পাতা পড়ে আছে। দোকানি বসে আছে একটা বেঞ্চে।

এই দোকানের উল্টো দিকে চিপা একটা গলি। তিনজন মানুষ পাশাপাশি হাঁটতে পারবে, এমন। ভেতরে ঘরবাড়ি। দুয়েকজন মানুষ চলাফেরা করছে। একটা রিকশা ঢুকেছিল। সেটা ঘোরানোর জায়গা নেই। এ জন্য পেছন দিকে ঠেলে বের করতে হচ্ছে। রিকশাওয়ালার মুখে দুনিয়ার বিরক্তি।

গলি কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে?

আমার মনে মনে বলা কথা যেন শুনতে পায় লুৎফন। বলল, এই গল্লির শেষ মাথায় খাল। ওই যে ওই খাল। রেলপুলের...

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই আমি বলি, বুজছি বুজছি। ধোলাইখাল।

হ। ওই যে চিপা গল্লি বেঁকা হইয়া আরও চিপা হইছে, ওইমিহি গেলেই খাল। যাবি?

না। খালপার গিয়া কী করুম?

তয় খালপার আমরা যামু। অন্যমিহি দিয়া যামু।

আমরা উত্তর দিকে হাঁটছি। বলদ গরুর সিংয়ের মতো বাঁকা হয়ে রাস্তা চলে গেছে পুবে। হাতের বাঁয়ে পুরোনা একটা মসজিদ। ঢোকার মুখে ডান পাশে অজু করার জায়গা, বাঁয়ে একতলা ছোট্ট দালানঘর। ইমাম সাহেবের থাকার ব্যবস্থা। মসজিদের চওড়া বারান্দা মোজাইক করা। একজন মুসাফির লোক খাম্বার পাশে খালি গায়ে ঘুমাচ্ছে। ভেতরে, পশ্চিম দিকে মুখ করে দুজন মানুষ হাঁটু ভাঁজ করে স্থির বসে আছে। কাজা নামাজ আদায় করে এখন মোনাজাত ধরেছে।

মসজিদের উল্টো দিকে, রাস্তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাঁকা



ডরভয় ফেলে বললাম, আইচ্ছা, ল যাই

হয়ে যাওয়া একতলা একটা দালানবাড়ি। বাড়িটা নতুন হয়েছে। দেয়ালের চুনকামের রং না ছাই রংয়ের, না সাদা। কেমন যেন একটা রং। বাড়ির পেট বরাবর ছোট্ট লোহার গেট। ছাদে ওঠার সিঁড়ি দেখা যায়। আরেকটা গেট আছে দক্ষিণ দিকে। একই রকমের গেট।

ঠিক নাক বরাবর উত্তর কোনায় সরকারি কল। দুবেলা পানি আসে। জিন্দাবাহারের বিহারি বাড়ির কোনার কলের মতো। কলের পাশে ময়লা, নোংরা ড্রেন, কলতলার মেঝে দাদরা খাদরা। বাঁধানো সিমেন্ট উঠে লাল ইট বেরিয়ে আছে। খানিকপর পানি আসবে কলে। তিন-চারজন বউ-ঝি এখনই ঠিলা, কলসি, বালতি নিয়ে লাইন ধরে আছে। তাদের পেছন দিকে দুজন মানুষ পাশাপাশি হাঁটতে পারবে কি না সন্দেহ, এমন চিপা একটা গলি। কয়েকটি দালানবাড়ি। প্রতিটিই অতি জীর্ণ, অতি পুরোনো। দেয়ালে আস্তর নেই, রং নেই। সোঁদা একটা গন্ধ আছে। একদম জিন্দাবাহারের বাড়িটার মতো।

মসজিদ থেকে কলপাড় পর্যন্ত, হাতের বাঁ দিকটা একদম খোলা। বেশ চওড়া ফাঁকা একটা জায়গা। পশ্চিমে মসজিদ শেষ হওয়ার পর একতলা কাঁচাপাকা কয়েকটা গরিব ধরনের বাড়ি। ওই লাইনে এগোতে থাকলে শেষ মাথায় খাল। তার আগের বাড়িগুলো একেবারেই বস্তি। ছাপড়াঘর, একচালা টিনের ঘর। ময়লা, নোংরা ধরনের পরিবেশ। রাস্তার ধারে হাগতে বসেছে একটা বাচ্চা মেয়ে। পাশে হাজামবাড়ির মহিলাদের মতো সুতি শাড়ি পরা মহিলা দাঁড়িয়ে পান চিবাচ্ছে। ঢাকাইয়া ভাষায় বাচ্চা মেয়েটিকে তাড়া দিল। ওই ছেমড়ি, হাগা ছেছ অহে না তর?

এটাই মুরগিটোলা।

উত্তর দিককার ফাঁকা জায়গায় ময়লার ভাগাড় বেশ অনেকটা জায়গাজুড়ে। তারপর একতলা একটা দালানবাড়ি। পশ্চিম পাশ দিয়ে ভাগাড় ঘেঁষে পায়ে চলা পথ। বাড়ির কাঠের গেট। সেই বাড়ির পশ্চিমে অনেকগুলো ছাপরাঘরের বেশ বড় একটা বাড়ি। গেট বলতে কিচ্ছু নেই। দুই ঘরের মাঝখান দিয়ে একজন মানুষ বাড়িতে ঢুকতে পারবে এমন রাস্তা।

দালানবাড়ির পশ্চিম দিককার দেয়াল আর ছাপরাঘরের বাড়ির মাঝখান দিয়ে ভাগাড়ঘেঁষা ওই রাস্তা আরও চিপা হয়ে ঢুকে গেছে।

আমি চারদিক তাকাতে তাকাতে হাঁটছি। পাশে লুৎফন।

পশ্চিম দিকে কিছুটা এসেই দেখি পুবে-পশ্চিমে বিশাল একটা পুকুর। ছাপরাঘরওয়ালা বাড়ির উত্তরে। পুকুরের উত্তর পারটা একদম গ্রাম। পুবে-পশ্চিমে লম্বা একটা ফসলের মাঠ। সেই মাঠে ধান বোনা হয়েছে, আখ বোনা হয়েছে। চৈত্র মাসের শেষ হয়ে আসা দুপুর রোদে ঝিমঝিম করছে ওদিকটা। তারপরই দক্ষিণ থেকে উত্তরে বাঁকা হয়ে এসেছে

ধোলাইখাল।

হাঁটতে হাঁটতে সেদিকটায় চলে আসি আমরা।

ধোলাইখাল থেকে পুকুরে ঢুকেছে চিকন একটা নালা। শুকনা খটখটো বর্ষায় এই নালা দিয়ে পানি ঢোকে পুকুরে, বোঝা যায়। এখন ময়লা-আবর্জনা পড়ে আছে। খানাখন্দে জমা পানি পচে কালো হয়ে আছে। মরা ইঁদুরের ওপর ভ্যান ভ্যান করছে মাছি। কালো পানির ওপর ছাই রঙের মশার চাদর।

নালা পেরিয়ে আমরা ধান আর আখখেতের দিকটায় আসি। ধোলাইখালের পাড়ে এসে দাঁড়াই।

চওড়াখাল খালের মতো বয়ে যাচ্ছে। দুয়েকটা ডিঙি নৌকা আসা-যাওয়া করে। চিকন নালাটার ওদিকে দেখি খেয়া পারাপারের ব্যবস্থাও আছে। ছোট্ট একটা কোষা নাও নিয়ে ওপার থেকে এল মাঝি। নাওয়ে চার-পাঁচজন মানুষ।

লুৎফন বলল, ওই পারটা হইল বাইন্নানগর।

আমি অবাক। বাইন্নানগর?

হ।

তুই এতকিছু জানচ কেমতে?

লুৎফন হাসে। কইলাম না তরে, আমি এই দিককার বেবাক চিনি।

আমি তাকিয়ে তাকিয়ে বানিয়ানগর এলাকাটা দেখি। এপারের মতোই মানুষের ঘরবাড়ি। পুরোনো একতলা-দোতলা দালান, টিন, বাঁশের ঘর, রাস্তা। বানিয়ানগরের পুব-উত্তর কোনা দিয়ে ধোলাইখালের একটা শাখা চলে গেছে পশ্চিম-উত্তরে। সে দিকটা দেখিয়ে লুৎফন বলল, ওই যে ওইমিহি চা, দেখ, ওইমিহি হইল নারিন্দা।

আমি তাকিয়ে থাকি।

দূরে রেলের হুইসেল শোনা যায়। সেই শব্দে চঞ্চল হলো লুৎফন। মুখ ঘুরিয়ে পুব দিকে তাকাল। আমাকে মৃদু একটা ধাক্কা দিয়ে বলল, ওইমিহি চা মিলু। দেখ, দেখ।

আমি পুব দিকে তাকালাম। ধোলাইখালের পাড় ধরে মুরগিটোলা ছাড়িয়ে ধান আর আখের খেত চলে গেছে নামাপাড়ার দিকে। এখান থেকেও দেখা যাচ্ছে রেললাইন, রেলপুল। ওই তো রেল আসছে ফুলবাড়িয়ার দিক থেকে। ইঞ্জিনের সাদা ধোঁয়ার সঙ্গে ঝিকঝিক শব্দ। কালো ইঞ্জিনের চাকার দিককার ওঠানামা এত দূর থেকেও দেখা যায়।

লুৎফন বলল, ধূপখোলা মাডের উত্তর মিহি যেই আউকখেত দেখছস, এগুনিই কইলাম ওই খেত। সিদা নামাপাড়ায় গেছে, রেললাইনে গেছে।

আমি লুৎফনের কথা শুনি আর অবাক হই। আবার বলি, তুই এতকিছু জানচ কেমতে?

লুৎফন হাসে। এক কথা কতবার কমু তরে? কইলাম না আমি গেনডাইরার বেবাক কিছু চিনি! ল আমার লগে।

কই যাবি?

নামাপাড়ার মিহি যাই।

শুনে আবার বুক কাঁপে আমার। না, ওইমিহি যামু না।

ক্যা?

তর মলতব আমি বুজছি।

কী বুজছস?

ওইমিহি গেলেই তুই রেললাইনে যাবি। রেললাইনে গেলেই পোল পার হইয়া দয়াগুঞ্জ যাবি।

আরে নারে ছেমড়া। কইলাম না তরে, আমিও হেদিন ডরাইছি। রেলপোলে আর উডুম না।

তাও আমি যামু না।

তয় কী করবি অহন?

এইমিহি ঘুইরাঘাইরা বাসায় যামু গা।

আইচ্ছা।

ধান আর আখখেতের আল ধরে আমরা হাঁটছি। আমাদের ডান দিকে পুকুর, বাঁ দিকে ধান-আখের খেত ছাড়িয়ে ধোলাইখাল। পুকুরের ওপারে মুরগিটোলায় মানুষের ঘরবাড়ি। ওই যেদিক দিয়ে আমরা এলাম ওই দিকটা। এই বিকেলেও ওপারের ইটকাঠ ফেলা ঘাটলায় ধোয়াপাকলার কাজ করছে মহিলারা। বাচ্চাকাচ্চার হইচই, ছোটাছুটি। পুরুষ-মহিলা এক ঘাটেই গোসল করছে কয়েকজন। পানিটা কী স্বচ্ছ! বিকেলবেলার হাওয়ায় মৃদু একটা ঢেউ উঠেছে পুকুরের মাঝ বরাবর।

নামাপাড়া আর মুরগিটোলার মাঝখানে, পুকুরের পুব পাড়ে ইটখোয়া ফেলা একটা রাস্তা উত্তর-দক্ষিণে। এটা আসলে পুকুরের পাড়। সেই রাস্তা বা পুকুর পাড় ধরে আমরা ফিরে আসি।

লুৎফন বলল, এই রাস্তার পরই কইলাম ধূপখোলা মাঠের পুব কোনা। ওই যে বাড়িঘর দেহচ না, ওইগুনির পরঐ। তারপর মাঠের ধার দিয়া রাস্তা। ইকটু আউগ্গাইলেই, দক্ষিণমিহি গেলেই তগো আমগো বাসার গল্লি। মাঠমিহি যাবি না মুরগিটোলায় আরও ঘুরবি?

ল ঘুরি।

ল।

লুৎফন আমাকে নিয়ে এই গলিতে ঢোকে, ওই গলিতে ঢোকে। এত চিপাচিপা গলি, কোনো গলিতেই দুজনের বেশি মানুষ পাশাপাশি হাঁটতে পারবে না। কোনো কোনোটা কানাগলি। গলির শেষমাথায় বাড়ি। জিন্দাবাহারের মতো।

এইসব গলিঘুচি ঘুরে রাস্তার দিকে এসে দেখি দূরে দূরে খাম্বার ওপর বিদ্যুৎবাতি জ্বলছে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

আমরা দ্রুত হেঁটে বাসার দিকে ফিরি।

চার

সেজাল খাঁ ফকির এসেছেন সেরুদার বাসায়।

অর্থাৎ মেয়ে মেয়েজামাইর বাসায় বেড়াতে এসেছেন। ওই বাসায় তাঁর দুই মেয়ে। বড় মেয়ে তো আছেই, ছোট মেয়ে আছে লুৎফন। সেরুদা কী কাজ করেন, কী তাঁর রোজগারপাতি কেউ জানে না। তিনি নানা রকম কাজ করার চেষ্টা করেন। কোনো কাজই বেশি দিন থাকে না। কাজ থাকে না, না তিনি লেগে থেকে কাজটা করেন না, বোঝা যায় না। আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে তাঁকে তেমন ভালো বলে না কেউ।

তবে বউটার খুব সুনাম। ভারি লক্ষ্মী বউ। নরম, সহজ-সরল ধরনের মানুষ। মুখে কথাটি নেই। তাঁর গলার শব্দ শোনাই যায় না। লুৎফন হয়েছে বোনের একেবারে উল্টো।

বিকেলবেলা অফিস সেরে বাসায় ফিরেছেন আব্বা। আমি বাইরে ঘুরে-ঘারে বাসায় এসেছি। আব্বার বাসায় আসার সময় হলে কোনো কোনো দিন আমি বাসায় ফিরে আসি। আব্বার কাছে দুপয়সা এক আনা চাই। দিলে ধূপখোলা মাঠের ওদিকে গিয়ে শনপাপড়ি, চিনাবাদাম, ঝালমুড়ি এসব কিনে খাই।

আজও বাসায় এসেছি সেই লোভে। ছিলাম মাঠের ওই দিকে। আজাদ মনি এখনো টুনু মামাদের বাড়ি থেকে ফেরেনি।

বাসায় এসে দেখি ভাত খাওয়া শেষ করে তামাক নিয়ে বসেছেন আব্বা। উষাকে কোলে নিয়ে মা বসে আছেন ঘরের দরজার পাশে, দেয়ালে হেলান দিয়ে। মায়ের মুখটা গম্ভীর।

ঘরে ঢুকেই শুনলাম মা বলছেন, সেজাল খাঁ আইছে।

আব্বা তামাক টানার ফাঁকে বললেন, হ সেরু কইছে।

সেরুর লগে দেহা হইল কই?

অফিসে গেছিল।

ক্যা?

মইধ্যে মইধ্যে যায়। মিনিসপালটিতে কনটেকটারির অনেক সুবিদা। ওইসবের চেষ্টা করে।

ও কনটেকটারি করব কেমতে? কনটেকটারি করতে টেকা লাগে না?

হ, ভালো টেকা লাগে।

তয়?

আব্বা চুপ করে রইলেন। মা কথা ঘোরালেন। জিন ডাক দিমু।

আব্বা একটু চমকালেন। হুকা থেকে মুখ সরিয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকালেন। ক্যা? জিন ডাক দিবা ক্যা?

জিনের লগে কথা আছে।

কী কথা?

হেইডা ডাক দিলেই হোনবেন।

অহন তো আমগো কোনো বিপদ নাই। বিপদ আল্লাহর রহমতে কাইট্টা গেছে। চাকরি ফিরত পাইছি, অফিসে আমার কোনো অসুবিদা নাই।

এইবার জিন ডাক দিমু অন্য কামে।

আব্বা কী বুঝলেন কে জানে। চুপ করে রইলেন।

মা বললেন, ওই বেডির মতলব আমার ভালো ঠেকে না।

কোন বেডির?

বোঝেন নাই আপনে?

আব্বা মাথা নাড়লেন। বুজছি। তয় তোমার চিন্তাডা ঠিক না। বেডি হইল কামের বেডির মতন। বাসা-বাড়িতে কাম করা পদের।

হেইডা চেহারা দেইক্কাই বুঝা যায়। জামাইডাও হাজামবাড়ির আবদুইল্লাহগো লাহান। বেডিডা অজুফাগো লাহান।

হ।

তয় বেডির নজর ভালো না। খালি আমার সংসারের মিহি চাইয়া থাকে। এর লেইগাই আমি জিন ডাক দিমু। আজাদ মনি নাই। অরা বড় অইছে। অগো সামনে বেবাক কথা কওন যায় না। আজই জিন ডাক দিমু। আপনে বেবস্তা করেন।

আব্বা নরম গলায় বললেন, আইচ্ছা দেও।

তয় ওডেন আপনে। ফুল, আগরবাত্তি, মমবাত্তি, বাতাসা, দুধ—এইসব জোগাড় করেন।

আড়াইডা টেকাও তো লাগব।

লাগুক। আপনের কাছে টেকা না থাকলে আমি দিমু নে।

না না, টেকা আমার কাছে আছে।

জিন ডাক দেওয়ার কথা শুনে আমি খুব খুশি। জিন এসে ব্যবস্থা দিয়ে চলে যাওয়ার পর, তখন তো সেজাল খাঁ সেজদার ভঙ্গিতে অজ্ঞান হয়ে থাকেন, যে এক গ্লাস পানি থাকে জলচৌকির আসনে, বাতাসা, ফুল ইত্যাদির পাশে, ওই পানি ছিটিয়ে দিলে জ্ঞান ফেরে তাঁর। তখন বাতাসা দেওয়া হয় সবাইকে। সেই বাতাসা খাওয়ার লোভে আমি খুব খুশি।

তবে রাত জাগতে হবে।

সেজাল খাঁ আসনে বসবেন গভীর রাতে। মেদিনীমণ্ডলে যে দু-চারবার জিন ডাক দেওয়া হয়েছে, তখন খুব বেশি রাত হওয়ার দরকার ছিল না। গ্রাম এলাকা। সন্ধ্যার পর রাতের খাওয়াদাওয়া শেষ হলেই মনে হয় ম্যালা রাত হয়ে গেছে। টাউনে সেই অবস্থা না। অনেক রাত পর্যন্ত বাড়ির পাশের গলিতে লোক চলাচল করে। দুয়েকটা রিকশার ঘন্টি বাজে। বাড়িটায় এত ঘর, এত লোক। কোনো কোনো ঘরের মানুষ অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকে। পোলাপানের কান্নাকাটির শব্দ, স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া, ভাড়াটে ভাড়াটে ঝগড়া, নানান পদের কায়কারবার। সব মিটতে রাত এগারোটা-বারোটা বেজে যাবে। তারপর আসনে বসবেন সেজাল খাঁ। জিন আসতে আবার কতটা সময় নেবে কে জানে!

সেজাল খাঁ ফকির খুশি থাকলে জিন তাড়াতাড়ি আসে। জিনদের তিনি বলেন 'মাহাজন'। তিনি খুশি তো মাহাজনরাও খুশি।

এ জন্য সেজাল খাঁকে 'ভালভালাই' খাওয়াতে হয়।

মেদিনীমণ্ডলে দেখেছি, ওইসব অভাবের দিনেও ইলিশ মাছের বড় বড় টুকরা, বাটিভরা দুধ, আমার মুঠোর চেয়েও বড় খাঁজের পিঠার মতো একখানা খেজুরে গুড়, এসব খাওয়াতে হয় সেজাল খাঁকে। ঘরে কবরী কলা থাকলে দুধ-কবরী কলা, আমের দিন হলে আমদুধ।

আজ কী খাওয়ানো হবে?

রাতের বেলা দেখি ব্যবস্থা ভালোই। বোয়াল মাছের বড় একটা পেটি, দুধ আর সাগর কলা। ফকির বেশ আয়েশ করে, অনেকক্ষণ ধরে খেলেন। আব্বাও বসেছেন তাঁর সঙ্গে। দুজনে গল্প করেন আর খান। কয়েকটা সাগর কলা বঁটিতে কেটে দুভাগ করা হয়েছে। আমরা ভাইবোনরা একেক টুকরা কলা পেলাম।

সারা দিন টো টো করে ঘোরার ফলে রাতের বেলা শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে যাই আমি। সেই রাতে টেরই পেলাম না কখন জিন ডাকতে বসলেন ফকির, কখন জিন এল, কজন এল, কতক্ষণ থাকল, কী কী বলল।

এক ঘুমে সকাল। উঠে দেখি আব্বা ফজরের নামাজ পড়ছেন। সেজাল খাঁ আব্বার সঙ্গে শুয়েছিলেন বারান্দায়, তিনি তখনো শুয়ে।

সেজাল খাঁ গেলেন নাশতা খেয়ে। আমি গিয়ে কোনার ওই দোকান থেকে পরোটা, হালুয়া আর কেটলিতে করে চা নিয়ে এলাম। আব্বা চা তেমন খান না। পরোটা-হালুয়া খেয়ে ফকির খুবই আয়েশ করে চা খেলেন।

ফকির চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর গোসলখানা থেকে গোসল করে এলেন আব্বা। পায়জামা আর শার্ট পরে অফিসে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছেন। মা বললেন, আমি ডরাইয়াই গেছিলাম।

আব্বা থতমত খেয়ে তাকালেন। ক্যা?

উঠানের দিক থিকা আলো আসতাছিল। আমগো বারিন্দা পুরা আন্ধার আছিল না।

হ। আবছা আবছা দেহা যায় বেবাক।

আমি দেকলাম ফকির ফাল দিয়া বাইর হইয়া গেল।

আব্বা হাসলেন। আরে ওইডা ফকির না, মাহাজন আইছিল তিনজন। শেষজন ওইভাবে বাইর হইল। আমিও দেখছি।

একটু থেমে আব্বা বললেন, তয় তোমারে তো কইয়া গেল, কেঐ কোনো ক্ষতি করতে পারব না। বেবাক ঠিক অইয়া যাইব।

হ। তয় যেই শিকড়ডা দিছে, ওইডা মাজায় বাইন্দা রাকতে হইব। অফিস থিকা আহনের সমায় 'কাইত্তান' লইয়া আইয়েন। কাইত্তান দিয়া মাজায় বানতে হইব।

আইচ্ছা, আনুম নে।

সেদিন দুপুরের পর এক ঘটনা ঘটল। উষাকে বুকের কাছে নিয়ে মা শুয়ে আছেন। আমি বাসা থেকে বেরোব কি না ভাবছি। বাদল, পলি, ডলি, মুকুল কেউ শুয়ে, কেউ বসে। এ সময় দেখি সেই মহিলা এসে আমাদের ঘরের সামনে দাঁড়িয়েছে। মুখটা শুকনা, ভয়ার্ত। আমাকে বলল, তোমার মারে একটু ডাক দিবা বাজান।

আমি মাকে ধাক্কা দিলাম—মা, ও মা। আপনেরে ডাকে।

মা কাঁচা ঘুম ভেঙে উঠলেন। কে ডাকে?

উই যে...

মা তীক্ষ্ণ চোখে মহিলার দিকে তাকালেন। রুক্ষ গলায় বললেন, কী?

আপনের লগে ইকটু কথা কমু।

চৌকি থেকে নেমে বারান্দায় এলেন মা। কও।



রেললাইনের ওপরে এসে দাঁড়াই

মহিলা বারান্দায় উঠে এল। উঠেই দুহাতে মায়ের একটা হাত জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল। আমার যুদি কোনো ভুল হইয়া থাকে, আপনে আমারে মাপ কইরা দেন। আমার কোনো ক্ষতি কইরেন না। আমার স্বামী পোলাপানের কোনো ক্ষতি কইরেন না।

মা অবাক। আমি তোমার ক্ষতি করুম ক্যা? আর কেমনে ক্ষতি করুম? তোমারে তো আমি চিনিই না। তোমার লগে কোনো দিন কথাও কই নাই।

হেইডা কন নাই। তয় আমি জানি, আপনে আমার উপরে চেইত্তা রইছেন। আমগো বাড়ি আগলা গালিমপুর। গরিব ঘরের মাইয়া। বাপের সংসারেও কষ্ট করছি, জামাইর সংসারেও কষ্ট করি। তয় আমি খারাপ না। আমারে কেউ কোনো দিন মন্দ কয় নাই।

মা গম্ভীর।

মহিলা বলল, হ এইডা সত্য, কেরানি সাবরে আমি রাইন্দা-বাইড়া খাওয়াইতে চাইছি। তার কাম কাইজ কইরা যুদি দুই-চাইরডা টেকা পাই, আমার সংসারডা ভালো চলে। আমি তার কামের বেডি হইতে চাইছি। এইডা এই বাড়ির মাইনষে ভালো চোক্কে দেহে নাই। আপনের বইনপোর কানে লাগাইছে। হেয় গিয়া আপনেগো কইছে। আপনে বিশ্বাস করেন, আমার মনে কোনো বদচিন্তা নাই। আল্লার কিরা...

মহিলা কাঁদতে লাগল।

মা চুপ করে আছেন।

মহিলা কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমি খুব ডরাইছি আফা, খুব ডরাইছি।

ক্যা, ডরাইছ ক্যা?

রাইত্রে বাইরে যাওনের লেইগা উটছি, হুনি, আপনেগো ঘরের চালে বিরাট আওজ। কেমুন কেমুন গলার কথা হুনা যায়। বিয়ানবেলা হোনলাম জিন ডাক দিছিলেন। আমারে লইয়া আপনের সন্দ, জিনেগো কাছে আমার কথা মনে হয় কইছেন। এইডা মনে কইরা বিরাট ডরান ডরাইতাছি আমি। আপনে আমার কোনো ক্ষতি কইরেন না, আমার স্বামী-পোলাপানের ক্ষতি কইরেন না। আল্লার কিরা, আমি আপনের সংসারে নজর দেই নাই। কেরানি সাবের মিহি বদচোক্কে চাই নাই। আমি ওই পদের মাইয়া না...

মা ধীর-শান্ত গলায় বললেন, আইচ্ছা ঠিক আছে।

মহিলা তবু মায়ের হাত ছাড়ে না। কন, আপনে আমারে মাপ করছেন? কন?

আইচ্ছা কইলাম।

খোলসা কইরা কন, তোমারে আমি মাপ করছি।

মা হাসিমুখে বললেন, তোমারে আমি মাপ করছি।

আঁচলে চোখ মুছে মহিলা বলল, তয় অহন আরেকখান

কথা কই?

কও।

আমার পোলাপান দুইডা চুপচাপ পদের। যেহেনে বহাই, বইয়া থাকে। বিরক্ত করে না। হেয় তো বিয়ানে যায়, আহে রাইতে। সংসারে আমার কোনো কামই নাই। আপনের বড় সংসার। এত ডি পোলাপান। হারা দিন দেহি আপনে খালি কাম করেন। আমারে আপনে রাখেন। বিয়ানে, দোফরে, বিয়ালে, তিনবেলাই আমি আপনের কাম কইরা দিমু নে। মাস কাবারি দুই-চাইর টেকা আমারে দিয়েন।

শুনে মা খুব খুশি। তোমার নাম কী?

জহুরা।

জহুরা, ভালো নাম। হোনো, কাম যহন করতে চাইতাছ করো। কয় টেকা নিবা হেইডা ফয়সালা কইরা লও।

ফয়সালা লাগব না। আপনে যা দিবেন হেইডাই নিমু। ভালো-মন্দ কিছু কমু না।

একটু থেমে বলল, হোনেন আফা, এই বাড়ির বাইরে গিয়া আমি কাম লইতে পারুম না। পোলাপান দুইডারে কার কাছে রাইখা যামু? বাড়ির মইধ্যে কাম পাইলে করতে কোনো অসুবিধা নাই। যহন লাগে আমার ঘরে গেলাম, যহন লাগে আপনের ঘরে আইলাম...

হ, হেইডা ঠিক।

তয় কাইল থনেই করি?

করো।

নাকি আইজ থিকাই করুম? অহন কী কাম আছে, কন, কইরা দেই।

না কাইল থিকাই কইরো।

আইচ্ছা।

জহুরা খুশি হয়ে চলে গেল।

সন্ধ্যাবেলা বাসায় ফিরে ঝুলপকেট থেকে কাইতানের দলা বের করেছেন আব্বা। মায়ের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, নেও তোমার কাইত্তান।

মা নিলেন না। লাগব না।

আব্বা অবাক। ক্যা?

যেই কামে চাইছিলাম হেই কাম হইয়া গেছে।

কথাটা বুঝতে পারলেন না আব্বা, ফ্যাল ফ্যাল করে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

মা হাসলেন। জহুরা আইছিল।

জহুরা কে?

ওই যে ওই ঘরের বেডি।

ও আইচ্ছা। কী কয়?

ঘটনা খুলে বললেন মা। শুনে আব্বা বললেন, হ, ওই বেডি আমার রান্ধন-বাড়ন করতে চাইছিল। দুয়েক দিন ভাত রাইন্ধা দিছে, ডিম ভাইজ্জা দিছে, গোলালুভর্তা বানাইয়া দিছে। রান্ধন-বাড়ন ভালো। কামে রাখো, তোমার সুবিদা হইব।

তারপর মুগ্ধ গলায় আব্বা বললেন, দেখছ মাহাজনগো কারবার। একদিনও গেল না, তোমার কাম হইয়া গেল।

হ।

এর লেইগাই তো আমি সেজাল খাঁ ফকিররে এত ভালো জানি। হের জিনরা কামের আছে। বহুত প্রমাণ আমি পাইছি।

এইবার আমিও পাইলাম। তয় এই বাসায় থাকন যাইব না।

ক্যা?

এতডু একখান ঘরে এতডি মানুষ কেমতে থাকে?

তুমি পোলাপান লইয়া দেশে যাও গা।

না দেশে আমি আর যামু না। বহুত দিন দেশে থাকছি। দেশে আর ভাল্লাগে না। আপনে বড় বাসা লন। আমি ঢাকায়ই থাকুম।

বড় বাসার ভাড়া হইব অনেক। এই বাসার ভাড়া তিরিশ টেকা। বড় বাসা পাইতে গেলে পঞ্চাশ-ষাইট টেকা, আশি-এক শ টেকাও লাগতে পারে।

লাগলে লাগব। দরকার হইলে কম খামু, তয় থাকুম ইকটু আরামে। বড় বাসা দেখেন।

আব্বা চিন্তিত মুখে তামাক সাজাতে বসলেন।

পাঁচ

গেট দিয়ে বেরোতে গিয়ে দেখি আফতাব মিয়া দাঁড়িয়ে আছেন।

সাদা লুঙ্গি আর চেক চেক হাওয়াই শার্ট পরা। লুঙ্গিটা বোধ হয় পুরোনো, শার্ট তেমন পুরোনো না। তবে দুটোই ধোয়া, পরিষ্কার। একটু মোটা ধাঁচের শরীর। ভুঁড়ি আছে। শার্ট আঁটসাঁট হয়েছে শরীরে। গোলগাল মুখে দু-তিন দিনের শেভ না করা দাড়ি, নাকের তলায় বড় ছ্যাঙ্গার মতো ঝিমকালো মোচ। মাথায় অল্প টাক।

আমাকে দেখেই বললেন, কেরানিছাব আছে নিহি? আইছে অফিছ থন?

হ, আইছে।

ডাক দেও আব্বা।

অফিস থেকে ফিরে লুঙ্গি-গেঞ্জি পরেছেন আব্বা। ভাত খেয়ে তামাক খাচ্ছেন এখন। গিয়ে বললাম, আব্বা, আপনেরে ডাকে।

কে?

আপতাব মিয়া।

খাড়াইতে কও বাজান। আইতাছি।

আমি আবার দৌড়ে গেলাম। খাড়াইতে কইছে। আব্বায় আইতাছে।

আইচ্ছা আইচ্ছা। খাড়াইছি।

আমি সেরুদার বাসার দিকে চলে গেলাম। ওদিকে লুৎফন অপেক্ষা করছে। আমরা আজ কাঠেরপুলের দিকে যাব। লুৎফন ওদিকটাও চেনে। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমাকে সব দেখাবে।

লুৎফনের কারণে আমার মাঝে মাঝে খুব লজ্জা করে। মেয়ে হয়ে সে সব চেনে আর আমি চিনি না কিছুই। লুৎফনও তো আমার মতোই। গ্রামে থাকে। দোগাছি গ্রামে ওদের বাড়ি। এই প্রথম ঢাকায় এসেছে। এসেই পুরো গেন্ডারিয়া চিনে ফেলেছে। আর আমি তো আগেও ঢাকায় এসেছি, ঢাকায় থেকেছি। আমি চিনি না কিছুই।

তারপরই মনে হলো, চিনব না কেন? আমিও চিনি। জিন্দাবাহারের ওদিকটা খুব ভালো চিনতাম। ইসলামপুর রোড হয়ে একা একা লায়ন সিনেমার ওদিক দিয়ে চলে যেতাম শাঁখারীবাজার, ভিক্টোরিয়া পার্ক, লক্ষ্মীবাজারের মিউনিসিপ্যালিটি অফিস। এদিকে জিন্নাহ অ্যাভিনিউ, সদরঘাট, নোয়াববাড়ি, নয়াবাজার, আরমানিটোলার মাঠ। আরমানিটোলার ওদিককার গনি মামার মেসও তো খুব ভালো চিনতাম। গেন্ডারিয়ার সাধনা ঔষধালয়ের ওদিকটা চিনি। বিনাখালার সঙ্গে ফায়ার সার্ভিসের ওদিকটায় গিয়েছিলাম। কত বানর দেখেছি।

মনে মনে বলি, আমিও কম চিনি না। লুৎফনের থিকা বেশিই চিনি। আমগো এই বাসায়, সেরুদার বাসায়ও তো আগে আইছি। আফতাব মিয়ার বাসায়ও গেছিলাম একদিন।

ঘটনাটা মনে পড়ে।

ওই যে বুজির সঙ্গে ঢাকায় এসেছিলাম, সেবারেরই ঘটনা। রাতে আব্বার কাছে থেকেছি। সকালবেলা পরোটা-হালুয়া খেয়েছি আব্বা আর আমি। সেদিন রোববার। সকাল দশটার দিকে আফতাব মিয়া এলেন। তিনি বিরাট খাতির-

তোয়াজ করেন আব্বাকে। কেরানিছাব কেরানিছাব বলে মুখে ফেনা তুলে ফেলেন। পরে শুনেছি আফতাব মিয়া মিউনিসিপ্যালিটিতে কন্ট্রাকটরি করেন। সেই কাজে আব্বা তাঁকে খুবই সাহায্য করেন। আব্বার হাতেই নাকি তাঁর কাজ। আব্বা চাইলেই কাজ দিতে পারেন, বিল তুলে দিতে পারেন। এ জন্য সারাক্ষণ আব্বাকে তিনি মাথায় তুলে রাখেন। আব্বা যা বলেন তাই শোনেন। দুয়েকবার দেখেছি, আব্বা কথা বলছেন আর আফতাব মিয়া মাথা নিচু করে, 'জি ছাব, জি ছাব' করছেন। পারলে আব্বাকে মুখে তুলে খাইয়ে দেন, কোলে তুলে রাখেন। দুজন পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছেন, বেজায় রোদ উঠেছে, আফতাব মিয়া আব্বার মাথায় ছাতা ধরে রেখেছেন। আব্বার অস্বস্তি হচ্ছে, তবু ছাতা কিছুতেই আব্বার হাতে দেবেন না। মেদিনীমণ্ডলে যেমন দেখেছি আমাদের সুদিনে, আব্বা মাওয়ার বাজারে কিংবা গোয়ালিমান্দ্রার হাটে যাবেন, সঙ্গে যাচ্ছে হাজামবাড়ির আবদুল কিংবা মজিদ, ছানা সেন্টুদা কিংবা জহুদা, নজুদা, তারা যেভাবে আব্বার মাথায় ছাতা ধরে রাখতেন তার চেয়েও যেন বেশি বিনয়ী আফতাব মিয়া।

আমি এসেছি ঢাকায়, কেরানিছাবের মাইজা পোলা, সকাল দশটার দিকে আফতাব মিয়া এসে হাজির। নাশতা শেষ করে আব্বা তামাক খাচ্ছেন, আমি চৌকিতে পা ঝুলিয়ে বসে আছি। আফতাব মিয়া এলেন, সালামায়ালাইকুম কেরানিছাব।

ওয়ালাইকুমআসসালাম। আসেন, আসেন।

আফতাব মিয়া ঢাকাইয়া লোক, স্থানীয় লোক। এলাকার বাড়িঘর বেশির ভাগই তাঁদের আত্মীয়স্বজন কিংবা পরিচিতজনের। বিশেষ করে মুরগিটোলার। কারণ মুরগিটোলায় তাঁদের দুখানা বাড়ি। এক বাড়িতে থাকেন, আরেকটা ভাড়া দেওয়া। তাঁর বাপ-দাদার জন্মও এই এলাকায়। সুতরাং এদিককার যেকোনো বাড়িতে তাঁর অবাধ যাতায়াত। কোনো বাড়িতে ঢুকতেই কোনো অসুবিধা নেই। শুধু ঢোকার আগে, বাড়ির বউ-ঝিদের বোঝানোর জন্য যে পুরুষ মানুষ কেউ ঢুকছে বাড়িতে, তারা যেন একটু সচেতন হয়, ঙোয়ো ঙোয়ে করে বার দু-তিনেক গলা খাঁকারি দেন।

এই বাড়িতে ঢোকার আগেও দিয়েছেন। ঘরে ঢুকে আমাকে দেখে কী আল্লাদ! পারলে কলিজাটা বের করে দিয়ে দেন। মুখে প্রশংসার অন্ত নেই। কী ছোন্দর পোলাটা, মাছাল্লা মাছাল্লা! কেরানিছাব, অরে আমগো বাইত লইয়া যাই। বউ-ঝিরা দেহুক কী ছোন্দর পোলা। আপনেও চলেন।

না না, আমার যাওনের কাম নাই। মিলুরে লইয়া যান। ঘুরাইয়া ঘারাইয়া দিয়া যাইয়েন। আমি বাসায়ই আছি।

আইচ্ছা আইচ্ছা।

আফতাব মিয়া আমার হাত ধরলেন। চলো আব্বা, চলো...

আমার পরনে ইংলিশ প্যান্ট আর স্যান্ডো গেঞ্জি ছিল, তার ওপর হাফহাতা শার্ট আর স্পঞ্জের স্যান্ডেল পায়ে রওনা দিলাম।

এই বাড়ি থেকে বেরোনোর পর হাতের ডান দিকে ধূপখোলা মাঠ দু-তিনটা বাড়ির পর। মাঠের পাশে সরু রাস্তা। রাস্তার বাঁ দিকে হাঁটতে লাগলাম। উত্তর কোনায় এসে রাস্তা বেঁকে গেছে পশ্চিমে। ঢুকলাম পশ্চিমে। চার-পাঁচটা বাড়ির পর, হাতের ডান দিকে প্রথমে এক গলি। অতি চিপা কানাগলি। দু-তিন বাড়ি পর আবার একটা ও রকম গলি। ঢুকলাম পরের গলিতে। গলির শেষ মাথায় নীল রঙের টিনের গেটওয়ালা একতলা বাড়ি। কিছুদিন আগে চুনকাম করা হয়েছে। তার আগে, ডান পাশে পুরোনো টিনের গেটওয়ালা একতলা হতশ্রী ধরনের একটা বাড়ি। সেই বাড়ির গেট ঠেলে ঢুকলেন আফতাব মিয়া। আহো আব্বা, আহো...

ও, এই তাহলে আফতাব মিয়ার বাড়ি? আমি তো ভেবেছিলাম ওই চুনকাম করা নীল গেটের বাড়ি!

আফতাব মিয়ার বাড়ি ইংরেজি 'এল' অক্ষরের মতো একতলা দালান। পুব থেকে শুরু হয়ে পশ্চিমে 'এল'-এর মতো বেঁকেছে। চওড়া বারান্দা আছে। বাড়িতে মাটির কোনো চিহ্ন নেই। ছোট্ট উঠানও বাঁধানো। বারান্দা, উঠান আর ঘরের ভেতরকার মেঝে ইট রঙের। বহু জায়গা দাদরা-খাদরা, সিমেন্ট উঠে ইট-সুরকি বেরিয়ে গেছে। দেয়ালের চলটা উঠে গেছে খানে খানে। তবে বাড়ির ভেতরটা বড় ঠান্ডা। চৈত্র মাসের রোদে পুড়ে পুকুরের পানি যেমন গরম হয়, ডুব দিয়ে একটু নিচে গেলেই যেমন ঠান্ডা একটা ভাব পাওয়া যায়, বাইরে থেকে বাড়িতে ঢুকে তেমন একটা অনুভূতি হলো আমার। আরাম লাগল।

আমাকে দেখে বাড়ির বউ-ঝিদের মধ্যে ভালো রকম একটা সাড়া পড়ল। দুটো বাচ্চা মেয়ে আর একটা ছেলে পিট পিট করে তাকাতে লাগল আমার দিকে। উঠানে ছোটাছুটি করছিল তারা। রান্নাঘরের ওদিক থেকে আফতাব মিয়ার মতোই আধা মোটা, ফরসা একজন মহিলা এলেন। আমার মায়ের চেয়ে কম বয়সী হবেন, আফতাব মিয়াকে জিজ্ঞেস করলেন, এইডা নি কেরানিছাবের মাইজা পোলা?

হ। ঘরে লইয়া যাও। খিলাও কিছু। কয়া গেলাম না তোমারে...

হ কইছেন তো।

মহিলা আমার হাত ধরলেন। আহো আব্বা, আহো।

আমি তাঁদের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

ঘরে উঁচু খাট পাতা, পরিপাটি বিছানা। বিছানায় নীল রঙের ডোরাকাটা চাদর। সাদা ওয়ারের বালিশ। একটা কোলবালিশও আছে। খাটের মাথার দিকে আমার সমান লম্বা একটা আলমারি। সামনের দিকে কাঠের ফ্রেমে কাচ বসানো। ভেতরের সবকিছু দেখা যাচ্ছে। টুকটাক জিনিস। কালো বেল্টের একটা হাতঘড়ি। কয়েকটা সোনার চুরি, মুক্তার মালা। সোনার ভারী ধরনের একটা হার। কানের রিং, দুল। একটা টিকলি। চুলের ক্লিপ, সেফটিপিন, ছোট্ট-সুন্দর একটা মুখ দেখার আয়না, সাদা সুন্দর একটা চিরুনি। পিতলের কাজলদানি, সুরমাদানি। আলমারির ওপর কাগজপত্র আর কালো রঙের একটা চশমা।

অন্য কিছুই আমার চোখে লাগল না, লাগল ওই কালো চশমাটা। খাটে পা ঝুলিয়ে বসে আমি বারবার চশমাটার দিকে তাকাই।

আফতাব মিয়ার বউ একটা পিরিচে করে বড় বড় দুটো মোরব্বা নিয়ে এলেন। আমের মোরব্বা। চিনির আঠাল শিরা লেগে আছে মোরব্বায়, আদার কুচি লেগে আছে। ভারি মনোহর একটা গন্ধ।

মোরব্বা দেখে আমি ভুলে গেলাম ঘণ্টাখানেক আগে আব্বার সঙ্গে বসে বড় সাইজের একটা পরোটা আর অনেকখানি হালুয়া খেয়েছি। সুজির দানা দানা হালুয়া। ঘিয়ের গন্ধটা যে কী চমৎকার! ওই যে জিন্দাবাহারের বাসায় জামির কাকা যে রকম পরোটা-হালুয়া খেতেন, হালুয়ায় ঘিয়ের গন্ধটা যেমন থাকত, এই হালুয়াও ঠিক তেমন। খুব খেয়েছি, পেট একদমই ভরা। তারপরও মোরব্বা দেখে আমার মুখ লালায় ভরে গেল।

তারপরও একটু সংকোচ হয় আমার। খাব?

আফতাব মিয়া দাঁড়িয়ে আছেন সামনে। আমার সংকোচটা বোধ হয় টের পেলেন। আদুরে গলায় বললেন, খাও আব্বা, খাও। ছরম করতাছ ক্যালা?

আফতাব মিয়ার বউও বললেন একই কথা। ছরম কিয়ের? খাও। আমি খিলাইয়া দিমু?

আফতাব মিয়া বললেন, না না খিলাই দিবার লাগব না। ও নিজেই খাইবার পারব। খাও, আব্বা খাও।

আমি মোরব্বা খেতে লাগলাম। মোরব্বা খাই আর আড়চোখে আলমারির ওপর রাখা কালো চশমাটা দেখি।

ব্যাপারটা খেয়াল করলেন আফতাব মিয়া। কালা চশমা দেহোনি আব্বা? ওইটারে কয় গগলস। রইদের মাইদ্যে চোক্কে দিবার লাগে। লিবা?

আমাকে দিতে চাইছেন কালো চশমাটা?

আমি চোখে পরব?

চোখে পরে মেদিনীমণ্ডলে গেলে সবাই খুব অবাক হবে।

পোলাপানে কি এই চশমা পরে?

আলমারির ওপর থেকে গগলসটা নিলেন আফতাব মিয়া। শার্টের নিচ দিককার অংশ দুআঙুলে ধরে গগলসের কাচ মুছলেন, দুহাতে ধরে আমার চোখে পরিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রং বদলে গেল ঘরের। এতক্ষণ ফকফকা আলো দেখেছি, এখন দেখি সবকিছু ছায়া ছায়া। যেন প্রখর সূর্যের তলায় এসে দাঁড়িয়েছে ঘন কালো মেঘ। মেঘের ছায়া নেমেছে চারদিকে।

ভেতরে ভেতরে আনন্দে ফেটে পড়ছি আমি। তবু আনন্দ চেপে রাখি। একদিকে মোরব্বা খাওয়ার আনন্দ, অন্যদিকে এ রকম একটা জিনিস উপহার পাওয়া! আনন্দে ছটফট করছে বুক। কতক্ষণে ছুটে যাব বাসায়। আব্বাকে দেখাব জিনিসটা। সেরুদার বাসায় গিয়ে দেখাব বুজিকে।

আফতাব মিয়া তখন আমার দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসছেন। বহুত ছোন্দর লাগতাছে আব্বারে। বহুত ছোন্দর। রইদের মাইদ্যে এইডা পিনবা। বহুত আরাম লাগব।

আফতাব মিয়ার বউ বললেন, ইট্টু ঢিলা ঢিলা লাগতাছে না?

আফতাব মিয়া বললেন, বড় মাইনষের জিনিছ পিচ্চিরা পিনলে এমুনই লাগে। লাগুক, অছুবিদা নাই। জিনিছখান আব্বার পছন অইছে, দি লয়া যাউক।

গগলস চোখেই আফতাব মিয়ার সঙ্গে বেরিয়ে এলাম আমি। দু-তিন মিনিটের মধ্যে আমাদের বাসা। আব্বা আমাকে দেখে হাসতে লাগলেন। এই জিনিস কই পাইলা বাজান?

আমি কথা বলার আগেই আফতাব মিয়া বললেন, আমি দিছি। না না, আব্বায় চাহে নাইক্কা। বেড়াইবার গেছে আমার বাইত, একটা কিছু দেওন লাগে না?

আব্বা আর কথা বললেন না।

বুজির সঙ্গে মিটমাট হয়ে গেছে আব্বার। ম্যালা কেনাকাটা করে আমাকে আর বুজিকে শ্রীনগরের লঞ্চে চড়িয়ে দিলেন। আমরা ফিরে যাচ্ছি। বুজির চোখ উঠেছে। দুই চোখ রক্তের মতো লাল। কিছুক্ষণ পরপর চোখের কোণে হলুদ আর সবুজ মেশালে যে রং হয় তেমন রঙের 'কেতুর' জমছে। বুজির হাতে ভেজা পুরোনো একটা রুমাল। ওই দিয়ে চোখ পরিষ্কার করেন।

আমার চোখে আফতাব মিয়ার দেওয়া ঢিলা গগলস। গগলস শব্দটা উচ্চারণ করতে পারেন না বুজি। বলেন 'গজব'। লঞ্চে আমার চোখে ওই জিনিস দেখে লোকজন তাকাতাকি করে, মুচকি হাসে। একজন ঠাট্টাবাজ লোক বলল, খাইছে আমারে। ছোড উত্তমকুমার আইলো কই থিকা?

শ্রীনগর থেকে গোয়ালিমান্দ্রার ওদিক হয়ে কাজির পাগলার খালে ঢুকতে হবে। জষ্ঠি মাসের মাঝামাঝি। খালে পানি বেড়েছে। সীতারামপুর পর্যন্ত যাবে নৌকা। সীতারামপুর থেকে পনেরো-বিশ মিনিট লাগবে হেঁটে যেতে। গাঁট্টিবোঁচকা যা আছে বুজি আর আমি ভাগ করে নিতে পারব।

কিন্তু বুজির চোখটা...

সমষপুরের ওদিক ছাড়াচ্ছে নৌকা। হঠাৎ বুজি বললেন, তোমার গজবখান ইট্টু দেও তো মিয়াভাই। চোক্কে দিয়া দেহি কেমুন লাগে।

গগলস খুলে আমি বুজির চোখে পরিয়ে দিলাম। যেভাবে আফতাব মিয়া আমাকে পরিয়েছিলেন, ঠিক সেইভাবে।

বুজির মুখে হাসি। নৌকার ছইয়ের ভেতর থেকে বাইরে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখছেন। সাদা সুতি কাপড় পরা ছোটখাটো রোগা, প্রায় বৃদ্ধা মহিলাকে ওই জিনিস চোখে পরাতে অদ্ভুত লাগছিল দেখতে।

আমি হাসতে লাগলাম। হেসে কুটিপুটি। আপনেরে কেমুন জানি লাগতাছে বুজি। হি হি।

আমার হাসি দেখে বুজিও হাসেন। কেমুন লাগে মিয়াভাই?

এইডা যে আপনে, চিনন যায় না। হি হি।

মাঝি লোকটা পরিচিত। কালীরখিলের ওদিককার বেলদার বাড়ির লোক। সেও বইঠা বাইতে বাইতে বুজিকে দেখে হাসে।

একসময় বুজি রেগে গেলেন। চট করে চোখ থেকে খুললেন গগলস। আমার হাতে দিয়ে বললেন, এত হাসনের কী হইছে? ল তর গজব।

আমি তখনো হাসছি।

আজ আফতাব মিয়াকে দেখে তাঁর দেওয়া সেই গগলসের কথা মনে হলো। জিনিসটা চোখে দেওয়াতে বুজিকে কেমন দেখাচ্ছিল মনে পড়ল। আমার আর মাঝির হাসাহাসির কথা মনে পড়ল। বুজির রেগে যাওয়া মুখটা চোখের সামনে দেখতে পেলাম।

লুৎফন সেদিনকার ভঙ্গিতে গেটের কপাট ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। আমাকে দেখেই লাফ দিয়ে রাস্তায় নামল। তাড়াতাড়ি ল মিলু। চায়ের দোকানে গান হইতাছে।

কিয়ের গান?

হেইডা জানি না। ল গিয়া দেহি।

ল।

আমরা দৌড়ে এলাম পশ্চিম দিককার রাস্তায়। ডান দিকে মুরগিটোলা যাওয়ার এই কোনায় চায়ের দোকান। সকালবেলা পরোটা-হালুয়া, বুটের ডাল, গরুর গোস্ত এসব পাওয়া যায়। গুলগুলাও পাওয়া যায়। বিকেলবেলা পাওয়া যায় শিঙাড়া, ডালপুরি। আর চা তো আছেই।

সেই দোকানের সামনে বেশ কিছু লোক ভিড় করে আছে। ভেতরেও লোকজন আছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। খালি গায়ের লুঙ্গি পরা এক লোক পেট যতটা সম্ভব ভেতর দিকে চেপে সেই খাদে উল্টো করে বসিয়েছে মাঝারি সাইজের অ্যালুমিনিয়ামের একটা হাঁড়ি। সেই হাঁড়ি দুহাতে তবলার মতো বাজিয়ে গলা ছেড়ে গান গাইছে।

ও দূর কি মুসাফির
হামকো ভি সাথ লে লে রে...

লোকজন মুগ্ধ হয়ে তার গান শুনছে। অনেকের হাতে চায়ের কাপ। কারও কারও হাতে বিড়ি-সিগারেট। পানও মুখে আছে কারও কারও। ভারি জমজমাট একটা পরিবেশ। আমাদের বয়সী, আমাদের চেয়ে বড় ছোট পোলাপানও আছে কিছু। কারও মুখে কোনো কথা নেই। গান শুনছে সবাই।

আমি আর লুৎফনও দাঁড়িয়ে গেলাম ভিড়ের মধ্যে। সেই ফাঁকে দেখি চায়ের দোকানদার নির্বিকার ভঙ্গিতে চুলার পাড়ে বড় একটা পিঁড়িতে বেলুন দিয়ে ডালপুরি বানাচ্ছে। হাতের একপাশে ময়দার দলা অন্যপাশে আধা সিদ্ধ ডাল। একদলা ময়দা নিয়ে পটু হাতে তার মাঝখানে ডাল দিয়ে পোঁটলা বানিয়ে বেলুন দিয়ে বেলে, ছোট সাইজের পরোটার মতো করে চুলায় বসানো কড়াইয়ের ফুটন্ত তেলে ফেলছে। প্রায় চোখের পলকে ওই জিনিস ফুলে ডালপুরি হয়ে যাচ্ছে।

গান কী শুনব, আমি তাকিয়ে তাকিয়ে ডালপুরি ভাজা দেখি। ফুলে হলুদ হয়ে যাওয়ার পর জিন্দাবাহারের জামির কাকা চিনাবাদাম ভাজা হলে যে রকম খঞ্চা দিয়ে তুলতেন, ও রকম খঞ্চা দিয়ে তুলে পাশে রাখা অ্যালুমিনিয়ামের বড় একটা



দুপুরবেলার প্রখর রোদে ঝিমঝিম করছে চারদিক

থালায় রাখছে। খঞ্চার ফুটো দিয়ে তেল ঝরে পড়ছে কড়াইতে।

সেই লোক এখন গাইছে।

কাশী দেখা মাথুরা দেখা...
কাহি না মানকা মিত মিলা রে
আয়া তেরি দুয়ারে...
তেরে দুয়ার খাড়া এক যোগী...

লুৎফন বলল, ল যাইগা।

গান হুনবি না?

না।

ক্যা?

পচা গান। আমার ভাল্লাগে না।

আমার হাত ধরে দক্ষিণ দিকে হাঁটা দিল লুৎফন। ওদিন তরে মুরগিটোলা চিনাইছি, ল আইজ কাঠেরপুল চিনাই, বাগিচা চিনাই।

আইচ্ছা।

সোজা দক্ষিণ দিকে হাঁটতে থাকি আমরা।

রাস্তার পশ্চিম দিকটায় বেশ বড়, লম্বা একটা দালানবাড়ি। তার আগে-পরে আরও দুয়েকটা দালানবাড়ি। সেগুলো ছোট ছোট। রাস্তার সঙ্গে গেট। পুব দিকটা গরিব ধরনের। টিনের ঘরওয়ালা মেসবাড়ি একটা, ছাপরাঘরওয়ালা বাড়ি কয়েকটা। তারপর আমাদের গলির মতো আরেকটা গলি পুবে-পশ্চিমে। ও রকমই বাড়িঘর। দালানের চেয়ে টিনের বাড়ি বেশি। বিক্রমপুরের মতো চৌচালা টিনের ঘর। নারকেলগাছ, আম-জামগাছ। বকুলগাছ, কদমগাছ আছে। নিমগাছ আছে। এই গলিও গিয়ে শেষ হয়েছে ধূপখোলা মাঠে।

আমরা গলিতে ঢুকি না, সোজা হাঁটতে থাকি।

ওই গলির এই দিককার মুখে পুরোনো একটা একতলা বাড়ি। রাস্তার দিকে বড় বড় জানালা। রাস্তা থেকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠে গেছে বাড়িতে। একটু উঁচু বাড়ি। রাস্তার পুব দিকে এই বাড়ি, পশ্চিম দিকে কপাট ছাড়া একটা গেট। গেটের ভেতর সরু রাস্তার দুপাশে সুন্দর সুন্দর টিনের ঘরওয়ালা বাড়ি, একতলা দালান। আর কত রকমের যে গাছপালা! ভারি সুন্দর একটা পরিবেশ।

লুৎফন বলল, এইডাই বাগিচা। ল আগে কাঠেরপুল দেইক্কাহি তার বাদে বাগিচায় ঢুকুম নে।

আইচ্ছা।

আমরা দক্ষিণে হাঁটছি। ওই পুরোনো একতলা বাড়ির পর বড় একটা বাড়ি। সামনে কাঠের গেট। ভেতরে সবুজ ঘাসের লন, কয়েকটা আমগাছ। তারপর একতলা দালান। কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে বারান্দা। গেটটা খোলা। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে ভেতরটা দেখলাম। সাদা চুনকাম করা বাড়ি। বনেদি

একটা ভাব আছে বাড়ির। পরে আরও দু-তিনটা বাড়ি। সবগুলোই পুব দিকে, পশ্চিম দিকে ওই বাগিচার গেট থেকে দক্ষিণ দিককার রাস্তার কোনা পর্যন্ত, তেলমিলের কোনা পর্যন্ত লম্বা দেয়াল। দেয়ালের ওপাশে বাড়িঘর, গাছপালা। তার মানে ওই বাড়িগুলো সবই বাগিচার ভেতর। ঢুকতে হয় ওই গেট দিয়ে। গেটের ভেতরকার সরু রাস্তার দিকে প্রতিটি বাড়ির গেট।

পুরো জায়গাটা কি একই মালিকের?

দক্ষিণ দিকে চৌরাস্তার মোড়। মোড় না বলে মুখ বলা ভালো। পুব থেকে পশ্চিমে এসেছে রাস্তা। পুব দিকে ধূপখোলা মাঠ, পশ্চিমে ধোলাইখালের ওপর কাঠেরপুল। মুরগিটোলা থেকে আসা রাস্তা পুব-পশ্চিমের রাস্তার পেট কেটে ওপাশে ভাট্টিখানা হয়ে লোহারপুলের দিকে চলে গেছে।

আমরা রাস্তার মুখে দাঁড়ালাম।

লুৎফন বলল, আগে পুবমিহি দেইক্কাহি। তার বাদে কাঠেরপোলের মিহি যামু নে।

পুবমিহি কী আছে?

অনেক পদের দোকান আছে। শেষ মাথায় ধূপখোলা মাঠ।

মাঠ দেইক্কা কী করুম? রোজঐত্তো দেহি।

মাঠতরি না গেলাম। এই মিহিই থাকলাম।

আইচ্ছা ল।

আমরা পুব দিকে হাঁটা দিলাম।

খোয়া ওঠা ভাঙাচোরা রাস্তা। দুয়েকটা রিকশা চলছে। গরুর গাড়িতে ইট যাচ্ছে, ঠেলাগাড়িতে যাচ্ছে ভারী ভারী বস্তা। গরুর গাড়ি তো গরুতে টানছে, গারোয়ান বসে আছে গাড়িতে। ঠেলাগাড়ি টানছে তিনজন লোক। সামনে একজন, আসলে টানছে সে, পেছন থেকে দুজনে ঠেলছে। সামনের লোকটা অল্পবয়সী, তাগড়া জোয়ান। হাঁটুর ওপর তোলা লুঙ্গি। মাজায় বান্ধা গামছা। মাথায় তেল দেওয়া চুল, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়িমোচ। ঝিমকালো শরীরে ভারী ঠেলাগাড়ি টেনে নিচ্ছে। ঘাড়-পিঠের মাংসপেশি, দুই হাতের বাহুর ভাঁজ ফুটে আছে। মাথার দিক থেকে শরীর বেয়ে নামছে ঘাম। মনে হচ্ছে লোকটা ধোলাইখালে ডুব দিয়ে উঠেছে। শরীর মোছার সময় পায়নি।

পেছনের লোক দুজন বয়স্ক। দুজনের মুখেই কাঁচাপাকা দাড়ি। সামনের লোকটির মতোই খালি গা, লুঙ্গি একই কায়দায় পরা। তারাও ঘামে ভিজছে।

এদিককার রাস্তার বাঁ দিকটায় অনেক দোকান। মুদি দোকান, পান-বিড়ির দোকান, ওষুধের দোকান, মিষ্টির দোকান, চায়ের দোকান। ভাতের হোটেল আছে। ডান দিকটায় দোকান বলতে গেলে নেই-ই। পুরোনো পুরোনো দালানবাড়ি। রাস্তার মাঝবরাবর ডান দিকে কয়েক ধাপ উঠে একটা লন্ড্রির দোকান। আরেকটু এগোলে ডান দিকে চিপা গলি ঢুকেছে। ওদিকটায় সাবেক শরাফতগঞ্জ লেন।

ধূপখোলা মাঠ পর্যন্ত আমরা গেলাম না। ঘুরে এলাম কাঠেরপুলের দিকে। যে গলি দিয়ে আমরা বেরিয়ে ছিলাম সেই গলির মুখে, পশ্চিম দিকে তেলমিল। বিশাল লোহার গেট। গেটের ভেতর অনেকখানি খোলা জায়গা। গেট দিয়ে ঢুকলেই ডান দিকে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা একটা একতলা। পশ্চিমে খোলা মাটির উঠোন। তারপর খালের পাড় ঘেঁষে ইট রং করা চালার তেলমিল। সরিষা ভাঙিয়ে তেল বের করার কাজ চলছে। একটা দেয়াল চলে গেছে সোজা ধোলাইখাল পর্যন্ত। তার উল্টো দিকে নোংরা ড্রেন। ড্রেনের ওপারে একটা বাড়ির শ্যাওলাধরা দেয়াল। আগাছা জন্মেছে দেয়ালে। বিশাল একটা বটগাছ আছে। গাছের গোড়ার দিকে লম্বা ঝুরি নেমেছে। একটা টংঘর বটতলায়। পান-বিড়ির দোকান। দোকান চালায় মোটা ধরনের মাঝবয়সী এক মহিলা। চেহারা দেখে বোঝা যায়, মহিলা দজ্জাল ধরনের।

বটগাছের পেছনে সবুজ ঘাসের মাঠ। মাঠের ওপারে তেলমিলের চালার মতো চালাওয়ালা পুবে-পশ্চিমে লম্বা বিশাল একটা ঘর। চারদিকে ইটের দেয়াল, চালা ও রকম টিনের। দূরে দূরে একটা করে দরজা ঘরের। মোট তিনটা দরজা। তিন দরজায়ই ভারী ভারী তালা ঝুলছে।

লুৎফনকে জিজ্ঞেস করলাম, এইডা কী রে?

এইডাই তো ভাট্টিখানা।

ভাট্টিখানা কারে কয়?

হেইডা জানি না।

আমি অবাক। তুই জানচ না?

না।

ক্যা, জানচ না ক্যা?

বেবাক আমি জানুম কেমতে?

তুই বলে পুরা গেনডাইরা চিনছ?

হ চিনি তো।

তয় ভাট্টিখানা কি জানচ না ক্যা?

লুৎফন হাসল। জানন আর চিনন এক হইলনি?

দূর থেকে কাঠেরপুল দেখা যাচ্ছে। দুপাশে রেলিং দেওয়া ধনুকের মতো পুল। ভালোই চওড়া। রিকশা পর্যন্ত উঠে যাচ্ছে পুলে। মানুষের মাঝখান দিয়ে ওপারে চলে যাচ্ছে।

আমরা দুজন কাঠেরপুলে উঠলাম। মাঝবরাবর রেলিংয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালাম। নিচে স্বচ্ছ পানির ধোলাইখাল। ওপারে দরিদ্র ধরনের ঘরবাড়ি খালের পাড় ঘেঁষে। দুয়েকটা নৌকা চলাচল করছে।

লুৎফন বলল, কাঠেরপোলের ওইপারের জাগাডার নাম জানচ?

না, কী নাম রে?

কুলুটোলা। কাঠেরপোলের লেইগা মাইনষে কয় কুলুটোলা কাঠেরপোল।

আমি কথা বলি না। কাঠেরপুলের নিচ দিয়ে বয়ে যাওয়া ধোলাইখালের পানির দিকে তাকিয়ে থাকি।

দক্ষিণ দিককার রেলিংয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে উত্তরের রেলিংয়ে দাঁড়ালাম। এদিকটায় খালের পশ্চিম পাড়ে পুরোনো একটা মন্দির। মন্দিরের চূড়া উঠে গেছে আকাশের দিকে। শ্যাওলা ধরা মন্দিরের মাথার দিকটায় পড়েছে বিকেলবেলার রোদ। অশ্বত্থের চাড়া বেশ বড় হয়েছে মন্দিরের মাথার দিকে। সেখানটায় ওড়াউড়ি করছে সবুজ রঙের টিয়াপাখি। মন্দিরের গর্তে বাসা বেঁধেছে।

মন্দিরের পায়ের কাছে বাঁধানো ঘাটলা। অতি পুরোনো, খোয়া-ওঠা, ইট বেরিয়ে যাওয়া ঘাটলার সিঁড়ি নেমে গেছে খালের গভীরে। একজন সিঁদুর পরা মহিলা ঘাটলায় বসে থালাবাসন ধোয়ার কাজ করছে।

ঘাটলার ঠিক উল্টো দিকে, খালের পুব পাড়ে প্রায় নতুন টিনের চালা দেওয়া দু-তিনটা সুন্দর ঘর দেখা যাচ্ছে। বিক্রমপুরের বনেদিবাড়ির বাংলাঘরের মতো ঘর।

লুৎফন বলল, ওই ঘরঘুনি বাগিচার ঘর। ল অহন বাগিচায় যাই।

আইচ্ছা ল।

আস্তে-ধীরে হেঁটে আমরা তারপর বাগিচায় ঢুকি। ঢুকেই অদ্ভুত এক ভালো লাগায় ভরে যায় মন। গেট দিয়ে ঢোকার পর দুপাশে চটির বেড়া দেওয়া আঙিনা, আমাদের সমান উঁচু সীমানাদেয়াল দেওয়া বাড়ি। কোনো বাড়িতে সুন্দর টিনের ঘর, কোনো বাড়ি আধা পাকা, পাকা। প্রতিটি বাড়ির সামনে খোলা কিছুটা জায়গা, হাসনাহেনা, জবা, বেলি, গোলাপের ঝাড়। গন্ধরাজ, কামিনী, শেফালিগাছ। নারকেলগাছ আছে, বকুল, কদম, আম, জাম, কলার ঝাড়, মেহেদির ঝাড়। অপূর্ব একটা পরিবেশ। পুরুষ মানুষ যেন নেই জায়গাটায়। এবাড়ি-ওবাড়ির বাচ্চা ছেলেমেয়েরা খেলছে, যুবতী মেয়েরা বাড়ির

আঙিনায় দাঁড়িয়ে গল্প করছে, কী সুন্দর শব্দে হাসছে। পোশাক-আশাক কী সুন্দর। বিনাখালাদের মতো। হাওয়ার গন্ধটাও এখানে অন্য রকম। ফুলের সুবাসমাখা।

আরেকটু এগোলে বাঁধানো ঘাটলার সুন্দর একটা পুকুর। চারদিকের পাড় বাঁধানো। উত্তর দিকে ঘাটলা, দক্ষিণে পুকুরের ওপারে উঁচু দেয়াল। তেলমিলের পেছনটা।

পুকুরটা একেবারে পরিষ্কার। চার পাড়েই নানা রকম পাতাবাহার, জবা, হাসনাহেনার ঝোপ। ওপারে কয়েকটা ডুমুরের ঝোপ পুকুরে এসে নেমেছে। পুকুরের পশ্চিম পাড়টা হচ্ছে দেখার মতো। বাংলাঘরের মতো তিন-চারটা ঘর। প্রতিটি ঘরে রেলিং দেওয়া বারান্দা। বারান্দার রেলিং দরজা-জানালা নীল রং করা। প্রতিটি ঘরে ঢোকার সুন্দর সরু রাস্তা। রাস্তার দুপাশে বাঁকা করে ইট বসানো। ইটের অর্ধেকটা মাটির তলায়, অর্ধেকটা বাইরে। গোলাপি রঙের দূর্বাফুল ফুটে আছে পায়ের কাছে। নানা রকম পাতাবাহারের ঝাড়, গাঢ় সবুজ পাতার হাসনাহেনা ঝাড়, জবা ফুলের গাছ অনেক, গন্ধরাজের গাছ অনেক। ঝুমকোলতা উঠে গেছে ঘরের চালার দিকে, কুঞ্জলতা উঠেছে। বড় বড় কয়েকটা শিরীষগাছ ছায়া মেলে রেখেছে। সেসব গাছে ডাকাডাকি করছে শেষ বিকেলের পাখপাখালি। একদম স্বপ্নের মতো একটা পরিবেশ।

এই বাড়িটা কাদের? কারা থাকে এইসব ঘরে?

বাসায় ফিরে ভাইবোনদের কাছে কাঠেরপুলের গল্প বলি আমি, বাগিচার গল্প বলি। মন্দিরের কথা বলি, স্বচ্ছ পানির পুকুরের কথা বলি। কথায় কথায় রাত হয়ে যায়।

ছয়

জহুরা সারাক্ষণ আমাদের ঘরেই পড়ে থাকে।

মায়ের প্রায় সব কাজই করে দিচ্ছে। সকালবেলা কুয়ার পাড়ে নিয়ে হাঁড়ি-পাতিল, থালাবাসন ছোবা দিয়ে মাজছে। আমাদের জামাকাপড় বাংলা সাবান দিয়ে ধুয়ে উঠানের তারে মেলে দিচ্ছে। সময়মতো শুকনা কাপড় তুলে এনে ঘরে রাখছে। তার মেয়েটা বড়। বছর পাঁচেক বয়স। নাম হলো ময়না, ছেলেটার বয়স তিন। নাম মতি।

জহুরার ছেলেমেয়ের নাম শুনে মা একদিন বললেন, সোন্দর নাম রাখছ পোলা-মাইয়ার। ময়না-মতি। কে রাখছে এই নাম?

জহুরা লাজুক গলায় বলল, অগো বাপেই রাখছে।

বাচ্চা দুটো সত্যি খুব চুপচাপ ধরনের। কান্নাকাটি, চিৎকার, চেঁচামেচি বলতে গেলে নেই। চুপচাপ এদিক যাচ্ছে, ওদিক যাচ্ছে। বাদল, পলি, ডলি, মুকুলের সঙ্গে উঠানে খেলছে। ডলি একদিন ময়নাকে একটা ধাক্কা দিল খেলতে খেলতে। ছিটকে মাটিতে পড়ল মেয়েটা। খালি গা, ছিটকাপড়ের প্যান্ট পরা। উঠে প্যান্ট ঝাড়তে লাগল, কাঁদল না, কিছু বললও না।

দেখে আমার খুব মায়া লাগল। দিলাম ডলিকে এক থাপ্পড়। অরে ধাক্কা দিলি ক্যা?

ডলি কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে মাকে বলল। মা এসে আমার কান মুচড়ে ধরলেন। জহুরা এসে ছাড়াল। মাইরেন না আফা, মাইরেন না।

তারপর আমার মাথায়-পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, ছোড ভাইবইনরে মারতে অয় না বাজান। আদর করতে অয়।

তয় ও ময়নারে ধাক্কা দিল ক্যা?

ময়না এসে বলল, আমি দুক্কু পাই নাই।

জহুরাকে আমরা খালা ডাকতে শুরু করেছি। মা-ই ডাকতে বলেছেন। মায়ের সঙ্গে এখন তার বেদম খাতির। নিজের ঘরে কখন যায় জহুরা, কখন রান্নাবান্না করে, বাচ্চাদের খাওয়ায়, নিজে খায়, আমরা টেরই পাই না। সারাক্ষণই আমাদের ঘরে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে মায়ের সঙ্গে টুকটাক গল্প করছেই।

একদিন দুপুরের দিকে তরকারি কুটতে কুটতে শুনি মাকে বলছে, আফা, বড় সংসার আমার খুব ভাল্লাগে।

কও কী? বড় সংসার ভাল্লাগে?

হ।

বড় সংসারে তো ম্যালা কাম! আজাইর থাকনই যায় না। আমার সংসার দেহো না? এতডি পোলাপান। একলা একলা বেবাক কাম করতে জান বাইর হইয়া যাইত। দেশে যহন আছিলাম তহন এত কাম করতে হইত না। আমার মায় আছে, বইনে আছে। অরাই করত বেশি কাম। আর এহেনে একলা একলা রান্ধন-বাড়ন, ধোয়াপাকলা, পোলাপানের নাওন-ধোওন। ইশ্ জানডা বাইর অইয়া যাইত। তোমারে পাওনে জানডা আমার বাঁচছে।

তয় আপনের সংসারের কাম করতে আমার খুব ভাল্লাগে। একটার পর একটা কাম। আজাইর বলতে নাই। আমি এমুনই চাইতাম। গরিব গিরস্তবাড়ির মাইয়া। বাপে খেতখোলা করত। আমরা দুই ভাই, এক বইন। বাপ-ভাইগো বেবাক কাম আমিই করতাম। আমার মায় অসুইক্কা মানুষ। দুই-চাইর দিন পরপর জ্বর আহে, শইল বেদনা করে। পেড বেদনা করে। জন্মের পর থিকা মায়ের এই অবস্থা দেখছি। আমি ওই মিলুর বয়স থিকাই সব কাম করতাম বাড়ির। বিয়া অওনের আগে খালি চিন্তা করতাম, আমার য্যান বড় সংসারে বিয়া অয়। অনেক মানুষ সংসারে, অনেক রান্ধন-বাড়ন, অনেক কাম। বিয়ান থিকা রাইত দোফর তরি আমার য্যান খালি কামই করতে অয়...

মা অবাক। কও কী তুমি? এমুন কথা তো কোনো দিন হুনি নাই। মাইনষে কাম করতেই চায় না। আজাইর থাকতে চায়, কামে ফাঁকি দিতে চায়। এই পয়লা একজন মানুষ দেকলাম যে খালি কাম করতে চায়, কাম করতে তার ভাল্লাগে।

হ আফা আমি ইট্টু উল্টাপদের মানুষ। তয় মাইনষের কপাল দেহেন, চাইলাম এক রকম, অইলো আরেক রকম। জামাইবাড়ি বইলা কিছু আমার নাই-ই। ময়নার বাপে অনাথ-এতিম মানুষ। ছোডকালে মা-বাপ মরছে। এক খালা আছিল, হেই খালায় পাইল্লা বড় করছে। খালায়ও গরিব মানুষ। অল্প বয়সে মইরা গেল। তারপর ঢাকার টাউনে আইল হেয়...

নাম কী ময়নার বাপের?

খলিল। খলিল মিয়া।

কও, তার বাদে?

চুলায় ভাতের হাঁড়িতে বলক এসেছে। জহুরা হাতায় করে ভাত তুলে দেখল ফুটতে আর কতক্ষণ লাগবে। তারপর বলল, বারো বচ্ছর বয়সে ময়নার বাপে ঢাকায় আইসা পড়ল। গালিমপুরের বাদশা মিয়ার কাটাকাপড়ের দোকান সদরঘাটে। তার লগে দোকানদারি করত। বেতন নাই, পেডেভাতে কাম। ঈদের সমায় লুঙ্গি ছাট কিন্না দেয়। দিনে দিনে কারবারটা হেয় হিগ্গা গেল। তয় কারবার করতে তো টেকা লাগে। টেকা পাইব কই? আমগো বাড়িতে বিয়ার প্রস্তাব পাডাইল। নগদ টেকা দেওন লাগব পাঁচশো। জমি বিক্রি কইরা পাঁচশো টেকা দিল বাবায়। হেই টেকা দিয়া কারবার শুরু করল। সাত-আষ্ট বচ্ছর আগে আমার বিয়া হইছে। আয় বরকত ভালো করতে পারে নাই ময়নার বাপে। তয় অভাবও নাই। খাইয়া-পইরা চইলা যায় আমগো।

তয় তুমি কাম করতে চাইলা ক্যা? সংসারে অভাব থাকলে সেন বাড়ির বউ-ঝিরা কাম করে?

হ এইডা ঠিক কথাই। দুই-চাইরডা টেকা আয় করতে পারলে বেবাকতেরই ভাল্লাগে। আমারও লাগব। তয় টেকার

থিকাও আমার বেশি লোভ কামের। আজাইরা আমি থাকতেই পারি না। নিজের সংসারের কাম করতে আমার এক-দুই ঘণ্টাও লাগে না। পোলাপান দুইডা শান্ত। ময়নার বাপে সকালে যায়, রাইতে আহে। কাম তো আমার নাই-ই। কেরানি সাবরে দেইখা মনে হইছিল সাবের ঘরের কাম কইরা দেই। হেয় বাইরে বাইরে খায়, আমি রাইন্দা-বাইড়া খাওয়াই। দুই-চাইরডা টেকাও পাইলাম, কাম করনের শকখানও পুরা হইল...

একটু থেমে জহুরা বলল, তয় আফা, আল্লায় মানুষের মনের আশা কোনো না কোনো সময় পূরণ করেঐ। কেমতে কেমতে দেহেন আমার আশা পূরণ হইল। ঠিকই আপনের লগে আমার খাতির হইল। ঠিকঐ দিন-রাইত আপনের সংসারের কাম করতে পারতাছি। আপনে কোনো কামই করবেন না আফা। বেবাক কাম করুম আমি। আপনে হুইয়া-বইয়া থাকবেন।

মা হাসতে হাসতে বললেন, তোমার মাথায় ছিট আছেনি জহুরা?

শুনে জহুরাও হাসে। থাকতে পারে আফা। কাম করনের ছিট।

আব্বা বাসায় ফেরার পর তাঁর ভাতটা মা বেড়ে দেন। ভাত খেতে খেতে টুকটাক কথা হয় দুজনার। মাকে কখনো দেখি না আব্বার তামাকটা সাজিয়ে দেন। আব্বার তামাক খাওয়াটা মা আসলে পছন্দই করেন না। জিন্দাবাহারের বাসায় দুয়েকবার শুনেছি এই নিয়ে কথা বলছেন মা। কামলাগো লাহান তামুক টানেন ক্যা? খাইলে সিকারেট খাইবেন। ভদ্রলোকে তামুক খায়নি?

আব্বা সরল গলায়, হাসিমুখে বলতেন, গিরস্ত ঘরের পোলারা তামুকই খায়। তোমার মায় খায় ক্যা? সে তো নামকরা ঘরের মাইয়া। আমগো বংশের লগে মিল আছে। তারাও খাঁ বংশের আমিও খাঁ বংশের।

খাঁ বংশের মাইনষে তামুক খায় এইডা কোনো দিন হুনি নাই, দেহিও নাই।

অহন দেহো। তোমার মায়ও খায়, স্বামীও খায়।

নিজের তামাক নিজে সাজিয়ে খেতেন আব্বা। কয়েক দিন ধরে দেখছি জহুরা সাজিয়ে দেয়। জহুরার সাজিয়ে দেওয়া তামাক, দেয়ালে হেলান দিয়ে আরামসে টানতে থাকেন আব্বা।

'ভাট্টিখানা' শব্দটা আমার মন থেকে যায়নি। এক সন্ধ্যায় জিজ্ঞেস করলাম আব্বাকে।

ও আব্বা।

কী বাজান?

ভাট্টিখানা কী?

হুকা থেকে মুখ তুলে আব্বা আমার দিকে তাকালেন। হাসিমুখে বললেন, তুমি ওই জিনিস খাইবানি বাজান?

ভাট্টিখানা খাওনের জিনিস?

হ।

কেমুন খাওন?

শরবতের মতন।

চিনি দেওয়া শরবত না মিঠাই দেওয়া?

সেইটা আমি কইতে পারুম না।

ক্যা কইতে পারবেন না?

আমি কোনো দিন খাইয়া দেখি নাই।

ও। তয় একদিন ওই শরবত আইননেন আব্বা। আমি খামু।

আব্বা এবার হো হো করে হাসতে থাকেন। তুমি খাইবা? ভাট্টিখানার ওই শরবত তুমি খাইবা?

মায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, শুনছোনি মিলুর মা, তোমার মিলু তো ভাট্টিখানার শরবত খাইতে চায়?

কথাটা মাও বুঝতে পারেন না। অবাক হয়ে আব্বার মুখের দিকে তাকান। ভাট্টিখানার শরবত আবার কোনডা?

ও তুমিও তাইলে বোজো নাই?

না।

আরে ভাট্টিখানা হইল...আইচ্ছা পুরাডাই বুঝাইয়া কই। কথাটা হইল 'ভাটিখানা' মাইনষে কয় ভাট্টিখানা। ভাট্টিখানা অর্থ হইল মদের কারখানা। সেখানে মদ বানানো হয়। 'ভাটি' অর্থ বড় হাঁড়ি। মদ চোলাইয়ের কারখানা।

মা আমার পক্ষ নিলেন। মিলু পোলাপান মানুষ, ও এত কিছু জানব কেমনে?

সেইটা ঠিক।

আব্বা আমার দিকে তাকালেন। আথকা ভাট্টিখানার কথা জিগাইলা ক্যা বাজান?

লুৎফনের লগে কাঠেরপোলের ওইমিহি গেছিলাম তহন ভাট্টিখানা দেখছি।

বুজছি, বুজছি।

আমার মনে তখন আরেক প্রশ্ন। ভাট্টিখানায় মদ বানানো হয়। মদ জিনিসটা কী?

জিজ্ঞেস করলাম আব্বাকে। ও আব্বা, মদ কারে কয়?

ওই যে তোমারে কইলাম, শরবতের মতন একখান জিনিস। বতলে ভরা থাকে। বিদেশি সাহেবরা খায়।

বিদেশি সাহেব কারা?

জিন্দাবাহারের ওই দিকে সাদা সাদা কয়েকজন মানুষ দেখছ না আরমাইনটোলা যাওনের রাস্তায়...

সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ল সেই বড় গেটওয়ালা বাড়ির কথা। লাল রঙের একটা মোটরগাড়ি, ফরসা ফরসা পুরুষ-মহিলা। ইংরেজিতে কথা বলে। ও ওরা তাহলে বিদেশি? ওরা তাহলে সাহেব? ওরা মদ খায়?

মনে মনে বলি, বড় হয়ে আমিও একদিন সাহেব হয়ে যাব। আমিও একদিন মদ খাব।

সেই রাতে ভাইবোনরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘরের ভেতর চৌকির ওপর সার ধরে শুয়ে আছে মনি, বাদল, পলি, মুকুল। উষা শুয়ে আছে এক পাশে। দাদা শুয়ে আছে পশ্চিম দিককার মেঝের চিপায়। আমি আর ডলি বারান্দায়। আমাদের মাঝখানে শোবেন আব্বা। উষার পাশে গিয়ে শোবেন মা। ডলি ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি ঘুমাইনি। পড়ে আছি ঘাপটি মেরে। ভঙ্গিটা এমন, যেন গভীর ঘুমে ডুবে আছি।

আব্বা দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে ঘুমানোর আগের তামাকটা খেয়ে নিচ্ছেন। মা এসে বসলেন তার পাশে। ঘরডার ভেতরে ইট্টু চাইয়া দেহেন তো।

কী দেহুম? দেহনের কী আছে?

ওই যে আজাদ হুইয়া রইছে চিপার মইদ্যে। পোলাপানগুনি সব চকিতে। মিলু, ডলিরে লইয়া আপনে বারিন্দায়। এইভাবে এতডি মানুষ থাকতে পারে?

সেইটা আমি বুজতাছি। তয় তুমি একখান কাম করো, আজাদ, মনি আর মিলুরে দেশে পাডাইয়া দেও। দুই-চাইর দিনের মইদ্যেই পাডাইয়া দেও। অগো তো ইশকুলও খুইল্লা যাইব।

বাদলরেও পাডাইতে হইব।

পাডাও। ও তো ওর বুজিরে ছাড়া থাকতে পারে না।

হ রোজই বুজি বুজি কইরা কান্দে। তয় আজাদ, মনি আর বাদল যাউক। মিলু থাকুক।

ক্যা? মিলুর ইশকুল আছে না?

অর 'মাথা' ভালো। কয়দিন ইশকুল কামাই করলে কিছু হইব না।

তয় অরে রাকতে চাইতাছ ক্যা হেইডা তো বুজলাম না?

বাসায় একটা পোলা থাকন লাগে। দোকানপাটে পাডাইতে হয়।

বুজলাম।

বোজেন বেবাকই। খালি আসল কথাই বোজেন না।

বুজছি।

কী বুজছেন, কন আমারে?

এই বাসায় তুমি থাকতে চাইতাছ না।

হ। এই রকম বাসায় থাকন যায় না, এই কথা আমি আগেও কইছি। এত ছোট ঘর, এতডি মানুষ আমরা। লড়ন-চড়ন যায় না।

তামাক শেষ করে হুকা রাখলেন আব্বা। তার আগে কলকি উপুড় করে বাইরে ফেললেন পোড়া তামাক আর টিকার ছাই। আফতাব মিয়ার লগে আমার কথা হইছে।

কী কথা?

মুরগিটোলায় তার একখান বাড়ি আছে। একতলা দালান। দুইডা বড় বড় রুম। লাম্বা, চওড়া বারিন্দা। রান্দনঘর, কুয়া, পাকা পায়খানা। কুয়ার পাড়ে দেওয়াল দেওয়া আছে। টিনের একখান দরজা আছে। বউ-ঝিগো গোছল করতে অসুবিদা হয় না।

কন কী? খুব ভালো বাড়ি তো!

হ।

ওই বাড়িডা লওন যায় না?

যায়। আফতাব মিয়া সাধতাছে। তার কনটেকটারির কাম বেবাকই আমার হাতে। আমারে খুশি রাখতে পারলে সুবিদা। তয় কনটেকদার মানুষ তো, টেকা চিনে। ভাড়া চায় এক শ কুড়ি টেকা।

মা অবাক। এক শ কুড়ি টেকা?

হ। আমার লেইগা কুড়ি টেকা কমাইব। এক শ টেকা নিব।

দুই রোমের পুরা একখান বাড়ি, অন্য কোনো ভাড়াইট্টা নাই, এত সুবিদা! এক শ টেকা ভাড়া তো নিবই।

আমি চিন্তা করি অন্য কথা।

কী কথা?

মায়না পাই আড়াই শ টেকা। এক শ টেকা বাসা ভাড়া দিলে এতডি পোলাপান লইয়া চলুম কেমনে? সংসার তো দুইডা।

দুইডা সংসার?

দুইডা সংসার না? আজাদ অরা থাকব দেশে। পোলাপানের খাওন-পরনের খরচ দেওন লাগব না?

দেশে অগো রাখুম ক্যা? বেবাকতেরে ঢাকায় লইয়া আমু। এহেনকার ইশকুলে ভর্তি কইরা দিমু।

পুনু আছে, তোমার মায় আছে?

অরা কিছুদিন দেশে কিছুদিন ঢাকায় থাকব।

বুজলাম। খরচা আছে না এইসবের?

মা গম্ভীর। তয় এতডু ঘরের মইদ্যেই কষ্ট করুম আমি? বিয়ার পর থিকা তো কষ্টে কষ্টেই দিন যাইতাছে।

আব্বা একটু চুপ করে থেকে বললেন, ঠিক আছে। কথা কই আফতাব মিয়ার লগে। ওই বাড়িতে ভাড়াইট্টা আছে। এক-দুই মাসের মইদ্যে ওই ভাড়াইট্টা উডাইয়া দিয়া বাড়ি আমারে দিয়া দিব।

মা খুশি। আব্বাকে বুঝ দেওয়ার জন্য বললেন, হোনেন, আগেও আপনেরে কইছি, আইজও কইতাছি, খাওন-দাওন আর সংসারের অন্য খরচ আমি কমাইয়া হালামু। ওতে আমার কোনো অসুবিদা হইব না। পোলাপান লইয়া ইট্টু আরামে থাকতে চাই। আপনে যা মায়না পান ওতেই সংসার চইল্লা যাইব।

তয় আর কী? লইয়া লই আফতাব মিয়ার বাড়ি।

হ লইয়া লন। তয় দেহেন আর কিছু টেকা কমাইতে পারেননি?

না হেইডা অইব না। আমি কইছিলাম। এক শ টেকাই ভাড়া দেওন লাগব। ঠিক আছে, তুমি যহন কইতাছ, এক শ টেকা দিয়াই লমু।

সকালবেলাই ভাইবোনরা সবাই জেনে গেল দুই মাসের মধ্যে এই বাসা ছেড়ে যাব আমরা। একলা একটা পুরো বাড়িতে থাকব। দুটো বড় বড় রুম, আলাদা রান্নাঘর, পায়খানা, কুয়া, গোসলখানা। বাদল না পলি কে যেন আমাকে বলতে এল, আমি হেসে বললাম, আমি কাইল রাইতেই হুনছি। মায়-আব্বায় কথা কইতাছিল। তহনও আমি ঘুমাই নাই। ঘুমের 'ভ্যাক' ধইরা আছিলাম।

সকালবেলার কাজ করতে এসে জহুরা খালাও শুনল। শুনে খুবই মন খারাপ করল। আব্বা যতক্ষণ বাসায় ততক্ষণ কোনো কথা বলল না। টুকটাক কাজ করতে লাগল। মন খারাপের ছায়া পড়েছে মুখে।

আব্বা বাজারে যাওয়ার পর, আব্বার জন্য ভাত রান্না করতে বসে মাকে বলল, তয় আপনেরা এই বাসা ছাইড়া যাইবেন আফা?

হ। কী করুম কও? এতডু একটা ঘরে এত পোলাপান লইয়া থাকন যায়?

সেইটা ঠিক। আর এই রকম বাসায় আপনেগো মানায়ও না। মানায় আমগো লাহান মাইনষেরে। দোকানদার ফেরিআলা মাইনষেরে।

মা কথা বললেন না।

আব্বার অফিস দশটা থেকে। সাড়ে নটার মধ্যে বাসা থেকে বেরিয়ে যান। কাঠেরপুলের ওদিক দিয়ে হেঁটে পনেরো-বিশ মিনিটের মধ্যে লক্ষ্মীবাজারের মিউনিসিপ্যালিটি অফিস। আর আব্বা হাঁটেন খুব জোরে। আব্বার সঙ্গে কোথাও যেতে হলে তাঁর পিছু পিছু দৌড়াতে হয়।

আব্বা ওঠেন খুব সকালে। ফজরের আজানের সঙ্গে সঙ্গে। উঠে কোনো কোনো দিন মুরগিটোলার মসজিদে চলে যান নামাজ পড়তে। কোনো দিন একটু দেরি হলে ঘরেই নামাজ পড়েন। মাও ওঠেন তার পরপর। সব সময় ফজরের নামাজটা মা পড়তে পারেন না। উঠেই নাশতা বানাতে বসেন। রুটি, হালুয়া, মুড়ি, মিঠাই, কোনো কোনো দিন জাউ, খুদের 'বউয়া'। এসব আমাদের নাশতা। আব্বা আগের রাতে কোনো কোনো দিন পাউরুটি এনে রাখেন। সকালবেলা চিনি দিয়ে দুই টুকরা করে পাউরুটিতে আমাদের নাশতা হয়।

আব্বাও আমাদের সঙ্গে নাশতা করে বাজারে চলে যান। কোনো কোনো দিন আমিও যাই আব্বার সঙ্গে। আজাদ তেমন যায় না।

বাজার থেকে এসে গোসল-টোসল করে গরম ভাত খেয়ে অফিসে যান আব্বা। ভাতের সঙ্গে একটু ডাল, আগের রাতে রাখা তরকারি, একটা সিদ্ধ ডিম, নয়তো ডিমভাজা। দুপুরে ভাত আব্বার খাওয়া হয় না। সকালে খান আর বিকেলে এসে খান কোনো কোনো দিন। যেদিন ফিরতে দেরি হয়, সন্ধ্যা বা রাত হয়ে গেলে একবারে রাতেই ভাত খান।

আগে একাই মাকে সামলাতে হতো সব, কিছুদিন ধরে জহুরা খালা কাজ করছে আমাদের ঘরে, ফলে সবকিছু আর মাকে করতে হয় না।

আজ আব্বা অফিসে চলে যাওয়ার পর জহুরা খালা মন খারাপ করা গলায় মাকে বলল, আমার কোনো ভালো জিনিসই বেশি দিন থাকে না আফা।

মা অবাক। কোন ভালো জিনিস বেশি দিন থাকে না?

যেমুন আমার বাপের বাড়ি। ওই বাড়িতে আমি বহুত ভালো আছিলাম। বড় হইতাছি, সংসারের বেবাক কাম করতাছি, আমার বহুত ভালো লাগত। মা, বাপ আর দুই ভাইয়ের কেঐরে আমি কোনো কাম করতে দিতাম না। বিয়ার কথা যহন হইতাছে, আমি খালি চিন্তা করতাম, আমার য্যান বড় সংসারে বিয়া হয়। বাড়িতে য্যান অনেক মানুষ থাকে,

অনেক কাম থাকে। আমি য্যান দিন-রাইত খালি কাম করতে পারি। হইল ঠিক উল্টা। যেই মাইনষের লগে বিয়া হইল তার নাই কিছুই। কোনো কামই নাই সংসারে। দুইজন মাইনষের রান্ধন-বাড়ন, ধোয়াপাকলা, চোক্কের নিমিষে কইরা হালাই আমি। তার বাদে আর কাম নাই। আজাইরা থাকতে আমার ভাল্লাগে না। পোলাপান হইল। কাম কাইজ ইট্টু বাড়ল। তাও তেমুন কিছু না। আজাইরাই থাকি। সংসারে কামই নাই, তাও বানাইয়া বানাইয়া কাম করি। আপনের সংসারে আইলাম কাম করতে, বড় সংসার আপনের, কাম কইরা আরাম পাই, টেকা আপনে কয়ডা দিলেন না দিলেন ওইডা আমি চিন্তাও করি না...

মা বললেন, তুমি তো কাম লওনের আগে টেকার কথা কইছিলা...

ওইডা কইছিলাম আর কি। কয়ডা টেকা পাইলে তো ভালোই অয়। না পাইলেই বা কী। আমার মনের শান্তিডা তো পাইতাম। হেই শান্তিও দেহেন অহন আর থাকব না। আপনেরা চইলা যাইবেন।

আমগো বাসা কইলাম বেশি দূর হইব না। মুরগিটোলা। তুমি চিনো?

চিনি।

ওই বাসায় গিয়া কাম করতে পারবা না?

ময়নার বাপে রাজি হইব কি না কইতে পারি না।

তারে রাজি করাও। তুমি তো অন্য কোনো বাসায় কামে যাইতাছ না? আমরা তোমার চিনা পরিচিত।

হ। দেহি তারে কইয়া...। তয় আরেকখান ভেজালও আছে।

কিয়ের ভেজাল?

পোলাপান দুইডা? অগো কার কাছে থুইয়া যামু?

থুইয়া যাইবা ক্যা? অগো তোমার লগে লইয়া যাইবা। হোনো, আমি তোমারে বুদ্ধি হিগাইয়া দেই। ময়নার বাপরে তুমি বুজাইবা, বিয়ানবেলা সে দোকানদারি করতে চইলা যাওনের পর তুমি তোমার দুই পোলা-মাইয়া আমগো বাসায় লইয়া যাইবা। হারা দিন কাম কাইজ কইরা সন্ধ্যাবেলা আইয়া তোমগো রান্ধন-বাড়ন করবা।

দোফরে খামু কই? দোফরে রান্ধন লাগব না?

দোফরে আমগো বাসায়ই খাইবা। আমগো লগে খাইবা।

শুনে জহুরা খালার মুখে এত সুন্দর একখানা হাসি ফুটল! যেন জীবনের সব স্বপ্ন এইমাত্র পূরণ হয়ে গেছে তার।

সাত

সকালবেলা আজাদ, মনি আর বাদল চলে গেছে।

সদরঘাট গিয়ে আব্বা ওদের মাওয়ার লঞ্চে চড়িয়ে দিয়েছেন। বিকেল নাগাদ মাওয়ার ঘাটে গিয়ে ভিড়বে লঞ্চ। সেখান থেকে হেঁটে মেদিনীমণ্ডল চলে যাবে ওরা। বুজি আর পুনুআম্মা হঠাৎ ওদের দেখে খুশি হয়ে যাবেন।

বুজিকে দেখে কেমন করবে বাদল?

বুজিই বা কেমন করবেন বাদলকে দেখে?

বাদল তো তার জান।

বিকেলের দিকে এসব ভাবতে ভাবতে বাসা থেকে বেরিয়েছি। দেখি লুৎফন হেঁটে আসছে আমাদের বাসার দিকে। আমাকে দেখে হাসল। তগো বাসায়ই যাইতাছিলাম।

ক্যা?

লুৎফন মজার গলায় বলল, তোমার লেইগা না চান্দু। যাইতাছিলাম একখান খবর লইতে।

কী খবর?

তরা বলে জামাল মিয়ার বাসা ছাইড়া দিবি?

কে কইল তরে?

দুলাভাইয়ে।

সেরুদায়?

তর সেরুদা ছাড়া আমার আর কোনো দুলাভাই আছে? বলদা ছ্যামড়া!

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, আমারে বলদা ছ্যামড়া কইলে আমি তরে বলদি ছেমড়ি কমু।

আমি বলদি না।

আমিও বলদ না। আমি যা জানি তুই হেইডা জানচ?

কোনডা জানি না, ক।

ভাট্টিখানা কারে কয় জানচ?

কারে কয়?

তরে জিগাইছি তুই ক।

জানি না।

আমি জানি।

কারে কয় ক তো?

ভাট্টিখানা হইল মদের কারখানা। যেহেনে মদ বানায়।

লুৎফন অবাক। মদের কারখানা?

হ ছেমড়ি।

কে কইল তরে?

হেইডা কমু না। মদ কারা খায় জানচ? সাহেবরা, সাহেবরা খায়।

তুই জানচ ঘোড়ার আন্ডা। মদ মেথররাও খায়।

মেথররা মদ খায়?

হ।

কে কইছে তরে?

আমি জানি। বড় কেঐরে জিগাইছ, কইয়া দিব তরে। তয় ভাট্টিখানা যে মদের কারখানা এইডা হুইন্না আমার একটা বুদ্ধি আইছে।

কী বুদ্ধি।

একদিন ওই কারখানায় ঢুকুম। মদ কেমতে বানায় দেহুম।

আমিও দেহুম। আমারে নিবি?

নিমু নে। অহন ক আমারে, সত্যঐ তরা জামাল মিয়ার বাসা ছাইড়া দিতাছস?

হ। আমরা মুরগিটোলা যামু গা। আফতাব মিয়ার বাসায়। পুরা একটা বাড়িতে একলা থাকুম আমরা।

কবে যাবি?

দুই মাস পর।

লুৎফন ঠোঁট উল্টে বলল, ও। তয় অনেক দেরি আছে। আমি মনে করছি দুই-চাইর দিন পরই যাবি গা।

আরে না ছেমড়ি। আইজ দাদায়, মনি আর বাদল দেশে গেছে। কয়দিন পর আমিও যামু। আমার ইশকুল খোলা।

আমিও যামু গা।

কই, দেশে যাবি?

না।

তয়?

লুৎফনের ঠোঁটে রহস্যের হাসি। ওই যে তরে কইছিলাম, একলা একলা রেলে চইড়া কোনো মিহি যামু গা।

লুৎফনের হাসি দেখে আমিও হাসি। তুই যে কইছিলি আমারেও লইয়া যাবি?

লুৎফন ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল, ইশ্ আল্লাদ কত! অরে লইয়া যাইব। এই ছ্যামড়া, তুই আমার জামাই যে তরে লইয়া যামু?

'জামাই' কথাটা শুনে আমার খুব রাগ হলো। ওই বান্দরনি, আমি তর জামাই হমু ক্যা রে? তর লাহান পেতনিরে কে বিয়া করে?

কী আমি পেতনি?

হ তুই পেতনিই।

আমারে পেতনি কইলে থাবড় দিয়া তর দাঁত হালাইয়া

দিমু।

আমি মুখিয়ে গিয়ে বললাম, সাহস থাকলে দে তো থাবড়?

সঙ্গে সঙ্গে হেসে ফেলল লুৎফন। গলা নরম করে বলল, তরে আমি কোনো দিনও থাবড় দিমু না। তুই খুব ভালো।

আমিও তৎক্ষণাৎ নরম।

লুৎফন বলল, তর আমার দশা হইল, এই কাইজ্জা এই খাতির।

তারপর আমার হাত ধরল। ল, আইজ ইসটেন কেলাবের ওইমিহি যাই। ওইমিহি তরে লইয়া কোনো দিন যাই নাই।

আমি খুশি হয়ে বললাম, ল যাই।

বিকেলবেলা ধূপখোলা মাঠের চারদিকেই খেলাধুলা চলছে। ফুটবল, গোল্লাছুট, কাবাডি। পোলাপান দৌড়াদৌড়ি করছে, সাইকেল চালাচ্ছে। পাশাপাশি গরু-ছাগলও চড়ছে মাঠে। ভারি জমজমাট একটা অবস্থা। মাঠপাড়ের বাড়িঘর থেকে বউ-ঝিরাও বেরিয়ে এসেছে। যে যার বাড়ির সামনে হাঁটাচলা করছে, আশপাশের বাড়িঘরের মহিলারা জড়ো হয়ে গল্পগুজব করছে।

মাঠের ধারে হাঁটছে পুরুষ মানুষরা। রিকশা চলছে। দুজন চারজন করে পুরুষ মানুষ দাঁড়িয়ে-বসে ফুটবল খেলা দেখছে। গোল হলে চিৎকার-চেঁচামেচি করছে।

শিমুলগাছগুলোর দক্ষিণ পাশ দিয়ে আমি আর লুৎফন মাঠ পাথালে হাঁটতে লাগলাম। পুব-দক্ষিণ কোনের দিকে যাব।

মাঠের এই দিকটা সবচেয়ে জমজমাট। ইস্ট এন্ড ক্লাবের সামনের মাঠে জার্সি আর বুট পরে খেলছে দুটো দল। তাদের চারপাশে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছে কিছু দর্শক। ক্লাবের ঘরগুলো বাগিচার সেই ঘরগুলোর মতো। চটির বেড়া দেওয়া চারদিক। বেড়ার গা ঘেঁষে পাতাবাহারের ঝোপ, জবা, গন্ধরাজের গাছ। মেহেদিগাছের ঘন ঝাড় অনেক। ভারি সুন্দর পরিবেশ।

মাঠের দক্ষিণ পাশে চিনাবাদাম বিক্রি করছে এক লোক। বরই আর চালতার আচার বিক্রি করছে। শনপাপড়িওয়ালা আছে, ঝালমুড়িওয়ালা আছে। লোকজনও এদিকটায় বেশি। আহা, দুই পয়সা বা এক আনা থাকলে আমি আর লুৎফন শনপাপড়ি কিনে খেতে পারতাম!

এ পাশটায় মাঠ শেষে রাস্তার দক্ষিণ পাশে কাঠের সুন্দর একটা দোতলা বাড়ি। বিনাখালাদের বাড়ির মতো মাঠের দিকে রেলিং দেওয়া বারান্দা। পাশে আরেকটা একতলা টিনের বাড়ি। অনেকগুলো ঘর বাড়িতে। একটা ঘরের দরজা রাস্তার দিকে। দু-তিনটা কালো কালো যুবতী মেয়ে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। পরনে সালোয়ার-কামিজ। তাদের পেছনে বড় একটা টিনের সুন্দর ঘরের রাস্তার দিককার দরজাটা খোলা। সেই দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ঘরে বেশ কয়েকটা বইয়ের আলমারি। আলমারিভর্তি মোটা মোটা অনেক বই।

এইসব বাড়ির পর পুব দিকে খোলা কয়েক কদম জায়গা। একটা হতদরিদ্র ছাপরাঘর। গেরুয়া পরা রোগাপটকা একটা লোক ছাপরাঘরের দরজায় উদাস হয়ে বসে আছে।

সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘোরাঘুরি করে আমরা ফিরে এলাম।

দুদিন পর ঘটল ভয়ানক এক ঘটনা। দুপুরের দিকে দিশেহারা ভঙ্গিতে আমাদের বাসায় এলেন সেরুদা। মাকে ডাকেন—আম্মা। সব্বনাস অইয়া গেছে, আম্মা। লুৎফন হারায়া গেছে।

বারান্দায় বসে রান্না করছে জহুরা খালা। মা ছিলেন তার সামনে। সেরুদার কথা শুনে উঠে দাঁড়ালেন। হায় হায় কছ কী?

হ আম্মা। বিয়ান থিকা লুৎফনরে পাওয়া যাইতাছে না। আমি বহুত বিচড়াইছি। কোনোহানে নাই লুৎফন।

আমি ছিলাম ঘরের ভেতর। দৌড়ে বেরোলাম। আমগো বাসায়ও আহে নাই।

হেইডা আমি জানি। এই বাসায় আইছে কি না খবর লইছি।

মা বললেন, কই হারায়া গেল মাইয়াডা?

হেইডাই তো বুজতাছি না।

আথকা হারায়া যাইব ক্যান? তর বউ বকা দিছিলোনি? রাগ কইরা কোনো মিহি গেল গা?

বউ বকা দেয় নাই, দিছিলাম আমি। বিয়ান হইয়া সারে নাই, দেহি কোনোরকমে মুড়ি মিডাই খাইয়া বাইর হইয়া যায়। আমি দিছি বকা—এই ছেমড়ি, তুই খালি ফরফর কইরা উড়ছ ক্যা? বিয়ানবেলা বিয়ানে কই যাচ? বইয়া থাক ঘরে, নাইলে থাবড়াইয়া দাঁত হালাইয়া দিমু। তার বাদে আমি গেছি বাজারে। ফিরা আইসা দেখি লুৎফন নাই। পয়লা পয়লা আমি কিচ্ছু বুজি নাই। মনে করছি গেছে কোনো মিহি। দোফর হইয়া গেছে, ফিরত আহে না দেইক্কা আপনেগো বউ কইলো, রাগ কইরা বাইর হইয়া গেল, বিচড়াইয়া আনো। এইমিহি ওইমিহি বহুত বিচড়াইলাম, কোনো হানে পাইলাম না। আপনেগো বউ কান্দাকাটি করতাছে...

জহুরার দিকে তাকিয়ে মা বললেন, পোলাপানের দিকে খ্যাল রাইখো জহুরা। আমি ইট্টু সেরুর বাসায় গেলাম।

হ হ যান আফা।

আমিও মায়ের সঙ্গে গেলাম। গিয়ে দেখি সেরুদার বউ কাঁদছেন। তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে বাড়ির কয়েকজন বিভিন্ন বয়সী মহিলা। মাকে দেখে সেরুদার বউর কান্না আরও বাড়ল। মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, লুৎফনরে না পাইলে বাপ, মা, ভাইগো আমি কী কমু? আমার বাসা থিকা কেমতে হারায়া গেল লুৎফন?

তারপর সেরুদার ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি। তুমি আমার বইনরে বকা দিলা ক্যা? অর যেই মিহি ইচ্ছা যাইব। তুমি বকলা ক্যা? যুদি আমার বইনরে না পাওয়া যায়, তয় তোমারে আমি বডি দিয়া কোবাইয়া কোবাইয়া কাডুম।

সেরুদা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

আমি অবাক হয়ে সেরুদার বউকে দেখছি। এত শান্ত-নম্র মহিলা হঠাৎ কী রকম বদলে গেছেন। কী রকম হিংস্র চেহারা হয়েছে তাঁর। মা তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, মায়ের কথাও যেন শুনছেন না। সেরুদাকে আপনি করে বলেন, এখন বলছেন তুমি করে। তাদের ঘরের সামনে ভেঙে পড়েছে বাড়ির সব লোক।

লুৎফন গেল কোথায়?

তারপরই মনে হলো, ওই যে লুৎফন বলেছিল একদিন রেলে চড়ে দূরে কোথাও চলে যাবে, তাহলে কি সেভাবে কোথাও চলে গেল? আর কি সে ফিরে আসবে না?

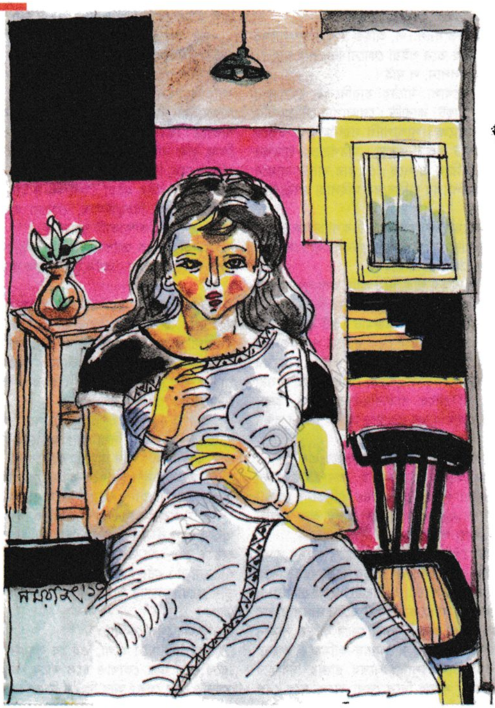
লুৎফন যে বলেছিল আমাকেও সঙ্গে নেবে?

এসব কথা কাউকে বলি না আমি। সেরুদার বাসা থেকে বেরিয়ে উদাস ভঙ্গিতে হেঁটে ধূপখোলা মাঠের শিমুলগাছগুলোর ওদিকটায় আসি। দুপুরবেলার প্রখর রোদে ঝিমঝিম করছে চারদিক। লোকজন বলতে গেলে নেই মাঠে। দুয়েকটা গরু-ছাগল চড়ছে, শালিক পাখি চড়ছে। গাছের ডালে বসে ডাকছে কাক। শিমুলতলার সবুজ ঘাসে ছায়া পড়ে আছে।

সেই ঘাসে এসে বসি আমি। আমার শুধু লুৎফনের কথা মনে হয়। কোথায় হারিয়ে গেল লুৎফন? কোথায় চলে গেল? আর কোনো দিন কি লুৎফনের সঙ্গে আমার দেখা হবে না?

কান্না পায় আমার, খুব কান্না পায়। শিমুলতলার ঘাসে বসে হাঁটুতে মুখ গুঁজে লুৎফনের জন্য আমি আকুল করা কান্নায় কাঁদতে থাকি। আমার কান্না দেখে দুপুরবেলার রোদ, শিমুলের ন্যাড়া ডালপালা, বিষণ্ন ফুল। মাঠের শালিক পাখি আর হাঁ করা কাক। ❦

গল্প



সচিত্রকরণ : সমরজিৎ রায় চৌধুরী

বিশ্বজিৎ চৌধুরী

সুন্দর রহস্যময়

হাসিন জাহানের সঙ্গে আমার দেখা হলো দীর্ঘ প্রায় ১৮-১৯ বছর পরে। কলেজ জীবনে এই সহপাঠিনীর প্রেমে পড়েছিলাম আমি। বাকি জীবনে আমি যে আর বিয়ে-সংসার করলাম না, অনেকের ধারণা প্রথম প্রেমের সেই ব্যর্থতাই এর কারণ। এ বিষয়ে আমি নিজে কিছুটা বিভ্রান্ত, তাদের সেই ধারণাই ঠিক, নাকি পরবর্তীকালে আমার কিছু বিবাহিত বন্ধু ও ঘনিষ্ঠজনের দাম্পত্য জীবনকে খুব কাছ থেকে দেখে এই সামাজিক সম্পর্কটির আদৌ কোনো অর্থ আছে কি না—এই প্রশ্ন উদাসীন করে তুলেছিল আমাকে। অবশ্য হাসিন যদি আমার কাঁচা অথচ তরুণ ও তাজা আবেগের মূল্য দিত

তাহলে ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াত জানি না।

হাসিন ছিল অসাধারণ রূপসী, ভিড়ের মধ্যে মিশে থাকার উপায় তার ছিল না, বরং ভিড়-কোলাহলের মধ্যেও মনোযোগের কেন্দ্র হয়ে ওঠার মতো একটা দৈব-পক্ষপাত ছিল তার চেহারা ও দৈহিক সৌন্দর্যে। ফলে তার প্রণয়াকাঙ্ক্ষীর সংখ্যা ছিল দুহাতের করে গুনে হিসাব করার চেয়ে বেশি। নিজের রূপ ও এর মোহবিস্তারী শক্তি সম্পর্কে বিলকুল ধারণা ছিল তার। চারপাশে মৌমাছির অবিরত গুঞ্জনে অতিষ্ঠ, কিন্তু সমঝদার এই মেয়েটি একবার আমাকে ঠাট্টা করে বলেছিল, কিছু কিছু মেয়ের জন্য সামাজিক বিধান শিথিল হওয়া উচিত। মহাভারতের দ্রৌপদীর মতো পঞ্চস্বামীর সংসার করার অধিকার দিলে তাদের প্রতি সুবিচার হতো।

সে রকম সুযোগ থাকলে দ্বিতীয় থেকে পঞ্চমজনের মধ্যে আমারও যেকোনো একটা স্থান হয়ে যেতে পারত বলে রসিকতা করেছিল। সন্দেহ নেই এই 'করুণা' আমাকে ব্যথিত ও অপমানিত করেছিল। তারপরও আমাদের সম্পর্ক কখনো তিক্ততার পর্যায়ে যায়নি, কারণ তার প্রত্যাখ্যানের মধ্যে যেন রূঢ়তার চেয়ে অসহায়ত্ব ছিল বেশি।

চারুকলা কলেজে আমার এই সহপাঠিনী একবার আমার একটি তৈলচিত্রের মডেল হতে রাজি হয়েছিল। ঘটনাচক্রে সেই ছবিটি বার্ষিক প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কার পায়। ছবিতে সুন্দরী তরুণীর কপালে লাল টিপ এঁকে সেটা একটু থেবড়ে দিয়েছিলাম। হাসিন সন্দেহ করছিল সেখানে লাল রঙের পরিবর্তে আমি নিজের এক ফোঁটা রক্ত মিশিয়ে দিয়েছিলাম কি না। এমনকি ছবিতে নাক ঠেকিয়ে শুঁকে দেখেও সে বোঝার চেষ্টা করেছিল তাতে রক্তের গন্ধ আছে কি নেই। আমি অবশ্য কখনোই তার এই কৌতূহল নিবৃত্ত করিনি।

ছবিটি আঁকার কিংবা প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হওয়ার পর তার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বেড়েছিল এবং যেকোনো কারণেই হোক আমার মতো 'প্রতিভাবান'কে যোগ্য সম্মান দিতে পারল না বলে অনুতাপ করত। আমি তাকে এ ব্যাপারে কোনো অস্বস্তিবোধ না করার অনুরোধ করে বলেছি, যখন এই প্রস্তাবটা আমি দিয়েছিলাম তখন ঘোর বর্ষা ছিল, বর্ষামানব মনে একটা বিশেষ ধরনের প্রভাব ফেলে এবং সম্ভবত 'অসময়ে কোকিল ডাকিয়াছিল।'

শুধু সুন্দর চেহারা ও দেহকান্তির জন্য আমি হাসিনের প্রেমে পড়েছিলাম তা নয়। স্বীকার করতে হবে তার পাকা ধানের মতো গায়ের রং, বড় দুটি টলমলে চোখ, কমলার কোয়ার মতো ফোলা দুটি ঠোঁট আর বাঁকা সিঁথির দুপ্রান্ত থেকে কোমর অব্দি নেমে আসা ঝরঝরে সোজা চুল দেখে যে কারোরই মনে একবার হাহাকারের বোধ জাগতে পারে। তার মসৃণ হাতের সরু ও সুচারু আঙুলগুলো দেখে মনে হবে পিয়ানোর রিড বা তানপুরার তার ছাড়া আর কোথাও এর স্পর্শ বেমানান।

তবে পরিচয়ের পর তার জমিয়ে কথা বলার ধরন আমাকে মুগ্ধ করেছিল বেশি। সে অদ্ভুত সব ঘটনা বিশ্বাস করত এবং অন্যদের বিশ্বাস করতে বলত। বন্ধুরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সেসব ঘটনা শুনে বিভ্রান্ত হতো এবং নানা দোলাচলের মধ্যেও শেষ পর্যন্ত মেনে নিত। আমি বিশ্বাস করতাম না, কিন্তু শুনতে পছন্দ করতাম, ভালো লাগত। যেমন একবার সে আমাকে গোপনে বলেছিল, তার যে অসাধারণ রূপ (নিজের এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে খুবই নিশ্চিত ছিল) তা মোটেই পারিবারিক জিনসূত্রে পাওয়া নয়। তার আপন বড় বোন ও মা-বাবা কিংবা বংশের কেউই দেখতে সুন্দর নয়। মাত্র সাত কি আট বছর বয়সে এই রহস্য তাকে জানিয়েছিল তার দাদি। তার মা দ্বিতীয়বার সন্তান প্রসব করার পর প্রায় কাকের ছানার মতো একটি শিশুর মুখ দেখে বিবমিষা হয়েছিল দাদির। একে তো ছেলে ও বউমার ঘরে পরপর দুটি কন্যাসন্তানের জন্ম তাঁকে বিমর্ষ করে দিয়েছিল, তদুপরি মেয়েটির এ রকম বদ্‌খত চেহারা-সুরত দেখে যারপরনাই হতাশ হয়ে পড়েছিলেন তিনি। এ অবস্থায় কী করা যায়, আদৌ কিছু করা যায় কি না ভাবছিলেন দাদি এবং কাকতালীয়ভাবে কিছু একটা করার সুযোগ তিনি পেয়ে গিয়েছিলেন।

হাসপাতালে পরীর মতো সুন্দরী এক সদ্যপ্রসবার কন্যার সঙ্গে কৌশলে অদলবদল করে ফেলেছিলেন নিজের ছেলে-বউয়ের সন্তানটি। তখন গভীর ঘুমে অচেতন ছিলেন দুই নারীই। একমাত্র সাক্ষী হাসপাতালের আয়াকে বড় অঙ্কের বকশিশ দিয়ে হাত করেছিলেন দাদি।

হাসপাতালে নানা রকম কাণ্ডকীর্তি হয় বলে শুনেছি, কিন্তু এ ঘটনা মোটেই বাস্তবসম্মত মনে হয়নি আমার। গাইনি ওয়ার্ডের ডাক্তার, নার্স সর্বোপরি অ্যাটেনডেন্টদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে এমন একটি কাজ সেরে ফেলা মোটেই সম্ভব বলে মনে হয় না। তার ওপর এ রকম একটি ঘটনার কথা পরিবারে আর কারোর মুখে কখনো শোনা যায়নি, দাদি তাকেই বলল, যে কিনা নিজেই এই প্রতারণার অন্যতম শিকার—এটাও বিশ্বাস করার পক্ষে একটু কঠিনই। যাই হোক বড় বোন শিরীন সুলতানার সঙ্গে কোনো মিল না রেখে এই দাদিই তার নাম রেখেছিলেন হাসিন জাহান।

হাসিন আমাকে বলেছিল, এখনো মায়ের বয়েসী সুন্দরী নারী দেখলেই সে তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে নিজের জন্মদাত্রীর খোঁজ করে। পুরো ব্যাপারটা বিশ্বাস হয়নি বটে, কিন্তু তার নিজের বিশ্বাসের কথা ভেবে, গভীর দীর্ঘশ্বাসের পর তার কষ্টের ছাপ পড়া মুখের দিকে তাকিয়ে আমি সমবেদনা জানিয়েছিলাম সেদিন।

> "এখনো মায়ের বয়েসী সুন্দরী নারী দেখলেই সে তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে নিজের জন্মদাত্রীর খোঁজ করে"

আমার ধারণা ছিল, এ ঘটনা গোপনে শুধু আমাকেই জানিয়েছিল হাসিন, কিন্তু পরে শুনেছি আমার বন্ধুরা অনেকেই হাসিনের জন্ম ও জন্মের অব্যবহিত পরের ঘটনা সম্পর্কে জানে। বিশ্বাস কে করেছে বা করেনি সেটা তাদের ব্যাপার, কিন্তু তারা শুনেছে হাসিনের মুখেই।

হাসিন জাহানকে নিয়ে নানা রসাল ও মুখরোচক কাহিনি চালু ছিল বন্ধু ও পরিচিত মহলে। লক্ষ করেছি আমাদের যেকোনো আড্ডায় বিভিন্ন বিষয় ঘুরে কোনো না কোনোভাবে একবার এই মেয়েটির প্রসঙ্গে উঠতই এবং তেমন কোনো জুতসই সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়াই ওর চারিত্রিক ত্রুটি-বিচ্যুতি বিষয়ে একমত হতো সবাই। আমি এ বিষয়ে মতামত দিতাম না, কারণ আমার মনে হয়েছে এটা সুন্দরীদের দুর্ভাগ্যের একটা দিক। এতে আছে কারও ঈর্ষা-পরশ্রীকাতরতা, কারওবা অপ্রাপ্তির বেদনা থেকে আঙুর ফলকে বিস্বাদ মনে হওয়ার গল্প।

হাসিন চলে যাওয়ার পর অন্তত আরও দুই নারীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছিলাম আমি। কিন্তু নির্দিষ্ট

পরিণতিতে পৌছানোর আগেই শিথিল হয়ে পড়েছিল দুটি সম্পর্কই। তাদের ঘাটতি কিছু ছিল না, বরং বলা চলে একটি পুরুষের জীবনকে সুখী ও অর্থপূর্ণ করে তোলার যথেষ্ট সামর্থ্য ছিল দুটি মেয়েরই। কিন্তু যে ছবিটা আমি এঁকে ফেলেছিলাম একবার, সেই ছাঁচের মধ্যে ফেলে অন্য অবয়বকে সম্পূর্ণ করে তোলার চেষ্টার মধ্যেই মস্ত একটা ফাঁকি ছিল। মানুষ তো একটি অবয়ব শুধু নয়, প্রত্যেকের পৃথক অভিব্যক্তি, আলাদা ভাষা আছে। একসময় তারাও হয়তো লক্ষ করছিল আমার দৃষ্টিতে আছে অন্য অনুসন্ধান, অন্য একটি ছায়া খুঁজে চলেছি আমি। এক জীবনে অন্য ছায়াটির সন্ধান করেই হয়তো দিব্যি সুখী দাম্পত্য চালিয়ে নিতে পারছে অনেকেই, আমি পারলাম না।

একবার এমনকি পারিবারিক একটি উদ্যোগেও সম্মতি দিয়েছিলাম। কিন্তু কথাবার্তা অনেকদূর এগিয়ে যাওয়ার পর প্রায় শেষ মুহূর্তে নিকটজনদের রীতিমতো বিব্রত ও বিরক্ত করে সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেলেছিলাম।

'এত দিন পরে এলে, কেন এলে?' আমি হাসি ও কৌতুকের ছলে জিজ্ঞেস করলাম হাসিনকে।

'আজ সে বিশ সাল প্যাহলে, তুমি আমাকে...।' বাক্য অসমাপ্ত রেখে হাসল সে।

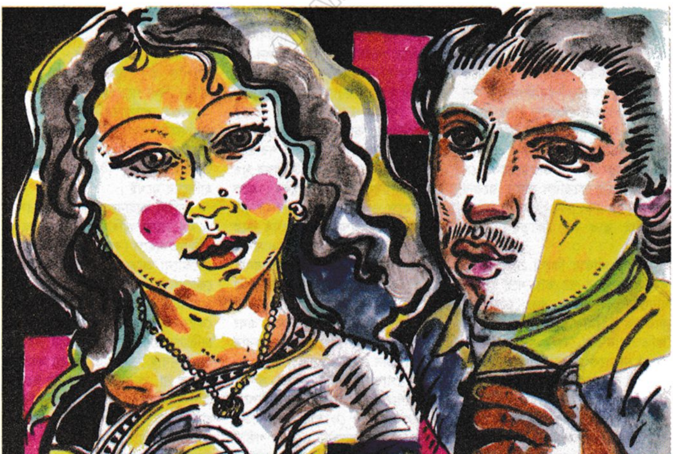
আমার নবীন যৌবনের আকুলতার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছে হাসিন। তাতে অবশ্য এতকাল পর আমার আহত বা বিব্রত হওয়ার কিছুই তেমন নেই। বরং তার বিখ্যাত হাসিমুখের দিকে তাকিয়ে মনে হলো জীবনের এতগুলো হেমন্তকাল পেরিয়ে এসেও হাসিন জাহান প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মকে অনেকটাই উপেক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে। আগের তীব্রতার পরিবর্তে শান্ত স্নিগ্ধ একটা বাড়তি দীপ্তি যুক্ত হয়েছে চেহারায়। বাড়তি যেটুকু পরিবর্তন লক্ষ করলাম, দাঁত বের করে হাসলে এখন দুচোখের পাশে ত্বকে পাখির পায়ের আঁচড়ের মতো দু-একটি রেখা ফুটে ওঠে। দীর্ঘকালের ব্যবধানে এই সামান্য পরিবর্তন মোটেই আলাদা করে উল্লেখ করার মতো নয়।

কালোর ওপর জরির কাজ করা পাড়, মসলিনের সাদা একটি শাড়ি পরেছে, কালো ব্লাউজ। এখনো জাঁকিয়ে শীত পড়েনি, তবু কালো একটি শাল জড়িয়ে এসেছিল। ঘরে ঢুকেই সেটা চেয়ারের হাতলের ওপর ঝুলিয়ে রেখেছে।

হাসিনের বিয়ে হয়েছিল এক চিকিৎসকের সঙ্গে। নাটকীয়তা ছিল সেখানেও। পাত্রপক্ষের সামনে ছোট বোনকে দেখিয়ে বড় বোন শিরীন সুলতানার বিয়ে দেওয়ার একটি অপচেষ্টা করেছিল তার পরিবার। শেষ মুহূর্তে চিকিৎসক পাত্র ও তার আত্মীয়স্বজন এই প্রতারণায় ক্ষুব্ধ হয়ে বিয়ের আসর থেকেই পাত্রকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নিলে ছোট বোন হাসিনকে তার সঙ্গে বিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল পরিবার।

প্রায় বিনা আপত্তিতে সেই চিকিৎসককে বিয়ে করে চট্টগ্রাম ছেড়ে ঢাকা চলে গিয়েছিল হাসিন। এই মেয়ের মাথায় সামান্য গন্ডগোল আছে—এ সন্দেহ প্রথম থেকেই ছিল। বিয়ের ঘটনাটি শোনার পর থেকে তার পুরো পরিবারকেই একই রোগে আক্রান্ত মনে হয়েছে আমার।

বিয়ের পর মোটামুটি সুখেই সংসার করেছিল বলে জানাল হাসিন। অভাব শুধু একটিই, সন্তানাদি ছিল না। চিকিৎসক স্বামী কখনোই এর জন্য হাসিনকে দায়ী করেনি এবং অকপটে জানিয়েছিল সমস্যাটি তারই। শিরীন সুলতানার অভিশাপেই এ রকমটি হয়েছে বলে বিশ্বাস করত হাসিনের স্বামী মনসুর এবং এও বলত তার জীবন দীর্ঘায়িত হবে না। এটিও ঘটবে শিরীনের অচরিতার্থ আকাঙ্ক্ষার দীর্ঘশ্বাসের কারণেই। নিজের এই ধারণা সত্য প্রমাণ করে বছর তিনেক আগে ডা. মনসুর মারা গেছে। মৃত্যুর আগে উইল করে তার শরীরটি দান



করে গিয়েছিল মেডিকেল কলেজে। এতে আপত্তি ছিল হাসিনের। কিন্তু নিজের প্রাণহীন দেহ চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্রদের কাজে ব্যবহৃত হবে, এ রকম মহৎ ব্রতে উদ্বুদ্ধ হয়ে মনসুর তার সিদ্ধান্তে অনড় ছিল।

আমি হাসিনের প্রেমে পড়েছিলাম তার জমিয়ে কথা বলার ধরনের জন্য। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোটানার মধ্যে ফেলে দিত সে আমাকে এবং সম্ভবত আমি এ রকম একাকার হয়ে যাওয়া অনুভূতি উপভোগ করতাম। এত বছর পর আমি আবার সেই বিভ্রান্ত অবস্থার মুখোমুখি হলাম।

'আমার এই আস্তানাটি খুঁজে বের করলে কী করে?' কিছুটা ধাতস্থ হওয়ার পর আমি জানতে চাইলাম তার কাছে।

'খুব সোজা। তুমি আর্ট কলেজের শিক্ষক, সেখানে গেলে কেউ না কেউ তো শিক্ষকের বাড়িটি চিনিয়ে দেবে।'

কথা ঠিক। আমি দেবপাহাড় এলাকায় একটি বাড়ির চিলেকোঠায় একা থাকি। কলেজে যেটুকু সময় কাটে, তার বাইরে খুব একটা কোথাও যাই না। এই অগোছালো এক চিলতে ঘরেই শুয়ে বসে, বই পড়ে, ছবি এঁকে আমার দিন কেটে যায়। আমার মধ্যে বড় শিল্পী হওয়ার সম্ভাবনা দেখতেন অনেকেই। সেসব কিছুই হয়নি, এখন আমি শুধুই চারুকলা কলেজের একজন প্রবীণ শিক্ষক। বলা চলে অনাদরে অবহেলায় এক কোণে পড়ে থাকা একজন মানুষ। ছাত্রছাত্রী বা তরুণ সহকর্মীরা কেউ কেউ বাসায় আসতে চাইলে আমি এড়িয়ে চলি। কিন্তু কলেজের অফিসের পিয়ন কেরানিদের নানা কাজে এ বাসায় আসতে হয়েছে। তাদের কেউ হাসিনকে বাসা চিনিয়ে দিতেই পারে।

আবার প্রশ্ন করলাম, 'কেন এলে?'

'তুমি খুশি হওনি আমাকে দেখে?'

নিশ্চয়ই হয়েছি। হাসিনের উপস্থিতি এখনো তার চারপাশকে সচকিত করতে পারে, আনন্দময় করে তুলতে পারে। বললাম, 'হয়েছি। কিন্তু তার চেয়েও বেশি অবাক হয়েছি।'

এবার কাজের কথায় আসতে চাইছে বোঝা গেল হাসিনের কথায়। বলল, 'তুমি একটি নবজাতককে দত্তক নিতে চেয়েছ?'

বিস্মিত হই আমি। কিছুদিন আগে সংবাদপত্রের পাতায় একটি নির্মম সংবাদ দেখেছিলাম। ডাস্টবিন থেকে একটি ফুটফুটে কন্যাশিশুকে উদ্ধার করা হয়েছে। আশপাশের লোকজন সদ্যোজাত শিশুটিকে মেডিকেল কলেজে দিয়ে এসেছিল। হাসপাতালের চিকিৎসকেরা শিশুকন্যাটিকে পরিচর্যা করে সুস্থ করেছেন এবং ডাক্তার ও নার্সদের স্নেহে বেশ কটা দিন পেরিয়ে যাওয়ার পর এখন এই প্রশ্নটি সামনে এসেছে, মেয়েটির আশ্রয় মিলবে কোথায়? আমি সংসার-বিরাগী মানুষ। সংসারের স্বপ্নই দেখিনি, অপত্য স্নেহকাতরতা আমার ওপর ভর করার কোনো কারণ নেই। কিন্তু কী অজ্ঞাত কারণে একজন নার্সের কোলে হাসিমুখের শিশুটির ছবি সংবাদপত্রে দেখে অদ্ভুত খেয়াল জাগল আমার মনে। একটি মানবশিশুকে বড় করে তোলার অভিজ্ঞতা লাভ করার বাসনা হলো, এ বিষয়ে আমার এক হাজার একটি অসুবিধার কথা জেনেও এই বাসনা নিবৃত্ত করতে পারলাম না।

'তোমারটি ছাড়া আরও পাঁচটি আবেদনপত্র জমা পড়েছে তুমি জানো?'

'না।'

'সুতরাং তুমি পাচ্ছ না। এ বিষয়ে সাত দিন পর আদালতে শুনানি হবে। আদালত নিশ্চয় একজন অবিবাহিত নিঃসঙ্গ মানুষকে একটি নবজাতক সন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব দেবে না।'

এ কথার যুক্তি আছে। শিশুটিকে আমার কাছে না দেওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তাতে কী আর হবে, জীবনে এ রকম অনেক অপ্রাপ্তির অভিজ্ঞতা আমার আছে। কিন্তু শিশুটির বিষয়ে হাসিনের এত কৌতূহল কেন, ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে আমার কাছে এসেইবা এ বিষয়ে কথা বলার কী কারণ থাকতে পারে!

হাসিন বলল, 'মেয়েটিকে দত্তক নেওয়ার জন্য আমিও আবেদন করেছি। কিন্তু সমস্যা আছে। আমিও একা বিধবা মহিলা, আমাকে দেবে বলে মনে হয় না। আদালত বরং এই শিশুর দায়িত্ব নেওয়ার জন্য একটি নিঃসন্তান দম্পতিকেই উপযুক্ত মনে করবে।'

'তাহলে তো কিছু করার নেই।' হতাশ কণ্ঠে বললাম আমি।

'আছে। করার আছে। খুব সহজেই এ সমস্যার সমাধান হতে পারে। সে জন্যেই তো তোমার কাছে এলাম।'

'আমি কী করতে পারি?'

'তেমন কিছুই না, তুমি জাস্ট আমাকে বিয়ে করে ফেল। আমরা স্বামী-স্ত্রী মিলে মেয়েটিকে দত্তক চাইব।'

আমি হাঁ করে তাকিয়ে থাকি হাসিন জাহানের দিকে। চিরকাল এই নারীর হেঁয়ালি-তামাশা আমাকে বিভ্রান্ত করেছে। এবারও সে রকম অবস্থার মধ্যে ঠেলে দিয়ে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

'আমাকে বিয়ে করতে আপত্তি আছে তোমার? আমি বুড়ি হয়েছি বলে?...তুমিও তো এখন আর সেই যুবকটি নেই, বুড়োবুড়ির সংসার হবে। কী সমস্যা?'

হাসিন জাহানের এই এক সুবিধা। পৃথিবীর কোনো সমস্যাকেই সে গুরুতর ভাবতে অভ্যস্ত নয়।

অদ্ভুত এক ধন্দের মধ্য থেকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমিইবা এত ডেসপারেটলি মেয়েটাকে চাইছ কেন?'

এবার আমাকে আপদমস্তক কাঁপিয়ে দিয়ে হাসিন বলল, 'কারণ মেয়েটি আমার।'

'মানে?'

'মানে মেয়েটিকে জন্ম দিয়েছি আমি।'

> আদালত নিশ্চয় একজন অবিবাহিত নিঃসঙ্গ মানুষকে একটি নবজাতক সন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব দেবে না

আমার বিস্মিত হওয়ার শক্তিও যখন প্রায় নিঃশেষ, তখন নতুন একটি গল্পের অবতারণা করল হাসিন। তার মৃত স্বামী মনসুর প্রায় প্রতিদিনই স্বপ্নে দেখা দিত তাকে। দিনের আর কোনো সময়ে নয়, রাতে একাকী শয্যাশায়ী হলেই তার পাশে আসত মনসুর। প্রথম দিকে ভয় পেত, কিন্তু চিৎকার করে ওঠার শক্তি পেত না। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে নিজেকে একা বিছানায় আবিষ্কার করে ব্যাপারটা তার দুর্বল মনের কল্পনা বলে ধরে নিত এবং ভাবত পরের রাতে ওরকম আর ঘটবে না। কিন্তু পরের রাতেও ঠিক একই ঘটনা ঘটত। ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। মৃত স্বামীর সঙ্গেই রাত্রিযাপন করতে শুরু করেছিল। নিয়মানুযায়ী মৃতদেহের সৎকার করা হয়নি বলেই এমনটা হতে পারে বলে ধরে নিয়েছিল সে। একসময় বুঝতে পারল ব্যাপারটা শুধুই স্বপ্নে বাঁধা থাকছে না, কেননা মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে গেলে সে হাতে স্পর্শ করে অনুভব করেছে মনসুরের অস্তিত্ব। স্বপ্নেই একদিন তার সঙ্গম প্রার্থনা করেছে মনসুর, বলেছে, এবার সন্তান হবে, তার যাবতীয় শারীরিক ত্রুটি সেরে গেছে।

'তারপর মৃত স্বামীর সঙ্গে তোমার দৈহিক মিলনের পর তুমি গর্ভবতী হলে এবং যথাসময়ে তোমার একটি কন্যাসন্তান হলো, তাই তো?' প্রচণ্ড অসহিষ্ণুতা ও রাগ প্রকাশ পাচ্ছিল আমার কণ্ঠে।

কিন্তু একটুও উত্তেজিত না হয়ে শান্ত ও দৃঢ় গলায় সে বলল, 'হ্যাঁ, ঠিক তা-ই। গর্ভধারণের পর আর কখনো আমাকে দেখা দেয়নি মনসুর।'

'বিশ্বাস করি না'—চিৎকার করে উঠি আমি। 'তোমার এসব গালগল্প অনেক শুনেছি, দয়া করে এই আজগুবি গল্প বিশ্বাস করতে বোলো না আমাকে।'

কয়েক মুহূর্তের জন্য চুপ করে গেল হাসিন। বেদনার্ত মুখে তাকাল আমার দিকে। বলল, 'জানি কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু এটাই সত্য। প্রেগন্যান্ট হওয়ার পর স্কুলের চাকরি ছেড়েছি আমি, ঢাকা ছেড়ে এসেছি। বাপের বাড়িতে এসে আত্মগোপন করে ছিলাম, যাতে আমার শরীরের পরিবর্তন কারও চোখে না পড়ে। আমার বাবা তো বেঁচে নেই, মায়ের অনেক গঞ্জনা সহ্য করেও ভ্রূণ নষ্ট করিনি।'

'বাচ্চাটা ডাস্টবিনে এল কী করে?'

'আমিই রেখেছি। এই সন্তান নিয়ে অকূল সমুদ্রে পড়ে গিয়েছিলাম। আমার মা সন্তানসহ আমাকে বাড়িতে আশ্রয় দিতে রাজি ছিল না, তাঁরও তো আত্মীয়স্বজন, সমাজ বলে কিছু একটা আছে! নিজের বাচ্চা পরিচয় দেওয়ার তো উপায় ছিল না। ওর জন্মের দুদিন পর ক্লিনিক থেকে ফিরেই এক বিকেলে মেডিকেল কলেজের কাছে একটি নির্জন এলাকায় কাপড় মুড়িয়ে বাচ্চাটাকে ডাস্টবিনে রেখে এসেছিলাম। তবে দূর থেকে লক্ষ রাখছিলাম। যা ভেবেছিলাম, একসময় পথচলতি মানুষের কানে গেল শিশুর কান্না। একজন-দুজন করে বিস্মিত লোকের ভিড় বাড়তে থাকল। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই হই-হট্টগোল বেধে গেল। ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলাম আমিও, কেউ সন্দেহ করেনি। এক তরুণকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানোর পরামর্শটাও আমিই দিয়েছিলাম।'

হা ঈশ্বর, স্বপ্ন-সঙ্গমে মৃত স্বামীর ঔরসে সন্তান লাভের ঘটনাও বিশ্বাস করতে হবে আমাকে!

নিজেকে স্থির রাখার চেষ্টা করছিলাম। কারণ এই মহিলা আমাকেই পাগলে পরিণত করার চেষ্টা করছে কি না বুঝতে পারছি না কিছুতেই। বিকেলটা তখন অন্ধকারের দিকে গড়াচ্ছে, এই শীতের মধ্যেও ঘামতে শুরু করেছি আমি। একবার উঠে সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিলাম ঘরে, পাখাটাও ছাড়তে হলো।



হঠাৎ একটা যুক্তির ইশারা পেয়ে দীর্ঘ নীরবতা ভাঙলাম আমি, আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে জানতে চাইলাম, 'পঞ্চাশ পেরিয়ে যাওয়া বয়সে কেউ গর্ভধারণ করতে পারে? মা হতে পারে হাসিন?'

ম্লান হাসল সে। উঠে দাঁড়িয়ে ছাদের সঙ্গে লাগানো দীর্ঘ জানালাটি বন্ধ করে ফিরে এল নিজের জায়গায়। তারপর আমাকে দারুণ অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিয়ে হঠাৎ বুকের কাপড় সরিয়ে ব্লাউজ ও অন্তর্বাস খুলে ফেলল। ফর্সা, ভরাট, সুন্দর স্তন।

এই বাসাটাতে দীর্ঘকাল একা থাকি আমি। বহুতল ভবনটির বাসিন্দাদের কাছে আমার একটি পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি আছে। এখন একটি মহিলা আমার ঘরে উদোম গায়ে বসে আছে—এই দৃশ্য ছাদে পায়চারিরত কেউ যদি উঁকিঝুঁকি মেরে দেখে ফেলে তাহলে কী হবে? তা ছাড়া দীর্ঘকাল নারীসঙ্গবঞ্চিত মানুষ আমি, অস্বীকার করি কী করে এমন শারীরিক সৌন্দর্য বিহ্বল করে তুলেছে আমাকে!

কিন্তু হাসিন আগের মতোই নির্বিকার ও শান্ত। বিমূঢ় অবস্থা থেকে ফিরিয়ে আনতেই বোধ করি হাত তুলে দৃষ্টি আকর্ষণ করল আমার, তারপর নিজের ডান হাত চেপে ধরল বাম স্তনের ওপর। ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল সাদা তরল।

'এরপরও আমার মাতৃত্বকে অস্বীকার করবে?' হাহাকারের মতো শোনাল তার গলা।

ধীরে আবৃত করল বক্ষদেশ, শাড়ির আঁচলটা বুকের ওপর টেনে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ছাদসংলগ্ন আমার চিলেকোঠার জানালাটি খুলে দিয়ে এসে আবার বসল মুখোমুখি। এক ঝলক ঠান্ডা হাওয়া ঘরে ঢোকার পর কিছুটা স্বাভাবিক বোধ করছি তখন। এটুকু স্বস্তির অনুভব থেকে কথা বলার শক্তিও ফিরে পেলাম যেন।

'যা-ই বলো, মৃত স্বামীর সঙ্গে...ব্যাপারটা কিছুতেই মানতে পারছি না।' প্রায় দিশেহারা কণ্ঠে উচ্চারণ করলাম আমি।

এবার এগিয়ে এসে দুহাত চেপে ধরল আমার, অনুনয়ের সুরে বলল, 'ওটা বিশ্বাস না-ই করলে, না হয় তোমার মনের মতো একটা ব্যাভিচার বা পাপের দায় চাপিয়ে দাও আমার ওপর। তবু আমাকে বিয়ে করো, তুমি তো ভালোবেসেছিলে আমাকে...।'

আমি হাসিন জাহানের দিকে তাকিয়ে থাকি। যে দুর্লভকে না পেয়ে ভরা বসন্তের দিনগুলোতে একটি নিষ্পত্র বৃক্ষের জীবন কাটল আমার, আজ এতকাল পর নিজেই সে যখন দুহাত পেতে এসে দাঁড়িয়েছে সামনে, তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার শক্তি কি আমার আছে?





শিল্পী : শাহাবুদ্দীন আহমেদ

লেখাটি আওয়ামী লীগের ইতিহাস নিয়ে লেখা
বইয়ের তৃতীয় পর্বের একটি অধ্যায়ের অংশবিশেষ।
বইটি প্রকাশিত হবে প্রথমা প্রকাশন থেকে

মহিউদ্দিন আহমদ

রক্তাক্ত আগস্ট

ভয়ংকর একটা ঝড়ের আগে যেমন অদ্ভুত রকমের নিস্তব্ধতা থাকে, যেন মনে হয় কোনো বাতাস নেই, গাছের একটা পাতাও নড়ছে না, চারদিকে অস্বস্তিকর একটা গুমোট ভাব—বাংলাদেশের অবস্থা তেমনি দাঁড়িয়েছিল পঁচাত্তরের মাঝামাঝি। চারদিকে বাকশাল নিয়ে কৃত্রিম মাতামাতি, ক্যাম্পাসে-রাজপথে কোনো মিছিল নেই, বিক্ষোভ নেই। পল্টনে জনসভা হয় না।

আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব এটা বুঝতে অক্ষম ছিল যে মানুষ তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। বাকশাল নিয়ে ঢাকঢোল পেটানো এবং তাতে যোগ দেওয়ার ডামাডোলে সাধারণ মানুষের মনের রক্তক্ষরণ আওয়ামী নেতৃত্ব না বুঝলেও সচেতন মানুষের চোখে তা ধরা পড়েছিল। সিপিবির এক মূল্যায়নে এর প্রতিফলন দেখা যায় :

> বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ এ দেশের জনগণের জাতীয় স্বাধীনতার জন্য মূল ভূমিকা পালন করেছিল। তাই স্বাধীনতার পর জনগণ তাঁদের কাছে অনেক কিছু আশা করেছিল। এটা ঠিক যে একটা নতুন জাতি ও রাষ্ট্র গড়ে তোলা, বিশেষত যুদ্ধবিধ্বস্ত অবস্থা থেকে, অত সহজ ও স্বল্পকালের ব্যাপার নয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে গরীব মেহনতি, স্বল্পবিত্ত, মধ্যবিত্ত প্রভৃতি সীমিত আয়ের লোকজন একশ্রেণির ধন-পিচাশের কারসাজিতে আগাগোড়াই নিষ্পেষিত হয়েছিল। স্বাধীনতার পর জনগণের ঘরে স্বাধীনতার সুফল কখনোই পৌছেনি। বরং দুঃখ-কষ্ট ও সংকটই বৃদ্ধি পেয়েছে।...সাধারণ মানুষের ভাগ্য যখন ক্রমে অবনতির দিকে যাচ্ছিল, তখন শাসক দলের একাংশসহ মুষ্টিমেয় 'সৌভাগ্যবান' ব্যক্তির ধনস্ফীতি ঘটছিল। জনগণ এই অবস্থার অবসান কামনা করতে শুরু করেছিল।

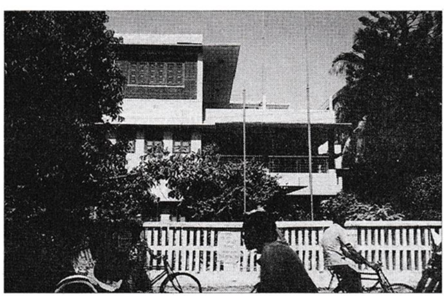
ভারতবিরোধিতা এবং সরকার তথা শেখ মুজিববিরোধিতা তখন প্রায় সমার্থক হয়ে গিয়েছিল। ওই সময়ের পরিস্থিতির একজন নিবিড় পর্যবেক্ষক ছিলেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের উপহাইকমিশনার জে এন দীক্ষিত। বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কে টানাপোড়েন তাঁর নজর এড়ায়নি। তাঁর মতে, এর দায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানেরও। ভারতের সঙ্গে একটা ইতিবাচক সমীকরণ তৈরির মাধ্যমে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করতে শেখ মুজিব ব্যর্থ হয়েছেন। একই সঙ্গে বিরোধী দলের প্রতি তাঁর কর্তৃত্ববাদী মনোভাব অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি করেছিল।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী কামাল হোসেনের মতে, ভারতবিরোধিতার পেছনে ভারতেরও দায় ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারত বাংলাদেশকে সাহায্য করলেও ভারত সরকারের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন যাঁরা অখণ্ড পাকিস্তানকেই ভারতের জন্য সুবিধাজনক মনে করতেন। ১৬ ডিসেম্বর (১৯৭১) পাকিস্তানি সৈন্যদের আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের আয়োজন নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল। পাকিস্তানি অস্ত্রশস্ত্র বাংলাদেশ থেকে ভারতে নিয়ে যাওয়া, ফারাক্কা বাঁধ ও গঙ্গার পানি বণ্টনের সমস্যা, সমুদ্রসীমা নিয়ে বিরোধ, এসব বিষয় তাদের হাতকেই শক্তিশালী করেছিল, যারা বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সুসম্পর্ক চায়নি।

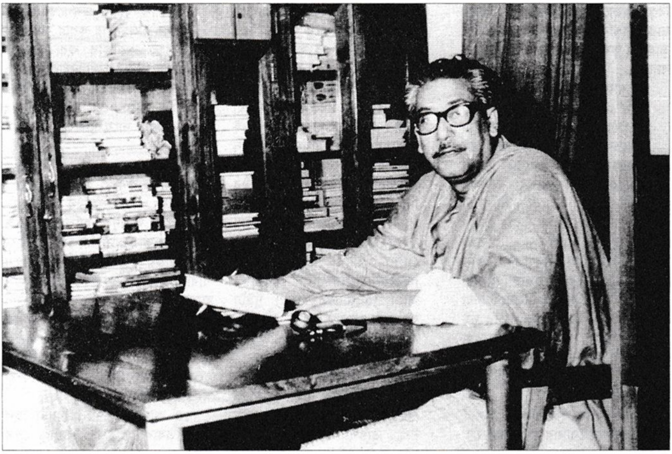
জাসদ জন্মলগ্নেই সরকার উৎখাতের ঘোষণা দিয়েছিল। তারা একটা 'বিপ্লবের' লক্ষ্যে নিজেদের সংগঠিত করছিল। তৈরি করেছিল 'বিপ্লবী গণবাহিনী'। এর পাশাপাশি চলছিল সামরিক বাহিনীর মধ্যে 'সর্বহারা শ্রেণির মুক্তির আদর্শে উদ্বুদ্ধ কর্মী সৃষ্টির প্রক্রিয়া'। এই প্রক্রিয়ার একপর্যায়ে সামরিক বাহিনীর মধ্যে গড়ে তোলা হয় 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা'। এই সংগঠন 'দেশের সকল সেনানিবাসে ও ছাউনিগুলোতে অত্যন্ত সঙ্গোপনে এবং দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে যেতে থাকে।'

১৯৭৫ সালের মার্চ মাসের এক সন্ধ্যা। হাজারীবাগ পানির ট্যাংকের কাছে বাড্ডানগরে গণি সাহেবের বাড়ির দোতলায় ঢাকা নগর গণবাহিনীর একটা সভা হচ্ছে। ওই বাড়ির ছেলে ফ ক ম ইকবাল ছিলেন জাসদের স্থানীয় কর্মী। সভায় হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেন সিরাজুল আলম খান। চুয়াত্তরের ডিসেম্বরে দেশে জরুরি অবস্থা জারি হলে তিনি কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন। তাঁর চিরপরিচিত দাড়ি-গোঁফ উধাও। এক হাতে শিখদের মতো স্টেইনলেস স্টিলের বালা। গণবাহিনীর অস্ত্রের মজুত নিয়ে কথাবার্তা হলো। তিনি আশ্বস্ত করলেন, অস্ত্র কোনো সমস্যা নয়। কেউ একজন জানতে চাইল, অস্ত্র কোথা থেকে আসবে। তাঁর ঝটপট উত্তর, 'দরকার হলে চায়না থেকে আনব। তোমাদের কত লাগবে।' এরপর তিনি আবার কলকাতা চলে গেলেন। অস্ত্রের তালিকা নিয়ে গণবাহিনীর আঞ্চলিক কমান্ডাররা সীমান্তের ধারেকাছের জেলাগুলোতে বসে থাকলেন। শুধু গণবাহিনীর ফিল্ড কমান্ডার লে. কর্নেল (অব.) আবু তাহের ও ডেপুটি কমান্ডার হাসানুল হক ইনু রয়ে গেলেন ঢাকায়। দলের কেন্দ্রীয় ফোরামের অন্যতম প্রধান নেতা কাজী আরেফ আহমেদ পরে বলেছিলেন, 'আরে মিয়া অস্ত্রের অর্ডার তো হয়েই গিয়েছিল ইন্ডিয়ার অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিতে, সিল-ছাপ্পর ছাড়া।' নভেম্বরের দিকে অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা ছিল।

গণবাহিনীর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দুটো। শেখ মুজিবকে ক্রমাগত চাপে রাখা এবং অন্য কোনো বামপন্থী গ্রুপ যেন সুযোগ না নিতে পারে, তার খেয়াল রাখা। ২৬ মার্চ ১৯৭৫ ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল, যেখানে শেখ মুজিবের ভাষণ দেওয়ার কথা। গণবাহিনীর ঢাকা নগর শাখার কমান্ডার আনোয়ার হোসেন সিদ্ধান্ত দিলেন, শেখ মুজিবের সভা পণ্ড করতে হবে। 'ডানো' দুধের পাঁচ পাউন্ডের কৌটা ব্যবহার করে ৭০টা বোমা বানানোর আয়োজন করা হলো। পরিকল্পনা ছিল, পান-বিড়ি-সিগারেট, ঝালমুড়ি, আইসক্রিম



বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাড়ি



বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, নিজ পাঠাগারে

বিক্রেতা—এই ধরনের ফেরিওয়ালাদের দিয়ে মাঠের বিভিন্ন জায়গায় বোমাগুলো ফাটানো হবে। জনসভা যেদিন হবে, তার চার-পাঁচ দিন আগে ঢাকা নগর গণবাহিনীর পলিটিক্যাল কমিসার রফিকুল ইসলাম জানালেন, দলের উচ্চতর ফোরাম থেকে এই পরিকল্পনা স্থগিত রাখার নির্দেশ এসেছে। বলা হলো, সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে যে 'ষড়যন্ত্র' হচ্ছে এ সম্পর্কে একটি তথ্য দিয়েছেন তাঁর সহকারী প্রেস সচিব মাহবুব তালুকদার। একটি সরকারি গোয়েন্দা সংস্থায় কাজ করতেন তাঁর এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়। অজ্ঞাত কারণে তিনি তাঁর আসল নামটি উল্লেখ করেননি। তাঁর কাজের মধ্যে ছিল হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বিদেশিদের গতিবিধির ওপর নজর রাখা এবং মাঝেমধ্যে তাদের টেলিফোন টেপ করে সন্দেহজনক কোনো তথ্য পেলে কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো। তিনি একদিন উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'বঙ্গবন্ধুকে সরানোর গভীর ষড়যন্ত্র হচ্ছে। কয়েক দিনের মধ্যেই খারাপ কিছু একটা ঘটবে।' তালুকদার তাঁর বন্ধু রফিকুল আনোয়ারকে বিষয়টা জানালেন। তাঁরা দুজন গেলেন শেখ ফজলুল হক মণির কাছে। মণি তালুকদারের সমসাময়িক বন্ধু এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় কলকাতায় তাঁরা কিছুদিন একসঙ্গে ছিলেন। মণির সঙ্গে তাঁদের কথাবার্তা ছিল এ রকম :

ঘটনা আনুপূর্বিক বর্ণনা করলাম। মণি শুনে বলল, অ্যাবসার্ড! লোকটা মনে মনে একটা ঘটনা তৈরি করেছে।

তবু বঙ্গবন্ধুকে ঘটনাটা বলে রাখা প্রয়োজন। রফিকুল আনোয়ার বললেন।

কাল্পনিক ঘটনা তাঁকে বলে লাভ নেই। দেশে বিপ্লব ঘটেছে। বাকশাল নিয়ে আমরা খুবই ব্যস্ত। এ সমস্ত আজগুবি খবর বলে বঙ্গবন্ধুকে বিড়ম্বিত করা ঠিক না।

অগত্যা মণির অফিস থেকে ফিরে এলাম। আমাদের উভয়ের মনই ভারাক্রান্ত। রফিকুল আনোয়ার বললেন, বঙ্গবন্ধুকে তুমি সরাসরি কথাটা বলতে পার। তাঁর নিরাপত্তার ব্যাপারে তুমি চিন্তা কর জানলে খুশিই হবেন।

কাউকে আর কিছুই বলার প্রয়োজন নেই। অভিমান ভরে বললাম, এ সমস্ত আজগুবি খবর নিয়ে আমাদেরও মাথাব্যথার কোনো কারণ নেই।

এর মধ্যে মহা ধুমধামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষবর্ষের ছাত্রছাত্রীরা পালন করলেন র‍্যাগ ডে। জুন মাসের একটা দিন বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর নাচে-গানে, হইহল্লায়, উৎসবে রঙিন হয়ে উঠল। রাষ্ট্রপতির ছেলে শেখ কামাল ছিলেন কেন্দ্রীয় র‍্যাগ ডে উদ্‌যাপন কমিটির আহ্বায়ক। তাঁর নিপুণ নির্দেশনায় কোনো খুঁত ছিল না। সবাই মিলে তাঁকে তকমা দিলেন 'র‍্যাগ মার্শাল'। বিকেলে কলাভবন চত্বরে বটতলায় মঞ্চ সাজিয়ে আন্তহল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রতিযোগিতা হলো, চ্যাম্পিয়ন হলো মুহসীন হল। সন্ধ্যায় সবাই মিলে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের সবুজ চত্বরে বসে প্রজেক্টরে ছবি দেখলেন। শেখ কামাল জোগাড় করেছিলেন হিন্দি ছবি *সত্যকাম*। অনেক রাত পর্যন্ত আনন্দে মেতে থাকলেন সবাই। মনেই হলো না, দেশে কোনো সমস্যা আছে।

আগস্টের প্রথম সপ্তাহে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ শেষপর্বের পরীক্ষা শুরু হলো। ছাত্র-শিক্ষক সবাই ব্যস্ত। চ্যান্সেলর শেখ মুজিবুর রহমান ১৫ আগস্ট সকালে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবেন। সর্বত্র ঘষামাজা চলছে। একটা প্রচার ছিল যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা শেখ মুজিবের উপস্থিতিতে মহাসমারোহে বাকশালে যোগ দেবেন।

চ্যান্সেলর শেখ মুজিবের আগমন ঠেকানোর জন্য ছক কষছিলেন প্রাণরসায়ন বিভাগের লেকচারার আনোয়ার হোসেন। তিনি ছিলেন জাসদের সামরিক সংগঠন বিপ্লবী গণবাহিনীর ঢাকা নগরের কমান্ডার। শেখ মুজিবের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমন উপলক্ষ করে গণবাহিনী কিছুটা ভীতি ছড়াতে চেয়েছিল। এ বিষয়টা

বিস্তারিতভাবে উঠে এসেছে গণবাহিনীর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত কমান্ডার মোশতাক আহমেদের বয়ানে :

> আনোয়ার ভাই শিক্ষকদের একটা লিস্ট আইনা আমারে দিছে। তারপর আমি বাংলাবাজার যাইয়া এনভেলাপ কিনলাম। উনার ভাই বাহার কোথা থেকে একটা সাইক্লোস্টাইল মেশিন আনল। ওখানেই কপি করা হয়। আপিলটা বাকশালে জয়েন না করার জন্য। কারও সই ছিল না। প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টের শিক্ষকদের জন্য চিঠিগুলো আলাদা করছি। আমরা একই সময়ে সব ডিপার্টমেন্টে দিয়া আসছি। এইটা ১৫ আগস্টের দুই দিন আগে। ১৫ আগস্ট টিচাররা সবাই বাকশালে জয়েন করবে এমন একটা কথা ছিল। এটা যেন না করে।
>
> ফকিরাপুলের একটা ঢালাই কারখানায় বোমার খোল বানানো হইত। আনোয়ার ভাই আমারে একবার নিয়া গেছিল। একটা ছালার ব্যাগে ভইরা সেই খোল মোটর সাইকেলের পেছনে কইরা নিয়া গেল, মিরপুরে পাঠায়া দিল। হয়তো আরও ডেলিভারি হইছে। নিয়া তো 'নিখিল' বানানো হইছে। (বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার নিখিলচন্দ্র সাহা চুয়াত্তরের ২৬ নভেম্বর জাসদের হরতাল উপলক্ষে বোমা বানাতে গিয়ে দুর্ঘটনাজনিত বিস্ফোরণে নিহত হয়েছিলেন। তাঁর স্মরণে গণবাহিনী তাদের তৈরি বোমার নাম রেখেছিল 'নিখিল'।)
>
> ১৪ আগস্ট তো ইউনিভার্সিটিতে হাই এক্সপ্লোসিভ ফাটানো হইল। এইটা বাকশালে জয়েন না করতে থ্রেট আর কি। সায়েন্স বিল্ডিং, অ্যানেক্স বিল্ডিং, কলাভবন, ভিসির অফিসের সামনে চারটা টাইম বোমা ফাটানো হইল। ভিসির অফিসের সামনে আর কলাভবনের দায়িত্বে ছিল বাহার।
>
> আগের দিন আলাপ হইছে, আমি এলিফ্যান্ট রোডের বাসা থেকে ডেলিভারি নিব। সকালে যাইয়া আমার দুইটা ডেলিভারি নিলাম। সায়েন্স বিল্ডিং আর অ্যানেক্সের দায়িত্বে আমি ছিলাম। এসএম হলের আশরাফ ভাই আর আহসান ভাই, এই দুইজন গেছে অ্যানেক্স বিল্ডিংয়ে বোমা ফাটাইতে। কার্জন হলের সামনেরটা করছে নূর মোহাম্মদ।
>
> আনোয়ার ভাই সকালে আমারে বলল যে, তোমারে টাইম দিছি একটা-দেড়টা, ওই সময় দোয়েল চত্বরের দিকে দাঁড়াবা। হবে কি হবে না এইটা জানাব। ওই হিসাবে আমি এদেরকে সকালে জিনিস দিয়া দিছি। আমি একদম টাইমলি ওই জায়গায় আসছি। এমন বৃষ্টি! তখন রক্ষীবাহিনীতে ভরা জায়গাটা। আনোয়ার ভাই বাংলা একাডেমির দিক থেকে আইসা রিকশাটা থামাইল। এই পাশে আইসা বলল। বইলাই রিকশায় ওই দিকে চইলা গেল। আমি ওখান থেকে জিমনেসিয়ামের দিকে গেলাম। আমি গ্যালারিতে বসা। দুইটা আওয়াজ শুনলাম। আমি এদেরকে মিলিত হওয়ার জায়গা দিলাম—মেডিকেল কলেজের ক্যান্টিন। দেখলাম আশরাফ ভাই। কোনো ক্ষয়ক্ষতি নাই। আমাকে রিপোর্ট করল, কেউ ধরা পড়ে নাই। তারপর ওইখান থেকে যে যার মতো চইলা গেলাম। আমি রাত্রে মুহসীন হলে ছিলাম।

ঢাকা সেনানিবাসে লেখা হচ্ছিল নাটকের নতুন স্ক্রিপ্ট। পরিচালক সাঁজোয়া বাহিনী বেঙ্গল ল্যান্সার্সের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক মেজর দেওয়ান ইশরাতউল্লাহ সৈয়দ ফারুক রহমান এবং তাঁর প্রধান সহযোগী সেকেন্ড ফিল্ড আর্টিলারির অধিনায়ক মেজর খন্দকার আবদুর রশিদ। ফারুক চুয়াত্তর সালেই মন স্থির করেছিলেন, 'হি (মুজিব) মাস্ট গো' (মুজিবকে সরতেই হবে)।

ফারুক-রশিদ একা ছিলেন না। সরকার ও রাজনীতি সম্পর্কে সামরিক বাহিনীর মধ্যে জন্ম দিয়েছিল নেতিবাচক মনস্তত্ত্ব। এই মনস্তত্ত্বের একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিফলন পাওয়া যায় সেনাবাহিনী থেকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে অবসরে যাওয়া লে. কর্নেল আবু তাহেরের মধ্যে। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী :

> পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত আওয়ামী লীগের ভূমিকা সবারই জানা, কীভাবে একটার পর একটা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা হয়েছিল, কীভাবে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হয়েছিল। আমাদের লালিত সব আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন ও মূল্যবোধ একের পর এক ধ্বংস করা হয়েছিল। গণতন্ত্রকে অত্যন্ত নোংরাভাবে কবর দেওয়া হয়েছিল। জনগণকে পায়ের নিচে পিষে জাতির ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল ফ্যাসিস্ট একনায়কতন্ত্র।...
>
> শেখ মুজিব জনগণের নেতা ছিলেন। অস্বীকার করার অর্থ হবে সত্যকে অস্বীকার করা। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে তাঁর ভাগ্য নির্ধারণের ভার জনগণের ওপরই বর্তায়। জনগণের উচিত হবে জেগে ওঠা এবং প্রতারণার দায়ে মুজিবকে উৎখাত করা।

অদৃষ্টবাদী ফারুক ২ এপ্রিল (১৯৭৫) চট্টগ্রামের হালিশহরের বিহারি কলোনিতে আবদুল হাফিজের সঙ্গে দেখা করে তাঁর আশীর্বাদ চান। জন্মান্ধ এই ফকির 'আন্ধা হাফিজ' নামে পরিচিত। তিনি ফারুককে তিন মাস অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। এই সব কথা উঠে এসেছে পরবর্তী সময়ে ফারুক ও রশিদের সাক্ষাৎকারভিত্তিক প্রতিবেদনে। সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন লন্ডনের *সানডে টাইমস*-এর প্রতিবেদক অ্যান্থনি মাসকারেনহাস।

১৪ আগস্ট ১৯৭৫। দিনটা ছিল বৃহস্পতিবার। রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পরদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা পূর্বনির্ধারিত অনুষ্ঠানে যাবেন। দিনটা কেমন কেটেছিল? তাঁর আশপাশে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের একজন হলেন সহকারী প্রেস সচিব মাহবুব তালুকদার। তিনি ঘটনাক্রম বর্ণনা করেছেন এভাবে :

> দুপুরে তিনি ডেকেছিলেন আবদুল তোয়াব খান (রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব) ও আমাকে। বলেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা তৈরি করতে। আমি একটু বিস্মিত হয়েছিলাম, তিনি কি তাহলে লিখিত ভাষণ দেবেন? তোয়াব খান কথাটা জিজ্ঞাসা করলেন তাঁকে। তিনি বললেন, লেখা বক্তৃতা নয়, মুখেই বলব। তবে হাতের কাছে লিখিত সমস্ত ডাটা ও ইনফরমেশন থাকতে হইব।
>
> বিকালবেলা শিক্ষা সচিব এম মোকাম্মেল হক আসবেন গণভবনে। তাঁর কাছ থেকে সব তথ্য সংগ্রহ করে একটা খসড়া তৈরি করার নির্দেশ দিলেন প্রেস সচিব। আমি নির্ধারিত সময়ে শিক্ষা সচিবের জন্য অপেক্ষা করছি। তিনি যথাসময়ে আসছেন না দেখে আমার উদ্বেগ বাড়ল। তথ্যাদি না পেলে বক্তৃতাই বা তৈরি করব কেমন করে?
>
> ইতোমধ্যে এল দুঃসংবাদ। রামগতিতে ভারতীয় বিমানবাহিনীর একটি হেলিকপ্টার ভেঙে পড়েছে। নিহত হয়েছেন কয়েকজন ভারতীয় সৈনিক। বিষয়টি নিয়ে ভারতীয়

দূতাবাসের সঙ্গে আমাদের কিছুটা মতদ্বৈধতা দেখা দিয়েছে। ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত জে এন দীক্ষিত বলছেন, সংবাদটা পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া ঠিক হবে না। আবদুল তোয়াব খান বললেন, আলাপ-আলোচনার পরে এ বিষয়টির সিদ্ধান্ত জানানো হবে। এ নিয়ে প্রেস সচিব অত্যন্ত পেরেশানিতে পড়ে গেলেন।

সন্ধ্যার পরপরই বঙ্গবন্ধু ৩২ নম্বরের বাসভবনে চলে গেছেন। তাঁকে বলেছিলাম, আজ সন্ধ্যায় ফরাসউদ্দীনের ফেয়ারওয়েল ডিনার।

হ, জানি। বঙ্গবন্ধু বললেন, তার মানে আমারে এখনই ছুটি দিলা তোমরা। মৃদু হেসে বললেন, ফরাসের ডিনারে তো আমি থাকতে পারি না।

বঙ্গবন্ধু বাসায় চলে যাওয়ার পরপর শিক্ষা সচিবের ফোন এল। জানালেন, কিছুটা অসুস্থ বোধ করছেন। এ অবস্থায় তিনি গণভবনে আসতে অপারগ। তথ্যগুলো টেলিফোনে লিখে নিতে অনুরোধ করলেন। তিনি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এবং এই নির্দেশ শিরোধার্য। টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে তিনি আমাকে ডিকটেশন দিতে থাকলেন। আমি যাবতীয় তথ্য লিখে নিলাম। আমার উদ্বেগ কিছুটা প্রশমিত হল।

আবদুল তোয়াব খান রামগতির ঘটনা নিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন। পরে তাঁর মনে হলো, এই সিদ্ধান্তটা বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে আসা প্রয়োজন। তিনি ফোন করলেন বঙ্গবন্ধুকে। বঙ্গবন্ধু বললেন, তুমি আমার অফিসে গিয়া রেড টেলিফোনে আমারে ফোন কর।

তোয়াব খান বঙ্গবন্ধুর অফিস কক্ষে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর ফিরে এলেন তিনি। কি কথা হয়েছে আমি জানি না। এর মধ্যে আবার ভারতীয় দূতাবাস থেকে ফোন এল।

তোয়াব খান জানালেন, দুর্ঘটনার খবর পত্রিকায় জানাতে হবে। নইলে দেশবাসীর মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে।

ভারতীয় ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত জানালেন, তিনি বিষয়টি সম্পর্কে দিল্লীর সঙ্গে কথা বলেছেন।

প্রেস সচিব বললেন, আমরা উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এমতাবস্থায় আমাদের সিদ্ধান্ত বহাল থাকবে।

প্রেস সচিব যখন বঙ্গবন্ধুর কক্ষে কথা বলতে গেছেন, ঠিক তখনই তাঁর ঘরের টেলিফোন বাজল। রাত ৯টা হবে। ফোন ধরে বুঝতে পারলাম তথ্য প্রতিমন্ত্রী তাহেরউদ্দীন ঠাকুর। তিনি বললেন, এত রাতে কি করছ ওখানে?

বললাম, অফিসের কাজ করছি। আগামীকাল বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবেন, তাঁর বক্তৃতা তৈরি করছি।

তোয়াব সাহেব কোথায়?

তিনি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে গেছেন তাঁর অফিস ঘরে।

ওখানে কেন?

রেড টেলিফোনে কথা বলছেন। বললাম, তুমি একটু লাইনে থাক। আমি তোয়াব ভাইকে ডাকছি।

না, দরকার নেই। তাহেরউদ্দীন ঠাকুর ফোন ছেড়ে দিলেন।

প্রেস সচিব ঘরে ফিরলে আমি তাকে তথ্য প্রতিমন্ত্রীর ফোনের কথা বললাম। তিনি বললেন, প্রয়োজন হলে তিনি আবার ফোন করবেন।

আমি নিজের অফিসে এলাম। ঘড়িতে রাত প্রায় সাড়ে ৯টা। লেখায় আবার ব্যস্ত হয়ে পড়লাম আমি। এরই মধ্যে ডিএফআই-এর নব নিযুক্ত চীফ কর্নেল জামিল আমার ঘরে এলেন। বললেন, আপনারা পেয়েছেন কি? সবাই খাবার সামনে নিয়ে আপনাদের অপেক্ষায় বসে আছেন। ওদিকে তোয়াব সাহেব কি নিয়ে ব্যস্ত, এদিকে আপনিও লেখায় ব্যস্ত।

বললাম, জামিল ভাই, আপনি যান। আমি এখনই আসছি।

কর্নেল জামিল চলে গেলেন। সত্যি অনেক দেরি হয়ে গেছে। রাষ্ট্রপতির একান্ত সচিব ফরাসউদ্দীনের বিদেশ যাত্রা উপলক্ষে বিদায়ী নৈশভোজ। তাড়াতাড়ি কাগজপত্র ঠেলে রেখে উঠে পড়লাম। নৈশভোজে গিয়ে আমি বসলাম কর্নেল জামিলের পাশে। খেতে খেতে তাঁর সঙ্গে গল্প করলাম।

রাত ১১টার পর অফিস ছেড়েছি।...বাসায় এসেও কাজের কমতি নেই আমার।...আবার বসলাম বক্তৃতার খসড়া নিয়ে।...রাত প্রায় দেড়টায় আমার কাজ শেষ হলো।

মাহবুব তালুকদারের বর্ণনায় জানা যায়, ১৪ আগস্ট গণভবনে সবাই মিলে অনেক রাত পর্যন্ত খানাপিনা ও গল্পে মশগুল ছিলেন। বঙ্গবন্ধু সেখানে ছিলেন না। রাত ৯টায় ফোন করে তাহেরউদ্দিন ঠাকুর নিশ্চিত হয়েছিলেন যে রাষ্ট্রপতি তাঁর বাসায় আছেন। গণভবনে বঙ্গবন্ধুর আস্থাভাজন কর্মকর্তারা যখন নির্ভার সময় কাটাচ্ছেন, তার কয়েক কিলোমিটার দূরে কুর্মিটোলায় সেনাবাহিনীর এক মেজর তার সৈন্যদের নিয়ে একটা অভিযানের ছক সাজাচ্ছেন।

বেঙ্গল ল্যান্সার্সের নিয়মিত প্রশিক্ষণ মহড়া হয় মাসে দুবার, বৃহস্পতিবার রাতে। ১৪ আগস্ট ১৯৭৫ ছিল বৃহস্পতিবার। রাত ১০টায় ফারুক ও রশিদ অসমাপ্ত কুর্মিটোলা বিমানবন্দরের টারমাকে গেলেন। রাত ১১টায় উপস্থিত হলেন মেজর শরিফুল হক ডালিম, মেজর আজিজ পাশা এবং ক্যাপ্টেন বজলুল হুদা। ডালিম এবং পাশা সেনাবাহিনী থেকে আগেই অপসারিত হয়েছিলেন। ফারুক ও রশিদের


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলারের শুভাগমন উপলক্ষে বিশেষ ক্রোড়পত্র

১৫ আগস্ট *দৈনিক বাংলায়* শেখ মুজিবের আগমন উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর আট পৃষ্ঠার ক্রোড়পত্র ছাপা হয়েছিল

১৫ আগস্টের ঘাতকেরা


সৈয়দ ফারুক রহমান


শাহরিয়ার রশীদ খান


শরিফুল হক ডালিম

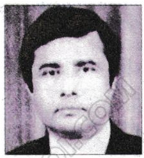

আবদুল আজিজ পাশা


বজলুল হুদা


নূর চৌধুরী

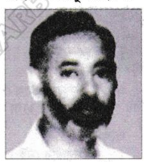

মোসলেহউদ্দিন খান

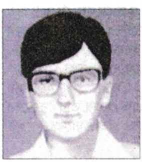

কিসমত হাশেম


আহমেদ শরিফুল হোসেন


রাশেদ চৌধুরী


মহিউদ্দিন আহমেদ


খন্দকার আবদুর রশীদ


নাজমুল হুসেন আনসার


আবদুল মাজেদ


মহিউদ্দিন আহমেদ

বাহিনীর সদস্যদের মধ্য থেকে ৭৫ থেকে ১৫০ জনের তিনটি দল তৈরি করা হলো। একটি দল নিয়ে ডালিম গেলেন ইস্কাটনে আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাড়ির উদ্দেশে। একটি দল নিয়ে রিসালদার মুসলেহউদ্দিন গেলেন ধানমন্ডিতে শেখ ফজলুল হক মণির বাড়ির দিকে। মেজর মহিউদ্দিন ও সাবেক মেজর নূর চৌধুরীর নেতৃত্বে ১২০ জনের তৃতীয় দলটি গেল ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বরে শেখ মুজিবের বাড়ির দিকে। ফারুক ট্যাংকের বহর নিয়ে ভোর ৪টা ৪০ মিনিটে রওনা হলেন শেরেবাংলা নগরে অবস্থিত রক্ষীবাহিনীর সদর দপ্তরের দিকে। মাত্র দুটো ট্যাংক নিয়ে তিনি পৌঁছালেন শেরেবাংলা নগরে। ট্যাংকে কোনো গোলা ছিল না। ভোর সোয়া পাঁচটায় ঢাকার তিনটি বাড়ির মানুষেরা আক্রান্ত হন। ভোর ৫টা ৪০ মিনিটে শেখ মুজিবের বুক ঝাঁঝরা করে দেয় ঘাতকের বুলেট। নিহত হন তাঁর পরিবারের সবাই, যাঁরা ওই দিন ওই বাড়িতে ছিলেন। ডালিম বেতারে ঘোষণা দেন, 'আমি মেজর ডালিম বলছি। খোন্দকার মোশতাক আহমেদের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বীর সশস্ত্র বাহিনী দেশের সর্বময় ক্ষমতা গ্রহণ করেছে। শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে। স্বৈরাচারের পতন হয়েছে।' রশিদ বাণিজ্যমন্ত্রী খোন্দকার মোশতাক আহমদের বাসায় যান এবং তাঁকে শাহবাগে ঢাকা বেতার কেন্দ্রে নিয়ে আসেন। মোশতাককে নতুন রাষ্ট্রপতি হিসেবে বেতারে ঘোষণা দেওয়া হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে যারা গণবাহিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁরা ছিলেন সবাই 'ফুট সোলজার'। তাঁদের যেভাবে নির্দেশ দেওয়া হতো, তাঁরা তা তামিল করতেন। ১৫ আগস্ট সকালে হত্যাকাণ্ডের খবর শুনে তাঁরা হকচকিত হয়ে পড়েন। গণবাহিনীর মোশতাক আহমেদের বর্ণনা থেকে জানা যায় :

> মুহসীন হলে গণবাহিনীর আমি, নূর মোহাম্মদ, ফখরুল, বাছেত, তাজুল ভাই এই রকম ছয়জন ছিলাম। আমরা রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের সামনে দিয়া, দশটা-টশটার দিকে হবে, হাঁটতেছি। আমরা তো ফার্স্ট ইয়ারের। দুইজন সেকেন্ড ইয়ারের। কী হইছে বুঝতেছি না। আমাদের সাথে কেউ যোগাযোগ করতেছে না। এইটুকু আমরা বুঝছি যে খারাপ কিছু। হলে আইসা এক রুমে আমরা শুইয়া রইছি। কখন কী অর্ডার আসে। তখন এমন ছিল, বলার সাথে সাথে নাইমা যাইতাম।
>
> আবু আলম ভাই আমাদের সাথে শুরুতে ছিলেন, ইউনিভার্সিটির কমান্ডে। আবু আলম সাসপেন্ড, অব্যাহতি আর কি। ১৫ আগস্টের সময় আমি কমান্ডার। আমি ফার্স্ট ইয়ারের ছেলে। অন্যরা সিনিয়ার। আনোয়ার ভাই এমনভাবে দায়িত্ব দিছে, সিনিয়ার-জুনিয়ার না বুইঝাই। পরে আনোয়ার ভাই দুইটা-আড়াইটার দিকে যোগাযোগ করছে। বাচ্চুরে দিয়া ইনফরমেশন পাঠাইছে একটা চিঠি দিয়া। (মীর নজরুল ইসলাম বাচ্চু ২৬ নভেম্বর ১৯৭৫ ভারতীয় হাইকমিশনে একটা অভিযান চালানোর সময় নিহত হন।) অবান্তব চিঠি। লেখছে যে, 'অবস্থা ভালো। সব রকম চেষ্টা

চলছে। স্বর্ণ এবং অস্ত্র জোগাড়ের চেষ্টা কর।' মানে এগুলা কোথাও থিকা পাইলে নিয়া নাও। সেন্সটা এই। এলিফেন্ট রোডে যোগাযোগ করতে বলল।

এলিফেন্ট রোডে গেলাম। যাইয়া দেখি যে, ইউসুফ ভাইয়ের (কর্নেল তাহেরের বড় ভাই বিমানবাহিনীর সাবেক সার্জেন্ট আবু ইউসুফ) বাসায় এক জিপ আর্মি। এখানে আর্মি ঢুকে কেন? আমি ব্যাক কইরা মেইন রোডের দিকে চইলা আসতেছি। বাহার বাসা থিকা দৌড়ায়া আইসা আমারে জড়ায়া ধরল। আর্মিদের সামনেই নিয়া গেল। ভিতরে বসলাম। দেখলাম আনোয়ার ভাই আসল। আর্মিও কয়েকজন বসা। আমি তো বুইঝা উঠতে পারতেছি না, আর্মি এখানে কেন? তখন আনোয়ার ভাই বলল যে, সব জায়গায় যাইয়া খবর দাও। আমি বললাম, সব জায়গায় মুভ করতে করতে তো সন্ধ্যা হইয়া যাবে? পাঁচটা থেকে তো কারফিউ? কী করি? মিলিটারিরা বলল, স্যার একটা চিঠি লেইখা দিবে। স্যার মানে কর্নেল তাহের। তাহের ভাইয়ের সঙ্গে আমার দেখা হয় নাই। আনোয়ার ভাই বলল যে, ধরা পড়লে বলবা কর্নেল তাহেরের লোক। উনি মিলিটারিদের সামনেই আমাদের সাথে কথা বলছে।

১৫ আগস্টের অভ্যুত্থান ও হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে খোন্দকার মোশতাকের যোগাযোগের মাত্রা নিয়ে বিভ্রান্তি রয়ে গেছে। তিনি কি আগে থেকেই সব জানতেন? তিনি কি এই পরিকল্পনার অংশ ছিলেন? তার আগামসি লেনের বাড়ির উল্টো দিকের বাড়িতে থাকতেন ফজলুল হক খান মনা। ১৫ আগস্ট সকালে মোশতাক ওই বাড়িতে গিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে মনার ছোট ভাই নাসির খান ধিলেনের বিবরণ কৌতূহল জাগায়:

'রাজু (ধিলেনের ভগ্নিপতি), কাজটা কেমন হইল' (মোশতাকের প্রশ্ন)? মোশতাক সাব তো গেঞ্জি পরা, স্যান্ডেল পরা, লুঙ্গি পরা। 'তোমরা সব চইলা যাও।' সামনে যুবলীগের (স্থানীয়) প্রেসিডেন্ট বসা। মর্নিং ওয়াক করতে যাবেন। ভোরবেলা তো? মোশতাক দশ মিনিটের মতো ছিল। আসছিল ফোন করতে। নিজের বাড়ি থিকা ফোন করব ক্যান? ওর (মনার) বাড়ি থিকা করব। এইটা আমি জানি না, কোন জায়গায় ফোন করছে। শেভ-শুভ



খোন্দকার মোশতাক আহমেদ

কইরা বাইর হইছে। মোশতাক সাব যে প্রেসিডেন্ট হইছে এইটা আমি জানতাম না তো? লোকজন কইল, মোশতাক সাব তো প্রেসিডেন্ট! আরে শালা, এইটা ক্যামনে হয়? আর্মি-টার্মি আইসা স্যালুট দিয়া নিয়া গেল, সাড়ে সাতটা-পৌনে আটটার সময়।

মেজর ডালিমের বেতার ঘোষণার কিছুক্ষণ পরেই কয়েকজন সাবেক সেনা কর্মকর্তা শাহবাগের বেতার ভবনে আসেন। তাঁরা এসেছিলেন পরিবর্তনের পক্ষে সমর্থন ও সাহায্য দিতে। এদের মধ্যে ছিলেন আবু তাহের, আকবর হোসেন, শাজাহান ওমর, জিয়াউদ্দিন, রহমতউল্লাহ এবং মাজেদ।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ড্রেজার বিভাগের পরিচালক লে. কর্নেল (অব.) আবু তাহের ভোর পাঁচটায় তাঁর বাবুর্চি মোতালেবকে আদেশ দেন গাড়িচালক গিয়াসউদ্দিনকে তাঁর নারায়ণগঞ্জের বাসায় ডেকে আনতে। গিয়াসউদ্দিন আসার পর নারায়ণগঞ্জে ডিসি অফিসসংলগ্ন একটি সেনা ক্যাম্প থেকে সেনাবাহিনীর গাড়ি ও লোকজন নিয়ে তাহের ঢাকা রওনা হন। পথে পুরোনো ঢাকার একটা বাড়ি থেকে তাঁর সহকর্মী হাসানুল হক ইনুকে সঙ্গে নেন। বেতার কেন্দ্রে আসার পর মেজর ডালিম ছুটে এসে তাঁকে সালাম করেন এবং বেতারে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করেন। গণবাহিনীর ঢাকা নগরের কমান্ডার আনোয়ার হোসেনও বেতার কেন্দ্রে হাজির হয়েছিলেন।

ডালিমের ভাষ্য অনুযায়ী, বামপন্থী অনেক রাজনৈতিক দল, বিশেষ করে জাসদ চাচ্ছিল একটি বিপ্লবী সরকার গঠন করে তাদের দলীয় কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে। কিন্তু অভ্যুত্থানকারীরা তাতে সায় দেয়নি। ১৫ আগস্ট সকালে আবু তাহের নিজেই খোন্দকার মোশতাক আহমদকে কয়েকটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন। প্রস্তাবগুলোর মধ্যে ছিল অবিলম্বে সামরিক আইন জারি করা, সংবিধান বাতিল করা, রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া এবং বাকশালকে বাদ দিয়ে একটি সর্বদলীয় জাতীয় সরকার গঠন করা।

সেনাবাহিনীর সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট মোহাম্মদ মারুফ রশীদ ১৯৭৫ সালের জানুয়ারিতে বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি থেকে কমিশন পান। ১৫ আগস্ট রাতের ট্রেনে ছুটিতে সিলেটে তার বাড়ি যাওয়ার কথা ছিল। ১৪ তারিখ রাতে ঢাকার মগবাজারে দিলু রোডে তার বন্ধু ফাইসন্সের কর্মকর্তা আবদুল মুনিম ফারুকের ভাড়া বাড়িতে তিনি তাস খেলছিলেন। সঙ্গে আরও ছিলেন ব্যবসায়ী ইফতেখার হোসেন শামীম, ফাইসন্সের কর্মকর্তা আবদুর রহমান এবং সিলেটের জাসদ নেতা শওকত। তাঁরা প্রায়ই এ রকম আড্ডা দিতেন। মারুফ রশীদ ওই রাতের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে:

আমরা সারা রাত তাস খেলি। হঠাৎ গোলাগুলির আওয়াজ। ভাবলাম, বঙ্গবন্ধু ইউনিভার্সিটিতে যাবেন, ছেলেরা হয়তো আনন্দে পটকা ফাটাচ্ছে। পরে জেনেছিলাম ইস্কাটনে মন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাসায় গুলি চলেছিল। মুনিম ফারুকের সকাল সকাল অফিসে যাওয়ার কথা। তখনো গাড়ি আসেনি দেখে সে মেইন রোডে গেল গাড়ির খোঁজে। রাস্তার ধারে লোকজন রেডিও শুনছে। খবরটা শুনে বাসায় ফিরে মুনিম বলল, 'ঘরে থাকেন।' আমি আইডি কার্ডটা পকেটে নিয়ে বের হলাম। হাঁটতে হাঁটতে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের ভেতরে গিয়ে দেখি বিদেশি কয়েকজন সুইমিংপুলে সাঁতার কাটছে। বেরিয়ে রাস্তার মোড়ে এসে দেখলাম ট্যাংক যাচ্ছে রেডিও স্টেশনের দিকে। আমি এগোলাম। ওখানে সেকেন্ড লেফটান্যান্ট কিসমত হাশেম এবং আনসারকে দেখলাম। মেজর শাহরিয়ার রশিদ সিভিল ড্রেসে কাঁধে স্টেনগান ঝুলিয়ে হাঁটাহাঁটি করছেন। আমাকে দেখেই ধমকে উঠলেন, 'সিভিল ড্রেসে কেন, ইউনিফর্ম পরে আসো।' উনি বিএমএতে ফিজিক্যাল ট্রেনিং স্টাফ অফিসার ছিলেন, আমাকে চিনতেন। ভেবেছিলেন আমি তাঁদের গ্রুপেরই



বঙ্গবন্ধু-হত্যার পর রাস্তায় নামানো হয় ট্যাংক

লোক।

আমি ভেতরে ঢুকতেই করিডরে দেখলাম খোন্দকার মোশতাক। আমাকে দেখেই বললেন, 'ওয়েল ডান মাই বয়।' তিনিও ভেবেছিলেন, আমি এই দলেরই একজন।

সেনাবাহিনীর লোকদের নাশতা নিয়ে সেকেন্ড ফিল্ড আর্টিলারির একটা ট্রাক এল। পুরি আর এক মগ চা খেলাম। একটা সিগারেট ধরাতে যাচ্ছি, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট জামান বললেন, 'কী ক্যাপস্টেন খাও?' এই বলে একটা বেনসন দিলেন। ওনার বাবা সিলেটে জেইলার ছিলেন, ভালো পরিচয় আছে।

ওই সময় কর্নেল আবদুর রহমান ও মেজর মাসুদ জহির একটা গাড়িতে ক্যান্টনমেন্টে যাচ্ছিলেন। আমি ওদের সঙ্গে গেলাম। তারপর আমি হেডকোয়ার্টার্সে নেমে হাঁটতে হাঁটতে সিগন্যাল মেসে এলাম। ইউনিফর্ম পরে নিলাম। মেজর ফজলুল হকের ভেসপা ছিল। ওটা নিয়ে আমরা আবার গেলাম রেডিও স্টেশনের দিকে। পৌছাতেই দেখি একটা গাড়ি থেকে কর্নেল তাহের নামছেন। ফজলুল হকের শার্টে প্যারাট্রুপারের ব্যাজ ছিল। কর্নেল তাহের তা লক্ষ করে বললেন, 'তুমি কখন প্যারা করেছ?' ফজলুল হক জবাবে বললেন, 'স্যার, আপনি যখন ইনস্ট্রাক্টর ছিলেন।' 'গুড, গুড', বলে তিনি ভেতরে ঢুকলেন।

ভেতরে গিয়ে করিডর দিয়ে হাঁটছি। একটা বন্ধ দরজা, দরজায় গোল গ্লাস, ভেতরটা এক ঝলক দেখলাম। খোন্দকার মোশতাক বসে আছেন। তাঁর পাশে দাঁড়ানো সফিউল্লাহ, জিয়া ও খালেদ মোশাররফ। খালেদ কনুই দিয়ে জিয়াকে একটা গুঁতো দিলেন। তাঁর বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে মনে হলো, বলছেন, 'দেখো দেখো, সফিউল্লাহ কেমন কাঁদছে।' সফিউল্লাহ আসলেই কান্না কান্না ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

সিগন্যাল মেসে ফিরে নাশতা করে অফিসে গেলাম। আমার সিও ছিলেন লে. কর্নেল বাহার। তিনি মিটিং ডাকলেন। অপারেশনাল অর্ডার দিলেন, এক প্লাটুন সৈন্য নিয়ে টিঅ্যান্ডটি সিকিউর করতে মেজর মুসাকে পাঠালেন রমনা এক্সচেঞ্জে। থার্ড গেটের (জাহাঙ্গীর গেট) সামনে দেখলাম রাস্তার ওপর দাঁড়ানো সানগ্লাস চোখে মেজর ফারুক, প্যান্টের পকেটে দুহাত রেখে দাঁড়িয়ে আছেন বীরের মতো। জেড ফোর্সের লোকেরা আর রিপ্যাট্রিয়েটেরা খুব ফুর্তিতে ছিল।

শেখ মুজিবকে নিয়ে দলের মধ্যে যে মাতামাতি ছিল, আগস্ট অভ্যুত্থানের পর নিমেষে তা উধাও হলো। সবকিছু যেন আমূল পাল্টে গেল। যাঁরা এত দিন তাঁর নামে জয়ধ্বনি দিয়েছিলেন, তাঁরা কেউ গর্তে লুকালেন, কেউ খুশিতে ডগমগ হলেন, কেউবা নির্লিপ্ত হয়ে গেলেন। এই অভ্যুত্থানের সঙ্গে পঞ্চাশের দশকে ইরাকের সামরিক অভ্যুত্থানের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবদাল করিম কাসেম রাজা ফয়সলকে ১৯৫৮ সালের ১৪ জুলাই ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন। রাজা, তাঁর স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, মা এবং খালাকে এক সারিতে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। অথচ এর কয়েক সপ্তাহ আগে রাজা যখন কারবালায় ইমাম হুসেনের সমাধি দেখতে গিয়েছিলেন, তখন পথে জনতার ঢল নেমেছিল তাঁকে একনজর দেখতে। মানুষের ভিড়ে রাজার গাড়ি এগোতে পারছিল না। জনতা তখন গাড়িটি হাত দিয়ে তুলে সমাধির কাছে নিয়ে গিয়েছিল। তবে ইরাকে এ ধরনের ঘটনা এটাই প্রথম না। ইমাম হুসেন যখন বাগদাদের পাশ দিয়ে কারবালার দিকে যাচ্ছিলেন, তখনো বাগদাদের সব মানুষ ইমামের সমর্থনে পথে নেমে এসেছিল। তিনি সবাইকে নিয়ে নামাজ পড়তে দাঁড়ালেন। নামাজ শেষে দেখা গেল, বাগদাদের মানুষের মন বদলে গেছে। তারা সবাই চলে গেছে। এটা ইরাকে প্রচলিত একটা লোকগাথা। কিন্তু এই কাহিনি একটা বার্তা দেয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব অনেককেই নেতা বানিয়েছিলেন। কিন্তু বিপদের সময় তাঁরা কেউ কাজে আসেননি। তাঁর অবর্তমানে সামরিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের অক্ষম আহাজারি ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি। জাতীয় রক্ষীবাহিনীর উপপরিচালক সরোয়ার হোসেন মোল্লা ১৫ আগস্টে তাঁর সারা দিনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন এভাবে :

> জেনারেল সফিউল্লাহর কাছে আমরা অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলাম। সেনাবাহিনী প্রধান হিসেবে উনি কী পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছেন এবং আমাদের কী করা উচিত সে ব্যাপারে কোনো নির্দেশনা দিতে পারেন কি না। উত্তরে সফিউল্লাহ বললেন, 'আমি কর্নেল শাফায়াত

জামিলকে পাচ্ছি না।'...'আমি একটু পরে তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করব।' পরে আর কোনো যোগাযোগ হয়নি।...

যা হোক, এরপর আমরা টেলিফোন করলাম সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেবকে।...বললাম, স্যার, বঙ্গবন্ধু আর নেই। এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত হয়েছি। আপনি এখন রাষ্ট্রের অস্থায়ী প্রধান। এই অবস্থায় আমাদের জন্য আপনার কী নির্দেশ?...তিনি বললেন, আমি একটু জেনারেল সফিউল্লাহর সঙ্গে কথা বলে আপনাদের জানাব। আমি বললাম, স্যার আমরা তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি। জেনারেল সফিউল্লাহ কোনো কিছু করবেন কিংবা করতে পারবেন বলে আমাদের মনে হয় না। ঠিক আছে, আমরা আপনার নির্দেশের অপেক্ষায় রইলাম। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর তাঁর কাছ থেকে কোনো উত্তর না আসায় বন্ধু আনোয়ারুল আলম শহীদ তাঁকে পুনরায় টেলিফোন করে তাঁর সিদ্ধান্ত জানতে চায় এবং এ-ও বলে, সময় অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বয়ে যাচ্ছে। তিনি বললেন, আমি একটু মনসুর আলী সাহেবের সঙ্গে কথা বলে নিই। ইত্যবসরে আমরাও ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সাহেবের কাছে টেলিফোন করলাম। সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেবকে যে কথা বলেছিলাম, ওনাকেও একই কথা বললাম এবং আমাদের প্রতি কী নির্দেশনা আছে জানতে চাইলাম। উনি বললেন, আমি সৈয়দ সাহেবের সঙ্গে আলাপ করে আপনাদের জানাচ্ছি। এরপরে আবার সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেবকে টেলিফোন করা হলো। এবারও টেলিফোন করল বন্ধুবর আনোয়ারুল আলম শহীদ...। তিনি শহীদকেও একই কথা বললেন, আমি তো সফিউল্লাহকে পাচ্ছি না।...কিছুক্ষণ পরে আমরা আবার ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সাহেবের কাছে টেলিফোন করলাম। তখন তিনি আর টেলিফোন ধরলেন না। অন্য একজন টেলিফোন ধরে বললেন, তিনি বাসায় নেই। টেলিফোন রেখে দিলাম। এ অবস্থায় আমাদের বুঝতে কষ্ট হলো না যে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে হয়তো কোনো সিদ্ধান্ত আসবে না।...

আনুমানিক সকাল ১০টা কিংবা সাড়ে ১০টার দিকে আমরা রাজ্জাক ভাইয়ের বাসায় টেলিফোন করি।


BANGLADESH OB...
DACCA THURSDAY AUGUST 21 1975

Freedom From Fear

power lies in the esta- of a domain of peace. the very best use of the service of the multi- lies its existence in the of its intrinsic quality. deed applies to the ra- of international peace and ples of comity of nations on basis of sovereignty and terri- ial integrity of respective na- ons under the integral power of national cohesiveness achieving a universal balance through friend- ship with all and malice against none, must needs have its root at home and cultivation in all spheres the closest quarters. Only a peo- and nation at peace with itself nuinely powerful and in full sion of the strength derived national integrity.

Crossing over a vital adminis- ve change, the new Govern- of the People's Republic of gladesh directs its attention to nal cohesion and peace born ple's unstinted. co-operation lty at home as it extends to all with malice to tional understand- ... remedy

strictly observe justice free ... bias, whether personal or poli... in honour of individual free... subservient, however, to greater interest of the nation.

The impartial approach is reflected in the clear assuran... the new Government that n... would be harassed for reason... political opinion, inclination, tions; and there has been no si... arrest so far on that ground. T... Government's call to every patr... tic citizen to re-dedicate himself the service of the people wit... sense of devotion to raise the tion from the morass of accu... lated evils would find a ready re... ponse from every genuine lover o... Bangladesh. All false apprehension and misunderstanding must go so that the nation may participate a body in the present posture affairs and lead the country to cherished goal of prosperity peace. The Government's assura... for no fear in disowning the ... of favour is pertinent in so ... a free clear national climate ... precondition for people's ... cipation, ... fair, and ... ment to ...

২১ আগস্ট প্রকাশিত দ্য পাকিস্তান অবজারভারের সম্পাদকীয় : ফ্রিডম ফ্রম ফিয়ার

সেখান থেকে জানানো হলো তিনি বাসায় নেই। তারপর তোফায়েল ভাইয়ের বাসায় টেলিফোন করলাম। হঠাৎ দেখি উনি টেলিফোন ধরেছেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এখনো বাসায় আছেন, কারণটা কী? তিনি বললেন, কী করব বুঝতে পারছি না। তোমরা আমাকে নিয়ে যেতে পারো, তোমাদের ওখানে?...আমরা একজন অফিসারের নেতৃত্বে কয়েকজন রক্ষীসহ একটি ট্রাক তোফায়েল ভাইয়ের বাসায় পাঠিয়ে তাঁকে সদর দপ্তরে নিয়ে আসি।

১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের পর মনসুর আলী ঢাকার টিঅ্যান্ডটি কলোনিতে আত্মগোপন করেছিলেন। প্রতিমন্ত্রী কে এম ওবায়দুর রহমান সেখান থেকে তাঁকে বঙ্গভবনে নিয়ে যান। খোন্দকার মোশতাক মনসুর আলীকে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। মনসুর আলী রাজি হননি। মোশতাক ও মনসুর আলীর সাক্ষাতের ছবি পত্রিকা ও টেলিভিশনে যায়।

তোফায়েল আহমেদ তাঁর ধানমন্ডির বাসায় ফিরে এসেছিলেন। আবদুর রাজ্জাক ভোরেই তাঁর ধানমন্ডির বাসা ছেড়ে কেরানীগঞ্জের কলাতিয়া গ্রামে কয়েক দিন লুকিয়ে ছিলেন। ৬ সেপ্টেম্বর রাজ্জাক, তোফায়েল এবং জিল্লুর রহমান গ্রেপ্তার হন।

১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের পর সেনাবাহিনীর প্রতিক্রিয়া দেখে সেনাপ্রধান কে এম সফিউল্লাহ হতাশ হয়েছিলেন বলে পরে তিনি উল্লেখ করেছেন। ডালিম সকালে তাঁকে ঢাকা সেনানিবাসের ভেতর ৪৬ ব্রিগেডের দপ্তরে নিয়ে যান। তিনি ওখানে গিয়ে দেখেন, 'সৈন্যরা সবাই আনন্দ করছে। এমনকি বঙ্গবন্ধুর কিছু ছবিও ভাঙা হয়েছে।'

শেখ মুজিবের মরদেহ দাফন করা নিয়ে বঙ্গভবনে কথা-কাটাকাটি হয়েছিল। খোন্দকার মোশতাক বলেছিলেন, 'যথাযোগ্য মর্যাদায় তাঁর পিতা-মাতার কবরের পাশে গোপালগঞ্জে স্বগ্রামের বাড়িতে তাঁকে সমাহিত করা হোক।' একজন সেনা কর্মকর্তা ওই সময় প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, 'আমরা তাঁকে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে হত্যা করেছি। আর এক্ষণে আপনি তাঁকে মর্যাদার সঙ্গে দাফন করতে চান—এটা কেমন কথা! এ হতে

পারে না।' মোশতাক ধমক দিয়ে বলেছিলেন, 'ওয়েল, ইন দ্যাট কেইস, ইউ টেকওভার। ইফ আই অ্যাম দ্য প্রেসিডেন্ট ইউ হ্যাভ টু ক্যারি আউট মাই অর্ডারস।'

১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের আকস্মিকতায় আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন। ঢাকায় কাউকে প্রকাশ্যে ক্ষোভ জানাতে দেখা যায়নি। পরে জানা যায়, ঢাকার বাইরে দু-একটা জায়গায় তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ হয়েছিল। এ রকম একটা বিক্ষোভের আয়োজন হয়েছিল খুলনা শহরে বিএল কলেজে। এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন খুলনার ছাত্রলীগ কর্মী নূর খান। ঘটনাটি তিনি বর্ণনা করেছেন এভাবে :

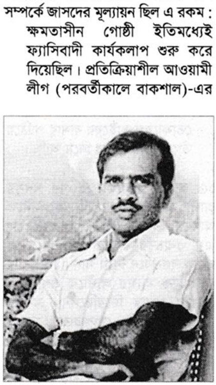
> আমি তখন সুন্দরবন কলেজে পড়ি, জাসদ-ছাত্রলীগের সঙ্গে যুক্ত। চুয়াত্তরের ১৭ মার্চের পর থেকেই আমাদের দলের নেতারা আন্ডারগ্রাউন্ডে। ধরপাকড় চলছিল। এর মধ্যে ঘটে গেল ১৫ আগস্ট। রাতে দেখা হলো গণবাহিনীর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কমান্ডার কামরুজ্জামান টুকুর সঙ্গে। টুকু ভাই অনেকদিন ধরে আন্ডারগ্রাউন্ডে। বললেন, এই অভ্যুত্থান আমাদের পক্ষে না। তারপর আবার আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে গেলেন। সাংগঠনিক কাজে আমি বিএল কলেজে গিয়েছিলাম ১৬ আগস্ট সকালে। বেলা দশটা হবে। দেখলাম আওয়ামী লীগসমর্থিত ছাত্রলীগের নেতা রায় রমেশ চন্দ্র বিশ-পঁচিশজন ছাত্রকে নিয়ে একটা প্রতিবাদ সভা করছেন বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদে। এরপর তারা কলেজ ক্যাম্পাসে মিছিল করলেন। পুলিশ এসেছিল। মিছিলকারীরা দ্রুত সরে পড়লেন। রমেশদা আন্ডারগ্রাউন্ডে গেলেন।

মুজিব হত্যার খবর শুনে অনেক রাজনীতিবিদ খুশি হয়েছিলেন। তাঁদের কাছে অসামরিক আওয়ামী লীগ-বাকশাল সরকারের চেয়ে সামরিক সরকার ছিল বেশি আদরের। জাসদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। তরুণদের একটা বড় অংশ 'বিপ্লবের' তাড়নায় টগবগ করে ফুটছিলেন। ১৫ আগস্টের নৃশংসতা দেখে তাঁরা অনেকেই হকচকিত হয়ে পড়েন। তবে খুশি হয়েছিলেন অনেকেই। কুমিল্লার স্থানীয় এক জাসদ নেতা তাঁর রাজাপাড়ার বাড়িতে ১৫ আগস্ট গরু জবাই করে ভোজের আয়োজন করেছিলেন। বাড়িতে মাইক লাগিয়ে সারা দিন গান-বাজনা, হইচই আর আওয়ামী লীগকে গালিগালাজ চলে। কাছেই ছিল স্থানীয় সংসদ সদস্য অলি আহমদের বাড়ি। মাইকটা তাঁর বাড়ির দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। অলি আহমদ তখন বাড়িতে ছিলেন না। প্রতিকূল পরিস্থিতি দেখে আগেই তিনি সপরিবার ঢাকায় চলে গিয়েছিলেন। গণবাহিনী একটা লিফলেট প্রকাশ করেছিল। শিরোনাম ছিল—খুনি মুজিব খুন হয়েছে, অত্যাচারির পতন অনিবার্য। তবে জাসদের নেতা-কর্মীদের এই উচ্ছ্বাস ছিল ক্ষণস্থায়ী। গণবাহিনীর সংগঠক মোশতাক আহমেদের মন্তব্য ছিল :

> আর্মির একটা ফ্যাকশনের সঙ্গে হয়তো আমাদের যোগাযোগ ছিল। তারপর তো খোন্দকার মোশতাক গুছাইয়া পিটা শুরু করল আমাদের। মুজিব কী পিটাইছে? খোন্দকার মোশতাকের বাড়িটা আরও বেশি। বগুড়ায় মরতেছে, রংপুরে মরতেছে, এই রকম শুরু হইল। তখন সিনেমা হলে দেখাইত, একটা বীভৎস লোক, হাতে স্টেনগান, গাট্টাগোট্টা, বাবরি চুল, লেখা—ওদের ধরিয়ে দিন।

বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের বাইরে জাসদ এবং সিপিবি ছিল দুটো উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দল। দল দুটোর মধ্যে নীতিগত ফারাক ছিল। অনেক বিষয়ে তাদের অবস্থান ছিল বিপরীত মেরুতে। কিন্তু যে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থান ঘটে, তার মূল্যায়নে এই দল দুটোর অবস্থান খুব কাছাকাছি মনে হয়েছে। আওয়ামী লীগ সম্পর্কে জাসদের মূল্যায়ন ছিল এ রকম :

> ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী ইতিমধ্যেই ফ্যাসিবাদী কার্যকলাপ শুরু করে দিয়েছিল। প্রতিক্রিয়াশীল আওয়ামী লীগ (পরবর্তীকালে বাকশাল)-এর সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধল সংশোধনবাদের বাংলাদেশস্থ এজেন্ট গণধিকৃত মণি-মুজাফফর চক্র। কিন্তু চরম ফ্যাসিবাদী কার্যকলাপ শেখ মুজিবকে ঠেকিয়ে রাখতে পারল না।...বুর্জোয়াদের মধ্যে দেখা দিল অস্থিরতা ও অন্তঃকোন্দল। দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের বিদেশি মুরব্বিরাও দিশাহারা হয়ে উঠল; কোন নেতৃত্বের মাধ্যমে তাদের স্বার্থ প্রতিপত্তি কায়েম থাকবে—এ প্রশ্নে তারা দ্বিধান্বিত হয়ে উঠল। এই ডামাডোলের একপর্যায়ে এল ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট। এদিন শেখ মুজিব ও তাঁর কতিপয় সহযোগী নিহত হলো। সামরিক বাহিনীর একাংশের সহযোগিতায় শেখ মুজিবেরই অন্যতম সহচর খোন্দকার মোশতাফ ক্ষমতায় বসল।



আবু তাহের

জাসদের এই মূল্যায়নটি করা হয় ১৯৭৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে। সিপিবির মূল্যায়নটিও অনুরূপ, যদিও তা করা হয়েছিল তিন বছর পর, ১৯৭৯ সালে। সিপিবির মন্তব্যে বলা হয় :

> দেশে একটি প্রগতির ধারা সূচিত হলেও দলের নেতা, মন্ত্রী, এমপি এবং দলের কর্মীদের একাংশ ব্যাপক দুর্নীতি, লাইসেন্স-পারমিট, ব্যাংক-ঋণ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতির মাধ্যমে বিত্তশালী হয়ে ওঠে। এমনকি জাতীয়করণকেও তারা নিজেদের বিত্ত সঞ্চয়ের কাজে ব্যবহার করতে থাকে। বঙ্গবন্ধুর আমলে ৩৪০ কোটি ৩৮ লাখ ডলার বৈদেশিক সাহায্য বাংলাদেশে আসে। বঙ্গবন্ধুর ভাষায় এই টাকার শতকরা ৩০ ভাগ দুর্নীতিবাজদের পকেটে চলে যায়। এদের মধ্যে আওয়ামী লীগের লোকজনও ছিল। এভাবে দলের মধ্যে বুর্জোয়া ও নব্য-ধণিকদের শক্তি ও প্রভাব বৃদ্ধি পায়। বস্তুতপক্ষে ১৯৭৪ সালে দেশের প্রগতির ধারাকে অগ্রসর করার ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগই প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।...শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদঘেঁষা আওয়ামী লীগের দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল অংশ জাতীয় আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াশীল অংশের সঙ্গে শরিক হয়ে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে এবং আওয়ামী লীগের একাংশ খুনি মোশতাকের সহযোগী হয়।

শেখ মুজিবের মূল্যায়ন নিয়ে জাসদে মতভেদ ছিল। ১৯৮০-এর দশকে জাসদে ভাঙনের প্রক্রিয়া শুরু হলে এ

বিষয়ে চমকপ্রদ কিছু তথ্য বেরিয়ে আসে। এক সাক্ষাৎকারে জাসদ সভাপতি এম এ জলিল বলেছিলেন, শেখ সাহেবের মৃত্যুটা হচ্ছে একটা ট্র্যাজেডি, ইটস এ ট্র্যাজেডি ফর দ্য নেশন। শেখ সাহেবের ইমেজ এই জাতি ব্যবহার করতে পারত। কিন্তু সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হলো আমরা তা ব্যবহার করতে পারিনি। শেখ সাহেবের মৃত্যুর জন্য তিনি যতটা দায়ী, আমরা মনে হয় জাতি হিসাবে কম দায়ী নই। জাতীয়তাবাদী চেতনাটার যেভাবে মৃত্যু ঘটল তা আমি সহজে মেনে নিতে পারি না। এখনও মেনে নিতে পারছি না। ইতিহাস শেখ সাহেবকে মহানায়ক হিসেবে, আমার মনে হয় সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসাবে চিহ্নিত করবে।

১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানকে দৈনিক *ইত্তেফাক* স্বাগত জানিয়েছিল। ১৬ আগস্ট দৈনিক *ইত্তেফাক* প্রথম পাতায় 'ঐতিহাসিক নবযাত্রা' শিরোনামে একটি সম্পাদকীয় ছাপে। সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয় :

> দেশ ও জাতির এক ঐতিহাসিক প্রয়োজন পূরণে ১৫ আগস্ট শুক্রবার প্রত্যুষে প্রবীণ জননায়ক খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী সরকারের সর্বময় ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছে। পূর্ববর্তী সরকার ক্ষমতাচ্যুত হইয়াছে এবং এক ভাবগম্ভীর অথচ অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে খন্দকার মোশতাক আহমদ রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ গ্রহণ করিয়াছেন।...বিগত সাড়ে তিন বছরের উর্ধ্বকালে দেশবাসী বাস্তব ক্ষেত্রে যাহা লাভ করিয়াছে তাহাকে এক কথায় হতাশা ও বঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের সত্যিকার আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপায়ণে খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে দেশের সশস্ত্র বাহিনীকে সেই ঐতিহাসিক দায়িত্ব নিতে আগাইয়া আসিতে হইয়াছে। তারও কারণ ছিল। পূর্ববর্তী শাসকচক্র সাংবিধানিক পথে ক্ষমতা হস্তান্তরের সমস্ত পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়া সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপকে অনিবার্য করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু ইতিহাসের গতিকে কোনো দিন ক্ষমতালিপ্সার বাঁধ দিয়া ঠেকাইয়া রাখা যায় না। আজকের এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমাদের দায়িত্ব অনেক। বাংলাদেশের এক মহাক্রান্তিলগ্নে জননায়ক খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে সশস্ত্র বাহিনী যে


জিয়াউর রহমান

> ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে তাহাকে সুসংহত করিতে হইলে জনগণের প্রতি অর্পিত ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে আমাদের সকলকে আজ ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে।

১৬ আগস্ট লন্ডনের *গার্ডিয়ান*-এ মার্টিন উলকাট 'মুজিব নিজেই দায়ী' শিরোনামে এক প্রতিবেদনে বলেন, 'নির্মম পরিহাস এই যে পাকিস্তানিরা তাকে হত্যা করেনি, তার দেশবাসীই তাকে হত্যা করেছে। এতে বোঝা যায়, কত দ্রুত বাংলাদেশ আশার উঁচু শিখর থেকে হতাশার অতল গহ্বরে নেমে এসেছিল, যার ফলে এই সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে। এজন্য বহুলাংশে দায়ী মুজিব নিজে। পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র চলাকালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মুজিব কোনো সংস্কার সাধনে, এমনকি একটা যোগ্য, সৎ প্রশাসন গড়ে তুলতেও চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। সর্বোপরি, মুজিব সেনাবাহিনীকে আঘাত করে আসছিলেন। রক্ষীবাহিনী একই সঙ্গে প্রেসিডেন্টের প্রহরী, গোয়েন্দা পুলিশ ও বিকল্প সেনাবাহিনী ছিল। আয়ারল্যান্ডের ব্ল্যাক অ্যান্ড টেন্স ও জার্মানির ব্রাউন শার্টের সঙ্গে এদের তুলনা করে চলে। রক্ষীবাহিনীর বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর অসন্তোষই হচ্ছে সামরিক অভ্যুত্থানের প্রধান কারণ এবং এক সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আর এক সেনাবাহিনী গঠন করে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার যে নীতি মুজিব গ্রহণ করেছিলেন তা ব্যর্থ হয়েছে।'

ব্রিটিশ দৈনিক দ্য *টেলিগ্রাফ* 'ফল অব অ্যান আইডল' শিরোনামে একটি নিবন্ধ ছাপে। এতে মন্তব্য করা হয় যে, শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণি শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে চলে যাওয়াতেই তাঁর কাল হয়েছে। শহুরে মধ্যবিত্তরা হচ্ছে বাংলাদেশের রাজনীতির সত্যিকার নিয়ামক শক্তি এবং যেদিন তিনি সংবিধান ছিঁড়ে ফেলেছিলেন সেদিনই

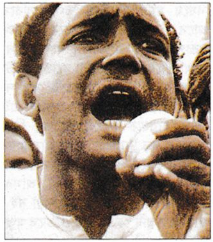

খালেদ মোশাররফ

তাঁর পতনের সূচনা হয় বলে মন্তব্যে উল্লেখ করা হয়। নিবন্ধে আরও বলা হয়, 'মোসাহেব পরিবেষ্টিত হয়ে থেকে তিনি তাঁর শাসনের বিরুদ্ধে যে ক্রোধ ধূমায়িত হয়ে উঠছিল সেটা না দেখে বরং এই স্লোগান আউড়ে আত্মসন্তুষ্টি লাভ করতে চাইতেন : আমার দেশবাসী আমাকে ভালোবাসে, আমি তাদের ভালোবাসি।...পক্ষান্তরে সমালোচকদের অতীত রেকর্ড যা-ই হোক না কেন, তাদের প্রতি মুজিবের আচরণ ছিল একেবারেই সহানুভূতিহীন।'

১৬ আগস্ট *বাংলাদেশ অবজারভার* একটা সম্পাদকীয় ছাপে। শিরোনাম, 'হিস্টোরিক্যাল নেসেসিটি।' একই পত্রিকায় একটি সংবাদ শিরোনাম ছিল, পিপল হেইল টেকওভার (জনগণ ক্ষমতা গ্রহণকে অভিনন্দন জানায়)। ২০ আগস্ট নতুন রাষ্ট্রপতি খোন্দকার মোশতাক আহমদ সামরিক আইন জারি করেন। সামরিক ফরমানে বলা হয় :

> যেহেতু আমি, খোন্দকার মোশতাক আহমদ সর্বশক্তিমান আল্লাহর সহায়তা ও করুণায় এবং জনগণের দোয়ার ওপর নির্ভর করিয়া ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের প্রাতঃকাল হইতে কার্যকর করিয়া গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল ও পূর্ণ ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছি, এবং যেহেতু আমি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের প্রাতঃকালে রেডিও বাংলাদেশের সকল কেন্দ্র হইতে প্রচারিত এক ঘোষণাবলে সমগ্র বাংলাদেশে সামরিক আইন জারি করিয়াছি;...অত্র ফরমান অনুসারে আমা-দ্বারা প্রণীত কোনো সামরিক আইন প্রবিধান বা আদেশবলে বা এর অধীনে কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত কোনো সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন তোলা বা ইহাকে অবৈধ বা বাতিল ঘোষণা করিবার ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্ট বা অন্য কোনো





সেই সময়ের তিন নেতা : জিল্লুর রহমান, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদ

> আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষের থাকিবে না।

১৫ আগস্ট অভ্যুত্থানের সঙ্গে সেনাবাহিনীর ওই সময়ের ডেপুটি চিফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের সংশ্লিষ্টতা নিয়ে পরে অনেক কথাবার্তা হয়েছে। নানা কারণে জিয়ার মনে ক্ষোভ ছিল। তিনি ভেবেছিলেন, তাঁকে সেনাপ্রধান করা হবে। প্রকৃতপক্ষে তাঁকে সেনাবাহিনী থেকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এতে জিয়া ক্ষুব্ধ হন। ঢাকা সেনানিবাসের স্টেশন কমান্ডার লে. কর্নেল এম এ হামিদের বিবরণ থেকে জানা যায়, জিয়াউর রহমানকে রাষ্ট্রদূত করে পূর্ব জার্মানি অথবা বেলজিয়ামে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়েছিল। জিয়া সেনাবাহিনী ছেড়ে যেতে চাননি। বদলি ঠেকানোর জন্য জিয়া কর্নেল হামিদের শরণাপন্ন হন। হামিদ জিয়ার বিষয়টি সাইদুর রহমান নামে শেখ মুজিবের আস্থাভাজন একজন 'প্রভাবশালী মুক্তিযোদ্ধাকে' বলেন এবং জিয়াকে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। পরে সাইদুর রহমান তোফায়েল আহমেদ ও আবদুর রাজ্জাককে ধরে জিয়ার সিভিল পোস্টিং ধামাচাপা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। লেখককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সাইদুর রহমান বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন :

> মংলা পোর্টের জেনারেল ম্যানেজার ক্যাপ্টেন নূরউদ্দিন কর্নেল হামিদসহ আমার কাছে আইল, জিয়াউর রহমানের ট্রান্সফারটা কীভাবে বন্ধ করা যায়। আমি যাইয়া তোফায়েলরে বললাম, রাজ্জাকরে বললাম। এই লোকটার স্বাধীনতা যুদ্ধে একটা বিরাট কনট্রিবিউশন ছিল। সে আর্মিতে থাকতে চায়। নতুন এই আর্মিটা হইতে আছে। এইখানে তার একটা কনট্রিবিউশন...আর্মিটারে রিবিল্ড করা। বঙ্গবন্ধু একটা পোস্ট বানাইয়া তারে এইখানে দিছে। একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়তো কোথাও আছে। খালেদ মোশাররফ আছিল, সব সময় জিয়াউর রহমানের এগেইনস্টে বলত। স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁর অবদান, তার প্রতি আমার একটা পার্সোনাল গ্র্যাটিচ্যুড ছিল। যদিও তাঁর লগে আমার পরিচয় খুব কম। তোফায়েল-রাজ্জাক বলল, আমরা যদি এইটা ডাইরেক্টলি বলি, উনি (বঙ্গবন্ধু), আবার ডিফেন্সের ব্যাপারে, এইটা ঠিক না। তোফায়েল বলল, এক কাজ করেন, এইটা আপনে বলেন। আমি রাজ্জাক আর মনসুর আলীর সঙ্গে আলাপ করি। মনসুর আলী তখন হোম মিনিস্টার।
>
> আমি গেছি শেখ সাহেবের কাছে। ছাদের ওপর বইসা আছে। গেলাম ওপরে। বললাম। বলল, কী? হি (মুজিব) ওয়াজ টেকেন অ্যাব্যাক (উনি চমকে উঠলেন)। মুক্তিযুদ্ধের সময় জিয়াউর রহমানের একটা ভালো রোল ছিল। কিন্তু এর যে একটা খারাপ রোল ছিল, এইটা শেখ সাহেব জানত। আমি তো জানতাম না।
>
> যেদিন কিলিংটা হইয়া গেল, আমি ফার্স্ট টেলিফোনটা করলাম তোফায়েলকে। তোফায়েল তখন বাসায়। তোফায়েল বলল, আমার বাসার চাইরদিকে তো আর্মি আছে। সে এর আগে রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পে গেছিল। রক্ষীবাহিনীরে অ্যাকটিভেট না করে সে চইলা আসে, আর আটকা পড়ে।
>
> শেখ মুজিবের কিলিংয়ের সঙ্গে জিয়াউর রহমান ইনভলভ্‌ড ছিল, এইটা আমার সন্দেহ। জাসদও ছিল। কর্নেল তাহের তো ইনভলভড ছিলই। কর্নেল তাহের থাকলে হাসানুল হক ইনু ওয়াজ ইনভলভড। ইনুরে জিজ্ঞাসা করলে ইনু আমতা আমতা করে। আর্মির সঙ্গে এরা কিন্তু মোটামুটি ইনভলভড ছিল, ডিসটেন্টলি হইলেও। অ্যাকটিভ পার্ট না নিলেও তাদের নলেজে ছিল। আর তাহেরের তো পুরাপুরি সম্মতি ছিল।

চুয়াত্তরের ডিসেম্বরের শেষে সিরাজুল আলম খান গোপনে কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন। মাঝে পঁচাত্তরের মার্চে একবার ঢাকায় এসেছিলেন। কয়েক দিন পর তিনি আবার কলকাতায় চলে যান। ১৫ আগস্টের পর তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী, জাসদ-সমর্থিত ছাত্রলীগের সাহিত্য সম্পাদক রায়হান ফিরদাউস মধু কলকাতায় যান। ছাত্রলীগের সভাপতি আ ফ ম মাহবুবুল হক, সিরাজুল আলম খানকে বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে ব্রিফ করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন তাঁকে। মধু কলকাতায় পৌঁছে তিন-চারদিন পর ভবানীপুরের রাজেন্দ্র প্রসাদ রোডে চিত্তরঞ্জন সুতারের বাড়িতে সিরাজুল আলম খানের দেখা পান। চিত্ত সুতার স্বাধীনতার আগে থেকেই কলকাতায় থাকতেন এবং ভারত সরকারের সঙ্গে শেখ মুজিবের যোগাযোগের একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করতেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর বাড়িটি ছিল মুজিব বাহিনীর যোগাযোগের কেন্দ্র। ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে চিত্ত সুতার বরিশালের একটি আসন থেকে আওয়ামী লীগের টিকিটে জাতীয় সংসদের সদস্য হলেও থাকতেন কলকাতায়। মাঝে মাঝে ঢাকায় আসতেন। ঢাকায় এলে বিমানবন্দর থেকে দৈনিক *গণকণ্ঠ*-এর একটা মাইক্রোবাসে করে তাঁকে নিয়ে আসা হতো।

কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর সিরাজুল আলম বলেছিলেন, 'মধু ফিফটিন্‌থ ওয়াজ আওয়ার ডেট' (১৫ তারিখটা আমরাই ঠিক করেছিলাম)। মধুর মনে হয়েছিল, 'সিরাজ ভাই খুবই কনফিউজড।' তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে বাংলাদেশের পরিস্থিতি, জাসদের

ভূমিকা এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে একটা সম্পর্ক তৈরির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে ইংরেজিতে একটা চিঠির খসড়া তৈরি করেন। মধু এরপর গেলেন দিল্লি। সেখানে বাংলাদেশ হাইকমিশনের তৃতীয় সচিব ছিলেন মো. কামালউদ্দিন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি এবং মুহসীন হল ছাত্রসংসদের সাবেক সহসভাপতি (১৯৭০-৭২)। কামালউদ্দিন বললেন, চিঠিটা তিনি দিল্লির চীনা দূতাবাসে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করবেন।

সেনাবাহিনীতে ক্ষোভ ছিল। সেনাবাহিনীর উপপ্রধান জিয়াউর রহমান নিজেও ক্ষুব্ধ ছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে অনেকের সঙ্গেই কথা বলেছিলেন। এমনকি ভারতীয় দূতাবাসও বাদ যায়নি। ঢাকায় ভারতীয় উপহাইকমিশনার জে এন দীক্ষিতেরও ভাষ্য অনুযায়ী :

> আমি এখনো ওই দিনগুলোর কথা স্মরণ করি, যখন জিয়াউর রহমান মাঝে মধ্যে কথাবার্তা বলতে আমার বাসায় আসতেন এবং মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তাদের প্রাপ্য সম্মান না দেওয়ার কারণে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে তিক্ততা প্রকাশ করতেন। এই ক্ষোভের কারণ ছিল। ক্র্যাকডাউনের (২৫ মার্চ ১৯৭১) আগে মুজিবের ঘোষণাগুলো বাদ দিলে জিয়াই প্রথম সেনা কর্মকর্তা যিনি চট্টগ্রাম রেডিও থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। যেসব কর্মকর্তা স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিলেন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে তাঁদের রেখে দেওয়া নিয়েও ক্ষোভ ছিল।

১৫ আগস্টের অভ্যুত্থান ও হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপট ও লক্ষ্য নিয়ে নানান মত আছে। এ ব্যাপারে অভ্যুত্থানকারী ফারুক রহমান এক সাক্ষাৎকারে অনেক খোলামেলা কথা বলেছেন। সাক্ষাৎকারটি ১৯৯২ সালের ১৪ আগস্ট ধানমন্ডিতে ফ্রিডম পার্টির অফিসে নেওয়া হয়েছিল। ফারুকের বয়ান ছিল :

> আমি স্বীকার করছি, শেখ মুজিবকে সপরিবারে হত্যার ঘটনা মর্মন্তুদ না হলেও দুঃখজনক। শেখ মুজিব ইজ দ্য ভিকটিম অব দোজ হু আর বেনিফিসিয়ারিজ অব হিজ লাইফ লং পলিটিক্যাল একটিভিটিজ।
>
> বাংলাদেশের সেনাবাহিনী, বেসামরিক রাজনীতিক এবং বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যদি সততা ও দায়িত্বজ্ঞান থাকত, তাহলে শেখ মুজিব আজও বেঁচে থাকতেন। তাঁকে মরতে হতো না। তিনটি বড় ভুল তাঁর পতনকে অনিবার্য করে তুলেছিল। প্রথমত, দেশে ফেরার পর নিজেকে প্রধানমন্ত্রী না করে তাঁর উচিত ছিল শুধু দলীয় প্রধান হিসেবে থাকা। দ্বিতীয় ভুলটা ছিল আওয়ামী লীগকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে তুলে ধরা অর্থাৎ শুধু একজন আওয়ামী লীগারই শ্রেষ্ঠ বাংলাদেশি—এই ধারণা সৃষ্টি করা। তৃতীয়ত, নিজেকে তাঁর একজন 'গড'-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ করা। যেকোনো ধরনের ফাইলে তাঁর সই লাগত।...
>
> স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় শেখ মুজিবের ভূমিকা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। এটাও সত্য যে, জনগণের সর্বোত্তম ইচ্ছায় তিনি একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর নেতৃত্বেই আমি পাকিস্তানিদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে যুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
>
> পাকিস্তান থেকে ফিরে না এলে তিনি জনগণের হৃদয়ে চির অমর হয়ে থাকতেন। কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনায় তিনি ছিলেন অযোগ্য। তিনি জাতিকে স্বাধীনতা দিয়েছেন, তাঁর আসলে আর কিছুই দেওয়ার ছিল না।...
>
> ৩২ নম্বরে অভিযান চলাকালে শেখ মুজিবের টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়নি। তিনি প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে জেনারেল সফিউল্লাহ, জিয়াউর রহমান, তোফায়েল আহমেদ প্রমুখের সঙ্গে কথা বলেছেন। কথা বলেছেন ঢাকার বিদেশি মিশনগুলোর সঙ্গে। শুধু ভারতের সঙ্গে লাইন ডাউন ছিল। এটাও আমরা করিনি। আল্লাহ করেছেন। জেনারেল সফিউল্লাহর সঙ্গে কথা বলার সময় কর্নেল রশিদ তাঁর কাছে ছিলেন।...


দৈনিক বাংলা

খোন্দকার মুশতাক নয়া রাষ্ট্রপতি

পাল্টে গেছে দেশ, *দৈনিক বাংলা*, ১৬ আগস্ট ১৯৭৫

> ১৫ আগস্টের আগে ১৫ মাস এ নিয়ে আমি ভেবেছি। শান্তিপূর্ণ কোনো পথ খুঁজে পাইনি। ওই সময় বামপন্থীরাও তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করেছিল। রক্তপাত ছিল অনিবার্য। আমি না করলে অন্য কেউ করত। এড়ানো যেত না।...
>
> আমার পরিকল্পনার পেছনে কোনো ষড়যন্ত্র নেই। আমিই এ ঘটনার একক নায়ক। ১২ আগস্টের আগ পর্যন্ত আমি, আমার স্ত্রী এবং চট্টগ্রামের হাফিজ (অন্ধ দরবেশ) ছাড়া অন্য কেউ জানত না। এ নিয়ে আসলে তৎকালীন সামরিক অফিসারদের কাউকে বিশ্বাস করার উপায় ছিল না।
>
> আমার সামনে দৃষ্টান্ত ছিলেন লে. কর্নেল জিয়াউদ্দিন। জিয়াউদ্দিন একপর্যায়ে জিয়াউর রহমান, শওকত আলীর মতো উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সম্মতিক্রমে শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'সকলের ইচ্ছা আপনি এখন সরে দাঁড়ান।' পরে শেখ সাহেব যখন তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন, ওই অফিসাররা অস্বীকার করলেন। পরিণতিতে তাঁকেই চাকরি খোয়াতে হয়। ভায়রা বলেই কর্নেল রশিদকে দলে ভেড়াতে সাহস করেছিলাম।

আগস্ট অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িতদের মধ্যে রশিদ ও ফারুকের দেওয়া কয়েকটি সাক্ষাৎকারে ওই সময়ের পরিস্থিতির কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। এ নিয়ে একমাত্র ডালিমই একটি বই লিখেছেন। তাঁদের বর্ণনার মধ্যে অনেক অসংগতি লক্ষ করা যায়। ফারুক দাবি করেছেন, তিনিই অভ্যুত্থানের মূল হোতা। পরে তিনি বিষয়টি রশিদকে জানিয়েছিলেন তাঁর সমর্থন পাওয়ার জন্য। রশিদ দাবি করেছেন যে তিনি

অনেক দিন ধরেই অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করছিলেন। অভ্যুত্থানের পক্ষে রাজনৈতিক সমর্থন পাওয়ার জন্য খোন্দকার মোশতাককে তিনিই ভিড়িয়েছেন। খোন্দকার মোশতাক দাবি করেছেন, তিনি আগে থেকে কিছুই জানতেন না। তাঁকে ডেকে আনা হয়েছে অভ্যুত্থান-পরবর্তী পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য। অভ্যুত্থানের আগে বা পরে তাঁরা সবাই স্বীকার করেছেন যে তাঁরা শেখ মুজিবের সরকারকে উৎখাত করতে চেয়েছেন। ডালিম এই অভ্যুত্থানের লক্ষ্যগুলো সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন :

> —বাকশালকে হটিয়ে প্রথমে একটি অসামরিক অন্তর্বর্তী সরকার ও পরে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একজন ব্যক্তির নেতৃত্বে একটি জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা, জনগণ ও জাতীয় সংসদের মধ্যে যার পর্যাপ্ত সমর্থন আছে;
>
> —মে. জে. সফিউল্লাহকে সরিয়ে মে. জে. জিয়াউর রহমানকে সেনাবাহিনীর প্রধান এবং জেনারেল ওসমানীকে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ করা;
>
> —সামরিক আইন জারি ও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটি জাতীয় সরকার গঠনের জন্য অন্তর্বর্তী সরকারকে সাহায্য করা।

কোন পরিস্থিতিতে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে, তা নিয়ে অনেক অ্যাকাডেমিক আলোচনা আছে। শুধু ষড়যন্ত্র-তত্ত্ব দিয়ে বিষয়টি বোঝা যাবে না। মোটা দাগে তিনটি কারণ নির্দিষ্ট করা যায়। ১. সিদ্ধান্ত গ্রহণ-প্রক্রিয়ার কেন্দ্রিকতা, ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত কর্তৃত্বের পরম্পরা, শৃঙ্খলা, সংহতি, জাতীয়তাবোধ এবং কৃচ্ছ্রতা সামরিক বাহিনীতে একধরনের মনস্তত্ত্ব তৈরি করে, যা তাদের 'দেশপ্রেমহীন লুটেরা' এবং 'দুর্নীতিবাজ রাজনীতিকদের' কবল থেকে দেশকে রক্ষা করতে উৎসাহিত করে; ২. রাজনৈতিক ব্যবস্থার দুর্বলতা, যেমন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নড়বড়ে অবস্থান, বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন, নিচুমানের রাজনৈতিক সংস্কৃতি—এসব কিছু সামরিক বাহিনীকে রাজনীতির মঞ্চে টেনে আনে; ৩. সামরিক বাহিনীর মধ্যে দ্বন্দ্ব, উপদলীয় চক্র, গোষ্ঠীগত স্বার্থ ও কারও কারও ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা সামরিক হস্তক্ষেপের সুযোগ করে দেয়।

এটা ঠিক যে বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা ছিল যথেষ্ট। ১৯৭১ সালের চেতনা ১৯৭৪ সালে এসে হারিয়ে গিয়েছিল। সামরিক হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা বাড়ছিল। কিন্তু সেনাবাহিনীতে যথেষ্ট শৃঙ্খলা ছিল না। গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্বও ছিল। নানা কারণে সামরিক বাহিনীর প্রায় সবাই ছিলেন ভারতবিরোধী। তাঁরা মনে করতেন, তাঁরা কাজ শেষ করার পর ভারতীয় বাহিনী স্রেফ ঢুকে পড়েছে। যুদ্ধের পর পাকিস্তানি বাহিনীর ফেলে যাওয়া উন্নতমানের সব অস্ত্রশস্ত্র ভারত নিয়ে যাওয়ায় সেনাবাহিনীর মধ্যে ক্ষোভ ছিল। ভারতবিরোধী মনোভাব ক্রমে মুজিববিরোধিতায় রূপ নেয়। সেনাবাহিনীর লোকেরা মনে করত তারা অবহেলার শিকার। প্রধানমন্ত্রী পুত্র শেখ জামাল যুক্তরাজ্যের স্যান্ডহার্স্ট থেকে চার মাসের একটা সংক্ষিপ্ত কোর্স শেষ করে ঢাকায় ফিরে এলে তাঁকে সেনাবাহিনীতে নিয়োগ দেওয়া হয়। তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ একটা পদে বসানো হবে বলে গুঞ্জন ছিল। সরকারি প্রশাসনের মতো সামরিক বাহিনীকেও বাকশালের নিয়ন্ত্রণে আনা হবে বলে প্রচার ছিল। যখন অভ্যুত্থান হলো, দেখা গেল যে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষুব্ধ কয়েকজন সেনা কর্মকর্তা মাত্র ১৪০০ সৈন্যের সমর্থন নিয়ে একটা সরকারের পতন ঘটিয়েছিল। অভ্যুত্থানটি ছিল আচমকা, দ্রুত এবং নৃশংস।

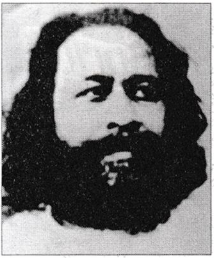
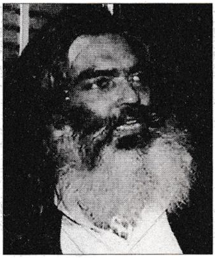
ভারতের সঙ্গে 'গোপন চুক্তি' নিয়ে দেশে অনেক হইচই হয়েছে। ড. কামাল হোসেন এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করে বলেন, দুই দেশের মধ্যে কোনো গোপন চুক্তি ছিল না, যদিও এ নিয়ে অনেক প্রচার ছিল। অভ্যুত্থানকারীরা পরে পররাষ্ট্র দপ্তরে গিয়ে 'গোপন চুক্তি'র খোঁজ করেছিল। সেটা আর পাওয়া যায়নি।

পাকিস্তান আমলে সম্ভাব্য শত্রুর (ভারত) আক্রমণের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য কোনো প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ছিল না। ছয় দফায় শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আলাদা মিলিশিয়া বাহিনী গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি ওই পথে হাঁটেননি। বরং সনাতন ধারার সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আবার জাতীয় রক্ষীবাহিনী তৈরি করে তাকে সেনাবাহিনীর দৃষ্টিতে একটা প্রতিপক্ষ হিসেবে তুলে ধরেন। এর ফল হয়েছিল নেতিবাচক। ১৯৭৩ সালের শেষে পাকিস্তান থেকে সেনাবাহিনীর আটকেপড়া বাঙালি সদস্যরা ফিরে এলে শেখ মুজিব তাদের অবসরে পাঠাতে বা অন্য কোথাও নিয়োগ দিয়ে পুনর্বাসন করতে পারতেন। কিন্তু এটা না করে তিনি তাদের প্রায় সবাইকে সামরিক বাহিনীতে নিয়ে নেন। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার পুরস্কার হিসেবে সামরিক বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধা সদস্যরা চাকরিতে দুই বছরের সিনিয়রিটি পেয়েছিলেন। পাকিস্তান-প্রত্যাগত সেনা কর্মকর্তাদের অনেককেই তাঁদের জুনিয়রদের অধীনে যোগ দিতে হয়েছিল। ফলে সামরিক বাহিনীতে তৈরি হয়েছিল দ্বন্দ্ব। শেখ মুজিব সামরিক বাহিনীতে একধরনের 'ভালোবাসা ও ঘৃণার' সম্পর্ক তৈরি করলেন। একটা স্বচ্ছ প্রতিরক্ষানীতি তৈরি করতে না পারার কারণে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছিল। তিনি প্রায়ই বলতেন, 'আমার সেনাবাহিনী'। কিন্তু সেনাবাহিনীর মধ্যে ছিল অবহেলা আর বঞ্চনার ক্ষোভ।

শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে তাঁর দলের মধ্যে ষড়যন্ত্র হয়েছে বলে অভিযোগ আছে। স্বাভাবিকভাবেই অভিযোগের তীরটি খোন্দকার মোশতাকের বিরুদ্ধে। অধ্যাপক তালুকদার মনিরুজ্জামানকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে খোন্দকার মোশতাক বলেছিলেন, অভ্যুত্থানের ব্যাপারে তিনি কিছুই জানতেন না। মেজররা শেখ মুজিবকে হত্যা করার পর তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি তাদের অনুরোধে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেন; কেননা সরকার গঠনে বিলম্ব ভারতীয় হস্তক্ষেপের সুযোগ করে দিত। এ ব্যাপারে সাবেক রাষ্ট্রপতি, যিনি খোন্দকার মোশতাকের সরকারে যোগ দিয়েছিলেন, মুহম্মদুল্লাহ বলেছেন :

> আমাকে মোশতাক সাহেব দৃঢ়ভাবে জানিয়েছিলেন যে তিনি বঙ্গবন্ধু হত্যার সঙ্গে জড়িত নন; কেবল ঘটনাচক্রের শিকার। তবে এ কথা বলেছিলেন যে তিনি জানতেন বঙ্গবন্ধুকে অন্তরীণ রাখা হবে। এটা বলেছিলেন আগস্টের শেষে কোনো এক শুক্রবারের জুমার নামাজের পর। কিন্তু পরে আমি অবগত হই যে তিনি সবই জানতেন।...
>
> কতিপয় ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করে ইঙ্গিতে বলেছিলেন এঁরা অনেক কিছুই জানতেন। যাঁদের প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন তাঁরা '৭৫-এর ঘটনাবলি নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন। এঁরা বিতর্কের উর্ধ্বে এবং উচ্চাসনেই আছেন।

খোন্দকার মোশতাক আহমদ যে একজন 'বিশ্বাসঘাতক', এ কথা ১৫ আগস্টের আগে কেউ বলেননি। আওয়ামী লীগের মধ্যে নেতৃত্বের কোন্দল ছিল। কিন্তু দলের কেউ মুজিব হত্যার ষড়যন্ত্রে অংশ নেবে, এটা ঘুণাক্ষরেও কেউ ভাবেনি। মুজিব পরিবারের জীবিত দুই সদস্য, তাঁর দুই মেয়ে শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা

জাসদের দুই নেতা : এম এ জলিল ও সিরাজুল আলম খান

তখন ব্রাসেলসে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সানাউল হকের অতিথি হিসেবে ছিলেন। মুজিব হত্যার খবর প্রচারিত হওয়ার পর এক মুহূর্তেই তাঁদের পৃথিবীটা বদলে গেল। সানাউল হক শেখ মুজিবের দুই কন্যাকে যেন তাড়াতে পারলেই বাঁচেন। ওই সময় জার্মানিতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ছিলেন হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী। ১৬ আগস্ট সন্ধ্যায় হাসিনা-রেহানা জার্মানিতে পৌঁছে রাষ্ট্রদূতের বাড়িতে আশ্রয় নেন। হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর ভাষ্যে জানা যায় :

> একপর্যায়ে হাসিনা জানতে চাইল কে এই ঘটনার নায়ক। আমি বললাম, রেডিও রিপোর্ট থেকে শুনেছি খোন্দকার মোশতাকের কথা। হাসিনা কোনোমতেই বিশ্বাস করতে রাজি নয়। সে বলছিল, তা কী করে হয়। আব্বার সঙ্গে মোশতাক চাচা কত ঘনিষ্ঠ। পরিবারের একজন সদস্যের মতো। তিনি এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডে জড়িত হতে পারেন না।

ব্রাসেলসে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সানাউল হককে শেখ মুজিব স্নেহ করতেন। অনেকের অমতে তিনি তাঁকে রাষ্ট্রদূত করেছিলেন। হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি তাঁর বাড়িতে হাসিনা-রেহানাকে আশ্রয় দেওয়া তো দূরে থাকুক, জার্মান সীমান্তে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাঁদের গাড়ি দিয়েও সাহায্য করতে অস্বীকার করেন। হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী গাড়ি পাঠিয়ে তাঁদের আনার ব্যবস্থা করেন। সানাউল হক পরে ঢাকায় 'বঙ্গবন্ধু পরিষদের' সদস্য হয়েছিলেন।

মুজিব হত্যায় দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র নিয়ে অনেক লেখাজোকা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সন্দেহের তীর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকেই তাক করা হয়। ১৯৭১ সালের ঘটনাপ্রবাহ এবং মুক্তিযুদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রের অস্বস্তির কারণ হয়েছিল। নিক্সন প্রশাসন এবং নিক্সনের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জার পাকিস্তানি সামরিক জান্তার পক্ষ নিয়েছিলেন। বলা চলে, যুক্তরাষ্ট্রের ইচ্ছার বিপরীতেই বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল। যুদ্ধ-পরবর্তী সরকার সমাজতন্ত্রকে অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সখ্য গড়ে তুলেছিল। বিষয়টি মার্কিন প্রশাসন সুনজরে দেখেনি। খোন্দকার মোশতাকের মার্কিন-ঘেঁষা মনোভাব কোনো লুকানো ব্যাপার ছিল না। আগস্ট অভ্যুত্থানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরাসরি সংশ্লিষ্টতা কিংবা পরোক্ষ মদদ ছিল বলে অনেকেই ধারণা করেন। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদের মূল্যায়ন হলো :

> পনেরো আগস্টের অভ্যুত্থানকে ঘিরে ষড়যন্ত্রের নানান তত্ত্বের সত্যতা যাই থাকুক না কেন, বাস্তবতা হলো এই যে, প্রায় সকল অভ্যুত্থান অভ্যন্তরীণ ঘটনাবলি ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ভূত হলেও বাইরের শক্তির উৎসাহ পাওয়া বা না পাওয়ার ওপর নির্ভর করে এর সফলতা বা ব্যর্থতা। মুজিব-পরবর্তী সরকারগুলোর সাফল্য যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল এবং বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের উষ্ণ সম্পর্ক তৈরি করতে আগস্ট অভ্যুত্থান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

সরকারের নানান কার্যকলাপ, বিশেষ করে রক্ষীবাহিনীর অত্যাচার মানুষকে এতটাই ক্ষুব্ধ করেছিল যে সাধারণ মানুষ মনে মনে এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ চাইছিল। রক্ষীবাহিনীকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করা হতো। আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতারা তাঁদের ব্যক্তিগত বিরোধকে কাজে লাগিয়ে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে রক্ষীবাহিনী লেলিয়ে দিতেন। এ রকম একটা উদাহরণ পাওয়া যায় রক্ষীবাহিনীর উপপরিচালক আনোয়ার উল আলমের বর্ণনায়। বরিশালের আওয়ামী লীগ নেতা আমির হোসেন আমু ও আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ কোনো একটা গ্রামে কিছু লোকের কাছে বেআইনি অস্ত্র আছে, এই অভিযোগ করেন। আনোয়ার উল আলম যথাস্থানে গিয়ে বাড়ি তল্লাশি করে জানতে পারেন, যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তারা একেবারে নিরীহ লোক। জমিজমা-সংক্রান্ত বিরোধ বা অন্য কোনো কারণেই তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছে। আলম বুঝতে পারলেন, 'রক্ষীবাহিনীর অল্পবয়সী সদস্যদের ব্যবহার করে আওয়ামী লীগের স্থানীয় অসৎ নেতারা গ্রামের মানুষের মধ্যকার বিবাদ থেকে ফায়দা লুটতে চায়। এতে দুর্নাম হয় রক্ষীবাহিনীর।' আনোয়ার উল আলমের বর্ণনা থেকে জানা যায় :

> বরিশালের সাধারণ মানুষের ওপর, বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের ওপর কী পরিমাণ নির্যাতন হয়েছিল তা বোঝা গিয়েছিল যেদিন বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হয়, সেদিন। দেশটা ছিল নীরব, নিথর, স্তব্ধবাক। কিন্তু বরিশাল শহরে কয়েক হাজার লোকের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ মিছিল বের হয়েছিল। তবে সেটা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে বলে নয়, তাঁরা আনন্দ মিছিল বের করেছিলেন বরিশালের নির্যাতনকারীদের হাত থেকে তাঁরা রক্ষা পেয়েছেন ভেবে।

অভ্যুত্থান ও হত্যাকাণ্ডের খবর শুনে অনেকেই হকচকিত হয়ে পড়েছিলেন। যাঁরা ঢাকার বাইরে ছিলেন, তাঁরা ঘটনার আকস্মিকতায় কী করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। ওই সময়ের একটা বিবরণ পাওয়া যায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তরুণ ক্যাপ্টেন শচিন কর্মকারের কাছ থেকে। শচিন সেনাবাহিনীতে কমিশন পান ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়। চুয়াত্তরে কুমিল্লা সেনানিবাসে তাঁর পোস্টিং হয়। ওই সময় কুমিল্লার ব্রিগেড কমান্ডার ছিলেন কর্নেল মাশহুরুল হক (পরে ব্রিগেডিয়ার)। তাঁকে রাষ্ট্রপতির মিলিটারি সেক্রেটারি করা হলে কর্নেল আমজাদ আহমদ চৌধুরী (পরে মেজর জেনারেল) কুমিল্লার ব্রিগেড কমান্ডার নিযুক্ত হন। ১৫ আগস্ট ও তারপরের কয়েক দিনের ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন শচিন কর্মকার :

> আমি ছিলাম মূল ক্যান্টনমেন্টের মেইন মেসে, যেটাকে বলে ডিপ মেস। পরের রুমটায় থাকত

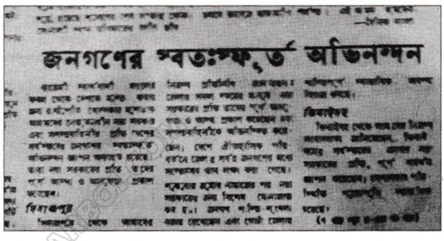
আর্টিলারির নুরুল ইসলাম। রিপাট্রিয়েশন যখন হয়ে যায়, তখন রুমের স্কেয়ারসিটি হয়ে যায়। আমার রুমে ভাগে পড়লেন আমার কোম্পানির অফিসার হামিদুল হোসেন বীর বিক্রম।

সকালবেলা বাথরুমে। প্যারেডে, পিটিতে যাব। ছয়টা সাড়ে ছয়টা হবে। ওই সপ্তাহে আমি ছিলাম গ্যারিসনের ডিউটি অফিসার। আমাদের রুমে হিটার-টিটার, গিজার নাই। শাওয়ার অনেক ওপরে। আগের দিনের বিল্ডিং, ঝপঝপ শব্দ হয়। সে (হামিদুল) চিৎকার করছে, আমি শুনি নাই। তারপর দরজায় লাথি মাইরা বলল, স্যার, ভাইঙ্গা ফেলব। বাধ্য হইয়া কল বন্ধ করতে হইল। ভাঙবা, কী কারণে ভাঙবা? কয় যে, শেখ সাহেব মারা গেছে। টাওয়েল পেঁচাইয়া কোনো রকমে বাইর হইলাম। আমারে বিশ্বাস করানোর জন্য রেডিওটা জোরে ছাইড়া দিছে। শুনলাম, আমি মেজর ডালিম বলছি...। গলাটা চিনি। আমাদের সঙ্গে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে ছিল। তাড়াতাড়ি কাপড় পইরা আমার সিওরে ফোন করলাম। সিও ছিলেন সৈয়দ আবদুল হান্নান। সুনামগঞ্জ বাড়ি। বললেন, ইউনিফর্ম পরে তাড়াতাড়ি চলে আস। ব্যাটালিয়নে পৌঁছতে পৌঁছতে আমার সিও চইলা আসল। গ্যারিসন ডিউটি অফিসারের আলাদা একটা ফোন থাকে, হটলাইনে সব ক্যান্টনমেন্টে কথা বলার জন্য। মেজর আবেদ, সিলেটে বিডিআর-এর সেক্টর কমান্ডার। বললাম, স্যার, আপনি পিলখানায় বলেন। এভরি ওয়ান আওয়ার, হি ইউজড টু গিভ মি আ কল। আমিও ঢাকায় আমার হটলাইনে স্টেশন হেডকোয়ার্টার, এম এস ব্রাঞ্চ, সবখানে, যেখানে আমার অ্যাকসেস আছে, ফোন করলাম।

যখন কনফার্ম হইয়া গেলাম যে অ্যাসাসিনেশন হ্যাজ রিয়েলি হ্যাপেনড, তখন আমরা ডেপ্লয়মেন্ট করলাম। দেখলাম বারো থেকে তেরো জন সোলজার পালাইয়া গেছে। আতঙ্ক। যখন শুনছে বর্ডারে ভারতীয় সেনাবাহিনী আসছে, একটা রিউমার, আমাদের সেনাবাহিনীর অনেকে ডেজার্ট করল। ঘণ্টা দুয়েক পরে ব্রিগেড কমান্ডার আমজাদ খান চৌধুরী আমাকে ডাকলেন। বললেন, যদি সম্ভব হয়, তাহলে বিবিরবাজার, আমাদের কাছেই কুমিল্লা বর্ডারে, দেখ যে ভারতীয় সেনাবাহিনী কতদূর অগ্রসর হইছে এবং তারা আসলে সীমান্ত অতিক্রম করবে কি করবে না। ফিল্ড ইনটেলিজেন্সের আতিককে বললাম, চল যাই। আমরা ইউনিফর্ম খুইলা সিভিল ড্রেস পরলাম। একটা স্মাগলাররে ধরলাম। এতদিন পিটাইতাম, এখন স্মাগলার হইলাম। গিয়া দেখলাম যে ডেপ্লয়মেন্ট আছে। সতর্ক অবস্থা। দূর থেইকা ফরমেশন দেইখা বুঝতে পারলাম দুই-একটা সাঁজোয়া গাড়ি আছে, হালকা আর্টিলারি। মনে হইল একটা ব্যাটালিয়ন প্লাস, একটা ব্রিগেড পর্যন্ত মুভমেন্ট আছে। আমরা পাঁচটা-ছয়টার মধ্যে ব্যাক কইরা আসলাম। সন্ধ্যায় একটা স্টাডি পিরিয়ড টাইপের মিটিং ডাকলেন আমজাদ সাহেব, ফলোড বাই ডিনার। আমরা কী দেখলাম, এটা বললাম।

বিভিন্ন লোক, কেউ লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান, ভারতীয় সেনাবাহিনীর কী আছে, আমরা তো, এই সব। আবার কেউ বলল, আমরা ভারতীয় বাহিনীর কাছে প্রতিযোগিতায় কিছুই না। এইসব বিভিন্ন রকম কথা। সবাই জিজ্ঞেস করল, অ্যাজ আ কমান্ডার হোয়াট ইজ ইয়োর ইনস্ট্রাকশন টু আস। উনি একটা চমৎকার ইংরেজি বলেছিলেন, যেটা আমার সারা জীবন মনে থাকবে। দ্য মেয়ার প্রেজেন্স অব ইন্ডিয়ান আর্মি অ্যাট দ্য সাইড অব দ্য বর্ডার ইজ এনাফ থ্রেট ফর দিস ফরমেশন। আই উইল নট পুট মাই আনআর্মড সোলজার্স ইন ফ্রন্ট অব আর্মড ট্যাংক, র‍্যাদার আই উইল ফলো দেয়ার ইনস্ট্রাকশন। এই ধরনের কোনো ইনপ্রপোরশনেট যুদ্ধের কথা আমি বলতে পারি না। যুদ্ধ কোনো সলিউশন না। এটা কূটনৈতিক সলিউশনের মাধ্যমেই যা কিছু হইতে হবে। এবং সেটা পলিটিক্যাল নেতারাই করবে। আমাকে জিজ্ঞেস করল, আমার জায়গায় তুমি হলে কী করতা? বললাম, স্যার, আমি এই দুইটার মধ্যে একটাও করতাম না। বলতাম, ইউনিফর্ম খুইলা লুঙ্গি পইরা আর্মস আর অ্যামুনিশন নাও, বাড়িতে চইলা যাও। বললেন, তাতে কী লাভ হইত? বললাম, অন্য কিছু না করে প্রতিরোধ যুদ্ধ, গেরিলা যুদ্ধ করার জন্য বলতাম। না হইলে কমসে কম ডাকাতি করতাম। ডাকাতি করলে ইন্ডিয়ান আর্মি থাকতে পারবে না। আইনশৃঙ্খলা, নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। আসাম-উলফা, ওদের অনেক সমস্যা আছে। বাঙালি তো সুস্থ থাকতে পারে না, ডাকাতি-টাকাতি করবে। শান্তিরক্ষী বাহিনী আসবে। সভরেনটি রক্ষা করার কাজ কিছু একটা হবে স্যার। জাতিসংঘ আসলে তো আমার সভরেনটি কাইড়া নিবে না। বললেন, ইট ইজ আ নটোরিয়াস আইডিয়া, নেভার থট অব। এই হইল ১৫ আগস্টে আমার অভিজ্ঞতা।

দুই বা তিনদিন পরে আমাকে কোনো একটা কাজে আর্মি হেডকোয়ার্টারে আসতে হলো। আর্মির গাড়ি দেখলে সবাই রাস্তা থেইকা দৌড় দেয়। মোটামুটি একটা আরামের মধ্যে আসলাম। ক্যান্টনমেন্টে ঢুকেই, ফার্স্ট থিং যেটা আমার কাছে সিগনিফিকেন্ট মনে হইছে যে, দেশে একটা ডাকাত পড়ছে। মনে হইল লুটেরার রাজত্ব। রেডিও অফিসে দেখলাম চেনাশোনা একটা অফিসার, নাম বলা ঠিক হবে না। কোনো এক আওয়ামী লীগ নেতার আত্মীয়, ক্যাপ্টেন। কিছুদিন আগে চাকরিচ্যুত হইছে। সে দেখি


জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন

মোশতাক সরকারকে সমর্থন জানিয়ে ভাসানীর বার্তা, *দৈনিক বাংলা*, ১৭ আগস্ট ১৯৭৫

যে ইউনিফর্ম পইরা ওখানে আছে। বলল যে, বৃহত্তর কিছু অর্জন করতে হইলে ক্ষুদ্র কিছু স্বার্থ ত্যাগ করতে হয়। ওখানে আমার বন্ধু ছিল একটা, ডেপুটি ডাইরেক্টর আপেল মাহমুদ। তো আপেলের ওইখানে ঢুকলাম। শিঙাড়া খাইলাম। ও আবার সব পক্ষের লোক। আমাদের যেমন প্যানিক আছে, ওর নাই। পিয়নটা চা আনতে দেরি করল। বাইর হইয়া তারে পিটান দিল। সুইট ঝাড়ি দিল। উর্দুতে গালি দিল, দেরি হচ্ছে কেন আনতে। আমি ইউনিফর্ম পরা, ঘাতকদের একজন না হইয়া যাই। ওর আচরণে আরও ভয় পাইয়া গেলাম। কোনো রকমে শিঙাড়া-টিঙাড়া খাইয়া মানে মানে কাইটা পড়লাম।

আর্মি হেডকোয়ার্টারে আইসা দেখলাম যে আমাকে তো রিপোর্ট করতে হবে লগ এরিয়াতে। দেখলাম সিচুয়েশন কন্ট্রোলে। কে দায়িত্বে আছে বুঝা যায় না। এটা একটা স্বাস্থ্যকর সিচুয়েশন না আমার জন্য। সিজিএস খালেদ মোশাররফরে দেখলাম এক নজর। উনি আমারে ইশারা করলেন থাকতে। উনার সঙ্গে আমার একটা বিশেষ সম্পর্ক ছিল। ওখান থেকে বের হইয়া...ক্যান্টনমেন্টের ওখানে কয়টা ফলের দোকান ছিল, হাবিব ফ্রুটস ছিল। একটা ফোনের জায়গায় গিয়া জানালাম যে চলে আসতেছি। বিমানের ক্যাটারিং স্টেশন ছিল। সেখানে সাকের ভাই ছিলেন। ওনার ওইখান থেকে ফোন করলাম। উনি ক্যুর বিবরণ দিলেন। দেখলাম বিকাল হইয়া গেছে। ভাবলাম সকালে যাই, রাতটা কাটাই। ওয়াপদার ডেপুটি ডাইরেক্টর ছিলেন মাহফুজ আলম বেগ। উনি আমার যুদ্ধকালীন কমান্ডার ছিলেন। উনি থাকতেন বনানী ওয়াপদা স্টাফ কোয়ার্টারে। লেকের পাড়ে। আমি আইসা ওনাকে কানেক্ট করলাম। শাজাহানপুর-খিলগাঁয় থাকতেন বীর উত্তম শাজাহান উমর। যেহেতু আমরা একসঙ্গে যুদ্ধ করা লোক, কীভাবে যেন আমাদের মধ্যে একটা কানেকশন হইল। যদি কাছাকাছি থাকি, তারা সকালে ওয়াপদা বিল্ডিংয়ে আসবে। কর্নেল তাহের তখন ড্রেজারে চাকরি করতেন। ডাইরেক্টর ছিলেন।

বেগ সাহেব এবং শাজাহান উমর দুজনই আমার খুব ঘনিষ্ঠ। সেরনিয়াবাত তখন পানিসম্পদমন্ত্রী। বেগ সাহেব শাজাহান উমরের সামনে কর্নেল তাহেরকে জিজ্ঞেস করছে (ইতিপূর্বে সেরনিয়াবাত তাহেরের একটি উপকার করেছিলেন, সেই প্রসঙ্গ টেনে), তাঁকে আপনারা মাইরা ফেললেন? তাহের বললেন, কই, তাঁকে তো মারার কথা না। বেগ সাহেব আমারে বলছে। শাজাহান উমর আমার ঘনিষ্ঠ লোক। বলল, বুঝছিস, কাদের মারার কথা ১৫ আগস্ট, তুই (তাহের) তাহলে জানতিস? একেবারে ইনস্ট্যান্ট শাজাহান উমরের উক্তি। আমি বুঝে নিয়েছি যে, তাহের জানত। দে আর পার্ট অব ইট। এবং গণবাহিনীর ব্যাপারটা, তাহের তো গণবাহিনীর লিফলেট দিতেন সেনাবাহিনীতে। আমি লিফলেট পড়েছি। তাদের প্যানিট্রেশন এ রকম! আবার ডিএফআইতে (এখন নাম ডিজিএফআই) তাদের প্যানিট্রেশন! রাজশাহী বিভাগের যে ইনচার্জ ছিল, তার নাম হইল মেজর সেলিম। সেলিম আমাকে ইন্টারোগেট করে, 'র' সম্পর্কে। তখন 'র' কী জিনিস বুঝি না। টু বি ভেরি ফ্যাংক। তার কথাবার্তার ধরন যা ছিল, সেই সময়টা, বুঝতে পারতাম। কিন্তু কী রিঅ্যাক্ট করতে হয় সেটা জানতাম না। হি ওয়াজ টকিং টু দ্যাট লেভেল অব ন্যুইসেন্স উইথ মি। আমাকে দুই দিন কনটিনিওয়াসলি জেরা করেন। এটা ১৫ আগস্টের আগের ঘটনা। এই ধৃষ্টতা তাঁদের ছিল। এইটা ছিল অব্যবস্থাপনা। ওই সময় কোনো কিছুই প্রফেশনালি চালানো হয় নাই। কতখানি প্যানিট্রেশন ছিল গণবাহিনীর? লিফলেট যে দিত, সেটা ডিএফআইয়ের বিষয় না। বিষয় হইল, আমি 'র'-এর কি না। অল ফোকাস ওয়াজ মিসলেড, মিসজাজড, মিসগাইডেড। একটা সিকিউরিটি ফোর্সের যা দরকার তার বিন্দুমাত্র ছিল না।

আমি ১৮ আগস্ট ঢাকায় আসি। সম্ভবত ২০ বা ২২ তারিখ চলে যাই। সফিউল্লাহ ইনক্যাপাসিটেড হইয়া গেছিল। অক্ষম। কোনো কমান্ড নাই। কমান্ড সব ওদের হাতে, ঘাতকদের হাতে। আর জিয়া, যেটুকু আমার কাছে মনে হইছে, একধরনের লিভারেজ ছিল। মানে একটা অথরিটি ছিল। ফুল অথরিটি না। ওই সময় অ্যাবসলিউট কন্ট্রোল ছিল বইলা আমার মনে হয় নাই। একজাক্ট সিচুয়েশনটা কী, কেউ বলতে পারতেছে না। এই অবস্থায় আমি কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে ফিরলাম। তবে এইটা বুঝলাম, কান্ট্রি ইজ বিইং রান বাই ফিউ মেজরস। কুমিল্লা যাওয়ার পর আমি জানি যে, জিয়া অফিশিয়ালি হ্যাজ বিন মেইড চিফ অব স্টাফ।


দৈনিক বাংলা

নাবাহিনী প্রধান পদে জেঃ জিয়াউর রহমান

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ ও পদোন্নতি

সোভিয়েটের স্বীকৃতি

মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত হলেন

শচিন কর্মকারের বর্ণনায় কুমিল্লা সীমান্তে ভারতীয় বাহিনীর সমাবেশের যে তথ্য পাওয়া যায়, মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বার্তায়ও সেটা লক্ষণীয়। ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিস ইউজিন বোস্টার ১৭ আগস্ট ওয়াশিংটনে পররাষ্ট্র দপ্তরে পাঠানো তারবার্তায় জানিয়েছিলেন, পশ্চিমে হিলি ও পূর্বে কুমিল্লা সীমান্তে ভারতীয় সেনাবাহিনী শক্তি বৃদ্ধি করেছে বলে খবর এসেছে। 'বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর তৎপরতাকে ভারতীয় সেনা চলাচলের পাল্টা সাড়া হিসেবেই দেখা যেতে পারে।'

দেশের বাইরে হাতে গোনা যে কয়টি দূতাবাস ছিল, তার মধ্যে দিল্লি আর লন্ডন ছিল সবচেয়ে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ। দিল্লিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার অধ্যাপক এ আর মল্লিক

ঢাকায় এসে অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়েছিলেন। ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার ছিলেন পেশাদার কূটনীতিক আতাউল করিম। পরে মস্কোয় নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত শামসুর রহমান খান দিল্লিতে হাইকমিশনার নিযুক্ত হন। তিনি শেখ মুজিবের খুব ঘনিষ্ঠ এবং 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায়' অভিযুক্তদের একজন ছিলেন। ১৪ আগস্ট ১৯৭৫ তিনি দিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনে ভারতের রাষ্ট্রপতি ফখরুদ্দিন আলী আহমদের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয়পত্র পেশ করেন।

দিল্লির দূতাবাসে প্রায় সবাই ছিলেন শেখ মুজিবের আস্থাভাজন বা অনুগত। কর্নেল আবুল মনজুর (পরে মেজর জেনারেল) ছিলেন মিলিটারি অ্যাটাশে। ওই সময় কর্নেল এরশাদ দিল্লিতে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের (এনডিসি) প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন। হাইকমিশনে তৃতীয় সচিবের দায়িত্বে ছিলেন মো. কামালউদ্দিন। তিনি ওই সময়ের একটা বিরবণ দিয়েছেন :

> কর্নেল মনজুর ছিলেন খুবই ভদ্র। তিনি কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নিতেন না। আমাদের কারও বাসায় দাওয়াত থাকলে তিনি আগে এসে দুঃখ প্রকাশ করে চলে যেতেন। তিনি সত্যিই দেশকে ভালোবাসতেন। আমাকে বলে রেখেছিলেন, 'এরশাদ যদি কোনো কারণে আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়, তুমি রিসেপশনে বলে রাখবে আমার সঙ্গে যেন দেখা না হয়।'
>
> ১৫ আগস্ট ছিল ভারতের স্বাধীনতা দিবস। প্রথা অনুযায়ী সকালে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী লালকেল্লা থেকে ভাষণ দিচ্ছেন। শ্রোতাদের মধ্যে কূটনীতিকদের জন্য সংরক্ষিত জায়গায় বসে আছি। হঠাৎ কেউ একজন পেছন থেকে ঘাড়ে হাত দিয়ে আমাকে কিছু বলতে চাইল। ব্যাপারটা কূটনীতিকদের জন্য শোভন না। আমি ঘুরে তাকাতেই দেখলাম ভিয়েতনাম বা কম্বোডিয়ার একজন কূটনীতিক। বললেন, 'তুমি কি জানো, তোমার দেশে কী ঘটেছে? তুমি যে এখনো বসে আছো?' আমি অবাক হয়ে বললাম, 'জানি না তো!' সে আমাকে বলল, 'তুমি মিশনে যাও, রেডিও শোনো।'
>
> সামনের দিকে আমাদের হাইকমিশনের কয়েকজন কর্মকর্তা ছিলেন। তাঁদের কাছে যাওয়া সম্ভব ছিল না। মিশনে ফিরে এসে দেখি কর্নেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। ওদের কলেজ আমাদের দূতাবাসের পায়ে হাঁটা দূরত্বে। আমি তখন মানসিকভাবে বিধ্বস্ত। তিনি আমাকে বললেন :
>
> —আপনি কি হাইকমিশনের লোক?
>
> —হ্যাঁ, আমি থার্ড সেক্রেটারি।
>
> —এই ছবিটা কেন এখানে আছে?
>
> —কোন ছবিটা?
>
> —ওই যে, ওই যে, শেখ মুজিবের ছবি। ওইটা নামান।
>
> —আপনার কথায় তো এটা নামানো সম্ভব না। আমাদের কাছে যদি নির্দেশ আসে, তাহলে নামাব।
>
> —বাহ্ আপনি তো একটু অন্যভাবে কথা বলেন।
>
> ছবি আমি নামাইনি। দুপুরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন জার্মানি থেকে দিল্লি বিমানবন্দরে এলেন। আমি দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রটোকল অফিসার। তাঁকে হাইকমিশনারের বাসায় নিয়ে গেলাম। তাঁরা দুজন একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ কাঁদলেন। কামাল হোসেন একদিন হাইকমিশনারের বাসায় ছিলেন। পরে লন্ডন চলে যান।
>
> এ রকম একটা ঘটনা ঘটতে পারে, ভারতীয় কর্তৃপক্ষ মনে হয় বুঝতে পারেনি। তারা আমাদের কয়েক সপ্তাহ অফিসে যেতে নিষেধ করেছিল। আমরা এক সপ্তাহ যার যার বাড়িতেই ছিলাম। এরপর দূতাবাসে যাওয়া শুরু করি।


কামাল হোসেন, যখন পররাষ্ট্রমন্ত্রী

১৫ আগস্টের অভ্যুত্থান ও হত্যাকাণ্ডের খবর শুনে ইন্দিরা গান্ধী বিচলিত হয়েছিলেন, ইন্দিরার বন্ধু ও জীবনীকার পুপুল জয়াকারের লেখায় বিষয়টি উঠে এসেছে। জয়াকারকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা র-এর প্রধান আর এন কাও বলেছিলেন, মুজিবকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল ১৯৭৪ সালেই এবং বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহের গোপন তৎপরতার খবর তাঁর কাছে ছিল। তিনি ব্যক্তিগতভাবে বিষয়টি ইন্দিরাকে জানিয়েছিলেন এবং ইন্দিরা তাঁকে এ নিয়ে কথা বলার জন্য ঢাকায় পাঠিয়েছিলেন। কাও এ প্রসঙ্গে বলেন, 'আমরা বাগানে হাঁটছিলাম। আমি মুজিবকে বললাম, আমাদের কাছে তথ্য আছে যে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে। কিন্তু তাঁর মধ্যে উদ্বেগ ছিল না। বললেন, "আমার কিছুই হবে না। ওরা তো আমারই লোক।" আমি তাঁকে আমাদের পাওয়া সুনির্দিষ্ট তথ্যের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছিলাম।' পঁচাত্তরের মার্চে কাও জানতে পারেন যে বাংলাদেশের গোলন্দাজ বাহিনীতে মুজিবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে। ইন্দিরা সঙ্গে সঙ্গেই মুজিবকে তা জানিয়েছিলেন। 'কিন্তু মুজিব এটা বিশ্বাস করেননি। তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশের জাতির জনক; তাঁর লোকেরা তাঁকে খুন করতেই পারে না।' চুয়াত্তরে এমন খবরও ছিল যে বাংলাদেশের বাইরে থেকেও ষড়যন্ত্র হচ্ছে। ১৫ আগস্টের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে জয়াকার বলেন :

> আমি ১৫ আগস্ট সন্ধ্যায় ইন্দিরার বাসায় গিয়েছিলাম। দেখলাম তিনি ভয়ে আচ্ছন্ন। নিজেকে নিরাপদ মনে করার চিন্তাটা একেবারে তলানিতে পৌঁছে গেছে। লালকেল্লা যাওয়ার ঠিক আগে তিনি হত্যাকাণ্ডের খবরটি শুনেছিলেন। সযত্নে তৈরি করা ভাষণটি তিনি দিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো ঘোষণা দেওয়ার কথা তাঁর মনে হয়নি।
>
> তিনি আমাকে বলেছিলেন, মুজিব হত্যা হলো ষড়যন্ত্রের প্রথম অধ্যায়, যা গোটা উপমহাদেশকে প্রভাবিত করবে। তিনি নিশ্চিত যে তিনিই হবেন পরবর্তী লক্ষ্য। মুজিবের ছোট ছেলের খুন হওয়ার খবরটা তাঁর সব চিন্তা এলোমেলো করে দিয়েছিল। তিনি ভয় পেয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'আমি গোয়েন্দা রিপোর্টকে গুরুত্ব দিইনি। কিন্তু এটা উপেক্ষা করা আর ঠিক হবে না।' তিনি সব ব্যাপারেই সন্দেহপ্রবণ হলেন এবং সবাইকে সন্দেহ করতে শুরু করলেন। ছায়ার মধ্যেও তিনি শত্রু দেখতে পান। আমাকে বললেন, 'কাকে বিশ্বাস করব? রাহুল (ইন্দিরার ছেলে রাজীব গান্ধীর পুত্র) মুজিবের ছেলের প্রায় সমান বয়সী। কাল তার অবস্থাও এমন হতে পারে।

তারা আমাকে এবং আমার পরিবারকে শেষ করে দেবে।'

মুজিব হত্যা ইন্দিরার মনে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিল। ইন্দিরা তাঁর আস্থাভাজন আর এন কাওকে বলেছিলেন, 'আমি ভালো নেই। আমি এক ঘরে ঘুমাই, সঞ্জয় (ইন্দিরার ছোট ছেলে) ঘুমায় পাশের ঘরে। যদি কিছু ঘটে যায়, ওকে ডাকতে পারব।' দুটো ঘরের মধ্যে এক চিলতে বারান্দা। মুজিবের মৃত্যুর পর থেকে ইন্দিরা তাঁর ঘরের দরজা খোলা রাখতেন।

নতুন রাষ্ট্রপতি খোন্দকার মোশতাক আহমদকে মার্কিনপন্থী এবং নিহত রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে সোভিয়েত প্রভাবাধীন বলয়ের একজন হিসেবে মনে করা হতো। ১৫ আগস্টের পর ওই দুটো দেশের প্রতিক্রিয়ায় এর প্রতিফলন দেখা যায়। একটি মার্কিন দলিলে মন্তব্য করা হয়, '১৯৭৫ সালের আগস্টে একটি দুর্নীতিগ্রস্ত, অকার্যকর এবং সহিংসতাপ্রবণ হয়ে ওঠা সরকারের পতন ঘটাতে সংকল্পবদ্ধ তরুণ সেনা কর্মকর্তাদের পরিচালিত অভ্যুত্থানে মুজিব নিহত হন।' অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিক্রিয়ায় মুজিব হত্যাকাণ্ডে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। ১৯ আগস্ট প্রাভাদায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধের উদ্ধৃতি দিয়ে একটি মার্কিন দলিলে বলা হয়, মুজিব ও তাঁর পরিবারকে হত্যাকারী 'কসাই'দের বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর 'বিয়োগান্ত' মৃত্যুতে সোভিয়েত ইউনিয়নের মানুষ 'তীব্র শোক প্রকাশ করছে।'

আগস্ট অভ্যুত্থানে সবচেয়ে খুশি হয়েছিল পাকিস্তান। পাকিস্তান ১৫ আগস্টেই মোশতাক সরকারকে স্বাগত জানায় এবং শুভেচ্ছার প্রতীক হিসেবে ৫০ হাজার টন চাল ও দেড় কোটি গজ কাপড় পাঠানোর অঙ্গীকার করে। বাংলাদেশের নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দিতে পাকিস্তান অন্য ইসলামি দেশগুলোর প্রতিও আহ্বান জানায়। অন্যদিকে ভারত সতর্ক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। ১৭ আগস্ট এক সরকারি বিবৃতিতে বাংলাদেশের ঘটনাবলিকে 'অভ্যন্তরীণ বিষয়' হিসেবে উল্লেখ করা হয়। চীনের সংবাদ সংস্থা অভ্যুত্থানের খবর দিলেও কোনো মন্তব্য করেনি।

১৬ আগস্ট লন্ডনে বসবাসরত প্রায় দুই শ বাঙালি মোশতাক সরকারের প্রতি সমর্থন জানাতে বাংলাদেশ হাইকমিশনে যান এবং দেয়ালে ঝোলানো শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি ভেঙে চুরমার করে দেন। হাইকমিশনের ৫০ জন কর্মচারীর মধ্যে কয়েকজন


ইন্দিরা গান্ধী

তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে নতুন সরকারের পক্ষে স্লোগান দেন।

১৭ আগস্ট *ইত্তেফাক*-এ প্রকাশিত এক সংবাদে জানা যায়, মওলানা ভাসানী ১৬ আগস্ট খোন্দকার মোশতাকের কাছে পাঠানো এক তারবার্তায় নতুন সরকারের প্রতি 'পূর্ণ সমর্থন' জানিয়েছেন। এই পরিবর্তনকে তিনি 'এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ' বলে অভিহিত করেন এবং দেশের বুক থেকে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি নির্মূল করার এবং অনিশ্চয়তার অবসান ঘটানোর আহ্বান জানান। তিনি মোশতাকের উদ্দেশে বলেন, 'আল্লাহ আপনার ও নয়া সরকারের সহায় হোন।'

মোহাম্মদ তোয়াহা বাংলাদেশে আত্মগোপনে থাকা অবস্থায় বেশ কিছুদিন শেখ মুজিবের আশ্রয়ে ছিলেন। কিন্তু এ জন্য তাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞতাবোধ ছিল না। ১৮ আগস্ট পূর্ব বাংলার সাম্যবাদী দলের (মা-লে) কেন্দ্রীয় কমিটির একটি বিবৃতিতে বলা হয়, 'বিগত ১৫ আগস্ট সেনাবাহিনী রুশ-ভারতের নিয়ন্ত্রিত খুনি দুর্নীতিবাজ মুজিব সরকারকে উৎখাত করেছে। দেশবাসী তাতে আনন্দিত। আমরাও সেনাবাহিনীর দেশপ্রেমিক অংশকে স্বাগত জানাই।'

জাসদ, ইউপিপি এবং জাগমুই ১৫ আগস্টের পর একটি বিবৃতি তৈরি করেছিল। ২০ আগস্ট বিবৃতিটি লিফলেট আকারে প্রচার করা হয়। বিবৃতিতে বলা হয়, 'বাকশাল ছিল এক ব্যক্তির নিষ্ঠুর ফ্যাসিস্ট ব্যবস্থা, যার অবসান আমাদের কাম্য ছিল। কিন্তু মোশতাকের নেতৃত্বাধীন সামরিক শাসনও কাম্য নয়।'

ভারতের সরকারি মুখপাত্রের বরাত দিয়ে পরিবেশিত বিবৃতিতে বলা হয়, 'বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলি সেখানকার অভ্যন্তরীণ ব্যাপার।' ভারতের হাইকমিশনার সমর সেন ১৯ আগস্ট বঙ্গভবনে খোন্দকার মোশতাক আহমদের সঙ্গে দেখা করেন।

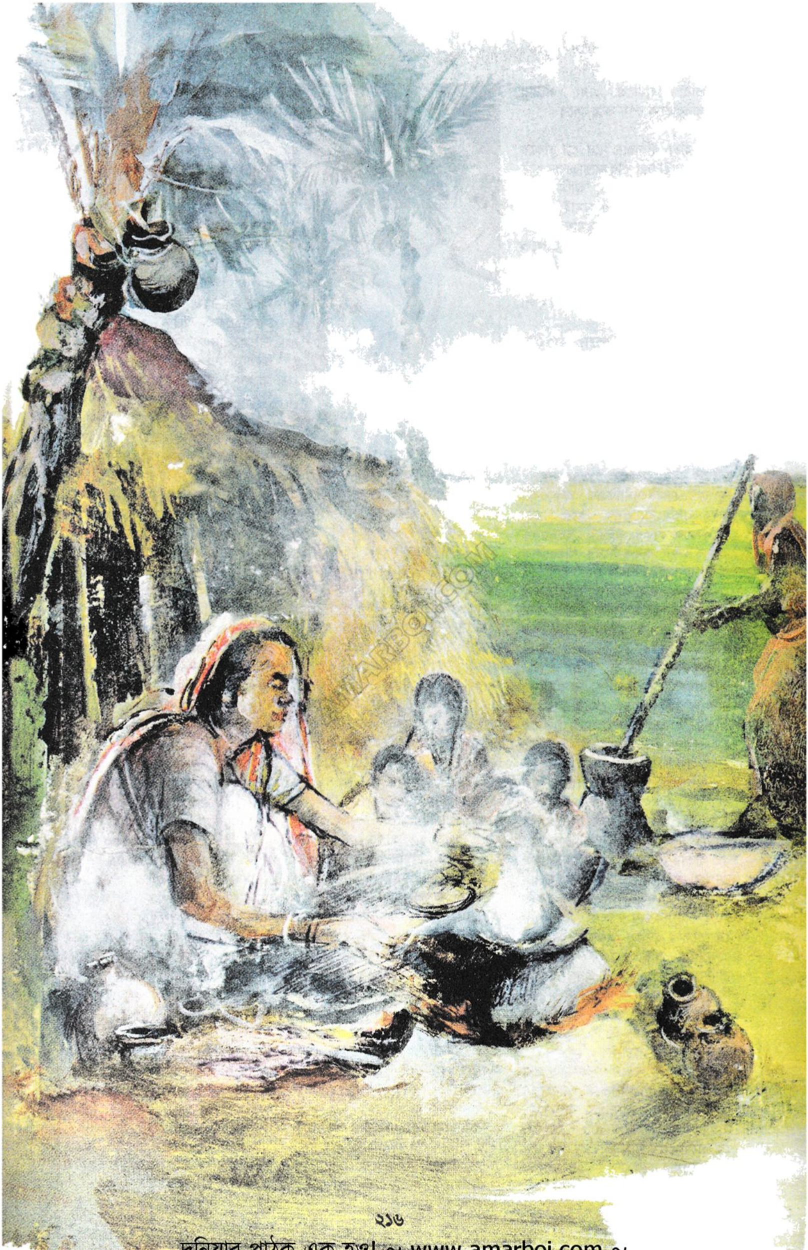
২০ আগস্ট জারি করা সামরিক আইন ১৫ আগস্ট সকাল থেকে কার্যকর হয়েছে বলে ঘোষণা দেওয়া হলো। ২১ আগস্ট *বাংলাদেশ অবজারভারের* প্রধান সম্পাদকীয় মন্তব্যের শিরোনাম ছিল 'ফ্রিডম ফ্রম ফিয়ার' (ভয় থেকে মুক্তি)।

জাতীয় লীগের সভাপতি এবং আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা আতাউর রহমান খান বাকশালে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি ১৫ আগস্টকে 'নাজাত দিবস' হিসেবে আখ্যা দেন। জাতীয় সংসদের স্পিকার আবদুল মালেক উকিল সে সময় বিদেশে ছিলেন। লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দরে ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে মন্তব্য করে তিনি বলেন, জাতি ফেরআউনের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছে। কিছুদিন পর বাকশালের ১৫ সদস্যের কার্যনির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্য মহিউদ্দিন আহ্‌মেদ খোন্দকার মোশতাকের একটা ব্যক্তিগত চিঠি নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থন পাওয়ার আশায় মস্কো যান। প্রায় প্রতিদিন গণমাধ্যমে মোশতাকের নেওয়া পদক্ষেপকে সমর্থন জানিয়ে বিবৃতি ছাপা হতে থাকে।

২৩ আগস্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, কামারুজ্জামান, আবদুস সামাদ আজাদ, কোরবান আলীসহ ২০ জন আওয়ামী-বাকশাল নেতা গ্রেপ্তার হন। ২৪ আগস্ট মে. জেনারেল সফিউল্লাহকে সরিয়ে মে. জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। জেনারেল (অব.) এম এ জি ওসমানী রাষ্ট্রপতির প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা নিযুক্ত হন।

সংবিধান বহাল থাকে। ৩০ আগস্ট জারি হয় 'রাজনৈতিক দল (নিষিদ্ধকরণ) অধ্যাদেশ।' পয়লা সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতির আদেশে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর 'বাকশাল পদ্ধতি' বাতিল করা হয়। ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ রাষ্ট্রপতি খোন্দকার মোশতাক আহমদ 'ইনডেমনিটি' অধ্যাদেশ জারি করে ১৫ আগস্ট অভ্যুত্থান ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে জড়িতদের আইনি সুরক্ষা দেন। এই আদেশে বলা হয়েছিল, ১৫ আগস্ট অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত কারও বিরুদ্ধে কোনো আদালতে কোনো ধরনের আইনি ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না।

স্থানাভাবে এই লেখার তথ্যসূত্র দেওয়া সম্ভব হলো না। তবে প্রকাশিতব্য বইটিতে পূর্ণাঙ্গ তথ্যসূত্র থাকবে।



উপন্যাস



সাগুফতা শারমীন তানিয়া

শতকিয়া

১ পর্ব

পৌষ মাসের দুর্জয় শীতে যখন পাড়াগাঁয়ে মোষের শরীরে কাঁপই ধরিয়া যাইত, আমরা তিন ভাই মিলিয়া লালজমিনে হলুদ কল্কাদার দোলাই গায়ে দিয়া হিহি করিতে করিতে আখি-গুড়ে পাক দেওয়া চিড়ার চাক কি ছোলার চাক খাইতাম। তখন পাগলা সাবু নিজের নগ্ন পৃষ্ঠে শিকলের বাড়ি দিতে দিতে আমাদের ঘরের সুমুখ দিয়া ভিখ মাঙিয়া হাঁটিয়া যাইত। সাবু কোনকালে পাগল হইয়া আমাদের গ্রামে আসিয়া থান গাড়িয়াছিল, তাহা কেহ হলফ করিয়া বলিতে পারিত না। সাবুর গায়ের রং এককালে টকটকে ছিল শোনা যায়, অনাচারে তাহা ধূলিমলিন হইয়া গিয়াছে। পিঙ্গল পৃষ্ঠে কতকগুলি দড়ার ন্যায় পাকানো দীর্ঘ কালশিটা। চুলে জট। পিন্ধনে চট। গভীর মনোবৈকল্যে সাদা হইয়া আসা দৃষ্টি সত্ত্বেও বোঝা যাইত—একদা সাবু যারপরনাই

সচিত্রকরণ : জামাল আহমেদ

খুবসুরত ছিল। আমরা ছেলেপুলেরা তাহাকে দেখিবামাত্র ভয়ে পলাইতাম। শুনিতে পাইতাম সাবুর আসল নাম সাহাবুদ্দীন। গোরাসাহেবদের অত্যাচারে পাগল হইয়া গিয়াছে। কেহ বলিত সাহাবুদ্দীন শেখেদের পো, এক ব্রাহ্মণকন্যার প্রেমে পড়িয়াছিল, বিবাহ দূরে থাক, কন্যার পিতা তাহাকে জনসমক্ষে এমন বেইজ্জত করিয়াছিল যে সেই শোকে সে পাগল হইয়া ঘর ছাড়িয়াছে। মোটের উপর বুঝিতাম, সাবু জাতে মোসলমান, দীনের হইতেও দীন। করুণাপরবশ হইয়া আমার মা তাহাকে ডাকিয়া ভাত খাওয়াইতেন। আউশচালের রাঙা রাঙা ভাত। পুরাতন তেঁতুল আর চিটাগুড়। পাগল ছড়াইয়া ছিটাইয়া কলাপাতায় মোটা ভাত চটকাইয়া খাইয়া উঠিত, উঠিয়া পগারের দিকে নিজের উচ্ছিষ্ট টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া আসিত।

দুরন্তপনা করিলে কিংবা ঘুমাইতে দেরি করিলে আমার নানি তালপাখার ডাঁটা দিয়া দুই-চারি ঘা বসাইয়া দিয়া কহিতেন, 'সাবুর মাইয়ার লগে বিয়া দিমু তরে জুড়ান!' লোকমুখে শোনা যায়, সাবু নীলকুঠির গুপ্তধনের খোঁজ জানে, কন্যার বিবাহে খরচ করিবে বলিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছে। ঘোষেদের ঢোলগোবিন্দ বলিত, সে স্বচক্ষে দেখিয়াছে, সাবুর একটি কন্যা আছে এবং সে পুঁথির জয়নবের ন্যায় নিরতিশয় সুরূপা। কিন্তু সাবুকে শ্বশুর হিসাবে কে চাহিবে? অতএব পাগল শ্বশুরলাভের আশঙ্কায় বাধ্য হইয়া ঘুমাইয়া পড়িতাম।

আমাদের পালপাড়ার বন্ধু রাখাল একদিন খবর আনিল সাবুর আসল নাম শিবু, শিবনাথ। মালোদের ছেলে। ইংরাজবিরোধী বিপ্লবের ষড়যন্ত্র করিয়াছিল বলিয়া তাহাকে ব্রহ্মদেশের মান্দালয়ে জেল খাটিতে হইয়াছে। জেলারসাহেবের অত্যাচারে পাগল হইয়া গিয়াছে। সেকালে দীনবন্ধু মিত্রের *নীলদর্পণ* নাটক দেখিয়া আসিয়া ঢোলগোবিন্দর ছোটকাকা গল্প করিতেন, শুনিয়া আমাদের নবীন বুকের রক্ত রোষে ফুলিয়া উঠিত। অতএব আমরা তিন ভাই, রাখাল আর পালপাড়ার অন্য ছেলেরা ঠিক করিলাম সকলে মিলিয়া সাবুর জন্য একখানি ঘর তুলিয়া দিব।

নদীর ধারে শ্মশানবাড়ির নিকটে পোড়োজমিতে প্রবল দেশপ্রেমের তাড়নায় আমরা ঘর তুলিতে শুরু করিলাম। শীতের নদী শীর্ণ হইতে হইতে প্রায় মৃতসলিলা হইয়া আসিয়াছে। পাড়ের কর্দমে নীলাভসবুজ গাঙদাঁড়া মাছ বুড়বুড়ি কাটিয়া যায়। মাখনা আর কলমিলতা ছাইতে শুরু করিয়াছে। রাখালের দিদি উলূপী আসিয়া একদিন কাদামাটির চাপড়া লেপিয়া-জুড়িয়া মাটির চুলা গড়িয়া দিয়া গেল। চালে খড় ছাওয়া হইয়াছে, খড়ি ঠেলিবার চুলা হইয়াছে, উঠানমতন একটুখানি জায়গা ঝাঁটা দিয়া পরিষ্কার করিয়া দিশিকুমড়ার চারা লাগানো হইয়াছে। পরিত্যক্ত মাদুর আর ছিঁড়া কাঁথা জুটাইয়া আনিয়াছি। চাষাদের গাঁ, ছিঁড়া কাঁথাখানি গেরস্থলোকে শ্রাবণ মাসে আউরত জাতকে দিয়া আরেকবার সিলাইয়া লয়, কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না। ঘর তো একরকম হইল, কিন্তু পাগলকে আনিবে কে? একে বুদ্ধিভ্রষ্ট উন্মাদ, তায় তাহার হাতে ভীষণদর্শন শিকল। তাহার কাছেই ভিড়িতে সাহস হয় না আর কুটিরে টানিয়া আনা!

দেখা গেল, শীঘ্রই আমাদের ঘরখানির আরও উপযোগিতা বাহির হইল। নদীর ধারে ওই দিকটায় সহসা কেহ আসিত না, রাশি রাশি অঙ্গার, অসাবধানে হাঁটিলে পায়ে মড়ার হাড় ফুটিত। কপিলা গাছগুলির মগডালে দুর্গন্ধ ডানায় পাখসাট মারিত শকুন। পরপারে সারাবেলা ছাতারে পাখির ডাক শুনিতে শুনিতে কাশ আর শর উদাস বাতাসে মাথা দোলাইত। গুগলি খাইতে বিলাতি হাঁস নামিত অদূরে পদ্মার চরে। নাও বোঝাই করিয়া কুমড়া নিয়া চাষারা যাইত ওপারের হাটে। ঘরের পিছনের ঝোপগুলিতে সাদা-সাদা ঘেঁটুফুল—তাহার ভিতর দিয়া সরসর করিয়া চলিয়া যাইত বদরাগী স্বর্ণগোধিকা। শুক্লপক্ষের সন্ধ্যাবেলা সেই দাওয়ায় বসিয়া থাকিলে একেবারে নাক বরাবর পিঠার আকৃতির হলুদ চাঁদ উঠিত। ওই ঘরখানি আমাদের খেলাঘরে পরিণত হইল। খেতের চাউল, কড়াইশুঁটি, কলাই, বেগুনখেতের বেগুন (সকলি চুরির দ্রব্য), শেওলার আড়ালে জুটিয়া যাওয়া হাঁসের ডিম—চাষার পো এই আমরা একদিন সাহেবদের অনুকরণে টোপাভাতি করিয়া ফেলিলাম; করিয়া ফেলিয়া এহেন চিত্তচাপল্যে লজ্জিতও হইলাম—কোথায় বিপ্লবী বীরের আবাস হইবে তাহা নয়, কিছু মতিচ্ছন্ন বালকের প্রমোদক্রীড়াস্থল হইয়াছে সেই কুটির। আমাদের প্রেষণার মতন আমাদের লজ্জাও দীর্ঘস্থায়ী হইল না, সেই শীতে আরও কয়েকবার আমরা টোপাভাতি করিলাম। আমাদের সর্বসুখ অবশ্য অধিককাল পরমপিতার সহিল না। শ্মশানের সিদ্ধিখোরদের একটি দল আসিয়া আমাদের সে ঘর হইতে উন্মূল করিয়া দিল।

আমাদের বেদনাও দীর্ঘস্থায়ী হইল না। লঘুচিত্তের বালকদের কান্নাহাসিতে কী আসে যায়। পরামানিকের কাছে খেউরি করিতে বসাইয়া দিলে যাহার চোখে পানি আসে, তাহার বেদনাতে বিশ্বাস কী!

গাঁয়ের জীবন যথারীতি চলিতে লাগিল। উত্তরের ভিনগাঁ হইতে মোষ আনিয়া মলন চলিল; সিউলিদের ছেলেদিগের খেজুররস আহরণ— মাঠে গুড় জ্বাল দেওয়া— মাটির হাঁড়িতে রাত জাগিয়া ধানসিদ্ধ করা ইত্যাদি সকলি চলিল। জ্যোৎস্নার মতন ফকফকে চিঁড়া কোটা হইতে লাগিল, গভীর রাত্রে চাষাদের ঘরে উদূখলে সেই পিঠার চাউল গুঁড়ি হইতে লাগিল। রবিশস্যে মাঠকে মাঠ ঝলমল করিতেছে। ঢোলগোবিন্দের কাকির পরপর তিনটি মৃতসন্তান জন্মিয়াছে, কাকি কার্তিকপূজা করিলেন এবং তাহাতে রবাহূত ছেলেরা তিলের নাড়ু, ক্ষীরের নাড়ু, মুগের নাড়ু মুঠি মুঠি খাইল—ছড়াইল।

২ পর্ব

শীত চলিয়া গিয়া একসময় বেজায় গরম পড়িল। ওলাবিবি আসিবার ভয়ে গাঁয়ের চতুর্দিক বাঁধানো হইয়াছে এইবারও। রাধাকৃষ্ণ সাজিয়া অষ্টকপূজারির দল ঢোল-কাঁসি-চাকি বাজাইয়া চৈত্রের গাঁওগেরামে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সারাবেলা নিমগাছে পাতিকাকগুলি বসিয়া কমলা টাগরা দেখাইয়া হাঁপাইতে থাকে। ফাল্গুন আসিবার পর হইতে আমাদের বাড়িতে কেবলি শজিনা আর গ্যাঁদালপাতার ঝোল রান্না হইতে লাগিল। চাষের জমি ফাটিয়া চৌচির। ঝাঁ-ঝাঁ রৌদ্রের দুপুরে চিল তীক্ষ্নস্বরে ডাকিতে লাগিল কেবল। দিঘির জল পচিয়া উঠিল, ঘোলাজলে পাতিহাঁসগুলি সারাবেলা গুগলি খুঁজিয়া নিষ্ফল ফিরিতে লাগিল—কাজেমের পিতার রাতকানা রোগ সারাইতে কাজেমের বোনেরা ডোবার সকল গুগলি নিয়মিত তুলিয়া রাঁধিয়া ফেলিয়াছে; নদীর দিকের খোঁড়লগুলিতে কিঞ্চিৎ প্রয়াসেই কই-ল্যাটা-রয়না-সরপুঁটি উঠিত, সে'স্থলে কেবলি কাদা, জাল ঠেলিলে তাহা ভরিয়া বড়জোর কোলাব্যাঙ মিলিবে। ব্যাঙের লোভে আবার কালসাপ আসিয়া জুটিবে। কাহারদের এক ছেলেকে সেদিন কেউটে সাপে কাটিল, ওঝা-গুনিন-বিষবেদে আসিয়া তারস্বরে চেঁচাইল—

'পানিতে পইড়া ডুব দিস
বাদা জমিত হাঁক দিস
চালে উঠ্যা বাগ দিস
ঢুলির ঢোলে কাঠি দিস
তয় যাইবে তোর সাপের বিষ'

বিষ গেল না, ধড়ফড়াইয়া মরিয়া গেল সে—কেহই কিছু করিতে পারিল না।

আমাদের নদীতীরবর্তী সেই খড়ের ঘরের অদূরে একদিন

একটি মড়া ভাসিয়া উঠিল। দীর্ঘকেশ, লালপাড় বিলাতি-ধুতির শাড়ি পালের মতন ফুলিয়া উঠিয়াছে—হতভাগিনীর হাতে লাল বেলোয়ারি চুড়ি। কুলবধূ কি কুলটা, হিন্দু কি মোসলমান কেহ বলিতে পারিল না। তাহার সৎকার কীরূপে হইবে, তাহাও কেহ মনস্থির করিতে পারিল না। রাখালের বোন উলূপী বিবাহ হইয়া ভিনগাঁয়ে চলিয়া গিয়াছে—শাশুড়ির গঞ্জনা সহিতে না পারিয়া সেও কবে এইরকম জলে ঝাঁপ দিবে, এই সাতপাঁচ ভাবিয়া পালপাড়ার রাখালের চোখে জল আসিল। দিদি উলূপীর বুনিয়া যাওয়া কুমড়াচারার মাচা বাঁধিতে বাঁধিতে শ্বাস ফেলিয়া ডাকিল, 'হে জগবন্ধু!' জোলাদের ছেলে কাজেমের এক ভগ্নি গেল সালে গলায় দড়ি দিয়াছে, কাজেমও সে ঘরের দাওয়ায় বসিয়া ফোঁপাইয়া উঠিল। কিন্তু সৎকারের প্রশ্নে একতা আসিল না, কাজিয়া লাগিয়া গেল। ইতোমধ্যে একদিন সকলের অগোচরে মড়াটিকে সম্ভবত কুমিরে টানিয়া লইয়া গেল। কুমিরে মড়া খায় কি না এই বিষয়ে আমরা মাথা ঘামাইতে লাগিলাম।

ঘোষেদের ঢোলগোবিন্দ আবার খবর আনিল, মড়াটি জমিদার করুনাসিন্ধু রায়ের বাড়ির আশ্রিতা, দামি ধুতি পরিয়াছে দেখ নাই? তাহাকে কেহ কেহ জীবদ্দশায় দেখিয়াছে, সুন্দর সাজ করিয়া বিনুনিতে বাদলা জড়াইয়া জামাইসোহাগী টিপ পরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে। তাহার গর্ভে কী করিয়া রাজার সন্তান আসিয়াছিল, তাই জমিদারের লোকে পালকি করিয়া তাহাকে মাঝগাঙে ডুবাইয়া দিয়াছে। আমরা জানি দরমার বেড়া দেওয়া খড়ের আঁতুড়ঘরে মোসলমানের পোয়াতি ৪০ দিন অবধি সময়কাল কয়েদ থাকে, হিন্দুর পোয়াতি থাকে ২১ দিন। শিশুটিকে বেশম মাখিয়া বেশ করিয়া নাওয়ানো হয়, গাভির দুগ্ধে তালমিছরি মিশাইয়া খাওয়ানো হয়। কাঁদিলে শিশুকে শান্ত করিবার জন্য অনেকের ঘরে আফিম খাওয়ানো চলে ইত্যাদি। শিশুর জন্মের সহিত যে কলঙ্ক জড়াইয়া থাকে, তাহা যেন সেই প্রথম কেহ আমাদের ঘাড় ধরিয়া বুঝাইয়া দিল। সেই সঙ্গে আর একটি দিকে আমাদের চোখ পড়িল—নারী ও পুরুষের সম্পর্ক। যাহা দেখিয়া আসিয়াছি, যাহা উষাকালের মতন প্রতিদিন চোখের সামনে ঘটিয়াছে তাহা যেন নূতন আলোকে প্রতিভাত হইল। জগৎ যে কেবল স্ত্রী এবং স্বামী দিয়াই তৈয়ার নহে, তাহাতে গলদ আছে, তাহাতে কালিমা আছে, সেই জ্ঞান লাভ করিলাম।

করুনাসিন্ধুবাবুর বাগানবাড়িতে আমরা প্রায়শই ডাগর আম কি কাঁঠালের এঁচড় চুরি করিতে ঢুকিতাম। জমিদারবাবু শৌখিন লোক ছিলেন, ইয়ারদোস্তদের সহিত মিলিয়া বনভোজন করিতেন—পশ্চিম হইতে বাঈ ভাড়া করিয়া আনা হইত। পাঁঠার মাংস আর আম-আদার অম্বলের সুঘ্রাণে তাঁহার বাগানের রন্ধ্রগুলি ভরিয়া উঠিত। কুঠির সাহেবদের সহিত তাঁহার পিতা-প্রপিতামহের অন্তরঙ্গতা ছিল। আমের মৌসুমে সাহেবেরা আসিয়া উৎসব করিয়া বাগানের ভালো জাতের আম খাইয়া যাইতেন। তাঁহার পিতা শিশিরবিন্দুবাবুর কালে লালমুখো ফসেট সাহেব বাগানবাড়ির গোল-বারান্দায় প্যারাফিন-ল্যাম্পের আলোয় বসিয়া নেটিভ রায়তদের বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসা করিতেন। জমিদারবাবুর আড়কালা হুকাবর্দার সাতকড়ি আলবোলা সাজাইয়া দিয়া যাইত। অন্দর হইতে মেমসাহেবদের ফরাসি এসেন্সের সুবাস আসিত, হিমানির সুবাস আসিত, পাকশাল হইতে খাস বাবুর্চির হাতের কান্ট্রি-কাপ্তেন চিকেনের কিংবা ভালো মাখন কিংবা গুড়ের পায়সের গন্ধ আসিত।

জমিদারবাবু শহরে প্রাসাদোপম বাড়িতে থাকিতেন বলিয়া শুনিতাম, নায়েব-গোমস্তারাই তাঁহার অনুপস্থিতিতে জমিদারি চালাইত। গ্রামে আসিলে ঘোড়া-টানা গাড়িতে করিয়া জমিদারবাবু এস্টেট দেখিতে বাহির হইতেন, কী সুপুরুষ দীর্ঘকায় প্রৌঢ়—মুখভাব ঈষদ্গাম্ভীর এবং বিষণ্ণ, কানের পিছনে জবাফুল গোঁজা, ললাটে পূজার তিলক, মলমলের উৎকৃষ্ট পোশাক, তেলাকুচাফলে গিলা করা হাতা। সেই রাজরূপের আড়ালে এমন অন্ধকার!

কালে আষাঢ় মাস আসিয়া গেল। খালের নূতন পানিতে পুঁটিমাছ উঠিল। নদীর ধারের সেই কলঙ্কিনীর মড়াটিকে আমরা ভুলিতে বসিয়াছি, এমন সময় আবার খবর আসিল—মেয়েটি আশরাফঘরের মোসলমান যুবতী। খড়খড়ির পাখি তুলিয়া সার্কাসের দল আসিয়াছে কি না দেখিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছিল। পিতা তাহাকে এমন বেত্রাঘাত করিয়াছিলেন যে তাহার মৃত্যু হইয়াছে—লাশ অতঃপর ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই গল্পের গলদ এই যে, মোসলমানের মড়া তো গোর দিবার কথা, লাশ ভাসাইয়া দিল কী বুঝিয়া? সত্যমিথ্যা রাখালের জগবন্ধু জানিবে, আমাদের চোখে ভাসিতে লাগিল ফিরোজা রেশমের উড়ানি জড়ানো তম্বী, তাহার গলায় বহুমূল্য জহরতের কণ্ঠী মসলিনে জড়ানো যাহাতে গরিমা প্রকাশ না পায়, চাকরানি সারা সন্ধ্যা বসিয়া তাহার রাশি রাশি কালো কেশে আফসাঁ ছড়াইয়াছে—যেন আড়াবনে জোনাকির দীপ জ্বালিয়াছে। নিমন্ত্রণে যাইবার কালে সে নিজ ঘরেই আকণ্ঠ খাইয়া তবে বাহির হইতো যাহাতে লোলুপতা প্রকাশ না করিয়া বসে, খাইবার লোভ নীচকুলের লক্ষণ। বাহির হইবারও কত ঝকমারি, পালকি কয়েক প্রস্থ কাপড়ে মুড়িয়া নিশ্ছিদ্র করিয়া তবে তাহাকে বাহির করা হইত। রৌদ্রলেশহীন অন্দরের অলিন্দগুলিতে তাহার এবং তাহাদের আত্মাপুরুষ শুকাইয়া মরিতেছিল। হায়, কত দিনরাত্রির প্রয়াস-আয়োজন-বিলাস-ব্যসন একটিমাত্র বেতগাছার প্রতাপে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল—তাহার জন্য সদরের সিভিল সার্জন ডাক্তার আসিল না। হাকিম আসিল না। আমার ভ্রাতা পরান সেই আশরাফকুলদুহিতার জন্য একটি কবিতা লিখিয়া ফেলিল। আমার কবিভাব ছিল না, নদীতীরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আমার নিতান্ত-সাধারণ প্রাণের আরজু আর কিছু প্রসব করিতে পারিল না।

৩ পর্ব

আমাদের গাঁয়ের নাম মুশুরি। গাঁয়ের ভিতর দিয়া চলিয়া যাওয়া ছোট নদীটার নাম ভাদরখ্যাপা, ভাদ্র মাসে তাহার দুই কূল ছাপাইয়া উঠে। সম্বৎসর তাহার খাঁড়ুজলে লোকের গৃহস্থালির কাজ চলে—তাহার ধূলিময় পাড়গুলিতে শিমুলগাছতলায় ঋষিপাড়ার ছাগলগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফাল্গুন মাসে বিরাগমাখা মুখে শিমুলফুল চিবায়। ভাদরখ্যাপার দুই পারে উত্তর-মুশুরি আর দক্ষিণ-মুশুরি, কেহ বলে একই গ্রামের দুই প্রান্ত, কেহ দুটি বিচ্ছিন্ন গ্রাম বলিয়া স্বীকার করে। দক্ষিণ-মুশুরি আটপৌরে শাড়িখানা হইলে উত্তর-মুশুরি তাহার বুটিদার আঁচলা, দুইয়ের বুনটে তফাত রহিয়াছে।

করুনাসিন্ধুবাবুর খানাবাড়িটিও উত্তর-মুশুরিতে, বাড়ির বিশাল চৌহদ্দি ঘিরিয়া দোলমঞ্চ, শিবালয়, দুর্গাবাড়ি। গাঁয়ে লোকশ্রুতি ছিল যে রাজা করুনাসিন্ধু রায়ের প্রপিতামহ অনাথবন্ধু রায় নীলকুঠির দেওয়ানি করিয়া বিস্তর কাঁচাপয়সার মুখ দেখিয়াছিলেন, মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি হইবার সময় তিনি কলিকাতা ছিলেন। সেই দিন কলিকাতার আর সকল হিন্দুদের মতন তাঁহার রন্ধনশালায়ও আগুন জ্বালান নাই এবং ব্রহ্মহত্যা দেখিবার পাপক্ষালন করিতে গঙ্গাস্নান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণকে ফাঁসি দিবার প্রতিবাদে তিনি অন্যত্র বাস করিবার মানসে চিরতরে শহর ত্যাগ করেন। কালে কালে একদিন মুশুরি আসিয়া আশপাশের কয়েকটি গ্রাম এবং তদসংলগ্ন অনাবাদি জমি কিনিয়া নেন। এইরূপে অনাথবন্ধু রায় পুকুর

কাটাইয়া, জঙ্গল কাটিয়া জমি আবাদ করিয়া জমিদারির পত্তন করেন।

তাঁহার একমাত্র পুত্র শারদসিন্ধু রায় ছিলেন পরিশ্রমসহিষ্ণু এবং বলদর্পিত জমিদার। প্রতিবৎসর শারদীয় পূজায় রাজা শারদসিন্ধু রায় স্বর্ণালংকার দিয়া প্রতিমা সাজাইতেন এবং সালংকারা প্রতিমা বিসর্জন দিতেন। দুর্ভিক্ষের সময় তিনি অন্নসত্র স্থাপন করিয়াছিলেন, শিক্ষার জন্য উচ্চবিদ্যালয় ও চতুষ্পাঠী দিয়াছিলেন, কূপ-পুষ্করিণী তো বিস্তর খনন করাইয়াছিলেন, গাঁয়ের প্রাচীন কমলদীঘিখানা দ্যাখো নাই? ব্রাহ্মণ-ভিক্ষুক-কন্যাদায়গ্রস্ত- ঋণগ্রস্ত কত লোকের তিনি সহায় হইয়াছিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। শুনিয়াছিলাম শারদসিন্ধু রায় বিড়ালের বিবাহ দিয়া পাত পাড়িয়া দশ গাঁয়ের লোক খাওয়াইয়াছিলেন, ধুলা না উড়িতে পায় এই জন্য ক্রোশখানেক ধরিয়া গোলাপজল ছিটাইয়া রাখা হইয়াছিল। লক্ষ্ণৌ হইতে সানাইদার আসিয়াছিল, কলিকাতা হইতে বাঈ। বিবাহকালে খাসগেলাসের ঝাড় দিয়া রোশনাই করিয়া মুশুরিকে যেমন সজ্জিত করা হইয়াছিল, কেবল প্রতাপাদিত্যের বিবাহের সময় যশোহর নগরীকে নাকি তদৃশ সাজানো হইয়াছিল। তখনো দশনম্বরী আইন হয় নাই, সেকালের জন কোম্পানির সাহেবেরাও নাকি সে তামাশায় যোগ দিতে আসিয়াছিলেন।

'যে দিবে কাঠা কাঠা/ তার হৈবে লাল বেটা' মুক্তহস্ত সেই রাজা শেষ বয়সে পুত্রসন্তানের মুখ দেখিয়াছিলেন বটে, নাম রাখিয়াছিলেন শিশিরবিন্দু রায়। শিশিরবিন্দুবাবু পিতার মতন দানশৌণ্ড ছিলেন, তথাপি প্রজাপীড়ক বলিয়াও তাঁহার দুর্নাম ছিল। শারদসিন্ধু দীর্ঘজীবী হন নাই। বেন্টিংকের আইন হইবার পরও তাঁহার পত্নী সতী হইয়াছিলেন। লোকে বলে, রক্তাম্বর পরিয়া সিঁথি ভরিয়া সিন্দুর দিয়া চিতায় আরোহণ করিয়া তিনি মৃত স্বামীর শব আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, কিন্তু চিতায় অগ্নিসংযোগের পর তাঁহার পরান কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। আগুন খাওয়া কি মুখের কথা, তিনি দৌড়াইয়া পলাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, চিতায় আরোহণ করিয়া শঙ্কিত হইলে তো প্রত্যাবর্তনের উপায় নাই, তাঁহাকে বাঁশ দিয়া চাপা দিতে দিতে বলপূর্বক দাহ করা হইয়াছিল। জীয়ন্তে পুড়াইয়া মারিবার এই দেশরীতি শুনিয়া মোসলমানের ঘরে লোকে বংশানুক্রমে শিহরিয়া উঠিত।

এই গেল উত্তর-মুশুরির রাজরাজড়াদিগের গল্প। দক্ষিণ-মুশুরির চিত্র ভিন্ন। দক্ষিণ-মুশুরি গোছানো গ্রাম নহে, বেশ কয়েক ঘর দরিদ্র মোসলমান এবং অন্ত্যজতে মিলিয়া সেথায় সংসারের দুর্ভোগের ভার বিনা ওজরে বহন করিয়া চলিত। গেঁয়োরা নদীতীরবর্তী জমিগুলিতে ধান-তোষাপাট-তিল-তিসির চাষাবাদ করিত, কৈবর্তরা গাব জ্বাল দিয়া জেলেডিঙির পৃষ্ঠে আলকাতরা মাখাইত, জোলার ঘরে বোনা হইত মোটাকাপড়। একবার ওলাবিবি মুখখানি দেখাইয়া গেলে তাহাদের ছেলেপুলের ঘরে কান্নার রোল পড়িয়া যাইত। আল্লাহর গজবই তাহাদের জীবনে নিশ্চলা, স্থায়ী। অদূরে বড় নদী তাহার অপার জল লইয়া কলকল বহিয়া যাইতেছে। শীতকালে তাহার জলের রং কুজ্ঝটিকার বর্ণ ধারণ করে, ঘোর বরষায় সেই জলের রং গৈরিক কর্দমের ন্যায়। বন্যার সময় গভীর নিশীথে নদীর শোঁ-শোঁ আওয়াজ যে শুনিয়াছে, সে নিশ্চিত জানিয়াছে দৈবানুকূল্য না হইলে রাখালের জগবন্ধু যেকোনো মুহূর্তে তাহাকে টানিয়া লইবেন।

উত্তর-মুশুরিতে অবস্থাপন্ন কুলীন হিন্দুদের বাস—তাহাদের শয়নকক্ষে সরিষার তৈলের দীপ জ্বলে, তাহাদের বাড়িতে শ্রাবণ মাসের শেষ দিন অবধি কেয়াখয়ের প্রস্তুত হয়, দাসীরা মেয়ে-বউদের রূপটান মাখাইয়া দেয়, তাহাদের খোকারা রুপার ঝিনুকে করিয়া দুধ খায়, সংস্কৃতে 'বটঃ-গিরিঃ-তরুঃ' শিক্ষা করে। বছর ভরিয়া সিন্দচোরের ভয়ে উত্তর-মুশুরির কুলীন গৃহস্থরা ভীত থাকে। উত্তর-মুশুরি বেষ্টন করিয়া প্রহরীরা চৌকি দেয়। উত্তর-মুশুরির ছিল দেবদেউল-পঞ্চায়েততলা-রথতলা-টোল—জমিদারির সেরেস্তায় হাঁকডাক শোনা যাইত। শুকনার মৌসুমে ভরাটি লইয়া অন্য গাঁয়ের জমিদারের বাহিনীর সহিত করুনাসিন্ধুবাবুর লাঠিয়াল-শড়কিওয়ালারা লড়িয়া আসিত। সুরকির পদ্মফুল আঁকা বড় বড় রাজবাড়ি। থামগুলি প্রকাণ্ড এবং শজিনাখাঁড়ার মতন শিরযুক্ত। দালানে বসিয়া প্রাসাদোপম বাড়িগুলির পোষা বিড়াল মাথা মসেহ্ করিত, ছ্যাতলা পড়া ছাদ রৌদ্রে ঝাঁঝাঁ করিত। উত্তর-মুশুরির গ্রীষ্মক্লিষ্ট বয়স্করা হাতে একখানি সিলাইকর্ম বা নভেল লইয়া ঘুমাইয়া পড়িত—গাঢ় নিদ্রা, স্বেদপাত করিয়া তাহাদের ঘাড়-গলা-বুক আঠালো হইয়া আসিত।

আমাদের দক্ষিণ-মুশুরির ছিল দিগন্তলক্ষ্মীর আঁকিয়া দেওয়া বিস্তীর্ণ সবুজ ভাদৌ-ফসলের ক্ষেত, উদার আকাশের তলায় উদাত্ত নদীকূল। ঋতুর দল দিবারাত্রির জপমালা অবিরাম জপিয়া চলিয়াছে। পিটুলি-ভুতিজাম-রসুইন্যা গাছে আঁধার করিয়া রাখা দাওয়া, নির্বিরোধ গেরস্তের ধানের গোলা—খড়ের পালান আর ছনের ঘর, শৈবালাচ্ছন্ন পাছপুকুরে সুবচনীর হাঁস চরিত, গাঁয়ের বউ-মেয়েরা বাসনের পাঁজা লইয়া সেই পুকুরের তালপৈঠায় সাবধানে নামিত।

দুই মুশুরির একটিই সাধারণ সম্পত্তি। পাগলা সাবু। গ্রীষ্মদিনে মাঠের ধুলামাটিতে ধুলোট সারিয়া আমবাগানের ছায়ায় ঘুমাইয়া থাকিত। আকালের সময় ক্ষুধার কষ্টে উচ্চস্বরে কাঁদিয়া শিকলের বাড়ি দিতে দিতে ভিক্ষা করিত। তাহার খাদ্য জুটিয়া যাইত। ভাদ্র-আশ্বিন মাসে তাহার পাগলামির জ্বালায় তিষ্টানো যাইত না। বৎসরের কোনো একটি মৌসুমে, ঠিক কোনটি তাহা আজ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিব না, সাবুর পাগলামি সারিয়া যাইত। সে নিজেকে অবিরাম শিকলের বাড়ি দিত না। ভাদরখ্যাপার তীরের তরুছায়ে বসিয়া খুব পরখ করিয়া কোন দিকে যেন সে তাকাইয়া থাকিত, ভিক্ষা করিত না, কাঁদিত না, উদাস হইয়া বসিয়া থাকিত। তাহার পাগলামি ভয় করিতাম নাকি তাহার বিষণ্ণতা তাহা হলফ করিয়া বলা মুশকিল।

৪ পর্ব

জমিদারবাবুর বাগানবাড়িতে লুকাইয়া ঢুকিয়া আমরা বালকের দল গাছের ছায়ায় ঘুরিতাম, আমরা তিন ভাই। পালপাড়ার রাখাল। শেখেদের তোরাপ, আফজল। জোলার পো কাজেম, বজলাল। ফকিরচাঁদ আর মুলুকচাঁদ। ঘোষেদের ঢোলগোবিন্দ। 'গাছে ক্যা রে? বাঘের ডরে। তোরা কয় ভাই? সাত ভাই। একভাই দিবি? ছুঁইতে পারলে নিবি।' বাগানবাড়ির চৌহদ্দিতে ফলবান বৃক্ষ-নিম-হত্তুকি ও কর্পূরগাছ। আমরা সবেদা-আঁশফল-কালোজাম ইত্যাদি চুরি করিয়া খাইতাম, চাঁপাগাছ হইতে চাঁপাফুল পাড়িতাম। সেই বাগানের মাটিই ছিল নিঃশব্দ রূপকথার কথক। পায়ের তলায় শুষ্ক ঝাউফল মটমট করিয়া ভাঙিত। ভাঙা চুড়ি মিলিত, মিলিত মনোহারী বোতাম, বিলাতি পীয়র্স সোপের মোড়ক, ফেলিয়া দেওয়া লিপটন কোম্পানির চায়ের টিন—কে জানিত তাহার স্বাদ কীরূপ।

নদীতীরে—শ্মশানবাড়ির নিকটে সেই পর্ণকুটিরের দাওয়ায় শুইয়া আমরা ছেলেরা কত কালক্ষেপণ করিয়াছি। আমাদের বাড়িগুলির ভিতরে জল-চল ছিল না, ঢোলগোবিন্দর কর্তামাকে দেখিতাম করল্লার বাহিরের দাঁতগুলি ভাঙিয়া নুনজলে ধুইয়া শুক্তো রাঁধিতেছিলেন—আমাদের উঠানের এক কোণে দেখিবামাত্র তাঁহার ফেনাভাতের হাঁড়ি ফেলিয়া দিতেন। দরিদ্র ঘর, অন্নের এমন অপচয় দেখিলে চক্ষে জল আসিত। ঘৃণা করিবার এহেন ক্ষমতা দেখিয়া বিস্ময় মানিতাম।

ঢোলগোবিন্দ হয়তো সান্ত্বনা দিবার মতন করিয়া বলিত, 'কর্তামা-বুড়িকে আমি বিজয়া দশমীর প্রণাম করিলেও স্নান করিয়া আসে।' সে সান্ত্বনা অপ্রয়োজনীয় মনে হইত। ঘোষেদের ছেলেরা গরুছাগল হারাইলে নাটাইচণ্ডীর পূজা দিত। চৈত্রসংক্রান্তির ফলারে রাঙা বাতাসা খাইত। আমরা নানির কোল ঘেঁষিয়া সবিস্ময়ে কারবালার যুদ্ধের গল্প শুনিতাম, মনশ্চক্ষে দেখিতাম জায়েদা জয়নাবের অন্ধকার ঘরে ঢুকিয়া ইমাম হাসানের পান করিবার সোরাহীতে হীরকচূর্ণ মিশাইতেছে, ইমাম হোসেনের ক্রোড়ে তাঁহার শিশুপুত্র আলি আসগরের মৃত্যুর সময় ডুকরাইয়া উঠিতাম। কিন্তু আমাদের কুটিরের দাওয়ায় আসিলে আমরা সকলি ভুলিয়া যাইতাম—দুরন্ত বালক যেরূপে বস্ত্র ছাড়িয়া সাঁকোর উপর হইতে বর্ষার জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে, সেইরূপ নিজেদের কূলপরিচয় পরিধেয়ের মতন পরিত্যাগ করিতাম, কৈশোর ছাড়া সেই কুটিরে আমাদের আর কোনো জাতপাত থাকিত না। বিস্তর বাজে কথা বলিতাম, শুনিতাম এবং বিশ্বাস করিতাম।

সেবার শারদোৎসবের পূর্বে ব্রাহিমোহনবাবুর অপঘাতে মৃত্যু হইবার পর শোনা যাইতে লাগিল, শ্মশানে অপদেবতা দেখা যাইতেছে। ব্রাহিমোহনবাবুকেই কেহ কেহ স্বচক্ষে হন্ হন্ করিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছে—গাড়ু হাতে, ময়লা সাদা ধুতি কোঁচা দিয়া নদীর দিকে নামিয়া যাইতেছেন। কৈবর্ত্যদের দুটি ছেলে মাছ মারিয়া শেষরাতে বাড়ি ফিরিতেছিল, ব্রাহিমোহনবাবু লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া তাহাদের কাছে আসিয়া মাছ চাহিয়াছিলেন—ছেলে দুটি ইষ্টনাম জপ করিতে করিতে দৌড়াইয়া পলাইয়া আসিয়াছে, ফিরিয়া দেখিয়াছে ব্রাহিমোহনবাবু তাহাদের পিছু পিছু তালগাছের মতন লম্বা ঠ্যাং লইয়া আসিতেছেন। আমরা কয়েক দিন নদীর ঐদিকটায় যাওয়া ক্ষান্ত দিলাম।

ঢোলগোবিন্দের ছোটকাকা ছিলেন কর্তামার কোলপোঁছা সন্তান। কলকাতায় পড়িতে গিয়াছিলেন। ছুটিতে বাড়ি আসিয়া তিনি আমাদের লইয়া ঘুরিতে বাহির হইলেন। তাঁহার কাছেই শুনিলাম একটি নূতন শব্দ—অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। প্রথমে ভাবিলাম, আমাদের হ্যাংলা বলিবার জন্য নূতন শব্দের উদ্ভব হইয়াছে। কাকা আমাদের বুদ্ধিতে অবজ্ঞার হাস্য করিলেন। তাহার পরে বিশদ বুঝাইয়া দিলেন অ্যাংলো মানে বর্ণশঙ্কর। আমাদের সাবু বর্ণশঙ্কর। কলকাতায় এই রকমজাতের ঢের মানুষ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা আয়া রাখিয়া সন্তান পালন করে, জানালায় ফুলগাছ লাগায়, হাওয়া বদলের জন্য পাহাড়ে যায়, পাউরুটি দিয়া 'ছোটা-হাজরি' করে এবং রেলওয়ে কম্পার্টমেন্টে তাহাদের সাথে উঠিলে নেটিভদের ঘাড় ধরিয়া নামাইয়া দেয়। ছোটকাকাও সাধ করিয়া পাউরুটি খাইয়াছেন, কিন্তু কলকাতার সেই রুটিকরদের কারখানার সামনে পইতা ঝোলানো ছিল। সে যাহা হোক।

ছোটকাকা বুড়া সাতকড়ির কাছ হইতে খবর বাহির করিয়াছেন, সাবুর দাদার দাদা নাকি ছিল গোরা সৈন্য, তাহার স্ত্রী ছিল সাতগাঁয়ের মেয়ে। নাম ছিল দৌলতুন্নিসা। দৌলতুন্নিসার সাথে বিবাহে সন্তান জন্মানো উপলক্ষে সেই গোরাসাহেব জন কোম্পানির হর্তাকর্তাদের কাছে পাঁচ রুপি উপহারও পায়, কোম্পানির লোকে তখন ভারতবর্ষের মানুষের সাথে খাইতে-মাখিতে সৈন্যদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতেন, নহিলে স্ত্রীলোক জুটিবে কোথা হইতে, জন্মভূমি তো তাহারা সহস্র-সহস্র ক্রোশ দূরে ফেলিয়া আসিয়াছে। সন্তানের নাম হয় হ্যারি সাদারল্যান্ড। আমাদের চক্ষু চড়কগাছ করিয়া কাকা শুনাইলেন, এই সাদারল্যান্ড সাহেবের বংশধরদের মধ্যে এক সাবুই বাঁচিয়া আছে। সাদারল্যান্ড সাহেবের পিতা সেই গোরাসাহেব ভারতবর্ষকে নিরতিশয় ভালোবাসিয়াছিল, তাহার মিশ্রবর্ণ সন্তানেরা তাহাকে ঘিরিয়া কিলবিল করিত, গোরাসাহেব তাহাদের বুকে-পেটে খেলিতে দিয়া আমোদ পাইত। ১৮২০-এর কলেরা মহামারিতে সেই গোরাসাহেব আর তাহার তিন সন্তান মৃত্যুবরণ করে। দৌলতুন্নিসার কোনো খবর জানা যায় না। শেষ অবধি হ্যারি সাদারল্যান্ড ছাড়া সাহেবের কোনো সন্তানই বাঁচে নাই।

সাতকড়ির পিতা সেই আধাসাহেব হ্যারি সাদারল্যান্ডকে চাক্ষুষ দেখিয়াছিলেন, সাহেব তাহার সন্তানদের শিক্ষাদীক্ষার বিষয়ে দারুণ সতর্ক ছিলেন। ইংলন্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়া নাকি সিদ্ধ গোমাংস আর সুজির মিঠাই ছাড়া সন্তানদের কিছু খাইতে দিতেন না—সকাল হইতে সন্ধ্যা অবধি সন্তানদের পাঠাভ্যাস করিতে হইত, সাদারল্যান্ড সাহেব রানির সন্তানপালনের রীতিকেই আদর্শ মানিতেন। সাহেবের নাতনিদের বিবাহ দিতে বড় সমস্যা হইত, স্থানীয় রাজা-মহারাজাদের অন্ধকার জেনানায় তিনি বংশের কন্যাদের দিতে চাহিতেন না, কিন্তু বর্ণশঙ্করদের প্রতি ইংরেজদের মনোভাব বিরূপ ছিল বলিয়া তাহাদের ভিতরেও সম্বন্ধ হইয়া উঠিত না। সাবুর এক ফুফু শোনা যায় করুনাসিন্ধুবাবুর বংশের কারও রক্ষিতা হইয়াছিলেন। সাবুর বাপ-চাচারা এইমতো ত্রিশঙ্কু দশায় জীবনাতিপাত করিয়া গিয়াছেন, কেহ গলায় দড়ি দিয়াছেন, কেহ অন্য 'প্রেসিডেন্সি'তে চলিয়া গিয়া সংসার পাতিয়াছেন। সাবুর পরদাদা সাদারল্যান্ড সাহেব শেষ বয়সে বিলাতবাসী হইয়াছিলেন—পিতার মতন ভারতবর্ষপ্রীতি তাঁহার স্থায়ী হয় নাই। এই গল্পের উপজাত হিসাবে আমাদের অঘা মনকে অনেক শব্দের দিকে কাকা অঙ্গুলিনির্দেশ করিলেন—বর্ণশঙ্কর-রক্ষিতা-প্রেসিডেন্সি ইত্যাদি। আমরা মুশুরির পাললিক বালকেরা চমৎকৃত হইয়া গেলাম।

শেখের পো তোরাপ আর আফজল মুরগি জবেহ আর ফাতেহা পাঠ ইত্যাদি শিখিয়া মক্তব যাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছে শুনিয়া কাকার তাচ্ছিল্যের অবধি রহিল না। ফকিরচাঁদ আর মুলুকচাঁদও দস্তখত করিতে শিখিয়া পাঠশালা যাওয়া বন্ধ করিয়া দিবে-দিবে করিতেছিল। বাঙালি মোসলমানকে শিক্ষালাভের সুফল বুঝাইয়া লাভ কী, ছেঁড়া তহবন আর মলিন পিরানপরিহিত অথবা উলঙ্গ ঊর্ধ্বাঙ্গের সারি সারি মানুষ—আকার দেখিয়া কেবল মালুম হয় উহারা মানুষ। কাকা আমাদের দাওয়ায় বসিয়া ভারতবর্ষের ভাবী অধিকারীকুলের শিক্ষার মূল্য লইয়া অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা দিলেন। শেখ-সৈয়দ-জোলা-মোগল-পাঠান যত দিন শিক্ষিত না হইবে, আমাদের মুক্তি আসিবে না। একদিন এই ইংরেজ তাড়াইবার জন্য ঝাঁসির রানী-নানাসাহেব-তাঁতিয়া টোপী যুদ্ধ করিয়াছেন—আজ আমরা পুঁইচচ্চড়ি-গলাভাত পাইলেই দাওয়ায় গড়াইয়া তালপাখার হাওয়া করিতে করিতে নিদ্রা যাই—সাহেবেরা আমাদের সর্বস্ব লুটিয়া লইতেছে—আমাদের নবাবদিগের পরিবারকে মুচিখোলায় বাস করিতে বাধ্য করিতেছে—সেইদিকে ভ্রুক্ষেপমাত্র করি না। কাকা পরিকল্পনা করিলেন—এই দক্ষিণ-মুশুরিতেই তিনি নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করিবেন। এই পাতার কুটিরেই কেন নয়। এইখান হইতেই একদিন রঘুনাথ শিরোমণির মতন—অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের মতন জ্ঞানী পুরুষ জন্মাইবে। কাকার উত্তেজনা আমাদের শিরায় শিরায় প্রবেশ করিয়া আমাদের চারদিকে ফুলকি জ্বালাইতে লাগিল, ফুলকিগুলি কাকাকে ঘিরিয়া জ্বলিতে জ্বলিতে একসময় নিভিয়া গেল, তিনি ছুটি ফুরাইলে কলকাতা চলিয়া গেলেন।

৫ পর্ব

আমরা আবার আগের মতনই দুর্বৃত্তপনা করিয়া জীবন

কাটাইতে শুরু করিলাম। সন্ধ্যা হইয়া আসা অব্দি পাচন হাতে গরু চরাইতাম নয় নাড়াপোড়া মাঠে ঘুড়ি উড়াইতাম। সংসারের কাজে লাগিতাম না বলিয়া প্রতি সন্ধ্যায় মা-বাপের হাতে দু'ঘা খাইতাম। রূপকথার রাজপুত্র-মন্ত্রীপুত্র-কোটালপুত্রকে একদা তাহাদের মাতারা যেমন রাজভোগ খাইতে দিয়া থালার এক কোণে একটু ছাই রাখিয়া দিতেন—আর সেই ছাই দেখিয়া পরদিন তাহারা দিগ্বিজয়ে বাহির হইত, বাপের দু'ঘা মার যেন সেই আশায়। পরদিন আমরাও দিগ্বিজয়ে বাহির হইতাম বটে, সারাবেলা বনবাদাড় ঢুঁড়িয়া বেড়াইতাম, দলকলসের আর মরিচজবা ফুলের মধু চুষিতাম। গেরস্থের অজ্ঞাতসারে তাহার খেতের আনাজকলা-মুলা-ঝিঙ্গা-পটোল ইত্যাদি চুরি করিতাম, জমিদারবাবুর বাগানবাড়িতে সুনসান দুপুরে হানা দিয়া সাতকড়ির নিকট আগের জমানার নানান কিচ্ছা শুনিতাম—সাতকড়ি আগে আমাদের আঁকিয়া কাটিত, বয়স হইয়া গিয়াছে, সে আর আগের মতন দূর-দূর করিত না। সন্ধ্যানাগাদ কৌশল্যা নামের এক দাসী তাহাকে রুটি গড়িয়া দিয়া যাইত, সে আফিমের ডেলা সেবন করিয়া ঢুলিত। দিনের বেলা তাহার বিস্তর অবসর ছিল। গেঁটেবাতের রোগী, ব্যথা উপশমের জন্য আমি তাহাকে বেতশাক আনিয়া দিতাম। সে আমাদের গল্প শুনাইত।

সেবারের চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়কপূজার সময় বুধাইকে বড়শি গাঁথিয়া বাঁশের ডগার সহিত বনবন করিয়া ঘুরানো হইল, বুধাইয়ের সেই ঘা পরে বিষাইয়া গেল, সে মরিল। বৈশাখের শুরুর দিন আমানি খাইয়া এবং আম্রপল্লবের জলের ঝাপটা খাইয়া রাখাল আসিয়া উপস্থিত হইল। গোয়াল সাফসুতরা করিয়া পান্তায় দুধ মিশাইয়া খাইয়া আমিও তাহার সঙ্গে চলিলাম, মোষের লড়াই দেখিব, মেলার খাজা-মোয়া-মুড়ি-মিছরি-ফেনিবাতাসা খাইব।

বাড়ি আসিয়া শুনিলাম, আমাদের পিতা আমাদের এক এক করিয়া মহকুমার ইংরাজি বিদ্যালয়ে পাঠাইতে মনস্থ করিয়াছেন, শখের পাঠ হিসাবে অনিয়মিতভাবে পড়িয়া আমাদের বিদ্যাশিক্ষা সম্ভব হইবে না। গলায় ঝোলানো পিতলের খিলালকাঠি দিয়া দাঁত খিলাল করিতে করিতে তিনি মাকে এই সিদ্ধান্ত শুনাইতেছেন। তিনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, ফারসিতে গুলিস্তাঁ এবং বোস্তাঁ পড়িয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি, মওলানা রুমির *মছনভি* পড়িয়াছেন, আমাদের তিনিই নিজ হাতে বাংলা ও ইংরাজিতে বর্ণপরিচয় করাইয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদ হইতে আসিবার সময় আমাদের পড়িবার জন্য



ভাদরখ্যাপার তীরের তরুছায়ে বসিয়া খুব পরখ করিয়া কোন দিকে যেন সে তাকাইয়া থাকিত

নানান পুস্তক লইয়া আসিতেন—পড়িয়া শুনাইতেন, না বুঝিলে দ্রুত তাঁহার উৎসাহ রোষে পরিণত হইত। 'চাষার ব্যাটা চাষাই থাকিবি, জোলার পো জোলাই রহিবি' ইত্যাদি আস্ফালন করিতে করিতে প্রহার শুরু করিতেন। উত্তর-মুশুরির সম্পন্ন ঘরগুলিতে বিদ্যাশিক্ষার চর্চার সহিত মানসিক প্রতিযোগিতার এই মানসিকতা আমি বুঝিতাম না, যত দিন হিন্দুর প্রখর জাত্যভিমান আমাকে মনোবেদনা দেয় নাই, তত দিন আমি পিতার এই মনোভাব বুঝিতে পারি নাই। আমাদের মা অক্ষরজ্ঞানসম্পন্না ছিলেন, শয়নঘরে মায়ের কিছু পঠিত পুস্তক ছিল *চাহার দরবেশ, রেয়াজুস সালাতিন, কাসাসুল আম্বিয়া*। মা তেঁতুলবিচি মাটিতে সারি করিয়া স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ লিখিতে পারিতেন, আমাকে পাশে লইয়া ডাঁটা কুটিয়া তিন টুকরা করিয়া রান্নাঘরের মেঝেয় লিখিতেন— 'ব', এইভাবে আমাদের তিনি বর্ণপরিচয় করাইয়াছিলেন।

এইবার দেখিলাম আমাদের পিতার আমাদের অতীশ দীপঙ্কর বা রঘুমনি বানাইবার জন্য তর সহিতেছে না। আমাদের নানি কলাপাতার পিঠে সরিষার তেল মাখাইয়া কুপির উপরে ধরিয়া কাজল বানাইতে বানাইতে গজগজ করিতে লাগিলেন—কুঁজার চিত হইয়া শুইবার অভিলাষ হইয়াছে। ত্যানা দিয়া পিঠ আবৃত করিবার মুরোদ নাই হাতে পয়সা থাকিলে আজিকে যে জোলা কাল সে শেখ হইবে, পরের সনে হইবে সৈয়দ, শুধু শুধু পড়িয়া সময় নষ্ট করিয়া লাভ কী, ইত্যাদি। সন্ধ্যার অন্ধকারে পরান পানি গরম করিয়া কুঁড়া মিলাইয়া ধবলীরে জাবনা দিতেছিল, হারান মায়ের স্তন্যবিরল মাই শুষিয়া ঘুমাইয়া গিয়াছে। তাহাদের ক্রম পরে আসিবে এইজন্য তাহাদের দুর্ভাবনা ছিল না। আমি জ্যেষ্ঠ। প্রথম কোরবানির ছুরি আমার ঘাড়েই ধরা হইবে।

দেখা গেল, কোরবানির ভাগ্য আমি করিয়া আসি নাই। মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া গিয়া আমাদের পিতা এক গুটিবসন্ত আক্রান্ত সহকর্মীর সেবা করিয়াছিলেন, নিজে যেই টিকা দিয়াছিলেন—তাহা ক্ষীণশক্তি হইয়া থাকিবে, তাঁহার গায়ে লাল স্ফোটক দেখা দিল। একপক্ষকাল অত্যন্ত রোগভোগের কষ্ট করিয়া তিনি মৃত্যুবরণ করিলেন। মৃত্যুর খবর লইয়া তার আসিল, আমাদের সংসারের সন্তোষ-প্রীতিপ্রফুল্লতার দীপখানি এক ফুঁয়ে নিভিয়া গেল।

আব্বার মাহিনা এমন কিছু দোহারা ছিল না, কিন্তু মুর্শিদাবাদ শহর হইতে বাড়ি আসিলে তাঁহার ট্রাংক হইতে মায়ের জন্য খরিদকৃত সওদা বাহির হইত—এসেন্সের শিশি, হিমানীর কৌটা-লক্ষ্মীবিলাস তৈল আর বাহির হইত মাদ্রাসার কুতুবখানা হইতে ধার করিয়া পড়িয়া শুনাইবার জন্য আনীত নানাবিধ ইংরেজি ও উর্দু পুস্তক—*নবনারী, লায়লা-মজনু, হাতেম তাঈ, বাহার দানেস*। ইহজীবনে বিশ্বসাহিত্যের জাদুস্পর্শ যাহার মনে লাগিয়াছে, তাহার পশ্চাদপদ-কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রতিবেশীর সঙ্গ কিছুতেই ভালো লাগিবার নয়। আগেই বলিয়াছি, মোসলমান সমাজের তিনি সদস্য ছিলেন বটে—তাঁহার হৃদয়ে বিদ্যাবিরূপ মোসলমানের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল না। সবুজ তোষাপাটের নধর শীর্ষ আর হলুদ সরিষার আকাশ অধিকার করিয়া নেওয়া সুমিষ্ট গন্ধ মিলিয়া দক্ষিণ-মুশুরির যে অন্নপূর্ণা মূর্তি—আব্বা তাহাতে বুঁদ হইয়া কয়েক দিন নিস্তরঙ্গ জীবন কাটাইতেন। শহরের শান বাঁধানো ভুঁই তাঁহার প্রাণের শাঁসজল শুষিয়া ফেলিত—সেই ক'টি দিন তিনি যেন নির্জনতায় শ্যামলিমা মাখিয়া নূতন জীবন ফিরিয়া পাইতেন। যুবাপুরুষেরা জলের ধারে মাচা বাঁধিয়া মাছ মারিত, তিনি সেখানে বসিয়া পাড়ের দিকে চাহিয়া মুড়ি চিবাইয়া সময় কাটাইতেন, মা ভাজনাখোলায় খেতের চালের টাটকা মুড়ি ভাজিয়া দিতেন। বেলা চড়িলে তেল মাখিয়া নদীতে নাইয়া আদুরগায়ে বাড়ি আসিয়া কাপড় বদলাইতেন, মুড়ি চিবাইবার ন্যায় ধীরগম্ভীর ভঙ্গিতেই ভাত-তরকারি খাইতেন।

আমার নানি তাঁহার মায়ের শৈশবের সই ছিলেন, মায়ের মৃত্যুর পর আমার নানিই তাঁহার প্রতিপালন করিয়াছেন—আব্বা থাকিবার সেই দিনগুলিতে নানি আমাদের টানাটানির সংসারেই কিছু সুখাদ্য তৈয়ার করিতেন। আমাদের অভাবের ঘরে রান্নার পাট চুকিবার পর নির্বাণোন্মুখ উনানের শেষ আঁচে নানি আনাজের গায়ে ছ্যাঁদা করিয়া সামান্য তেল মাখাইয়া পুড়াইয়া রাখিতেন, তাহা দিয়া পরবর্তী বেলার খাওয়া সারিবেন। এই পোড়া কখনো শোল কিংবা টাকিমাছও হইত। সারাদিন মাঠে মাঠে ঘুরিয়া শাক-কলা-ঘুঁটে যাহাই জোগাড় করিয়া আনিয়া দিতাম, তিনি সাগ্রহে গ্রহণ করিতেন। আব্বা আসিলে নানি তাঁহার গোপন সঞ্চয় ভাঙিয়া বাজার করাইতেন, কলার বড়া ভাজিয়া যত্ন করিয়া বাঁশের ঝাঁকায় তুলিয়া রাখিতেছেন দেখিলেই বুঝিতাম আব্বা আসিয়াছেন। সন্ধ্যাবেলা মা তেলহলুদে গা ধুইয়া কিঞ্চিৎ আতর মাখিয়া ধোয়া শাড়ি পরিতেছেন দেখিলে বুঝিতাম আব্বা আসিয়াছেন।

৬ পর্ব

আব্বা বাঁচিয়া থাকিতে মুশুরির সেইসব দিনের দুপুরগুলি ছিল আল্লাহর গজবের ন্যায় বিভীষিকাপূর্ণ। হিন্দুর মেয়েরা সূর্যোদয়ের আগে ভাদরখ্যাপায় স্নান করিয়া আসিয়া মাঘমণ্ডলের ব্রত করিত, সফেদা-কাঠকয়লা-সুরকি-তুষপোড়া ইত্যাদি দিয়া আলেপনা দিত আর ছেলেপুলে ভিড় করিয়া দূরে দাঁড়াইয়া দেখিত। তাহাদের সহিত মিলিয়া আমরাও দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতাম। বাড়ি আসিতেই বাপের উত্তম-মধ্যম জুটিত। গোঁড়া বৈদ্যবাড়ির ছেলেরা আয়ুর্বেদশাস্ত্রের শ্লোক মুখস্থ করিতেছে, মুনশিজির কাছে ফারসি শিখিতেছে। কায়স্থর ছেলেপুলেরা শিখিতেছে শতকিয়া-পণকিয়া, কাঠাকালি-বিঘাকালি, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপক্রমণিকা ব্যাকরণ ও ঋজুপাঠ। পরবর্তীতে তাহারা সংস্কৃতে কুমারসম্ভব পড়িবে, রঘুবংশ পড়িবে, আর আমরা কেবল নানির মুখে পুঁথি শুনিব, ইউসুফ-জোলেখার প্রণয়বৃত্তান্ত শুনিব, গোলে বাকাউলির কিচ্ছা শুনিব—মোসলমানের পুত্র কী করিয়া প্রতিযোগিতায় জয়ী হইবে এইসব নিয়া তক্ দিরকে দোষারোপ করিতে করিতে আব্বা আমাদের পিটাইতেন। কোথায় হিন্দুর সহিত মোসলমানের প্রতিযোগিতা চলিতেছে, আমাদের পলিপড়া মাথায় তাহা ঢুকিত না। সেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ পিতৃমূর্তি চিরতরে হারাইয়া গেল।

আব্বা মিঠাকুমড়ার মাচান বাঁধিতে বাঁধিতে আমাদের সরলগণিত আর হিসাব কষা শিখাইতে বসাইতেন, ইংরাজিজ্ঞান পরখ করিতেন। দা-কাটা বাঁশের ছড়ি গোলার গায়ে ঠেস দিয়া রাখিয়া দিতেন—যখন তখন ছড়িখানা ব্যবহৃত হইবে। সন্ধ্যায় উঠানের বেলগাছতলার চৌকিতে শুইয়া আব্বা গামছা ঘুরাইয়া নিজেকে বাতাস করিতেন এবং আমাদেরকে নিজের পঠিত সাহিত্য গল্পের আকারে শুনাইতেন। ঈশ্বর গুপ্ত এবং রঙ্গলাল তাঁহার অতীব প্রিয় ছিল। আব্বা সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর সম্প্রচারহেতু আমাদেরকে রামায়ণ-মহাভারত হইতে বাইবেল হইতে গল্প বলিতেন, ইংরেজ আসিবার আগের জমানার মহীয়সী নারীদের গল্প বলিতেন। মক্তবের মুনশিজিকে জিজ্ঞাসা করিয়া কোরআনের বাণীর কোনো অর্থ বাহির করা যাইত না, তিনি জানিতেন না, তাঁহাকেও তাঁহার মুনশিজি শিখান নাই, কিন্তু আব্বা কিছু কিছু জানিতেন। আব্বা হাঁ করিলে মুনশিজিকে ইউসুফ নবীর মতন গিলিয়া খাইতে পারিতেন। তাঁহার আহৃত তাবত ভূগোল ও ইতিহাসবিদ্যা আমাদের মুখস্থ করাইবার চেষ্টা করিতেন—বিজাপুরের চাঁদবিবির গল্প শুনাইতেন, কোহ-ই-নূর আর দরিয়া-ই-নূরের গল্প শুনাইতেন। শুনাইতেন তৈমুর লং

জয়লাভ করিবার পর বিজিতদের করোটি দিয়া সৌধ তৈয়ার করাইতেন, নাদের শাহও তাঁহাকে গুরু মানিয়া করোটিসৌধ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তৈমুর আসিয়া সুলতান বায়েজিদের যুদ্ধে হানা না দিলে আজ ইউরোপ মোসলমানের অধীন থাকিত, সেই গল্প করিতে গিয়া আব্বার কণ্ঠরোধ হইত—হায় ভ্রাতৃখোর মোসলমান! আব্বা তাঁহার সুরবিরল কণ্ঠে মীরসাহেবের 'সংগীতলহরী' হইতে ছন্দ তুলিয়া সুরে বাঁধিতেন, 'যাদের নামে কাঁপিয়াছে বাসুকি পাতালে/ এখন তাহার বুকে মারছে লাথি বানরের দলে', এই লালমুখো বানর কে? না, ইংরেজ। সাতসমুদ্র পাড়ি দিয়া ভারতশাসন করিতে আসিয়াছে। জগদীশ্বরের আজ্ঞায়ই আসিয়াছে বই নয়। কে বলিয়াছে তাঁহার মহিমার পার নাই? মহিমময় আল্লাহ আপন ভূমে মানুষকে এমন লাঞ্ছিত হইবার পীড়া দিতেছেন!

টিমটিমে আলো জ্বালিয়া খড়ির আগুনে নানি থালকচু সিদ্ধ করিতে করিতে নিচুগলায় বংশোদ্ধার করিতেন, ছেলেপুলেরা ইংরাজি বোলচাল শিখিবে, দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করিবে, হালাল-হারামের প্রভেদ করিবে না, এরপর শরাব খাইবে, নাসারাদের মতন গুল্ ফের তলা অবধি লুটাইয়া পরিচ্ছদ পরিবে আর কাগজে পোঁদ মুছিবে ইত্যাদি কত-কী বলিতেন। ছেলেপুলেকে সূর্যাস্তের পর গাছতলায় যাইতে দিতে নানির আপত্তি ছিল, খালি শয্যায় নানি নারিকেলপাতার ঝাড়ু রাখিয়া দিতেন। আব্বা নানির খিস্তি শুনিতে পাইতেন না, মহাবীর অর্জুনের মতন তিনি কেবল একটি পাখিকেই দেখিতে পাইতেন—তাহার নাম বিদ্যা, পাশে বসাইয়া শুনাইতেন—আগুল্ফলম্বিত কেশধারী কে এক কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে কহিল—পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ? অথবা, ব্যাটল অফ নাইলে ক্যাসাবিয়াঙ্কা নামের এক তেরবৎসরের কিশোর পিতার আদেশের অপেক্ষায় জ্বলন্ত জাহাজের উপর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—কখন পিতা ডাকিয়া বলিবেন, 'তোমার কর্তব্য পুরা হইয়াছে, চলিয়া আইস', অন্ধকারে ক্যাসাবিয়াঙ্কার জাহাজের মাস্তুলে আগুন ধরিয়া যাইত, ঝিঁঝির ডাক পাওয়া যাইত আর থাকিয়া থাকিয়া আব্বার শূন্য উদর শব্দ করিয়া ডাকিয়া উঠিত। এহেন বিদ্যোৎসাহী মানুষ আমি জন্মিয়া অব্দি দেখি নাই।

করুনাসিন্ধুবাবুর প্রপিতামহ অনাথবন্ধুবাবুর নবাবদত্ত উপাধি ছিল রায়। রায়বাড়ি ছাড়া গ্রামের বসতি-অঞ্চলে পাকাবাড়ি নির্মাণ নিষিদ্ধ ছিল। পাকাবাড়ি কেবল জমিদারবাবুর একচ্ছত্র অধিকার। চৈত্র-বৈশাখ মাসে আগুন লাগিলে মুশুরি, পাষাণখোলা, কাঁসারীপাড়া, দোকাটি, কেষ্টপুর, জোড়শিমুলতলা, খরিশা, মাধবডিহি ইত্যাদি গাঁয়ের বারজাতের মানুষের ঘরগুলি অগ্নিদেবের ভোগে যাইয়া খাক হইত। সেইবার চৈত্র মাসে আমাদের ঘর পুড়িল, আমরা কাজেমদের ঘরে আশ্রয় লইলাম। একে নিদারুণ দারিদ্র্য, ঘরে তণ্ডুল নাস্তি, তায় নিত্যি মহাফেজের তাগাদা। বাড়িতে থাকিয়া আর কত রোরুদ্যমানা জননীর মুখ দেখিব—কত আর অদৃষ্টকে গালাগালিরত নানির কাছে পড়িয়া থাকিব। বাহির হইয়া দেখিতাম—ভাদরখ্যাপা বৈশাখের রৌদ্রে পারার মতন গলিতে গলিতে জ্বলিতে জ্বলিতে চলিয়াছে। তটভূমি হইতে জলে ঝুপঝুপ করিয়া ভোঁদড় নামিতেছে—পানকৌড়ি অল্পজলের উপর দিয়া যিশুর মতন পার হইয়া যাইতেছে। পরপারে নিদাঘ-সূর্যের প্রভাবে শপ্পের আচ্ছাদন লঘু হইয়াছে—কশাড়ের জঙ্গল বিবর্ণ। রৌদ্রের প্রভাবে ভাঁটঝোপগুলি হইতে জংলি গন্ধ বাহির হইতেছে। শ্মশানবাড়ির কাছে আমাদের সেই কুটিরে আসিয়া দাওয়ায় শুইয়া থাকিতাম। অশ্রুশূন্য চোখে দেখিতাম, চালের খড় পচিয়া যাইতেছে। চাঁচারিতে ঘুণ ধরিয়াছে। কুটিরের পিছনের বাঁশবন হইতে সুনসান দুপুরে কিসে ডাকিত—টাক্কো! টাক্কো! সেইখানে সেই পাতার কুটিরে একদিন তকদির আমার দিকে চাহিয়া হাসিলেন, যদিও হাস্যপরিহাসে সে ঘটনার শুরু হয় নাই।

৭ পর্ব

এইখানে প্রথমে একটু বিষয়ান্তরে যাইব, জমিদারবাবুর অন্দরের গল্প বলিব। সাতকড়ির মুখে শুনিয়াছিলাম, বহুকাল হয় এক পহেলা বৈশাখে কপাল দেখিয়া এবং হস্ত গুনিয়া গণকঠাকুর করুনাসিন্ধুবাবুর বড় তরফে সন্তানভাগ্য লিখা আছে বলিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন সেইবৎসর সুরঙ্গমার সন্তান জন্মিবে। তৎকালে জমিদারবাবু নিঃসন্তান ছিলেন। ঠাকুরমশায় তো পাখোয়াজ লোক, বৎসরের ভাগ্য বলিয়া চালের কাঠা ও পয়সা লইয়া চলিয়া গেলেন। জমিদারবাবুর স্ত্রী সুরঙ্গমার আর দিন কাটে না।

এদিকে করুনাসিন্ধুবাবুর বোটে এতদঞ্চলে পাচক বামুন সুলভ নয় এই ওজরে মোসলমান বাবুর্চি রাখা হইয়াছিল, সে কেনানী পোলাও রাঁধিত—রামপাখির ঝোল-গোমাংসের ঝুরি দিয়া কাবাব, তাহাতে ইয়ারদোস্ত-মোসাহেব পরিবৃত রাজার উদরপূর্তি হইত। রাজ অন্তঃপুরে মেয়েবউদের সাথে মিলিয়া সুরঙ্গমা স্নান করিয়া ষষ্ঠীতলায় সমবেত হইয়া পূজার জোগাড় দিতেন, পূজান্তে ষষ্ঠীর পাঁচালি শুনিয়া স্নেহভাকদের মাথায় ধানদূর্বা দিয়া উপবাস ভাঙিতেন—আর রাজার বোটে কলকাতার মুন্নিজান-পিয়ারীজান নাচিত। স্বামীর আয়ুক্ষয়ের ভয়ে সুরঙ্গমা দিনের বেলায় স্বামীসন্দর্শন করিতেন না। দৈবাৎ দেখা হইয়া গেলে একগলা ঘোমটা দিয়া সরিয়া যাইতেন। রাত্রিকালেও রাজার দর্শন কদাচিৎ মিলিত। রাজা রাত্রে স্ত্রীর মুখ দেখিতেন না, অবিদ্যার মুখ দেখিতেন। পুরুষমানুষ তো শিমুল নয় যে সংবৎসর নিজের নিয়মেই ফাটিয়া যাইবে আর তুলার বীজ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে (এইখানে নষ্ট বুড়া সাতকড়ি একটি অশ্লীল কথা বলিয়াছিল, তাহা অনুক্ত রহিল।)! মোটের উপর, জয়দেবের গীতগোবিন্দ পুরা করিবার জন্য ঈশ্বরের যত চেষ্টা দেখা গেছিল, এইবেলা তাহা দেখা গেল না, করুনাসিন্ধুবাবুর মূর্তি ধরিয়া ঈশ্বর আসিয়া তাঁহার অসম্পূর্ণ কাজ সমাপ্ত করিয়া গেলেন না। অতএব, সুরঙ্গমার সেবৎসর সন্তান জন্মিল না। তাহাতেও হইল না, রাজা বৎসর ঘুরিলে আরেকটি বিবাহ করিলেন। এইবারের বধূটি নিতান্ত দরিদ্রঘরের পরমাসুন্দরী কন্যা। তাহার নাম সরযুবালা।

সরযুবালাও আসিল, সুরঙ্গমারও সন্তানসম্ভাবনা দেখা দিল। যে সন্তানকামনাকে কেন্দ্র করিয়া সুরঙ্গমার দিবসযামিনী এক হইয়া গিয়াছিল, তাহা যখন সত্যই আসিয়া ধরা দিল, তখন সুরঙ্গমার স্বামী দখল হইয়া গিয়াছে, তাঁহার খাসদাসী মাধী দাঁড়াইয়া থাকে রাজাবাবুকে সুরঙ্গমার ঘরে পৌছাইয়া দিবার জন্য, তিনি আলগোছে নববধূর মহলে ঢুকিয়া যান—গিয়া সরযুর পুতুলখেলার সঙ্গী হইয়া আমোদলাভ করেন। হিন্দুর ঘরে কন্যাজন্ম লাভ করিয়াছে, গায়ের ঝাল গায়ে মরিতে দেওয়া ছাড়া সুরঙ্গমার আর কোনো উপায় রহিল না।

কাচকড়ার পুতুল অবশ্য সরযু বেশি দিন খেলিতে পাইল না। কেই বা পায়! সুরঙ্গমা তত দিনে এস্টেটের ভাবী অধিকারীর জন্ম দিয়াছেন, মোহনকান্তি রায় নাড়ুগোপালকে উৎখাত করিয়া মায়ের কোল জুড়িয়া বসিয়াছে, আসমানে চাঁদের কলার মতন দিনে দিনে বাড়িতেছে।

মোহনকান্তি রাজার দুলাল। তাহাকে চোখে চোখে রাখা হয়, কুবের চাকর আসিয়া দুধ-জিলিপি খাওয়াইয়া যায়। সহিস-বেহারা সাথে যায় সর্বত্র। তাহার মা সারাবেলা নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহার জন্য ষোড়শ ব্যঞ্জন তৈয়ার করেন। তাহার জন্মোৎসবগুলিতে সরকারি শুভেচ্ছার নিদর্শনস্বরূপ

উচ্চপদস্থ ইংরেজ সাহেবেরা উপস্থিত থাকেন। বলে কি না, কপালে জলে-ডুবিয়া মরণ থাকিলে স্বয়ং নিয়তি কুমিরের বেশ ধরিয়া আসিয়া টানিয়া নিয়া যায়। ছেলের করুনাসিন্ধুবাবুর বোটের দিকে বড় ঝোঁক, বোটে করিয়া দূর দ্বীপে যাইয়া রাইফেল দিয়া রাজা পাখি শিকার করেন, বোটে সুবেশা গণিকাসমাগম ঘটে, বোটে নিষিদ্ধ খাদ্য পরিবেশিত হয়—মোটের উপর বোটের প্রতি মোহনের অল্প বয়েসেই অত্যন্ত অনুরাগ জন্মে। রাজনন্দনকে কুপথে লইবার জন্য মন্ত্রণাদাতার কখনোই অভাব ঘটে না, মোহনেরও সে অভাব হইল না। রাজার অজান্তে সে অবাধে বোটে যাতায়াত করিতে পাইল। সে জল বড় ভালোবাসিত—বোট হইতে জলে ঝাঁপাইয়া সাঁতার দিত—কৃষ্ণদামপুরের চরে গিয়া হাঁস মারিত।

এমনই একবার সে সবার অলক্ষ্যে সাঁতার দিতেছিল, তখন ভাদ্র মাসের ভরা নদী দুকূল ছাপাইয়া কলকল করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, ঝুপঝুপ করিয়া পরপারে গ্রামগুলির তীর ভাঙিতেছে—মোহন ডুবসাঁতার দিয়া উঠিতে গিয়া দামে আটকাইয়া গেল। ভাগ্যক্রমে তখন আমি নদীর জলে নামিয়াছি—ভাই পরানের সাথে সমারোহ করিয়া সাঁতরাইতেছি। পরান তাহাকে প্রথম দেখিল—দামে আটকাইয়া আঁকুপাঁকু করিতেছে। তাহাকে জল হইতে এন্তার কায়িক শ্রম করিয়া তুলিয়া কুটিরের দাওয়ায় আনিয়া ফেলিলাম। শ্বাসক্রিয়া শুরু করিবার চেষ্টায় চাপড় দিলাম। ওয়াক তুলিয়া একসময় সে দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। চোখ মেলিল।

এতকাল দূর হইতে বড়তরফের কুমারকে দেখিয়াছি, এইবার মনে হইল তাহার মোহনকান্তি নামখানা সার্থক। পিয়ারা চেহারাই বটে। ততক্ষণে রাজার লোকের কাছে খবর গিয়াছে। তাহারা চক্ষের পলকে আসিয়া পালকি করিয়া মোহনকে লইয়া গেল। মনে ভয় হইল, আমাদের না জানি বাঁধিয়া লইয়া যায়। তাহা হইল না দেখিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম, তবে সেই স্বস্তি দীর্ঘায়ু হইল না। সন্ধ্যায় এত্তেলা আসিল, আমাদের ডাক পড়িল। হলুদ পাগড়ি মাথায় বাঁধা, মহিষাসুরের মতন দেখিতে হলধর আলো হাতে আসিয়া ধানখেতের বিস্তারের ভিতর দিয়া হাঁটিয়া আমাদের জমিদারের সেরেস্তায় লইয়া গেল। জাতে মোসলমান বলিয়া ফরাস সরাইয়া আমাদের জায়গা করা হইল। নায়েবমশাই আমাদের ডাকিয়া কিছু কাঁচাপয়সা হাতে ধরাইয়া দিলেন— নাচিতে নাচিতে বাড়ি ফিরিলাম। মা অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন, জান বাঁচাইয়া পয়সা নিলি তোদের শরম করিল না ইত্যাদি। আমাদের নানি বিনা বাক্যব্যয়ে পয়সাগুলি তুলিয়া রাখিয়া শিকা হইতে ভাত-তরকারি নামাইয়া আমাদিগকে খাইতে বসাইলেন—মায়ের সৌজন্যশিক্ষা তাঁহার কাছে অপ্রয়োজনীয় বোধ হইত। নানি অল্পবয়সে বিধবা হইয়া অবধি বহু ক্লেশ শিকার করিয়া তাঁহার সন্তানদিগের খাওয়াপরা নিশ্চিত করিতেছেন, তাঁহার পুত্রসন্তানেরা সকলেই শৈশবের অপুষ্টিজনিত অসুখে মরিয়াছে, বাঁচিয়া থাকিবার মহামন্ত্র ছাড়া নানির পূজ্য আর কোনো মন্ত্র ছিল না। আমাদের মা ছিলেন আদর্শবতী, ক্যাসাবিয়াঙ্কার মতন জ্বলন্ত জাহাজে ঠায় দাঁড়াইয়া থাকবার মানসিকতাসম্পন্না স্ত্রীলোক। নানি তাঁহাকে এমন করিয়া আগলাইয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়াই বাহিরের কঠিন আঁচে তাঁহার মর্ম শুকাইয়া যায় নাই।

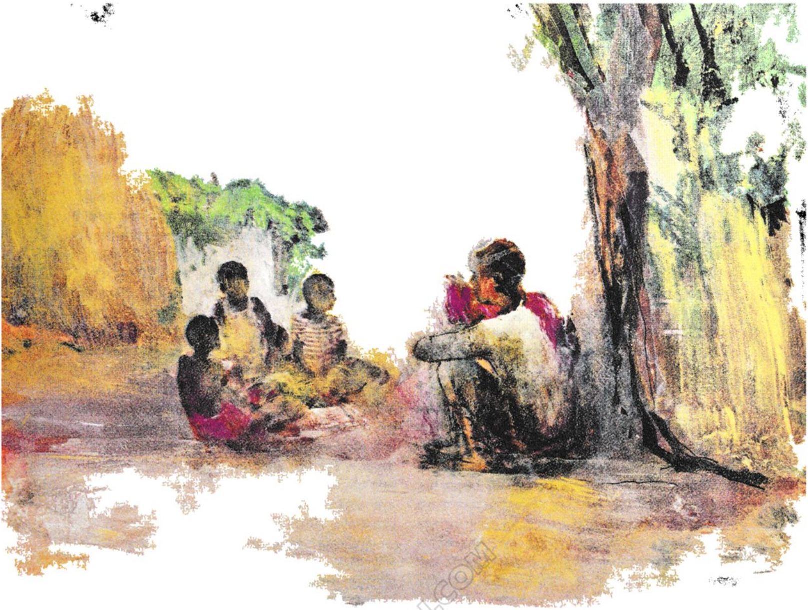
৮ পর্ব

দুদিন বাদে আবার ডাক পড়িল। এইবার জমিদারবাড়ির অন্দরে—বড়রানী সুরঙ্গমা আমাদের ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। আমরা আমাদের সবচেয়ে ছাপ কাপড়খানা—দিশি যুগীর বোনা তহবনখানা পরিয়া তালুতে তেল চাপড়াইয়া রানীসঙ্কাশে চলিলাম। রাজবাড়ি পৌছিবার পর কৌশল্যাদাসী আসিয়া আমাদের একখানি জালির কাজ করা অন্ধকার গলিপথে অন্দরের একটি ঘরে লইয়া গেল, আরেকটি দাসী একটি রেকাবিতে করিয়া আখের টুকরা, জালিশ, সাডাবের নেওয়া, তালমিছরি ইত্যাদি খাইতে দিয়া গেল। আমি আর পরান একে অপরের দিকে তাকাই—ইতোপূর্বে হিন্দুবাড়িতে আমাদের কেহ ঢুকিতেই দেয় নাই আর খাওয়া! মনে ভাবিলাম—বড়রানী হয়তো জানেন না যে আমরা মোসলমান, এইমত ভাবিয়া খাবার স্পর্শ করিলাম না। দুই ভাই মিলিয়া বিচলিত মুখে জমিদারপুরের অন্দরশোভা দেখিতে লাগিলাম।

ঘরখানিতে ধূলিমলিন বেলোয়ারি ঝাড়লণ্ঠন—কোণের দিকে কাচের আলমারিতে চিনামাটির মেমপুতুল-সমুদ্রশঙ্খ-গালার কাজ করা মনোহারী দ্রব্য সাজানো। দেয়ালে বোধ করি শিশিরবিন্দুবাবুর তৈলচিত্র—মৃত বাঘের পেটে পা দিয়া দর্পভরে দাঁড়াইয়া আছেন। বিপরীত দেয়ালে কার্পেটে বোনা বিলাতি ফুলের গুচ্ছের ছবি বাঁধাই করা, চওড়া শৃঙ্গশোভিত মহিষের মাথা ঝুলিতেছে। ঘরের জানালাগুলিতে রুইতন আকৃতির রঙিন কাচ বসানো, তাহার ভিতর দিয়া বিলাতি লেবেঞ্চুস রঙের আলো আসিতেছে।

বড়রানী আসিলেন, দেখিলাম রাজার ঘরেও শ্যামবর্ণের মাতৃমূর্তি দেখিতে মিলে, হাতগুলি আদুর, গলায় সরু মুক্তালতা, গায়ে গরদের শাড়ি জড়ানো, শাড়ির ঢালা লাল পাড় মসৃণ—তাঁহার মুখখানা ঘিরিয়া রাখিয়াছে, কপালে চাকাপানা কুঙ্কুমের টিপ। তিনি স্থির হইয়া আমাদের দেখিলেন, দেয়ালগিরির আলোয় তাঁহার বড় বড় চক্ষুগুলি রুপার কাজললতার মতন ঝলসাইতেছিল, আস্তে আস্তে তাহারা জলে ভরিয়া আসিল। আমরা অস্বস্তির সহিত চুপ করিয়া রহিলাম। তিনি আমাদের আড়ষ্ট দেখিয়া নম্রস্বরে বলিলেন, 'তোমরা আমার গোপাল, সংকোচ করিয়ো না।' আব্বা বলিতেন, 'আমরা গো-জাতীয়', সেই কথা মনে পড়িয়া কি না কে জানে, পরান খুক করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া সভয়ে চারদিকে তাকাইতে লাগিল। করুনাসিন্ধুবাবুকে প্রজারা ভয় করিত, তাঁহার পুরী হইতে জীয়ন্ত বাহির হইব এমন সম্ভাবনা এইবার বোধ হইল লোপাট হইয়াছে। একটি সস্নেহ হাসি রানীর ঠোঁট ছুঁইয়া গেল। তিনি একে একে আমাদের ঘরের নানান খুঁটিনাটি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরাও যথাসাধ্য জবাব করিলাম। মনে হইল আমরা জবাব দিবার আগেই তিনি কিছু খবর সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। আমাদের পিতৃবিয়োগ হইয়াছে, আমাদের ঘর ভস্মীভূত হইয়াছে এই সকলই তিনি পূর্ব হইতে জানিতেন। রানী আমাদের চমকিত করিয়া বলিলেন, নায়েবমশাইকে তিনি বলিয়া দিয়াছেন আমাদের ভিটায় ঘর তুলিয়া দিতে, এই জন্য তোষাখানা হইতে খরচ যাহা লাগে যাইবে আর রাজাকে বলিয়া মোহনের সহিত তাহার মুনশিজির নিকট আমাদের দুই ভাইয়ের পড়াশোনা করিবার অধিকার আদায় করিয়াছেন। ভাবীকালের প্রজাপোষককে প্রজাদের ধর্মবর্ণনির্বিশেষে ভালোবাসিতে হইবে, জানিতে হইবে—তাই এই ব্যবস্থায় কুমারের মঙ্গলই হইবে, এই সব বলিলেন।

এতকাল প্রজাপীড়ক রাজা পাঠশালা ভাঙিয়া দিতেছেন এইরূপ গল্প শুনিয়াছি, রানীর কথায় আমরা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম। রিরংসা উদ্দীপক সংস্কৃত শ্লোক পড়িয়া গ্রামের বৈদ্যের ছেলেরা পাকিয়া উঠিতেছে—উর্দু পুস্তকগুলিও রীতিমতো অশ্লীলতাপূর্ণ, পড়িবার জন্য আমাদের এমন কিছু তাড়া বোধ হইতেছিল না। হিন্দুর বিদ্যাভ্যাসের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার তাড়নাও ছিল না। এমন জানিলে মোহনকান্তির সলিলসমাধিই হইতে দিত পরানের এইরকম মনোভাব—আমার মনও অনুকূল নয়। মক্তবের আকুঞ্জি হুজুরের কাছ হইতে ছাড়া পাইতে না পাইতেই এ কী উৎপাত—এখন রাজারানী চড়াও হইয়া আমাদের লেখাপড়া



আব্বা গামছা ঘুরাইয়া নিজেকে বাতাস করিতেন এবং আমাদেরকে নিজের পঠিত সাহিত্য গল্পের আকারে শুনাইতেন

শিখাইবে!

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। পরের দিন হইতে আমরা দুই ভাই মোহনকান্তির সহিত পড়িতে আসিলাম। কাশীদার পাগড়ি-পরা এক মুনশিজি আমাদের পড়াইতেন। তিনি কুরসিতে বসিতেন, মোহনকান্তি ফরাসে বসিত আর আমরা মেঝেয় বসিতাম। জ্ঞানলাভের নামে দুলিয়া দুলিয়া শুকবৃত্তি করিতাম। খাগের কলম আর কয়লাগোলা কালি দিয়া লিখিতাম। মুনশিজি চোখে একটু কম দেখিতেন, ভুল করিলে আঙুল জোড়া করিয়া খাগ মাঝখানে রাখিয়া বিষম টিপুনি দিতেন। কর্ণবিবরে আসিত হাসির হররা—দাসদাসীদের কোন্দল—মত্তমানুষের গানের কলি—নাকে আসিত পিঠাপুলির ঘ্রাণ।

মোহন প্রথমে আমাদের সহিত মিশিত না। চুপচাপ পড়া বুঝিয়া লইত। পড়া শেষ করিয়া দুধ-জিলাপি খাইতে উঠিয়া যাইত। ধীরে ধীরে আমাদের প্রতি তাহার কৌতূহল জন্মাইল। সামাজিক বিভেদ ডিঙাইয়া আমাদের মিলমিশ সম্ভব ছিল না, সেই বিভেদ মানিয়া লইয়াই একরকমের অসম সখ্য তৈরি হইল—আমরা ছাড়া তাহাকে কে বেথুল-বঁইচি খাইতে শিখাইবে, মুনশিজির সামনে হাসি আসিলে কাহাদের চোখে চোখে সেই হাসি চালান করিয়া দিবে? কে পাগলা সাবুর মান্দালয় জেলে কারাবাসের গাঁজাখুরি গল্প শুনাইবে? সেই মান্দালয় কোথায়? বর্মামুল্লুকে। মোহনকান্তি জানে সেখানে পোলো খেলিবার (শুনিলাম, একপ্রকারের সাহেবি খেলা) চমৎকার ব্যবস্থা, চুরুট সস্তা আর জেনানার বালাই নাই—নারী-পুরুষ একে অন্যের নিকট মারীগুটিকার মতন ভয়াবহ বস্তু নয়—কেমন খোলামেলা বন্ধুবৎসল ফিটফাট খোশপোশাকি বর্মিসমাজ—সেইখানে যাইতে পারিলে বেশ হইত। কিন্তু নিরন্তর আরাকানি মশার অত্যাচার—মশারির চালে গেছো ব্যাঙ আর জলাভূমি কত সওয়া যাইবে! বুড়া সাতকড়ি বর্মামুল্লুকের গল্প শুনিবামাত্র বাঁকা হাসিয়া বলিয়াছিল—যা যা, তাহারা স্ত্রীলোকের অপেক্ষাও কিশোরদের ভালোবাসে...তাহার পর কী বলিতে গিয়া চুপ করিয়া গিয়াছিল।

যাহাই হউক, আমাদের আলাপ জমিয়া উঠিল। প্রথমদিকে রাজভোগ খাইয়া আর মোহনের সাচ্চা জরির পেশোয়াজ দেখিয়া আসিয়া আমাদের কুটিরে গড়াইয়া রাখালদের কাছে বিপুল উৎসাহে কত গল্প করিতাম! এইবার দেখিলাম, মোহনকান্তি যত কাছে আগাইয়া আসিতেছে, বন্ধুদের ভিতর 'এঁটোপাতের ধোঁয়া স্বর্গে যাইতে চায়' ইত্যাদি স্বগতোক্তি তত বাড়িতেছে, রাখাল-ঢোলগোবিন্দরা একরকমের অবিমিশ্র অসূয়ায় তত সরিয়া যাইতেছে। তাহারা যাহাদের উঠানে ঢুকিতে দেয় নাই, সেই মোসলমানের পো রাজবাড়িতে ঢুকিয়া হান্টলি অ্যান্ড পামার্সের বিলাতি রাজভোগ খাইয়া আসিতেছে।

৯ পর্ব

একদিন জ্বর উঠিয়াছে বলিয়া পরান পড়িতে আসে নাই। মুনশিজি আসিবার খানিকক্ষণ আগেই আমাদের পড়িবার জন্য বসিতে হইত। তখনো ভিতরবাড়ি হইতে ঢুলিতে ঢুলিতে মোহনকান্তি আসিয়া পৌছায় নাই। পড়ার ঘরে ঢুকিয়া চমকাইয়া উঠিলাম। মরকত-সবুজ আলোকরশ্মির মতন উজ্জ্বল একখানা শাড়ি পরিহিতা বালিকা, চওড়া পাড় হইতে নিরাবরণ হাতখানা বাহির হইয়া আসিয়াছে। শাড়ির সবুজ

খাপের উপরে সোনালি চক্রাকার বুটি নয়াপয়সার মতন ঝলমল করিতেছে, নড়িবার সময় শাড়িতে যে শব্দ হয় তাহা স্বর্ণগোধিকার ঝোপঝাড়ে চলিয়া যাইবার মতন সরসর শব্দ, আর সে আলোড়নে চুলের কুন্তলীন ও অগুরুর সুবাস বাতাসে আসিয়া মিশে। তাহার চোখগুলি আয়ত-চঞ্চলকৃষ্ণ। ভ্রুপল্লবগুলি সেই সতেজ চোখগুলিকে শুক্তির ঢাকনার মতো ঘিরিয়া রাখিয়াছে। অবারিত কপালে লাল সিন্দুরের টিপখানা অত্যুজ্জ্বল, যেন শুভ্র-কপালের ভিতর হইতে রক্তবিন্দুর মতো স্ফুরিত হইতেছে। মুখখানি অল্পহাসির আমেজে বাঁকা। তাহাকে দেখিলে চক্ষু সরে না, মুখে বাক্য হরে না। বালিকা কে, কেন এইখানে আসিয়া নিঃশব্দে স্থির হইয়া বসিয়া আছে, কেন তাহার ওষ্ঠে একরকমের তামাশা দেখিবার মজা ফুটিয়া উঠিতেছে—কিছুই বুঝিলাম না। তাহাকে হাতজোড় করিতে পুরুষকারে ঠেকে, আবার না দেখিবার ভাবও করা যায় না। আমার আদ্যোপান্ত ভূমিজরিপ করিয়া সে একসময় ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সাতকড়ির বয়স হইয়া আসিয়াছে, শীত শুরু হইবার সময় প্রতিবছর আমরা ভাবিতাম, এই শীতে সাতকড়ি যাইবে, কিন্তু যমের অরুচি প্রতি ফাল্গুন মাসে পাঁকাটির মতন হাত-পা লইয়া ঠিকই সিধা হইত। কাছে গিয়া পড়িলেই সে বাপের মুখে শোনা গল্পের ঝুড়ি খুলিয়া বসিত। আমাদের ম্লেচ্ছ ও নিম্নবর্গীয়দের সংস্পর্শে আসিয়া তাহার জাত যাইবার ভয় ছিল না, হুঁকার জল ফেলিবার উদ্বেগ ছিল না। আগের মতন তাহার নড়িয়া চড়িয়া নিজেরটুকু রাঁধিয়া লওয়া হইত না, দুধ আর আফিমের ভরি—এই লইয়া সে বাঁচিয়া ছিল। জ্বরে পড়িলে গুপী নামের নীচজাতীয়া একটি স্ত্রীলোক তাহার দুবেলার রান্না করিয়া দিত। লোকে বলিত, তাহার সহিত সাতকড়ির অপবিত্রযোগ ছিল।

করুণাসিন্ধুবাবুর বাগানের উত্তরদিকের সীমান্তে পাঁশকুড়ের কাছে একখানা পরিত্যক্ত কোঠাবাড়ি ছিল, কোনোমতে ঠেকনা দিয়া রাখা সেই বাড়ির সদরদরজার উপরে নামের ফলক ভাঙিয়া গিয়াছে—তবু পড়া যাইত 'রাইশশী নিবাস', সেখানে সাতকড়ি থাকিত। শোনা যায় এই রাইশশী ছিলেন জমিদার শিশিরবিন্দুবাবুর রক্ষিতা। তাঁহার গায়ের রং ছিল সোহাগা গলানো সোনার মতন, চোখ ছিল মার্জারির মতন কটা, সেকালে লোকে তাহাকে মেমশশী ডাকিত। মেমশশীর বেশবাস ছিল রানীর মতন—বেনারসি পরিতেন, হীরার কণ্ঠী পরিতেন, নাইকুন্ডলি অব্দি নামিয়া আসা আসল মোতির হার; দোকাটির মেয়ে, তাহাকে উঠাইয়া আনিয়াছিল রাজার লোক। রাজার তাঁহাকে বাগ মানাইতে অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল। রাইশশী ছুটিতে ছুটিতে বাগানের এই কোঠাবাড়িতে আসিয়া দুয়ারে কুলুপ আঁটিয়া দিয়াছিলেন। কেমন করিয়া কবে সেই দুয়ার আবার রাজার জন্য খুলিয়া গিয়াছিল, কে বলিবে। সাতকড়ি স্মৃতি হাতড়াইয়া আর মনে করিতে পারিত না। কিংবা একা একা কিছু ভাবিত, তাহার ঘোলাটে দ্রব চোখের মণিতে একরকম সুদূরের রং ধরিয়া স্থির হইয়া থাকিত।

আমরা তাহার কাছে গিয়া 'বুড়াআআ' ডাকিয়া পড়িতেই সে শুরু করিত, সেকালের গবর্মেন্টের সিভিল সার্ভেন্ট নিজ জেলায় ছয়বেহারার পালকিতে করিয়া যাইতেন, সামনে যাইত মশালচি, নারিকেল তৈলে সময়-সময় আগুন বাড়াইয়া লইত। পথিমধ্যে বিস্তর বনভূমি পড়িত, কালীসাধক ঠগীদের ভয় ছিল—বর্ষাশেষে পূজা দিয়া তাহারা ডাকাতিতে বাহির হইত। আমরা একটু ঘন হইয়া বসিতাম, এইবার ঠগীদের গল্প আসিতেছে—ঠোনা মারিয়া ঢুলিতে থাকা রাখালকে জাগাইয়া দিতাম। ফাঁসুড়ে ডাকাত তাহারা, বণিকের বেশে ঘুরিতেছে—দুর্গম পথে ঘাপটি মারিয়া রহিয়াছে—নিজেদের ভিতরে সাংকেতিক ভাষা রামাসীতে কথা বলিতেছে, ধর্মশালা খুঁজিতে খুঁজিতে পথিক বনপথে আসিয়া গিয়াছে, তাহার আর রক্ষা নাই, (সাতকড়ির বর্ণনা রীতিমতো নিঁখুত।) শ্বাসরোধ করিয়া মারিয়া ফেলিবার আগে পথিক বুকফাটা ডাক ছাড়িয়া উঠিল—বাবা!, ঠগী হাসিল, মরণকালে সকলেই পিতৃশরণ লয় বৈকি। ঘরে আসিয়া ঠগী দ্যাখে—পথিকের গায়ের নতুন কাপড়খানা আসলেই তাহার একমাত্র পুত্রের। আমাদের চোখ টলমল করিত, সাতকড়ি নির্বিকার মুখে থালা টানিয়া খাইতে বসিয়া যাইত, ফেনাভাত আর কোনোমতে একটা তরকারি। কখনো চালপিঠালি দিয়া মাছের তেলের বড়া, কখনো কাঁটা দিয়া ছেঁচড়া। সাতকড়ির প্রেমার্থিনী বড় ভালো রাঁধিত। আমরা মাঝে মাঝে তাহার ভাগ পাইতাম। রাখালেরা সেই নিত্যপ্রসাদ লইতে ইতস্তত করিত, সাতকড়ি একগাল হাসিয়া বলিত, 'আড়াল কইরা খাইয়া ফেল, দ্যাখলে জাত যায়, খাইলে যায় না।'

রাজার পীড়ন নাকি রাজার স্নেহপীড়ন, কোনটি অধিক যাতনাকর বলিতে পারি না, কালে কালে মোহনের ভালোবাসা একরকমের সর্বগ্রাসী জলচর প্রাণীর মতন অষ্টপাশ দিয়া আমাদের ঘিরিয়া ধরিল। সে রাজার ঘরে সঙ্গীহীন জীবন কাটাইয়া অভ্যস্ত, সঙ্গী পাইয়া তাহার আগ্রহের অবধি রহিল না। তাহাকে ঢাকা পাঠাইয়া ভালো ইস্কুলে পড়াইবার জন্য রানী ধরিয়া পড়িলেন, মোহন জেদ ধরিল সে আমাদের ছাড়িয়া ইস্কুলে যাইবে না। রাজামশায় নিশ্চয় বিরক্ত হইয়াছিলেন, রানী বলিলেন—'আহা বাছা আমার!' ইত্যাদি। নির্দিষ্ট সময়ে বাক্স গুছাইয়া, চাকর লইয়া এবং আমাকে বগলদাবা করিয়া মোহন ঢাকা চলিল।

দীর্ঘদিনের জ্বরের প্রতাপে পরানের স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়িয়াছিল—সে ঢাকা যাইতে পারিল না, মুশুরির মাতৃস্তন আঁকড়িয়া পড়িয়া রহিল। আমাদের ঘর তোলা হইয়াছে, যৎসামান্য খেতের ফসল হয়, আউশচালের ভাত জোটে। খেতের সরিষা ভাঙাইয়া কিঞ্চিৎ রাই মিশাইয়া কলু তৈল দিয়া যায়। বাথানে দুইটি গাই, একটি ধবল আরেকটি কপিলবর্ণ। পরান ঢাকায় যাইতে না পারিবার জন্য তেমন দুঃখবোধ করিল না, কপিলার বক্ষপঞ্জরে যষ্টিপাত করিয়া দিন কাটাইতে মনস্থ করিল—আর আমি ঢাকাস্থ পোগোজ স্কুলে বেত খাইয়া ইংরেজি শিখিতে লাগিলাম। এই করিয়া নিয়তির নির্দেশে আমার মৃত পিতার উম্মেদ একরকম করিয়া পুরা হইতে শুরু করিল। আমার ভিতরেও বোধ করি কোথাও নিত্যসঙ্গী অভাবকে অগ্রাহ্য করিয়া কোনো এক মহত্তর জীবনের দিকে উদ্ভাসিত হইবার প্রগাঢ় মর্মবাসনা ছিল, এক্ষণে তাহা নিজের সন্নিকটে ধরা দিল। অল্প আয়াসেই পুস্তক আমার ভালো লাগিল, কেতাবকীট হইতে শুরু করিলাম।

১০ পর্ব

আমাদের নদীতীরের ঘরের দাওয়ায় ছিঁড়া মাদুরে শুইয়া কাকা একবার একটা অদ্ভুত কথা বলিয়াছিলেন। আদিকালে রাজারা অশ্বমেধযজ্ঞ করিত। একটি সর্বসুলক্ষণযুক্ত অশ্ব বর্ষ ভরিয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া তাহাদের যশবৃদ্ধি করিত, যুদ্ধজয় করিয়া আসিত, অবশেষে রাজা কিনা সেই অশ্বকে নিজের মোক্ষলাভের উদ্দেশ্যে হত্যা করিয়া যজ্ঞ করিতেন—বেঙ্গল তথা ভারতবর্ষ ব্রিটিশরাজের জন্য সেইরূপ মেধের অশ্ব। রেশম চাহিলে রেশম, সল্টপিটর (কে জানে সে কী বস্তু) চাহিলে সল্টপিটর, নীল চাহিলে নীল, পাট চাহিলে পাট—অনন্তর জোগাইয়া চলিয়াছে, অথচ ভারতবর্ষের প্রাণ বিসর্জন দিয়া এই নিষ্ঠুর লালমুখো রাজার যাগ-যজ্ঞ চলিতেছে। আমরা মনে ভাবিতাম, ঘোড়াকে মারিলে সে কী বুঝিতে পারে না যে তাহাকে মারা হইতেছে? শারদসিন্ধুবাবুর বিধবাকে দাহ করিবার সময় তিনিও নির্ঘাত বুঝিয়াছিলেন

জিন্দা পুড়িয়া মরা কাহাকে বলে—তাহা হইলে আপামর বেঙ্গল এই দাহ টের পাইতেছে না কেন?

আমাদের নদীতীরের ঘরখানার আলস্যময় দিন—বাজে কথায় পার করা বেলা—কাদাজলের গর্তে আঙুল ডুবাইয়া মাছ ধরা, দায়ে কাটা তামাক সেবন করিতে করিতে সাতকড়ির গল্প, বৈশাখের নালিতা শাক—ভাদ্র মাসের তালের পিঠা কোথায় ফেলিয়া আসিলাম! ঠাঁইনাড়া হইয়া ঢাকায় আসিয়া আমার মন বসিত না। পূর্বেই স্বীকার করিয়াছি আমাদের আদত ছিল পাললিক শিলার, তাহাতে বিস্তর আগাছার বীজ প্রকৃতিই রুইয়াছেন, সে বীজ ঢাকা শহরের শানে পড়িয়া মাথা কুটিতে লাগিল। ঈদ আসিয়া পড়িল, কাগজের টুপি মাথায় দিয়া ঈদগাহে গিয়া ইমামসাহেবের বয়ান শুনিয়া আসিলাম, 'ইবলিশ যখন আট দিকের অধিকার চাহিয়া জুটাইয়া লইল, আল্লাহ বলিলেন—রে দুর্মতি, তুই উর্ধ্ব আর অধঃ ভুলিয়া গেলি কি করিয়া, আমার বান্দা মাথা নোয়াইয়া সিজদা করিবে আর হাত তুলিয়া দোয়া মাঙিবে—এই দুই কাজের কারণে তাহার আট দিকের পাপক্ষালন করিয়া দিব!'

মাঝেমধ্যে মন আনচান করিলে কমিশনার বাকল্যান্ড সাহেবের গড়া বাঁধের উপর ঘুরিতে যাই, নদীর হাওয়া খাই, চকে আসিয়া খাই বাকরখানি। চক ঘুরিয়া কসিদার কাজ, মুসলমানি টুপি, ছিট কাপড়, বেতের পেঁটরা, জুতার পসরা, ভুসিমালের আড়ত দেখিয়া বেড়াই। কখনো দেখিতে পাই নূতন বড় চকবাজার প্রদক্ষিণ করিয়া সেলাম জানাইয়া বরযাত্রীসমেত বিবাহ মজলিশে ফিরিতেছে—আখড়ার ধুলায় কুস্তিগিরেরা কুস্তিতে মত্ত—হাত ঘুরাইয়া কত কসরত করিয়া তেলে ভূষণ ময়রা জিলিপি ছাড়িতেছে তাহা অনন্তকাল দাঁড়াইয়া দেখি। দেখি শ্রীনিবাসের দোকানে সদ্য ভাজা বেগুনিগুলি পানার মতন টোপা টোপা হইয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। সোন্দা ঘি, ঘানির তৈলের আলাদা আলাদা ঘ্রাণ বাতাসে। মহররমের সময় শিয়া সম্প্রদায়ের মিছিল বিবির রওজা হইতে বাহির হইয়া নায়েবে নাজিমদের গড়িয়া যাওয়া ইমামবাড়ার দিকে চলিয়া যাইতেছে। হুসায়নী দালান হইতে ইলাহি-রাতে মর্সিয়ার সুর ভাসিয়া আসিতেছে—দিবারাত্রির অফুরান কর্মচাঞ্চল্যের কেন্দ্রস্থলে আসিয়া পড়িলাম যেন।

দোলাইখালের উপরে লোহার পুল। রেসের দিন অফিস আদালত দ্রুত খালি হইয়া যায়। রেসকোর্সের পাশের পুকুরের ধার ঘিরিয়া বিলিতি ঝাউগাছের সারিতে বাতাস খেলিবার মর্মর শুনিয়া আসি। একধারের কবরখানাটিতে প্রচুর গরু-ছাগল চরে। শাহবাগের দিকে গেলে নওয়াবদের বাগানে বিস্তর হরিণ চরিতে দেখা যায়। শহরটিতে প্রচুর গুয়াবাগান, রাস্তাগুলি বেশির ভাগই ধূলিকাদাময়, কিছুদূর পরপর হাইড্র্যান্ট—তাহার জলের স্বাদ মেটে—কদাচ তাহাতে গেঁড়িও মিলে। দুই ধারে আম-কাঁঠালের গাছ অথবা ধানখেত, অড়হরখেত, যেন গেঁয়ো রূপখানি শহরের ইতিউতি ছোবল দিয়া ফিরিতেছে।

দিনের বাতাসে অনেক গল্প আগাছার রেণুর মতন ভাসিয়া বেড়াইত এবং আমার হৃদয়ের পলি আঁকড়াইয়া ধরিয়া শিকড় বিস্তার করিত। শ্রীনিবাস হীনপ্রভ মোগল বাদশাহর বর্মামুল্লুকে মরিবার গল্প করিতে করিতে মুখ বাঁকাইত। দুইখান ঘড়ি আছিল রে জুড়ান। আর্মেনি গির্জার আর রূপলাল হাউসের ঘড়িঘর—ভাইঙ্গা পড়ল একদিন। হাতে শুষ্ক রুটির ন্যায় চাকতি ধরাইয়া দিয়া কহিত, 'নে নে, নাচনেওয়ালি খানির নামে এই রুটির নাম', আগা বাকেরকে মারিয়া ফেলিবার গল্প আমি শুনিয়াছি তাহার মুখেই। রসাল গল্পও শোনা যাইত—নপসী রক্ষিতার গায়ে ঈর্ষাপীড়িত নবাবের ছাপ্পান্নটি ছুরিকাঘাত করিয়া রাখিবার গল্প। শ্রীনিবাস তেলেভাজা ভাজিতে ভাজিতেই কত গল্প করিত। পাগলা মৌলভি জমিদার আর নীলকর ওয়াইজসাহেবের ফৌজদারি মামলা কতকাল চলিয়াছে সব গল্প জানিত সে। নিমতলীকুঠির শেষ নায়েবে নাজিমের ঘোড়ায় চড়িয়া ম্লেচ্ছপোশাক পরিয়া মোসাহেব লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এইসব তাহার বাপপিতামহ দেখিয়াছে। হাতের ভঙ্গিমায় অবলীলায় বুড়া শ্রীনিবাস দেখাইয়া দিত—কোন পথ দিয়া নুসরত জংয়ের পাটহাতি চলিয়া যাইত, দেখিতাম সেই পথে বুড়া ইমামসাহেব পাটনাই জামদানির পাগড়ি পরিয়া হাঁটিয়া যাইতেছেন। কেল্লা হইতে কাটরা অবধি কিছুই যেন শ্রীনিবাসের অগোচর ছিল না। মাঝে মাঝে দোকানের বাসি তেলেভাজার খানিকটা সে পাতার দোনায় করিয়া তুলিয়া রাখিত, আমি আসিলে অপাঙ্গে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া আমার হাতে গুঁজিয়া দিত।

সূর্য ডুবিলে সবকিছু অন্ধকারে ডুবিয়া যাইত। কিছু রাস্তায় বিজলিবাতির আলো আসিয়াছে, তখনো ঘরে আমরা তেলের বাতি জ্বালাইতাম। সন্ধ্যাবেলা ফেরিওয়ালার মিঠাই বেচিবার হাঁক শোনা যাইত, অন্ধ ফকিরের ভিখ মাঙিবার গান, সিসাভরা ঝাঁজমলের শব্দ আর সহিসের হুঁশিয়ারধ্বনি। কলঙ্কের কালিমায় আগ্রীব নিমজ্জিত কিছু পথ রহিয়াছে, রাতের শহরে সেই পথে দল বাঁধিয়া গান গাহিয়া কাহারা হল্লা করিতে করিতে চলিয়া যায়। সদর রাস্তার দুই ধারে দ্বিতল দালান হইতে চকিত বেহালার শব্দ আসে, নারীকণ্ঠের উচ্চগ্রাম হাসি আর কাচের বোতল ভাঙিবার ঝনৎকার। সেই সব গলিপথে আমাদিগের মতন বালকদের ভুলিয়াও প্রবেশ করা নিষেধ। মত্ত হইবার ভান করিয়া চোরেরা গায়ের উপর আসিয়া পড়িবে—শাল ইত্যাদি লইয়া দৌড়াইয়া পালাইবে।

দুপুর রোদে বাড়ির সামনের সরু রাস্তা দিয়া নীচুজাতের পসারিণীরা মাথায় করিয়া কচ্ছপ ফেরি করিয়া ফিরিত। কেহ গেরস্থের দালানের ছায়ায় বসিয়া দা দিয়া কাঁঠাল ভাঙিত। হিন্দুস্তানি ভিখারি সুর করিয়া ভিখ মাঙিয়া যাইত। কীর্তনিয়ারা রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইবার পর কত লোকে সেই ধূলি মাখিত, কীর্তনের দল চলিয়া গেলে লোকে খই-বাতাসা ছিটাইত। মাঝে মাঝে আমি তামাম দিনমান হাঁটিতাম। পিলখানা হইতে হাতির বৃংহতি শুনিতে পাওয়া যাইত, সেই হাতির পাল নাইতে যাইত হাতিরঝিলে। মতিঝিলের জলাজঙ্গল পার হইয়া গেলে দিলখুশার বিলাতি রীতির বাগানবাড়ি, মাঠে দুই-চারিটা বিলাতি তালশ্রেণির গাছ। বাগানবাড়ির তালাবের আয়নার মতন জল, জলের ধারে বসিবার পাকা দালান, বাঁধাই পইঠা জলে নামিয়া গিয়াছে। ফিরিবার সময় দেখিতাম বাজারের কাছের গির্জার ঘড়িতে ছয়টা বাজিয়াছে, গির্জার চূড়া গৈরিক আলোয় মাখামাখি। এইভাবে ঢাকার ধূলিময় পথে আমি শহুরে জীবনের পায়দানে দৌড়িয়া উঠিলাম, এই শহরের আলো-বাতাসে আমার অভিষেক হইল।

১১ পর্ব

মোহনকান্তি, তাহার চাকরবাকরসহ বুড়িগঙ্গার তীরবর্তী একটি বড় বাড়ি ভাড়া লইয়া থাকিত। পুরোনো আমলের বাড়ি, তাহার সম্মুখে একখানি সুন্দর বাগান—দুইখানি বলরামচূড়াগাছ আর থামগুলিতে দিশি বেলফুলের ঝাড়, ছাতেও বাগান। ইস্কুলে আসিয়া অবধি মোহনকান্তির দেখাদেখি আমিও ধুতি-উড়নী পরিতাম। মোহনকান্তি বিষয়ে এইখানে কিছু বলিয়া লইতে চাই। আগেই বলিয়াছি তাহার পিতার শিশ্নোদরপরায়ণ জীবনের প্রতি তাহার একরকম আগ্রহ ছিল, কিন্তু সেই আগ্রহ শিশুর কৌতূহল বৈ নয়। আমার নানি বলিতেন, মুসা নবী শিশুকালে অঙ্গারকে রক্তপ্রবাল ভাবিয়া খপ করিয়া মুখে পুরিয়া দিয়াছিলেন। মোহনকান্তির আগ্রহ সেইরূপ ছিল। জগতের সকল বিষয়ের দিকে নিজের উৎসুক চক্ষু তুলিয়া দেখিত, ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দেখিত আর চুপ করিয়া



ঈদ আসিয়া পড়িল

থাকিত। খোরাকি ও কাপড় ধোলাই-খরিদ বাবদ যে অর্থ তাহাকে পাঠানো হইত, তাহাতে হাসিয়া খেলিয়া আমাদের সকলের হইয়া যাইত, চাকরেরা চুরি করিয়াও শেষ করিতে পারিত না। সনাতনচাকর তাহার চাইতে ভালো করিয়া বলিয়া যাইতে পারিত, কোন জমি লাখেরাজ, জায়গীরের কোন জমি ফসলি জমি, কোন জমি ব্রহ্মোত্তর। জায়গীর-ইতিহাস-রাজনীতি কোনো কিছুই মোহনকান্তিকে আদৌ টানিত বলিয়া মনে হয় না। সে কেবল বিপুল আগ্রহভরে দেখিয়া যাইত আর ছাদের আলিসায় ভর দিয়া চুপ করিয়া ভাবিত। ছাতের কোণে কোণে ছত্রি—সে'বাড়ির ছাতে উঠিয়া আমরা বেড়াইতাম ও পড়া মুখস্থ করিতাম। দেখিতাম, দুপুরের বুড়িগঙ্গা কুলুধ্বনি করিতে করিতে অতিকায় রুপার অজগরের মতন জাফরাবাদের দিকে চলিয়া যাইতেছে। বড়রানীর পাঠানো আচার-আমসত্ত্ব আর মাষকলাইয়ের বড়ি জ্যৈষ্ঠ মাসে সেই ছাতে রৌদ্রদগ্ধ হইতে থাকিত—চাকর গিয়া বাঁদরের উৎপাত হইতে সেই সকল সুখাদ্য পাহারা দিত।

কালবৈশাখী ঝড় উঠিলে বাড়ির জানালার খড়খড়ি কাঁপিতে থাকিত, বৃষ্টির ছাট আসিয়া মেঝে ভিজিয়া যাইত। মেঝেয় ভাঙা জাহাজ হইতে সংগৃহীত গোল লণ্ঠন রাখিয়া সনাতন চাকর কাছে বসিয়া ঝিমাইত। ঠাটা পড়িবার শব্দে যেন কোশ কোশ দূর হইতে নানির কান্নায় বুজিয়া আসা আবছা গলা পাইতাম, 'আল্লা আল্লা বলো মমিন!' বুড়িগঙ্গার দিক হইতে ঠান্ডা বাতাস আসিয়া আমাদের শরীরে কদম ফুটিত। মনে হইত নদীপথে এই ভয়ানক ঝঞ্ঝাকালে জেলেডিঙিগুলিতে, বজরাগুলিতে কি মাল্লারা খিজিরপীরকে, দরিয়ার সবুজ পীরকে ডাকিতেছে? চাঁদবণিকের ডিঙা কি আজ রাত্রে নবলক্ষ বেসাতসমেত ডুবিয়া যাইতেছে? ঝড়ের বেগ কমিয়া আসিলে সরু পাছগলি দিয়া অদূরের বাগানবাড়ির সজল সুবাস আসিত। সকালবেলা দেউড়িতে বিস্তর আমের মুকুল ঝরিয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিতাম আর তাহাদের অসামান্য সুগন্ধে মনে মুশুরির স্মৃতি জ্বলজ্বল করিয়া উঠিত। সেই আমবাগিচার গাছগুলিতে মউল ঝরিয়া মটর ধরিল, সেই সবুজ মটর গুটি হইল। এমন চলিতে থাকিলে মানুষ হইবার সকল চেষ্টায় ক্ষান্ত দিয়া পুনরায় মুশুরি ফিরিয়া যাইতাম সন্দেহ নাই—যদি না আমিরুল্লার সাথে দেখা না হইত।

আমিরুল্লা আমাদের দুই ক্লাস উপরের ছাত্র ছিল, ফেল করিয়া আমাদের সাথে পড়িতে আসিয়াছে। অন্য ছাত্ররা তাহাকে ভাই বা দাদা ডাকিয়া ফেল লইয়া খেপাইত, সে বিশেষ খেপিত না। জগতের সকল প্রাণীকে একরকম দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া সে পরিষ্কার দেখিয়া লইয়াছিল, যাহা দেখিয়াছিল তাহাতে তাহার সমকক্ষ কেহ তাহার নজরে পড়ে নাই। অতএব মূর্খের প্ররোচনায় সে রাগ করিত না। প্রথমে আমিও তাহাকে অবজ্ঞার চোখেই দেখিতাম, যাহা শহরের দস্তুর তাহা পালন করিতে পল্লিবালকের সবিশেষ চেষ্টা থাকে বৈকি। পরে যখন তাহাকে আবিষ্কার করিলাম, আমার যেন নবজন্ম হইল। আমিরুল্লা জ্ঞানের সমুদ্র বই নয়, শিক্ষকের সাধ্য কি তাহাকে পুরা বুঝিতে পারে।

সত্যমিথ্যা মিশাইয়া বুঝিতে পাইলাম, সে মাতালচাঁদের কবিগানের দলের সহিত বাজনদারদের সহিত গাবগুবাগুব বাজাইয়া, যাত্রাদলের অধিকারীর তামাক সাজিয়া দিয়া ঘুরিয়াছে, নূপুর পরিয়া দোয়ার হইয়াছে, পাঁচালির দলে গাওনা করিয়াছে। সেই সুবাদে রাজ্যের দুলে-হাড়ী-বাগদী-ডোম-চাঁড়ালের সহিত মিশিয়াছে, রামায়ণ-মহাভারত পড়িয়াছে। বিদ্যাসাগরের ইস্কুলে মোসলমান ছেলেরা পড়িতে পায় না এই বিষয়ে তাহার জ্বালা আছে। সর্বোপরি বাংলার প্রথম গভর্নর জেনারেলকে লইয়া সে একখানি নাটক লিখিয়াছে। প্রথম গ্রীষ্মের ছুটিতে বসিয়া বসিয়া সে আমাকে সেই নাটক পড়িয়া শুনাইল। নাটকের ভণিতা লিখিয়াছেন সংস্কৃতজ্ঞ এক

পণ্ডিত—হেস্টিংসের আমলে জেলা আদালতগুলিতে ইসলামি আইনের ব্যাখ্যা দিবার জন্যে মুফতি-কাজি এবং হিন্দুশাস্ত্রীয় আইন ব্যাখ্যার জন্য এই সকল পণ্ডিত নিয়োগের প্রথা ছিল।

সমুদ্রপথে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া, জিব্রাল্টার ছুঁইয়া, মরিশাস হইয়া ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়া ওয়ারেন হেস্টিংস ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কেরানি হইয়া বাঙ্গালা মুল্লুকে আসিলেন। কালে কালে একদিন বাঙ্গালার প্রথম গভর্নর জেনারেল হইলেন। নবাবের বৃত্তি অর্ধেক করিয়া দিলেন, সম্রাট শাহ আলমের বাৎসরিক বৃত্তির ২৬ লক্ষ টাকা বন্ধ করিয়া দিলেন। এতেও হইল না ভাবিয়া হেস্টিংস নবাবের হাত হইতে দেশের সকল শাসনভার কাড়িয়া লইলেন। মহারাজ নন্দকুমারকে জাল করিবার মিথ্যা অভিযোগে কলিকাতার রাস্তায় ফাঁসি দেওয়াইলেন। নিয়তিদেবী হেস্টিংসের কীর্তিকলাপে বাঁকা হাসিলেন মাত্র (নিয়তির আবির্ভাবে আমি উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। এইবেলা কুমির আসিয়া হেস্টিংসকে টানিয়া লইবে হয়তো।) এই ওয়ারেন হেস্টিংসকে তাঁহার জাতের লোকের হাতেই হেনস্তা হইতে হয়। লর্ড উপাধি পাইতে গিয়াও তিনি পান নাই, মকদ্দমায় অবিলম্বে তাঁহার বিচার আরব্ধ হয়—তাঁহাকে সর্বস্বান্ত হইতে হয়। দুর্জন যে তাহার জীবতকালেই পাপের জন্য পীড়াভোগ করিয়া যায়—তাহাই হইল এই নাটকের শিক্ষা। আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে গদগদ হইয়া বলিলাম, 'ভাই আমিরুল্লা, তুমি এত জানিলে কোথায়?'

সে একরকম অনিচ্ছার সহিত তাহার সেজভাইয়ের ঋণ স্বীকার করিল, সেজভাই গাঁয়ের স্কুলের সেকেন্ড মাস্টার ছিলেন, আমিরুল্লা তাঁহার কাছ হইতে ভূগোল এবং ইতিহাস শিখিয়াছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তিনি তোমার এই রচনা পড়িয়াছেন?'

আমিরুল্লা গা মোচড়াইয়া একরকম ভঙ্গি করিয়া বলিল, 'আমি তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইলে তিনি বলিয়াছেন হেস্টিংস গভর্নর না হইলে সংস্কৃত কি আরবি-ফার্সি কিছুরই চর্চা থাকিত না, তাঁহার বন্ধু পলিয়েরের নাম করিয়া বলিলেন তিনি পুঁথিসাহিত্য রক্ষা করিয়াছেন...আসলে সেজভাই ব্রিটিশরাজের চাকর, হৃদয় বিকাইয়া দিয়াছেন। আমরা টিপুর নামে কাঁদিয়া ফেলি, সেজভাই তা দেখিয়া আমাকে মারিতে বাকি রাখিয়াছিলেন। টিপু সুলতানের ছেলেকে সাহেবেরা নাকি জেলখানাতেও তাহার খাস ধোপা-নাপিত বরাদ্দ করিয়াছিল, ইংরেজরা খারাপ কিসে?'

আমার বিমুগ্ধ হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া নিবার নিমিত্ত কান্ত মুদী কি করিয়া জীবন বিপন্ন করিয়া হেস্টিংসকে লুকাইয়া রাখিয়াছিল—আমিরুল্লা সেই গল্প শুরু করিয়া দিল। আমার জীবনের একটি অমূল্য অধ্যায় শুরু হইল।

১২ পর্ব

আমিরুল্লা একদিন আমাকে সঙ্গে করিয়া তাহার বাড়ি লইয়া গেল। ইমারতখানা বড় আজব, পর্দাপ্রথার সম্মানে সেইখানে দরজার ডান পাশের খিলানের আড়ালে দাঁড়াইয়া কাশিয়া নিজের উপস্থিতি জানান দিতে হয়—প্রকাণ্ড বারদুয়ারী উঠান, রোয়াকগুলি চওড়া, চকমিলান কোঠা, একধারে তাহাদের সহিস আমলিগোলার শিংয়ের কাঁকই দিয়া বাবড়ি চুল আঁচড়াইতেছে, তাহার সহকারী ঘোড়ার গা রগড়াইতেছে, শীতের প্রকোপে ঘোড়াগুলির কম্পিত গা দিয়া ধোঁয়া বাহির হইতেছে। একধারে পুরাতন ইঁদারা, ইঁদারার জলে ব্যাঙ, তাহার পাড় ঘিরিয়া কনকনে ঠান্ডা জল গায়ে ঢালিয়া লোকে আদুর হইয়া খোল মাখিয়া স্নান সারিতেছে অথবা অষ্টবজ্র মাজন দিয়া দাঁত মাজিতেছে।

অন্দর হইতে ঝলক ঝলক রন্ধনের সুবাস আসিয়া বাতাসে হানা দেয়, অন্দরে পাকশালের পাশে একগলা ঘোমটা দিয়া চাকরানিরা কেহ ঘোলমউনি লইয়া কেহ কুটনা কুটা লইয়া সার বাঁধিয়া বসিয়াছে, সর-ছানা বাটিবার শিলপাটা হলুদ-মরিচ বাটিবার পাটা হইতে পৃথক। নালা দিয়া রান্নাবাড়ির রঙিন জল কলকল করিয়া বহিয়া যাইতেছে। উঠানের একপাশে বড় বড় গামলায় সারাবৎসরের ছিনে-পড়া চালকুমড়া চুনের জলে গুলিয়া মোরব্বা তৈয়ার হইতেছে।

মহিলারা সে'বাড়িতে জাঁতি দিয়া সুতার মতন সরু করিয়া সুপারি কাটিতেন, ভিজা খয়েরে শখের ফলমূল তৈয়ার করিতেন, সারারাত্র নিভ্-জ্বাল দিয়া শালগম-আলু ইত্যাদি ঘিয়ে ডুবাইয়া তামার হান্ডিতে মোরগার শবদেগ রান্না করিতেন। তাঁহাদের বাঁধা শালকর ছিল, পছন্দের আতরওয়ালা, খোঁপা বাঁধিবার নোকরানি ছিল। সে'বাড়ির মেয়েদের গায়ের রং গরমকালের খোবানির মতন, তাহারা পাতা কাটিয়া সিঁথি করিত না, পান খাইয়া মুখ লাল করিত না এবং হীরামোতির কণ্ঠী পরিত, বাঁদীদের মতন স্বর্ণালংকার পরিত না। সন্ধ্যায় সব দিক আঁধার করিয়া আসিলে সেই সব কন্যারা ছাদে যাইয়া হাওয়া খাইত, আমাদের সহিত তাস বাটিয়া তাস খেলিত। তাহাদের ভাবগতিক দেখিয়া-শুনিয়া আমার মুশুরির সেই নদীতীরের হতভাগিনীর মড়াটিকে মনে পড়িত।

যাহা হউক, সেই বাড়িতে গোলাবাড়ির খড়ের পোয়ালের উপরে শুইয়া শিষ চিবাইতাম অথবা ছাতে গরমের বিকালবেলা তাহাদের খাস পাটিয়ালের বোনা শীতলপাটি পাতিয়া আকাশের দিকে মুখ করিয়া আমিরুল্লার সাথে শুইয়া অজস্র বকিতাম এবং বকুনি শুনিতাম—মথুরামোহনবাবুর চ্যবনপ্রাশ ছাত্রদের স্মৃতিশক্তির পক্ষে কত হিতকর, আমাদের ইস্কুলের পত্তন করিয়াছিলেন জমিদার নিকোলাস পোগোজ, আনন্দবাবুও আমাদের স্কুলের ছাত্র ছিলেন, আমাদের ইস্কুলে একদা মাইকেল মধুসূদন দত্তকে সংবর্ধনা দেওয়া হইয়াছিল, আমিরুল্লা সেই গল্প করিত। *বীরাঙ্গনাকাব্য* তাহার মুখস্থ ছিল, অনর্গল আবৃত্তি করিয়া যাইত সে। পাগলা সাবুর কথা শুনিয়া আমিরুল্লা বিজ্ঞের মতন বলিত—মুর্শিদাবাদের শেষ নবাব ফেরাদুন জার দুইটি বিলাতি পত্নী ছিল, সারাবিবি আর জুলিয়াবিবি, নবাবের একশতখানা সন্তানের ভিতরেই কেহ নিশ্চয়ই সাবুর প্রপিতামহ-টহ হইবে। সেই বর্ণশঙ্কররা মুর্শিদাবাদ হইতে মুশুরি কী করিয়া আসিল সেই বিষয়ে ভাবিয়া কিছু কূলকিনারা পাইতাম না। হামানদিস্তায় করিয়া ঘুড়ির মাঞ্জা দিবার কাচ গুঁড়া করিতাম, চীনাকাগজ দিয়া ঘুড়ি বানাইতাম। দূর হইতে ছাদ-পিটানীদের গান ভাসিয়া আসিত। ঊর্ধ্বাকাশ নীলবর্ণ। নফর আসিয়া কারুকাজ করা সরপোশে ঢাকিয়া এলাচিলেবুর শরবত দিয়া যাইত, তাহার সুগন্ধ কী! শরবতের সাথে কোনো কোনো দিন আসিত মোরব্বা, কোনো দিন আসিত চুটকি-সেমাই। মোসলমানকে আতিথেয়তায় কেহ হারাইতে পারিবে না।

চামচিকা বাহির হইয়া রাত করিয়া আসিলে ছাত হইতে নামিয়া আসিতাম, ধপধপে দস্তরখান পাতিয়া চিনামাটির পাত্রে রোগনি শিরমাল রুটি আর কোরমার মসলায় রাঁধা শবদেগ পরিবেশিত হইত, আদব করিয়া খাইতে হইত। হাঁচি দিতে হইলে দস্তরখান হইতে উঠিয়া গিয়া হাঁচিয়া আসা দস্তুর ছিল। আমিরুল্লার মাতা মাঝে মাঝে আমাদের সম্মুখে বাহির হইতেন, নাতিদীর্ঘ শরীর যারপরনাই আবৃত, হস্তপদপ্রান্তের যতটুকু দাসীদের আজ্ঞা দিবার সময় আবরণের বাহির হইত—তাহা হইতে যেন জ্যোতি বাহির হইত। শ্যামায়মান সন্ধ্যা—ঘরের বাতিগুলি অন্ধকার দূর করিবার জন্য নিতান্ত অপ্রতুল, অনুজ্জ্বল মোমের আলোকেও শুভ্র সমুজ্জ্বল তাঁহার

ত্বকের শ্রী, স্বল্পালোকে দাসীরা তাঁহার তত্ত্বাবধানে বড় বড় চিনামাটির ডিশে করিয়া খাবার আনিয়া রাখিত। খাইবার পরে আমরা আবার ছাদে আসিয়া শুইতাম, কাজল-নীল আকাশে জ্যোৎস্নাকুমুদের মতন চাঁদ ভাসিত, তারকামঞ্জরীর তলায় পাটি বিছাইয়া শুইয়া আমরা গল্প করিতাম, আমি সাতকড়ির গল্প করিতাম, আমিরুল্লা বলিত, 'আফিমের নেশা বড় নেশা, আফিম গিলিয়া কমলাকান্তর মনে হইত সকল মনুষ্য সংসারবৃক্ষে ফলের মতন ঝুলিয়া আছে।' সেই দৃশ্য ভাবিতাম, আমরা সকলে জরৎকারু মুনির জ্ঞাতিদের মতন বৃক্ষ হইতে ঝুলিতেছি—আর হো হো করিয়া হাসিতাম, আহা সে বড় অকারণসঞ্জাত সুখের সময়।

কেল্লার দিকে বেড়াইতে যাইতাম, কাছেই আতিশখানা, কি না আমিরুল্লা শিখাইত—আতিশ মানে অগ্নি। গাওনা করিতে গিয়া আমিরুল্লা যাত্রাদলের সহিত দেশে দেশে ঘুরিয়া ম্যালেরিয়া বাঁধাইয়াছিল, প্রায়ই তাহার জ্বর হইত। স্বাস্থ্য শীর্ণকায়, বড় বড় চোখগুলি খরার আকাশের তারার মতন জ্বলিত, আমিরুল্লা হাত-পা নাড়িয়া ক্রমাগত গল্প শুনাইত। আমিরুল্লা তেজগাঁওয়ের পর্তুগিজ গির্জা দেখিবার গল্প করিত, সেই তেজগাঁও কোথায়, আনারসের খেত আর মণিপুরিদের ইক্ষুখেতে সবুজ তেজগাঁও, গোবাঘার ডাক ভাসিয়া আসা তেজগাঁও।

আশ্বিন মাস আসিয়া গিয়াছিল। রৌদ্রের রং উজ্জ্বল এবং তেজ তীব্র হইয়াছে, বেলা পড়িয়া আসিলে আকাশের আলো দ্রুত মরিয়া আসে। নদীর ধারের কাশফুলগুলি শুভ্র হইতে রজত-রজত হইতে নস্যরং হইয়াছে, নৌকায় করিয়া আমরা বেড়াইতে যাইতাম। পথে চিড়া-গুড় আর ফতুল্লাবাজারের কলাপাতামুড়া পাতক্ষীর দিয়া পেটপূজা করিতাম। মাঝিরা সিপাহিদের অভিশাপে হাতিশুঁড়ো ঝড়ে নবাববাড়ি অগ্নিকুণ্ডের মতন জ্বলিবার গল্প করিত, নদীপথে নবাববাড়িতে ঝড় আসিয়া কী করিয়া নামিয়া সদর-অন্দর তছনছ করিয়া দিয়াছিল তাহা কল্পনা করিতাম। মুসলমান মাঝির হাতে পুঁটিমাছের ঝোলভাত খাইতাম, তাহাদের মুখে বটতলার পুঁথি শুনিতাম। কোথাও চর পড়িয়াছে, সেই চরের তীর হোগলা-খড়ি-শরে পূর্ণ, অপরাহ্নের নদীবক্ষে বৈরাগ্যের রং ফুটিতে দেখিতাম। অদূরে বুড়িগঙ্গার ঘাটে গামছাবৃতা স্তনদুল্যমানা বেশ্যার দল স্নানে নামিত আর সমবেত দর্শকদিগের উদ্দেশে খিস্তি করিত। আমিরুল্লা তৎকালে তামসিক জীবনের স্বাদ পাইয়াছে, সে কৌতুকমিশ্রিত কৌতূহল লইয়া চাহিয়া থাকিত।

পূজা উপলক্ষে মোহনকান্তি মুগুরি ফিরিয়া গিয়াছিল, আমি আমিরুল্লার বাড়ির আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। সনাতন প্রায়শই দেশে যাইত, সেই হাতে করিয়া মায়ের জন্য আমার খরিদ করিয়া দেওয়া পান আর তামাক লইয়া যাইত, আসিবার সময় মায়ের চিঠি এবং সরাগুড়-মুড়কি ইত্যাদি নিয়া আসিত। যথাকালে পূজার উপহার নীল বর্ণের কালাপাড় কোরা ধুতি, সাদা জমিতে বেগুনি ছিটে দেওয়া সুতির জামা আর চকচকে ঝিনুকের বোতাম বসানো বার্নিশের জুতা পরিয়া মোহনকান্তি ফিরিয়া আসিল। আমি পুনরপি আমার পিঞ্জিরায় নিক্ষিপ্ত হইলাম। কিছুকাল আমিরুল্লার সহিত থাকিয়া আমার চিত্তে যাযাবরের বাঁশি বাজিয়াছে, সেই যাযাবরের নিত্যদিনের ইস্কুল ও মোহনকান্তির বলয় আর ভালো লাগিতেছিল না।

১৩ পর্ব

ঢাকার বাড়ির ঠাকুর ভালো রাঁধিত, কচুশাকে ইলিশের মাথা, কলমিশাকে ফলুইমাছ। এমনকি কাঁঠালের ভুতিও সে ফেলিত না, কুচাইয়া লইয়া কী কী সব রাঁধিয়া ফেলিত। মোহনকান্তির রান্না আলাদা হইত, রুপার থালায় সাদা লুচি-তরকারি-নির্জলা ক্ষীর সাজাইয়া তাহাকে পরিবেশন করা হইত। আমি খাইতাম দাসদাসীদের সহিত এবং আমার কোনো থালা ছিল না। আমাকে অদূরে পরিচ্ছন্ন লাল মেঝেয় পরিষ্কার কলাপাতায় ভাত-তরকারি দেওয়া হইত, কোনো দিন মাছের ক্বাথ সংক্রমিত হওয়া ঝোল জুটিত, কোনো দিন ছ্যাঁচড়ার কাঁটা, কোনো দিন শুধু ডাল-ভাতের চূড়া হইতে গড়াইয়া পড়িত। আমার গেলাস আলাদা, খাইবার সময় সেটি ডান হাতে ধরিতে হইত এবং নিজেই মাজিয়া রাখিতে হইত। মোসলমানের এঁটো কে সাফ করিতে যাইবে? পাতাখান খাইবার পর আমি ফেলিয়া আসিতাম আর আমার সাবুর কথা মনে পড়িত। যাহা কিছু জন্মদাগের মতন মানিয়া লইয়াছিলাম, আমিরুল্লার হৃদয়ের চকমকিতে আগুন পড়িয়া তাহার সকলি অন্য রঙে দেখিতে শুরু করিয়াছিলাম। একই দস্তরখানে বসিয়া চিনামাটির কোর্মাদানিতে কোর্মা খাইয়া মুগুরির মাটো বালকের মাথা ঘুরাইয়া গিয়াছে এইসব ভাবিয়া মনকে বিফল তর্জন করিতাম। ভাবিয়া দেখিলে, পোগোজ স্কুলেও হিন্দু ছাত্রদের জলপান করিবার মার্জিত কাঁসার গেলাস ছিল ঘরের ভিতরে, মোসলমানের পানি পান করিবার পাত্রখানা উঠানে গড়াগড়ি খাইত। শিক্ষকদের কেহ কেহ সাম্প্রদায়িক ব্যবহার করিতেন, আমার এই সামান্য জীবনে আমি দেখিয়াছি বিষবাষ্প যত সহজে বাতাসে ভর করে, সুবাস তাহা পারে না।

মোহনকান্তির মায়ের উদগ্র মাতৃস্নেহ ঔষধি বড়ির আকারে, আমসত্ত্বের আকারে রৌদ্রে পুড়িত, সে দৃকপাত করিত না। মাঝে মাঝে উদাস কুমার কেবল ছোটরানীকে মনে করিত। সে বলিত—তাহাদের বয়সের তফাত বিশেষ ছিল না। বাপের অনুকরণে মোহনকান্তি তাহাকে 'সরো' ডাকিত। সোনালি কালি দিয়া মার্জিন টানিয়া তাহাতে ছোট ছোট পাখি আঁকিয়া ভিতরে গোটা গোটা হরফে মোহনকান্তি তাহাকে চিঠি লিখিত। ছোটরানী খুব ভালো ঘুড়ি উড়াইতে পারিত। তাহার গলায় কুঁচফলের মালা, বিবিয়ানা খোঁপা, তাহার রূপটান, তাহার দোলপূর্ণিমার রাতের সাজ এইসব স্বল্পভাষী মোহনকান্তি যখন বর্ণনা করিত, তাহাতে ভক্তির চাইতে মোহ বেশি প্রকাশ পাইত। আমি উসখুস করিতাম, কিছু বলিতাম না। আমিরুল্লা আমাকে মীরসাহেবের 'বসন্তকুমারী' পড়িয়া শুনাইয়াছিল—সপত্নীপুত্র এবং তরুণী ভার্য্যার আশনাইয়ের উপাখ্যান।

বুড়িগঙ্গাতীরের এই বাড়িতে থাকিবার বছরগুলিতে আমার অকপট পাঠানুরাগ জন্মিল। দাসদাসী চাকরবাকরে রমরমা এই বাড়িখানায় লেখাপড়ার উপযুক্ত পরিবেশ ছিল না। তথাপি আমিরুল্লাহর সান্নিধ্যে আসিয়া আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অধ্যায়ের পটোত্তোলন ঘটিল। নূতন আলোকে আপনার জীবনকে দেখিলাম, তাহার বিকাশের পথ আপদসংকুল হইলেও অসম্ভব বলিয়া আর বোধ হইল না। বিদ্যালাভ করিবার আশায় দিবাভাগের বেলাগুলি উৎসর্গ করিলাম তো বটেই রাত্রির প্রহরগুলি উৎকণ্ঠ জাগৃতিতে কাটিতে লাগিল। পড়া শেষ হইলেও বই হাতে করিয়া বসিয়া থাকিতাম, যাহা মনে আসে লিখিয়া রাখিতাম—এইভাবে আমি আপনার মনের গায়েবি আওয়াজগুলির কলমচি হইলাম। অধ্যয়নের অবসরে ছাদের আলিসায় ভর দিয়া দিনমান নদী দেখিতাম—বুড়িগঙ্গার অপর পারে খেসারির সবুজ খেত রৌদ্রে ঝলমল করিতেছে, এপারে কাঠের পইঠায় চাষারা শণ পিটাইতেছে, ধোপা ঠাঁই-ঠাঁই করিয়া কাপড় পিটাইতেছে। চাকরদের শুকনা কাঠ সরু চেলা করিবার শব্দ থামিয়া গেলে দাসীর বাটনা বাটিবার শব্দ আর কবুতরের স্বগতোক্তি ছাড়া আর কোনো শব্দ নাই। সকালে মাঠা-মাখনঅলা ডাকিয়া গিয়াছে, মিশিঅলা ডাকিয়া গিয়াছে, নতুন পনির-ক্ষীরসাঅলা ফেরি করিতে বাহির হইয়াছে, ধুনকার পাশের বাড়ির নিচতলায় তুলা ধুনিতেছে। কার্তিকের মরা বেলা, ও'বাড়ির দাসী ছাদের রৌদ্রে সুপারি শুকাইতে

দিতে আসিয়াছে, কাহার মড়া খুলির মতন সুপারিগুলি রৌদ্রে মুখ করিয়া শুষ্ক হইতেছে। আমাদের ছাদে বেড়া তুলিয়া মিঠাকুমড়ার লতা চড়াইয়াছে কে যেন। নদীর উপর দিয়া কুমোরের কলসি-হাঁড়ি বোঝাই নৌকা যাইতেছে। সেই নৌকা হইতে কেহ চড়া গলায় গান ধরিয়াছে, কলি বুঝা যায় না, কেবল বাতাসে ভর করিয়া একটি হাহাকারময় সুর ভাসিয়া আসে।

আব্বার মুখে শোনা কপালকুণ্ডলার গল্পে তাহার সর্বশরীর দীর্ঘকেশ দিয়া আবৃত ছিল, মূঢ় বালকচিত্ত ঠাহর করিয়া দেখে নাই তাহার শরীরে কাপড় ছিল কি না। আমিরুল্লা কুলকুল করিয়া হাসিয়া বলিয়াছিল, সেই বনবালার পরিধেয় বলিতে কিছু ছিল না, পরিধান করিতে হইবে এই শরম ইস্তক ছিল না। সম্ভবত আমিরুল্লাই আমার দৃষ্টি জগতের নারীকুলের দিকে ঘুরাইয়া দিয়াছিল—দুই-চারিবার ফেল করা স্কুলের ছাত্র, ডেঁপো বলিয়া উহাদের দুর্নাম থাকে সাধারণত। পুষ্পশোভা দেখিবার খুশিতে উল্লসিত বালকমন—তাহাকে আমিরুল্লা শিখাইয়াছিল, হেন পুষ্প আছে যাহা দিয়া চর্ব্যচোষ্য রাঁধা যায়—ক্ষুন্নিবৃত্তি করা যায় (যেমন বকফুল-যেমন কুমড়াফুল), উদর অবধি না পৌঁছিলে আর কি গ্রহণ করিলাম! তাহার উপর একটি জ্ঞাতি-বোনের সহিত আমিরুল্লার বিবাহপ্রস্তাব উঠিয়াছিল, সে সবিশেষ বিস্তারপূর্বক তাহার গল্প করিত। মার্জিত তৈজসের মতন ভাস্বর তাহার কাজলটানা চোখ, পিতলের সুরাঈয়ের মতন দীর্ঘ গ্রীবা, মাথা জড়াইয়া সলমার কাজ করা চুন্নি। দাসীবাঁদীদের কল্যাণে লায়েক হইবার পূর্বেই তাহার জ্ঞানবৃক্ষের ফল আস্বাদ করা হইয়াছে, কেহ তাহাতে কিছু মনে করে নাই, মোসলমানের ঘরে দাসীদের সহিত সংগমের রেওয়াজ ছিল। আমিরুল্লা এবং আমি পাশাপাশি শয্যা লইয়া নিরানন্দ অন্ধকারে কাহার শরীরযন্ত্র স্পর্শ করিবার কল্পনায় অমৃতাপ্লুত হইয়া উঠিতাম, পরপার-ভাঙানিয়া পদ্মার মতন রে রে করিয়া আমাদের দেহের ভিতরে কি স্রোত ছুটিয়া আসিত, নাছোড় নাবিকের মতন নিজ দেহের হাল ধরিতাম। সেই শিহরণ প্রাণপণে চাপা দিবার জন্য ধর্মের শাসন অনুভব করিতে চেষ্টা করিতাম, তাহাতেও অপারগ হইয়া আমিরুল্লা শ্বাস ফেলিয়া পাশ বদলাইয়া শুইত। রাত্রিকালে এইরূপ চিত্তবিক্ষেপ জন্মিত বলিয়া প্রভাত হইতে না হইতে আমরা দুইজন মিলিয়া কিছু উদ্যমের চর্চা করিতাম। তাহাতে কী লাভ হইত বলিতে পারিব না, দিবসের সকল সাত্ত্বিক প্রচেষ্টাকে ভাসাইয়া দিয়া রাত্রে পুনরপি বীর্যক্ষয় করিতাম।

১৪ পর্ব

ঢাকায় মানুষে মানুষে বড় দ্রুত কাজিয়া লাগিয়া যাইত। ধোপার সহিত সনাতন চাকরের নিয়মিত লাগিয়া যাইত। প্রায়ই দেখিতাম শ্রীনিবাস আর ভূষণ ময়রা প্রায়-কুস্তি করিতেছে। বিবাহবাটীতে হিজড়ার দল আসিয়া 'আমি কারে দেখিয়া দিব ঘোমটা লো, নাতিনজামাই আমার ল্যাংটা, যেন হস্তীর গলে বাঁধা ঘণ্টা লো' এইসব গাহিতেছে আর তুচ্ছ বিষয় নিয়া হাতাহাতি শুরু হইয়াছে। এক গলির লোক মিছিল করিয়া গিয়া আরেক গলির লোকের সহিত মারপিট করিতেছে। হিন্দু-মোছলমানে যত না জশনের সম্প্রীতি ছিল, দাঙ্গা-ফ্যাসাদ ছিল ঢের বেশি। অপরের কথা কী বলিব, আমিরুল্লার সহিতই কথায় কথায় আমার বিবাদ লাগিয়া যাইত। আমিরুল্লার চরিত্রে এক অদ্ভুত সংনম্যতা ছিল, তাহাকে আজিকার সন্ধ্যায় যে বিষয়ে বিবদমান হইয়া হারাইতাম, পরদিন সকালে সে আবার সেই একই বিষয়ে তাহার প্রত্যয় ব্যক্ত করিত। হারিলেও যে হার না মানে, আবার যাহার সমর্থন এবং মতামত প্রায়শই বদলাইয়া যায়, তাহার সহিত সুসম্পর্ক রাখা মুশকিল। তাহার দলে ভিড়িয়া থাকাও অসম্ভব।

আমিরুল্লার সেজভাই নসরুল্লা ভাইয়ের মুখে আমি প্রথম কিছু শব্দ শিখি, যেমন 'লহমুল খিঞ্জির' অর্থাৎ নিষিদ্ধ মাংস, যেমন 'দারুল হরব' অর্থাৎ বিধর্মীর দেশ। তাহার মুখেই আমি দুঃসাহসিক ঘোষণা শুনিয়াছি যে ব্রিটিশ ভারত দারুল ইসলাম। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মোছলমান শাসককে পরাস্ত করিয়াছে তো কী, মোছলমানের কানুন তো রাখিয়াছে, সেই কানুন প্রয়োগ করিতে কাজী রাখিয়াছে, মুনশি রাখিয়া ফারসি পড়িয়াছে। যাহাদের সহিত কোমরপানিতে ডুবিয়া লাই-খেলা খেলিয়াছি, পাগল হইয়া যাওয়া বিপ্লবীর জন্য শ্মশানবাড়ির সেই খড়ের কুটীর গড়িয়াছি, কাঁচা ঢ্যাপ খাইয়াছি...সেই রাখালরা 'কাফের', তাহারা মোছলমানের সহিত বৈষম্য চিরকাল জিয়াইয়া রাখিবে। তাহার আমার মাঝখান দিয়া হজরত ছালমান ফর্সীর খননকৃত পরিখা। ইংরেজশাসকরা সিরাজুদ্দৌলা কি টিপু সুলতানকে পরাস্ত করিয়া মারিয়াছে তাহা ভুলিতে হইবে। ইংরেজ বরং মোছলমানের প্রতি সদয়। আব্বার শিখাইয়া যাওয়া সামান্য ইতিহাসজ্ঞান এবং ছোটকাকার মুখে শোনা রাজনীতির কথা আজিও আমার কানে বাজিত। অতএব নসরুল্লা ভাই বা আমিরুল্লা কাহারও কথায় আমার সম্মতি যোগাইত না।

ইংরেজ আসিবার পরেও কাজীর কানুন ছিল, তাহাতে কিছুই প্রমাণিত হয় না, মুর্শিদাবাদের নবাবগণ পুতুল-নবাব হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহা ভোলা যাইবে না। রাজাকে এমন ধীরলয়ে স্নায়ুতন্ত্রে সুচ বিঁধাইয়া সংজ্ঞাহীন করিয়া প্রজায় পরিণত করিয়াছে যে জাতি, সে জাতি তো কপট, তাহার আশ্বাসে ভরসা কী? আজ মোছলমান সমাজে আপনার উদ্দেশ্য হাসিল করিবার জন্য অসন্তোষের গুটি পাকিতে দিতেছে, কাল যখন প্রয়োজন হইবে তখন এই পুঞ্জীভূত অসন্তোষ তাহারাই কঠোর হস্তে দমন করিবে। নসরুল্লা ভাই গর্জিয়া উঠিয়া বলিতেন, 'যৎসামান্য দ্বীনী এলেম লহিয়া গণ্ডগ্রামে পড়িয়া থাকাই তোমার ভাগ্যে ছিল। কপালগুণে আজ ইস্কুলে পড়িতেছ তথাপি কুলীন হিন্দু যুবক হইতে একশত বছর পিছাইয়া আছো, সমানে সমান বলিলে তুমি চাকুরি করিবে কি প্রকারে? সরকারি দফতরে-কেরানিগিরিতে-আদালতের কর্মচারী-স্কুলের শিক্ষক...সর্বত্র শিক্ষিত হিন্দু যুবকের চাকুরি হইতেছে। রাজানুগ্রহ আমাদের মোছলমান সমাজের বিকাশে অবশ্যই লাগিবে।' আমিরুল্লাও উপেক্ষার হাসি দিয়া বলিত, 'যে জাত আমাদিগের পার্শ্বে এত বছর থাকিয়াও আমাদের সহিত জলচলে রাজি হয় নাই, মোছলমানের ছোঁয়াতে যাহাদের এত ঘৃণা তাহার সহিত কিসের মিলমিশ?' আমার মনে হইত, শুধু কি ঢোলগোবিন্দর কর্তামা আমাদের উঠানে দেখিলে ভাত ফেলিয়া দিতেন? মোছলমানের ভিতরে যাহারা আশরাফ, তাহাদের বাড়ি জেয়াফত খাইতে গেলে কি মিলমিশ হয়? এই যাহারা পীরপয়গম্বর অথবা আমির-বাদশাহদের দূরবর্তী বংশধর, যাহাদের সাবেকী বালাখানার ছাদ জীর্ণ, যাহাদের দীঘি সংস্কারের অভাবে হাজামজা আর বাগিচাগুলি জঙ্গল আর সুরকির স্তূপ। কি হিন্দু কি মোছলমান, চাষার পোয়ের তো কোথাও সম্মানজনক স্থান নাই। মোছলমান তহশিলদারও খাজনা উসুল করিতে তাহাকে শোষণ করিয়াছে, শোষণ করিয়াছে হিন্দু গোমস্তাও। এইসব ভাবিতাম আর বিজেতার জাত হিসাবে মোছলমানের কি প্রাপ্য ছিল আর কি কি প্রাপ্য হইবে এইসকল নিয়া আমিরুল্লা নসরুল্লা এই দুই ভাইয়ের তর্ক শুনিতাম। যাহা শিক্ষায়-উদ্যমে-পরিশ্রমে মিলিবার কথা, তাহা মিলিল না বলিয়া আজ রাজানুগ্রহ চাহিয়া আর্জি পেশ করিবার প্রয়োজন পড়িয়াছে। মনে ভাসিত তুচ্ছ মছলা-মাছায়েল লইয়া অকথ্য বাহাছ করিতে থাকা পরমুখাপেক্ষী মৌলভীদের কথা। যুগের দাবি মানিয়া না লইয়া বিজেতার গর্বে ফোঁসফোঁস আর বুতপূজারি অধঃস্তনদের



স্ত্রীকুল যে সতী হইবার নিমিত্ত

উত্থানে হিসহিস ছাড়া আমি ইহাতে কিছু পাইলাম না। জন্মিয়া অবধি কেহ যদি ভাবে সে শৌর্যে-বীর্যে-মহত্ত্বে এবং বুদ্ধিমত্তায় ধর্মসূত্রে সেরা, তাহার সহিত তর্ক করাটা বেফুজুল। আমিরুল্লা আজ মোছলমানের চাকুরি শুধু নহে, মোছলমানের সাহিত্য, জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চা ইত্যাদি সকলি চাহিতেছে অথচ দাঁতের মাজন হইতে কেশতৈল সকলি হিন্দুর। এই কথা স্মরণ করাইয়া দিতেই আমিরুল্লা অম্লানবদনে উত্তর করিল, ইহা হিন্দুলোকের ফন্দি, আলকেমি হইতে শুরু করিয়া ইউনানী চিকিৎসার সম্ভাবনা ইত্যাদি বহুকিছু তো মোছলমানের ইত্যাদি। আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম, মোছলমানের সমস্যা হইতেছে সে মৌলভীকে দিয়া মৌলুদ শরীফও পড়াইতে চাহে আবার একই মৌলভীর নিকট সাহিত্যও প্রত্যাশা করে। সাহিত্যরচনা করিতে হইলে সিহাহ সিত্তাহ পড়িয়া আসিতে হইবে? নসরুল্লা ভাই ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, 'আপন ঘরে সম্মানের কিছু দ্যাখো না? আদরণীয় কিছু দ্যাখো না?' তিনি যেইভাবে আমাকে দেখাইতে চাহেন, আমি খাকছার সেইভাবে দেখিতে পাই না, সেই কথাটি স্বীকার করিয়া সেই সন্ধ্যার মতন বিদায় হইলাম।

বাড়ি ফিরিতে ফিরিতে মনে পড়িত, আমিরুল্লা সন্ধ্যায় জায়গীর মাস্টারের কাছে পড়িতে বসিবে। মোহনকান্তির গৃহশিক্ষক আসিবেন, রূপবাবু-রঘুবাবুদের ছেলেদের মতনই তাহাকে ক্লাসে মুখ দেখাইতে যাইতে হয়, পরীক্ষা দিয়া পাস করিতে হয় না। আর আমি আজ সমস্ত রজনী জাগিয়া দুলিয়া দুলিয়া পড়া মুখস্থ করিব, যাহা বুঝিব তাহা আপনা হইতে হৃদয়ে মুদ্রিত হইবে, যাহা বুঝিব না তাহা মুখস্থ করিয়া পার হইব। সামনে পরীক্ষা, দেখিতে হইবে শিক্ষিত উদ্যমী হিন্দুসন্তানের সহিত পাল্লা দিয়া মুহম্মদীয় নামের কেহ পাস করিতে পারে কি না। উত্তর মুশুরির হিন্দুরা যাহারা আমাদের জেলে, তাঁতি, মাঝি, চাষা এইসব পরিচয়েই চিনে, তাহারা আমাদের নূতন করিয়া চিনিবে, মান্য করিবে এবং রাজানুগ্রহপ্রাপ্ত বলিয়া বিশেষ গ্রাহ্য করিবে এমন একটি চিত্র ভাবিতে চেষ্টা করিলাম। ভাবনাই সার হইল।

১৫ পর্ব

এইখানে বলিয়া রাখি, ঢাকা অধ্যায় সমাপ্ত হইবার আগে একটি ঘটনা আমার সামনে ঘটে—তাহা অদ্যাবধি আমি ভুলি নাই। জমিদার বাবু করুণাসিন্ধু রায় তাঁহার 'কলিজার রক্ত-মাথার মজ্জা-ফেপসার বাতাস' খাসরক্ষিতা মুন্নিজানকে সাথে করিয়া 'মগর-মুখো' বজরাযোগে বুড়িগঙ্গাতীরের সেই বাড়িতে আসিয়া উঠিলেন। মুন্নিজান আসিবার পর হল কামরার আসবাব বদলানো হইল, হল কামরার দরজাগুলিতে বসন্তের বৃষ্টির মতন ফিনফিনে পর্দা টাঙানো হইল। সন্ধ্যাবেলা সেখানে বীভৎস উজ্জ্বলতায় ভাস্বর মহফেল বসিতে লাগিল। মহফেলের ঢোলকের শব্দ, বাজনার ধ্বনি, নারীকণ্ঠের গান, মোসাহেবদের আত্মহারা মাতলামির শব্দ অন্দরে আমাদের পড়ার ঘর অব্দি পৌঁছিতে লাগিল। বাড়ির সুমুখে মেরজাই পরা হিন্দুস্তানি দারওয়ান খাটো বাঁশের পোক্ত লাঠি হাতে বহাল হইল। বজরার সহিত যথারীতি লাল পাগড়িপরা মুলুকচাঁদ আসিয়াছিল, সে দিনমান বল্লম দিয়া ভোঁদড় মারিয়া এবং রাত্রে ভাঙ খাইয়া পড়িয়া রহিল। রাজাবাবু আসিবার কারণে

বাজারের ফর্দ চওড়া হইল—রুইকাতলা মাছের বরাদ্দ ইতিপূর্বে ছিল এক সের, মাহিফরাস আসিয়া তাহার দ্বিগুণ দিয়া গেল, ঢালাও দুগ্ধ-ঘৃত-মাখন, জমিদারবাবুর খাইবার জন্য যে চাল আসিত তাহার ভাত বাড়িলে মল্লিকাফুলের মতন সুবাস বাহির হইত। বলির মাংস মোছলমানের খাইতে নাই বলিয়া খাইতাম না, পাচক ঠাকুরের হাতের গুণে সারা পাড়া মাংস রাঁধিবার গন্ধে ম-ম করিত। আগে অবেলায় ফকির আসিয়া গান গাহিয়া ভিখ মাঙিয়া যাইত, চাকরদের সহিত দাসীরা দালানের আড়ালে গিয়া দা-কাটা তামাক খাইত, এখন সেই ফুরসত কই? সমস্ত বাড়ি যেন কর্মযজ্ঞের ঢেউয়ে চড়িয়া নাচিতেছে।

এতকাল আমরা মুন্নিজানের রূপের গল্পই শুধু শুনিয়াছি, শুনিয়াছি সে পুঁথির জয়নাবের মতন রূপবতী, সেই রূপ সাথে করিয়া প্রলয় লইয়া আসে। এইবার সবিস্ময়ে তাহার মাকালফলের মতন দিব্যপ্রভ গায়ের রং দেখিলাম, শিশমহলের কাচের মতন রঙিন তাহার চোখ, কুঙ্কুম রঙের ঠোঁট, মাথার চুল কটা এবং মোগল বাদশার বেগমদের মতন লতানো জুলফি, বিশাল কবরী ঘাড়ের সন্নিকটে এলাইয়া থাকিত, তাহাতে নানা পদের অলংকারসামগ্রী। সুবর্ণসূত্রের ফুল-পাতাকাটা জ্যাকেট, মিহি রেশমী বুটিদার চাদরে স্তনশোভা আবৃত, কাঁধের কাছে রজত প্রজাপতির কাঁটা দিয়া চাদরখানা সংযত করা। হাত নাড়িয়া কথা কহিবার সময় তাহার হাতের রতনচূড় হইতে মণিমাণিক্য ঝিকমিক করিত। কিন্তু তাহার রকমসকম ঠিক বেশ্যাগারের বেশ্যাদের মতন ঠেকিত না। একখানা অটোমান কৌচে আয়েশ করিয়া বসিয়া সে আদরের হাতখানি নিজের উদরে ফেলিয়া রাখিয়া সহাস্যে চাকর-নোকরের ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করিত, বেতন বাড়াইবার জন্যে বজরার দাঁড়ি-মাঝিরা তাহার কাছে তদবির করিত। রাজা তাহার ঊরুতে মাথা রাখিয়া দিবানিদ্রা দিতেন, উঠিবার পর শরবত আনা হইতে হাত-পা মালিশ ইত্যাদি সবই মুন্নিজান দেখভাল করিত। রাজার বজরায় সে তাস বাটিয়া গোলামচোর খেলিত, গ্রামোফোন বাজাইয়া গান শুনিত। মুন্নিজান ইশারায় একদিন আমাকে ডাকিয়া নিয়া গিয়া আমার রচিত পদ্য শুনিয়া বাহবা দিয়াছিল।

মাত্র এক মাস মুন্নিজানসহ জমিদারবাবু বুড়িগঙ্গাতীরের সেই বাড়িতে রহিলেন। একদিন ভোরে উঠিয়া ছাদে আসিয়াছি, তখন উষাসমাগম হইবার সময়, একঝলক দীর্ঘশ্বাসের মতন বাতাস বুড়িগঙ্গার উপর হইতে উঠিয়া আসিয়াছে। নিচতলায় কোলাহল শুনিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিলাম, শুনিতে পাইলাম ভোররাতে নদীতে জোয়ার আসিলে বজরাযোগে জমিদারবাবু মুশুরি ফিরিয়া গিয়াছেন। মুন্নিজানের কথা কেহ বলিতে পারিল না, কেবল বাড়ির দাসী উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিয়া বলিতে গিয়াছিল, তাহাকে পেটের বাচ্চাসমেত দুই মাল্লার নৌকায় করিয়া নিয়া মাঝগাঙে ডুবাইয়া মারা হইয়াছে—সনাতন চাকর তাহার টুঁটি টিপিয়া ধরিয়াছে। দাসদাসীতে বড় গোল বাধিয়াছে। মুলুকচাঁদকে কেহ খুঁজিয়া পাইতেছে না। মোহনকান্তি এইসব গোলযোগের ভিতরে ছাদের আলিসায় বসিয়া রহিল। কেহ তাহাকে ডাকিবার সাহস করিল না। আমি বাড়ির ভিতরের অপরিমার্জিতবাগবুদ্ধি দাসদাসীর শোক ও শঙ্কার পরিবেশ সহিতে না পারিয়া একসময় মুশুরি পালাইয়া আসিলাম।

ভাদরখ্যাপার গলাজলে নামিয়া নারীকুল দলঘাস কাটিত, ধানের তুষ ঝাড়িত, ক্ষেতে মুনিষদের খাইবার যোগাড় দিত, বাড়ির লোকের রাতকানা রোগ সারাইতে পাথরে ঠুকিয়া জীয়ন্ত গুগলি ছেঁচিয়া ঝোল রাঁধিত, একখানামাত্র কাপড়ে স্বীয়শরীর আবৃত করিয়া শৈবালাচ্ছন্ন তালাবে ডুব দিয়া লুকাইয়া বাড়ি চলিয়া আসিত—জন্মাবধি এই আউরতজাতকে ঋতুপরিক্রমার মতন বিশেষত্বহীন জানিয়াছি। গাঁয়ের দরিদ্র মোছলমানের ঘরে পর্দাপ্রথার প্রকোপ ছিল না। আমাদের অন্দরে দেখিয়াছি এক স্ত্রীলোক পুঁথি পড়িতেছে, আর অপরাপর স্ত্রীলোক সুপারি কাটিতে কাটিতে অবহিতচিত্তে তাহা শুনিতেছে, তাহাদের গায়ে জামা-সেমিজ নাই, কেহ 'বকুল-পারুল' গায়ে মাখার সাবান ঘষে কি না সন্দেহ, গরমের ভিতরেও দিশি ধুতির খাটো ঘোমটা হাতে টানিয়া লইতেছে, একাদিক্রমে ছেলেদের মাই দিতে দিতে তাহাদের স্তন অন্তরীপের আকার লাভ করিয়াছে—ইহার ভিতরে বিস্ময়ের কী আছে, পুলকের কী আছে কে বলিবে। কিন্তু কালে কালে ইহাদের সংযোগেই জগতে বড় বড় যুদ্ধ ঘটিয়াছে, রাজ অন্তঃপুরের ষড়যন্ত্রে ইহাদের যোগই নির্ধারণ করিয়াছে কালকূট-বুদ্ধিতে কে জিতিবে।

আগেই বলিয়াছি, নারীপুরুষের সম্পর্ক যে বিবাহবন্ধনের বাহিরেও থাকিতে পারে, শিশুজন্মের সহিত কলঙ্ক থাকিতে পারে, তাহার দীক্ষা মুশুরিতে থাকিতেই আমি লাভ করিয়াছি, ইহাতে সাতকড়িরও ইন্ধন ছিল। সাতকড়ি জমিদারের এস্টেটে মাসোহারাভুক্ত কর্মচারীদের সহিত অন্তঃপুরিকাদের অপবিত্রযোগের বিস্তর গল্প জানিত, গল্প করিবার সময় সে রাখঢাক করিত না। চোখ নাচাইয়া বলিত, 'কাম বড় কঠিন রিপু, স্বয়ং সুরপতি ইন্দ্রও এর বশবর্তী হইয়া গুরুপত্নীর লাঞ্ছনা করিয়া দুর্ভোগ পোহাইয়াছিলেন, তাঁহার সারা শরীর দিয়া লিঙ্গ গজাইয়াছিল...' এতটুকুন কল্পনামাত্র আফিমখোর হাসিয়া আকুল হইত। সাবুর জন্মপরিচয় নিয়া রাখালদের সাথে মিলিয়া আমরা কত না হাসিতাম, কি না সিরাজুদ্দৌলার হারেম হাত বদলাইয়া মীরজাফরের কাছে সোপর্দ করা হইয়াছিল, সেইখান হইতে শোনা যায় মীরজাফর কতকগুলি রমণীকে লর্ড ক্লাইভের কাছে ভেটস্বরূপ পাঠাইয়াছিলেন। কালে তাহাদের গর্ভের পুত্রকন্যাদের কেহ পাগলাসাবুর পিতা-প্রপিতামহের জন্ম দিয়াছিল নিশ্চয়ই। পুরুষাদিক্রমে বাহিত হইতে হইতে বিলাতি রক্ত একটু ঘোলা হইয়াছে কেবল, ধূলির আস্তর সরাইয়া দিয়া দ্যাখো, সাবুর গায়ের রং খাপখোলা খঞ্জরের মতন ঝলসাইতেছে। পাড়াগাঁয়ে গল্প তৈয়ার হয় এইমতই, অলসলোকের হাতে হাতে ফিরিয়া তাহার বুনট রচিত হয়।

১৬ পর্ব

মুশুরি আসিবার পর হইতে দেখিতেছি সারা গ্রাম থমথম করিতেছে। সদরে যাইবার রাস্তা দিয়া বড়জোর দু-একটি গ্রাম্য লোক মোট মাথায় করিয়া চলিয়া যায়, আর কাহাকেও সহসা দেখা যায় না। মায়ের কাছে শুনিলাম, পালদের বালবিধবা মেয়ে যুগী (যোগমায়া) আমাদের মোছলমান পাড়ার তমিজের সহিত পলাইয়াছে। যুগী মাছ খাইতে বড় ভালোবাসিত, সাধ করিয়া মাছ কুটিত, মাছের আঁশ দিয়া শখের ছবি গড়িত। বিধবার বরাদ্দ ছোলাগুড় আর দুধসাবু, তাহাকে মাছ দিবে কে। আমিষ খাইবার লোভে কি হৃদয়ের হাতছানিতে হতভাগী এহেন গুরু অপরাধ করিল কে বলিবে। তমিজের চেহারা আমার ভাল করিয়া মনে পড়িল না, ফাল্গুন-চৈত্র মাসে সে ছাপাখানা হইতে *মহম্মদী* পঞ্জিকা—শিশুদের প্রাইমার—রতিশাস্ত্র—গো কোরবানির ফজিলত ইত্যাদি মাথায় করিয়া লইয়া আসিত, ফিরি করিয়া বৎসরভর সংসার চালাইত, আষাঢ়-শ্রাবণ মাস ছাড়া মুশুরিতে থিতু হইত না। এই তমিজ কবে কখন যুগীকে কুলত্যাগ করিবার প্ররোচনা দিল কে বলিবে, কোন গ্রাম, কোন পাড়া তাহাদের এই যুগলকে ঠাঁই দিবে? হিন্দুর ঘরে সত্যনারায়ণের পূজাশেষে মোছলমান পান-সুপারি-কলা-সন্দেশ পাইবে, দহলিজের সামনে আসিয়া হাসিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিবে ঠিকই কিন্তু তেলে-জলে

কোনোদিন মিশ খাইবে না। হিন্দুর গাঁয়ে রাজারাণী পুষ্করিণী খনন করে, মোছলমানের গাঁয়ে সেই কাজ করে পীর-গাজীতে। মুশুরির অন্ধকার ঘরগুলির খোঁয়ারে হাঁসের ঘরে হাঁস এবং মুরগির ঘরে মুরগিই জন্মিবে, তেমনি হিন্দুর ঘরে হিন্দু এবং মোছলমানের ঘরে মোছলমানই জন্মিবে, চিরকাল তাহাই হইয়াছে। ইতোমধ্যে পালপাড়ার ছেলেদের সহিত মোছলমান পাড়ার লোকেদের এক দফা কাজিয়া হইয়া গিয়াছে। ভরাটি লইয়া ছাড়া এমন বিষম কাজিয়া মুশুরিতে কেহ দেখে নাই। রাখালের জেঠামশাই মরিয়াছেন। ঢোলগোবিন্দ হাত ভাঙিয়াছে, পা ভাঙিয়াছে, কাজেমের মাথা ফাটিয়াছে, তাহাকে সদরে লইয়া যাইতে হইয়াছে...অথচ কেহ চিত্তরানি খেলে নাই। বজলাল বলিয়া কাজেমের এক জ্ঞাতিভ্রাতা ছিল, সে মরিয়াছে।

এমত গোলযোগের ভিতর দেখিলাম, পরম নিশ্চিন্তে আমার নানি তাহার এক সইয়ের নাতনির সহিত আমার বিবাহ ধার্য করিয়াছেন। মোছলমানের দুহিতা, আশরাফকুলের মেয়েশিশুদের মতন তাহাদের অদন্তস্ফুট পর্দাপ্রথার কড়াকড়ি নাই, ছয়সাত বৎসর অবধি ইহারা মাতৃস্তন্যপান করে বলিয়া নাকগুলি বোঁচা, প্রায় নগ্নগাত্রে ঘুরিয়া বেড়ায়, ফসলের মাঠে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ইঁদুরের গর্ত হইতে ধান সংগ্রহ করিয়া আনে। এইবার পানের খিলিতে লঙ্কাবীজ দিয়া আমাকে খাইতে দিবে, মাদুরের তলায় সুপারি রাখিয়া তাহাতে উপবেশন করিতে দিবে, নেকাহ্ অনুষ্ঠানে উচ্ছিষ্ট শরবত খাইতে দিবার সময়কার গ্রাম্য ইতরজনোচিত ঠাট্টা-বটকেরাগুলি মনে আসিতে আমার শরীরে বিতৃষ্ণার কদম ফুটিল। শহরে কিছুকাল থাকিয়া গাঁয়ের নিস্তরঙ্গ জীবন আমার নিকট অসহবোধ হইতেছে—কে বলিবে মুশুরিপল্লির নয়নমঞ্জুল রূপ চিত্তে জাগরূক থাকিত বলিয়া কতদিন ঢাকার বাড়িতে শুইয়া কাঁদিয়াছি! এ যে মুশুরি, শহরের রাজা-রাজড়া-মোসাহেব-সাহেব-মাতাল-মদ্যপ-বারবণিতার ঝনঝনানি গাঁয়ের জীবন কোথায় পাইবে? শহর আমার শিরায় শিরায় মদ্যপের উত্তেজনা পুরিয়া দিয়াছে, গ্রামের উৎকর্ণ আড়ষ্ট নির্জনতা আমাকে বধির করিয়া তুলিতেছে, ইহা যেন সেই অন্তরীপাকার মাতৃস্তন, জরিদার জ্যাকেট ইহার পরিধেয় নহে। নানি আমার বিমর্ষতার কারণ ধরিতে পারিলেন না, তিনি স্বীয়কার্য করিয়াছেন, ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের জন্য একটি গৃহপালিত পশুর আমিষখণ্ড সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। নিজে শয্যা লহিয়াছেন, মায়ের শরীরও ভাঙিয়া পড়িয়াছে—সেই শরীর লইয়াই তাঁহারা ধামা-কুলা মেরামত করিতেছেন, পুরাতন শাড়ির পাড় হইতে সুতা টানিয়া কাঁথা সিলাই করিতেছেন, ধান ঝাড়িবার সময় চাষাদের মেয়েরা ধান সরাইয়া ফেলিত—সেই ক্ষতি রোধ করিতে নিজেরাই ধান ঝাড়িতেছেন। এই ক্ষতি হইতে রক্ষাকল্পে আমার একটি বিবাহ করা দস্তুর। যাহাতে তাঁহারা বোঁচা মেয়েটির নাক টানিয়া খেলিতে পারেন, 'কে বলে রে বোঁচা/ ভইর্যা আনব মাটি/ নাক হইবে পরিপাটি' ইত্যাদি...

পরাণ চিরদিনই জ্বরের রোগী, সে কাঁপিতে কাঁপিতে দোলাই গায়ে দিয়া শীতের রৌদ্রে বসিয়া থাকে। আমার বিবাহপ্রস্তাবে সে বড় আমোদ পাইল।

ঢেঁকিঘরের পিছনে প্রচুর আম আদা হইয়াছে, সরু সরু পাতা বাতাসে দোলে, আদাটুকু ভাঙিলেই কাঁচা আমের সুবাস—আব্বা বাঁচিয়া থাকিতে আম আদা দিয়া মটরডালের টক খাইতে ভালোবাসিতেন। সামান্য ফসলি জমি বাদে আমাদের উত্তরাধিকার বলিতে এই ভিটামাটিখানাই। সদর এবং ভিতরবাটিতে দুইখানা উঠান, পিছনে একফালি জমিনে কিছু সিঁদুরে আমগাছ, খাজা কাঁঠালের গাছ আর সুপারিপাতার বেড়া দেওয়া পুকুরখানা। উঠানের বেলগাছতলায় একখানা পুরাতন চৌকি পাতা—তাহাতে অর্ধশায়িত অর্ধ-উপবিষ্ট হইয়া একদা আব্বা হুঁকা টানিতেন আর ঝিমাইতেন। এই গাছটির বেলে আঠা হইত না, বিচি হইত না, লোকে মোরব্বা করিবার জন্যে হাতে করিয়া লইয়া যাইত। উঠান ঘিরিয়া মানকচু-পেঁপে-করমচা ইত্যাদি গাছ, গোহালের কাছে একখানা ফলবন্ত জামরুলগাছ। ফসলি জমি আমাদের যাহা ছিল তাহার বেশির ভাগই আব্বা মরিবার পর একে একে চলিয়া গিয়াছে। হিন্দুবাড়ির ফটকসংলগ্ন উঠানখানিতে সর্বদা ফুলের বাগান থাকিত, মোছলমানের থাকিত কুক্কুটের ঘুঁটিয়া যাওয়া কর্দম আর বড়জোর আনাজের গাছ। আব্বা সেই রাগ হইতে কাহাদের মালিকে হাত করিয়া উত্তর মুশুরি হইতে আনিয়া আমাদের উঠানে খানকতক দোপাটি-মল্লিকা-কেশুত-সন্ধ্যামালতী ফুল লাগাইয়াছিলেন। অযত্নে তাহারা ঝোপঝাড় হইয়া উঠিয়াছে, সন্ধ্যাকালে সেই ঝোপ হইতে বড় স্মৃতিজাগানিয়া সৌরভ উঠিয়া আসে। অন্ধকারে মা আসিয়া সেইদিকে মুখ ফিরাইয়া মেটে দাওয়ায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন। হাতগুলিতে গালার বালা, গেরস্থঘরের মেয়েদের পরিবার রুপা-দস্তার গহনা আর কাচের আংটি এইসব যাহা কিছু আবাল্য দেখিতাম, সেই তুচ্ছ অলংকারগুলিও এইবার আসিয়া দেখিতে পাইলাম না। কেশুত ফুলের মতন নরম বিষণ্ন সাদা তাঁহার মুখখানা। ঘর-তোলা পটের বিবি হইলে আরও শোকের সমারোহ করিতে পারিতেন, ছেলেপুলের সংসার, তাহাতে থামিয়া থাকা চলে না। একসময় নাতিদীর্ঘ শ্বাস ফেলিয়া তিনি উঠিয়া যাইতেন।

এইবার আসিয়া দেখিলাম সেই পাগলা সাবু আকালের সময় খাইতে না পাইয়া কঙ্কালসার হইয়াছে। চাষাদের দয়াপরবশ দানে সর্বদা তাহার স্বাস্থ্যরক্ষা হইত, চাষাদের ঘরেই যখন চাউল বাড়ন্ত—শেষপাতে চিরকেলে দুধকলা মাখিয়া খাওয়ার কথাও স্বপ্নের মতন শুনায়, তখন পাগলের পেট পালিবে কে? মুশুরিতে মকর-সংক্রান্তির পিঠা একদা শেয়ালকেও ভোগ দেওয়া হইত, আজ মানুষেরই পাতে শালুক আর ঘেঁচুসিদ্ধ ছাড়া কিছু দিবার নাই। গেরস্থঘরের মেয়েরা বিষাক্ত আগাছা অবধি তুলিয়া আনিয়া সিদ্ধ করিয়া খাইয়া মরিতেছে।

১৭ পর্ব

শ্মশানবাড়ির নিকট সেই চালাঘরে এক সাধু আসিয়া থান গাঁড়িয়াছেন। আগের পচিয়া যাওয়া ছাউনি ফেলিয়া দিয়া নূতন করিয়া বহেড়াগাছের কড়িবরগা এবং উলুর ছাউনি দেওয়ানো হইয়াছে, ঘরের পিছনে ঘণ্টাকর্ণের ঝোপে গোসাপের আস্তানা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে—পরিষ্কার জমিন কোপাইয়া তরিতরকারি লাগানো হইয়াছে, পিছনের ঢালে খানিকটা পিপুল-তেঁতুল-ময়নাকাঁটা ইত্যাদির দুশ্ছেদ্য জঙ্গলমতন জায়গা ছিল, সেখানে বিস্তর বনচালতা ফলিয়া রহিত, সেই জঙ্গলটুকুন শুধু অক্ষত রহিয়াছে। রান্নাবাড়ির কাছে একটি কাঁঠালগাছ, এই গাছখানা আগেও ছিল, তাহার গা ভরিয়া রোমশ ইঁদুরের মতন ইঁচোড় ফলে, কাঁঠাল হইবার আগেই ঝরিয়া যায়। কাঁঠালগাছতলায় দাঁড়াইয়া ঘোষেদের ছেলেরা কেহ আসিয়া রান্নার কাঠ ফালি করিয়া দেয়, কাঠ চিরিবার শব্দ আর কামারপাখির ডাক ছাড়া আর সব সুনসান। সাধুবাবার ভিটাখানি ঘিরিয়া রাঙচিতার বেড়া। ঢুকিবার মুখে দুইটি পাণ্ডুজবা আর শেফালিগাছ। নদীর দিক হইতে নালা কাটিয়া খেতে জলসেচনের পথ করা হইয়াছে—বাতাসে কাঁচা দুধ-গুড়-পাকা কলা-শাকালু-ভিজানো চাউল ইত্যাদির মিশ্র গন্ধ—জায়গাটির ভোল পাল্টাইয়া গিয়া এখন কেমন আশ্রম বলিয়া ভ্রম হয়।

সাধুবাবা স্বপাকে খান, দেবদূতের মতন সুপুরুষ এবং



মন খারাপ হইলে জাহাজঘাটায় আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতাম

বয়েসে নবীন, কৌপীনমাত্র সম্বল করিয়া দেশবিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। বাবার কৃপায় ঢোলগোবিন্দের মৃতবৎসা কাকির এই বৎসর একটি শিশু জন্মিয়াছে, আঁতুড়ের বারান্দায় নিরন্তর আগুন জ্বালাইয়া রাখা হইয়াছে, কপাটের গায়ে হেলান দিয়া শিশুর দিদিমা জাগিতেছে। আশপাশের গ্রামগুলি হইতে সন্তানার্থী নারীরা নরুন দিয়া বুক চিরিয়া রক্ত দিয়া সাধুবাবার আস্তানায় পাঠাইতেছে। মুশুরির নিস্তরঙ্গ জীবনে সাধুবাবার শাস্ত্রজ্ঞান, মন্ত্রোচ্চারণের নিষ্ঠা, গভীর রাত্রে ঘাটে বসিয়া স্তব-গান ইত্যাদি ঘিরিয়া খানিক চাঞ্চল্য জাগিয়াছে।

সাধুবাবা আসিবার পর মুশুরিতে এক অদ্ভুত গল্প ছড়াইয়াছে, আমাকে সেই গল্প পরাণই শোনাইল। রাজা শারদসিন্ধু রায়ের কর্মচারীদের সহিত কুঠিয়ালদের গোলমাল বাধিয়াছিল, সে গোলমালে কুঠির এক সাহেবকে রাজকর্মচারীরা শমন সদনে প্রেরণ করিয়াছিল, শারদসিন্ধু রায় তখনকার মতো গন্ডগোল থামাইতে পারিয়াছিলেন সত্য, তাহাতে শেষরক্ষা হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুকালে তঁহার স্ত্রী শাকম্ভরী সতী হইয়াছিলেন বলিয়া এতকাল যে লোকশ্রুতি আছে, তাহা আসলে সত্য নহে। বলপূর্বক দাহ করিবার সময় ইংরেজ টাউনসেন্ড সাহেব আসিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যান। সেকালে ইংরেজরা ভারতবর্ষের সতীদাহকে প্রেতিনী সন্দেহে মধ্যযুগে যেরূপ জীবন্ত দগ্ধ করিয়া অভিযুক্তাদের হত্যা করা হইত, সেইরূপ অশুভ ডাকিনীবিদ্যার দস্তর ভাবিয়া থাকিবে, স্ত্রীকুল যে সতী হইবার নিমিত্ত-জহরব্রত করিবার নিমিত্ত স্বয়ং উদ্বেল হইতে পারে তাহা ইহাদের মনে উদ্রেক হইত না। ফলে ইংরেজদিগের হাতে অনেক সতীই চিতাগ্নি হইতে পরিত্রাণলাভ করিত, জোব চার্নক এমত করিয়াছেন, ফিরিঙ্গি এক কবিয়াল করিয়াছেন। তত দিনে অবশ্য সতীদাহ রোধে বেন্টিংকের আইনও হইয়াছে। শারদসিন্ধুবাবুর স্ত্রীকে উদ্ধারপূর্বক সেই ইংরেজ সাহেব তাঁহার বাড়িতে লইয়া যান, ধর্মান্তর করিয়া 'জর্জিনা' নাম দিয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন এবং সংসার ফাঁদিয়া বসেন। শারদসিন্ধুবাবুর নাবালক পুত্র শিশিরবিন্দুবাবু তাঁহার এস্টেটে নিজ-বিমাতার কাছে লালিতপালিত হন। জর্জিনার গর্ভে টাউনসেন্ড সাহেবের চারটি সন্তান জন্মে, টাউনসেন্ড সাহেব মারা যান কলেরায়, তাঁহার মৃত্যুর পর জর্জিনা এবং তাঁহার সন্তানদের কী হইল জানা যায় না। শুধু জানা যায়, এই সন্তানদের কেহই দীর্ঘজীবী হন নাই, ভ্রাতৃভাবে এঁদের একজনকেই শিশিরবিন্দুবাবু নিজ এস্টেটে আশ্রয় দেন, দোকাটি গ্রামে তাঁহার ভদ্রাসন, টাউনসেন্ড সাহেব এবং জর্জিনার একমাত্র জীবিত পুত্রের দোকাটির সংসারে পাঁচটি পুত্র এবং দুইটি কন্যা জন্মে। একজন বাদে এই পাঁচ পুত্রের কেহই পরিণত বয়স অবধি বাঁচেন নাই, উপার্জনক্ষম হইবামাত্র তিনি বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির বাহিরে চলিয়া যান। কন্যাদের নাম শুধু জানা যায়, রাইশশী আর হেমশশী। 'রাইশশী নিবাস' তো আমি চিনি, হেমশশীর গল্পও শুনিয়াছি, তাহা হইলে কি শিশিরবিন্দুবাবু তাঁহার কোনো জ্ঞাতিকেই রক্ষিতা হিসাবে রাখিয়াছিলেন? শিহরিয়া উঠিয়া মনে ভাবিলাম সাতকড়ি একটু সারিয়া উঠিলে তাহাকে গিয়া ঘটনার সত্যাসত্য জিজ্ঞাসা করিয়া আসিব। যাহা হউক, এইসব গল্প ছড়াইবার পর মানুষের মনে রাজভক্তি টলায়মান হইয়াছে, ইংরাজভীতি রহিয়াছে কিন্তু তাহার সহিত ভক্তি নাই, এই গোরাসাহেবেরা ভূভারতে হিন্দু-মোছলমান কাহারও ধর্ম রাখিতে দিবে না। গ্রামে কানাঘুষাও শুনিলাম, আশ্রমে গভীর রাত্রে কাহারা আসিয়া লাঠিচালনা এবং অস্ত্রচালনার মহড়া দেয়। মুশুরিতে হলধরের চেয়ে পরাক্রান্ত শত্রু আর হয় না, কাহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য এইসব মহড়া চলিতেছে? এইসব নানা কথা শুনিলাম, কিন্তু আমল দিলাম না।

সেকালে মোছলমান ঘরেও পঞ্জিকা দেখিয়া শুভদিন ধার্য

করা হইত। তেমন একটি দিন দেখিয়া আমার বিবাহ হইল। যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই হইল, বিবাহের কন্যাকে বাড়ির সন্নিকটস্থ ফলের গাছ হইতে নামাইয়া আনিয়া বিবাহ দেওয়া হইল, দ্রব্যসম্ভারপূর্ণ নৌকাযোগে আবক্ষ ঘোমটা পরিয়া একটি শিশুকন্যা আসিয়া আমাদের ঘরে ঠাঁই লইল, আমার মা তাহাকে কোলে করিলেন। শুনিলাম, বালিকা অক্ষর চিনিতে পারে, কিন্তু শুধু 'ক' 'খ' লিখিতে পারে, কিছু সহায়তায় গৃহকর্ম সমাধা করিতে পারে। দিবাভাগে আমি তাহাকে দেখিতে পাইব না ইহাই দস্তুর ছিল। রাত্রিকালে তাহাকে যখন আমার সহিত এক ঘরে ঘুমাইতে দেওয়া হইল, সে প্রথমে ব্যাঘ্রগ্রাস-সম্মুখীন ছাগশিশুর ন্যায় ম্রিয়মাণ রহিল, অতঃপর এমন উর্ধ্বশ্বাসে ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিল যেন তাহার পিতাপিতৃব্য মরিয়াছে। কোথায় পড়িয়া রহিল আমিরুল্লার সহিত অন্ধকারে কল্পিত সেই গরমকালের খোবানির মতন গাত্রবর্ণ, কোথায় সেই মার্জিত তৈজসের মতন ভাস্বর কাজলটানা চোখ, পিতলের সুরাঈয়ের মতন দীর্ঘ গ্রীবা ইত্যাদি! আমি অত্যন্ত তিক্তমনে শিশুর ক্রন্দনভারাক্রান্ত সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম।

আমি নিদ্রাকালে স্বপ্ন দেখিতাম না বলিয়া পরাণ তামাশা করিয়া বলিত, গরু-ঘোড়া ইত্যাকার চতুষ্পদ প্রাণী স্বপ্ন দেখে না। বিবাহের রাত্রে কিন্তু আমি স্বপ্ন দেখিলাম, দেখিলাম, আমার স্ত্রী একটি চতুর্দশবর্ষীয়া বালিকা, একটি ঘরের ভিতরে আমরা কিংখাবের আসনে বসিয়া আছি, বাল্যে তাহার নাকে একদা পোঁটা পড়িত এবং ক্ষীরপুলি হাতে দিয়া তাহাকে আমি স্বয়ং কান্না ভুলাইয়াছি এইসকল মনে করাইয়া দিয়া আমি বড় হাসিতেছি। কোথা দিয়া জরিপাড়ের মতন মিহি একফালি রৌদ্র আসিয়া তাহার মুখে পড়িয়াছে, অনাবিল আনন্দে উদ্ভাসিত সেই মুখে রৌদ্রের পাড়খানা বড় মানাইয়াছে। তাহাকে সেই আমি স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম আবার সমুদ্রযাত্রার প্রাক্কালে, সেই গল্প পরে করিব। কেন তাহাকে জীবনে দুইবার স্বপ্নে দেখিয়াছি, দুইবারই সোনার কাঠি রৌদ্র এবং রুপার কাঠি জ্যোৎস্নাচুম্বিত হইতে দেখিয়াছি—কে বলিবে।

১৮ পর্ব

বিবাহের রাত্রিটি আমার আমৃত্যু মনে থাকিবে। বাহিরে অকালবর্ষণের রাত্রি। সিক্ত আমকাঁঠালগাছ হইতে বড়ই মাদক ঘ্রাণ উঠিতেছে। কাহার সহিত নিয়তি আমাকে বাঁধিয়া দিল জানিলাম না, বিবাহপ্রস্তুতি বলিয়া আমারও কিছু ছিল না, নহিলে নাবালিকার মন ভুলাইতে হাতে করিয়া শ্রীনিবাসের দোকান হইতে শক্করপারা আনিতাম, অথবা আনিতাম চকবাজারের শোলার পাখি। কিংবা এইসবই হয়তো ভ্রান্ত চিন্তা, সামান্য কালির ছিটা পেটে পড়িতেই আমি কল্পলোকে যাহাদের সঙ্গিনী ভাবিতে শুরু করিয়াছিলাম, তাহারা কৈশোরোত্তীর্ণা, তাহাদের জীবনে বিদ্যাচর্চার সুযোগ ঘটিয়াছে, তাহারা কেহ মাতৃক্রোড়চ্যুত শিশু নহে। হায়, মাত্র কয়েকটি মাস মোহনকান্তির সহিত বাস করিয়া আমি নিজের পঙ্‌ক্তি ভুলিয়াছিলাম। দীর্ঘক্ষণ দাওয়ায় বসিয়া থাকিয়া মশকের অত্যাচার সহিয়া যৎকালে মনে হইল বালিকা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তখন ঘরে প্রবেশ করিলাম। অন্ধকারে ঘুমন্ত শিশুকন্যার নাসার শব্দ তালে তালে বাজিতেছে। ঘরের অন্ধকার কিয়ৎকাল পরে চক্ষে সহিয়া আসিলে দেখিলাম, রুপার মাদুলি দিয়া গাঁথা খোঁপা খুলিয়া এলো হইয়াছে, পরনের বিবাহের কাপড়খানা পুঁটুলি বানাইয়া চাটাইয়ের উপরে রাখিয়া সে নিদ্রা গিয়াছে। কে গো তুমি কাহাদের কন্যা, তোমার বাঁধা শালকর থাকিবে না, পছন্দের আতরওয়ালা থাকিবে না, খোঁপা বাঁধিবার নোকরানি থাকিবে না, আমাদের শুষ্ক সুপারিপত্রে আচ্ছাদিত পানাপুকুরে ডুব দিয়া তোমার দিন যাইবে! সহধর্মিণী লইয়া যেইসকল চিত্র মনোমধ্যে সযত্নে প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা সিক্ত ন্যাকড়া দিয়া খড়ির দাগের মতন মুছিতে লাগিলাম, আমার মনের এইসকল গূঢ় বাসনা কদাচ সিদ্ধ হইবে না। দক্ষিণ মুশুরির দরিদ্র বালক, এত দিন কি করিয়া নিজস্থান ভুলিয়া ছিলাম? কে বলিবে। বাহিরে বেলগাছতলার দিকে শিয়াল বিকটস্বরে ডাকিয়া উঠিলে চমকিয়া উঠিলাম, মশকের অত্যাচার সহিতে সহিতে একসময় নিদ্রাসাগরে নিমজ্জিত হইলাম।

মুখে কুলুপ আঁটিয়া মুশুরি ফিরিয়াছি—এই সংবাদ ক্রমে রাজার কানে কী করিয়া গেল কে জানে, হলধর আবার এক সন্ধ্যাবেলা আসিয়া আমাকে কাছারি লইয়া গেল। বহুদিন পর হলধরকে সচক্ষে দেখিলাম, নদীর কচ্ছপের মতন সর্বভুক—নৃশংস চেহারা, স্কন্ধখানি মহিষাসুরকে হার মানাইবে। কাছারি নিয়া গিয়া আমাকে কিসের অপরাধে এমন ভূততাড়ানিয়া প্রহার করা হইল কে বলিবে। মারিবার সময় কেবল কে যেন বলিতে লাগিল, রাজামশায় তাহার যবনী রক্ষিতা মুন্নিজানকে খুন করাইয়াছেন, এই কথা এই যবনের জিভ রাষ্ট্র করিয়াছে। আর একজন কে বলিল, এখন কেবল প্রাথমিক সোয়াদ দিয়া দেওয়া হউক, পরে ঘরের লোকদিগকে রাজার নামে কলঙ্ক দিবার শাস্তি বুঝাইয়া দেওয়া হইবে। প্রথমদিকে ক্রোধোৎক্ষিপ্ত চিত্তে আমি প্রহারে বাধা দিতে শুরু করিলাম, কিন্তু এতগুলি মুগুরভাজা পালোয়ানের সহিত আমি পারিব কী করিয়া, কাঠডলা-বাঁশডলা কিছুই বাদ রহিল না। মূর্চ্ছা যাইতে যাইতে পরওয়ারদেগারের নাম লইলাম—আয় আহাদ, হে নিঃসঙ্গ, হে নিঃসঙ্গের মুশকিল আসান, আমাকে রক্ষা করো। এইভাবে প্রহারপূর্বক আমাকে একটি অন্ধকার কুঠিতে কয়েদ করিয়া রাখা হইল। একসময় মনে হইল পাখিসব প্রত্যুষ ঘোষণা করিল। সজ্ঞানে ফিরিলাম এবং আরেকবার পাখিকুলের কাকলী শুনিয়া মনে হইল, হয়তো সন্ধ্যা ঘনাইয়াছে।

এই রূপে কত দিন গেল বলিতে পারি না, একদিন ভোরের আলো ফুটিবার আগে আমাকে ছাড়া হইল, চোখ ফুলিয়া বুজিয়া গিয়াছে, নাক-মুখ হইতে ঝরঝর করিয়া রক্ত ঝরিতেছে, কাপড়ে মূত্রের উগ্র গন্ধ লইয়া উষার আলোয় বাড়ির চিরপরিচিত পথে গোত্তা খাইয়া ফিরিতে২ কোথা হইতে তন্মনস্ক মনে জাগরূক হইল মুন্নিজানের গলার আওয়াজ, ঢাকাই বেহালার মতন আওয়াজ—প্রথম শুনিলে চমকাইয়া উঠিতে হয় এমন ভার এমনি ধার, কিন্তু শ্রবণদুটি ঘাতসহ হইয়া আসিবামাত্র সেই স্বর মর্মে আসিয়া স্পর্শ করে। এমন সৃষ্টিকে হত্যা করিতে বড় কঠিন প্রাণ হওয়া চাই।

মৃতকল্প দশায় মনে নানা প্রশ্ন জাগিত। রাজা মুন্নিজানকে বিষপ্রয়োগ করিয়া নদীতে নিক্ষেপ করিবার আদেশ কেন দিয়াছিলেন? রাজার ঔরসে নর্তকীর গর্ভে শিশু জন্মিবার কাহিনী কিছুমাত্র নূতন নহে, সেইসব সন্তান জন্মিয়া রীতিমতো স্বাভাবিক মানুষের আকারই লাভ করে, সামাজিক সম্মানটুকু তাহাদের জোটে না বটে, কিন্তু অন্যান্য বিবাহগর্বী মাতাপিতার দরিদ্র সন্তানদিগেরই বা সমাজে সম্মান কোথায়? সম্মানের চাইতে সংস্থানই বড়। খাইয়া পড়িয়া একটি বাত্যাবিক্ষোভহীন জীবন কাটাইয়া যাইতে পারিলেই তো গ্রামের লোকে বাঁচে, সম্মান বড়লোকের খাঁই বই নয়।

বাড়ি পৌঁছিতে মুন্নিজান-হত্যার উদ্বেগ ব্যোমপথে মিলাইয়া গেল, প্রাণ চাপিয়া ধরিল স্বজনদিগের অনিষ্টের ভয়। ভাইয়েরা আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া আহাজারি করিতে লাগিল। মা আমার এই দুর্দশা দেখিয়া বড়ই মর্মপীড়িতা হইলেন, তাঁহার শান্ত চক্ষু ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির মতন জ্বলিতে লাগিল, তিনি আমাকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া রহিলেন, আমার জ্ঞান ফিরিলে আমার দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, 'এই গ্রাম

হইতে পলায়ন করো, আমি তোমার উপর হেন অত্যাচার সহিতে পারিব না, আমি বড় গভীর খতরা টের পাইতেছি। রাজা খেপিলে তোমার পার্শ্বে কেহ থাকিবে না, মোছলমানের এমনিতেই কেহ নাই।'

আমি মায়ের কোলে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া থাকিয়া অশ্রুপাত করিতে করিতে বলিলাম, 'আমাকে আবার খুঁজিতে আসিয়া না পাইলে যদি তোমাদের উপর বলপ্রয়োগ করে? এই বাড়ি ভাঙিয়া যদি সমভূমে মিলাইয়া দেয়? ভিটামাটিতে যদি পুকুর করে?'

মা অবিচল কণ্ঠে কহিলেন, 'আমি দেখিব। বিধবা-বেওয়া মেয়েলোককে আল্লা বাঁচাইবেন। তুমি চলিয়া যাও। ভিক্ষা করিয়া খাইও, যেমন করিয়া পারো কাজ জুটাইয়া লইও, সাধুসঙ্গ করিও, যাহাতে সুসার হয় তাহাই করিও। স্থায়ী আবাস হইলে চিঠি লিখিয়া জানাইও। ততদিন আমি এইদিক দেখিব। খোদা নেগাহবান থাকিলেন।' ব্যথায় পাশ ফিরিতে পারি না, পরাণ আসিয়া ভূশয্যায় ছিন্ন মাদুরে আমাকে ফিরাইয়া দিতে দিতে যাহা বলিল তাহার কিছু কিছু আসমানি খবর বটে, কাহারা রেলের কামরায় ঢিল মারিয়াছে, সাহেব ছিলেন কামরায়, জানালার কাচ ভাঙিয়া সাহেবের এক চক্ষু নষ্ট হইয়াছে। গাঁয়ে কয়েকবার পুলিশ আসিয়াছিল, পুলিশ আসিবার খবরে শ্মশানপাড়ের সেই সাধুবাবার আস্তানাখানা ফাঁকা হইয়া গিয়াছে। এমন জাগ্রত সাধু চলিয়া গেলেন বলিয়া হিন্দুরা বড় খেপিয়াছে।

একদিন রাত্রের অন্ধকারে মুশুরি ইহজন্মের মতন ত্যাগ করিলাম। রথতলার সেই অতিকায় কৃষ্ণবট যাহার অঞ্জলির মতন পাতায় বালক-কৃষ্ণ ননী চুরি করিয়া রাখিতেন, সেই বটের তলায় পাগলা সাবু ঘুমাইতেছিল, আমি তাহাকে দেখি নাই, তাহাকে অতিক্রম করিয়া যাইবার সামান্য শুষ্কপত্রের শব্দে যে সে জাগিতে পারে তাহা ভাবি নাই। গ্রামের সীমানা অবধি হনহন করিয়া আসিতে আসিতে টের পাইলাম আমার পিছনে পাগল প্রচণ্ড বেগে দৌড়াইয়া আসিতেছে, নাগাল পাইল বলিয়া। শুধু দৌড়াইলে বুঝিতাম, সাবু বিজড়িত উচ্চস্বরে কীসব বলিতেছে আর কী কী সব ছুড়িয়া মারিতেছে—ঘুঁটে না ঢিল না কী কে বলিবে। আমি প্রমাদ গনিলাম, একখানা থান ইটে ঠোকর খাইতে খাইতে উহা তুলিয়া লইয়া অন্ধকারে পাগলের বরাবর ছুড়িয়া দিলাম। পাগল অমানুষিক শব্দ করিয়া উঠিল। তাড়া করিবার শব্দ আর পাইলাম না।

১৯ পর্ব

কী প্রযত্নে ময়দানের শ্যামলিমা, চা-খানার কোলাহল আর গ্রামোফোনের শব্দে উচ্চকিত কলিকাতা আসিলাম সেই কাহিনী থাক, ক্লেশ যাহা কিছু স্বীকার করিয়াছি আমার অদৃষ্টে তাহা অমোচনীয় কালির হরফে লিখিত ছিল বলিয়াই করিয়াছি। মুশুরিতে থাকিতে কাকার মুখে এবং ঢাকায় থাকিতে আমিরুল্লার নিকট পাশ্চাত্যশিক্ষার আবেশে উন্মার্গগামী কলিকাতার বাবুদের বহু কীর্তিকলাপের কথা শুনিয়া আসিয়াছি। সেইসব কথা আমার ধমনী চঞ্চল করিয়া রাখিত, কলিকাতা নামক এই আজবখানা দেখিব বলিয়া কতকাল যাবৎ উন্মুখ হইয়া আছি। খিদিরপুরের ডকে উল্কি কাটা গোরা খালাসীদের দেখিলাম—চাঁদপাল ঘাটের জলমগ্ন সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া দেশবিদেশের জাহাজ দেখিলাম—দূর দূর হইতে জাহাজ কোম্পানিগুলির পূর্বদেশীয় সদর দপ্তর দেখিলাম, চটকলের ঘড়িতে ঘণ্টা বাজিবার শব্দে উদাস হইলাম, ভূকৈলাসের ঘোষালদের রাজবাড়ির চাতালে নারিকেলবীথির ছায়ায় শুইয়া ভোজপুরীদের সহিত গাঁজার ছিলিম ধরাইলাম। মাথার উপরে উত্তাপে সাদা হইয়া আসা নির্মেঘ আকাশে চিল ডাকিয়া ডাকিয়া ঘুরিত। পথে পথে পসারী ডাকিয়া ফিরিত। কোথাকার কুঁদুলি বিধবারা ঘাটে জল ঘাঁটিয়া হাতে-পায়ে হাজা ধরাইত এবং কলহে ক্ষান্ত হইত না—তাহাদের কোন্দলের আওয়াজ ভাসিয়া আসিত। কোথাও খালের ঘোলা পানিতে ভাসিয়া যাওয়া ধানবোঝাই নৌকা দেখিলে মনে ভাসিত মুশুরির কথা।

হুগলির ঘোলা জলে বিদেশি স্টিমার—সারি সারি নৌকা—ঘাটের কাছে অলস বসিয়া থাকা সাদা ষাঁড়—মাঝে মাঝে কলাঝাড়ের ছায়ায় চালাঘরের ভিতর চাল-ডাল-আনাজ-কাঠ-ঘুঁটে-তেল-নুনের দোকান। হিন্দুতে বলিত এর নাম কেদারপুর—শিবমন্দির আছে দ্যাখোনাই? মোছলমান বলিত এর নাম খিজিরপীরের হইতে আসিয়াছে। দিনের পর দিন সেস্থলে ঘুরিয়া বাড়িওয়ালার সহিত ঘরভাড়া লইয়া বচসা করি, এক বেলা ট্যাংরা মাছের কাদার গন্ধ গুলিয়া ফেলা ঝোল দিয়া পোড়া ভাতের কাঁই খাইতে পাই। প্রতিদিন ধর্না দিই, কাজ আর জোটে না। ক্রমে আট আনার বদলে জাহাজে পালিশ করিবার কাজ পাইলাম, ঋণ করিয়া ঘর ভাড়া করিয়া থাকিতেছি, কবে জাহাজে কাজ জুটিবে, কবে ফিরিব তবে ঋণ শোধ হইবে।

মুশুরি হইতে মায়ের চিঠি আসিত, পরাণের স্বাস্থ্য, গাভিন গাইয়ের হাল, গাঙের কাঁকড়ায় কাটিয়া দেওয়ায় আউশের ফসলের ক্ষতি এইসব বিষয় নিয়া মা লিখিতেন, নসিবা খাতুনের কথা কিছু থাকিত না। সাধুর থানে পুলিশ গুপ্ত সন্ত্রাসীদের হদিস পাইয়াছে, উহারা রাত্রিকালে এই আস্তানায় এমনকি উত্তর মুশুরির কুলীনকুলের যুবকদের লাঠিখেলা-শড়কিখেলা শিখাইত, ছুরি চালাইতে শিখাইত। পরাণের জ্বর বাড়িতে বাড়িতে সম্বৎসরের ব্যাধিতে পরিণত হইয়াছে। আমি যাইবার পর হইতে নানি শয্যা নিয়াছেন, ইতোমধ্যে আর উঠেন নাই। এই সকল খবর, আর আসিত অনন্ত দারিদ্র্যের খবর—একটি পয়সাও ঘরে নাই, চাউলসিদ্ধ আর পাইন্যা কচু খাইয়া দিন কাটাইতেছেন, ছেলেদের কাপড় ছিঁড়িয়া শতচ্ছিন্ন, গাছগুলি একে একে বেচিয়া দিতে হইতেছে। আমি নিরুপায় হইয়া সেইসব দুর্দশার কথা পড়িতাম। মা বারবার লিখিতেন 'ঈশ্বরের মহিমা, তিনি জানেন', এই ভরসা জোলো ঠেকিত। ঈশ্বর থাকেন উত্তর মুশুরিতে। দক্ষিণ মুশুরির এই কয়েক ঘর মোছলমানের নিমিত্ত কাহারও সময় নাই। চিঠি শেষ হইত এই বলিয়া যে, এহেন দুর্দশার খবরাদি শুনিয়া আমি যেন ছুটিয়া না আসি, মুশুরিতে যেন না ফিরি। মহিমময় ঈশ্বর তাহাদের দেখিবেন। আমার মনশ্চক্ষে ভাসিত বেথুল-ঝোপগুলির মাথায় তেলাকুচার রোমশ সাদা ফুল। তালাবের চতুর্দিক নবীন গ্রীষ্মে আমরুলশাকে ভরিয়া গিয়াছে, পাড়ের কাদাজলে বকঠুঁটো মাছ, বসন্তবৌরী পাখনার হলুদ ঝলক দেখাইয়া উড়িয়া যাইতেছে এক সজিনাগাছ হইতে আরেক সজিনাগাছে, হরিয়াল-ঘুঘু আর ছাতারে পাখি চিৎকার করিতে করিতে শ্যামা ধান-কলাইয়ের বীজ ইত্যাদি খাইতেছে। আহা দক্ষিণ মুশুরিতে সন্ধ্যার কবরগাহে গোবাঘা আর রাত্রির প্রহরগুলিতে শেয়ালের ডাকে কান পাতা দায় হইত।

তুমি গাঁওগেরামের ছাওয়াল, জন্মিয়া অবধি গো-মাতার মতন নিরীহ গ্রাম বই কিছু চিনিতে না, সেই তুমি ডকের সন্নিকটে ঘরভাড়া করিয়া থাকিলে, বহু ধরপাকড় করিয়া ঘাট-সারেংকে উৎকোচ দিয়া লস্কর হইয়া আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে সমুদ্রে চলিলে পৃথিবী দেখিবে বলিয়া, দেখিবার বেলায় দেখিবে জাহাজগুলির বিরাটকায় জ্বলন্ত উদর আর দিবারাত্র দেখিবে বিপুলানীল সমুদ্র ঢালের মতন উজ্জ্বল—তাহার কূল নাই, কিনার নাই, আদি-অন্ত নাই। জাহাজ চলিতে শুরু করিবামাত্র ভারত মহাসাগরও চলিতে শুরু করে, যেন কোনো অতিকায় আদিম জন্তুর উপর সওয়ার হইয়াছ, তাহার পিচ্ছিল পৃষ্ঠ

প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছো, সে যেইখানে লইয়া যাইবে সেইখানেই যাইতে হইবে—প্রথম দশদিন মুখ দিয়া কিছু গিলিলেই বাহির হইয়া যাইবে।

নোয়াখালীর এক লস্কর, তাহার নাম লোকমান—গলায় রঙিন রুমাল আর কানে সোনার রিং, সে আমাকে তেঁতুলের মাড়ি মিশাইয়া দুই গাল ভাত মাখিয়া মুখে তুলিয়া দিত, তাহাও প্রথমদিকে রাখিতে পারিতাম না, ক্রমে উদর শান্ত হইল। তখন শুরু হইল অন্য জ্বালা, ক্ষুধার গরম অন্ন নাই—ভান্ডারী ভাঁড়ার হইতে কিছু বাহির করিয়া দিলে সকলে মিলিয়া খাইবার জন্য সামান্য ডাল-ভাত কিংবা শুঁটকি মাছের তরকারি রাঁধিয়া লওয়া হয়। পাকসমাধা হইলে আহারকালে ভাতের থালায় উপুড় হইয়া পড়িবার সময় ঠাহর করিয়া দেখিলে বোঝা যায় না ইহা পূর্ববঙ্গের কি মালয়দেশের মোছলমানের হাত, না অসমিয়া হিন্দুর হাত, না গোয়ার খ্রিষ্টানের হাত। কঠিন শীতে শীতবস্ত্র নাই, কাঠের তক্তার উপরে একখানা কম্বল মুড়ি দিবার জন্য জোটে, পান হইতে চুন খসিলে জোটে প্রহার। প্রথমদিকে সমুদ্র তোমাকে চড়কিপাক খাওয়াইবে—সমুদ্রবমন শেষ হইবার পরেও ক্লেশের কমতি নাই, স্কার্ভি-বেরিবেরি রোগে ক্লিষ্ট হইয়া কিংবা অগ্নিগর্ভ বয়লারে কয়লা ভরিতে গিয়া তোমার গতকল্যের সখা আজিকে মরিতেছে। মোছলমানের বড় জ্বালা, তাহার সহে না জানিয়া ওপরওয়ালা জোর করিয়া শুয়োর খাওয়াইয়া দিতেছে। শ্বেতাঙ্গ উপরওয়ালার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া কেহ কেহ মাহিনার মায়া ত্যাগ করিয়া জাহাজঘাটা ভিড়িবামাত্র রাত্রে জাহাজ হইতে পলাইতেছে, রাতভর জঙ্গলে ঘাপটি মারিয়া থাকিতেছে।

২০ পর্ব

মনে কত মহৎ ইচ্ছা লইয়া এই পথে আসিয়াছ, দেশসেবা করিবে, সংসারের হাল ফিরিবে, খোদাতাআলার আশ্চর্য সৃষ্টি ঘুরিয়া দেখিবে—সকল ইচ্ছাই ক্রমে কেমন দিকভ্রষ্ট মনে হইতে থাকিবে। যে দেশকে আপনার ভাবিয়া যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছ, সেই দেশ তো তোমাকে আপনার করিয়া লয় নাই, 'দখলদার' আর 'দখলীকৃত' এই দুই ভাগে বিভক্ত না করিয়া লইলে সেই দেশ তোমাকে এবং নিজেকে দেখিতে পায় না। যে রাজভক্তি নিয়া জাহাজে উঠিয়াছ, সেই রাজা কিংবা রানী গত এক শতকে যত দুর্ভিক্ষের কারণ হইয়াছেন, তাহার আগের দু'হাজার বছরে ভূভারতে তেমন নজির নাই। কেন তুমি দিন না দেখিয়া রাত না দেখিয়া অসহ্য উত্তাপে-বাষ্পে অজ্ঞান হইয়া এঞ্জিনরুমে কয়লা ভরিয়া জাহাজের বিলাতি নাবিকের তুলনায় এমন নিম্নবেতনভুক্ত তাহার কোনো জবাব নাই। কেন তাহাদের বেতন বাড়ে কিন্তু তোমার বেতন বাড়ে না, তাহার কোনো জবাব নাই।

এতসব প্রশ্নের জবাব আমরা খুঁজিতাম না, খুঁজিবার অবকাশ ছিল না, খুঁজিলেও উত্তর মিলিবে না জানিতাম। ক্রমশ অন্যায় ব্যবহার নির্বাক থাকিয়া সহ্য করিতে শিখিয়া গিয়াছিলাম, সমুদ্রের লবণাক্ত জল আর বাতাসের স্বাদ ভালো লাগিতে শুরু করিয়াছিল। দিনমান ভাস্বর হইয়া থাকা জলধি ভালো লাগিত, সহচরদের সহিত কোন্দল ও সহানুভূতির কোলাহল—অবিচ্ছিন্ন যোগ ভালো লাগিত, মহাসাগরবক্ষে সফেন বিদারণরেখা কাটিয়া জাহাজ চলিয়াছে স্বীয়লক্ষ্যাভিমুখে—তাহা ভালো লাগিত, স্টিমারের মেদুর ভোঁ-ধ্বনির গমগমী ভালো লাগিত, সর্বাধিক ভালো লাগিত জাহাজ যখন আলো-ঝলমল বন্দরগুলিতে ভিড়িত—পোর্ট সাঈদ, এডেন, কলম্বো। প্রথমবার শত শত প্যাগোডার চূড়াচ্ছন্ন বর্মামুল্লুক দেখিয়া বহুদিন পরে মোহনকান্তির কথা মনে পড়িয়াছিল। হংকং-এর জাহাজঘাটার কাছে কয়েকজন বুড়িকে চিংড়ি মাছের খোসা ছুলিতে দেখিয়া মনে পড়িয়া গিয়াছিল উনানের সন্নিকটে উবু হইয়া বসা আমার নানিকে। বসফরাসের আকিকরঙা ঢেউয়ে রৌদ্রের ঝিকিমিকি, আলেপ্পোতে দেখা বকরির পাল চড়ানো রাখাল, হাজার তোরণের তুর্কপুর। বসফরাস-অ্যান্টিয়োক-আলেপ্পো-আলেকজান্দ্রিয়া-জেনোয়া-মার্সেই...পরলোকগত আব্বার মুখে শোনা নামগুলি আসিয়া আমার প্রাণে কী অভিঘাত করিত, সযত্নে যে মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাসটি এত দিন রোধ করিয়া রাখিয়াছিলাম, হৃদয়ের অতলগর্ভ হইতে তাহা ঠিকরাইয়া উঠিত।

শতক্লেশ স্বীকার করিয়া একদিন কুয়াশাচ্ছন্ন ভোরে আপনার টাকাকড়ি পাগড়িতে লুকাইয়া জোব্বা-পাজামা পরিয়া বিলাতের ইস্ট ইন্ডিয়া ডকে নামিলাম। ক্ষুধায়-তৃষ্ণায়-পথশ্রমে ক্লান্ত দেহ, শীতের বাতাস হাড় অব্দি কাঁপাইয়া দিতেছে। দেখিলাম প্রস্রাবখানাতেও বিলাতি নাবিক আর লস্করদের ঢুকিবার পথ আলাদা, শুঁড়িখানায় সাদা চামড়ার লোকেদের পানাহারের স্থান পর্দা দিয়া আলাদা করিয়া দেওয়া। এই সমুদ্রযাত্রার আগের রাত্রে আমার কিশোরী স্ত্রী নসিবা খাতুনকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম, দেখিয়াছিলাম জ্যোৎস্নামদির এক দীঘিতে অজস্র কুমুদ ফুটিয়াছে, তাহার মাঝখানে একখানা ডোঙায় করিয়া আমরা ভাসিতেছি। অন্ধকারে আমার স্ত্রীর মুখভাব স্পষ্ট নহে, স্বচ্ছ চক্ষুদ্বয়ে বড় গভীর মদির নিমন্ত্রণ। সে সেই জ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনীতে অবগুণ্ঠন খুলিয়া দিয়াছে, নিবিড়কুন্তলার কেশ বেড়িয়া অবাধ চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে। সেই জলটুঙ্গী আর পদ্মদীঘি, সেই জ্যোৎস্না এবং সেই কুলবালা হইতে কত দূর আসিয়া পড়িয়াছি।

ডকের বাতাস গরম আলকাতরার মিষ্ট গন্ধে ভরপুর। তুলার গাঁটরি, চামড়ার গাদা, চেরাই করা কাঠ সকলই স্তূপীকৃত হইয়া আছে। অদূরে জাগিতেছে সারি সারি বাড়িঘরের চিমনি আর গুমটিঘরের ছাদ। এইখানে কোথাও আমিরুল্লার হেস্টিংস ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, একমাত্র সন্তানের ডিপথেরিয়া রোগে ভুগিয়া মরিবার সংবাদ ১৭৬৫তে ইংলন্ড ফিরিয়া যাইবার আগ অব্দি পান নাই, পরবর্তীতে তিনি বিবাহ করিলেও আর সন্তানাদি হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর সাথে সাথে তাঁহার বংশ লোপাট হইয়া গিয়াছিল।

কুয়াশার প্রগাঢ় উড়ানি দিয়া জল-স্থল মণ্ডিত। পথে এশীয়লোকে কোথায় থাকে জিজ্ঞাসা করিলে বিলাতি পুলিশ নাসিকাকুঞ্চনপূর্বক যেকোনো দিকে অবহেলার হাত খেলাইয়া বলিয়া দিল, 'নাক বরাবর হাঁটিয়া যাও, যেইস্থলে কারিপাউডারের গন্ধ পাইবে থামিও, এশীয়লোকের দেখা পাইবে।' আমাকে লোকমান বলিয়া দিয়াছিল যদি আপনার দেশীয় লোকের সাক্ষাত পাও, বাঁচিয়া গেলে, ক্ষুধার অন্ন জুটিবে, ইঁদুরে কাটা হইলেও কম্বল জুটিবে, অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন কেহ তোমার চিঠি লিখিয়া দিবে, অসুখ হইলে হাসপাতাল নয় ওয়ার্কহাউসে জমা করিয়া দিবে। নহিলে বাঁচিয়া থাকিলে শুঁড়িখানায় সর্বস্বান্ত হইয়া একদিন ছিন্নকোট গায়ে পথে নামিয়া তুমি ভিক্ষা করিবে, মুখে বলিবে 'বকশিশ'।

খুঁজিতে খুঁজিতে আমার স্থান হইল শ্যাডওয়েলে মুটেমজুর—আফিমখোরদের ব্যারাকে—বাড়ি তো নয় ভূতের বাথান, সেইখানে না আছে বিছানাপত্তর, না আছে আসবাব, না আছে শীত হইতে বাঁচিবার আগুন। স্নান না করিতে করিতে গায়ে বিকট গন্ধ হইল, আনাজের খোসাটুকুন খাইবার জন্য কলহ করিতে শিখিলাম। বাড়িতে কাহারও পরিত্যক্ত একখানা বাইবেল কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম, অসময়ে কিতাবের অভাবে তাহাই ধরিয়া পড়িতাম। আমিরুল্লার সান্নিধ্যে থাকিয়া আমার বিদ্যোৎসাহ সৃষ্টি হইয়াছিল আগেই স্বীকার করিয়াছি, রসগর্ভ পিঠার বর্ণ যেইরূপ বদলাইয়া যায়, সেইরূপ জ্ঞানান্বেষীর হৃ

দয় বদলাইয়া যায়। এই অশান্ত-উদ্দেশ্যহীন জীবনকে অর্থপূর্ণ করিতে বাইবেলখানির জুড়ি ছিল না।

নদীর কুয়াশায় আচ্ছন্ন রেলওয়ে-খালপাড়-করাতকল-জাহাজঘাটা-ধোবিখানা-শুঁড়িখানা-বোর্ডিং হাউস, এই সবকিছুর চতুর্পাশ দিয়া কিলবিল করিয়া গজাইয়া উঠিয়াছে বস্তি—জনহিতকর দুই চারিটি কর্মকাণ্ড আর কিছু কর্তাব্যক্তির সাধ্য কি এই অশেষ দারিদ্র্যের ভার লাঘব করে। ইহারা কর্মপটু এবং নীতিনিষ্ঠ জাতি, পরের প্রাঙ্গণে মেওয়াগাছ নুইয়া পড়িতেছে ফলভারে—ইহারা তাহা স্পর্শমাত্র করিবে না। ঈশ্বরের সেবা করিবার ভক্তি দিয়া ব্যবসায়ী গ্রাহক পরিসেবা করে অথচ ইহাদের পরজাতির প্রতি হীনমনোভাব প্রবল। ইহাদের যুদ্ধে মৃত নেটিভরা সংখ্যামাত্র, কাহারও নাম উল্লেখিত হয় না—কে জাহাজের ডেক হইতে ঢেউয়ের তোড়ে ভাসিয়া গেল, কে তেলকালি গিলিয়া খাবি খাইল, কে নৌকা হইতে ঘুমের ভিতর জলে পড়িয়া গিয়াছিল, কে জলে পড়িয়া কয়েক ঘণ্টায় শীত জমিয়া মরিল কেহ তাহার হদিস করিতে পারিবে না। অপরকে নিযুক্ত করিয়া কার্যসমাধা করিবার পরে ব্রিটিশরা স্বাবলম্বী ইহাই দাবি করিবে, যুদ্ধজয়ের বড়াই করিয়া ব্রিটিশরা বুক ফুলাইবে, তাহাদের সমরে অর্ধশত রকমের জাতি সহযোদ্ধা হিসাবে ছিল, তাহাদের নামনিশানাও রহিবে না। খোদার কুদরতে এদের মাটির তলায় কয়লাখনি রহিয়াছে, কয়লাখনির সন্নিকটেই রহিয়াছে লোহার আকরিক। এই প্রাকৃতিক কৃপার সাথে মিশিয়াছে জাতের সহজাত বলিষ্ঠতা এবং দুষ্টবুদ্ধি। সাতসমুদ্র জয় করিতে আর অধিক কী প্রয়োজন?

আমি একটি মিসরীয় কফিশপে ধোয়াধুয়ির কাজ করিতাম এবং আলুর খোসা ছুলিতাম। বাড়ি ফিরিবার পথে খোসাটুকু তুলিয়া আনিয়া কুটিয়া ভাজিয়া খাইতাম, পথে প্রায়ই ঘৃণাবিকৃত মুখের শ্বেতাঙ্গদের হাতে প্রহার জুটিত, পথে সতর্ক থাকিতে হইত। সতর্ক না থাকিলে অচল পয়সা ধরাইতেও এইখানে কাহারও জুড়ি নাই। মন খারাপ হইলে জাহাজঘাটায় আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতাম। কয়লাবোঝাই জাহাজ ভিনদেশে যাইতেছে, সওদাবোঝাই জাহাজ আরেক মুল্লুক হইতে ফিরিয়া আসিতেছে। ক্রমে শিখিলাম হেরিং ধরিবার নৌকাগুলির ছিন্ন পাল বাদামি, পার্বত্যপ্রদেশ হইতে আসা রূপবতী মেছুনিরা কেমন আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় হেরিং মাছ চিরিয়া পোঁটা-পিত্ত ফেলিয়া লবণের স্তূপে আছড়াইয়া ফেলিতেছে এবং নুনে জারানো মাছ পিপেয় ভরিতেছে।

'চ্যালা মাছে করে খেলা/ পাবদা নাড়ে দাড়ি'...

দরিদ্রতম কিশোররা টেমস নদীর এক হাঁটু বিষাক্ত কর্দমে নামিয়া বেচিবার উপযোগী ভাঙা-টুটাফাটা যেকোনো কিছু খুঁজিতেছে...

২১ পর্ব

হরেক রকম স্টিমারে হরকিসিমের লোক, পাগড়ি পরা ভারতীয়—ঝুঁটি বাঁধা চীনেম্যান—কেবল নিগ্রোরাই কোনো কারণে বর্শা এবং বাঘছালের অনুষঙ্গবর্জিত সাদাসিধা কাপড় পরিত, ইহারা সকলেই উচ্চস্বরে গালাগাল করিয়া কথা কহিত—একে অপরের সহিত তুচ্ছ কারণে মারপিট করিত, মিটমাট হইয়া গেলে উৎকট আমোদে একগলা মদ্যপান করিয়া মদ্যপের গলায় গান করিতে করিতে ঘুমাইত। লাইমহাউনে চীনা খালাসিদের আফিমখানার গল্প অনেক শুনিয়াছি, ঘুরিয়া আসিয়া ইতস্তত চীনাদের কিছু মুদিদোকান, সরাইখানা আর জুতা মেরামতের দোকান ছাড়া কিছুই দেখিলাম না। আফিমখোর সাতকড়ির কাছ হইতে কত সহস্র ক্রোশ দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, সে বাঁচিয়া আছে কি না কে বলিবে।

এ স্থলে আসিবার পূর্বে কবে ভাবিয়াছি সমাজের নিচুতলার বারবণিতাদের সহিত জলচল করিতে হইবে, জমিদারের কাছারিতে অনেক কেচ্ছা বাতাসে উড়িত, কাজীবাড়ির পুরুষরা রক্ষিতা রাখিতেন এবং দিবাভাগেও তাহাদের গলা জড়াইয়া শুইয়া বসিয়া থাকিতেন...এইসব শুনিয়াই ঘৃণায় শিহরিত হইতাম। বুড়া জাহাজিরা গল্প শুনাইত, পতিতার সহিত জলচল করিতে হইবে না—মদ্যের ঘোরে তাহারাই তোমার গলা ধরিয়া কবজা করিয়া লইয়া যাইবে—লস্করদিগকে ভুলাইয়া গলিপথে নিয়া সর্বস্ব ছিনাইয়া নিয়া মারিয়া রাখিয়া যাওয়াও ইহাদের আরেক পেশা! সেই হতভাগিনীদেরই বা দোষ কী, কাঁহাতক আর শীতের রাতে গলির বাতির আলোয় দাঁড়াইয়া চট সেলাই করা যায়। স্বল্পালোকে দেখিবে তাহাদের চোখ মদিরাভাণ্ডের মতন কূলপ্লাবী, দৃষ্টি মর্মভেদী, সৈনিক কিংবা নাবিক খদ্দের ধরিবার আশায় তাহারা স্কার্ট গুলফের উপরে একটু বেশিই তুলিয়া হাঁটিতেছে, বডিসের শক্ত বাঁধুনি হইতে উপচাইতে উদ্গত বিপুল স্তন, পাউডারের চুনকাম হনুর হাড় ঢাকিয়া ফেলিয়াছে কিন্তু অভাবতাড়িত মুখে তীক্ষ্ণ ক্ষুধা এবং বিবিধ কুরোগের ছাপ ঢাকিতে পারে নাই, তবেই চিনিবে এই স্ত্রীলোক জাতে পতিতা। কমজাতের, দরিদ্রের এবং পতিতের কেহ নাই, ঈশ্বরও নাই, তাঁহার অপার কৃপাজ্যোতিও নাই। সেইসব দিন কিছু বদলাইয়াছে, চিরকালীন নম্রভাষিণী নারী ঘরে-বাহিরে তাহার অধিকার লইয়া আওয়াজ তুলিতেছে, সেই সামান্য আওয়াজ ইংরাজ সমাজসমুদ্রে ঢেউ তুলিতেছে।

ক্রমে আমার হৃদয়ে মায়ের চারিত্রিক শিক্ষা এবং অপবিত্রের প্রতি ঘৃণা ফিকে হইয়া আসিল। একদা ভাবিতাম বারবণিতার হৃদয় পিশাচীর হৃদয়, দেখিলাম ইহারাও আল্লাহতালার সৃষ্ট নরনারী। যেকোনো স্থান হইতে অর্থসমাগমের তৃষ্ণা ইহাদের নিদারুণ বটে; এই প্রকট দারিদ্র্য, এই বচ্ছরকার অর্ধাহারপীড়া এবং এই পিতৃপরিচয়হীন রুগ্ন শিশুদের লইয়া ইহারা কোথায় যাইবে? 'মা বলিত সঙ্গতিসম্পন্ন ভদ্রলোকের স্ত্রীকুল স্বামীকে সঙ্গমেচ্ছু দেখিলে দেশরীতি অনুসারে শিরঃপীড়ায় মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে, তবেই না আমাদের গ্রাসাচ্ছাদন জুটে', বলিয়া হাসিতে ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিত হ্যানা, হ্যানার গল্প কিঞ্চিদধিক পরেই করিব। তাহার গল্প বাদ দিয়া আমার গল্প হইতে পারে না, হ্যানা এবং অকালমৃতা বেসী।

হ্যানার নানি কসাইখানা হইতে চর্বি লইয়া সাবান কারখানায় গিয়া বেচিয়া দিয়া আসিত, নিরুপায় হইয়া মাঝে মাঝে খদ্দেরের নিকট দেহ বিক্রি করিত, অর্থাভাবে নিজের দাঁতও বেচিয়া দিয়াছিল। নানি রেলে কাটা পড়িয়া মরিবার পর হ্যানা তাহার বিমাতার নিকট কিছুকাল আশ্রিত ছিল, সেই তাহাকে একদিন বেশ্যাবৃত্তিতে ঢুকাইয়া দিয়াছে। হ্যানার নাতিদীর্ঘ গড়নের শরীর, ঊর্ধ্বাঙ্গে কিঞ্চিদধিক বাহুল্য রহিয়াছে, আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া রুজ-এনামেল-ভ্রুপেন্সিল দিয়া দীর্ঘক্ষণ সে সাজিত, সামান্য গহনা পরিত। তাহার একটি কষদাঁত ভাঙামতন ছিল, মুখ ঘিরিয়া কাঠচেরাই রঙা চুলের বোঝা, যেদিন স্নান করিত সেদিন তাহার মুখের শোভা বাড়িত, স্নান সে সহসা করিত না, এই জাড়ের দেশে চুলের বোঝা ভিজানো দুষ্কর। এ দেশে লোকে দাঁতও মাজিতে চায় না, ধনিয়াপাতার ন্যায় একরকম সুগন্ধি পাতা চিবাইয়া লয়।

হ্যানা কর্মঠ স্ত্রীলোক, গৃহকর্মে তাহার পটুত্ব দেখিলে বিস্ময় মানিতে হয়, একটুখানি তন্ডুলকণাকে বাড়াইয়া সে যেমন করিয়া আহারের সংস্থান করিত তাহা দেখিলে যিশুর পাঁচ হাজার মানুষ খাওয়াইবার গল্প মনে পড়িবে। সারা দিনে তাহার তিলার্ধ ফুরসত নাই। সন্ধ্যার বিষণ্ন দীপালোকে সেলাই করিতে করিতে হ্যানার আরেকটি জাতভগিনী গলির সকলকে শুনাইয়া ইংরেজিতে জগতের সকলের বংশোদ্ধার করিত—খদ্দেরদের বিশেষ পরিচয়সূচক নামে ডাকিয়া (যেমন

একজনকে উহারা ডাকিত 'টম থাম্ব') তাহারা হাসিতে ফাটিয়া পড়িত। বেসীকে সামান্য আহার করাইয়া আমি নিজেও গৃহকর্মে লিপ্ত হইতাম, হাত সচল না থাকিলে হ্যানা নিকৃষ্ট গালি দিত, অলসতা সে সহ্য করিতে পারিত না। অর্থের সমাগম হয় না এমন অবস্থাও সে সহিতে পারিত না, দেহ বেচিতে না পারিলে উচ্চশ্রেণীর লোকের গৃহে শিশুপালনে বুকের দুধ বেচিবে, না হইলে দাঁত বেচিবে। আমি গ্রামের সন্তান—গ্রামের জীবনের মূল সুর আলস্য, সময় সেইখানে স্থবির, হতদরিদ্রের কোলাহল আর মামলা-মোকদ্দমা ব্যতীত সেই গহিন সময়-সমুদ্রে আর কোনো ঢেউ জাগিয়া উঠে না। সেই নিথর গ্রামজীবন হইতে কোথায় আসিয়া পড়িলাম, এইখানে ত্রাহিরবে সমস্ত জগতের কর্মস্রোত রক্তস্রোতের মতন নিষ্পেষিত হইয়া শহরের হৃৎপিণ্ডে আছড়াইয়া পড়িতেছে—কুটামাত্র আশ্রয় করিয়া সেই স্রোতে সওয়ার হইয়া কোথায় চলিতেছি। কে কোথা হইতে এই স্রোতে আসিয়া মিলিলাম?

রূপটান না মাখিলে হ্যানার যে স্বাভাবিক সুকুমার মুখের শ্রী, তাহাতে এক আশ্চর্য আকর্ষণ ছিল—হৃদয়ের অন্তস্তল অবধি দেখিতে পাইবার মতন স্বচ্ছতা ছিল তাহার মুখে। প্রাত্যহিক জীবনের নিদারুণ অপ্রীতির ঘটনাবলি সেই স্বচ্ছতাতে কালি ঘুলাইয়া দিতে পারে নাই, বলি ফেলিতে পারে নাই। সম্ভবত খুব সহজ করিয়া সে তাহার পেশাকে ন্যায্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, একরকমের গ্লানিহীনতা তাহাকে পরিচালনা করিত। দিবাভাগের প্রচণ্ড পরিশ্রমের ক্লান্তি পুরুষ ও নারী রাত্রির অভিসাররসে গঞ্জিকা এবং মেওয়ার রসে ডুবাইয়া দিবে ইহাই তো দস্তর। তাহার ন্যায়-অন্যায় বোধ এবং বুদ্ধিবিবেচনার কোথাও এই বৃত্তি লইয়া প্রশ্নের সঞ্চার হইত না। শুধু খদ্দের টাকা না দিয়া পলাইলে এবং মারধর করিলে সে আপন কামরায় আসিয়া কিছু সময় কাহাকেও বাপান্ত করিয়া কাঁদিত। তখন তাহার চিন্তার পরিচ্ছন্নতাও রহিত না, আঁখিঠার বা মাজা নাড়ার ঠমক রহিত না, এই ক্রন্দনধ্বনি দুঃখী স্ত্রীলোকের চিরপরিচিত ক্রন্দনধ্বনির মতোই শোনাইত।

২২ পর্ব

অক্টোবর আসিতে আসিতে সেই বৎসর প্রবল শীত পড়িল, সকাল-সন্ধ্যা মটরশুঁটির স্যুপের মতন ঘন কুয়াশায় পথঘাটের নিশানা মিলাইয়া যায়। শীত বাড়ে আর আমার মনে চৈত্র মাসের রংচঙা নীলনৃত্য আর রামযাত্রা ভাসে, যে গরম সহিতে পারিতাম না সেই গরমে পুড়িবার সাধ জাগে। রাস্তায় গিয়া যখন যাহা পাই ঝিনুক-পাঁকাল মাছ-গেঁড়ির আচার ইত্যাদি লইয়া আসি। মাসের মাঝামাঝি জো নামের এক মদ্যপ খদ্দের আসিয়া হ্যানাকে এমন প্রহার করিয়া গিয়াছে, তাহার হাতের হাড় ভাঙিয়া গিয়াছে, হাত না সারিতে সে পড়িয়াছে জ্বরে। তাহার মৃতমন্য শরীরটি টানিয়া আনিয়া আমাকেই হাসপাতালে যাইতে হইয়াছে। জ্বরের ঘোরে সে ক্রমাগত ভুল বকিত। আমি তাহার বার্লি সেদ্ধ করিতাম, শিথানে জাগিতাম, জলপট্টি দিতাম, বেসীকে আগুনে সেঁকিয়া দুধ খাওয়াইতাম। জ্বরতপ্ত রোগিণীর মন ভুলাইবার জন্য তাহাকে একদিন একছড়া বুনোফুলের মালা গাঁথিয়া আনিয়া দিয়াছিলাম, হতভাগী তাহা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। রাতব্যাপী জাগিয়া ভোরের দিকে ঘুমাইতাম, ক্ষুধিত বেসীর চিৎকারে জাগিয়া উঠিয়া আবার তাহাকে কোলে করিতাম, খেলা দিতাম।

সারিয়া উঠিবার পর হ্যানা আমাকে তাচ্ছিল্য করা পরিহার করিল। তাচ্ছিল্য দূরে থাক, একরকমের অনুরক্ত দৃষ্টিতে আমাকে দেখিতে লাগিল। স্নেহ-করুণা-মমতার মাধুর্য হইতে সে চিরনির্বাসিতা, আমি তাহার দুর্বাক্য অনায়াসে সহিয়াছি, কিন্তু এই অনুরাগের চাহনি সহিতে পারিলাম না, চাহনির তরঙ্গ আমার মেরুমজ্জা অবধি আসিয়া অভিঘাত করিতে লাগিল। মনের আনদিশায় পলাইয়া বেড়াইতে শুরু করিলাম, আমি যে বিবাহিত, আমার হিতাহিতের সহিত আরেক অবোধ কিশোরীর জীবনের লাভক্ষতি বিজড়িত, তাহার কথা, আমার চিরসতী মায়ের কথা মনে আসিবামাত্র চক্ষে বিষাদবারি দেখা দিত। কিন্তু পলাইয়া যাইব কোথায়, লীলাময়ের বিচিত্র লীলায় আরেক খেলা শুরু হইয়াছে। দুইখানি বিদ্যুৎগর্ভ মেঘের মতন আমরা সন্নিকটবর্তী হইতেছিলাম, সংঘর্ষকাল ঘনাইয়া আসিতেছে—তাহার পলল সুবাস বাতাসে ঘনাইয়া উঠিতেছিল।

আজন্ম সংস্কারবশত প্রথম স্ত্রীসঙ্গমকালে আমার চেতনার অন্ধকার জুড়িয়া এই বাণী নিকষিত হরফে জ্বলজ্বল করিতে লাগিল যে আলো জ্বালিলে এই নারীদেহে কতই না রোগলক্ষণ দেখা যাইবে, বিষবেদে যেমন করিয়া সর্পদষ্টের শরীর হইতে বিষ শুষিয়া লয়—আমিও বোধ করি সেইরূপে রোগের বিষ শরীরে লইলাম। মনে ভাবিলাম নেউল হইলে গোলাঘর হইতে সর্পদষ্ট হইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া উপশমের শিকড় চিবাইয়া আসিতাম। এই শরীর কর্মসাধনের এবং পয়োনিষ্কাশনের জানিয়া কতকাল কাটাইয়াছি, এই শরীরে হলুদবনের কলুদফুল ফুটিতে দিল হ্যানাই। বিষাক্ত হইলেও সন্দেহমাত্র নাই তাহা ফুল, মিলিত হইবার সাথে সাথে এই ফুল মূর্ছা গেল না, আবেহায়াত হইয়া আমার হৃদয়ে দুলিতে থাকিল। স্ত্রীপুরুষের রসায়ন ব্যাখ্যা করিয়া বলিবার নাই। যাহা আমার নহে এবং কোনোকালে আমার হইবে না, সেই হ্যানা এবং বেসীর সহিত আমার জীবন গ্রন্থিত হইয়া গেল। আমি স্বামী এবং পিতার কর্তব্য ও দুশ্চিন্তা করিতে লাগিলাম অথচ আমার কোনো পদাধিকার ছিল না। বেশ্যালয়ের ছায়াচ্ছন্ন কুটীরে দিনের আলোও ম্লান আভায় ডুবিয়া থাকে, সেইখানে আমি আরেক রকম পিতা এবং আরেক রকম স্বামী হইয়া জীবন শুরু করিলাম। এই বিবাহ শারীরিক বিবাহ—স্বার্থশাসিত বিবাহ—ইহার গ্লানি অপার।

হ্যানার কন্যা বেসীর পিতৃপরিচয় কেহ বলিতে পারিত না, তাহাই স্বাভাবিক। শিশুটির খোসা ছাড়ানো বাদামের মতন মসৃণ শরীর, কাঁসার কলঙ্কের মতন গায়ের রং, মায়ের নীলাঞ্জন নয়—তাহার চক্ষু মুগুরির শীতের মাঠে জ্বাল দেওয়া গুড়ের ন্যায় খয়েরি, চুলগুলি কুঞ্চিত এবং তাহার বর্ণ স্পেনীয় মেহগনি কাঠের ন্যায়, কাহার রক্ত কোথায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে! মায়ের অনাদরে নির্বিবাদে ঘাসফুলের ন্যায় সতেজ হইয়া ফুটিয়া আছে এই আলুফা শিশু, তাহাকে দেখিবামাত্র আমার হৃদয় আকুল হইত। কোনো খদ্দের আসা-যাওয়ার পথে তাহাকে চপেটাঘাত করিলে রাগে অন্ধ হইয়া যাইতাম। আমি তাহাকে কোলে করিয়া পাগলের মতন আদর করিতাম আর সে খিলখিল করিয়া হাসিত, মায়ের আড়ালে আমি তাহাকে 'রত্তি' ডাকিতাম, ঐ তো একরত্তি শিশু, সোনায় ওজন করিলে তুল্যমূল্য মিলিবে, তাই 'রত্তি'। ঘরে কেহ না থাকিলে তাহাকে হাঁটুতে দোলাইয়া কত গাহিয়াছি—'ঘুঘু সই/ তোর থান কই/ শিমুলগাছে/ গাছ কই/ ছুতারে নিছে/ ছুতার কই/ পিঁড়ি চাছে'...ইহপৃথিবীতে মাতৃস্নেহের বহু জয়গান শুনিয়াছি, পিতার স্নেহ নিয়া কেহ ঢাকে কাঠি দেয় না আর আমি পিতাও নহি। আমার এই সন্তানস্নেহের স্বরূপ বড়জোর লোকে আত্মীয়ের প্রতি মমতা হিসাবে চালাইবে, অথচ আমার আল্লাহ জানেন, ইহা তাহার তুলনায় শক্তিমন্ত। সন্তানের উমর-দরাজ না হইলে পিতামাতাকে তাহা কেমন করিয়া বাজে, টের পাইয়াছিলাম বেসীর মৃত্যুতে। তাহার ঔষধ-পথ্য খরিদ করিতে এমনকি লস্করদের আস্তানায় ভিখ মাঙিতেও গিয়াছিলাম, এককালের পরিচিত মোছলমান ভ্রাতারা আমাকে

দেখিয়া ভ্রু-বেহেশতমুখী করিয়া সরিয়া গিয়াছিল, গেরস্থঘরের সম্মান লুটাইয়া বেশ্যাসংসর্গ করিয়াছি বলিয়া দু'কথা শুনাইয়াছিল। লোকমান তত দিনে টটেনহ্যামে এক আইরিশ মহিলাকে বিবাহ করিয়া সংসার পাতিয়াছে, সে থাকিলে আমার চিন্তা ছিল না। খুদাবক্স নামের এক পূর্বপরিচিত লোক ছিল, সে ঝুড়ি বুনিয়া রোজগার করিত, সেই খুদাবক্স আমাকে তিন শিলিং ধার দিয়াছিল আমার মনে আছে।

ঘরে শস্যের দানা সিদ্ধ করিয়া কখনো খাইয়াছি, কাবাবচিনিগুঁড়া দিয়া খয়েরি করিয়া ইহারা একপ্রকার চাউলের জাউ খায়, আহার জুটিয়াছে তাহাই ভাগ্য মানিবার কথা অথচ মনে জাগিয়াছে দেবভোগ্য চাউলের ঘ্রাণ। যে উঠানে আমার পিতা মাটি কোপাইতেন, তাহার চারিধার দিয়া লাউ-কুমড়ের লতার বিস্তার, গাছের বেগুনের তরকারির কী স্বাদ। ঘরে কিছু না থাকিলেও গাছের কুমড়া-শিম-থোড় কিছু তো মিলিত। সেইসব ভাবিয়া মন সকরুণ হইয়া আসিত। রাতের মেঘমলিন আসমানের জুলমত খোলাসা না হইতে শয়নঘরের মূত্রবোঝাই পাত্রখানা পাছদুয়ারের নালা অবধি টানিয়া আনিতে আনিতে মনে জাগিত কারা যেন একত্রে ভাদরখ্যাপার কূলে গাহিয়া উঠিতেছে 'উঠো উঠো সুয্যিঠাকুর ঝিকিমিকি দিয়া'।

২৩ পর্ব

অসত্য বলিব না, বেদনায় আত্মহারা হইয়া কদাচ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতাম, তাহা কেবলি চারিদেয়ালে প্রতিধ্বনিত হইয়া আপন উৎসের নিকট ফিরিয়া আসিত। সমাজের সর্বনিম্ন পঙ্ক্তির কালিমালিপ্ত নারীসংসর্গ করিতেছি ভাবিলে ঘৃণায় হৃদয় দীর্ঘদিন কণ্টকিত হইত। এই নারী, এই কন্যাই আমার ইহকালের সংসর্গ, আমার আখের-অন্তিমের বান্ধব? বেসী যখন বাঁচিয়া ছিল, তখন একদিন বুকে বল আনিয়া হ্যানাকে বলিলাম, এহেন ইতর জীবন যাপন না করিয়া আমরা দুইজন সংসার করিয়া আর দশজন সংসারী মানুষের ন্যায় খাটিয়া জীবন কাটাই না কেন—লস্কর আর চীনাম্যানদের জন্য একটি সরাইখানা দিব, দস্তুর মতন সংসারও হইল, উপার্জনও হইল, কালিমাও মাখিতে হইল না। শুনিয়া হ্যানা এমন করিয়া হাসিয়া উঠিল যে পরবর্তীতে এই কথা আর তাহার কাছে তুলিতে মন সায় দিল না। কঠিন কায়িক পরিশ্রমে ধীরে ধীরে এইসব ভাবালুতার রস শুকাইয়া গেল। হ্যানা অবেলায় বসিয়া যখন খুশহালের স্বপ্ন দেখিত, আমিও তাহাতে যোগ দিতে লাগিলাম, এই দুঃখের দিন ক্লেশের দিন রহিবে না, খোদার ইচ্ছায় শুভদিন আসিবে—সেই শুভদিন আমাদের হইবে। আদিম পুরুষ এবং তাহার পার্শ্বে আদি নারী প্রাত্যহিকতার চলমান ইতিহাসে সশরীর জাগিয়া থাকিল।

বেসীর মৃত্যুতে সব বদলাইয়া গেল। সন্তানশোকে হ্যানা তিলার্ধ সময় বরাদ্দ করিল না। কর্মের সেই আশ্চর্য প্রণোদনা আমার নিকট বড় অসহনীয় এবং প্রায় অশ্লীল ঠেকিল। আমি কোথাকার কে, একটি ফুলের মতন শিশুকে আজিও জনবিরলে চোখের জলে ভাসিয়া 'ঘুঘুর সই' খেলিয়া সোনার ঘাটে না রুপার ঘাটে উপুড় করিয়া ফেলিতেছি আর তাহার জননী দিন না ফুরাইতেই রুটি-মাখনের চিন্তায় অধীর হইয়া উঠিতেছে। আমার বেদনা দেখিয়া সে আমাকে কষিয়া গালি দিল এবং একাধিক দিন কাজে যাই নাই বলিয়া অভিসম্পাত করিল। আমিও চিৎকার করিয়া জবাব করিলাম, চিরনিশ্চুপ হইবার আগে পশুর যে চিৎকার। আমি পূর্বদেশীয় হাঁদা লোক, আমার দুনিয়ায় ব্যথা কোনোদিন চলিয়া যায় না। কুমোরের হাতের একটি আঙুলের মতন জীবনের মাটির তালখানা ছুঁইয়া থাকে, সেই-ই জীবনকে আকার দেয়। গালিগালাজ শুনিতে শুনিতে আমি সাদা চোখে হ্যানাকে দেখিলাম। বলিহীন-কালিহীন হইলে কী হইবে, এই তো পতিতার চেহারা, উল্লেখের অযোগ্য নারীর চেহারা। হ্যানা বলিত, এ দেশের লোকে বিশ্বাস করে উত্তরের বাতাস বহিবার কালে সঙ্গম করিলে সন্তান বলিষ্ঠ হইবে, কিন্তু পূবালী বাতাস বহিবার দিনগুলিতে তাহা হইলে পুরুষলোক কী করিবে? পশ্চিম হইতে বাতাস বহিলে? দখিনা বাতাসের বাসন্তী দিনে? সেই অনুকূল পবনে তাহারা বেশ্যাগারে ভাসিয়া আসিবে। উজ্জ্বল আলোকসভায় কিংবা নিষ্প্রভ চর্বির মোমবাতির আলোকে যদি স্ত্রীদেহের অনন্ত শোভা দেখিতে ইচ্ছা হয়, তাহারা কোথায় যাইবে? বেশ্যালয়ে আসিবে। এমন যাহার সরল বিশ্বাস, তাহার সহিত বাকি জীবন গ্রন্থিত হইয়া থাকিলে নিচুতলায়ই রহিয়া পচিতে হইবে, সন্তান জন্মিবে—যে সন্তানের আইট্যালমাটির লেপ দেওয়া কালো মুখ আর একমাথা কালো কেশ দেখিয়া এই দেশের স্থানীয়রা চুকচুক শব্দ করিয়া শোক করিবে। সন্তান মরিবে, তাহার বিদেহী আত্মার প্রতি শোক করিবার সম্মানটুকু মাতা দিবে না। আপনার বিভ্রম ঊর্ণাজালের মতন পাতিয়া তাহাকেই সংসার ভাবিয়া বসিয়া আছি, তাহার চতুর্দিকে স্নেহ-মায়া-করুণার লতা চড়াইয়া দিয়াছি। প্রমাদ ছাড়া এইখানে আর কী আছে? গভীর বৈরাগ্যে মন ভরিয়া উঠিল। বাড়ি হইতে বাহির হইলাম, কিন্তু মনে জানিলাম এই যাওয়াই শেষ যাওয়া। আমি আর ফিরিব না।

পথে পথে কত লোকে কত কী খাদ্য ফিরি করিয়া ফিরিতেছে, ভেড়ার পায়া, আলুসেদ্ধ, সর্দিগর্মির চোষ্য ঔষধ—পিপারমেন্ট। একধারে পুরাতন বইয়ের স্তূপ, তাহার পাশেই কেহ শিশিবোতল নিয়া কেহ রুপার চামচ, বাটি, মোমদানি নিয়া, কেহ তালাচাবি নিয়া বসিয়া গিয়াছে। শহরের পথে পথে সিগারেটের শেষাংশটুকুও লোকে তুলিয়া কোথাও লইয়া জমা করিতেছে। এই পথ দিয়া আরও কত শহরে যাইব। ম্যানচেস্টারে কিংবা ল্যাঙ্কাশায়ারে গিয়া সুতার কলে কাজ করিব। যেথায় যাহা পরোয়ারদেগার জুটাইবেন, তাহাই ভাগ্য ভাবিয়া লইব।

ভাবিতে ভাবিতে মনবলাকা মানস সরোবরের দিকে ধাবিত হইল, ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইলে একদিন ভারতগামী জাহাজে আবার চড়িয়া বসিব, হাড়ভাঙা পরিশ্রম করিব, মা বারে বারে বলিতেন 'ঈশ্বরের মহিমা অপার', আমার দেশে অবশ্য আমার স্থান সংকুলান হইবে। কাহারও অত্যাচারের ভয়ে আর পলাইব না। আশ্চর্য এই, দেশে ফিরিবার কথায় আমার মমতাময়ী মায়ের কথা মনে হইল না, রোগশয্যায় ফেলিয়া আসা নানির কুশলযাচ্ঞা করিলাম না, সামান্য সময়ের পরিণীতা স্ত্রী নসিবা খাতুনের কথাও মনে পড়িল না। ইয়াদ হইল, আজ হইতে কতকাল পর সেই নদীতীরের কুটীরের উঠানে গিয়া বসিব? খড় পচিয়া-ভিটিমাটি ধুইয়া গিয়া সেই ঘরের নিশ্চয়ই আর চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট নাই, নদী কি শুকাইয়া পিছাইয়া গিয়াছে? করুণাসিন্ধুবাবুর পিনিসখানা আছে সেই নদীতে? আজলগাছে ছাতারে পাখি চিৎকার করিবে। ভাঁটের ফুল ফুটিয়া একটুখানি ঝোপমতন জায়গা আলো হইয়া আছে নিশ্চয়ই। ভাঙিতে ভাঙিতে নদী কতখানি আগাইয়া আসিয়াছে? কবেকার সেই ঘরের ভিটি। কবেকার রাখাল আর ঢোলগোবিন্দ। কে কোথায় চলিয়া গিয়াছে? কোথা কোথা দিয়া চলিয়া গিয়াছে অমল বাল্য, কোথায় টানিয়া আনিয়াছে নটিনী যৌবন। সকলি জাগর-স্বপ্নের মতন বোধ হইতে থাকিবে একসময়। কবেকার একটি পুরাতন চিহ্ন দেখিবার আশায় সেই মাটিতে বসিয়া রহিব। সূর্য গরম হইয়া উঠিবে। গাছগুলির ছায়া হ্রস্ব হইয়া আসিবে। কাহারও সহিত সাক্ষাত হইবে না, কাহাকেও খুঁজিবার নাই এইসব জানিয়াও বসিয়া রহিব। উঠিবার তাড়াবোধ করিব না। রাজারা জন্মভূমিকে বলিতেন 'জনক-ভূ', এই অকরুণ ধরণীতে আমরা তাহাকে বলি মাতৃভূমি।

গল্প



সচিত্রকরণ : আবুল বারক আলভী

আসিফ নজরুল

ইন্টারভিউ

সিলায়নের চুল নেই। কিন্তু বড় বড় গোঁফ আছে। শুধু এটুকু মিল থাকার জন্য কোনো মানুষকে সি-লায়ন মনে করার কারণ নেই। কিন্তু লোকটাকে দেখে আমার তা-ই মনে হয়। সি-লায়নের রঙের একটা কোটও পরে আছে সে। সমুদ্র থেকে উঠে আসার পর সি-লায়নের মুখ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় পানি পড়তে থাকে। তার মুখেও বড় বড় ঘামের ফোঁটা। সে তা একবারও মোছার চেষ্টা করে না।

সি-লায়ন সম্পর্কে আমার জানার কথা না। কিন্তু অনেক দিন ধরে আমি বিসিএসের জন্য পড়ছি। আমার অভ্যাস খারাপ। পড়তে পড়তে যা ভালো লাগে তাই পড়া শুরু করি। কয়েক দিন আগেই পড়েছি সি-লায়ন নিয়ে। স্টেলার নামের সি-লায়নের ওজন হয় এক হাজার কেজি। এদের চাচাতো ভাই ওয়ালরাস নামের একটা দাঁতালো প্রাণী। তার ওজন হয় দুই হাজার কেজি। আমার ঠিক সামনে যে, তার ওজন অবশ্য এক

শ কেজির বেশি হবে না।

সে চোখ পিটপিট করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমারও চোখ পিটপিট করার অভ্যাস আছে। কিন্তু এখন এটা করা যাবে না। জোর করে চোখের পাতা খোলা রাখি। সে ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করে। বলে, আর্কিমিডিসের বাবার নাম কী?

আমার মৌখিক পরীক্ষা হচ্ছে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চার নম্বর বোর্ডে। আমার জন্মসংখ্যা তিন। কাজেই চার আমার জন্য কুফা নম্বর। না হলে রুমে ঢোকার সাথে সাথে বকা খেতাম না। বকা খেয়েছি রুমে ঢুকেই বসে পড়ার জন্য। অথচ আগের বিসিএসে বসার অনুমতি চেয়েছিলাম বলে বকা খেয়েছিলাম। এক পণ্ডিত ব্যঙ্গ করে বলেছিল, বি স্মার্ট! এটা তোমার জন্যই রাখা চেয়ার।

এবার আমি স্মার্ট হতে গিয়ে ধরা খেয়েছি। কেন যেন পরীক্ষকেরা প্রথম থেকে রেগে আছে আমার ওপর। বোর্ডে আছে পাঁচজন। এখন প্রশ্ন করছে মাত্র দুজন। একজন বসে বসে ঝিমোচ্ছে। বাকি দুজন অনর্গল গল্প করছে। গল্পের বিষয় আইপিএল ক্রিকেট। ধোনি নাকি বিরাট কোহলি—কে ভালো ক্রিকেটার তা নিয়ে তর্কও হচ্ছে সরকারি কর্ম কমিশনের এই দুই পরীক্ষকের মধ্যে।

আমি মন দিয়ে তা-ই শুনছিলাম। এসবের মধ্যে হঠাৎ আর্কিমিডিসের বাবা কীভাবে এল বুঝতে পারি না। আর্কিমিডিস বিরাট বড় বৈজ্ঞানিক। লোহা কীভাবে ভাসবে, এটা আবিষ্কার করে সে গোসল করার সময় ন্যাংটা অবস্থায়। সে অবস্থায় সে ইউরেকা ইউরেকা বলে রাস্তায় ছুটে গেছে। কাজেই আর্কিমিডিসকে নিয়ে প্রশ্ন হতে পারে। কিন্তু আর্কিমিডিসের বাবাকে নিয়ে কেন? আমার নিজের বাবার নাম জানতে চাইলেও এতটা অবাক হতাম না আমি।

সি-লায়নকে ভালো করে দেখি। আসলেই সে এই প্রশ্নটা করেছে। সে আবারও চোখ পিটপিট করে বলে, বাবার নাম?

আবদুস সামাদ।

আর্কিমিডিসের বাবার নাম আবদুস সামাদ?

জি না। আমার বাবার নাম।

সি-লায়ন চড়া গলায় বলে, আমি আর্কিমিডিসের বাবার নাম জানতে চেয়েছি।

আমি আর উত্তর দিই না। উত্তর জানলে তো দেব। বিসিএসে আমি চেয়েছি অ্যাডমিন ক্যাডার। আর্কিমিডিসের বাবার সঙ্গে জনপ্রশাসনের কী সম্পর্ক!

প্রকাণ্ড একটা টেবিলের মাঝখানে আমাকে বসানো হয়েছে। আমার চারপাশে এখন শিকারিদের মতো চোখ করে তাকিয়ে আছে ভাইভা নিতে আসা পণ্ডিতবৃন্দ। আর্কিমিডিসকে নিয়ে কথাবার্তা পছন্দ হয়েছে তাদের। আমি এখন কিছু বললেই খপ করে ধরবে তারা। সে সুযোগ না দিয়ে আমি নীরব থাকি।

বোর্ডে একজন মাত্র মহিলা আছে। সে আমাকে নীরব থাকতে দেয় না। শান্ত গলায় বলে, লুলুসিএফ মানে কী?

জি!

এলইউএলইউসিএফ। এটার মানে কী?

এলইউএলইউসিএফ মানেই তো লুলুসিএফ। আমি তাই বলি।

মহিলা পণ্ডিত এবার বিরক্ত গলায় বলে, আমি লুলুসিএফ মানে কী সেটাই তো জানতে চাচ্ছি!

লুলুসিএফ! এটা কি কোনো ভাইরাসের নাম? নাকি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর? আমি ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র। আমাকে এমন অদ্ভুত প্রশ্ন করার মানে কী?

মোটা ঘাড়ের মহিলার প্রশ্নে নীরব হয়ে গেছে ইন্টারভিউ বোর্ড। আমার কেন যেন মনে হয় এরা কেউ জানে না উত্তরটা। জানে শুধু মোটা মহিলা। সে বিপুল উৎসাহ নিয়ে বলে, লুলুসিএফ মানে হচ্ছে ল্যান্ড ইউজ, ল্যান্ড ইউজ চেঞ্জ অ্যান্ড ফরেস্ট্রি। এটা কিয়োটো প্রটোকলের একটা মেকানিজম। কিয়োটো প্রটোকল কী তা সে সবিস্তার বর্ণনা করতে থাকে। বর্ণনা করতে করতে হাঁপিয়ে ওঠে। একবার পানি খায়। পানি খাওয়া শেষ হলে মুখ হাঁ করে ওপরের দিকে তাকায়। বলে, এসি নষ্ট নাকি স্যার?

স্যার মানে সি-লায়ন। সে মন দিয়ে শুনছিল লুলুসিএফের বিষয়। মহিলার কথা শুনে সে এসির রিমোট নিয়ে টেপাটেপি করে কয়েকবার। বিরক্ত গলায় বলে, কী সব চায়নিজ এসি বানায় আজকাল।

এটা বলে সে রিমোট ছুড়ে মারে টেবিলে। তা প্রায় আমার বুকের কাছে এসে থামে। সে প্রচণ্ড রেগে বলে, কিচ্ছু জানে না এরা।

এরা মানে কে! এরা মানে কি চায়নিজরা? নাকি আমি? আমিই বোধ হয়। না হলে আমার দিকে এমন আগুন চোখে তাকিয়ে আছে কেন?

যা বোঝার বুঝে যাই। এবারও হবে না বিসিএসে। এমনিতেই লিখিত পরীক্ষায় নিচের দিকে আমার নাম। ভাইভায় কিছু না পারলে এবারও চাকরি হবে না।

অথচ আমি কিছুই পারি না তা ঠিক নয়। এমনকি কিয়োটো প্রটোকলও জানি আমি। আর্কিমিডিসের বাবার কথা চিন্তা করতে গিয়ে সব তালগোল পাকিয়ে গেছে। না হলে শুধু কিয়োটো কেন, প্যারিস অ্যাগ্রিমেন্ট নিয়েও কত কিছু বলতে পারতাম। আইএনডিসি মানে ইনটেনডেড ন্যাশনালি ডিটারমাইন্ড কন্ট্রিবিউশন। আইএনডিসিও পড়ে এসেছি আমি।

সি-লায়নের লোকজন বিড়বিড় করছে। বিড়বিড় শব্দগুলোর মানে হচ্ছে আমার কোনো আশা নেই আর। এখন আমি গেলেই খুশি ওরা। কাজেই এত ভীতু হয়ে থাকার মানে হয় না আর।

> আমার চারপাশে এখন শিকারিদের মতো চোখ করে তাকিয়ে আছে ভাইভা নিতে আসা পণ্ডিতবৃন্দ

আমি মোটা মহিলাকে বলি, ম্যাডাম আমি আইএনডিসি জানি।

তিনি অবাক হয়ে বলেন, আইএনডিসি কী?

আমি খুশি হই মনে মনে। তার মানে জানে না সে। গুড। আমি সি-লায়নের দিকে তাকিয়ে বলি, স্যার আমি আর্কিমিডিসের মায়ের নাম জানি।

মানে?

আর্কিমিডিসের মায়ের নাম অলিম্পিয়কস্।

আর্কিমিডিসের মায়ের নাম দিয়ে আমি কী করব?

তাহলে বাবার নাম দিয়ে আমি কী করব?

মানে কী? এই ছেলে, হোয়াট ডু ইউ মিন?

কিছু না। আসি স্যার।

আসি মানে? তোমার ভাইভা তো শেষ হয়নি।

আমি মুচকি হাসি। হয়েছে স্যার, হয়েছে।

বাইরে শরতের আকাশ। সাদা সাদা মেঘফুল মাথার ওপর। আমি সেই ফুলের দিকে তাকিয়ে বুক ভরে নিশ্বাস

নিই। তার ছায়া খুঁজি ভিআইপি সড়কে। সেখানে শুধুই ঝলসে দেওয়া গাড়ির ছাদ।

ক্যান্টনমেন্টের কাছে এই জায়গাটায় রিকশা চলে না। সিএনজিও থামে না। আমি ক্রিসেন্ট লেকের দিকে হাঁটা ধরি। মোবাইল ফোন অন করে দেখি আটটা মিসকল। আটটাই শর্মিলার। অন্য কারও অবশ্য ফোন করার কথা না। আজকে যে চাকরির ইন্টারভিউ, এটা বলিনি কাউকে। কতবার বলা যায় এসব।

আমার ফোন বাজছে আবার। ফোন সামনে ধরে অবাক হয়ে যাই আমি। অচেনা নাম্বার। কেটে দিই। আবার ফোন! আমি ধমকের সুরে বলি, কে?

আমি। তুমি কই সোনা? কেমন হলো ভাইভা।

শর্মি, কার ফোন এটা?

এই যে একটা আপুর ফোন থেকে করলাম। তুমি আসো তাড়াতাড়ি।

তোমার ফোন কই?

চার্জ শেষ। তোমার পরীক্ষা?

পরীক্ষা! খুব ভালো। খুবই।

সত্যি! সত্যি শব্দটা লম্বা টানে উচ্চারণ করে শর্মি। হেসে দিই আমি। সে বলে, বুঝছি আমি। আসো তাড়াতাড়ি।

২.

ক্রিসেন্ট লেকে শর্মি কোথায় থাকবে জানি আমি। ওর কাছে যেতে যেতে তিনটা সিগারেট খাই। শর্মি জানলে রাগ করবে। সিগারেট খাওয়া পছন্দ করে না সে। তার ভাই থাকে দুবাইয়ে। সিগারেট যেন ছেড়ে দিই, এ জন্য সে দুবাই থেকে ইলেকট্রিক সিগারেট আনিয়েছে। সেই সিগারেট গাঁজাখোরের মতো জোরে জোরে টানতে হয়। তারপর তার পশ্চাদ্দেশ থেকে অতিসামান্য একটা পচা গন্ধের মতো কিছু বের হয়। আমি শর্মির সামনে মুখ কুঁচকে তা-ই টেনেছিলাম কয়েক দিন।

সে অন্তর্যামী টাইপের একটা মেয়ে। নিজেই একদিন ইলেকট্রিক সিগারেট ফেলে দিয়েছে ক্রিসেন্ট লেকে। আমাকে শুধু বলেছে কম খেতে। কম খাওয়ার চেষ্টা করতে। কিন্তু কম কেন খেতে হবে, তা বুঝতে পারি না। সিগারেট খেলে খারাপ অসুখ হয়, মানুষ তাড়াতাড়ি মরে যায়। তাড়াতাড়ি মরে গেলে অসুবিধাটা কী?

অসুবিধা একটাই। শর্মি তাড়াতাড়ি বিধবা হয়ে যাবে। সেটাও হবে যদি সত্যি তার সাথে বিয়ে হয় আমার কোনো দিন।

শর্মি ইন্টারভিউ বৃত্তান্ত শুনে হাসে অনেকক্ষণ। ক্রিসেন্ট লেকের পাড় ধরে হেঁটে হেঁটে আমরা এসেছি আসাদগেট আড়ংয়ে। আড়ংয়ের ক্যানটিনের বেসন দিয়ে চিংড়ি ভাজা খুব প্রিয় আমার। শর্মিরও। সে দুপ্লেট প্রন অর্ডার দিয়ে বলে, কিন্তু অলিম্পিয়কস্ নামটা তুমি জানলে কীভাবে?

জানব না কেন! এটা তো গ্রিসের ফুটবল টিম।

কীই ই! অলিম্পিয়কস্ আসলে মা না? শর্মির হাসি থামেই না। ফুটবল টিম আর্কিমিডিসের মা। তুমি পারোও।

শর্মি মায়াময় চেহারার একটা মেয়ে। হাসলে তাকে আরও মায়াময় মনে হয়। তার চোখ চিকচিক করে ওঠে, মুখে মায়াজল টলমল করতে থাকে, পুরো শরীর দুলতে থাকে। তার হাসির শব্দটাও খুব সুন্দর। শর্মি জানে না ওকে হাসানোর জন্য কত রকম চেষ্টা করি আমি।

শর্মি আমার ঘোর লাগা চোখ দেখে থামে। কী হলো তোমার?

কিছু না।

কিছু না মানে? কোথাও হারিয়ে যাও তুমি হঠাৎ?

তোমার ভেতরে।

ধুত। শর্মি তার ওড়না ঠিক করে। আজকে সে আকাশ-নীল কামিজ পরেছে, তার মধ্যে বহু রঙের কারুকাজ। তাকে সবচেয়ে সুন্দর লাগে



রাধাচূড়ার মতো হলদে রঙে। আড়ংয়ের ক্যানটিনে ঢোকার আগে কাপড় দেখছিলাম আমরা। সেখানে রাধাচূড়া রঙের জমিনে গোলাপি একটা কামিজ দেখে কেনার খুব ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু দাম দেখে সরে যাই। শর্মি আমার দিকে তাকিয়ে হেসেছিল। হাসলেও কিছু করার নেই। দুই হাজার টাকা কেন, এক হাজার টাকাও নেই আমার কাছে। কখনোই থাকে না।

শর্মি তর্জনী ছোঁয়ায় আমার নাকে। এ্যাই, কী হয়েছে?

কিছু না। চাকরি নিয়ে চিন্তা হয়।

কেন, চাকরি না হলে অসুবিধা কী?

আমি হাসি। অসুবিধা নাই। যত দিন তুমি আছো, অসুবিধা নাই।

আমি তো আছিই।

শর্মি গাঢ় চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। শুধু ওর চোখ দুটো যদি আমার জগৎ হতো, তাহলে চাকরির দরকার থাকত না। কিন্তু সেই চোখে কতক্ষণ আর তাকিয়ে থাকতে পারি আমি।

খাওয়ার পর শর্মি হঠাৎ একটা কাণ্ড করে। তিনটা এক হাজার টাকার নোট বের করে। বলে, ধরো, তোমার পুরস্কার।

কিসের?

আর্কিমিডিসের মায়ের নাম বলার।

শর্মি টেবিলের ওপর ঝট করে তিনটে নোট রাখে। তারপর আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে এক দুর্দান্ত মোচড়ে কাউন্টারের কাছে পৌছায়।

এমন না যে শর্মি আমাকে টাকা দেয়নি আগে। তাই বলে এত টাকা! আমি তাকে কিছু বলার সুযোগও পাই না। সুযোগ পেলেও লাভ হবে না কোনো।

সে এখন তন্ময় হয়ে বিছানার চাদর দেখছে। আমি ঘুরতে ঘুরতে কামিজ রাখার জায়গাটায় যাই। যখন আমার চাকরি হবে আমি শর্মিকে একসাথে পাঁচটা সালোয়ার-কামিজ কিনে দেব। পাঁচটা না, প্রথম মাসের টাকা দিয়ে যতগুলো পাওয়া যায় সবগুলো। কিন্তু আমার চাকরি কি হবে কোনো দিন? কোনো দিন না।

টের পাই না কখন রাধাচূড়া রং কামিজের কাছে এসে দাঁড়িয়েছি। হাত বুলিয়ে দেখি তা। এত মোলায়েম! শুধু শর্মিকেই মানায় এটা।

এই কামিজটা কিনতে পারি আমি এখন। এটার দাম দুই হাজার দুই শত টাকা। এক হাজার টাকার তিনটা নোট আছে আমার কাছে এখন।

শর্মি নুয়ে নুয়ে চাদর দেখছে। একটু দূরে সরে আবার কাছে আসছে। কী একটা কথায় হেসেও উঠছে। এত হাসতে পারে মেয়েটা!

আমার দিকে একবারও তাকায় না সে। আমি যে আছি এটাই যেন মনে নাই তার। একা একা কামিজটা হাতে নিয়ে বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকি। এটা কিনতেই সে আমাকে টাকাটা দিয়েছে।

এতক্ষণ লাগল এটা বুঝতে আমার!

৩.

চাকরি একটা দরকার আমার। আমার হলে থাকতে সমস্যা হচ্ছে। মাস্টার্স পরীক্ষার রেজাল্ট হওয়ার সাথে সাথে হল থেকে চলে যাওয়ার নিয়ম আছে। এই নিয়ম মানতে হয় না সবার। কিন্তু আমি তাদের মতো না। কোনো ছাত্রনেতার হাতে-পায়ে ধরে আমি হলে থাকতে রাজি না। সায়েম আমাকে বলেছিল সরকারি ছাত্রসংগঠনে ঢুকে যেতে। হলে সিট পাওয়ার জন্য, হলে থাকার জন্য সবাই করে এটা। আমিও একসময় করেছি এসব। কিন্তু এখন আর রুচি হয় না।

> শর্মি নুয়ে নুয়ে চাদর দেখছে। একটু দূরে সরে আবার কাছে আসছে। কী একটা কথায় হেসেও উঠছে।

আমার রুমে দুজনের থাকার কথা। দুজনই ছিলাম। কিন্তু হলের নেতা মাসখানেক হলো আরও দুজনকে তুলে দিয়েছে। সেই দুজনের একজনের কাজিনও এসে থাকে মাঝে মাঝে রাতে। তিনজন একসঙ্গে হইহুল্লোড় করে তাস খেলে, এনার্জি ড্রিংক খায়। মাত্র ফার্স্ট ইয়ারে পড়া ছেলে এরা। আমাকে একদিন বলে, ভাইজান খেলবেন নাকি?

ইচ্ছে হচ্ছিল চড় দিয়ে কান ফাটিয়ে দিই। কিন্তু আমি কিছু বলিনি এদের। বলে কী হবে? রাতবিরাতে মিছিল করে ফেরে এরা। মিছিলে গেলে, স্লোগান দিলে এমনিই গা গরম হয়ে থাকে। আমাদেরও থাকত। তাই বলে সিনিয়রদের আমরা 'ভাইজান তাস খেলবেন নাকি' বলে বসতাম না। এরা বলছে। আমার রেজাল্ট শেষ হলে হয়তো এদের সাথে তাসই খেলতে হবে। রাতবিরেতে মিছিলে যেতে হবে। কোনো কোনো রাতে নাকি মাঠে জড়ো করিয়ে নেতার ভাষণ শোনানো হয়। তারপর সেই ভাষণের ওপর আলোচনাও হয়।

এসব আমার পক্ষে সম্ভব না। রেজাল্ট বের হলেই হল ছেড়ে দেব আমি। বকশীবাজারের দিকে কিছু মেস আছে। সেখানেই উঠব। সেখানে থাকতে হলেও টাকা লাগবে। এই টাকা কি বাবার কাছে চাওয়া সম্ভব? সম্ভব না।

চোর বংশের বড়লোক বন্ধু আছে একজন আমার। পুরো চারটা বছর সে আমার কাছেই পড়া বুঝেছে। আমাকে চাকরি দিতে চেয়েছিল তার বাবার রিয়েল এস্টেট ফার্মে। আমি খুশি মনে তাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম শর্মির সঙ্গে। কিন্তু সে শর্মির দিকে খুব খারাপভাবে তাকিয়েছিল। শুধু তাই না। শর্মির সামনেই উচ্ছল চিৎকার করে উঠেছিল, ওয়াও! ইউ গট এ জুসি গার্লফ্রেন্ড!

সে হয়তো আশা করেছিল খুশি হব আমি। কিন্তু আমার ভালো লাগেনি কথাটা। মানুষ কি আম-কাঁঠাল নাকি যে জুসি হবে!

আমি তাকে বলি, জুসি কী রে গর্দভ।

সাদমানকে কোনো দিন এভাবে ডাকিনি আগে। সে গর্দভ শুনে একটু ভ্যাবাচেকা খায়, বলে, কে গর্দভ?

তুই।

আমি গর্দভ?

হ্যাঁ। মাথায় গুওলা গর্দভ।

সাদমান এরপর থেকে আমার সঙ্গে কথা বলে না ঠিকমতো। আমিও বলি না। তার কাছে চাকরি চাওয়ার প্রশ্নই আসে না।

চাকরির চেষ্টা তাই বলে কম করিনি আমি। বিসিএস ছাড়াও বিভিন্ন নন-ক্যাডার চাকরির আবেদন করেছি, বড়-ছোট কোম্পানিতে করেছি। এমনকি একবার একটা কলেজে পর্যন্ত চেষ্টা করেছি। ইন্টারভিউ পর্যন্ত যেতে পেরেছি মাঝে মাঝে। কিন্তু সেখানে এমন সব অদ্ভুত প্রশ্ন করে তারা আমাকে! একবার একজন বলে, তোমার বাবার নাম আবদুস সামাদ। তোমার নাম রাজীব আহমেদ কেন? আমি কলেজের আগে পড়েছি সোনাকান্দা স্কুলে। এক চাকরির ইন্টারভিউতে এ নিয়ে কী হাসাহাসি তাদের। একজন বলে, সোনাকান্দা মানে কী মিঁয়া?

মিঁয়া শুনেই কি না জানি না, মাথায়

রক্ত চড়ে গিয়েছিল আমার। বলি, সোনাকান্দা মানে সোনার কান্দা, সোনার কান্না!

সোনা আবার কাঁদে নাকি।

কোনো কোনো সোনা কান্দে স্যার।

বলে কি বেয়াদব!

আমি মনে মনে বলি, তুই বেয়াদব।

সে বলে, ইতর কোথাকার।

আমি এবার স্পষ্ট উচ্চারণে বলি, তুই ইতর! ইতরের বাচ্চা ইতর।

শর্মি খুব খুশি হয়েছিল আমি এটা বলতে পারায়। ওর জন্যই হয়তো ব্যাপারটা নেশার মতো হয়ে যায় একসময়। চাকরির ইন্টারভিউতে যাই। আমার সাথে উল্টাপাল্টা করলে আমিও ডাবল উত্তর দিয়ে দিই। শর্মির কাছে এসে গল্প করি। সে হেসে কুটিকুটি হয়। সাবাস বলে পিঠেও চাপড়ায় মাঝে মাঝে।

কিন্তু এভাবে আর কত দিন! শর্মি আমাকে বাসায় যেতে বলেছে আজ। মা আর ছোট ভাইকে নিয়ে সে মালিবাগে থাকে। বাবা নেই, দুবাইতে থাকা বড় ভাইয়ের টাকায় সংসার চলে তাদের। সেই ভাই আসবে সামনের মাসে।

শর্মি আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করে। তার হোম ইকোনমিকস কলেজের গল্প। ছোটবেলার গল্প। ভাইয়ের গল্প। ভাই আসবে দুই মাসের জন্য। এবার নাকি বিয়ে ঠিক করে যাবে তার।

শর্মি করুণ কণ্ঠে বলে, চাকরি-টাকরি পাবে না কিছু?

এতক্ষণে বুঝি, কেন সে ডেকেছে বাসায়। কিন্তু আমি চাকরি পাব কীভাবে? এটা তো আর আমার ওপর না। বিরস গলায় বলি, সামনের সপ্তাহে ইন্টারভিউ আছে একটা।

শর্মি খুবই উৎসাহিত হয়ে ওঠে। কোথায়?

ঢাকার একটা কলেজে। ইংরেজির শিক্ষক।

তাই নাকি! তাহলে তো ভালো চান্স আছে তোমার।

কী জানি। আগেও তো এমন চাকরির ইন্টারভিউ দিয়েছি। হয়নি।

এবার হতে পারে। শর্মি হঠাৎ হাত ধরে আমার। তুমি প্লিজ উল্টোপাল্টা বোলো না কিছু ইন্টারভিউতে।

উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করলেও না?

প্লিজ না। হয়তো উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করে টেম্পারামেন্ট দেখে তোমার! একটু সহ্য করে দেখো না।

শর্মি করুণ চোখে তাকিয়ে আছে।

আমি বলি, আচ্ছা, উল্টোপাল্টা বলব না। ভালোমতো প্রিপারেশন নিয়ে যাব।

খুশি হয়েছে শর্মি। খুশিতে হঠাৎ জড়িয়ে ধরে আমাকে। কিছুক্ষণ পরে অবাক হয়ে দেখি, কাঁপছে ওর শরীর। আমার গলার কাছটা ভিজে যাচ্ছে। সামনে ধরি ওর মুখ। কী হয়েছে বেবী?

কিছু না। সরি আমি।

কেন?

তুমি যা ইচ্ছে বলো ইন্টারভিউতে। উল্টোপাল্টা বললে আরও উল্টোপাল্টা বলবে। তোমাকে অপমান করলে ওদেরও অপমান করবে।

কী বলো তুমি!

শর্মি আকুল চোখে তাকিয়ে আছে, প্রমিজ করো।

প্রমিজ!

প্রমিজ করো, যা ইচ্ছে শুনিয়ে দেবে ওদের।

যা ইচ্ছে! চাকরির গুষ্টি কিলাই।

শর্মি জলভেজা চোখে হাসে। আবারও জড়িয়ে ধরে আমাকে। ভাইয়াকে যেভাবে হোক সামলাব আমি। তুমি চিন্তা কোরো না।

শর্মিকে ঠেসে ধরি বুকের ভেতর। ওর দেয়ালে বিদ্রোহী কবির ছবি। নিচে লেখা কবিতা—বলো বীর, চির উন্নত মম শির।

শর্মি জানে না আসলে উন্নত না আমার শির। ইন্টারভিউ বোর্ডে কখনোই উল্টোপাল্টা কিছু বলি না আমি। একটা চাকরির জন্য নত শিরে সব অপমান সহ্য করি। যা কিছু এসে বলি ওকে, যা এতক্ষণ বললাম আপনাদের, তা শুধু কল্পনা আমার।

তবুও উন্নত শির থাকুক তার কাছে। থাকুক আমার কল্পনায়। না হলে বেকার থেকে আর কী লাভ আমার। ●



গল্প



সচিত্রকরণ : মোস্তাফিজ কারিগর

মাহবুব তালুকদার

মৃত্যুসনদ

এইমাত্র অফিসে এলেন তিনি। চেয়ারে বসে প্রতিদিনের মতো সুরা ফাতিহা পাঠ করে মোনাজাত করলেন। ফাইলপত্র দেখার আগে এক কাপ চা খাওয়া তাঁর দীর্ঘদিনের অভ্যাস। কিন্তু আজ চা খেতে ইচ্ছা করছে না। সকালবেলা অফিসে আসার আগে চারটা পত্রিকা পড়েন তিনি। একটি পত্রিকায় জাতীয় পরিচয়পত্র সম্পর্কে নেতিবাচক প্রতিবেদন বেরিয়েছে। সেটা তাঁর শিরঃপীড়ার কারণ। প্রতিবেদন সত্য হলে আপত্তির কিছু ছিল না। কিন্তু প্রতিবেদনটি নিতান্তই মনগড়া। তা পড়ে মেজাজ ঠিক রাখা দায়। প্রতিবেদককে অবশ্য তিনি চিনতে পারলেন না। নতুন কেউ হবে হয়তো।

আগারগাঁওয়ের এই অফিসে তাঁর দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয়

পরিচয়পত্র কর্মযজ্ঞের তিনি শীর্ষ ব্যক্তিদের একজন। দেশের প্রাপ্তবয়স্ক সব নাগরিককে এনআইডি বা জাতীয় পরিচয়পত্র দেওয়া তাঁর কাজ। দেশের মানুষ প্রথম দিকে এর গুরুত্ব ততটা অনুধাবন করতে পারেনি। আজকাল জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। নাম, পিতার নাম, মাতার নাম, জন্মতারিখ, ঠিকানা ইত্যাদি সামান্য কয়েকটি তথ্য যে মানুষের জীবনে এত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে, আগে তা ছিল ধারণারও অতীত। এখন অনেকগুলো ক্ষেত্রে এনআইডি ছাড়া কাজ হয় না।

এই মুহূর্তে পরিচয়পত্রের ব্যাপারটি আরও এক ধাপ এগিয়ে গেছে। প্রত্যেক নাগরিককে স্মার্টকার্ড দিতে হবে। যাঁরা নগরবাসী নন, তাঁরাও নাগরিক। সুতরাং কাজের পরিধি সহজেই অনুমেয়। তবে সবকিছুর পরও এই দায়িত্ব পালনে একধরনের আত্মতৃপ্তি আছে। কাজটা যতটা চ্যালেঞ্জিং, ততটাই আত্মতৃপ্তির। মনে মনে আত্মপ্রসাদ অনুভব করলেন আজিমুদ্দীন সরকার।

অফিসকক্ষের বাইরে উচ্চকণ্ঠের কথাবার্তা শোনা গেল। এখানে তো কোনো ঝামেলা হওয়ার কথা নয়। কঠোর নিরাপত্তাবেষ্টনীতে থাকেন তিনি। তাহলে এত হইচই কিসের? কলবেল টিপে বেয়ারারকে ডাকলেন। সে ভেতরে এসে বলল, 'একটা লোক জোর করে ভেতরে ঢুকতে চাচ্ছে। আমি বলেছি, স্যার খুব ব্যস্ত। এখন দেখা হবে না। কেন দেখা করতে এসেছে, তা বলছে না। কেবল বলছে, আপনি ছাড়া আর কারও সঙ্গে কথা বলবে না। অযথা চেঁচামেচি করছে স্যার!'

ভাবনায় নাড়া পড়ল তাঁর। তিনি যে খুব ব্যস্ত তা তিনি নিজেই জানতেন না। এই অফিসের প্রবেশমুখে বড় করে লেখা আছে, 'নির্বাচন ভবনে আপনাকে স্বাগতম'। কিন্তু ভবনের ভেতরে যিনি রিসেপশনে বসে আছেন, তিনি প্রয়োজনবোধে অভ্যাগতদের নানা প্রকার প্রশ্ন করার জন্য সদাপ্রস্তুত। কিন্তু বাইরে যাঁর উচ্চকণ্ঠ শোনা গেল, তিনি কেবল তাঁর সঙ্গেই দেখা করতে চাওয়ার কারণ কী?

'যিনি সাক্ষাৎ করতে এসেছেন, তাঁকে ডাকো।' বললেন আজিমুদ্দীন।

'ডাকব স্যার,' বেয়ারার আবার জানতে চাইল।

'বললাম তো!'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে যিনি এলেন, তিনি একজন বৃদ্ধ মানুষ। চেহারা বা বেশভূষায় বিশেষত্ব কিছু নেই। সম্ভবত গ্রাম থেকে এসেছেন। কী বলতে চান তিনি?

'স্যার! আপনি আমাকে একটা সনদ দেন।'

'কিসের সনদ?'

'আমি যে বেঁচে আছি, সেটা প্রমাণ করার জন্য।'

'আপনি তো বেঁচে আছেন।'

'না স্যার! কাগজপত্রে আমি মৃত। আপনার সনদ পেলে আমি প্রমাণ করতে পারব যে আমি জীবিত।'

আজিমুদ্দীন সরকার আরেকবার পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন আগন্তুকের দিকে। বয়স কত হতে পারে তাঁর? সত্তর থেকে পঁচাত্তরের মধ্যে হতে পারে। এই বয়সে সত্তর বা পঁচাত্তরের মধ্যে তেমন ফারাক নেই। হঠাৎ তাঁর নিজের বাবার কথা মনে পড়ল। বাবা বেঁচে থাকলে তাঁরও বয়স পঁচাত্তর হতো। মুক্তিযুদ্ধের সময় মারা গেছেন তিনি। শুধু মারা গেছেন বললে সবটা বলা হয় না। হানাদার বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন। তাঁর দোষ ছিল তিনি যথাসময়ে আত্মরক্ষার জন্য ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারেননি বা যাননি।

না স্যার! কাগজপত্রে আমি মৃত। আপনার সনদ পেলে আমি প্রমাণ করতে পারব যে আমি জীবিত।

'আপনি বসুন।' বললেন আজিমুদ্দীন।

আগন্তুক বসতে ইতস্তত করলেন, 'আপনার সামনে বসব স্যার! আমার দাঁড়িয়ে থাকতে অসুবিধা নাই।'

'আমি আপনাকে বসতেই বলেছি।'

বসলেন তিনি। তবে তাঁর মুখ দেখে মনে হলো একধরনের চরম অস্বস্তির ছাপ ফুটে উঠেছে চোখে-মুখে।

'কোত্থেকে এসেছেন? বাড়ি কোথায়?'

'জেলা নেত্রকোনা, থানা পূর্বধলা, গ্রাম হাপানিয়া।'

'কী করেন আপনি?'

'কিছু করি না। শরীরে তাগদ নাই।'

'এবার বলুন, আপনার সমস্যা কী?'

'আমার নাম বলব না? আমার নাম তো জিজ্ঞাসা করলেন না?'

'নাম বলুন।'

'মোহাম্মদ ওমর আলী তালুকদার।'

'আপনি তালুকদার?'

'আমি না, আমার বাপ-দাদা তালুকদার ছিল। এখন কেবল নামের মধ্যে তালুকদারি আছে। কামে নাই।'

'আপনি কী যেন বলছিলেন, আপনি মারা গেছেন!'

'আমি যে বেঁচে আছি, তার প্রমাণ কী?'

'বেঁচে থাকার কোনো প্রমাণ লাগে নাকি? মৃত ব্যক্তির জন্য ডেথ সার্টিফিকেটের ব্যবস্থা আছে। আপনার শারীরিক উপস্থিতিই তো আপনার বেঁচে থাকার প্রমাণ।'

'স্যার! আপনি বুঝবেন না। আমি যে বেঁচে আছি তা প্রমাণ করতে পারছি না। সেটা প্রমাণ করতে গিয়ে আমি কে, সেটা প্রমাণ করা লাগবে। আমি থানায় গিয়েছিলাম। থানার বড়সাহেব বলছেন, আপনি কে? বললাম, আমার নাম ওমর আলী তালুকদার। স্যার বললেন, মুখে বললে হবে না। প্রমাণ কী? সে জন্যই তো আপনার কাছে আসা।'

'তার মানে আপনি একটা জাতীয় পরিচয়পত্র চান?'

'জি। তাতে লিখে দেবেন যে আমি বেঁচে আছি।'

'পরিচয়পত্র পাওয়া মানেই বেঁচে থাকা। কিন্তু আপনাকে মারল কে?'

'আমার ছেলেরা।'

'মানে?'

'আমার দুই ছেলে কাগজপত্রে আমাকে মৃত দেখিয়ে জায়গাজমি সব ভাগাভাগি করে নিয়েছে। আমি যে মৃত সেটা আগে টের পাই নাই।'

'কখন টের পেলেন যে আপনি মৃত?'

'দিন দুই আগে, যখন ওরা আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিল।'

'বাড়ি থেকে বের করে দিল কেন?'

'আমাকে ঠিকমতো খাওন দেয় না। বড় ছেলে বলে, তুমি ঢাকা চইলা যাও। ঢাকায় বুড়াদের জন্য বিনা পয়সায় থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। কী যেন নাম?'

'বৃদ্ধাশ্রম!'

'ঠিক। আমাকে সেখানে যেতে বলে। আমি বলি, জমিজমা আমার। আমাকে ঠিকমতো খেতে দিবি না কেন? আসলে সব দুই ছেলের বউয়ের কারসাজি।'

'তারপর?'

'আমি রাগ করে জমি বিক্রি করে দেওয়ার কথা ভেবেছি। তহশিল অফিসে যেতে তহশিলদার বলল,

আপনি আবার কে? কোত্থেকে এলেন? আমি বললাম, আমি ওমর আলী তালুকদার।'

'তারপর?'

'তহশিলদার আরও বলল, ওমর আলী তালুকদার তো মারা গেছে, অনেক দিন আগে। আপনি কোন ওমর আলী তালুকদার? আমি তাকে বোঝাতে পারলাম না আমার পরিচয়।'

'তারপর?'

'শেষে একজনের পরামর্শে আমি ঢাকায় এলাম। এখানে দালাল ধরলাম। দালাল বলল, মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করা নাকি কঠিন ব্যাপার। এ কাজ করতে দুই হাজার টাকা লাগবে। তা, দুই হাজার টাকা আমি পাব কোথায়? শেষে ঠিক করলাম, মরি আর বাঁচি আমি অফিসের বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করব। তাই আপনার কাছে এলাম। আপনি আমাকে বাঁচান স্যার।'

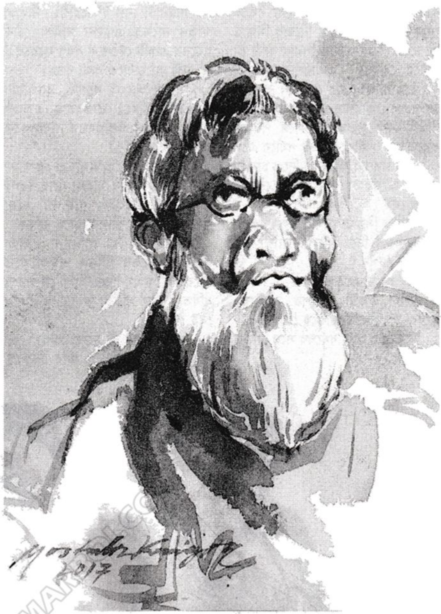
'আপনি যা করেছেন, ঠিকই করেছেন।' আজিমুদ্দীন বললেন, 'আপনি ঠিক জায়গাতেই এসেছেন।' একটু বিরতি নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি চা খাবেন, না কফি?'

'আমি কোনো দিন কফি খাই নাই। কফি কি চায়ের মতো স্বাদ?'

বেল টিপে বেয়ারারকে কফি ও বিস্কুট আনতে বললেন তিনি। বেয়ারার সবিনয় আদেশ পালন করল। তবে বিস্কুটের প্লেট সে আজিমুদ্দীনের সামনে রেখেছিল। তিনি সেটা ওমর আলীর দিকে এগিয়ে দিলেন। বললেন, 'আমি আপনার জাতীয় পরিচয়পত্রের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এতে আপনার সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তবে এ জন্য আপনার কিছু কাগজপত্রের প্রয়োজন হবে। আশা করি, কোনো অসুবিধা হবে না।'

ওমর আলী তালুকদার ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বিষয়টি নিয়ে চিন্তায় পড়লেন তিনি। একজন বৃদ্ধকে মৃত দেখিয়ে তাঁর সন্তানেরা পৈতৃক জমি ভাগাভাগি করে নিয়েছে। এমন অমানবিক ঘটনা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। তবে উনি যা-কিছু বলেছেন, সবটাই তাঁর কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছে। ওর মুখের ভঙ্গি আর মনের আর্তি মেশানো কথাগুলো বলে দিচ্ছিল, তাঁর বক্তব্যের সবটুকুই সত্য। সত্য কত নিষ্ঠুর হতে পারে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। 'সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালোবাসিলাম।'

কয়েকটা ফাইল বগলদাবা করে ঘরে ঢুকল তারিক সিরাজ। এই অফিসে তাঁর পরবর্তী সহকর্মী। আজিমুদ্দীন তাকে বসার ইঙ্গিত করে বললেন, 'কী খবর তারিক?'



'স্যার! আমরা একটা প্রতারণার ফাঁদে পড়ে গেছি।'

'মানে? আমরা প্রতারণার ফাঁদে পা বাড়াতে যাব কেন? ব্যাপারটা কী?'

'দুজন লোক তাদের বয়স কমানো-বাড়ানোর জন্য আবেদন করেছিল। ওরা বলেছে, ভুলক্রমে তাদের বয়স পাঁচ বছর কম লেখা হয়েছে। জাতীয় পরিচয়পত্রে আমরা তা সংশোধন করে দিয়েছি।'

'নিশ্চয়ই আমরা তা নিজের থেকে করিনি। সাপোর্টিং কাগজপত্র কি ছিল না?'

'সবই ছিল।'

'তাহলে অসুবিধা কী?'

'স্যার! যে সময়ে তার জন্মতারিখ লেখা হয়েছে, ওই সময়ে তার মা-বাবার বিয়েই হয়নি।'

'মাই গড! সেটা ধরা পড়ল কী করে?'

'ওরা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নাম গেজেটভুক্ত করতে চেয়েছিল। জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের সভায় যাচাই-বাছাই করতে গিয়ে ব্যাপারটা ধরা পড়েছে।'

'এখন আমাদের করণীয় কী?'

'আমরা এ বিষয়ে বিধি অনুযায়ী যা করার করব। জন্মতারিখ পরিবর্তনের জন্য যাদের কাগজপত্র পেশ করা হয়েছিল, সেগুলো আবার যাচাই করব। লোক দুজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

'ওরা দুজনে একই সময়ে কি জন্মতারিখ পরিবর্তন করতে চেয়েছিল?'

'জি স্যার। ওরা দুই ভাই।'

'দুজন কি একই দিনে জন্মেছে?'

'হ্যাঁ। ওরা যমজ। আমরা ওদের তলব করেছি।'

'ঠিক আছে। কী হলো, আমাকে জানিও।'

'অবশ্যই স্যার।'

তারিক সিরাজ চলে যাওয়ার পর অফিসের ফাইলে মনোনিবেশ করলেন তিনি। নথিগুলোকে কখনো কাগজের বান্ডিল মনে হয় না তাঁর কাছে। প্রতিটি নথিকেই জীবন্ত মনে হয়। এর পাতায় পাতায় অক্ষরে অক্ষরে মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। চাকরির ক্ষেত্রে চিরকাল তিনি মানুষের উপকার করতে চেয়েছেন। আইন-

কানুন ও বিধিবিধানের মধ্যে থেকে সংবেদনশীল মন নিয়ে নিজের সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। কিন্তু তারিক সিরাজ আজ কী শুনিয়ে গেল? 'প্রতারণার ফাঁদ!' নথিগুলোর অভ্যন্তরে গোপনে বা তাঁর অগোচরে প্রতারণার ফাঁদ পাতা আছে। প্রতিটি নথি সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করতে হবে। জীবনের এই পর্যায়ে এসে কারও প্রতারণার ফাঁদে পা দিতে চান না তিনি। আত্মরক্ষা করে চলার কোনো বিকল্প নেই।

তারিক সিরাজ আবার এল। একটা নথি এগিয়ে দিয়ে বলল, 'স্যার! এই ফাইলটা দেখুন।'

'কী আছে এতে?'

'এটা একটা ধর্ষণের ব্যাপার। আমরা বিষয়টাতে জড়িয়ে গেছি।'

'মানে? আমরা ধর্ষণের সঙ্গে জড়িত হতে যাব কেন?'

'ঘটনাটা বেশ ইন্টারেস্টিং। নীলুফা খাতুন নামের একজন মহিলা চৌদ্দ বছরের একটি ছেলেকে ধর্ষণ করেছে।'

'কী আজেবাজে কথা বলছ?'

'স্যার! আগেই বলেছি, ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং। প্রাপ্তবয়স্ক একজন মহিলা একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক নাবালককে ধর্ষণ করেছে।'

'বুঝলাম। এতে অসুবিধা কোথায়? আর ধর্ষককে তুমি মহিলা বলছ কেন? ধর্ষক তো ধর্ষকই। বাই দ্য ওয়ে, ধর্ষকের কোনো স্ত্রীলিঙ্গ আছে নাকি?'

'আছে কি না জানি না। থাকা উচিত। ধর্ষকের স্ত্রীলিঙ্গ ধর্ষিকা হতে পারে। যাকে ধর্ষণ করা হলো সে অবশ্য ধর্ষিতা। তবে ধর্ষিকা কথাটা অভিধানে নেই।'

'ধর্ষণের পর কী হলো বলো?'

'যে ধর্ষণ করেছে তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।'

'হওয়া উচিত। তারপর?'

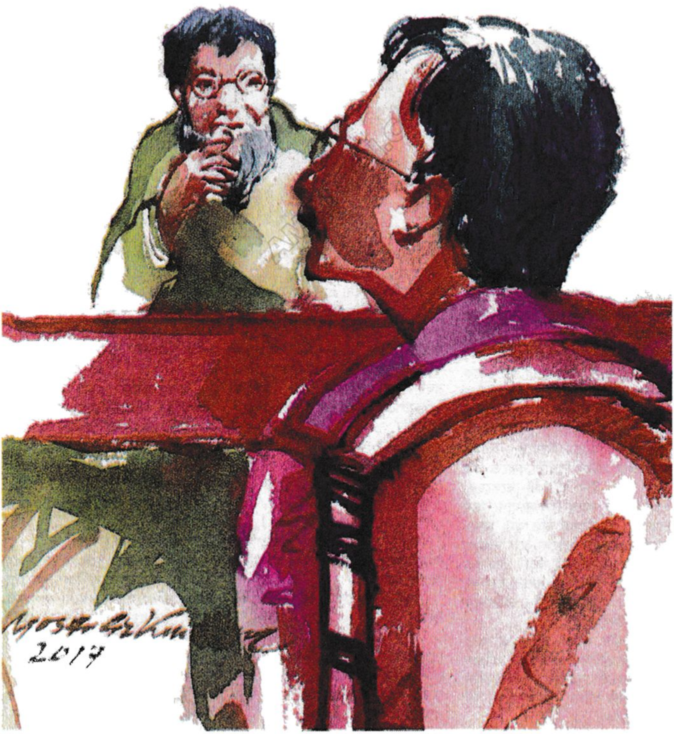
'যে ধর্ষক বা ধর্ষিকা সে আমাদের স্মার্টকার্ড দেখিয়ে বলছে তার নাম নীলুফা খাতুন নয়, নীলুফার খাতুন।'

'হতেই পারে।'

'আমরা তাকে নীলুফা থেকে নীলুফার করে দিয়েছি। আমাদের কাছে নাম সংশোধনের জন্য সে আবেদন করেছিল। বলেছিল, মূল নাম থেকে "র" বাদ পড়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে তার নাম নীলুফার খাতুন। নামে মিলছে না বলে আদালত তাকে খালাস দিয়ে দিয়েছেন।'

'আদালতের কাজ আদালত করেছেন। আমরা কী করব?'

'ধর্ষিত ছেলেটির বাবা উচ্চ আদালতে আপিল করায় আদালত জানতে চেয়েছেন নীলুফাকে আমরা



কীভাবে নীলুফার বানালাম? নীলুফা আর নীলুফার একই ব্যক্তি কি না?'

'হুঁ। আচ্ছা, ব্যক্তি কথাটার কোনো স্ত্রীলিঙ্গ আছে কি?'

'কী জানি স্যার! আমার মনে হয় নেই। এর স্ত্রীলিঙ্গ ব্যক্তিনী হতে পারে। ব্যক্তির স্ত্রীলিঙ্গ ব্যক্তিনী হিসেবে কথাটা চালু হওয়া দরকার।'

এই পর্যায়ে নিজেকে মনে মনে সংযত করলেন আজিমুদ্দীন সরকার। লিঙ্গ নিয়ে এত ভাবনার কী আছে ? মূল ঘটনার সঙ্গে তাঁর এই চিন্তার কোনো সম্পর্ক নেই। আসলে ভাবনাগুলো মানুষের মনে উদিত হয় বা অস্ত যায়। চিন্তাগুলো আপনা থেকে মনে জেগে ওঠে বা বিলীন হয়ে যায়। অদ্ভুত আচরণ এই মন নামক বস্তুটির। তবে মনকে বস্তু বলা সম্ভবত ঠিক নয়। অফিসে বসে কী সব আজেবাজে কথা ভাবছেন তিনি!

এই মুহূর্তে ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে স্মার্টকার্ড। তারিক সিরাজকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে বিদায় করার পর স্মার্টকার্ডের দুটো নথি টেনে নিলেন তিনি। পত্রিকাগুলো এ বিষয়ে সমালোচনার জন্য যেন অপেক্ষায় থাকে। রাতারাতি এত অসংখ্য লোককে স্মার্টকার্ড বিতরণ কি সম্ভব? তবু তিনি আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, যাতে এ বিষয়ে নেতিবাচক রিপোর্ট কম হয়। কিন্তু পত্রিকার সাংবাদিকেরা বাস্তব অবস্থা অনেক সময় বুঝতে চান না। যাকগে। ওদের কথা ভেবে ভেবে নিজের মাথাব্যথা বাড়ানোর মানে হয় না।

অফিসের দিনগুলো প্রায় একই রকম বয়ে চলে তাঁর। সকাল নয়টার মধ্যে অফিসে আসেন তিনি। মধ্যাহ্ন বিরতিটুকু ছাড়া একনাগাড়ে কাজ করে যান। কখন বিকেল পাঁচটা বাজবে, তার জন্য ঘড়ি ধরে বসে থাকেন না। ঘড়ির কাঁটা দেখেন সকালে, বিকেলে নয়। বেশির ভাগ সময় অফিস থেকে বেরুতে সন্ধ্যা পার হয়ে যায়। এভাবেই বয়ে চলছে দিনগুলো।

কয়েক দিন পরে কনফারেন্স রুমে মিটিং সেরে নিজের টেবিলে এসে বসতেই বেয়ারার বলল, 'আপনার সেই লোক এসে বসে আছে অনেকক্ষণ।'

'আমার সেই লোক মানে?'

'সেদিন আপনি যাকে কফি খাওয়ালেন। ডাকব স্যার?'

'ডাকো।'

ঘরে ঢুকলেন ওমর আলী তালুকদার। নামটা মনে করতে পারছেন তিনি। মাঝেমধ্যে স্মৃতিশক্তি যতটা লোপ পাওয়ার কথা ভেবে উদ্বিগ্ন থাকেন, ততটা নিশ্চয়ই হয়নি। তাঁকে বসতে বলে বললেন, 'কী খবর আপনার?'

'আমি আর বাঁচতে পারলাম না স্যার!'

'কেন? কী হয়েছে?'

'আপনি আমাকে সে সনদ দিয়েছেন, তাতে আমি জিন্দা আছি। কিন্তু কেউ আমাকে জিন্দা থাকতে দেবে না।'

'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। ব্যাপারটা খুলে না বললে আমি কী করে বুঝব?'

'আমার ছেলেরা আমাকে ওসমান আলী তালুকদার বানাতে চায়।'

'ওসমান আলী তালুকদার কে?'

'কে, তা আমিও জানি না। ওই নামে কোনো মানুষ নাই। খালি নামটাই আছে।'

'এর অর্থ কী? এই নামে কোনো মানুষ কখনো ছিল না?'

'জি না।'

'তাহলে? ছেলেরা আপনাকে ওসমান আলী তালুকদার বানাতে চায় কেন?'

> আপনি আমাকে সে সনদ দিয়েছেন, তাতে আমি জিন্দা আছি। কিন্তু কেউ আমাকে জিন্দা থাকতে দেবে না।

'ওদের কথা, বেঁচে থাকতে হলে ওমর আলী তালুকদারের ভাই ওসমান আলী তালুকদার হিসেবে বেঁচে থাকতে হবে। নিজের নাম নিয়ে বাঁচা যাবে না। দিঘির পাড়ে ওমর আলী তালুকদারের নামে একটা কবরও তারা বাঁধিয়ে রেখেছে। আমি যদি বলি, আমি ওমর আলী তালুকদার, তাহলে আমি খতম।'

'খতম মানে?'

'খতম মানে, আমার নামে কুলখানি করে চল্লিশা পড়ানো হবে। আমার নাম নিয়ে আমি বেঁচে থাকলে আমার জমিজিরাতগুলো ওরা তো ভোগদখল করতে পারবে না। তাই আমাকে শাসানি দিয়ে বলেছে, আমি কি মরতে চাই, নাকি একটা ভুয়া নামে বেঁচে থাকতে চাই?'

'একটা কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। ওরা ওদের নামে সাকসেশন সার্টিফিকেট করাল কীভাবে?'

'টাকা থাকলে এ দেশে সবই হয় স্যার! কেউ টাকা খাওয়ার জন্য হাঁ করে থাকে, আবার কেউ টাকা খাওয়ানোর জন্য সব সময় তৈরি থাকে।'

'আপনাকে কি কেউ টাকা খেতে বলেছে?'

'আমি গরিব মানুষ। টাকা দিয়ে কী করব?'

'আপনাকে হয়তো টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করার কথা ভাবতে পারে!'

'সেটা সম্ভব না। কিন্তু আমার ব্যাপারটা অন্য। আমার ছেলেদের আমি বলেছিলাম, আমি মারা গেলে বিষয়-সম্পত্তি তারাই পাবে। কিন্তু তাদের তর সইল না। বিশ্বাসও করল না আমাকে।'

'বিশ্বাস করল না কেন?'

'হঠাৎ আমি অসুখে পড়ে গেলাম। ক্যানসার। ওরা ভাবল, জমিজমা বিক্রি করে আমি ক্যানসারের চিকিৎসা করাব। আমি অত বোকা নই যে টাকাপয়সা খরচ করে ক্যানসারের চিকিৎসা করাতে যাব। আপনিই বলেন, ক্যানসারের চিকিৎসা করাতে ডাক্তারদের টাকা দেওয়ার কোনো মানে হয়?'

'চিকিৎসার ব্যাপারে নিজেকে বোকা ভাবছেন কেন?'

'কী লাভ এই অসুখের চিকিৎসা করে শুধু শুধু টাকা খরচ করার? ডাক্তার বলেছে এই অসুখ কখনো ভালো হবে না। আপনি হয়তো বলবেন, তাহলে ছেলেদের কাজের ব্যাপারে আমি চুপ করে থাকলাম না কেন? আমার কথা হলো, আমি মারা যাওয়ার আগেই ছেলেরা আমাকে মেরে ফেলল কেন? কেন ওদের এতটুকু ধৈর্য হলো না!'

'এখন কী অবস্থা?'

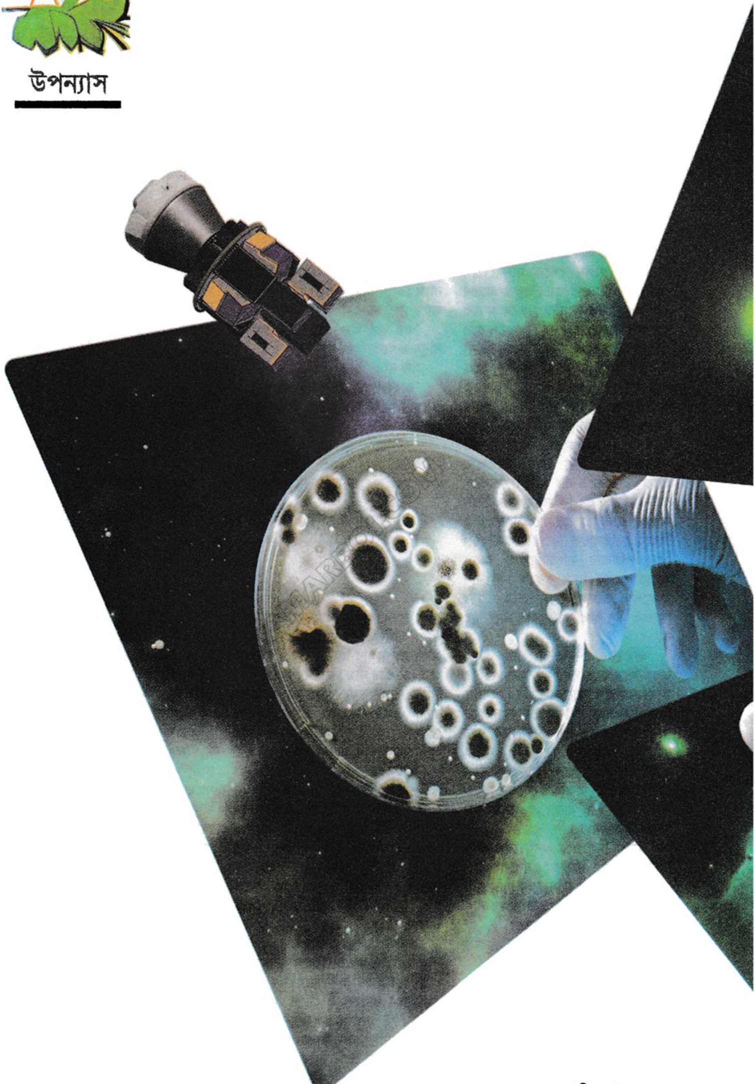
'বড় ছেলে বলেছে, যদি বাঁচতে চাও, তাহলে ওসমান আলী তালুকদার নামে বাঁচো। জাতীয় পরিচয়পত্র দেখিয়ে জমিজমার ব্যাপারে ভেজাল লাগাবে, তা হবে না। ওরা বড় সাংঘাতিক! পারলে আমাকে মেরেই ফেলে। ওদের মতিগতি ভালো ঠেকছে না। আগে তো কাগজপত্রে মেরেছিল। আমি পরিচয় সনদ পাওয়ার পর ওরা খুব খেপে গেছে। আমাকে সত্যি সত্যি মেরে ফেলবে মনে হচ্ছে।'

'এখন কী করতে চান?' জিজ্ঞাসা করলেন আজিমুদ্দীন।

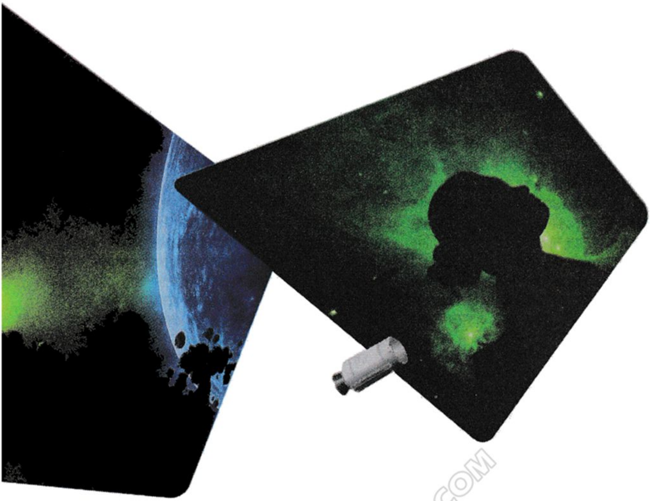
'আপনি আমাকে বাঁচান স্যার। আমি যে মৃত, তেমন একটা সনদ দেন। আপনার দেওয়া এই পরিচয়পত্রটা ফিরিয়ে নেন স্যার। আমি বাঁচতে চাই।'

ওমর আলী তালুকদার অফিসে বসে তাঁর সামনে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। ✸

উপন্যাস



সচিত্রকরণ : ধ্রুব এষ



শেখ আবদুল হাকিম

সবুজ সংক্রমণ এবং ললিতার প্রতি শ্রদ্ধা



প্রথম দিন
সংস্পর্শ

১. সাল ২০৪৩

দুরবিন চোখে একজন মানুষ। ব্যাপারটা এভাবেই শুরু হয়েছিল : শীতের রাতে একজন মানুষ রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে, রাস্তাটা পার্বত্য চট্টগ্রামের এক পাহাড়ের মাথায়, তাকিয়ে আছেন ছোট একটা শহরের দিকে।

হাড়কাঁপানো শীত প্রায় কাবু করে ফেলছে লেফটেন্যান্ট সৈকত মোস্তাজকে, গায়ে ওভারকোট আর হাতে ভারী দস্তানা থাকায় নড়াচড়ায় আড়ষ্টভাব চলে এসেছে, নিশ্বাস লেগে দুরবিনের কাচ ঝাপসা হয়ে যাওয়ায় খুব বিরক্ত, খানিক পরপরই চোখ থেকে নামিয়ে আঙুল দিয়ে ঘষে সেটা মুছতে হচ্ছে। কিন্তু বেচারার জানা নেই যে তাঁর এই তৎপরতা পণ্ডশ্রম মাত্র। ওই শহরের ভেতরটা দেখার ক্ষমতা ওই দুরবিনের নেই, ওখানে যে রোমহর্ষক গোপন রহস্য লুকিয়ে আছে তার নাগাল পাওয়াও ওটার পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষটা বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে পড়তেন যদি জানতে পারতেন যে শেষ পর্যন্ত যারা ওই গোপন রহস্যের মীমাংসা করতে পারবে তাদের দুরবিনের চেয়ে দশ লক্ষ গুণ বেশি শক্তিশালী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হবে।

সৈকত মোস্তাজ একটা বড় পাথরের গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর আগ্নেয়াস্ত্রও ওটার গায়ে ঠেক দিয়ে রাখা, চোখে অত্যাধুনিক দুরবিন—তাঁর এই ভঙ্গির মধ্যে বিষণ্ণতা আর বোকামি ঠাসা মানবিক একটা ভাব আছে। মৃত্যুর আগে ওই দুরবিন পরিচিত একটা ভাব এনে দিতে পারল তাঁর অনুভূতিতে।

আমরা কল্পনা করতে পারি এবং পুনর্নির্মাণের চেষ্টা করতে পারি, ওই পর্যায়ের পর কী ঘটেছিল।

সতর্কতার সঙ্গে, চারদিকে কড়া দৃষ্টি রেখে শহরটায় ঢুকেছিলেন মোস্তাজ। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন ওটা খুবই ছোট শহর। দশ-বারোটা পাকা-আধা পাকা বাড়ি, একটা মাত্র কংক্রিটের রাস্তার দুদিকে দাঁড়িয়ে আছে। একদম শান্ত পরিবেশ, কোনো আলো নেই, কোথাও এতটুকু নড়াচড়া নেই, বাতাস কোনো শব্দ বয়ে আনছে না। শহরকে ঘিরে থাকা নিচু পাহাড়গুলোর ওপর চোখ বুলালেন তিনি, গাছপালায় ঢাকা। পাহাড়ের ওপাশে আরও পাহাড় কয়েক শ কিলোমিটার পর্যন্ত।

ঠান্ডা বাতাসে হি হি করছেন মোস্তাজ। এটা ডিসেম্বর, আর এই মাসেই সবচেয়ে বেশি ঠান্ডা পড়ে এখানে। রাত দশটা। ঘুরে রাস্তা ধরে ফিরে আসছেন তিনি নিজের ভ্যানগাড়ির দিকে। ওটার মাথায় বসানো লম্বা অ্যানটেনা বাতাসে কাঁপছে। অলস মোটর মৃদু শব্দ করছে, ওটাই একমাত্র শব্দ শুনতে পাচ্ছেন তিনি।

পেছনের দরজা খুলে গাড়িতে উঠলেন, তারপর নিজের পেছনে বন্ধ করে দিলেন দরজা। ওখানে প্রাইভেট সৈয়দ তরুণ প্রাণ রয়েছে, ইলেকট্রনিকস টেকনিশিয়ান। একটা ম্যাপের ওপর ঝুঁকে রয়েছে সে। মোস্তাজ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তাঁরা ঠিক জায়গায় এসেছেন কি না। তরুণ প্রাণ জানাল, হ্যাঁ, এটাই সেই জায়গা।

দুজনেই ওরা খুব ক্লান্ত, সারা দিন প্যারেড আর একাধিক ট্রেনিং শেষ করে অতুল উপগ্রহের খোঁজে কুমিল্লার প্রান্তদেশ সেই দেওগাঁ থেকে গাড়ি চালিয়ে আসছেন তাঁরা। অতুল সম্পর্কে দুজনের কেউই খুব বেশি কিছু জানেন না, শুধু জানেন ওগুলো গোপন ক্যাপসুলের একটা সিরিজ, মহাশূন্যে পাঠানো হয় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ওপর দিকটা বিশ্লেষণ করার জন্য, পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে আবার ওগুলো পৃথিবীতে ফিরে আসে। লেফটেন্যান্ট মোস্তাজ আর প্রাইভেট প্রাণের কাজ হলো অবতরণের পর ওগুলো খুঁজে বের করা।

খুঁজে পাওয়াটা যাতে সহজ হয়, প্রতিটি উপগ্রহের সঙ্গে ইলেকট্রনিক ব্লিপার লাগানো আছে, পৃথিবীর মাটি থেকে ছয় কিলোমিটার দূরে থাকতে ওই ব্লিপার সংকেত দিতে শুরু করে। আর সে জন্যই ওদের ভ্যানে এত বেশি বেতার নির্দেশনা-সম্পর্কিত যন্ত্রপাতি রাখা হয়েছে। আঁকাবাঁকা পথ ধরে যেতে হয় তাঁদের, বিশ কিলোমিটার পরপর থেমে উপগ্রহ অতুলের সংকেত ধরতে হয়, তারপর আবার রওনা হতে হয়। পদ্ধতিটা মন্থর, তবে আর্মি মনে করে এটা বেশি নিরাপদ, কারণ কোনো এলাকায় দুটো ভ্যানগাড়ি দেখলে মানুষের মনে অনাকাঙ্ক্ষিত কৌতূহল এবং সন্দেহ জাগতে পারে।

ছয় ঘণ্টা ধরে ধীরে ধীরে উপগ্রহটার কাছে পৌঁছাচ্ছে ওদের ভ্যান। এখন প্রায় পৌঁছেই গেছে। মানচিত্রের ওপর পেনসিল দিয়ে টোকা দিল প্রাণ, পাহাড়ের গোড়ায় শহরটার নাম বলল—হাতিমারা, খাগড়াছড়ি। লোকসংখ্যা আটচল্লিশ। দুজনেই হাসছেন, তবে একটু আড়ষ্ট। তাঁদের অস্বস্তি বোধ করার কারণ হলো, কুমিল্লার দেওগাঁ মহাশূন্য ভ্রমণ এবং উৎক্ষেপণকেন্দ্র থেকে বলা হয়েছে, হাতিমারা শহর থেকে বারো মাইল উত্তরে ল্যান্ড করেছে উপগ্রহ অতুল। এই হিসেবে কয়েক শ গজের বেশি ভুল হবার সম্ভাবনা নেই।

কিন্তু ওদের বেতার নির্দেশনা যন্ত্রপাতি তা বলছে না। ওগুলো বলছে উপগ্রহটা হাতিমারা শহরের ঠিক মাঝখানে রয়েছে। মোস্তাজ বললেন, উত্তপ্ত হওয়ায় উপগ্রহটা জ্বলজ্বল করার কথা, আর সেটা কারও চোখে পড়ে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়, আর দেখতে পেয়ে কেউ ওটাকে হাতিমারায় নিয়ে গিয়ে থাকতে পারে।

এর মধ্যে যুক্তি আছে, তবে অসংগতিও আছে। হাতিমারার কোনো বাসিন্দা যদি মহাকাশ থেকে নেমে আসা বাংলাদেশের একটা তাজা উপগ্রহ দেখতে পায়, সে কাউকে না বলে থাকতে পারবে—সংবাদদাতাকে, পুলিশকে, বাসা (বাংলাদেশ অ্যারনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বা আর্মিকে? কাউকে না কাউকে বলতে না পারলে তার পেটের ভাত হজম হবে?

কিন্তু সে রকম কিছু ওদের কানে আসেনি।

ভ্যান থেকে নেমে এলেন মোস্তাজ, পিছু নিয়ে প্রাণও। কনকনে বাতাসে দাঁড়িয়ে শহরটার দিকে তাকালেন তাঁরা। শান্তিময়, কিন্তু পুরোপুরি অন্ধকার। মোস্তাজ লক্ষ করলেন শহরসংলগ্ন হাইওয়ের ধারে গ্যাস স্টেশন আর মোটেল, দুটোরই আলো নেভানো। অথচ বেশ কয়েক মাইলের মধ্যে আর কোনো গ্যাস স্টেশন বা মোটেল নেই। আর তারপরই পাখিগুলোকে দেখতে পেলেন তিনি।

দেখতে পেলেন থালার মতো বিরাট চাঁদের ধবধবে আলোয়। ভাবলেন, আশ্চর্য তো, আগে কেন তাঁর নজরে পড়েনি? ওগুলোকে দেখে কী মনে হচ্ছে, প্রাণকে জিজ্ঞেস করলেন। প্রাণ কিছু বুঝতে পারছে না। কৌতুক করে বলল, 'হতে পারে ওগুলো শকুন।'

'ঠাট্টা নয়, দেখতে ওরকমই লাগছে,' লেফটেন্যান্ট বললেন।

জোর করে একটু হাসল প্রাণ, বোঝা গেল নার্ভাস হয়ে পড়েছে। 'কিন্তু এখানে শকুন আসবে কী কারণে? শকুন তো আসে মরা কিছু থাকলে। আর রাতে শকুন...'

'কোথায় রাত? জোছনা একদম দিন করে রেখেছে।' হাত দুটোকে লাইটারের চারপাশে পেয়ালা বানিয়ে সিগারেট ধরালেন মোস্তাজ। খালি চোখে ছোট্ট শহরটা দেখলেন কিছুক্ষণ, তারপর দুরবিন ব্যবহার করলেন। যদিও প্রাণের কোনো লক্ষণ বা নড়াচড়া দেখতে পেলেন না।

তারপর একসময় দুরবিন নামালেন তিনি, পায়ের সামনে সিগারেট ফেলে জুতো দিয়ে পিষে নেভালেন। তারপর প্রাণের দিকে ফিরে বললেন, 'নামি চলো, শহরটা একবার দেখি।'

২. দেওগাঁ

প্রায় তিন শ কিলোমিটার দূরে বড়সড় একটা চৌকো কামরা, জানালা নেই, প্রকল্প অতুল-এর মিশন নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। লেফটেন্যান্ট একরাম রাহি ডেস্কের ওপর পা তুলে দিয়েছেন, সামনে এক গাদা বিজ্ঞান পত্রিকা, একটা করে তুলে চোখ বোলাচ্ছেন। আজ রাতে তিনি নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করছেন এখানে, এটা তাঁকে প্রতি মাসে একবার করতে হয়। তাঁর অধীনে বারোজন লোক কাজ করে। আজ তারা উল্লাস এক নামে একটা ভ্যানগাড়ির গতিবিধি মনিটর করছে, সেটা এখন খাগড়াছড়ির অনেক ভেতর দিকে রয়েছে।

রাতের বেলা এই ডিউটি খুব একঘেয়ে লাগে লে. একরাম রাহির। পত্রিকা পড়ে সেটা কাটানোর চেষ্টা করছেন তিনি। পেশায় তিনি একজন কার্ডিওভাসকুলার ফিজিওলজিস্ট, তাঁর বিশেষ আগ্রহ রয়েছে হাই-জি অ্যাকসেলারেশন থেকে দেহ-মনে যে চাপ তৈরি হয় তার ওপর।

তিনি পত্রিকা পড়ছেন, এই সময় মাথার ওপর জ্যান্ত হয়ে উঠল লাউডস্পিকার। লে. মোস্তাজ আর প্রাইভেট প্রাণ রিপোর্ট করছেন।

মোন্তাজ বললেন, 'উল্লাস এক, চঞ্চল দেওকে চাইছি। উল্লাস এক, চঞ্চল দেওকে চাইছি। আপনি পড়তে পারছেন? ওভার।'

'চঞ্চল দেও,' বললেন লে. রাহি। 'ওভার।'

'আমরা হাতিমারা শহরে ঢুকতে যাচ্ছি, অতুল উপগ্রহ ৭ উদ্ধার করব।'

'খুব ভালো, উল্লাস এক। রেডিও খোলা রাখো।'

উদ্ধার-প্রক্রিয়া একটা নিয়ম ধরে করতে হয়, সেটা লেখা আছে প্রকল্প অতুল-এর পদ্ধতিগত নিয়মাবলির পুস্তিকায়—একটা পেপারব্যাক, রাহির ডেস্কের কোণে পড়ে আছে। রাহির জানা আছে ভ্যান আর ঘাঁটির মধ্যে যে কথাবার্তা হলো সেটা টেপ করা হয়েছে. পরে স্থায়ী প্রকল্প ফাইলে তোলা হবে, যদিও এটার পেছনে তিনি কোনো যুক্তি বা কারণ খুঁজে পান না। ভ্যান গেছে, উপগ্রহ নিয়ে ফিরে এসেছে, এটাই তো ঘটছে সব সময়। এর মধ্যে এত রেকর্ড রাখার কী আছে?

লে. মোন্তাজ আবার যোগাযোগ করলেন। 'আমরা এখন শহরের ভেতর। এইমাত্র গ্যাস স্টেশন আর মোটেলের পেছন দিককে পাশ কাটিয়ে এলাম। এখানে সব একদম শান্ত আর নীরব। প্রাণের কোনো লক্ষণ নেই। উপগ্রহের সংকেত আগের চেয়েও জোরালো। খানিক দূরে মসজিদ আর চার্চ, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। চারদিকে কোথাও এতটুকু নড়াচড়া নেই। ভাবছি কুকুরগুলোই বা গেল কোথায়!'

হাতের পত্রিকা রেখে দিলেন লে. রাহি। মোন্তাজের গলার সুরে চাপা সন্ত্রস্ত ভাব বুঝতে না পারার কোনো কারণ নেই। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে পরিণত দুজন মানুষ পাহাড়ি এলাকার বনভূমি ঘেরা ছোট্ট একটা শহরে ঢুকতে ভয় পাচ্ছে শুনলে মজা পেতেন তিনি। কিন্তু মোন্তাজকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে চেনেন, তাঁর আর যত দোষই থাকুক, অত্যন্ত শক্ত মনের সাহসী মানুষ তিনি। হরর ছবি দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়বেন, এমন প্রকৃতির একজন মানুষ মোন্তাজ।

মন দিয়ে শুনছেন রাহি।

শব্দজটের ভেতর ভ্যানগাড়ির ভারী ইঞ্জিনের আওয়াজ পাচ্ছেন, শুনতে পাচ্ছেন তাঁরা দুজন শান্ত গলায় কথা বলছেন।

মোন্তাজ : জায়গাটা খুব বেশি চুপচাপ।

প্রাণ : জি, স্যার।

একটু বিরতি।

প্রাণ : স্যার?

মোন্তাজ : বলো?

প্রাণ : ওটা আপনি দেখলেন?

মোন্তাজ : কী দেখব?

প্রাণ : ওদিকটায়, ফুটপাতের ওপর। দেখে একটা লাশ মনে হচ্ছে।

মোন্তাজ : কী সব আজেবাজে জিনিস কল্পনা করছ তুমি।

আবার একটু বিরতি, তারপর লে. রাহি শুনতে পেলেন একটা ঝাঁকি খাওয়ার শব্দ তুলে দাঁড়িয়ে পড়ল ভ্যান, কড়া ব্রেক করায় পাকা রাস্তার সঙ্গে ঘষা খেয়ে গা রি রি করা শব্দ করল চাকা।

মোন্তাজ : শয়তান।

প্রাণ : এখানে আরেকটা, স্যার।

মোন্তাজ : মনে হচ্ছে বেঁচে নেই।

প্রাণ : আমি কী...

মোন্তাজ : না, ভ্যানের ভেতর থাকো।

যোগাযোগ করার সময় তাঁর গলার স্বর আরও জোরালো আর আনুষ্ঠানিক হলো : উল্লাস এক, চঞ্চল দেওকে চাইছি।

মাইক্রোফোন তুললেন লে. রাহি, 'এখানে চঞ্চল দেও। কী ঘটেছে?'

লে. মোন্তাজ, গলার আওয়াজ আঁটসাঁট, বললেন, 'স্যার, এখানে আমরা মানুষজনকে পড়ে থাকতে দেখতে পাচ্ছি। তারা অনেক। দেখে মনে হচ্ছে বেঁচে নেই।'

'তোমরা পুরোপুরি নিশ্চিত, উল্লাস এক?'

'আল্লাহর কসম,' মোন্তাজ বললেন। 'অবশ্যই আমরা পুরোপুরি নিশ্চিত।'

একরাম রাহি মৃদু গলায় বললেন, 'ক্যাপসুল লক্ষ করে যেতে থাকো, উল্লাস এক।' কথাটা বলার সময় কামরার চারদিকে চোখ বোলালেন। আরও বারোজন কর্মী তাঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছে, তারা চোখ মিটমিট করছে। বার্তা বিনিময় শুনছিল তারা।

ভ্যানটা আবার জ্যান্ত হয়ে উঠল। ডেস্ক থেকে পা নামিয়ে সিধে হলেন লে. রাহি, কনসোলের দিকে হাত বাড়িয়ে লাল 'নিরাপত্তা' বোতামে চাপ দিলেন। ওই বোতাম মিশন নিয়ন্ত্রণ কামরাকে ভবনের বাকি সব অংশ থেকে আলাদা করে ফেলল, ফলে তাঁর অনুমতি ছাড়া অন্য আর কেউ এখানে ঢুকতে পারবে না। তারপর তিনি ফোনের রিসিভার তুলে বললেন, 'মেজর তুষার আবদুল্লাহকে দাও। জরুরি। আমি লাইনে থাকছি।'

চলতি মাসে তুষার আবদুল্লাহ প্রধান ডিউটি অফিসার, ডিসেম্বর মাসে অতুলের সমস্ত তৎপরতার দায়িত্ব তাঁর ওপর।

একরাম রাহি একটা সিগারেট ধরালেন।

লাউডস্পিকারে লে. মোন্তাজের গলা শোনা যাচ্ছে : তোমার কাছে ওদের মরা বলে মনে হচ্ছে, প্রাণ?

প্রাণ : হ্যাঁ, স্যার। আশ্চর্য শান্ত, যেন খুব শান্তিতে ঘুমাচ্ছে, তবে মৃত।

মোন্তাজ : কী কারণে জানি না, আমার ঠিক ওদের মরা মানুষ বলে মনে হচ্ছে না। কী যেন একটা নেই। এর মধ্যে মজার কী যেন একটা থাকতে পারে...তবে তারা সবখানে ছড়িয়ে আছে। নিশ্চয়ই কয়েক ডজন হবে।

প্রাণ : তারা যে যেখানে ছিল যেন সেখানে পড়ে গেছে। হোঁচট খেয়ে পড়েছে, পড়ে মরে গেছে।

মোন্তাজ : পুরো রাস্তায়, ফুটপাতে...

আবার বিরতি, তারপর প্রাণ বলল, 'স্যার!'

মোন্তাজ : শয়তান।

প্রাণ : আপনি তাঁকে দেখেছেন? সাদা ঢোলা জোব্বা পরা, রাস্তার ওপর দিয়ে হাঁটছেন...

মোন্তাজ : দেখেছি আমি।

প্রাণ : ওই ভদ্রলোক ওদের স্রেফ টপকাচ্ছেন...

মোন্তাজ : তিনি এদিকেই আসছেন।

প্রাণ : স্যার, দেখুন, আমার মনে হয় এখান থেকে এখনই আমাদের সরে যাওয়া উচিত। আপনি যদি কিছু মনে না করেন, আমার...

পরবর্তী শব্দ কানের পরদা ফাটানোর মতো একটানা চিৎকার। তারপরই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। পরে আর দেওগাঁ অতুল মিশন নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র ওই দুজনের কোনো সাড়াশব্দ পেল না।

৩. সংকট

একটা সময় ছিল মহাশূন্য নিয়ে গবেষণা এবং অভিযান পরিচালনার ক্ষেত্রে সবার আগে ছিল যুক্তরাষ্ট্র আর রাশিয়া, লাইনে তাদের পেছনে ছিল ব্রিটেন, ফ্রান্স, চীন, ভারত, জাপান আর ব্রাজিল। তখন প্রতিটি দেশ ভাবত মহাশূন্য থেকে ভিনগ্রহের প্রাণীরা এসে মানুষের ওপর হামলা করতে পারে। ভাবত বিপথে সরে যাওয়া কোনো গ্রহাণু ছুটে এসে আঘাত করতে পারে পৃথিবীর বুকে, ডাইনোসরের মতো মানুষও তখন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এ ধরনের বিপদ থেকে বাঁচার জন্য যার

যার সাধ্যমতো প্রতিরোধব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল দেশগুলো।

কিন্তু আক্রমণটা এসেছিল অন্য দিক থেকে। সংকটের চেহারা মানুষের কল্পনার একেবারে বাইরে ছিল। সেটা ছিল বায়োলজিক্যাল হামলা। শুরু থেকে শেষ, এই আক্রমণের মেয়াদ ছিল দশ বছর। পরিণতিতে ওপরে যেসব দেশের নাম করা হয়েছে, সব মিলিয়ে তাদের মোট তিন কোটি লোক মারা গেছে। ক্ষয়ক্ষতি এখানেই শেষ নয়। অচেনা জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত ওই দেশগুলো তাদের মহাশূন্য গবেষণা এবং অভিযান বাতিল বা স্থগিত ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে।

তাদের জায়গায় ধীরে ধীরে উঠে এসেছে নতুন কিছু দেশ, তার মধ্যে বাংলাদেশও আছে। আর সব দেশের করুণ পরিণতি দেখে শিক্ষা নিয়েছেন বাংলাদেশের মহাশূন্য গবেষক আর বিজ্ঞানীরা, পৃথিবীর বাইরে মহাশূন্যের কোথাও থেকে আসা অচেনা জীবাণুর বিরুদ্ধে যথাসাধ্য প্রতিরোধব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু দেশের বিজ্ঞানী এবং টেকনিশিয়ানরা দেখে শিখেছেন, ঠেকে শেখেননি এবং দুটোর মধ্যে বিস্তর ফারাক। অ্যান্ড্রোমেডা স্ট্রেইনের হামলা যখন হলো, তার আগে পর্যন্ত দেশে বায়োলজিক্যাল সায়েন্স নিয়ে কোনো সংকট দেখা দেয়নি। এবং প্রথম যে বাংলাদেশিরা বাস্তবতার মুখোমুখি হলো, তারা সেটাকে ওরকম একটা সংকট বলে গ্রহণ করতে মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল না। মোস্তাজ এবং প্রাণ যোগ্য লোক, কিন্তু তাঁদের চিন্তার জগৎ মোটেও সমৃদ্ধ নয়। আর লে. একরাম রাহি, দেওগাঁর রাত্রিকালীন কর্মকর্তা, যদিও একজন বিজ্ঞানী, সাময়িক দায়িত্বে থাকার কারণে ব্যাখ্যার অতীত সমস্যাকে গুরুত্ব দিয়ে রাতটা মাটি করতে চাননি।

বিধি অনুসারে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা মেজর তুষার আবদুল্লাহকে ডেকেছেন রাহি এবং গল্পটা এখানে অন্য রকম এক বাঁক নিয়েছে। কারণ মেজর ভদ্রলোক অলস প্রকৃতির মানুষ, তিনি অসুস্থও বটেন।

কাঁচা ঘুম ভাঙায় মেজর আবদুল্লাহ রেগে বোম হয়ে আছেন, তবে কাউকে কিছু বলছেন না। লে. রাহির টেবিলের কোণে বসে আছেন তিনি, টেপ করা ভ্যানের মেসেজ শুনছেন। সেটা শেষ হতে বললেন, 'এ রকম উদ্ভট ঘটনার কথা বাপের কালে শুনিনি।' টেপটা আবার শুনছেন। একই সঙ্গে পাইপে তামাকও ভরছেন। ধরালেন ওটা, আয়েশ করে ধোঁয়া গিললেন। আবদুল্লাহ একজন ইঞ্জিনিয়ার, হাইপারটেনশনের রোগী। এই কারণেই আর্মিতে আর কোনো পদোন্নতি হয়নি তাঁর। নানা উপলক্ষে ওজন কমাতে বলা হয়েছে তাঁকে, কিন্তু তিনি এর উত্তর দেন নিজস্ব কায়দায়—ওজন আরও একটু বাড়িয়ে। আর্মি ছেড়ে কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে চাকরি নেওয়ার কথা ভাবছেন ভদ্রলোক।

আজ রাতে খুব ধীর হয়ে আছেন মেজর আবদুল্লাহ। তাঁর চিন্তাভাবনাও খুব মন্থর। কে কী বলল তাতে তিনি কান দেন না, তাঁর জানা আছে নিজের এই ধীর-স্থির ভাবই জীবনে সাফল্য বয়ে এনেছে। তাঁর আশপাশের লোকজন যত বেশি উত্তেজিত হয়, তিনি তত বেশি আগ্রহ হারাতে থাকেন, যতক্ষণ না তাঁর ঘুম পেয়ে যায়। তিনি যে নিজের মাথাটাকে পরিষ্কার রাখতে পারেন, এটাই সেই গোপন কারণ।

'যোগাযোগ সিস্টেমে কোনো গোলযোগ নেই তো?' এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে জানতে চাইলেন মেজর।

'বারবার চেক করা হয়েছে,' বললেন রাহি। 'সব সিস্টেম ঠিকমতো কাজ করছে।' রেডিও খুললেন তিনি, যান্ত্রিক শব্দজটে ভরে উঠল কামরা। 'যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হবার পর এখন যে শব্দজট শুনছেন, আমরাও ওরকম শুনেছি। তখন আমরা অডিও স্ক্রিন ব্যবহার করি, শব্দজট থেকে কম্পিউটার যাতে একটা প্যাটার্ন বের করে আনতে পারে। এভাবে,' বলে ডেস্ক কনসোলের একটা বোতামে চাপ দিলেন। হঠাৎ করে মনিটর স্ক্রিনে অসিলোস্কোপ রেখাগুলো বদলে গেল, হয়ে গেল শান্তশিষ্ট, নিয়মিত, বাড়ি মারার ভঙ্গিতে একটা প্যাটার্ন তৈরি হচ্ছে।

'আই সি,' বলে ভ্রু কুঁচকালেন মেজর। প্যাটার্নটা এখনই চিনতে পারছেন তিনি, ধরতে পারছেন অর্থটাও। তাঁর চিন্তা অন্যদিকে সরে যাচ্ছে, অন্যান্য সব সম্ভাবনা বিবেচনা করছেন, আরও জটিল ও বড় পরিসরে।

'এখানে এটা অডিও,' বললেন রাহি, আরেকটা বোতামে চাপ দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সংকেতের অডিও সংস্করণে ভরাট হয়ে উঠল কামরা। কর্কশ যান্ত্রিক শব্দ, তারপর জোরালো একটা ধাতব আওয়াজ শোনা গেল।

মাথা ঝাঁকালেন মেজর আবদুল্লাহ। 'একটা ইঞ্জিন। ধাক্কা খেলো বলে মনে হলো।'

'জি, স্যার। আমরা মনে করছি ভ্যানের রেডিও এখনো প্রচার করছে, চালু আছে ইঞ্জিনও। সেই শব্দই শুনছি এখন আমরা। শব্দজট থেকে বের করে আনা।'

'বেশ ভালো কথা,' বললেন মেজর, নিভে যাওয়া পাইপে আবার আগুন ধরালেন। 'আমাদের প্রমাণ দরকার।'

'প্রমাণ...কী প্রমাণ, স্যার?'

'ঘাঁটিতে কাঠঠোকরা আছে?'

'আমি ঠিক জানি না, স্যার। তবে, যদি না থাকে, বান্দরবান থেকে আনিয়ে নিতে পারব।'

'তাহলে আনান,' বলে দাঁড়ালেন মেজর আবদুল্লাহ। তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এবং আবার ক্লান্ত বোধ করছেন। 'ওই শহরের ওপর দিয়ে কিছু একটা ওড়ানো দরকার আমাদের—প্লেন হোক, কপ্টার হোক, স্যাটেলাইট হোক,' বললেন তিনি। 'কমপ্লিট স্ক্যান। প্রতিটি ক্যানিস্টার সরাসরি আসবে। ল্যাবগুলোকে সতর্ক করে দিন।' রাহিকে তিনি টেকনিশিয়ানদেরও ডেকে নিতে বললেন, বিশেষ করে মিলনকে। মিলনকে তিনি পছন্দ করেন না, তবে সে অত্যন্ত যোগ্য ও বুদ্ধিমান। আজ রাতে যোগ্য লোককে তাঁর দরকার হবে।

রাত এগারোটা সাত মিনিটে জহির আব্বাসকে দেখা গেল ঘণ্টায় ৭১৫ কিলোমিটার গতিতে জেট নিয়ে খাগড়াছড়ির আকাশে ঢুকে পড়ল। চাঁদের আলোয় তিনি তাঁর সামনে পথপ্রদর্শক এক জোড়া জেট দেখতে পাচ্ছেন, রাতের আকাশে ওগুলোর আফটারবার্নার যেন রাগে জ্বলজ্বল করছে। প্লেনগুলোর আকৃতির মধ্যে গর্ভবতী একটা ভাব আছে, ডানা আর পেটের তলায় ঝুলছে ফসফরাস বোমা।

আব্বাসের প্লেনটা অন্য রকম। এটা সরু, পিচ্ছিল একটা ভাব আছে, কালো। এটা একটা কাঠঠোকরা, সারা দুনিয়ায় সাতটার মধ্যে একটা।

কাঠঠোকরা মাঝারি পাল্লার রিকনিসন্স জেট এয়ারক্রাফট, রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা ইন্টেলিজেন্স ফ্লাইট চালানোর উপযোগী যন্ত্রপাতি দিয়ে সাজানো। জেটের পাশে দুটো ১৬এমএম ক্যামেরা ঝুলছে, একটা ভিজিবল স্পেকট্রামের জন্য, অপরটা লো ফ্রিকোয়েন্সি রেডিয়েশনের জন্য। প্লেনের মাঝামাঝি জায়গায় আরও বসানো আছে ইনফ্রারেড মাল্টিস্পেক্ট্র ক্যামেরা। তা ছাড়া, সচরাচর আরও যা যা থাকে, যেমন ইলেকট্রনিক আর রেডিও ডিটেকশন গিয়ার, তাও আছে। সমস্ত ফিল্ম আর প্লেট, অবশ্যই আকাশে প্রসেস করা হয়, স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে, ফলে জেট ঘাঁটিতে পৌছানো মাত্র চাক্ষুষ করার জন্য তৈরি অবস্থায় পাওয়া যায়।

অন্ধকারে ডুবে থাকা একটা শহরের চারপাশের কিনারা চিহ্নিত করতে পারে কাঠঠোকরার ক্যামেরা, পারে নয় হাজার কিলোমিটার ওপর থেকে কার আর ট্রাকের গতিবিধি অনুসরণ করতে। একটা সাবমেরিন পানির দুই শ ফুট গভীরে থাকলেও

সেটাকে খুঁজে বের করতে পারে। একটা কারখানা বন্ধ হয়ে যাবার চার ঘণ্টা পরও সেটার ফটো তুলতে সক্ষম, ওটার থেকে যাওয়া তাপ ব্যবহার করে। বন্দরের পানিতে কোথায় মাইন লুকানো আছে দেখতে পায়।

কাজেই কাঠঠোকরা হলো খাগড়াছড়ির হাতিমারার ওপর দিয়ে অন্ধকার রাতে উড়ে যাবার জন্য আদর্শ বিমান।

জহির আব্বাস সতর্কতার সঙ্গে নিজের যন্ত্রপাতি চেক করে নিচ্ছেন, তাঁর হাত প্রজাপতির মতো কনসোলের ওপর উড়ে বেড়াচ্ছে, স্পর্শ করছেন প্রতিটি বোতাম আর লিভার, মিটমিট করা সবুজ আলো দেখছেন, ওগুলো জানাচ্ছে প্রতিটি সিস্টেম কাজ করছে ঠিকমতো।

সামনের দিকে ঝুঁকলেন আব্বাস। খুব নিচে রয়েছেন তিনি, জমিন থেকে মাত্র পাঁচ শ ফুট ওপরে—মুহূর্তের জন্য ঝাপসা একটা সবুজ ঝলকের মতো দেখতে পাচ্ছেন; কোনো গাছ, নালা বা গ্রামকে আলাদাভাবে চিনতে পারছেন না। তারপর, অনেকটা সামনে, কিছু ঘর-বাড়ি চোখে পড়ল।

রিপোর্ট করলেন আব্বাস, 'হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি শহরটা।'

'ঠিক। এবার আমাদের একটু জায়গা করে দিন।'

জেট নিয়ে পিছিয়ে এলেন আব্বাস, বাকি দুটো প্লেনের সঙ্গে নিজের প্লেনের দূরত্ব বাড়ালেন আধ কিলোমিটারের কিছু বেশি। পি-স্কয়ার ফরমেশনে রয়েছেন তাঁরা, ফসফরাস ফ্লেয়ারের সাহায্যে সরাসরি যাতে টার্গেটকে দেখতে পাওয়া যায়। সরাসরি দেখতে পাওয়া আসলে একান্ত প্রয়োজন নয়, তা দেখতে না পেলেও নিজের কাজ করতে পারে কাঠঠোকরা। কিন্তু দেওগাঁ যেন জোর দিচ্ছে শহরের সম্ভাব্য সব তথ্য সংগ্রহ করতে হবে তাদের।

সামনে থাকা প্লেন দুটো দুদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, শহরের প্রধান সড়কের দুপাশে সমান্তরাল রেখায় পৌঁছাতে যাচ্ছে।

'আব্বাস? ছবি তুলতে তৈরি?'

আলতো করে ক্যামেরার প্রতিটি বোতামে আঙুল রাখলেন আব্বাস। চারটে আঙুল ব্যবহার করছেন তিনি, যেন পিয়ানো বাজাতে যাচ্ছেন।

'তৈরি।'

'আমরা যাচ্ছি এখন।'

সামনের প্লেন দুটো আরও নিচে নামল, দৃষ্টিনন্দন গোত্তা খেয়ে শহরের কাছাকাছি পৌঁছাচ্ছে। পরস্পরের কাছ থেকে যথেষ্ট দূরে এখন ওগুলো, দেখে মনে হচ্ছে জমিন থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি ওপরে, ঠিক যখন বোমাগুলো রিলিজ করতে শুরু করল। একটা করে বোমা মাটিতে নামল, সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড উত্তপ্ত সাদা গম্বুজ লাফিয়ে উঠল শূন্যে, অপার্থিব এক আলোয় গোসল করিয়ে দিল শহরটাকে, প্লেনগুলোর ধাতব পেট সেই আলোয় জ্বলজ্বল করছে।

জেট দুটো কাজ সেরে ওপরে উঠে যাচ্ছে, তাদের অভিযান শেষ, তবে আব্বাস ওগুলোকে দেখতে পাচ্ছেন না। তাঁর সমস্ত দেহ এবং মন শহরটার ওপর আটকে আছে।

'সব এখন তোমার, আব্বাস।'

আব্বাস জবাব দিলেন না। কাঠঠোকরার নাক নিচু করলেন তিনি, ফ্ল্যাপ নামালেন, প্লেন একটা ভারী পাথরের মতো জমিনের দিকে খসে পড়তে শুরু করায় একটা ঝাঁকি খেলেন। তাঁর নিচে, শহরকে ঘিরে চারদিকে কয়েক শ গজ পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে উজ্জ্বল আলো। প্রতিটি বোতামে চাপ দিলেন তিনি, ক্যামেরার সম্মিলিত গুঞ্জন যতটা না শুনতে পেলেন তার চেয়ে বেশি অনুভব করলেন।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ধরে নামল কাঠঠোকরা, তারপর স্টিকটা সামনে ঠেলে দিলেন আব্বাস, প্লেন মনে হলো বাতাসে আটকে গেল, স্থির হলো, ফের উঁচু হচ্ছে, ওপরে উঠছে। শহরের প্রধান এবং একমাত্র সড়ক এক পলকের জন্য চোখে ধরা পড়ল। লাশ দেখতে পেলেন তিনি, চারদিকে শুধু লাশ আর লাশ, হাত-পা ছড়ানো, রাস্তার ওপর পড়ে আছে, গাড়ির ভেতর কাত হয়ে আছে।

'আল্লারে,' বিড়বিড় করলেন।

তারপর দৃশ্যটা থেকে নিজেকে অনেক ওপরে তুলে নিল জেট। সেটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে আবার অকুস্থলের মাথার ওপর ফিরে আসছেন আব্বাস, দ্বিতীয়বার চাক্ষুষ করছেন মর্মান্তিক দৃশ্যটা। কী দেখেছেন ভাবতে চেষ্টা করছেন তিনি। রিকনিসঙ্গের প্রথম বিধিবিধানের একটা হলো : 'যাই দেখো, গ্রাহ্য কোরো না...' বিশ্লেষণ আর মূল্যায়ন করাটা পাইলটের কাজ নয়। সেটা তুলে রাখতে হবে বিশেষজ্ঞদের জন্য। যেসব পাইলট এই বিধি মানে না, নিজেদের বিপদ ডেকে আনা তারা। সাধারণত তাদের প্লেন ক্র্যাশ করে।

দ্বিতীয় দৌড়ের জন্য নেমে এসে সোজা হলো প্লেন, জমিনের দিকে না তাকানোর চেষ্টা করলেন আব্বাস। কিন্তু তাকালেন তিনি, লাশগুলোও দেখতে পেলেন। ফসফরাস ফ্লেয়ারের উজ্জ্বলতা কমে আসছে, ফলে নিচের দৃশ্য অশুভ আর গা ছমছমে হয়ে উঠল। কিন্তু লাশগুলো আগের মতোই আছে। দৃশ্যটা তাঁর কল্পনা ছিল না।

'এটা তুমি কী করলে, হ্যাঁ!' বিড়বিড় করলেন তিনি। কাকে, সেটা তিনিই ভালো বলতে পারবেন।

আরামদায়ক একটা ব্রিফিং রুম। বারোটা লেদার চেয়ার আর একটা প্রজেক্টর রয়েছে। লে. রাহিকে নিয়ে মেজর আবদুল্লাহ যখন ভেতরে ঢুকলেন, ওখানে আগে থেকে তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছিল মিলন, একটা পরদার পাশে দাঁড়িয়ে।

মিলন একটু খাটো, হাঁটার মধ্যে মৃদু ঝাঁকি আছে, মুখ দেখে মনে হবে সব সময় সব ব্যাপারে তার আগ্রহ প্রবল। যদিও ঘাঁটিতে খুব একটা কেউ পছন্দ করে না তাকে, কিন্তু তা না করলে কী হবে, রিকনিসঙ্গ ফটো দেখে অর্থ বের করার ব্যাপারে তার জুড়ি মেলা ভার। যেখানে কারও চোখে কিছু ধরা পড়ছে না, সেখানে বিস্ময়কর সব দৃশ্য দেখতে পায় সে, অন্যকেও দেখাতে পারে।

ভেতরে ঢুকে মেজর আর লেফটেন্যান্ট যখন বসছেন, মিলন তখন নিজের হাত দুটো পরস্পরের সঙ্গে ঘষছে। 'তাহলে কাজ শুরু করা যাক,' বলল সে। 'আজ রাতে আপনাদের আগ্রহী করার মতো কিছু জিনিস আমাদের কাছে আছে বলে মনে হচ্ছে।' পেছনে থাকা অপারেটরকে ইঙ্গিত করল সে। 'প্রথমে ফটো।'

ঘরের আলো প্রায় গায়েব হয়ে গেল। ক্লিক করে একটা ধাতব শব্দ। পরদায় গাছপালায় ঘেরা ছোট্ট শহরটা ফুটে উঠল।

'এটা একটা অস্বাভাবিক ফটো,' বলল মিলন। 'আমাদের ফাইল থেকে নেওয়া। দুই মাস আগে মর্ম ২, আমাদের রেকি উপগ্রহ, তুলেছিল—দুই শ কিলোমিটার ওপরে নিজের কক্ষপথে চক্কর খাবার সময়, আপনারা জানেন। এখানে টেকনিক্যাল মান বেশ ভালো। এখনো আমরা কার বা ট্রাকের লাইসেন্স প্লেট পড়তে পারি না, তবে এটার ওপর কাজ চলছে। হয়তো আগামী বছর পড়া যাবে।'

চেয়ারে শরীরের ভর বদল করলেন মেজর আবদুল্লাহ, তবে কিছু বললেন না।

'এখানে আপনারা শহরটা দেখতে পাচ্ছেন,' বলল মিলন। 'হাতিমারা, খাগড়াছড়ি। জনসংখ্যা আটচল্লিশ। খুব বেশি কিছু দেখার নেই। এদিকে এটা মুদিখানা, পাশেই মনিহারি, তার পাশে চায়ের দোকান। গ্যাস স্টেশন আর মোটেলের পেছনের অংশ ওদিকে, ওগুলো হাইওয়ের দিকে মুখ করা। গ্যাস স্টেশনের সাইনবোর্ডে হাতি শব্দটা কত বড় দেখাচ্ছে খেয়াল করুন। শহরের বাকি অংশে সাধারণ মানুষের ঘর-বাড়ি। মসজিদ আর চার্চ পাশাপাশি, খানিক দূরে মন্দির। ঠিক আছে,

এবার পরের ছবি।'

ক্লিক করে আরেকটা শব্দ হলো। এটা একটা কালো ফটো, লালচে একটু ভাব আছে। ঘর-বাড়ির কিনারাগুলো খুব বেশি গাঢ়।

'আমরা এখানে কাঠঠোকরার আইআর প্লেট দিয়ে শুরু করছি। এগুলো ইনফ্রারেড ফিল্ম, আপনারা জানেন, আলোর ওপর ভিত্তি করে বা আলোর সাহায্য নিয়ে তোলা হয়নি, তোলা হয়েছে তাপের সাহায্যে। যা কিছু গরম, ছবিতে তা সাদায় ফুটেছে; যা কিছু ঠান্ডা তা ফুটেছে কালোয়। এখানে আপনারা ঘর-বাড়ি সব কালো দেখছেন, ওগুলো জমিনের চেয়ে ঠান্ডা, তাই। রাত যত বাড়তে থাকে তত দ্রুত তাপ ছাড়তে থাকে দালানগুলো।'

'ওই সাদা দাগগুলো কী?' লে. রাহি জানতে চাইলেন। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটা সাদা দাগ রয়েছে ফিল্মে।

'ওগুলো,' জানাল মিলন, 'মৃতদেহ। কিছু বাড়ির ভেতরে, কিছু রাস্তায়। গুনলে দেখা যাবে পঞ্চাশটা। কিছু ক্ষেত্রে, এই যেমন এটার বেলায়, আপনারা চারটে হাত-পা আর মাথা পরিষ্কার চিনতে পারছেন। এটা লম্বা হয়ে পড়ে আছে। রাস্তার ওপর।'

এরপর আঙুল তুলে একটা চৌকো সাদা দাগ দেখাল মিলন। 'যত দূর বোঝা যাচ্ছে, এটা একটা অটোমোবাইল। লক্ষ করুন, এক প্রান্তে একটা সাদা দাগ রয়েছে। এর মানে হলো ইঞ্জিন এখনো চালু রয়েছে, এখনো তাপ তৈরি করছে।'

'ওটা ভ্যান,' লেফটেন্যান্ট বললেন। সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকালেন মেজর।

'এখন তাহলে প্রশ্ন উঠবে,' বলল মিলন, 'ওই লোকগুলো সবাই কি মারা গেছে? এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত হতে পারছি না। শরীরগুলো বিভিন্ন তাপমাত্রায় রয়েছে। সাতচল্লিশটা বরং ঠান্ডাই বলা চলে, ইঙ্গিত করে মৃত্যু ঘটেছে কিছু সময় আগে। তিনটে একটু গরম। তার মধ্যে দুটো ওই গাড়িতে, এখানে।'

'আমাদের লোক,' রাহি বললেন।

'আর তৃতীয় ব্যক্তি?'

'তৃতীয় ব্যক্তি একটা ধাঁধা। তাকে আপনারা এখানে দেখছেন, হয় রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে কিংবা কুঁকড়ে শুয়ে আছে। লক্ষ করুন প্রায় সাদা সে, তার মানে গরম। আমাদের টেম্পারেচার স্ক্যান বলছে, প্রায় পঁচানব্বই ডিগ্রি। তার মানে তত গরম নয়, হতে পারে এর কারণ রাতের বাতাসে তাপমাত্রার তারতম্য। ত্বকের তাপ কমিয়ে দিয়েছে। পরবর্তী স্লাইড।'

পরদায় আরেকটা ছবি চলে এল।

মেজর আবদুল্লাহ ছবি দেখে ভ্রু কুঁচকালেন। 'ওই স্পট, ওই ব্যক্তি, নড়ে গেছে।'

'ঠিক ধরেছেন। এই ছবিটা তোলা হয়েছে দ্বিতীয় দৌড়ে। স্পট সরে গেছে কমবেশি বিশ গজ। পরের ছবি।'

নতুন আরেকটা ছবি চলে এল পরদায়।

'আবার সরে গেছে!'

'হ্যাঁ। পাঁচ থেকে দশ গজ।'

'তার মানে ওখানে যারা রয়েছে তাদের মধ্যে একজন জীবিত?'

'সেটাই,' বলল মিলন, 'অনুমাননির্ভর উপসংহার।'

কেশে গলা পরিষ্কার করলেন মেজর। 'মানে, বলতে চাইছ, এটা তোমার ধারণা?'

'জি, স্যার। এটাই আমাদের ধারণা।'

'ওখানে, ওই অকুস্থলে একজন লোক আছে, যে লাশগুলোর মাঝখানে হেঁটে বেড়াচ্ছে?'

কাঁধ ঝাঁকাল মিলন, টোকা মারল পরদায়। 'আমাদের সামনে যে ডেটা রয়েছে, এর অন্য কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া কঠিন, স্যার, এবং...'

এই সময় বগলের তলায় গোল আকৃতির তিনটে ধাতব ক্যানিস্টার নিয়ে ঘরে একজন প্রাইভেট ঢুকল, বলল, 'স্যার, আমাদের কাছে এখন যে ফিল্ম আছে, পি-স্কয়ার ফরমেশন থেকে সরাসরি তোলা।'

'চালাও ওগুলো,' নির্দেশ দিলেন মেজর।

একটা ফিল্ম প্রজেক্টরে ঢোকানো হলো। এক মুহূর্ত পর কেউ একজন পথ দেখিয়ে লেফটেন্যান্ট জহির আব্বাসকে ঘরের ভেতর পৌঁছে দিয়ে গেল। মিলন বলল, 'ফিল্মগুলো এখনো আমি চালাইনি, ভালো হয় পাইলট সাহেব নিজে যদি একটু ব্যাখ্যা করেন।'

মাথা ঝাঁকিয়ে আব্বাসের দিকে তাকালেন মেজর। চেয়ার ছাড়লেন আব্বাস, নার্ভাস ভঙ্গিতে হাত দুটো ঘষছেন প্যান্টে, হেঁটে কামরার সামনের দিকে চলে গেলেন। পরদার পাশে দাঁড়িয়ে দর্শক-শ্রোতাদের মুখোমুখি হলেন। 'স্যার, আজ রাতে অকুস্থলের ওপর দিয়ে আমি উড়ে গেছি এগারোটা আট মিনিটে আর এগারোটা তেরো মিনিটে। দুবার গেছি, একবার পুব থেকে, একবার পশ্চিম থেকে—গড়ে গতি ছিল ঘণ্টায় আড়াই শ কিলোমিটার, উচ্চতা ছিল আট শ ফুট আর...'

'এক মিনিট, বাপ,' বললেন মেজর আবদুল্লাহ, একটা হাত তুললেন। 'এটা ধোলাই নয়, তুমি স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলো।'

মাথা ঝাঁকালেন আব্বাস, ঢোক গিললেন। কামরার আলো কমে গেল, যান্ত্রিক গুঞ্জন তুলে জ্যান্ত হলো প্রজেক্টর।

পরদায় দেখা গেল শহরের দিকে প্লেনটা যখন নামছে, চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল আলোর বন্যা বয়ে যাচ্ছে ওটার চারদিকে।

'এটা আমার প্রথম দৌড় ছিল,' আব্বাস বললেন। 'পুব-পশ্চিম, এগারোটা আট মিনিট। আমরা বাম ডানায় বসানো ক্যামেরার তোলা ছবি দেখছি, ওটা প্রতি সেকেন্ডে একশটা ফ্রেম কাভার করছিল। যেমনটি দেখতে পাচ্ছেন, আমার উচ্চতা দ্রুত কমে আসছে। নাক বরাবর সামনে টার্গেটের প্রধান সড়ক...'

থামলেন আব্বাস। শরীরগুলো ইতিমধ্যেই পরিষ্কার হতে শুরু করেছে। আর ভ্যানটা, রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে, ছাদের অ্যানটেনা এখনো পাক খাচ্ছে ধীরগতিতে। প্লেন ছুটছে এখনো, ভ্যানের দিকে পৌঁছাচ্ছে, তাঁরা সবাই দেখতে পাচ্ছেন ড্রাইভার ঢলে পড়েছে স্টিয়ারিং হুইলের ওপর।

'দারুণ, খুবই পরিষ্কার ছবি পেয়েছি আমরা,' শুরু করল মিলন।

'আব্বাস,' তাকে বাধা দিয়ে বললেন মেজর, 'ওর দৌড়ের কথা বলছিল।'

'জি, স্যার,' বললেন আব্বাস, খুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করলেন, তাকিয়ে আছেন পরদার দিকে। 'ঠিক এ সময় টার্গেটের সরাসরি ওপরে ছিলাম আমি, ওখান থেকে হতাহতদের দেখেছি, এখন যাদের এখানে আপনারা দেখছেন। আমার হিসাবে তখন পঁচাত্তর ছিল, স্যার।'

তাঁর গলার স্বর শান্ত, তবে টান টান। ফিল্মে একটা ফাঁক দেখা গেল, এরপর কিছু সংখ্যা, তারপর আবার ছবি ফুটল।

'এখন আমি দ্বিতীয় দৌড়ের জন্য ফিরে আসছি,' বললেন আব্বাস। 'ফ্লেয়ারের আলো অনেক কমে এসেছে, কিন্তু তারপরও আপনারা দেখতে পাবেন...'

'ফিল্মটা থামাও,' বললেন মেজর।

ফিল্ম সিঙ্গেল ফ্রেমে স্থির হয়ে গেল। তাতে দেখা যাচ্ছে লাশগুলো নিয়ে লম্বা হয়ে পড়ে আছে শহরের প্রধান সড়ক।

'একটু পেছনে যাও।'

পেছন দিকে যাচ্ছে ফিল্ম, জেটটাকে মনে হলো সড়ক থেকে পিছিয়ে যাচ্ছে।

'এখানে! থামো এখানে।'

স্থির হলো ফ্রেম। চেয়ার ছাড়লেন মেজর, হেঁটে পরদার

পাশে পৌঁছালেন, ঝুঁকে একটা পাশ দেখছেন।

'এটা দেখো,' বলে এক লোকের কাঠামোর দিকে আঙুল তাক করলেন। ওই ব্যক্তি হাঁটু পর্যন্ত লম্বা সাদা জোব্বা বা কোট পরে আছেন, দাঁড়ানো অবস্থায় মুখ তুলে তাকিয়ে আছেন প্লেনের দিকে। তিনি একজন বৃদ্ধ মানুষ, মুখে বলিরেখা ফুটে আছে, চোখ দুটো বিস্ফারিত।

'কী মনে হচ্ছে তোমার?' মিলনকে জিজ্ঞেস করলেন মেজর।

পরদার আরও কাছে সরে গেল মিলন। কাঠামোটা দেখে ভ্রু কোঁচকাল। 'আবার চালাও, আরেকটু সামনে নিয়ে যাও।'

ছবি এগোল একটু। উপস্থিত সবাই পরিষ্কার দেখতে পেল ওই ব্যক্তি তাঁর মাথা ঘোরালেন, কোটরের ভেতর তাঁর চোখও নড়ছে, মাথার ওপর দিয়ে তাঁকে পাশ কাটানো প্লেনটাকে অনুসরণ করছে দৃষ্টি দিয়ে।

'এবার পেছনে চলো,' বলল মিলন।

আগের ফ্রেমে ফিরে এল ছবি। মিলন বোকার মতো হাসছে। 'ওই ভদ্রলোককে আমার জীবিত বলে মনে হচ্ছে, স্যার।'

'হ্যাঁ,' কাটা কাটা গলায় বললেন মেজর। 'অবশ্যই জীবিত তিনি।' ধীরে ধীরে ঘুরলেন, বেরিয়ে গেলেন কামরা ছেড়ে।

বেরিয়ে যাচ্ছেন মেজর, দোরগোড়ায় থেমে আবার ঘুরলেন, গম্ভীর সুরে বললেন তিনি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে যাচ্ছেন; আরও বললেন, পরবর্তী নোটিশ না দেওয়া পর্যন্ত সব লোককে ঘাঁটির ভেতর যার যার কোয়ার্টারে থাকতে হবে, ফোন স্পর্শ করা নিষেধ এবং এই কামরায় যা তাঁরা দেখেছেন সবটাই গোপনীয়।

করিডরে বেরিয়ে সোজা মিশন কন্ট্রোলে চলে গেলেন মেজর আবদুল্লাহ, তাঁর পিছু নিলেন লে. রাহি।

'আমি চাই আপনি জেনারেল কায়কোবাদকে ডাকুন,' মেজর বললেন রাহিকে। 'তাঁকে জানান যথাযথ কর্তৃত্ব ছাড়াই এসওই ঘোষণা করেছি আমি এবং বলুন তিনি যেন এখনই এখানে চলে আসেন।'

লে. রাহি নড়তে পারলেন না, যেন পাথর হয়ে গেছেন, সব ভুলে মেজরের হাত আর ঠোঁটের দিকে পালা করে তাকাচ্ছেন—ওগুলো কাঁপছে। 'স্যার, আপনি...'

বাঘের মতো হুংকার ছাড়লেন মেজর। 'কী বললাম আমি? কী হুকুম করলাম?'

এবার রাহির নিজেরও ওই অবস্থা হলো। ফোনের দিকে হাত বাড়িয়েছেন, দেখলেন তাঁরও ওটা কাঁপছে। ডায়াল করতে সময় লাগছে, মাঝপথে বন্ধ করে দিয়ে মেজরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'স্যার, কথাটা আপনি নিজে তাঁকে বললে ভালো হতো না?' তাঁর ঠোঁট কাঁপছে, তিনি তোতলাচ্ছেন।

মেজর তাঁর দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ালেন। 'যা বলেছি, করুন। আমার অন্য কাজ আছে।'

জেনারেল কায়কোবাদকে পাওয়া গেল না, মেসেজটা দিতে হলো তাঁর এইডকে।

রিসিভার নামিয়ে মেজরের দিকে তাকালেন রাহি, বললেন, 'স্যার, আপনার মতো আমিও একই ভয় পাচ্ছি।'

'আপনার ভয়? কী সেটা, শুনি?' জিজ্ঞেস করলেন মেজর, ঘুরলেন লেফটেন্যান্টের দিকে।

'আল্লাহ মাফ করবেন, স্যার, কোনো ধরনের প্লেগ?'

'শ্‌শ্‌!' ঠোঁটে একটা আঙুল রেখে হিসহিস করলেন মেজর আবদুল্লাহ। 'এটা ইমার্জেন্সি, এটা গোপনীয়, এত তাড়াতাড়ি সব ভুলে গেলেন?'

৪. সতর্কতা

মেজর তুষার আবদুল্লাহ শব্দনিরোধক ছোট্ট খুপরির ভেতর ঢুকে টেলিফোনের সামনে যখন বসলেন, তাঁর জানা আছে কী তাঁকে করতে হবে, তবে কাজটা তিনি কেন করতে যাচ্ছেন সে সম্পর্কে তাঁর পরিষ্কার কোনো ধারণা নেই।

প্রজেক্ট অতুলের একজন বড় কর্মকর্তা হিসেবে প্রায় এক বছর আগে প্রজেক্ট দাবানল সম্পর্কে ব্রিফ করা হয়েছিল তাঁকে। ব্রিফ করেছিলেন, মেজরের মনে আছে, ছোটখাটো শুকনো খটখটে এক ভদ্রলোক, মেপে মেপে কথা বলেন। ঢাকা ইউনিভার্সিটির একজন প্রফেসর তিনি, প্রজেক্টটা কী নিয়ে তার একটা ধারণা দেন তাঁকে। খুঁটিনাটি সব এখন আর মনে নেই মেজরের, শুধু এটুকু মনে আছে যে কোথাও একটা ল্যাবরেটরি আছে এবং পাঁচ ব্যক্তির একটা টিমকে ওই ল্যাবরেটরিতে উপস্থিত হতে বলা যাবে। ওই টিমের কাজ হলো মহাশূন্য থেকে ফিরে আসা বাংলাদেশি মহাশূন্যযানগুলো পৃথিবীর বাইরের সম্ভাব্য লাইফ ফর্মের সংস্পর্শে আসছে কি না তদন্ত করে দেখা।

টিমের ওই পাঁচ ব্যক্তি কারা, মেজরকে তা জানানো হয়নি; তিনি শুধু জানেন বিশেষ প্রতিরক্ষা দপ্তর একটা হটলাইন আলাদা করে রেখেছে প্রয়োজনে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য।

পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করলেন মেজর। ভেতরে অনেক কার্ড দেখা যাচ্ছে, নির্দিষ্ট একটা আলাদা করলেন, তাতে কয়েকটা সংখ্যা লেখা, আর লেখা আছে: কোথাও যদি আগুন লাগে। ৮৭ নম্বরে জানান। শুধুমাত্র জরুরি অবস্থায়।

সংখ্যাগুলো কোড, কার্ডটা তাঁকে দেওয়ার সময় প্রফেসর ভদ্রলোক কোড কীভাবে ভাঙতে হবে শিখিয়ে দিয়ে গেছেন।

কাগজ-কলম নিয়ে কোড ভাঙছেন মেজর। জটিল কিছু নয়, মিনিট দশেক লাগল একটা ফোন নম্বর পেতে। একবার ফোনের দিকে, একবার হাতের কাগজটার দিকে পালা করে তাকাচ্ছেন তিনি, আর ভাবছেন এই নম্বরে ডায়াল করলে ঠিক কী ঘটবে আসলে? কার সঙ্গে কথা বলবেন তিনি? কেউ কি তাঁকে পাল্টা ফোন করবে? নাকি প্রথমে তাঁর সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া হবে?

চোখ রগড়ে আবার কাগজটার দিকে তাকালেন। অবশেষে কাঁধ ঝাঁকালেন, যা-ই ঘটুক তাঁকে তো ডায়াল করতেই হবে। অপর প্রান্তে মৃদু গুঞ্জন, যেন মৌমাছি উড়ছে। তারপর শব্দটা থামল, শোনা গেল একটা পুরুষ কণ্ঠ: এটা রেকর্ডিং। নিজের নাম বলুন, মেসেজ দিন, তারপর কেটে দিন লাইন।

'মেজর তুষার আবদুল্লাহ। দেওগাঁ এয়ারফোর্স বেস, অতুল মিশন নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র। আমার বিশ্বাস দাবানল সতর্কতা জারি করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এই পোস্টে আমার কাছে নিশ্চিতকরণের উপযোগী চাক্ষুষ তথ্যপ্রমাণ আছে, যে পোস্ট নিরাপত্তার কারণে এই মাত্র বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।'

কথাগুলো বলার সময় মেজরের মনে হলো, সতর্ক করার তাঁর এই চেষ্টা হয়তো কোনো কাজে আসবে না। সংশ্লিষ্ট লোকজন তাঁর মেসেজ পড়বেন, কিন্তু দেখা যাবে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন না। লাইন কেটে দেওয়ার কথা, তা না কেটে কানে ধরে আছেন তিনি। তারপর ক্লিক করে একটা শব্দের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল লাইন। রিসিভার নামিয়ে রেখে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। গোটা ব্যাপারটা তাঁর জন্য অসন্তোষ বয়ে আনল।

মেজর আবদুল্লাহ আশা করেছিলেন মিনিট দশেকের মধ্যে তাঁকে ঢাকায় ডেকে পাঠানো হবে, তাঁর আরও আশা ছিল যে পরবর্তী কয়েক ঘণ্টায় প্রচুর ফোন আসবে তাঁর কাছে, আর তাই ফোন ছেড়ে একচুল নড়েননি। কিন্তু কোনো ফোন এল না, কারণ মেজরের জানা নেই যে তিনি যে প্রক্রিয়াটা সচল করেছেন সেটা স্বয়ংক্রিয়। একবার চালু হবার পর দাবানল সতর্কতা নিজের নির্দিষ্ট ছক ধরে এগোতে থাকবে এবং সেটা



সৈকত মোন্তাজের চোখে অত্যাধুনিক দুরবিন

অন্তত পরবর্তী বারো ঘণ্টার মধ্যে প্রত্যাহার করা যাবে না। মেজর ফোন করার দশ মিনিটের মধ্যে দেশের সবচেয়ে নিরাপদ কেব্‌লের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে একটা বার্তা পৌঁছে গেল। পাঁচ মিনিট পর আরেকটা বার্তা গেল দাবানল ইউনিটের কাছে।

প্রথম বার্তায় বলা হয়েছে, 'দাবানল সতর্কতা জারি করা হয়েছে।' নিচে একটা তালিকা, কোন কোন প্রতিষ্ঠানে এই বার্তা পাঠানো হয়েছে। তারপর বার্তার শেষ অংশে বলা হয়েছে, 'প্রেসকে অন্ধকারে রাখার আদেশ জারি করা হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সতর্কতা ধরন ৭-! ২ বহাল থাকবে।'

এটা একটা স্বয়ংক্রিয় বেতারবার্তা, সতর্কতা ধরন ৭-১২ বহাল হওয়ার নির্দেশও তাই এবং তার সূত্রপাত ঘটেছে মেজর তুষার আবদুল্লাহর ওই ফোন করা থেকে।

দ্বিতীয় বার্তায় বলা হয়েছে, 'এই কজন বাংলাদেশি নাগরিককে বিরল শ্রেণি-২ নিরাপত্তা অনুমতি দান করা হয়েছে, এর আগে তাঁদের নিরাপত্তা অনুমতি ছিল বিরল শ্রেণি-৯। প্রয়োজনে রাষ্ট্রের যেকোনো গোপনীয়তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং যাচাই করতে পারবেন তাঁরা; রাষ্ট্রের সব কর্মকর্তার কাছে জবাবদিহি চাওয়ার অধিকার তাঁদের জন্য সংরক্ষিত থাকল; এখানে নামগুলো সংযুক্ত করা হলো :

'কুমার মুশফিক, সম্রাট বাবর, সদয় জাহান, সুনীল দস্তপির...এই নামটা বাতিল করতে হবে, নতুন করে পড়তে হবে, সুনীল দস্তগির এবং উত্তম নওয়াব। পরবর্তী নোটিশ না দেওয়া পর্যন্ত তাঁরা প্রত্যেকে বিরল শ্রেণি-২ অনুমতি ব্যবহার করতে পারবেন।'

এক অর্থে এই বার্তা রীতিপালন মাত্র, এটার উদ্দেশ্য ছিল সংশ্লিষ্টদের এটা জানানো যে পাঁচ ব্যক্তিকে সংকেত (কোড) 'ঠিক আছে' দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বলতে হবে যে মেশিন একটা নাম রিপ্রিন্টের সময় ভুল করেছে এবং পুরো বার্তাটা নতুন করে পড়েনি (এমনিতে নিয়ম হলো ভুল হলে পুরো বার্তা বাতিল করে দিয়ে নতুন করে প্রিন্ট করবে কম্পিউটার, তারপর সেটা কোথাও পাঠানো হবে।)।

বার্তাটা নিয়ে তাই সন্দেহ দেখা দিল। ঢাকা এবং অন্যান্য জায়গায় একজন কম্পিউটার বিশেষজ্ঞকে ডেকে বলা হলো, বার্তাটা ঠিক আছে কি না নিশ্চিত করো। ঢাকার বিশেষজ্ঞ বার্তার মান নিয়ে পাল্টা প্রশ্ন তুললেন, কারণ মেশিন আরও ছোটখাটো ভুল করে রেখেছে, যেমন যেখানে **১** হবে সেখানে ছেপেছে **!**।

সংক্ষেপে এর প্রতিক্রিয়ায় তালিকার শুধু প্রথম দুটো নাম নিরাপত্তা অনুমতি পেলেন, বাকিরা পেলেন না, নিশ্চিতকরণ স্থগিত অবস্থায় থেকে গেল।

দ্বিতীয় দিন

৫. গভীর রাত

মিসেস কুমার মুশফিক খুব ক্লান্ত বোধ করছেন। ময়মনসিংহ পাহাড়ি এলাকায় তাঁদের বাড়ি, বাড়ি থেকে স্ট্যানফোর্ড ক্যাম্পাস দেখতে পাওয়া যায়, তিনি এবং তাঁর স্বামী—ভদ্রলোক স্ট্যানফোর্ড ভার্সিটির ব্যাকটেরিওলজি ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান—পনেরোটা দম্পতির জন্য একটা ঘরোয়া পার্টির আয়োজন করেছেন। ভদ্রোচিত একটা সময়

পার হয়ে গেলেও অতিথিরা বিদায় নিতে আরও রাত করছেন। ক্লান্ত মিসেস মুশফিক অস্বস্তি বোধ করছেন, দ্বিতীয়বার কফি পরিবেশন করা হয়েছে, তাও দুই ঘণ্টা হয়ে গেল অথচ সবাই চুটিয়ে আড্ডা মারছেন।

রাত প্রায় বারোটা বাজতে চলেছে, এই সময় নক হলো দরজায়। এত রাতে আবার কে এল দেখতে গিয়ে মিসেস মুশফিক রীতিমতো হকচকিয়ে গেলেন। তাঁর সামনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে সামরিক বাহিনীর দুজন লোক। দুজনকেই কেমন যেন আড়ষ্ট আর নার্ভাস দেখাচ্ছে।

'কী সাহায্য দরকার, বলুন, প্লিজ।'

'দুঃখিত, ম্যাডাম,' তাদের একজন সবিনয় বললেন, 'কিন্তু এটা কি ডক্টর কুমার মুশফিকের বাড়ি?'

'হ্যাঁ,' বললেন ভদ্রমহিলা। 'আমি তাঁর স্ত্রী।' লোক দুজনকে পাশ কাটিয়ে তাঁর দৃষ্টি আরও দূরে চলে গেল, দেখলেন গাড়ি-বারান্দায় একটা মিলিটারি সেডান দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেটার পাশে আরেক লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন, লোকটার হাতে কী যেন একটা ধরা রয়েছে। 'ওই লোকের হাতে ওটা অস্ত্র নাকি?' জানতে চাইলেন তিনি।

উত্তর না দিয়ে অফিসার বললেন, 'ম্যাডাম, ডক্টর মুশফিকের সঙ্গে এই মুহূর্তে আমরা দেখা করতে চাই।'

মিসেস মুশফিকের কাছে এটা সম্পূর্ণ অচেনা একটা পরিস্থিতি, কোনো কারণ ছাড়াই ভয় পাচ্ছেন তিনি। এই ইউনিফর্ম পরা চতুর্থ লোকটাকে দেখতে পেলেন, আলোছায়ায় ঢাকা লনে হাঁটছেন, চোখ বুলাচ্ছেন বাড়ির প্রতিটি জানালার ওপর। এই লোকের হাতে রাইফেল রয়েছে। 'কী ঘটছে এখানে?'

'ম্যাডাম, আমরা আপনাদের পার্টিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে চাইছি না। দয়া করে ডক্টর মুশফিককে দরজায় ডাকুন।'

'আমি জানি না তিনি...'

'তা না হলে ভেতরে ঢুকে তাঁকে নিয়ে আসব আমরা,' বললেন অফিসার।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করলেন মিসেস মুশফিক, তারপর বললেন, 'এখানে অপেক্ষা করুন।'

পিছু হটে এসে দরজা বন্ধ করতে গেলেন তিনি, কিন্তু তার আগেই প্যাসেজে ঢুকে পড়লেন দ্বিতীয় অফিসার। দরজার পাশে টান টান হয়ে এবং বিনয়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকলেন, মাথার হেলমেট হাতে নিয়ে। 'আমি শুধু এখানে অপেক্ষা করি, ম্যাডাম,' বললেন তিনি, মিসেস মুশফিকের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন।

অতিথিদের কাছে ফিরে গেলেন মিসেস, চেষ্টা করছেন তাঁকে দেখে কেউ যাতে কিছু বুঝতে না পারে। সবাই হাসি-ঠাট্টা আর গল্পে মশগুল, স্বামীকে তিনি এক কোণে পেলেন। তাঁর কাঁধ ছুঁলেন তিনি, দল থেকে নিজেকে সরিয়ে আনলেন ডক্টর মুশফিক।

'জানি শুনতে হাস্যকর লাগবে, কিন্তু প্যাসেজে আর্মির কজন লোক দাঁড়িয়ে আছেন,' বললেন মিসেস। 'পিস্তল আর রাইফেল হাতে বাইরেও আছেন দুজন। বলছেন তোমার সঙ্গে দেখা করবেন।'

প্রথমে ডক্টর মুশফিককে বিস্মিত দেখাল, তারপর শান্ত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন। বললেন, 'ব্যাপারটা আমি দেখছি।' স্বামীর ভাবভঙ্গি স্ত্রীকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিল, মনে হলো তিনি যেন আশা করছিলেন এ রকম কিছু একটা ঘটবে।

'তুমি যদি জানতে ওরা আসতে পারে, তাহলে আমাকে তোমার জানানো উচিত ছিল...'

'আমি জানতাম না,' ডক্টর মুশফিক বললেন। 'বিষয়টা পরে আমি ব্যাখ্যা করব।'

প্যাসেজে বেরিয়ে এলেন তিনি। অফিসার তখনো ওখানে অপেক্ষা করছেন। স্বামীর পিছু নিয়ে মিসেসও চলে এসেছেন।

মুশফিক বললেন, 'আমি ডক্টর মুশফিক।'

'ক্যাপটেন প্রশান্ত,' বললেন অফিসার, হাত বাড়ালেন না। 'একটা আগুন লেগেছে, স্যার।'

'ঠিক আছে,' বললেন মুশফিক, চোখ নামিয়ে ডিনার জ্যাকেটের দিকে তাকালেন। 'আমার কি চেঞ্জ করার সময় আছে?'

'দুঃখিত, স্যার।'

অবাক বিস্ময়ে মিসেস দেখলেন তাঁর স্বামী শান্তভাবে মাথা ঝাঁকালেন, বললেন, 'ঠিক আছে।'

স্ত্রীর দিকে ফিরে মুশফিক বললেন, 'আমাকে যেতে হচ্ছে।' তাঁর মুখ সাদা কাগজ বললেই হয়, কোনো ভাবই ফোটেনি।

মিসেস ভয় পাচ্ছেন, মনে হচ্ছে তিনি একটা দুঃস্বপ্নের ভেতর আছেন। 'তুমি ফিরবে কখন?'

'সেটা ঠিক বলতে পারছি না। হয়তো এক কি দুই সপ্তা লাগবে। বেশিও হতে পারে।'

মিসেস মুশফিক গলার আওয়াজ নিচু রাখার চেষ্টা করছেন। 'এটা কী? মানে ব্যাপারটা কী নিয়ে? তুমি কি অ্যারেস্ট?'

'না,' বললেন মুশফিক, একটু হাসির সঙ্গে। 'সে রকম কিছু না। আমার হয়ে সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ো, ঠিক আছে?'

'কিন্তু ওই অস্ত্রগুলো কেন...'

'মিসেস মুশফিক,' সামরিক অফিসার বললেন, 'আপনার স্বামীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব। এখন থেকে তাঁর কোনো ক্ষতি বা কোনো রকম বিপদ হতে দেওয়া যাবে না।'

'হ্যাঁ, ঠিক,' মুশফিক বললেন। 'বুঝতে পারছ না, হঠাৎ করে আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষ হয়ে গেছি।' আবার হাসলেন, একটু অদ্ভুত লাগল দেখতে, তারপর স্ত্রীর কাঁধে একবার হাত রেখে একটু চাপ দিলেন।

এরপর, কী ঘটছে ভালো করে বুঝতে পারার আগেই, মিসেস দেখলেন দরজা টপকে তাঁর স্বামী বাইরে বেরিয়ে গেলেন—তাঁর এক পাশে হাঁটছেন ক্যাপটেন প্রশান্ত, আরেক পাশে অপর অফিসার। রাইফেল হাতে অফিসারকে কিছু বলতে হলো না, তিনি ওদের তিনজনের পেছনে চলে এলেন। গাড়ির পাশে দাঁড়ানো অফিসার স্যালুট করলেন ডক্টর মুশফিককে, দরজা খুলে সরে দাঁড়ালেন এক পাশে।

গাড়ির আলো জ্বলল, দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ হলো, একটা অর্ধবৃত্ত তৈরি করে চলে যাচ্ছে সেটা, দেখতে না দেখতে মাঝরাতের অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

গাড়ির ভেতর হেলান দিয়ে বসে আছেন ডক্টর মুশফিক, অফিসারদের দিকে চোখ। সবার চেহারা নির্বিকার। 'আমার জন্য কী আছে বলুন।'

'থাকবে, স্যার?'

'ধ্যাত্তেরি ছাই, কিছু থাকবে না? আমার জন্য নিশ্চয়ই তাঁরা কিছু দিয়েছেন আপনাদের।'

'ও, হ্যাঁ, স্যার।'

ডক্টর মুশফিকের হাতে একটা পাতলা ফাইল ধরিয়ে দেওয়া হলো, বাদামি কার্ডবোর্ড কাভারে স্টেনসিল করা: প্রজেক্ট সারমর্ম, অতুল।

'আর কিছু নেই?'

'না, স্যার।'

দীর্ঘশ্বাস চাপলেন মুশফিক। প্রজেক্ট অতুল সম্পর্কে এই প্রথম জানছেন তিনি। ফাইলটা অত্যন্ত সাবধানে পড়া দরকার। কিন্তু গাড়ির ভেতর আলো খুব কম। কাজেই, ভাবলেন, প্লেনে বসে পড়ে নিতে হবে।

তারপর তিনি পাঁচ বছর অতীতে ফিরে গেলেন, ফিরে

গেলেন হাতিয়া দ্বীপে, আশ্চর্য এক সিম্পোজিয়ামে, যেখানে ব্রিটিশ বায়োফিজিসিস্ট জে. মেরিক একটা পেপার পড়েছিলেন, তাতে তিনি খুব জোর দিয়ে বলতে চেষ্টা করেছিলেন যে পৃথিবীর বুকে শুধু সরল লাইফ ফর্ম দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এবং সেগুলোকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি; কিন্তু পৃথিবীর বাইরে থেকে যে লাইফ ফর্ম আমাদের এখানে হামলা চালাতে আসবে, বেশির ভাগ সম্ভাবনা সেগুলো হবে জটিল লাইফ ফর্ম। এবং সমূহ আশঙ্কার কথা হলো এই যে জটিল লাইফ ফর্মকে ধ্বংস করার প্রযুক্তির জ্ঞান বা কারিগরি বিদ্যা আমাদের নেই, কাজেই সেই যুদ্ধে মানুষের শোচনীয় পরাজয় ঘটার আশঙ্কা প্রবল।

মেরিক তাঁর দীর্ঘ বক্তব্যে ১০০০০ জটিল টাইপের লাইফ ফর্মের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন, এগুলোর দ্বারা যেকোনো সময় মানবজাতি আক্রান্ত হতে পারে। সবচেয়ে বড় বিপদের কথা, এই লাইফ ফর্মগুলোকে মানুষ চিনতে পারবে না বা চিনতে অনেক দেরি করে ফেলবে এবং ওগুলোর আকার হবে সম্ভবত পৃথিবীর ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসের মতো অথবা ওগুলোর চেয়েও অনেক ছোট।

পরে সিম্পোজিয়ামের বাইরে এক আলোচনায় বসে মেরিক বলেছিলেন, মানুষ এই যে একের পর এক সৌরজগতের গ্রহগুলোতে আসা-যাওয়া করছে, এর ফলেও পৃথিবীতে হঠাৎ একদিন প্লেগের আক্রমণ শুরু হয়ে যেতে পারে। তাঁর এই কথা শুনে উপস্থিত কিছু বিজ্ঞানী হাসাহাসি করেছিলেন, তবে সবাই না। তাঁর কথাকে অল্প যে কজন গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন ডক্টর কুমার মুশফিক। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ছত্রিশ, সম্ভবত ওই সিম্পোজিয়ামের সবচেয়ে বিখ্যাত এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন তিনি। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে ব্যাকটেরিওলজির প্রফেসর ছিলেন তখন, ত্রিশ বছর বয়স থেকে পড়াচ্ছিলেন ওখানে। সিম্পোজিয়ামের আগের বছর নোবেল প্রাইজ পান তিনি। তাঁকে এই পুরস্কার দেওয়া হয় বিজ্ঞানচর্চায় বিশেষ অবদান রাখার জন্য—মিউটেশনের মাধ্যমে পরিবর্তিত জিন-কাঠামো নিয়ে নতুন একটা জীবাণু যে পরিণতি এবং বৈশিষ্ট্য লাভ করে সেটাকে আবার বদলে আগের প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন তিনি।

মানুষটা একহারা, মাথায় টাক চলে এসেছে, বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তির অধিকারী, বৈজ্ঞানিক ঘটনার ক্যাটালগ বলা হয় তাঁকে। তাঁর অস্বাভাবিক একটা বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি সব সময় সব বিষয়ে অসহিষ্ণু, তাঁর ধারণা, সবাই তাঁর সময় নষ্ট করছে। মানুষকে কথা বলতে বাধা দেওয়াও তাঁর আরেকটা বাজে অভ্যাস, চেষ্টা করেও এটা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারেন না। তবে উপদেষ্টা হিসেবে অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও জনপ্রিয় তিনি। তাঁর এই গুণই তাঁকে প্রকল্প দাবানলে জায়গা করে দিয়েছে।

'আপনার জন্য এটাই সবচেয়ে দ্রুত বাহন জোগাড় করতে পেরেছি আমরা, স্যার,' আর্মির ক্যাপটেন প্রশান্ত বললেন।

চল্লিশজন সৈনিককে বসতে দেওয়া যাবে, এত বড় একটা হেলিকপ্টারে উঠলেন ডক্টর মুশফিক, নাম শিকারি বাজ। ভেতরটা পুরো খালি। তাঁকে কপ্টারে তুলে দিয়ে আর্মি অফিসার গায়েব হয়ে গেলেন, তাঁর জায়গায় হাজির হলো একজন স্টুয়ার্ডেস, তবে কাঁধে লেখা—মিলিটারি পুলিশ আর কোমরে জড়ানো হোলস্টারে গোঁজা রয়েছে একটা পিস্তল। ইঞ্জিন স্টার্ট নিচ্ছে, তরুণী দাঁড়িয়ে রয়েছেন গেটের পাশে।

একটা সিটে বসার পর ফাইলে চোখ বুলাচ্ছেন ডক্টর মুশফিক। গুরুত্বপূর্ণ ফাইল, ধীরেসুস্থে পড়া দরকার, কিন্তু তিনি দ্রুত পাতা উল্টে যাচ্ছেন। সেটা দেখে এমপি নিশ্চয় ভাবলেন তাঁর প্যাসেঞ্জার স্রেফ চোখ বুলাচ্ছেন, পড়ছেন না। তাঁর আসলে জানা নেই, ডক্টর মুশফিক প্রতিটি শব্দ পড়ছেন।

অতুল হলো মেজর জেনারেল অসীম হায়দারের ব্রেন চাইল্ড। আর্মির মেডিকেল কোরের প্রধান তিনি, সেটা কেমিক্যাল অ্যান্ড বায়োলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার ডিভিশনের অধীনে। অসীম হায়দারের দায়িত্ব হলো বরিশাল, দিনাজপুর, চট্টগ্রাম, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর আর পাবনায় যে সিবিডব্লিউ রিসার্চ ফ্যাসিলিটি গড়ে তোলা হয়েছে সেগুলো দেখাশোনা করা। ডক্টর মুশফিকের সঙ্গে এক কি দুবার দেখা হয়েছে তাঁর, যতটুকু মনে করতে পারছেন অসীম হায়দার শান্ত প্রকৃতির মানুষ, চশমা পরেন। তাঁকে দেখে ভাবা যায় না যে এত বড় একটা কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাঁকে।

ফাইল পড়ে ডক্টর মুশফিক জানলেন, ২০৪১ সালে নোয়াখালী জেলায় গড়ে তোলা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশন অব টেকনোলজির অধীনে জেট প্রপালশন ল্যাবরেটরিতে কাজ শুরু করে প্রজেক্ট অতুল। এই প্রকল্পের কাজ হলো সৌরজগতের ভেতর থেকে যেকোনো জীবাণু, যদি পাওয়া যায়, সংগ্রহ করা। এক অর্থে এটা আর্মির একটা প্রজেক্ট, তবে এটার ভিত্তি তৈরি করেছে ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, যেটাকে একটা সিভিলিয়ান প্রতিষ্ঠান বলে ধরে নেওয়া হয়। বাসা আসলে এমন একটা সরকারি এজেন্সি, সমস্ত কাজের আশি ভাগই সামরিক, তার মধ্যে ২০৪১ সালে তাদের শতকরা ৪৩ ভাগ কাজই ছিল ক্লাসিফায়েড।

থিওরি বলছে জেট প্রপালশন ল্যাবরেটরি এমন কৃত্রিম উপগ্রহের নকশা তৈরি করছে, যেগুলো মহাশূন্য থেকে অতি ক্ষুদ্র জীবাণু আর ধুলো সংগ্রহ করবে ল্যাবে বসে পাঠ করার জন্য। এটাকে নির্ভেজাল বৈজ্ঞানিক প্রজেক্ট বলে গণ্য করা হয় এবং ওই পাঠ কর্মসূচিতে যেসব বিজ্ঞান জড়িত তাঁরা সেটা মেনেও নিয়েছেন।

তবে, এই প্রজেক্টের আসল লক্ষ্য হলো নতুন লাইফ ফর্ম সংগ্রহ করা, যেগুলো দেশের তিতুমীর কেল্লা প্রোগ্রামে কাজে লাগতে পারে। সারমর্ম হলো, জীবাণুযুদ্ধে কাজে লাগানোর উপযোগী নতুন অস্ত্র আবিষ্কারের চেষ্টা।

তিতুমীর কেল্লা প্রোগ্রামের বিশাল হেডকোয়ার্টার রাজশাহীতে, ওখানে দেশের বিজ্ঞানীরা রাসায়নিক এবং জীবাণুযুদ্ধের নতুন নতুন অস্ত্র আবিষ্কারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রায় সব দেশই ধরে নিয়েছে যে আজ হোক বা কাল মহাশূন্য থেকে পৃথিবীর ওপর জীবাণুযুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হবে। কাজেই সবাই যে যার সাধ্যমতো প্রস্তুতি নিয়ে রাখছে।

যাত্রার মাঝপথে তাঁর ফাইল পড়ায় বাধা পড়ল। আর্মির একজন অফিসার, সঙ্গে একটা ফোন, সামনে এসে দাঁড়ালেন। তারপর ওই ফোনে ডক্টর মুশফিক যখন কথা বলতে শুরু করলেন, পিছু হটে ভদ্রোচিত দূরে সরে গেলেন অফিসার।

'ইয়েস?' ফোনে বললেন ডক্টর মুশফিক, আড়ষ্ট বোধ করছেন। মাঝ আকাশে ফোনে আলাপ করতে অভ্যস্ত নন।

'এদিকে আমি জেনারেল তৌফিকুর রাহমান,' একটা ক্লান্ত গলা ভেসে এল। জেনারেল তৌফিকুর রাহমানকে চেনেন না মুশফিক। 'আমি শুধু আপনাকে এটুকু জানাতে চাই যে টিমের সব সদস্যকেই ডাকা হয়েছে, শুধু প্রফেসর সুনীল দস্তগিরকে বাদে।'

'কী ঘটেছে?'

'প্রফেসর দস্তগির হাসপাতালে,' জেনারেল রাহমান বললেন। 'ল্যান্ড করার পর বিশদ জানতে পারবেন।'

আলাপ শেষ হলো। হাতের টেলিফোন আর্মি অফিসারকে ফিরিয়ে দিলেন মুশফিক। সব সদস্যকে ডাকা হয়েছে, ভাবলেন তিনি, তার মানে পরিস্থিতি অনেক গুরুতর। শিরশিরে একটা অনুভূতি হলো। আল্লাহই জানেন কী ঘটেছে!

তারপর এক এক করে টিম সদস্যদের কথা ভাবলেন তিনি। কার কেমন প্রতিক্রিয়া হলো কে জানে, সবাইকে নিশ্চয়

বিছানা থেকে তোলা হয়েছে।

তাঁদের একজন সম্রাট বাবর। তাঁর প্রতিক্রিয়া হবে ক্ষিপ্র। ইনি একজন কেমিক্যাল মাইক্রোবায়োলজিস্ট, সংক্রামক ব্যাধির চিকিৎসায় অভিজ্ঞ। প্লেগ আর মহামারি প্রচুর দেখা আছে বাবরের, কাজেই দ্রুত তৎপর হবার প্রয়োজনীয়তা তার চেয়ে ভালো আর কে বুঝবে। সাহসী এবং জেদি মানুষ, বিপদ যত বড়ই হোক পিছু হটতে জানেন না। ভারী শরীর তাঁর, বদরাগী চেহারা, চোখে রাজ্যের বিষাদ।

তারপর আছেন সদয় জাহান। তাঁকে ডক্টর মুশফিক কখনোই খুব একটা পছন্দ করতে পারেননি, তবে তাঁর ভেতর যে বৈজ্ঞানিক মেধা আছে, সেটা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেন। জাহান আর মুশফিক দুজনের ধরন একদম আলাদা : মুশফিক যেখানে গোছানো স্বভাবের, জাহান সেখানে সবকিছু এলোমেলো করে রাখেন; মুশফিক ধীর, জাহান অসহিষ্ণু; মুশফিক আত্মবিশ্বাসী, জাহান নার্ভাস।

তারপর আছেন অ্যানথ্রোপলজিস্ট সুনীল দস্তগির, আলিগড় ইউনিভার্সিটির সিলেট শাখায় পড়ান—পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে আসতে পারবেন না। রিপোর্ট যদি সত্যি হয়, মুশফিক তাঁর অভাব অনুভব করবেন। এই ভদ্রলোককে প্রায় সময় তথ্যবিভ্রাটের শিকার হতে দেখা যায়। সারাক্ষণ সেজেগুজে থাকার দিকে ঝোঁক। যেন দুর্ঘটনাবশতই আশ্চর্য একটা লজিক্যাল ব্রেন পেয়ে গেছেন। গণিতের অনেক জটিল প্রতীকী সমস্যার সমাধান পাবার আশায় অনেকেই ছুটে আসেন তাঁর কাছে, শোনা যায় আজ পর্যন্ত কাউকে তিনি হতাশ করেননি।

পঞ্চম ব্যক্তি তাঁর কোনো কাজে লাগবে বলে মনে করেন না ডক্টর মুশফিক। উত্তম নওয়াবের কথা মনে পড়তেই তাঁর ভ্রু জোড়া নিজে থেকে কুঁচকে গেল। টিমের আপস করা একজন প্রার্থী এই উত্তম নওয়াব। মেটাবলিক ডিজিজে অভিজ্ঞতা আছে এমন একজন ফিজিশিয়ান পেলে খুশি হতেন ডক্টর মুশফিক, তার পরিবর্তে অনিচ্ছা সত্ত্বেও একজন সার্জেনকে মেনে নিতে হয়েছে তাঁর। নওয়াবকে গ্রহণ করার জন্য অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন আর ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট থেকে প্রচুর চাপ ছিল, সেই চাপের কাছে মুশফিকসহ বাকি সবাইকে হার মানতে হয়েছে।

উত্তম নওয়াবকে ভালো করে চেনেন না কুমার মুশফিক। ভাবছেন, সতর্কতা জারি করা হয়েছে শুনলে কেমন প্রতিক্রিয়া হবে ভদ্রলোকের। মুশফিকের আসলে জানা নেই টিমের সবাইকে খবর দিতে কত সময় লেগে যাচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে, তাঁর জানা নেই সকাল পাঁচটার আগে পর্যন্ত প্যাথলজিস্ট সদয় জাহান ডাক পাননি। সকাল সাড়ে ছয়টার আগে ডাকা হয়নি মাইক্রোবায়োলজিস্ট সম্রাট বাবরকে—ওই সময় হাসপাতালে আসেন তিনি এবং তখন তাঁকে খবরটা দেওয়া হয়েছে।

আর উত্তম নওয়াব ডাক পেয়েছেন সকাল সাতটা পাঁচে।

উত্তম নওয়াব তখন হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে, সদ্য ধোয়া হাত দুটো লম্বা করা, একজন নার্স একটা তোয়ালে বাড়িয়ে দিলেন। কামরায় আরও কজন নার্স রয়েছেন, অচেতন এক রোগীকে শল্যচিকিৎসার জন্য প্রস্তুত করছেন তাঁরা, প্রয়োগ করছেন অ্যালকোহল আর আয়োডিন সলিউশন, কাজের ফাঁকে সবাই তাঁরা ডক্টর নওয়াবের কুশলাদি জানতে চাইছেন।

হাসপাতালে ছটফটে সার্জেন হিসেবে পরিচিত নওয়াব, তাঁর কথা বলা আর হাঁটাচলার মধ্যে সারাক্ষণ একটা অস্থির ভাব দেখা যায়। অন্য যেকোনো সার্জেনের চেয়ে দ্বিগুণ গতিতে কাজ করেন তিনি। সব যখন ঠিকঠাক ঘটতে থাকে, সহকারীদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করতে দেখা যায় তাঁকে, কৌতুক বলে সবাইকে হাসাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু যখনই কোনো ঝামেলা দেখা দেয়, তিনি মন্থর হয়ে পড়েন, হয়ে ওঠেন নিজেই একটা সমস্যা। বেশির ভাগ সার্জেনের মতো রুটিন ধরে কাজ করতে পছন্দ করেন তিনি। নির্দিষ্ট একটা নিয়মে সবকিছু সম্পন্ন হতে হবে, শৃঙ্খলা মেনে। তা না হলে তিনি আপসেট হয়ে পড়বেন।

অপারেটিং রুমের সবাই যেহেতু ব্যাপারটা জানেন, কাজেই ওভারহেড ভিউইং মনিটরে সম্রাট বাবরকে উদয় হতে দেখে সবাই শুধু যে বিস্মিত হলেন, তা নয়, শঙ্কিতও হলেন। বাবর ওপরের অফিস কামরায় রয়েছেন, হাত বাড়িয়ে অন করছেন ইন্টারকম, যেটা অপারেটিং রুমের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। বললেন, 'হ্যালো, নওয়াব।'

সার্জেন নওয়াব তখন রোগীর পেট বাদে সবকিছু জীবাণুমুক্ত সবুজ কাপড় দিয়ে ঢেকে দিচ্ছেন। অবাক হয়ে মুখ তুললেন। 'হ্যালো, বাবর,' বললেন তিনি।

'বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত,' বাবর বললেন। 'তবে এটা আমাদের ইমার্জেন্সি।'

'কিছু করার নেই, অপেক্ষা করতে হবে,' নওয়াব বললেন। 'একটা জরুরি অপারেশনের প্রস্তুতি শুরু করেছি আমরা।' রোগীকে কাপড়ে মোড়া শেষ করে উন্মুক্ত পেটে দস্তানা পরা হাত রাখলেন, অনুভবের সাহায্যে বুঝতে চাইছেন ছুরিটা ঠিক কোথায় ঢোকাবেন।

'এটাকে অপেক্ষায় রাখা যাবে না,' বললেন বাবর।

স্থির হয়ে গেলেন নওয়াব। স্ক্যালপেল নামিয়ে রাখলেন। তাকালেন মুখ তুলে। দীর্ঘ একটা নীরবতা।

'কী ছাই বলতে চাইছেন, অপেক্ষায় রাখা যাবে না মানে?'

বাবর শান্ত থাকছেন। 'আপনাকে এই মুহূর্তে বেরিয়ে আসতে হবে ওখান থেকে। এটা আমাদের ইমার্জেন্সি।'

'শুনুন, বাবর, এখানে আমি একজন রোগীর সঙ্গে রয়েছি। তাঁকে আমরা এই মাত্র অজ্ঞান করেছি। সব প্রস্তুতি শেষ, বাকি আছে শুধু ছুরি চালানো। এই অবস্থায় আমি স্রেফ হেঁটে বেরিয়ে যেতে পারি না...'

'আপনার জায়গায় উদয় চলে আসছেন।'

উদয় হাসান এই হাসপাতালের একজন স্টাফ সার্জেন।

'উদয়?'

'হাত ধুচ্ছেন তিনি,' বললেন বাবর। 'সব ব্যবস্থা করা হয়ে গেছে। সার্জেনদের চেঞ্জ রুমে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে বলে আশা করছি। এই ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে।'

মনিটর থেকে সরে গেলেন বাবর।

চোখ ঘুরিয়ে কামরায় উপস্থিত সবার দিকে তাকালেন উত্তম নওয়াব। কেউ একচুল নড়ছেন না বা কিছু বলছেন না। হাতের দস্তানা খুলে ফেললেন তিনি, তারপর ঝড়ের বেগে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন, প্রায় চিৎকার করে বলে গেলেন, 'কপালে কী আছে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না!'

উত্তম নওয়াবের সঙ্গে দাবানলের সম্পর্ক বেশ দুর্বলই বলতে হবে। বছর কয়েক আগে হাসপাতালের চিফ ব্যাকটেরিওলজিস্ট সম্রাট বাবর তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং নিরিবিলিতে বসে প্রজেক্ট দাবানল সম্পর্কে একটা ধারণা দেন তাঁকে। নওয়াবের কাছে ব্যাপারটা বরং খানিক ছেলেমানুষি আর মজার বলে মনে হয়েছিল, তবে খুব উৎসাহ নিয়ে টিমে যোগ দিতে রাজি হন তিনি, কথা দেন গোটা ব্যাপারটা তিনি সবার কাছে গোপন রাখবেন এবং ডাক পেলে কালবিলম্ব না করে হাজির হয়ে যাবেন যেখানে বলা হবে সেখানে। মনে মনে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, দাবানল প্রজেক্ট কখনোই কোনো কাজে লাগবে না।

প্রথম দিকে আপ-টু-ডেট থাকার জন্য নওয়াবকে কিছু কিছু ফাইল পড়তে দিতেন বাবর, কিন্তু সেগুলো না পড়েই ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই আর দেন না তিনি। বছর খানেক

আগে বাবর তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, একটা সংস্থায় নাম লেখাতে রাজি হবার পর সেটা সম্পর্কে কৌতূহল না থাকাটা ভবিষ্যতে বিপদ হয়ে দেখা দেবে না তো?

নওয়াব জবাব দিয়েছেন, 'না।'

ডাক্তারদের কামরায় বসে নিজের হাতে বানানো কফি খাচ্ছেন সম্রাট বাবর। নওয়াবকে ভেতরে ঢুকতে দেখে বললেন, 'জলদি, ব্রাদার, জলদি কাপড় পাল্টান।'

নওয়াব বললেন, 'আপনি কিছু মনে করবেন প্রথমে যদি একটু জানতে চাই ব্যাপারটা কী নিয়ে...'

'মনে করব, মনে করব,' তাড়াতাড়ি বললেন বাবর। 'কাপড় পাল্টান। বাইরে একটা গাড়ি অপেক্ষা করছে এবং আমরা ইতিমধ্যে দেরি করে ফেলেছি। বোধ হয় খুব বেশি দেরি হয়ে গেছে। দেখবেন আমরাই হয়তো সবার শেষে পৌঁছাব...'

বাবরের আচরণের মধ্যে অতিনাটকীয় একটা ভাব আছে, নওয়াব যেটা অপছন্দ করেন। লকার খুলে নিজের কাপড়চোপড় বের করলেন তিনি। 'ব্যাপারটা ওই ছাই প্রজেক্ট নিয়ে নয় তো?'

'একদম ঠিক ধরেছেন,' বললেন বাবর। 'তবে দয়া করে তাড়াতাড়ি করুন। গাড়িটা আমাদের এয়ারপোর্টে নিয়ে যাবে, কিন্তু সকালের ট্র্যাফিক জ্যাম ভয়াবহ...'

দ্রুতই কাপড় পাল্টালেন নওয়াব, কিছু চিন্তা করছেন না, মুহূর্তের জন্য তাঁর মন নিশ্চল হয়ে পড়েছে। কেন যেন তাঁর ধারণা হয়েছিল এটা কোনো দিন ঘটবে না। বাবরের পিছু নিয়ে হাসপাতাল থেকে সকালের রোদে বেরিয়ে এলেন তিনি, দেখলেন জলপাই রঙের আর্মির সেডান গাড়িটা ফুটপাত ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ওটার মাথায় বিশেষ একটা ছন্দে ঝিলিক মারছে লাল আলো। বাবর ঠাট্টা করছেন না, হঠাৎ এটা উপলব্ধি করে স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। এর মানে তো আমাদের সবার জীবনে একটা দুঃস্বপ্ন শুরু হতে যাচ্ছে, তাই তো? নিজেকে প্রশ্ন করলেন তিনি। বুকে একটা চাপ অনুভব করছেন। একটু যেন শ্বাসকষ্টও হচ্ছে।

এখন তাঁর অস্পষ্টভাবে মনে পড়ছে, ব্রিফ করার সময় তাঁকে বলা হয়েছিল, গোটা টিমকে ডাকা হলে বুঝতে হবে দেশবাসীর মাথার ওপর নরক নেমে আসছে।

উত্তম নওয়াবকে নিয়ে একটু অস্বস্তি আছে সম্রাট বাবরের মধ্যে। আসলে প্র্যাকটিস করছেন এমন সব ডাক্তারের ব্যাপারে একধরনের অসহিষ্ণুতায় ভোগেন বাবর। যদিও নিজে একজন এমবিবিএস ডাক্তার, কিন্তু তিনি কখনো প্র্যাকটিস করেননি, নিজের সবটুকু সময় ব্যয় করেছেন গবেষণায়। তাঁর ক্ষেত্র হলো ক্লিনিক্যাল মাইক্রোবায়োলজি আর এপিডিমিয়োলজি, আর তিনি বিশেষজ্ঞ হলেন প্যারাসাইটোলজিতে। বাবর সারা পৃথিবীতে প্যারাসাইটিক রিসার্চ পরিচালনা করেছেন। তাঁর কাজ ব্রাজিলিয়ান টেপওয়ার্মের তিনটে ধরনকে শনাক্ত করতে সাহায্য করেছে। তাঁর গবেষণা এমন সব কাজের ভিত তৈরি করেছে, যেখান থেকে তরুণ বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরে বহু কিছু আবিষ্কার করতে পারবেন।

বয়স বেশি হয়ে যাওয়ায় এখন আর বাইরে কোথাও যান না বাবর। পাবলিক হেলথ, প্রায়ই তাঁকে বলতে শোনা যায়, তরুণদের খেলা। অসুস্থ হয়ে পড়ায় তিন মাস হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল তাঁকে, চল্লিশ পাউন্ড ওজন হারিয়েছেন। সুস্থ হবার পর পাবলিক হেলথ সার্ভিস থেকে পদত্যাগ করেন। হাসপাতাল থেকে তাঁকে চিফ মাইক্রোবায়োলজির পদ সাধা হয়। তাতে সম্মত হন তিনি। তবে শর্ত দেন নিজের ভালো একটা সময় তিনি গবেষণায় ব্যয় করবেন, তাতে বাধা দেওয়া যাবে না। কাজ আর গবেষণার ক্ষেত্রে সুনামই সম্রাট বাবরকে প্রকল্প দাবানলে ঢুকতে সাহায্য করেছে।

বাবরের মাধ্যমে উত্তম নওয়াবকে টিমে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। নওয়াবকে কেন বাছাই করা হয়েছে, বাবর সেটা জানতেন, তবে নওয়াব জানতেন না। বাবর যখন তাঁকে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব দেন, নওয়াব তখন জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কী কারণে যোগ দেব? আমি তো স্রেফ একজন সার্জেন।'

'হ্যাঁ,' বাবর উত্তর দিয়েছেন। 'কিন্তু আপনি ইলেকট্রোলাইটস জানেন।'

'তো?'

'সেটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। ব্লাড কেমিস্ট্রিজ, পিএইচ, অ্যাসিডিটি আর অ্যালকালিনিটি, পুরোটা। এমন সময় আসতে পারে যখন এটা হয়তো মারাত্মক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।'

'কিন্তু ইলেকট্রোলাইট বিশেষজ্ঞ প্রচুর লোক আছে, তাদের অনেকে আমার চেয়েও ভালো,' যুক্তি খুঁজছেন নওয়াব।

'হ্যাঁ,' উত্তরে বলেছেন বাবর। 'কিন্তু তারা সবাই বিবাহিত।'

'বিবাহিত তো কী হয়েছে?'

'আমরা নিঃসঙ্গ একজনকে চেয়েছি।'

'কেন?'

'এটা প্রয়োজন ছিল যে টিমের একজন লোককে অবিবাহিত হতে হবে।'

'এটা স্রেফ পাগলামি,' নওয়াব বলেছেন।

'হতে পারে,' উত্তর দিয়েছেন বাবর। 'নাও হতে পারে।'

আর্মি সেডানের পাশে তরুণ এক অফিসার টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে, ওঁদের স্যালুট করলেন। তারপর জানতে চাইলেন, 'ডক্টর নওয়াব?'

'ইয়েস।'

'আমি আপনার কার্ডটা দেখতে পারি, প্লিজ?'

ছোট্ট প্লাস্টিক কার্ডটা বের করে অফিসারের হাতে ধরিয়ে দিলেন নওয়াব, তাতে তাঁর ফটো সাঁটা আছে। এই কার্ড তাঁর মানিব্যাগে এক বছরের বেশি দিন হলো পড়ে রয়েছে—শুধু নাম, ফটো আর বুড়ো আঙুলের ছাপ, ব্যস। এমন কিছু নেই যা দেখে ওটাকে অফিশিয়াল বলে মনে হবে।

নেড়েচেড়ে দেখে কার্ডটা ফেরত দিলেন অফিসার। 'ভেরি গুড, স্যার,' বলে সেডানের দরজা খুলে ধরলেন। ভেতরে ঢুকলেন নওয়াব, পিছু নিয়ে বাবরও ঢুকছেন। গাড়ির ছাদে লাল আলো জ্বলছে আর নিভছে দেখে হাত তুলে চোখ ঢাকলেন তিনি।

ব্যাপারটা খেয়াল করলেন নওয়াব। 'কোনো সমস্যা হলো?'

'না। আলোর ঝলক আমার স্রেফ সহ্য হয় না।' সিটে নড়েচড়ে বসার পর নওয়াবের দিকে তাকালেন বাবর, 'এয়ারফিল্ডে পৌঁছালে আপনাকে একটা ফাইল পড়তে দেওয়া হবে, যাত্রার মধ্যে পড়ে ফেলবেন।'

'কিসের যাত্রা?'

'আপনাকে একটা শিকারি বাজ হেলিকপ্টারে তোলা হবে...'

'কোথায় যাচ্ছি আমি?'

'আগে যেখানে পদ্মা ছিল, এখন যেখানে ধু ধু মরুভূমি, সেখানে—রাজশাহীর এক প্রান্তে। ওখানে পৌঁছানোর পর খুব ব্যস্ত থাকতে হবে, তার আগেই ফাইলটা পড়ে ফেলতে হবে।'

'টিমের বাকি সদস্যরা?'

হাতঘড়ির দিকে তাকালেন ডক্টর বাবর। 'সুনীল দস্তগিরের অ্যাপেনডিসাইটিস অপারেশন হবার কথা, হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। বাকি সবাই কাজ শুরু করে দিয়েছেন। এই মুহূর্তে একটা হেলিকপ্টারে রয়েছেন তাঁরা, হাতিমারার ওপরে—ওটা পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়িতে।'

'ওই নাম আগে কখনো শুনিনি,' নওয়াব বললেন।
'আমরা কেউ শুনিনি,' মন্তব্য করলেন বাবর, 'এর আগে।'

৬. হাতিমারা

একই দিন সকাল, দশটা বাজতে এক মিনিট বাকি, একটা কে-ফোর জেট হেলিকপ্টার কুমিল্লার দেওগাঁর সবচেয়ে নিরাপদ হ্যাঙ্গার থেকে টেকঅফ করল, যাচ্ছে খাগড়াছড়ির দিকে। সবচেয়ে নিরাপদ হ্যাঙ্গার থেকে টেকঅফ করতে হবে, এটা মেজর তুষার আবদুল্লাহর সিদ্ধান্ত, কারণ তিনি ভয় পাচ্ছিলেন স্যুটগুলো মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। কপ্টারের ভেতর তিনজন মানুষ, তাদের একজন পাইলট, বাকি দুজন বিজ্ঞানী, তিনজনই স্বচ্ছ প্লাস্টিকের ইনফ্ল্যাটাবল স্যুট পরে আছেন, দেখে মনে হচ্ছে ভিন গ্রহ থেকে আসা মেদবহুল দৈত্য একেকটা।

সকালের পরিষ্কার আকাশে কপ্টার যখন উঠে এল, ওটার পেটের ভেতর বসে থাকা আরোহী দুজন পরস্পরের দিকে তাকালেন। একজন কুমার মুশফিক, অপরজন সদয় জাহান। দুজনেই ঘণ্টা কয়েক আগে দেওগাঁয় পৌঁছেছেন—ডক্টর মুশফিক এসেছেন ময়মনসিংহ থেকে, ডক্টর জাহান এসেছেন সিলেট থেকে।

সদয় জাহান একজন প্যাথলজিস্ট, বয়স পঞ্চান্ন, সিলেটের একটা প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে পড়ান। তা ছাড়া বাসা-র একজন কনসালট্যান্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি। ব্যাকটেরিয়া আর হিউম্যান টিস্যু নিয়েও পড়াশোনা এবং ডিগ্রি আছে তাঁর। এই মুহূর্তে তিনি ভাবছেন, কী ঘটেছে, কী ঘটতে যাচ্ছে, সব অন্ধকারে, কাজেই আমার বুক তো একটু একটু কাঁপবেই।

উল্টো দিকে বসে আছেন কুমার মুশফিক, তিনি সদয় জাহানের চেহারা মোটেও পছন্দ করছেন না, তবে সেটা গোপন রাখছেন। স্বচ্ছ প্লাস্টিক স্যুটের নিচে তাঁর শার্টটা নোংরা, বাম পকেটের কাছে দাগ লেগে রয়েছে। ট্রাউজারের ভাঁজ ঠিক নেই। মাথার চুলে চিরুনি পড়েনি কত কাল কে জানে।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন ডক্টর মুশফিক, মনটাকে অন্যদিকে সরাতে চাইছেন। 'পঞ্চাশজন মানুষ,' মাথা নাড়তে নাড়তে আপনমনে বললেন, 'মরে গেল। মরে গেল অতুল ৭ ল্যান্ড করার আট ঘণ্টার মধ্যে।'

'ধরে নিতে হবে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে,' জাহান বললেন।

'হ্যাঁ। ধরে নিতে হবে।'

'শহরের ভেতর আর কাছাকাছি যারা ছিল তারা সবাই মারা গেছে,' ডক্টর জাহান বললেন। 'আরও দূর থেকে মারা যাবার কোনো রিপোর্ট আসেনি তো?'

মাথা নাড়লেন মুশফিক। 'আমি আর্মির লোকজনকে কাজে নামিয়ে দিয়েছি। তারা হাইওয়ে পেট্রলের সঙ্গে কাজ করছে। এখন পর্যন্ত শহরের বাইরে থেকে কোনো মৃত্যুর খবর আসেনি।'

'বাতাস?'

মোবাইল বেজে উঠল। ডক্টর মুশফিক দেখলেন তাঁরা যেদিকে যাচ্ছেন, সেদিক থেকেই ফোন করা হয়েছে। 'হ্যালো, ক্যাপটেন সাদিক। রিপোর্ট করুন।'

'ডক্টর মুশফিক, স্যার!' ক্যাপটেন সাদিক রুদ্ধশ্বাসে কথা বলছেন। 'আমরা হাইওয়ে সিকিউরিটির সঙ্গে টহল দিতে বেরিয়ে মারাত্মক দৃশ্য দেখে এসেছি।'

'কী দেখেছেন? কখন? কোথায়?'

'স্যার, এটা ঘটেছে সম্ভবত কাল রাতে, যখন বাতাস ছিল। পিঁপড়ে, মৌমাছি, পোকামাকড়, হাঁস-মুরগি, বাঁদর, তেলাপোকা, ঝিঁঝি পোকা, শেয়াল, কুকুর, গরু, ভেড়া, শুয়োর—সব, স-ব মরে পড়ে আছে। স্যার, মানুষ যদি মরেও থাকে, তাদের লাশ পাওয়া যাবে আরও দূরে কোথাও, কারণ বিপদের কথা শুনে ঘর-বাড়ি ছেড়ে আগেই পালিয়ে গেছে সবাই...'

'বাতাস, ক্যাপটেন?' তাগাদার সুরে জিজ্ঞেস করলেন ডক্টর মুশফিক। 'বাতাস এখন কোন দিকে বইছে খেয়াল করেছেন?'

'জি, স্যার, অবশ্যই খেয়াল করেছি। বাতাসে জোর নেই, প্রায় বইছেই না বলা যায়, স্যার। তবে কাল রাতে হাতিমারা শহরের দিক থেকে বাতাস বেশ জোরালোই ছিল...'

'ঠিক আছে, ধন্যবাদ,' ডক্টর মুশফিকের দুই সারি দাঁত পরস্পরের সঙ্গে বাড়ি খাচ্ছে। 'আপনারা ফিরে আসুন...কারও মধ্যে কোনো রকম লক্ষণ টের পেলে তাকে সঙ্গে রাখবেন না...আর্মির মেডিকেল টিমকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অকুস্থলে চলে আসতে বলবেন....'

'স্যার, কিসের লক্ষণ! যারা আক্রান্ত হচ্ছে তারা ঠাস করে মারা যাচ্ছে, দু-চার সেকেন্ডের মধ্যে!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনার কথাই ঠিক...'

'দূরে, পাহাড়ের গায়ে, দুজনকে ওভাবে পড়ে যেতে দেখে আমরা ছুটে পালিয়ে এসেছি, স্যার। মেডিকেল টিমকেও খবর দেওয়া হয়েছে...একদল এমপি জায়গাটাকে ঘিরে রেখেছে, মাঝখানে অনেক দূরত্ব রেখে, সবাই তারা গ্যাস মাস্ক পরা...'

'ওতে কোনো কাজ...' কথাটা শেষ না করে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন ডক্টর মুশফিক। 'আমরা হাতিমারায় যাচ্ছি, আপনি এখন ঠিক কোথায় আমাকে জানান...'

এক মিনিট পর টেলিফোন বন্ধ করে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকলেন ডক্টর মুশফিক, বিড়বিড় করে কী বলছেন শোনা যাচ্ছে না।

'জিনিসটা তাহলে ছড়াতে শুরু করেছে,' বললেন ডক্টর জাহান। 'নতুন কেউ আক্রান্ত হয়েছে কি না?'

'দুজন মারা গেছে।'

'ও মাই গড!' ডক্টর জাহানের চেহারা সাদা হয়ে গেল।

'পিঁপড়ে, মৌমাছি, পোকামাকড়, হাঁস-মুরগি, বাঁদর, তেলাপোকা, ঝিঁঝি পোকা, শেয়াল, কুকুর, গরু, ভেড়া, শুয়োর—সব, স-ব মরে পড়ে আছে ওদিকে...'

ডক্টর জাহান কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারলেন না, হঠাৎ বোবা হয়ে গেছেন যেন।

তাঁর দিকে তাকালেন মুশফিক। 'কাল রাতে বাতাসের গতি ছিল ঘণ্টায় দশ কিলোমিটার, ওই উত্তর দিকেই বইছিল। তবে মাঝরাতের দিকে থেমে গিয়েছিল। বছরের এই সময় এটা নাকি স্বাভাবিক নয়, আবহাওয়ার ওরা বলছিল আমাকে।'

'ও, আচ্ছা, বাতাস মরে যাওয়ায় আর বেশি দূর ছড়ায়নি, এ রকম মনে হচ্ছে?' প্রায় ফিসফিস করে জানতে চাইলেন সদয় জাহান।

'হ্যাঁ।'

'সেটা তাহলে আমাদের সৌভাগ্য।'

'হ্যাঁ,' বলে মাথা ঝাঁকালেন মুশফিক। 'আমরা আরও একটা দিক থেকে ভাগ্যবান। হাতিমারার চারপাশে এক শ পঁচিশ কিলোমিটার পর্যন্ত আর কোনো লোকবসতি নেই। ক্যাপটেন সাদিক যে প্রাণহানির কথা বলছেন, ওখানে মানুষও ছিল বলে ধারণা করা যায়, তবে ওটা অবৈধ বসতি, সরকারের কাছে ওই বসতি সম্পর্কে কোনো তথ্য নেই। আমাদের জানামতে এক শ পঁচিশ কিলোমিটার ফাঁকা পড়ে থাকার কথা।'

'কিন্তু এক শ পঁচিশ কিলোমিটারের কথা বাদ দিন, তারপর তো অন্তত তিন দিকে একের পর এক অনেক শহর,

আর প্রতিটি শহরে গিজগিজ করছে মানুষ। একবার যদি ওই পোকা ওগুলোর একটার নাগাল পায়...,' থেমে গেলেন ডক্টর জাহান, শব্দ খুঁজে পাচ্ছেন না, নিস্তেজ গলায় বললেন, 'তারপর কী ঘটবে আমি কল্পনা করতে পারি না।'

'তবে বাতাস যতক্ষণ নিস্তেজ থাকবে, আমরা সময় পাব।'

'ধরে নিতে পারি,' বললেন জাহান।

পরবর্তী পঁচিশ মিনিট ম্যাপে চোখ বুলিয়ে কাটালেন দুজন, এই ম্যাপ কাল রাতে দেওগাঁর কম্পিউটার তৈরি করে দিয়েছে—এতে বাতাসের গতিপথ এবং প্রবণতা দেখানো হয়েছে, প্রতিবেশী বড় শহরগুলো আক্রান্ত হলে কী রকম প্রাণহানি ঘটতে পারে তারও একটা আলাদা হিসাব দিয়েছে কম্পিউটার। বান্দরবান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, বাতাস আমাদের বিরুদ্ধে চলে গেলে শুধু ওই একটা শহরেই দেড় লাখ মানুষ মারা যাবার আশঙ্কা আছে।

দুই বিজ্ঞানী এরপর মৃত্যুর সময় নিয়ে আলোচনা করলেন। ভ্যানগাড়ির টেপ শুনেছেন তাঁরা, দুজনেই একমত হলেন যে হাতিমারায় মনে হয়েছে মৃত্যু এসেছে অকস্মাৎ।

'এমনকি আপনি যদি ধারালো ক্ষুর দিয়ে কারও গলা কাটেন,' ডক্টর জাহান বললেন, 'তাহলেও মৃত্যুকে আপনি অত তাড়াতাড়ি ডেকে আনতে পারবেন না। ক্যারটিড আর জাগুলার কাটার পরও জ্ঞান হারাতে দশ থেকে চল্লিশ সেকেন্ড সময় নেবে ভিকটিম, আর মারা যেতে সময় নেবে প্রায় এক মিনিট।'

'হাতিমারায় ব্যাপারটা যেন এক কি দুই সেকেন্ডের মধ্যে ঘটে গেছে।'

কাঁধ ঝাঁকালেন সদয় জাহান। 'ট্রমা,' সাজেশন দিলেন। 'মাথায় একটা বাড়ি।'

'হ্যাঁ। কিংবা একটা নার্ভ গ্যাস।'

'অবশ্যই সম্ভব।'

'হয় নার্ভ গ্যাস, তা না হলে ওটার খুব কাছাকাছি কিছু একটা,' বললেন মুশফিক। 'ওটা যদি কোনো ধরনের এনজাইম্যাটিক ব্লক হয়ে থাকে—আর্সেনিক বা স্ট্রাইকনিনের মতো কিছু—আমরা ধারণা করব পনেরো থেকে ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে মৃত্যু হবে, হয়তো আরও কিছু পরে। কিন্তু যদি নার্ভাস ট্রান্সমিশনের একটা ব্লক হয়, কিংবা যদি নিউরোমাসকুলার জাংশন বা কর্টিক্যাল পয়জনিং হয়, সেটা খুবই দ্রুত কাজ করবে। সেটা তাৎক্ষণিকই হতে পারে।'

'ওটা যদি দ্রুত কার্যকর গ্যাস হয়,' নওয়াব বললেন, 'সবচেয়ে আগে ছড়াবে ফুসফুসে...'

'কিংবা ত্বকে,' বললেন মুশফিক। 'মিউকাস মেমব্রেনে, যেকোনো কিছুতে। লোমকূপ বা ফুটো আছে এমন কিছু একটা পেলেই হলো।'

গায়ে থাকা নিজের প্লাস্টিক স্যুট স্পর্শ করলেন নওয়াব। 'এই গ্যাসের যদি ছড়িয়ে পড়ার প্রবল প্রবণতা থাকে....'

মুখে কাঁপা কাঁপা হাসি নিয়ে মুশফিক বললেন, 'সেটা আমরা শিগগিরই জানব।'

ইন্টারকম থেকে পাইলটের গলা ভেসে এল। 'হাতিমারা কাছে চলে আসছে, স্যার। প্লিজ পরামর্শ দিন।'

মুশফিক বললেন, 'একটা চক্কর দিন, জায়গাটা আমরা একবার দেখি।'

দ্রুত বাঁক নিচ্ছে কপ্টার। দুই বিজ্ঞানী জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। নিচে পরিপাটি, ছিমছাম, ছবির মতো সুন্দর ছোট্ট একটা শহর দেখতে পাচ্ছেন। অসুন্দর বলতে—চাঁদের ধবধবে আলো পেয়ে রাতেই নেমে এসেছিল শকুনের ঝাঁক, প্রতিটি লাশকে ঘিরে ভূরিভোজ শুরু করে দিয়েছে ওগুলো।

'এই ভয়ই পাচ্ছিলাম আমি,' ম্লান সুরে বললেন মুশফিক। 'ওগুলো বাহকের ভূমিকা পালন করলে সংক্রমণ দ্রুত অনেক দূর পর্যন্ত ছড়াবে,' বললেন সদয় জাহান। 'সংক্রমিত মানুষের মাংস খেয়ে নিজেরা সংক্রমিত হচ্ছে, তারপর দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে দেবে ওই জীবাণু।'

মুশফিক মাথা ঝাঁকালেন, জানালার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

'কী করব আমরা?'

'গ্যাস দেব,' বললেন মুশফিক। 'একটাও যাতে হাতিমারা ছেড়ে উড়তে না পারে।' বোতাম টিপে ইন্টারকম চালু করলেন তিনি, পাইলটকে বললেন, 'সঙ্গে ক্যানিস্টার আছে তো?'

'জি, স্যার, আছে।'

'আবার চক্কর দিন, গ্যাসে ডুবিয়ে দিন শহরটাকে।'

'ইয়েস, স্যার।'

কাত হলো কপ্টার, আবার চক্কর শুরু করেছে। খানিক পরই ম্লান নীল গ্যাসের মেঘ নিচের জমিন পুরোপুরি ঢেকে ফেলল।

'কী জিনিস?'

'ক্লরাজিন,' বললেন মুশফিক। 'খুব কাজ দেয়, লো কনসেন্ট্রেশনে। আশা করি একটাও পালাতে পারবে না, ওখানেই ছটফট করে মারা যাবে।'

বাঁক নিয়ে হাতিমারার ওপর থেকে সরে এল কপ্টার, তারপর কিছুক্ষণ স্থির হয়ে ভেসে থাকল শূন্যে। মৃদু বাতাসে ধীরে ধীরে এক সময় সরে গেল সব গ্যাস, আবার এখন জমিন দেখা যাচ্ছে। কয়েক শ শকুন পড়ে আছে ওখানে, কিছু শকুন এখনো ডানা ঝাপটাচ্ছে, তবে বেশির ভাগ আগেই মারা গেছে।

সেদিকে তাকিয়ে থেকে ভ্রু কুঁচকালেন মুশফিক। মনের কোণ থেকে তাঁকে যেন জানানো হচ্ছে কিছু একটা ভুলে গেছেন তিনি। ভুলে গেছেন, কিংবা গ্রাহ্য করেননি। কোনো ঘটনা, কোনো গুরুত্বপূর্ণ সূত্র, শকুনগুলো জোগান দিয়েছে, যেটা তার দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া উচিত হয়নি।

ইন্টারকমে পাইলটের গলা, বললেন, 'স্যার, আপনাদের নির্দেশের অপেক্ষায় আছি।'

'প্রধান সড়কের মাঝামাঝি জায়গায় নিয়ে যান আমাদের,' বললেন মুশফিক। 'তারপর রশির মইটা নামাবেন। জমিন থেকে বিশ ফুট ওপরে থাকতে হবে আপনাকে। তার বেশি নিচে নামবেন না, ল্যান্ড তো করবেনই না। ব্যাপারটা পরিষ্কার তো?'

'জি, স্যার।'

'মই বেয়ে আমরা জমিনে নামার পর আপনি কপ্টার তুলবেন পাঁচ শ ফুট ওপরে।'

'ইয়েস, স্যার।'

'আগের জায়গায় ফিরে আসবেন আমরা সংকেত দিলে।'

'ইয়েস, স্যার।'

'এবং আমাদের যদি কিছু ঘটে...'

'আমি সরাসরি দাবানলে চলে যাব,' বললেন পাইলট, তাঁর গলার আওয়াজ শুকনো।

'ঠিক।'

এর কী অর্থ, পাইলটের তা জানা। এই বিশেষ কাজে বিপদের আশঙ্কা থাকায় প্রতি মাসে তাঁকে এক লাখ টাকা ঝুঁকি ভাতা দেওয়া হয়। আর যদি তিনি বাড়ি ফিরতে না পারেন, তাঁর পরিবার পঞ্চাশ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ পাবে।

এত বেশি টাকা দেওয়ার পেছনে অবশ্যই উপযুক্ত কারণ আছে। জমিনে নামার পর ডক্টর মুশফিক আর ডক্টর জাহানের যদি কিছু ঘটে, পাইলটের ওপর নির্দেশ আছে সরাসরি দাবানল স্থাপনায় পৌঁছাতে হবে তাঁকে, তারপর জমিন থেকে ত্রিশ ফুট ওপরে কপ্টার নিয়ে ভেসে থাকতে হবে, ওই সময় দাবানল গ্রুপ সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করবে তাঁকে এবং তাঁর হেলিকপ্টারকে মাঝ আকাশে কীভাবে আগুনে পুড়িয়ে ছাই



ইন্টারকমে পাইলটের গলা, 'স্যার, আপনাদের নির্দেশের অপেক্ষায় আছি।'

করা যায়।

এই ঝুঁকি নেওয়ার জন্য বিশেষ ভাতা পান তিনি। এই চাকরিতে তিনি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে ঢুকেছেন। এবং তাঁর জানা আছে আকাশের অনেক ওপরে, বিশ হাজার ফুট ওপরে, এয়ারফোর্সের একটা জেট শূন্য থেকে শূন্যে নিক্ষেপযোগ্য মিসাইল নিয়ে চক্কর দিচ্ছে। কপ্টারের পাইলট যদি শেষ মুহূর্তে সাহস হারিয়ে ফেলেন, ব্যর্থ হন সরাসরি দাবানল স্থাপনায় পৌঁছাতে, তাহলে ওই জেটের কাজ হবে মিসাইল ছুড়ে কপ্টারটাকে ধ্বংস করা।

'কোনো রকম ভুল করা চলবে না,' পাইলট বললেন, 'স্যার।'

ধীরগতিতে শহরের প্রধান সড়কের মাথায় পৌঁছাল কপ্টার, ঝুলে থাকল শূন্যে। রশির মই মুক্ত করা হলো। সিধে হলেন ডক্টর মুশফিক, মাথার হেলমেট নেড়েচেড়ে ঠিক করে বসালেন। একটা কর্ডে টান দিয়ে নিজের স্বচ্ছ স্যুট ফোলালেন। পিঠে ছোট একটা অক্সিজেনের বোতল আছে, দুই ঘণ্টার জন্য যথেষ্ট। ডক্টর জাহান নিজের স্যুট সিল না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন তিনি, তারপর হ্যাচ খুলে মই ধরলেন, জমিনের দিকে তাকালেন। হেলিকপ্টারের রোটর প্রচুর ধুলোর মেঘ তৈরি করছে।

রেডিওতে কথা বললেন মুশফিক। 'অল সেট?'

'অল সেট।'

'বিসমিল্লাহ!' বলে মই বেয়ে জমিনের দিকে নামতে শুরু করলেন ডক্টর মুশফিক। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলেন, তারপর তাঁর পিছু নিলেন ডক্টর জাহান। আলোড়িত ধুলোর ভেতর কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না, তবে একটু পরই অনুভব করলেন তাঁর জুতো শক্ত মাটি ছুঁয়েছে। মই ছেড়ে দিয়ে চারদিকে তাকালেন, কোনো রকমে দেখতে পেলেন ডক্টর মুশফিকের স্যুট, ধুলোর রাজ্যে অস্পষ্ট কটা রেখা।

কপ্টার আকাশের আরও ওপরে উঠছে, তার সঙ্গে মইটাও উঠছে। ধুলো সরে যাচ্ছে। এখন তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন।

'চলুন, যাই,' বললেন মুশফিক।

বেঢপ স্যুট পরে থাকায় আড়ষ্ট ভঙ্গিতে হাঁটছেন তাঁরা। প্রধান সড়ক ধরে হাতিমারা শহরের দিকে এগোচ্ছেন।

৭. এটা স্বাভাবিক পদ্ধতি নয়

মানুষের সঙ্গে এই জীবাণুর প্রথম জ্ঞাত সংস্পর্শ ঘটার পর বারো ঘণ্টা পার হয়েছে কি হয়নি, ডক্টর জাহান আর ডক্টর মুশফিক অকুস্থলে হাজির হলেন।

এই ঘটনার কয়েক সপ্তা পর, ডিব্রিফিং সেশনে বসে, দুই বিজ্ঞানীই ওখানে দেখা দৃশ্যের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।

সকালের সূর্য তখনো আকাশের অনেক নিচে রয়েছে। গায়ে প্লাস্টিকের স্যুট থাকা সত্ত্বেও প্রচণ্ড শীত করছে ওঁদের। তবে পরিবেশটা বিষাদময়, লম্বা ছায়াগুলোকে শোকের প্রতীক হিসেবে করুণ লাগছে। ওঁরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখান থেকে রাস্তার দুদিক দেখা যাচ্ছে অনেক দূর পর্যন্ত—সামনের দিকে রাস্তার দুপাশে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে আধপাকা বাড়ি-ঘর।

তবে সবচেয়ে আগে তাঁরা যেটা খেয়াল করলেন তা হলো নীরবতা। খালি পড়ে থাকা বাড়িঘরের ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া শান্ত বাতাস মৃদু গুঞ্জন তুলছে, ব্যস, আর কোনো শব্দ নেই গোটা শহরে। লাশ পড়ে আছে সবখানে। কোথাও স্তূপ

করা, কোথাও বিস্ময়ের ধাক্কায় মাটিতে ছিটকে পড়া। তবে পাখির ডাক নেই, কুকুরের ছুটে আসা নেই, মাটিতে একটা পিঁপড়ে পর্যন্ত চরছে না। শিশুর কান্না? তাও নেই।

সব স্থির এবং নীরব।

পরস্পরের দিকে তাকালেন তাঁরা দুজন। কত কিছু জানতে হবে এবং কত কিছু করতে হবে বুঝতে পেরে কাঁধে ভারী বোঝা অনুভব করছেন তাঁরা। এই শহরে কোন ধরনের দুর্যোগ নেমে এসেছে, সেটা কী তা জানতে না পারলে ঠেকানোর উপায় হবে না, ফলে লাশের সংখ্যা শুধু বাড়তেই থাকবে। হাতিমারার সমস্যা অতি দ্রুত গোটা জেলা বা গোটা দেশের বিকট সমস্যা হয়ে দেখা দিতে পারে। দেশে দেশে এ রকম ঘটার অনেক উদাহরণ আছে।

কিন্তু তাঁদের কাছে কোনো সূত্র নেই।

তাঁরা শুধু দুটো জিনিস জানেন। এক. সমস্যাটা শুরু হয়েছে অতল ৭ ল্যান্ড করার পর। দুই. শহরের লোক মারা গেছে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে। এটা যদি কৃত্রিম উপগ্রহের নিয়ে আসা কোনো রোগ হয়, তাহলে মেডিসিনের ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনার কোনো নজির পাওয়া যাবে না।

দীর্ঘ একটা সময় কেউ কিছু বলছেন না, শুধু রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে চারদিকে চোখ বুলাচ্ছেন, অনুভব করছেন পরনের বেঢপ স্যুটে টান দিচ্ছে বাতাস। তারপর একসময় মুখ খুললেন ডক্টর মুশফিক, 'সবাই ওরা কী কারণে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসেছিল বলতে পারেন? এটা যদি কোনো রোগ হয়, হানা দিয়ে থাকে রাতে, তাহলে বেশির ভাগ মানুষের থাকার কথা ঘরের ভেতর।'

'শুধু তা-ই নয়,' ডক্টর জাহান বললেন, 'লক্ষ করুন, বেশির ভাগ লোক লুঙ্গি বা পাজামার সঙ্গে গেঞ্জি পরে রয়েছে। কারও পরনে সোয়েটার নেই, কোট নেই, মাফলার নেই, এমনকি চাদরও নেই, অথচ কাল খুব শীত পড়েছিল।'

'হতে পারে খুব তাড়া ছিল তাদের,' বললেন ডক্টর মুশফিক।

'কিসের তাড়া?'

'হয়তো কিছু দেখার,' জবাব দিলেন মুশফিক, অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন।

প্রথম যে লাশটার কাছে এসেছেন তাঁরা, সেটার দিকে ঝুঁকলেন সদয় জাহান। 'অদ্ভুত,' বললেন তিনি। 'খেয়াল করুন লোকটা কীভাবে নিজের বুক খামচে ধরে আছে। ওই লোক একা নয়, আরও কজনকে ওভাবে দেখা যাচ্ছে।'

ব্যাপারটা মুশফিকও লক্ষ করলেন, কারও হাত বুক খামচে ধরেছে, কারও হাত নিঃসাড় পড়ে আছে বুকের মাঝখানে। 'দেখে মনে হচ্ছে না খুব ব্যথা পেয়েছে কেউ,' বললেন তিনি। 'মুখের চেহারায় ব্যথা-বেদনা নয়, আমি বরং সবার মধ্যে শান্তিময় একটা ভাব দেখতে পাচ্ছি।'

'ঠিক শান্তিময় বলা চলে কি? ওদের চেহারায় বিস্ময় আছে, এটা আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না। লোকগুলোকে যেন অকস্মাৎ থামিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে বুক চেপে ধরা অবস্থায়।'

'করনারি?' বললেন মুশফিক।

'সন্দেহ আছে। চেহারা বিকৃত হতে হবে—প্রচণ্ড ব্যথায়। পালমোনারি এমবাসালাসের ক্ষেত্রেও একই কথা।'

'তবে সেটা যদি যথেষ্ট দ্রুত ঘটে তাহলে তারা সময় পাবে না।'

'হয়তো। তবে আমার মনে হচ্ছে এই লোকগুলো কোনো রকম ব্যথা না পেয়ে মারা গেছে। অর্থাৎ তারা তাদের বুক খামচে ধরে আছে...'

'শ্বাস নিতে না পারায়,' বললেন মুশফিক।

মাথা ঝাঁকালেন সদয় জাহান। 'অ্যাসফিক্সিয়েশন। ক্ষিপ্রগতি, ব্যথাবিহীন, প্রায় তাৎক্ষণিক অ্যাসফিক্সিয়েশন। তবে তাতেও আমার সন্দেহ আছে। কোনো লোক যদি শ্বাস নিতে না পারে, প্রথমেই সে কাপড়চোপড় ঢিলে করবে, বিশেষ করে বুক আর ঘাড়ের চারপাশের কাপড়। ওদিকে, ওই লোকটার দিকে তাকান। টাই পরে আছেন। কিন্তু সেটা স্পর্শই করেননি। আর ওদিকে ওই মহিলাকে দেখুন, ব্লাউজ পরে আছেন, গলার বোতাম পর্যন্ত লাগানো।'

বিহ্বল ভাবটা ধীরে ধীরে কাটিয়ে উঠছেন ডক্টর জাহান। তাঁর মাথা এখন পরিষ্কার চিন্তা করতে পারছে।

ভ্যান পর্যন্ত হেঁটে এলেন দুজন। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে গাড়িটা, হেডলাইট এখনো জ্বলছে। জানালা দিয়ে হাত গলিয়ে আলোটা নেভাবার চেষ্টা করছেন মুশফিক। হুইল থেকে ড্রাইভারের লাশ ঠেলে সরাতে হলো তাঁকে। লোকটার ওভারকোট সরে যাওয়ায় ইউনিফর্মের বুকপকেটের ওপর লেখা নামটা দেখতে পেলেন।

'মোস্তাজ।'

ভ্যানের পেছনে বসা লোকটার নাম প্রাণ। দুটো শরীরই শক্ত হয়ে গেছে। ভ্যানের পেছনে পড়ে থাকা একটা ইকুইপমেন্ট ইঙ্গিতে দেখালেন মুশফিক। 'ওটা কি এখনো কাজ করবে?'

'মনে হয় করবে,' বললেন জাহান।

'তাহলে চলুন উপগ্রহটা খুঁজে বের করি। ওটাই আমাদের প্রথম কাজ। পরে আমরা মাথা ঘামাব...'

থেমে গেলেন তিনি। তাকিয়ে আছেন মোস্তাজের মুখের দিকে। মৃত্যুর সময় নিশ্চয়ই সামনের দিকে সবেগে ঝুঁকে পড়েছিল সে, ফলে স্টিয়ারিং হুইলে লেগে তার গালে বেশ লম্বা একটা ক্ষত তৈরি হয়েছে, ভেঙে দিয়েছে নাকের ব্রিজও, ওখানের চামড়া উঠে গেছে।

'ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢুকছে না,' বললেন মুশফিক।

'কী?' জানতে চাইলেন জাহান।

'এই ক্ষত। দেখুন একবার।'

মুশফিকের কাঁধের ওপর দিয়ে দেখলেন জাহান। 'খুব পরিষ্কার,' মন্তব্য করলেন। 'চোখে লাগার মতো পরিষ্কার। আসলে, কোনো রক্তপাত ঘটেনি...'

তারপর সদয় জাহান বুঝলেন। এতই বিস্মিত হয়েছেন যে নিজের মাথা চুলকাতে গেলেন, কিন্তু তাঁর হাত গিয়ে ঠেকল প্লাস্টিকের হেলমেটে। 'মুখে ওরকম একটা,' বললেন, 'গভীর কাটা দাগ। ওখানে কত শিরা রয়েছে, মাংস রয়েছে, রক্ত পড়তে বাধ্য!'

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' বললেন ডক্টর মুশফিক, 'রক্ত পড়তে বাধ্য। বাকি লাশগুলো দেখুন। এমনকি যেখানে শকুনরা মাংসে খাবলা মেরেছে, কোথাও এক ফোঁটা রক্ত নেই।'

ডক্টর জাহানের বিস্ময় শুধু বাড়ছেই। এমন একটা লাশ খুঁজে পাচ্ছেন না, যার ক্ষত থেকে রক্ত বেরিয়েছে অথচ শকুনগুলো নিজেদের খেয়ালখুশিমতো চোখা ঠোঁট দিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করেছে প্রতিটি লাশ। ভাবছেন, ব্যাপারটা তাঁদের চোখে আগে কেন ধরা পড়েনি।

'হতে পারে এই রোগের মেকানিজম অব অ্যাকশন...'

'হ্যাঁ, আপনার ধারণা সঠিক হতে পারে,' ভ্যান থেকে নেমে এলেন মুশফিক। 'চলুন, ওই শালার উপগ্রহটা খুঁজি,' বললেন তিনি। 'ব্যাপারটা সত্যি আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিচ্ছে।'

পেছনে গিয়ে ভ্যান থেকে প্রাণকে টেনেহিঁচড়ে বের করলেন ডক্টর জাহান, লাশ মাটিতে রেখে উঠে বসলেন গাড়িতে, ওদিকে ইগনিশনে চাবি ঢুকিয়ে গাড়ি চালু করতে চেষ্টা করছেন ডক্টর মুশফিক, কিন্তু ইঞ্জিন স্টার্ট নিচ্ছে না। আরও বার কয়েক চেষ্টা করার পর বললেন, 'বুঝতে পারছি না। ব্যাটারি এত লো হতে পারে না যে...'

'গ্যাস?' ডক্টর জাহান জিজ্ঞেস করলেন।

একটু বিরতি। তারপর কাকে যেন বকা দিলেন মুশফিক। হাসতে গিয়েও হাসতে পারলেন না জাহান, ভ্যানের পেছন থেকে নেমে পড়লেন। রাস্তা ধরে হাঁটছেন দুজন, গ্যাস স্টেশনের দিকে যাচ্ছেন। ওখানে একটা প্লাস্টিকের বালতি পাওয়া গেল, কীভাবে কী করতে হয় বুঝে নিয়ে সেটায় গ্যাস নিলেন, তারপর ফিরে এসে ওই গ্যাস ভ্যানে ভরলেন। এবার প্রথমবারেই স্টার্ট নিল ইঞ্জিন। মুশফিক বললেন, 'চলুন, যাওয়া যাক।'

ভ্যানের পেছনে উঠে পড়লেন জাহান, তারপর ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্ট অন করলেন, বোতামে চাপ দিতে পাক খেতে শুরু করল ওটার সঙ্গে সংযুক্ত অ্যানটেনা। কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে পাঠানো সংকেত শুনতে পাচ্ছেন তিনি।

'দুর্বল সংকেত, তবে আছে। মনে হচ্ছে যেন বাঁ দিকে কোথাও।'

ভ্যান গড়াতে শুরু করেছে। ইঞ্জিন খুব ভারী আওয়াজ করছে, লাশগুলোকে এড়িয়ে এগোবার চেষ্টা করছেন ডক্টর মুশফিক। বিপ বিপ সংকেত এখন আরও জোরালো। রাস্তা ধরে ছুটে চলেছে তাঁদের গাড়ি। হাইওয়েতে উঠল সেটা, পাশ কাটাল গ্যাস স্টেশনকে। তারপর হঠাৎ করে বিপ বিপ শব্দ নিস্তেজ শোনাল।

'আমরা বেশি দূরে চলে এসেছি। গাড়ি ঘোরান।'

আবার ফিরতি পথ ধরতে হলো, শব্দের তীব্রতা অনুসরণ করছেন। আরও পনেরো মিনিট পর বোঝা গেল আওয়াজটা আসছে উত্তর দিক থেকে, আসছে শহরের একটা কিনারা থেকে। সুন্দর দেখতে কাঠের তৈরি একটা বাড়ির সামনে দাঁড় করানো হলো ভ্যান। গেটের নেমপ্লেটে লেখা ডাক্তার হুমায়ুন কাদের।

'কেউ একজন দেখতে পেয়ে নিয়ে এসেছে এখানে,' বললেন মুশফিক। 'সম্ভবত একজন ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষা করাতে চেয়েছিল।'

ভ্যান থেকে নেমে বাড়ির ভেতর ঢুকলেন দুজন। সদর দরজা খোলাই রয়েছে, বাতাস লাগায় একটা কবাট বাড়ি খাচ্ছে দেয়ালে। সামনের ঘরে ঢুকলেন তাঁরা। সেটা খালি। পাশের ঘরে ঢুকলেন, ডাক্তারের চেম্বার।

এখানে ডাক্তার কাদের রয়েছেন। বেঢপ আকৃতি, অসম্ভব মোটা, মাথায় সাদা চুল। ডেস্কে বসে আছেন, কয়েকটা ডাক্তারি বই খোলা অবস্থায় পড়ে আছে সামনে। এক পাশের দেয়ালে তাকের ওপর সাজানো রয়েছে বোতল, সিরিঞ্জ, পারিবারিক ফটো, তার মধ্যে সামরিক পোশাক পরা দুজন তরুণকেও দেখা যাচ্ছে। ডাক্তারের ছেলেরা সম্ভবত সেনাবাহিনীতে।

ডাক্তার কাদের কামরার এক কোণে তাকিয়ে রয়েছেন, চোখ দুটো বড় বড় দেখালেও, চেহারায় প্রশান্ত একটা ভাব।

'মনে হচ্ছে,' সদয় জাহান বললেন, 'ডাক্তার সাহেব বাইরে বেরোনোর সুযোগ পাননি।'

এই সময় অতল-৭ উপগ্রহটা দেখতে পেলেন তাঁরা।

খাড়া করে রাখা হয়েছে, তিন ফুট লম্বা, চকচকে পালিশ করা, মোচার মতো আকৃতি, রিএন্ট্রির সময় প্রচণ্ড তাপে কিনারায় ফাটল ধরেছে। আনাড়ি হাতে অতুল ৭ খোলার চেষ্টা হয়েছে, সম্ভবত প্লায়ার্স আর ছেনির সাহায্যে, ক্যাপসুলের পাশে পড়ে রয়েছে সেগুলো।

'হারামজাদা খুলেছে ওটা,' বললেন মুশফিক।

'জানল কীভাবে?'

'দেখে চিনতে পেরেছে, কিংবা কাউকে জিজ্ঞেস করে জেনেছে,' বললেন মুশফিক, দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'যা-ই হোক, এখন সে জানে। উনপঞ্চাশজন লোকও এখন জানে।' উপগ্রহের দিকে ঝুঁকলেন তিনি, হাঁ করে থাকা তেকোনা হ্যাচ বন্ধ করে দিলেন। 'আপনার সঙ্গে কনটেইনার আছে না?'

ভাঁজ করা প্লাস্টিকের একটা ব্যাগ বের করলেন ডক্টর জাহান। দুজন মিলে অতুলকে ভরলেন ওই ব্যাগে, তারপর মুখটা সিল করে দিলেন।

'আল্লাহই জানেন কিছু ফেলে যাচ্ছি কি না,' বিড়বিড় করলেন জাহান।

'মনে হয় না।'

ডাক্তার কাদেরের দিকে মন দিলেন তাঁরা। তাঁকে ধরে একবার ঝাঁকি দিলেন ডক্টর মুশফিক। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে চেয়ার থেকে মেঝেতে পড়ে গেল লাশ।

লাশের কনুই লক্ষ করলেন ডক্টর জাহান এবং হঠাৎ করে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। 'এদিকে আসুন,' ডক্টর মুশফিককে ডাকলেন, 'আমাকে একটু সাহায্য করুন।'

'কী কাজে সাহায্য করব?'

'লাশের গা থেকে কাপড় খুলতে হবে।'

'কেন?'

'আমি ওটার রং পরীক্ষা করতে চাই।'

'কিন্তু কেন?'

'স্রেফ একটু ধৈর্য ধরুন,' বললেন সদয় জাহান, ডাক্তার কাদেরের শার্টের বোতাম খুলছেন, ঢিলে করছেন কোমরের ট্রাউজার। দুজন মিলে কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ কাজ করে গেলেন, যতক্ষণ না মেঝেতে পড়ে থাকা ডাক্তারের শরীরকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করা গেল।

'এবার দেখুন,' এক পা পিছু হটে এসে বললেন সদয় জাহান।

'আরে, তাই তো!' বললেন ডক্টর মুশফিক।

স্পষ্ট কোনো রং ফোটেনি ত্বকে। সাধারণত কেউ মারা গেলে তার রক্ত শরীরের নিচু অংশের দিকে নেমে যায়, মাধ্যাকর্ষণের টানে। বিছানায় শুয়ে যে ব্যক্তি মারা যায় তার পিঠের রং ওখানে জমে থাকা রক্তের কারণে বেগুনি বা বেশ গাঢ় দেখায়। কিন্তু ডাক্তার কাদেরের, যিনি মারা গেছেন চেয়ারে বসা অবস্থায়, নিতম্বের বা উরুর টিস্যুতে কোনো রক্ত জমেনি।

কিংবা রক্ত জমেনি চেয়ারের হাতলে পড়ে থাকা তাঁর হাতের কনুইয়েও।

'এটা অদ্ভুত আবিষ্কার,' বললেন সদয় জাহান। কামরার চারদিকে তাকালেন, তাকের ওপর স্টেইনলেস স্টিলের বাক্স দেখতে পেয়ে খুললেন সেটা, ভেতর থেকে একটা স্ক্যালপেল তুলে নিলেন। তাতে একটা ব্লেড লাগিয়ে আবার লাশের দিকে ঘুরে গেলেন।

'অগভীর সবচেয়ে বড় শিরা আর রগ নেব আমরা,' বললেন তিনি।

'কোনটা?'

'কবজির।'

স্ক্যালপেল সাবধানে ধরে কবজির ভেতর দিকের ত্বকে ব্লেডের পোঁচ দিলেন ডক্টর জাহান, ঠিক বুড়ো আঙুলের পেছন দিকে। সদ্য তৈরি ক্ষতের দুপাশে সরে যাচ্ছে ত্বক, যা কিনা সম্পূর্ণ রক্তশূন্য। চর্বি আর টিস্যু বেরিয়ে পড়েছে, কিন্তু কোনো রক্ত দেখা যাচ্ছে না।

'অবাক কাণ্ড।'

এরপর আরও গভীর করে লাশের মাংস কাটলেন ডক্টর জাহান। কিন্তু তারপরও কোনো রক্ত দেখা গেল না। হঠাৎ করে, সবেগে, বড় একটা শিরা দুভাগ করে ফেললেন। লালচে কালো একটা টুকরো মেঝেতে খসে পড়ল।

'এ তো দেখছি মাথা খারাপ হবার অবস্থা,' বিড়বিড় করলেন ডক্টর মুশফিক।

'জমাট বেঁধে নিরেট আর শক্ত হয়ে গেছে রক্ত,' বললেন ডক্টর জাহান।

'এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে কারুরই রক্তপাত

হয়নি। রক্ত তরল অবস্থা হারিয়ে ফেললে গড়াবে কীভাবে?'

দুজন মিলে লাশটাকে চিৎ করলেন। উরুতে গভীর একটা গর্ত করলেন ডক্টর জাহান, কেটে ফেললেন ফেমারাল আর্টারি আর ভেইন। এখানেও কোনো রক্ত ঝরছে না। আঙুলের মতো মোটা শিরার ভেতর জমে শক্ত হওয়া পদার্থ পাওয়া গেল, লালচে কালো।

'অবিশ্বাস্য।'

আরেকটা গর্ত করলেন সদয় জাহান, এটা বুকে। প্রথমে পাঁজরের হাড় বের করলেন, তারপর খুব বেশি ধারালো একটা ছুরি খুঁজে নিলেন। পাঁজরের কয়েকটা হাড় ভাঙতে ছেনিটা কাজে লাগালেন, তা না হলে হার্ট আর ল্যাংসকে দৃষ্টিপথে আনা যাবে না। কিন্তু এখনো ওখানে কোনো রক্ত নেই।

বড় করে শ্বাস নিলেন সদয় জাহান, হৃৎপিণ্ড চিরে ফেললেন, দুভাগ করলেন লেফট ভেন্ট্রিকল, যেটা শিরাগুলোয় রক্ত পাম্প করে। ভেতরটা স্পঞ্জের মতো লাল একটা জিনিসে ভরে আছে। তরল রক্ত এতটুকুও নেই কোথাও।

'জমে নিরেট হয়ে গেছে,' বললেন তিনি। 'আর কিছু বলার নেই।'

'কোনো আইডিয়া আছে মানুষের রক্ত এভাবে কীভাবে জমাট বাঁধতে পারে?'

'পুরো ভাসকিউলার সিস্টেম? দশ পিণ্ড রক্ত? না।' ডাক্তার কাদেরের চেয়ারে ধপাস করে বসলেন সদয় জাহান, তাকিয়ে আছেন নিজের হাতে কাটাছেঁড়া করা লাশের দিকে। 'এ রকম কিছু আগে কখনো শুনিনি আমি। ডিসসেমিনিটেড ইনট্রাভাসকিউলার কোয়্যাগুইলেশন বলে একটা কথা আছে, কিন্তু সেটা বিরল, নানা ধরনের বিশেষ পরিস্থিতি দেখা দিলে তবেই ব্যাপারটার সূচনা ঘটে।'

'এককভাবে একটা টক্সিন এটার আয়োজন করতে পারে?'

'থিওরির দিক থেকে, পারে বলে আমার ধারণা। কিন্তু বাস্তবে পৃথিবীতে এমন কোনো টক্সিন নেই...'

থেমে গেলেন তিনি।

'হ্যাঁ,' বললেন মুশফিক। 'আমি মনে করি আপনি ঠিকই বলছেন।'

অতুল ৭ উপগ্রহটা তুলে নিলেন তিনি, বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন রাস্তায় দাঁড়ানো ভ্যানে তোলার জন্য। খানিক পর ফিরে এসে বললেন, 'বাড়িটা আমাদের একবার সার্চ করা দরকার।'

'এখান থেকে শুরু করি?'

'করতেই পারি,' রাজি হলেন মুশফিক।

সদয় জাহানই খুঁজে পেলেন মিসেস হুমায়ুন কাদেরকে। মধ্যবয়স্কা সুশ্রী মহিলা, কোলের ওপর একটা বই নিয়ে বসে আছেন চেয়ারে, ভঙ্গি দেখে মনে হলো বইয়ের পাতা ওলটাতে যাচ্ছিলেন। দ্রুত তাঁকে একটু পরীক্ষা করলেন তিনি, তারপর শুনতে পেলেন ডক্টর মুশফিক তাঁকে ডাকছেন।

বাড়ির আরেক প্রান্তে চলে গেলেন তিনি। মুশফিক ছোট একটা বেডরুমে রয়েছেন, ঝুঁকে বিছানায় শুয়ে থাকা এক কিশোর ছেলেকে দেখছেন। কামরাটা যে ওই ছেলের সেটা পরিষ্কার—দেয়ালে সাইকেডেলিক পোস্টার (গাঁজা ভালো দাওয়াই, অবদমিত অবস্থা থেকে বের করে আনে তোমাকে), তাকের ওপর অ্যারোপ্লেনের কয়েকটা মডেল সাজানো।

ছেলেটা চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, চোখ খোলা, তাকিয়ে আছে সিলিংয়ের দিকে। মুখ খোলা। এক হাতে শক্ত করে আঁকড়ে ধরা মডেল-অ্যারোপ্লেন সিমেন্টের খালি টিউব দেখা যাচ্ছে, সারা বিছানায় ছড়িয়ে রয়েছে টেপ, আঠা, রং, তারপিন।

পিছিয়ে এলেন মুশফিক। 'একবার দেখুন।'

খোলা মুখটা দেখলেন ডক্টর জাহান, ভেতরে একটা আঙুল ঢোকালেন, শক্ত হয়ে যাওয়া পদার্থের স্পর্শ নিলেন। 'গুড গড,' বললেন তিনি।

মুশফিক ভ্রু কুঁচকালেন। 'এতে সময় লেগেছে,' বললেন তিনি। 'যে কারণেই সে এটা করে থাকুক, এতে তার সময় লেগেছে। এটা পরিষ্কার যে এখানে আমরা সবকিছু সহজীকরণে উৎসাহ দেখাচ্ছি। কিছু লোক মারা গেছে তাদের বাড়িতে; কিছু বেরিয়ে এসেছে রাস্তায়। আরে এখানে এই বাচ্চাটা...'

মাথা নাড়ছেন তিনি। 'চলুন আরও বাড়ি চেক করি।'

ডাক্তারের বাড়ি ছেড়ে বেরোবার আগে তাঁর চেম্বারে একবার ঢুকলেন সদয় জাহান, লাশটার চারপাশে হাঁটছেন। কবজি আর পা কেটে ফাঁক করা, দেখতে অদ্ভুত লাগছে তাঁর। খোলা অবস্থায় রয়েছে বুক, কিন্তু কোনো রক্ত নেই। এই ব্যাপারটার মধ্যে অমানবিক এবং বুনো কী যেন একটা আছে। রক্তপাত যেন মানবতার একটা লক্ষণ। আসলেও, ভাবলেন তিনি, হয়তো তা-ই।

ডক্টর মুশফিকের জন্য হাতিমারা একটা ধাঁধা, এর গোপনীয়তা ফাঁস করার জন্য তাঁকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে এই ব্যাধি, তার গতিবিধি আর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে যা কিছু জানার আছে সবই তাঁকে জানাতে পারে শহরটা। দরকার শুধু ডেটাগুলো সঠিক পদ্ধতিতে এক করে সাজানো। তবে বাড়িটা সার্চ করার সময় তাঁকে স্বীকার করতে হলো যে ডেটাগুলো সব বিভ্রান্তিকর।

একটা বাড়িতে এক ভদ্রলোক আছেন, তাঁর স্ত্রী আছেন, আছেন এক তরুণী মেয়ে—সবাই বসে আছেন ডাইনিং টেবিলে। ভাবভঙ্গি দেখে বোঝা যায় সুখী তাঁরা, হাসিখুশি এবং কেউই নিজের চেয়ার পেছনে ঠেলার সময় পাননি। চোখে-মুখে অমায়িক হাসি নিয়ে নিষ্প্রাণ মূর্তি হয়ে গেছেন সবাই, প্লেটের ওপর দিয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকা অবস্থায়—সেসব প্লেটের খাবারে এখন পচন ধরেছে। খাবারের সঙ্গে পচছে মাছির ঝাঁকও।

এক বৃদ্ধা মহিলা, সব চুল সাদা, মুখভর্তি বলিরেখা। গায়ে 'কীটনাশক' লেখা একটা মাঝারি সাইজের বোতল রয়েছে মেঝেতে, তাঁর পায়ের কাছে, সেই বোতলের তলায় একটা এনভেলাপ পড়ে আছে, গায়ে স্পষ্ট অক্ষরে লেখা: 'তাকে, যদি কেউ বেঁচে থাকে।'

ভেতরের চিঠিটা বের করে পড়ছেন ডক্টর মুশফিক:

'আমি তিন সন্তানের মা, আমার তিন সন্তানকেই আমি জঙ্গি বানিয়েছি। ছোটবেলা থেকে ছেলেদের বুঝিয়েছি—কাফের মার, যেখানে পাবি সেখানে মার, মারতে গিয়ে যদি মরে যাস, এক পলকে বেহেশত পেয়ে যাবি! হাততালি দিয়ে বলেছি, বাহ রে বাহ, বাহবা, কী মজা!

'আমার তিন ছেলে বুকে বাঁধা বোমা ফাটিয়ে কাফেরদের নরকে পাঠাল, নিজেরা গেল বেহেশতে। আমি পড়ে থাকলাম একা। তারপর ছেলেরা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে লাগল, বলল: 'কোথায় গো মা তোমার বেহেশত? আমাদের তো অন্ধকার আর ঠান্ডা আকাশের এক কোণে আটকে রাখা হয়েছে, ফেরেশতারা বলছেন আমাদের এমন জাহান্নামে পাঠানো হবে, যেখান থেকে হাজার কোটি বছরেও বেরোতে পারব না। বলছেন, এই শাস্তি মাফ হতে পারে শুধু যদি আমরা নিজের চেষ্টায় মানুষ বানাতে পারি। যে প্রাণ তৈরি করতে পারব না সে প্রাণ ধ্বংস করে আমরা মহাপাপ করেছি।

'ওদের কথা শোনার পর আমি তো আর নিজের ভেতর নেই। আরে, কী বলে, সব তাহলে ভুয়া? তারপর চিন্তা করতে বসলাম। বেশি চিন্তা করার দরকার হলো না, ফাঁক আর ফাঁকি কেউ যেন আমার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে লাগল।

'আল্লাহ যদি বলে থাকেন, একজন মুসলমানের উচিত

জিহাদে অংশ নেওয়া, উচিত কাফেরদের হত্যা করা, তাহলে সংশ্লিষ্ট সবাই প্রত্যাশা করবে জঙ্গিদের তিনি সাহায্যও করবেন, তাই না? আল্লাহ তো সব নেক কাজে তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেন। কিন্তু কই, আল্লাহ কি জঙ্গিদের সাহায্য করছেন? আমরা তো বরং উল্টোটা দেখতে পাচ্ছি। আমেরিকা একা নয়, ইউরোপের দেশগুলোও নিয়ম করে সারা দুনিয়ায় সৈন্য পাঠিয়ে ইসলামি জঙ্গি মেরে সাফ করে ফেলছে যুগের পর যুগ ধরে। আবার, কী অদ্ভুত, এই দীর্ঘমেয়াদি পাইকারি জঙ্গি নিধনে ওদের সাহায্য করছে মুসলমানরাই।

'আমার ছেলেরা আবার আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। তারা জানতে পেরেছে, এই যে কাফের মেরে বেহেশতে যাবার কথা রটানো হচ্ছে, এর পেছনে আছে খোদ শয়তান। মুসলমানদের ক্ষতি করার একটা বিরাট ষড়যন্ত্র এটা তার। তার ষড়যন্ত্র যে সফল, সেটা বলাই বাহুল্য। শয়তান নাকি খুব চেষ্টা করছে পৃথিবীতে একটা নকল কেয়ামত নামাবে। হ্যাঁ, বেশ বুঝতে পারছি, কেয়ামত সত্যি চলে এসেছে। মাটি, আর সমস্ত বস্তু ধুলোর মতো উড়তে শুরু করবে, মানুষ ছিন্নভিন্ন হয়ে মিলিয়ে যাবে আকাশের আগুনে। আমার আল্লাহ আমার আর তাদের আত্মার প্রতি সদয় হন, যারা আমার ওপর সদয় ছিল। বাকি সবাই জাহান্নামের আগুনে পুড়তে থাকুক। আমিন।'

চিঠিটা শুনে ডক্টর জাহান মন্তব্য করলেন, 'পাগল বুড়ি। মানসিকভাবে অসুস্থ, দার্শনিক অর্থে দূষিত, নিজের চারপাশে সবাইকে মরতে দেখে তাঁর মাথা বিগড়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া, তিনি একজন খুনি, পাগল হবার সেটাই বড় কারণ।'

'এবং তারপর আত্মহত্যা করেছেন?'

'হ্যাঁ, আমার তা-ই ধারণা।'

'আরেকটু অপেক্ষা করলে এমনিতেই হয়তো মারা যেতেন, তাহলে কীটনাশক বিষ খেয়ে মরতে গেলেন কেন?'

'পাগলের কাজ যুক্তি দিয়ে মেলানো যায় না। ওই কিশোরও কিন্তু আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে,' বললেন ডক্টর জাহান। 'সেটাও খুব সহজ মৃত্যু ছিল না।'

মুশফিক মাথা ঝাঁকালেন।

দানেশ গাজি একা থাকতেন। কালো আর তেল চিটচিটে কভারঅল দেখে তাঁরা ধারণা করলেন শহরের গ্যাস স্টেশনটা তিনিই চালাতেন। এই ভদ্রলোক করেছেন কী, প্রথমে বাথরুমে ঢুকে বাথটাবে পানি ভরেছেন, হাঁটু ভাঁজ করে বসে পানির দিকে ঝুঁকেছেন, মাথাটা নামিয়েছেন পানিতে, যতক্ষণ না মৃত্যু হয় ততক্ষণ পানি থেকে মাথা আর তোলেননি।

তাঁরা যখন দানেশ গাজিকে পেলেন, তাঁর লাশ শক্ত হয়ে গেছে, নিজের মাথাটাকে দুহাত দিয়ে পানির নিচে ধরে রেখেছেন। চারপাশে আর কেউ নেই, নেই কোনো রকম ধস্তাধস্তির চিহ্নও।

'অসম্ভব,' বললেন ডক্টর মুশফিক, 'এভাবে কেউ আত্মহত্যা করতে পারে না।'

তারপর তাঁরা এক বাড়িতে ঢুকে একটা খোলা কম্পিউটার দেখতে পেলেন। কেউ একটা চিঠির মতো কিছু লিখে রেখে গেছে বলে মনে হলো। হ্যাঁ, চিঠি; তবে সাধারণ কোনো চিঠি নয়। বক্তব্য শান্ত থাকতে না দেওয়ার মতো স্পষ্ট, আবার কোথাও হয়তো পারম্পর্য রক্ষিত হয়নি, অভিমান আর ক্ষোভে ফেটে পড়া এক তরুণী অথচ কোনো অভিযোগ নেই এবং তাঁর চলে যাবার ধরনটা বড় মর্মস্পর্শী, শ্রদ্ধাভরা কাতরতায় নত হয়ে আসে মাথা।

আমি ললিতা বানু। আমার এই তেইশ বছর বয়সে আমি এমন কোনো সক্ষম পুরুষ দেখিনি যে সুযোগ পেলে আমাকে ধর্ষণ করতে চেষ্টা করবে না। কি? না, এটা আমার ফ্যান্টাসি নয়, ভয় নয়, মিথ্যে কল্পনা নয়, বানানো শঙ্কা নয়; আমি বুঝতে পারি, আমি জানি। আমাকে যদি একা পায়, আর যদি বোঝে ধরা পড়বে না, এ কাজ থেকে কেউ ওদের বিরত রাখতে পারবে না। প্রতিদিন হাজারের ওপর মেয়েকে আপনারা ধর্ষণ করছেন না?

'স্বপ্ন নিরেট নয়, জ্যান্ত নয়, সত্য নয়, বাস্তব নয়; আবার যদি বলা হয় স্বপ্ন আসলে এগুলোর উল্টো, তাহলে তা নিয়ে আমি তর্ক করার কিছু দেখি না। মর্ত্যের সুন্দরী নারীকে একবার শুধু দেখলে হয়েছে, গ্রিক আর রোমান দেবতারা তড়িঘড়ি করে মর্ত্যে নেমে এসে ঠিক ওই নারীকে উপভোগ করে যেতেন। সেটাকে ধর্ষণ ছাড়া কী বলা যায়? আমার স্বপ্নে আমি দেখতে পাই তেনারা আমাকেও ধর্ষণ করে যাচ্ছেন, নিয়মিত যদি নাও হয়। মুশকিল হলো এ কথা কাউকে আমার বলার সুযোগ বা সাহস নেই যে আমি কামজর্জর এক নারী এবং আমি অকপটে স্বীকার করছি সত্যি সত্যি আমি সারাক্ষণ উপলব্ধি করি কোনো পুরুষ আমাকে বিদ্ধ করলে যে সুখটা আমি পাব সেটার চেয়ে প্রিয় এবং কাম্য আর কিছু হবে না আমার জীবনে। নিশ্চয় আপনি ভাবছেন, জিনিসটা এখনো পায়নি, তাতেই তাঁর এই অবস্থা, পেলে না জানি কী হবে।

কী? দূর, সমাজের কথা কে ভাবে! ওসব আমি একদম গ্রাহ্য করি না। শুনুন, ওটা সত্যি সারাক্ষণ আমার দরকার। কিন্তু আমি ধর্ষিতা হতে চাই না। আমি চাই একজন পুরুষ আমাকে বানিয়ে নিক। আমার মনটাকে প্রত্যাশায় অধীর করে নেওয়ার দরকার আছে। আগে আমার শরীরটাকে উষ্ণ করো হে। আগে আমাকে রবিঠাকুরের কটা প্রেমের গান শোনাও ব্রাদার। আমার কানে শিস দাও, ঢালো জলতরঙ্গ, আগে আমার শরীরে শিরশিরে অনুভূতি হোক। মুখে সুন্দর একটু হাসি নিয়ে এসো, সে হাসিতে যেন মনের ভাবনারও ছাপ থাকে, এসে বলো আমি তোমাকে পছন্দ করি, আমি তোমাকে চাই—তুমি মুটে-মজুর হও, বেঢপ ভুঁড়িঅলা হও, তরুণ কবি হও বা তোমার বয়স সত্তর ছুঁয়ে দিক তোমাকে, তাতে আমার কিছু আসে যায় না, যত দিন মন চায় আমি তোমার—একটাই শর্ত, তোমাকে যথেষ্ট সময় নিয়ে শুধু শক্ত হতে হবে।

এতক্ষণে আপনার কাছে এটা তো পরিষ্কার হয়ে গেছে যে আমি স্বাভাবিক নই। যে মেয়ে নারীর যৌন স্বাধীনতা চাইছে এ সমাজ তাকে কখনো স্বাভাবিক বলবে না। এক অর্থে পুরুষেরাও কিন্তু যৌন স্বাধীনতা পাচ্ছে না, কিন্তু তাদের গায়ে বেশি জোর থাকায় তারা ধর্ষণের মাধ্যমে কিছুটা ভোগ করতে চেষ্টা করে।

আমার যেটা বলার কথা তা হলো, আমরা যারা যৌন স্বাধীনতা চাই, তা সে পুরুষ হোক বা নারী, তারা একধরনের জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত।

এই জীবাণু আমাদের ভেতর সংক্রমিত হয় আমাদের শরীরে যখন পরিবর্তনগুলো আসতে শুরু করে। এর নাম যৌনজীবাণু। যৌনজীবাণুর বৈশিষ্ট্য হলো ওটাকে ব্যবহার করতে হবে অবাধে, সহনীয় উদারতার সঙ্গে আর তাতেই এই স্বর্গীয় উপহারের পরম সার্থকতা। বিশ্বাস করুন, আমি মনে মনে জানতাম যে অন্য কোথাও এমন আরেকটা জীবাণু আছে, যেটা আমার জীবাণুটাকে মেরে সাফ করে ফেলতে পারে। জানতাম সেটা আমার শত্রু। সত্যি যদি আসে, আমি শেষ। আমাকে আমার সংক্রমণ থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য কোনো এক মহাবিশ্ব থেকে সত্যি এসেছে সেটা। কিন্তু আমি তাদের সে সুযোগ দেব না। যে জীবাণু আমাকে প্রায় অসহ্য রকমের সুখানুভূতি দেয় বা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি প্রকাশ করে, আমি ওদের আমার শরীর থেকে নির্মূল হতে দেব না। ওরা যখন আমাকে এত পছন্দ করে, তাহলে আমার সঙ্গেই যাক।

সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে, তাই এখন বাড়ির পেছনের উঠানে যাচ্ছি। ইতি, ললিতা, একজন অক্ষতযোনি [যতই

অসম্ভব বলে মনে হোক]।

বি. দ্র. এই কম্পিউটারের হার্ডডিস্ক সংরক্ষণ করতে পারেন, তাহলে আমার জীবনের ইন্টারেস্টিং কিছু বিষয় জানতে পারবেন। অসংখ্য ধন্যবাদ।

কথাগুলো কম্পিউটারে কম্পোজ করেছেন ললিতা। তিনি একটা প্রাইভেট ভার্সিটিতে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছিলেন। লেখাটা কম্পোজ করার পর শান্ত ভঙ্গিতে বাড়ির পেছনে গেছেন তিনি, একটা চেয়ারে বসেছেন, গায়ে এক গ্যালন কেরোসিন ঢেলেছেন, ভিজে গায়ে ঠেকিয়েছেন জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি। তাঁর শরীরের অবশিষ্টাংশের পাশে, তিন-চার ফুট দূরে, কেরোসিনের খালি ক্যানটা পাওয়া গেছে।

'কিছু লোক সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে, আবার কিছু...প্রথমে পাগল হয়েছে, তারপর মরেছে।'

'কিন্তু আমরা দেখা যাচ্ছে বারবার সেই একই মৌলিক প্রশ্নে ফিরে আসছি। কেন?'

'তাতে পার্থক্যটা কী?'

'এই পোকা সম্ভবত সবার বেলা এক রকম কাজ করে না,' বললেন সদয় জাহান। 'কিছু লোক বাকিদের চেয়ে বেশি প্রভাবিত হচ্ছে। কিছু লোক প্রোটেকশন পাচ্ছে, অন্তত কিছু সময়ের জন্য।'

'মনে আছে তো,' ডক্টর মুশফিক বললেন, 'হাতিমারার ওপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় প্লেন থেকে যে ছবি তোলা হয়েছে, তাতে এক লোককে জীবিত দেখা গেছে। সাদা জোব্বা বা আলখেল্লা পরা।'

'আপনি ভাবছেন এখনো বেঁচে আছে লোকটা?'

'সেটাই চিন্তা করছি,' বললেন মুশফিক। 'কিছু লোক যদি অন্যদের চেয়ে বেশি সময় বাঁচে—এত বেশি যে কম্পিউটারে কম্পোজ করতে পারে, হাতে চিঠি লিখে এনভেলাপে ভরতে পারে এবং আত্মহত্যার আয়োজন করতে পারে—তাহলে নিজেকে আপনি জিজ্ঞেস করে দেখুন, কেউ এই শহরে আরও অনেক লম্বা একটা সময় নিয়ে কেন বেঁচে থাকতে পারবে না?'

ঠিক এই সময় কান্নার আওয়াজটা শুনতে পেলেন তাঁরা।

প্রথমে মনে হলো কিছু না, বাতাসের শব্দ—এত চিকন আর দুর্বোধ্য; তবে কান পেতে থাকলেন তাঁরা, দ্বিতীয়বার শুনে মনে সংশয় জেগেছে, বিভ্রান্ত বোধ করছেন, তারপর বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। আওয়াজটা আর থামছে না, শুধু খক খক করে কাশির সময়টা বাদে।

ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে এলেন তাঁরা। অস্পষ্ট লাগছে কানে, কোন দিক থেকে আসছে বোঝা যাচ্ছে না। রাস্তা ধরে ছুটছেন দুজন, এতক্ষণে মনে হলো বাড়ছে ওটা। উৎসাহ পেয়ে ছোটার গতি বেড়ে গেল।

তারপর একদম হঠাৎ করে থেমে গেল কান্না।

দাঁড়িয়ে পড়লেন তাঁরা, খুব হাঁপাচ্ছেন, দ্রুত ওঠানামা করছে বুক। রাস্তার মাঝখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করছেন।

'আমাদের মাথা কি খারাপ হয়ে গেছে?' প্রশ্ন তুললেন সদয় জাহান।

'না,' বললেন কুমার মুশফিক। 'আমরা যে শুনেছি, তাতে ভুল নেই।'

অপেক্ষা করছেন তাঁরা। কয়েক মিনিট পুরোপুরি নীরব থাকল চারপাশ। রাস্তা আর বাড়িঘরের ওপর চোখ বুলাচ্ছেন ডক্টর জাহান। রাস্তার আরেক প্রান্তে, ডাক্তার হুমায়ুন কাদেরের বাড়ির সামনে ভ্যানগাড়িটা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

তারপর আবার শুরু হলো সেই কান্না। এবার তাতে অনেক জোর, প্রলম্বিত সুর।

আবার তাঁরা ছুটলেন।

খুব বেশি দূর যেতে হলো না; রাস্তার ডান দিকে, দুটো বাড়ির পর। বাড়িটার সামনের ফুটপাতে একজন পুরুষ এবং একজন মহিলার লাশ পড়ে আছে, দুজনেই নিজের নিজের বুক খামচে ধরে রাখা অবস্থায় মারা গেছে। ওগুলোকে পাশ কাটিয়ে ছুটলেন তাঁরা, ঢুকে পড়লেন বাড়ির ভেতর। কান্নাটা এখনো জোরালো, খালি কামরাগুলোকে ভরাট করে রেখেছে।

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠছেন তাঁরা। প্রথম কামরাটা খালি, পাশেরটা বেডরুম। বড় খাটের ওপর বিছানা, তবে পরিপাটি নয়, এলোমেলো হয়ে আছে। ঘরের এক ধারে ড্রেসিং টেবিল, আরেক ধারে একটা আলমারি।

আর আছে ছোট একটা দোলনা।

সেটার দিকে ঝুঁকলেন দুজন, সাদা কাভারে মোড়া ছোট্ট লাল লেপ সরাতেই ধবধবে ফরসা মুখটা দেখতে পেলেন তাঁরা, কাঁদতে কাঁদতে লাল করে ফেলেছে, ভারি অসুখী এক শিশু। ওদের মুখ পরখ করার জন্য সঙ্গে সঙ্গে কান্না থামাল সে। প্লাস্টিক স্যুটে ঢাকা মুখ আর শরীর দেখে ভয় তো পাবেই, কাজেই আবার কাঁদতে শুরু করল, এবার খিদেতে নয়।

'ভয়ে চেঁচাচ্ছে,' ডক্টর জাহান বললেন। 'পুওর থিং।' সাবধানে, আলতো করে ধরে, বুকের কাছে তুলে দোলা দিচ্ছেন। কিন্তু বাচ্চাটা তাতে থামছে না, তার দাঁতবিহীন মুখ বিরাট হাঁ হয়ে আছে, চেহারায় বেগুনি ভাব চলে আসছে, কান্নার দমকে কপালের শিরাগুলো ফুলে ফুলে উঠছে।

'মনে হয় খিদে পেয়েছে,' ডক্টর জাহান বললেন।

মুশফিক ভ্রু কুঁচকে দেখছেন। 'একদম তো কচি। বয়স বোধ হয় দুই মাসের বেশি হবে না। ছেলে না মেয়ে?'

পাতলা কাঁথা সরিয়ে ডায়াপার চেক করলেন সদয় জাহান। 'ছেলে। আর এই ছেলের ডায়াপার বদল করা দরকার, দরকার খাওয়ানো।' কামরার চারদিকে তাকালেন তিনি। 'হয়তো কিচেনে কিছু পাওয়া যেতে পারে...'

'না,' মাথা নাড়ছেন ডক্টর মুশফিক। 'ওকে আমরা কিছু খাওয়াব না।'

'কেন?'

'আগে আমরা ওকে এই শহর থেকে বের করব, তার আগে পর্যন্ত যেমন আছে তেমনি রাখতে হবে ওকে। হতে পারে এই ডিজিজ প্রসেসের সঙ্গে ফিডিংয়ের একটা সম্পর্ক আছে, হতে পারে যে মানুষগুলোকে এই রোগ খুব জোরে চেপে ধরেনি বা খুব দ্রুত কাবু করতে পারেনি তারা হয়তো সম্প্রতি কিছু খায়নি। হতে পারে এই শিশুর খাবারে প্রটেকটিভ কিছু আছে। হয়তো...' থামলেন তিনি, তারপর আবার শুরু করলেন, 'কিন্তু সেটা যা-ই হোক না কেন, আমরা কোনো ঝুঁকি নিতে পারি না। আমাদের অপেক্ষা করতে হবে, প্রথমে ওকে নিয়ে যেতে হবে নিয়ন্ত্রিত একটা পরিবেশে।'

সদয় জাহান দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। কুমার মুশফিক যে ঠিক কথা বলছেন তা তিনি জানেন, কিন্তু তিনি এও বুঝতে পারছেন যে শিশুটির পেটে অন্তত বারো ঘণ্টা কিছু পড়েনি। ওর তো কান্না পাবেই।

ডক্টর মুশফিক বললেন, 'এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ডেভেলপমেন্ট। আমাদের জন্য মেজর ব্রেক, আর তাই এটাকে আমাদের ধরে রাখতে হবে। আমি মনে করি এখনই আমাদের ফেরা উচিত।'

'কিন্তু এখনো আমাদের গোনা হয়নি মোট কটা লাশ।'

মাথা নাড়লেন মুশফিক। 'কিছু আসে যায় না। এখানে এরপর যা-ই পাব বলে আশা করি না কেন, তার চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান জিনিস আমরা পেয়ে গেছি—একজন সারভাইভার।'

কী মনে করে বাচ্চা তার কান্না একবার থামিয়েছে, মুখে একটা আঙুল ঢুকিয়ে চুষছে এবং চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়ে আছে ডক্টর জাহানের দিকে। তারপর, যখন বুঝতে পারল কোনো খাবার আসছে না, আবার গলা ছেড়ে কাঁদতে শুরু করল। এটাই তার প্রতিবাদের একমাত্র ভাষা। 'এটা খুব খারাপ যে,' সদয় জাহান বললেন, 'ও আমাদের বলতে পারবে না ঠিক কী ঘটেছে এখানে।'

'আমি আশা করছি পারবে,' বিড়বিড় করলেন ডক্টর মুশফিক।

ভ্যানগাড়িটাকে রাস্তার মাঝবরাবর নিয়ে এসে থামালেন তাঁরা, শূন্যে ঝুলে থাকা হেলিকপ্টারের সরাসরি নিচে। তারপর পাইলটকে সংকেত দিলেন : মইটা ফেলুন।

ডক্টর জাহান বাচ্চাটাকে নিয়েছেন আর ডক্টর মুশফিক নিয়েছেন কৃত্রিম উপগ্রহ অতুল ৭। আশ্চর্য এক ট্রফি, ভাবলেন মুশফিক, খুবই বিস্ময়কর একটা শহর থেকে পাওয়া। বাচ্চাটা এখন চুপ করে আছে; কাঁদতে কাঁদতে শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে, গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছে, তবে ঘুমের মধ্যেও মাঝেমধ্যে ফোঁপাচ্ছে বটে।

এই শিশুর প্রচুর যত্ন নিতে হবে, বাঁচিয়ে রাখতে হবে যেকোনো মূল্যে। কী কারণে ওকে ভয়ংকর রোগটা স্পর্শ করেনি, হয়তো এই প্রশ্নের উত্তরের ওপর নির্ভর করছে লাখ লাখ বা হয়তো কোটি কেটি মানুষের জীবন। হয়তো দেখা যাবে উত্তর পেলে সবার বাঁচার একটা উপায় পাওয়া যাবে, তা না হলে কাউকে বাঁচানো যাবে না। শুধু বাংলাদেশও হয়তো নয়, প্রতিবেশী দেশগুলোও জনশূন্য হয়ে পড়তে পারে। প্লেগ বা মহামারি একবার সেভাবে ছড়ালে কার সাধ্য সেটাকে থামায়।

কে জানে, ঘটনা হয়তো সেদিকেই এগোচ্ছে অথচ তাঁরা অন্ধকারে আছেন, কিছুই জানেন না। পার্বত্য এলাকা খাগড়াছড়ির বনভূমি আগের চেয়ে অনেক বেশি নিবিড় হয়েছে, হয়েছে আগের চেয়েও কয়েক শ কিলোমিটার বিস্তৃত। পুরো এলাকায় লোকবসতি নগণ্য, রাস্তাঘাট অসম্ভব দুর্গম, খবর পৌঁছাতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক পক্ষকাল লেগে যেতে পারে। পাঁচ শ বর্গকিলোমিটার এলাকার বনরক্ষীরা মরে সাফ হয়ে গেছে কি না তাই বা কে বলবে।

কপ্টার নেমে আসছে। নির্দিষ্ট উচ্চতায় স্থির হয়ে ভেসে থাকছে। ধুলোর মেঘ তৈরি হচ্ছে। কাঁথা দিয়ে শিশুটির মুখ ঢেকে নিলেন ডক্টর জাহান। মই নামল, সেটা ধরে ওপরে উঠতে শুরু করলেন তিনি। এমনিতে স্যুটটা আড়ষ্ট করে রেখেছে, তার ওপর কাঁধে বাচ্চা থাকায় মই বেয়ে উঠতে অনেক কষ্ট হচ্ছে।

উপগ্রহ নিয়ে নিচে দাঁড়িয়ে আছেন মুশফিক। দাঁড়িয়ে আছেন বাতাস, ধুলো আর সগর্জন রোটরের মাঝখানে। এবং এই অবস্থায় অকস্মাৎ উপলব্ধি করলেন রাস্তায় তিনি একা নন। ঘুরলেন, সঙ্গে সঙ্গে ভূত দেখার মতো চমকে উঠতে হলো।

তাঁর পেছনে একজন মানুষ।

বয়স হয়েছে মানুষটার। মাথায় পাতলা সাদা চুল, সারা মুখে প্রচুর রেখা আর দাগ। তিনি পরে আছেন লম্বা একটা নাইট গাউন, কাপড়টা সাদা, তবে তাতে প্রচুর ধুলাবালু আর ছোপ ছোপ দাগ লেগে আছে। আর পা দুটোয় কিছু নেই, খালি। হোঁচট খেতে খেতে হেঁটে আসছেন ডক্টর মুশফিকের দিকে। নাইট গাউনের ভেতর ভদ্রলোকের বুক ওঠানামা করছে, হাঁপাচ্ছেন তিনি।

'কে আপনি?' জিজ্ঞেস করলেন মুশফিক। তবে তাঁর জানা আছে : ইনি হলেন ফটোয় দেখা সেই ব্যক্তি। প্লেন থেকে এই ভদ্রলোকেরই ছবি তুলেছিলেন পাইলট। আদিবাসী একজন মানুষ।

'আপনি...' ভদ্রলোক বললেন।

'আপনি কে?'

'আপনারা এসব...করেছেন...'

'আপনার নাম বলুন।'

'আমাকে মারধর করবেন না, দয়া করে আমাকে মারধর করবেন না...আমি আর সবার মতো নই...'

প্লাস্টিকে মোড়া ডক্টর মুশফিকের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছেন তিনি, ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছেন। মুশফিক ভাবলেন, আমাদের নিশ্চয় অদ্ভুত লাগছে তাঁর। সম্ভবত অন্য কোনো গ্রহ থেকে আসা মানুষ বলে মনে করছেন।

'আমাকে মারবেন না...'

'মারব না, আমরা আপনাকে মারব না,' বললেন মুশফিক। 'আপনার নাম কী?'

'সুবীর...সুবীর, স্যার। কিন্তু দয়া করে মারধর করবেন না আমাকে। কী বললেন? আমার নাম? আমি সুবীর চাকমা। হ্যাঁ, আমি ...' থেমে রাস্তায় পড়ে থাকা লাশগুলো ইঙ্গিতে দেখালেন। 'আমি আর সবার মতো নই...'

'আমরা আপনার কোনো ক্ষতি করব না,' বললেন মুশফিক।

'কিন্তু আর সবার ক্ষতি করেছেন।'

'না, এখানে যা ঘটেছে তার জন্য আমরা দায়ী নই।'

'ওরা সবাই মারা গেছে। আমার আপনজনের মতো ছিল ওরা...'

'ওদের এই মৃত্যুতে আমাদের কোনো হাত নেই...'

'আপনি একটা মিথ্যুক,' চেঁচিয়ে উঠলেন ভদ্রলোক, চোখ দুটো বিস্ময়ে বিস্ফারিত—সম্ভবত নিজের এত বড় স্পর্ধা লক্ষ করে। 'আপনি আমাকে মিথ্যে কথা বলছেন। আপনি হিউম্যান নন। শুধু ভান করছেন হিউম্যান বলে। আপনার জানা আছে আমি সুস্থ নই, জানা আছে আমার সঙ্গে ভান করা যায়। আমি অসুস্থ, আমার রক্ত পড়ছে... রক্ত পড়ছে...ওখান থেকে...'

কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে তাঁর, হঠাৎ কুঁজো হয়ে গেলেন, পেট চেপে ধরে ব্যথায় মুখ কোঁচকাচ্ছেন।

'কী হয়েছে আপনার?'

উত্তর না দিয়ে মানুষটা ঢলে পড়লেন মাটিতে। জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলছেন, ফ্যাকাশে হয়ে গেছে চেহারা, খুব ঘামছেনও।

'আমার পেট,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন। 'সমস্যা আমার পেটে।'

তারপরই হড়হড় করে বমি করলেন। বমির সঙ্গে একদম তাজা টকটকে লাল রক্ত বেরিয়ে এল।

'সুবীর বাবু...'

কিন্তু ভদ্রলোক এখন আর সচেতন নন। তাঁর চোখ বন্ধ হয়ে গেছে, জমিনে চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। ডক্টর মুশফিক ভাবলেন, যাও বা পেলাম, মরে গেলেন! তারপর দেখলেন তাঁর বুক উঁচু-নিচু হচ্ছে, যদিও এত ধীরে যে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে তবে টের পাওয়া যায়।

মই বেয়ে আবার নেমে এলেন ডক্টর জাহান।

'কে ইনি?'

'আমাদের ভবঘুরে ব্যক্তি। ওকে তুলতে হবে, আমার সঙ্গে হাত লাগান।'

'তিনি কি বেঁচে আছেন?'

'কোনো রকমে।'

'ও গড, আমি স্রেফ মারা যাব!' বললেন ডক্টর জাহান।

অজ্ঞান সুবীর বাবুকে কপ্টারে তোলার জন্য ইলেকট্রিক পাওয়ার উইঞ্চ ব্যবহার করলেন তাঁরা। দ্বিতীয়বার ওটাকে নামাতে হলো অতুল ৭ ক্যাপসুল তোলার জন্য। তারপর কপ্টারের পেটে উঠে গেলেন দুই বিজ্ঞানী।



ইউনিফর্ম মানে এক প্রস্থ কাপড়ে তৈরি স্যুট

তাঁদের অক্সিজেন শেষ হয়ে আসছে। তবে স্যুট না বদলে খালি বোতল ফেলে দিয়ে নতুন বোতল ক্লিপ দিয়ে আগের জায়গায় আটকে নিলেন, তাতে আরও দুই ঘণ্টা অক্সিজেন সাপ্লাই পাবেন। প্রজেক্ট দাবানলের স্থাপনায় পৌছানোর জন্য যথেষ্ট।

বেতারে কুমিল্লার দেওগাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন পাইলট, ডক্টর মুশফিক যাতে মেজর তুষার আবদুল্লাহর সঙ্গে কথা বলতে পারেন।

'কী পেয়েছেন আপনারা?' জানতে চাইলেন মেজর, তাঁর গলার আওয়াজ স্বাভাবিক নয়, প্রশ্নটা তীক্ষ্ণ সুরে করতে চেয়েছেন, অথচ গলা থেকে আওয়াজই বেরোতে চাইছে না।

'কী হয়েছে?' ফিসফিস করে জানতে চাইলেন মুশফিক।

'কী আবার হবে! আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।'

'মরা একটা শহর। আমরা ভালো একটা এভিডেন্স পেয়েছি, যেখানে অস্বাভাবিক পদ্ধতি কাজ করছে।'

'সাবধান হোন,' সতর্ক করলেন মেজর, তাঁর গলার স্বর ক্ষণে ক্ষণে ভেঙে যাচ্ছে। 'এটা খোলা লাইন।'

'জানি, সচেতন আছি। আপনি ৭-১২ অর্ডার দেবেন?'

'চেষ্টা করব। সেটা আপনি এখনই চাইছেন?'

'হ্যাঁ, এখনই।'

'হাতিমারা?'

'হ্যাঁ।'

'আর কোথাও?'

'হ্যাঁ। হাইওয়ে ধরে খানিক উত্তরে। লোকেশনটা আমি কোড করে জানাব।'

'আমাদের কাছে খবর আছে আরও উত্তরে আরও ঘটনা ঘটেছে। শুধু উত্তরে নয়, দক্ষিণ আর পশ্চিমেও। সব মিলিয়ে বারোটা স্পটে, প্রতি মুহূর্তে স্পটের সংখ্যা বাড়ছে। আমরা খবর পাচ্ছি সীমান্তের দিকে ছয় শ মাইল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছে। বড় আঘাতটা লেগেছে বনরক্ষীদের ওপর, পালানোর সুযোগ ছিল না...দেরিতে হলেও শিকারি বাজ পাঠানো হয়েছে। অসমর্থিত খবরে বলা হয়েছে, সীমান্তের ওপারে ঘন বসতি থাকায় গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে যাচ্ছে...'

'ও মাই গড, ও মাই গড...,' ডক্টর মুশফিককে উদ্‌ভ্রান্ত দেখাচ্ছে।

'অতুল ৭ আপনাদের কাছে?' কর্কশ গলায় জানতে চাইলেন মেজর আবদুল্লাহ।

'হ্যাঁ,' এবার ডক্টর মুশফিকের গলা ভেঙে গেল, বেসুরো শোনাল।

'ঠিক আছে,' ক্লান্ত সুরে বললেন মেজর, রাত জেগেছেন তিনি, জানা নেই আবার কখন ঘুমাতে যেতে পারবেন। 'নির্দেশটা জারি করানোর চেষ্টা করছি আমি। তালিকায় যে কটা স্পট আছে সবগুলোতে পাঠানো হবে ওদের। যাক, সব খাক করে দিয়ে আসুক।'

৮. নির্দেশনা ৭-১২

৭-১২ হলো চূড়ান্ত দাবানল প্রটোকলের একটা অংশ, দেশের কোথাও বায়োলজিক্যাল ইমার্জেন্সি দেখা দিলে জারি করা যেতে পারে। এই নির্দেশনা জারি করার অর্থ হলো, মানুষসহ সব প্রাণীর জন্য বিপদ হয়ে দেখা দেওয়া ভয়ংকর রকমের ক্ষতিকর জীবাণু ধ্বংস করার প্রয়োজনে সীমিত পর্যায়ে থার্মোনিউক্লিয়ার উইপন ব্যবহার করা যাবে। এই নির্দেশনার

কোড হলো 'খাক', যেহেতু যে খুদে অ্যাটম বোমাটা ফেলা হবে সেটার কাজ হলো আক্রান্ত জায়গা এবং আশপাশের কিছু এলাকা পুড়িয়ে খাক বা ছাই করে ফেলা, যাতে ওই জীবাণুর ছড়িয়ে পড়া বন্ধ হয়।

২০১৭-১৯ সালে উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের যে যুদ্ধ হয়েছিল তাতে আমেরিকার এবং জাতিসংঘের চাপিয়ে দেওয়া নীতি টেকেনি, অর্থাৎ যাদের হাতে আণবিক অস্ত্র আছে তারাই শুধু সেটার সুবিধে ভোগ করতে পারবে, নতুন কোনো দেশ পারমাণবিক অস্ত্রের মালিক হতে পারবে না, এটা উত্তর কোরিয়া মানেনি। অ্যাটম বোমা মেরে দেশটাকে উড়িয়ে দেওয়া হবে বলে হুমকি দেখিয়েও কোনো কাজ হয়নি, উত্তর কোরিয়া একের পর এক পরীক্ষা চালিয়ে পারমাণবিক অস্ত্রের মালিক বনে গেছে। শুধু তা-ই নয়, আন্তমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক মিসাইলও বানিয়েছে তারা, আমেরিকার হুমকি-ধমকিতে কাজ হয়নি। কাজ হবে কী করে, উত্তর কোরিয়ার মিসাইল সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রের যেকোনো রাজ্যে আঘাত হানতে সক্ষম। আমেরিকানরা কি আর জানে না যে ইটটি মারলে অবশ্যই পাটকেলটি খেতে হবে।

এই যুদ্ধের ফল আমেরিকার জন্য ভালো হয়নি, আর তাই পারমাণবিক অস্ত্র বানাতে আর কেউ ওদের মানা শুনছে না। ২০৪৩-এ এসে দেখা যাচ্ছে আমেরিকা আর পৃথিবীকে নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা রাখে না। দেশটির পতন শুরু হয় ২০১৬ সালে, ডোনাল্ড ট্রাম্প নামের এক জোকারকে ভোট দিয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করার পর। এখন আণবিক অস্ত্র ইরানের কাছে আছে; আছে বাংলাদেশ, ব্রাজিল, আফ্রিকার অন্তত চারটে দেশ, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়াসহ আরও আধডজন দেশের হাতে। ব্যাপারটা এখন আর কারও একচেটিয়া নয়, ফলে ক্ষমতার ভারসাম্য লক্ষ করা যাচ্ছে।

এই প্রতিরোধ আইন তৈরি করার সময় কেউ ধারণা করতে পারেনি যে প্রধানমন্ত্রীকে যখন ৭-১২ জারি করতে অনুরোধ করা হবে, তখন তিনি সেটাকে কীভাবে নেবেন। যত ছোট আকৃতিরই হোক, তিনি কি নিজের দেশের ভেতর অ্যাটম বোমা ব্যবহার করতে রাজি হবেন. তাও আবার একাধিক স্পটে?

মেজর আবদুল্লাহর রিপোর্ট পাবার এক ঘণ্টা পর একটা সিদ্ধান্ত জানাল ঢাকা। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের পেছনে কী কারণ কাজ করে সেটা কখনোই পরিষ্কার হয় না, তবে চূড়ান্ত ফলাফলটা একদম পরিষ্কার।

প্রধানমন্ত্রী চব্বিশ ঘণ্টা থেকে আটচল্লিশ ঘণ্টার জন্য নির্দেশনা ৭-১২ জারি স্থগিত ঘোষণা করলেন। তার পরিবর্তে জাতীয় প্রহরীর ডিরেক্টরকে ডেকে পাঠালেন, নির্দেশ দিয়ে বললেন আক্রান্ত প্রতিটি স্পটকে মাঝখানে রেখে এক শ বিশ কিলোমিটার কর্ডন করে রাখো। তারপর কী হয় দেখার জন্য অপেক্ষায় থাকলেন তিনি।

৯. জাহাজডুবি, রাজশাহী

সার্জেন উত্তম নওয়াব বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর একটা হেলিকপ্টার গানশিপ শিকারি বাজে রয়েছেন, রাবারের অক্সিজেন মাস্কের ওপর দিয়ে তাকিয়ে আছেন হাঁটুর ওপর খোলা ফাইলের দিকে। ওটা পড়ছেন তিনি। ফাইলের প্রচ্ছদে স্টেনসিল করা কয়েকটা শব্দ :

দাবানল

(এই ফাইলে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাসংক্রান্ত চরম গোপনীয় তথ্য আছে। তাই অনুমোদিত ব্যক্তি ছাড়া কেউ এটা পড়তে পারবে না, পড়লে আইন অনুসারে তাকে বিশ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হবে এবং এক কোটি টাকা জরিমানা করা হবে।)

সম্রাট বাবর যখন ফাইলটা দিয়েছেন তাঁকে, প্রচ্ছদের লেখাটা পড়ে শিস না বাজিয়ে থাকতে পারেননি নওয়াব।

ডক্টর বাবর তাঁকে বলেছেন, 'ওসব আপনি বিশ্বাস করবেন না।'

'তার মানে শুধু ভয় দেখানোর চেষ্টা?'

'কী বলছেন ভয় দেখানো! ভুল কোনো লোক এই ফাইল পড়লে, স্রেফ গুম হয়ে যাবে সে।'

'ভালো, ভালো।'

'আপনি পড়ুন,' বলেছেন বাবর। 'তাহলে বুঝতে পারবেন কেন।'

পড়তে গিয়ে হোঁচট খেতে হয়েছে নওয়াবকে, কারণ ২৭৪ পাতার ফাইলে দু-চার লাইন পরপর রেফারেন্স আর ইন্টার সার্ভিস নোটেশন ব্যবহার করা হয়েছে, যার কিছুই তাঁর বোধগম্য হয়নি, হবার কথাও নয়।

মাত্র তিন পাতা পড়তেই বত্রিশ মিনিট পেরিয়ে গেল। ছোট ছোট হরফ, পড়তে খুব কষ্ট হচ্ছে, নওয়াবের চোখ ব্যথা করছে, মাথা ঘুরছে। ফাইল বন্ধ করে বিড়বিড় করলেন, 'এটা না পড়লে মহাভারত অশুদ্ধ হবার বিন্দুমাত্র আশঙ্কা নেই।'

ভাগ্যিস তিনি ফাইলটা পড়লেন না, তাই আমাদের লিখতে হলো না কী পড়েছেন তিনি, কাজেই আপনারাও জেল-জরিমানা থেকে রেহাই পেলেন।

কিন্তু তারপর দেখা গেল নওয়াব সাহেব আবার ফাইলটা খুলে পাতা ওলটাচ্ছেন। তিনি পড়ছেন বলে মনে হলো না, শুধু পাতাই ওলটাচ্ছেন। তারপর একটা পাতায় তাঁর দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। এই পাতাটি তিনি পড়লেন :

'২৭৪ পাতার ফাইলের এটা হলো ২৫৫ পাতা।

'প্রতিরক্ষা দপ্তর নিজস্ব অধিকার ও কর্তৃত্ববলে হাই সিকিউরিটি ফাইলের এই পাতাটি সরিয়ে ফেলেছে। সরিয়ে ফেলা পাতাটির নম্বর হলো ২৫৫। ফাইলের কোড নেম : দাবানল।

'সরিয়ে ফেলা বিষয়টির নাম হলো: অড ম্যান হাইপোথিসিস'

কোঁচকানো ভ্রু নিয়ে পাতাটির দিকে তাকিয়ে আছেন চিরকুমার নওয়াব, ভাবছেন কী মানে এর, এই সময় পাইলট ডাকলেন, 'ডক্টর নওয়াব?'

'বলুন।'

'এইমাত্র শেষ চেক পয়েন্ট পার হয়ে এলাম, স্যার। আর চার মিনিটের মধ্যে ল্যান্ড করব আমরা।'

'ঠিক আছে।' একটু থেমে জানতে চাইলেন, 'আপনি জানেন নির্দিষ্ট ঠিক কোথায় নামছে এই হেলিকপ্টার গানশিপ?'

'জানি, স্যার,' বললেন পাইলট। 'এটা রাজশাহী, জায়গার নাম জাহাজডুবি।'

'ও,' বললেন নওয়াব। 'কিন্তু আমি তো চারদিকে শুধু ধু ধু মরুভূমি দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, এই জায়গার নাম এখনো জাহাজডুবি রাখার কোনো মানে হয়?'

'এটাকে আপনি, স্যার, একটা খাঁটি বাঙালি রসিকতা বলতে পারেন,' কৌতুক করে বললেন পাইলট।

কয়েক মিনিট পর শিকারি বাজের গতি কমল, বদলে গেল ইঞ্জিনের শব্দ।

রাজশাহীর ধু ধু মরুভূমি প্রজেক্ট দাবানলের জন্য একদম আদর্শ জায়গা। কাছেই বিখ্যাত অ্যাটমিক সাইট শাপে বর, ঘোমটায় রয়েছে আলট্রা-এনার্জি টেস্ট স্টেশন, তারপর কাজীপাড়ার কাছে রয়েছে এয়ারফোর্সের আট নম্বর ট্রেনিং সেন্টার। এ ধরনের প্রায় সব ফ্যাসিলিটিই রাজশাহীর দক্ষিণ দিকে। বিশাল এলাকা, প্রায় সবটাই খালি পড়ে আছে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জমি অধিগ্রহণ করেছে, কী যেন একটা খাড়া করা হবে বলে শোনা যাচ্ছে।

দুপুরের খানিক পর ল্যান্ড করলেন উত্তম নওয়াব। আকাশে মেঘ নেই, রোদ খুব কড়া, শীতকাল হওয়ায় উপভোগ্য। মিলিটারি এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করেছে শিকারি বাজ। হেলিপ্যাডের কিনারায় বড় একটা টিনশেড দেখা যাচ্ছে, সেদিকে এগোলেন তিনি। ভেতরে প্রচুর জায়গা, একটা তাস খেলার টেবিলে দুজন পাইলট বসে আছেন। একজন সিকিউরিটি গার্ড এক কোণে দাঁড়িয়ে টেলিফোনে কথা বলছে কারও সঙ্গে, মেশিনগানটা কাঁধ থেকে ঝুলছে। সার্জেন ভেতরে ঢোকার সময় মুখ ফিরিয়ে তাকায়নি সে।

টেলিফোন বুথের কাছে কফি মেশিন দেখা যাচ্ছে, পাইলটকে নিয়ে সেদিকে এগোলেন নওয়াব, নিজেদের জন্য কফি ঢাললেন দুজন। কফিতে চুমুক দিয়ে সার্জেন জানতে চাইলেন, 'আচ্ছা, শহরটা কোন দিকে বলুন তো? আসার পথে কোথাও কিছু দেখলাম না যে?'

'আমার ঠিক জানা নেই, স্যার।'

'আপনি আগে কখনো এখানে আসেননি?'

'না, স্যার। এবারই প্রথম।'

'আমি বুঝতে পারছি না এই এয়ারফিল্ড ঠিক কী কাজে ব্যবহার করা হয়।'

এই সময় টিনশেডে ঢুকে তাঁদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল ডক্টর সম্রাট বাবরকে, হাতছানি দিয়ে নওয়াবকে ডাকছেন। ব্যাকটেরিওলজিস্ট পথ দেখিয়ে টিনশেডের পেছন দিয়ে বাইরে বের করে আনলেন তাঁকে, দেখা গেল তাঁদের জন্য ওখানে হালকা নীল ইগল সেডান কার অপেক্ষা করছে। গাড়িটায় কোনো রকম চিহ্ন রাখা হয়নি, সঙ্গে ড্রাইভারও নেই। ড্রাইভিং সিটে বসলেন বাবর, ইঙ্গিতে পাশের সিটে উঠতে বললেন নওয়াবকে।

গাড়ি ছেড়ে দিলেন বাবর, ধু ধু বালু ঢাকা তেপান্তরের ভেতর দিয়ে ছুটছে সেডান। বিশ মিনিট পর মরুর চেহারা বদলে গেল। তাঁদের দৃষ্টিপথ আটকে দিয়েছে ঢেউখেলানো আকৃতির অগুনতি বালিয়াড়ি, পাকা রাস্তাটা ওগুলোর ভেতর দিয়েই ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে এগিয়েছে মাইলের পর মাইল।

রাস্তার ওপর প্রচুর ধুলাবালু দেখে প্রশ্ন তুললেন নওয়াব।

'এর মধ্যে একটা চালাকি আছে,' উত্তরে জানালেন বাবর। 'ওগুলো বাতাসে উড়ে আসেনি, টাকা খরচ করে আমরা নিয়ে এসে ফেলেছি।'

'কিন্তু কেন?'

কাঁধ ঝাঁকালেন বাবর। 'ট্রাক্টরের চাকার দাগ ঢাকার জন্য। প্রচুর ভারী ইকুইপমেন্ট নিয়ে আসতে হয়েছে এই রাস্তা দিয়ে। আমরা চাইনি লোকজন ভাবুক ওগুলো কী, কোথায় নেওয়া হয়েছে।'

'সাবধানতার কথা যদি বলেন,' এক মুহূর্ত পর বললেন নওয়াব, 'ফাইলের পাতা ওলটাতে গিয়ে এক জায়গায় দেখলাম অ্যাটমিক সেলফ-ডেস্ট্রাকশন ডিভাইস সম্পর্কে লেখা হয়েছে।'

'কী জানতে চাইছেন?'

'ওটার অস্তিত্ব আছে?'

'আছে।'

'কিন্তু সেটা অপারেট করবে কে? তার আগে, হুকুম দেবেন কে?'

মাটির গভীরে দাবানল স্থাপনায় যখন অ্যাটমিক ডিভাইস বসানো হয় ডক্টর মুশফিক তখন বলেছিলেন দাবানলের ভেতর জীবাণু ছড়িয়ে পড়লে স্থাপনা উড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে তৎক্ষণাৎ; তখন যদি প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি চাইতে হয়, আর তা পেতে যদি অতিরিক্ত কয়েকটা মিনিট ব্যয় হয়ে যায় তাহলে সর্বনাশ যা ঘটার ঘটে যাবে, আমরা কেউ আর সেটাকে ঠেকাতে পারব না। তাঁর এই যুক্তি মেনে নিতে ছয় মাস সময় নেন প্রধানমন্ত্রী, বলেছেন, হ্যাঁ, এ রকম ঘটতে পারে।'

'এখন তাহলে কী ব্যবস্থা রাখা হয়েছে?'

'ওটা এখন সিভিলিয়ান, অর্থাৎ আমাদের হাতে। বিশদ কিছু এখনই আলোচনা করার দরকার দেখছি না।'

'না, সেটা ঠিক আছে, কিন্তু আমি যেন পড়লাম ওই ডিভাইসটা কীভাবে যেন অড ম্যান হাইপোথিসিসের সঙ্গে সংযুক্ত।'

'হ্যাঁ।'

'কীভাবে? আমার ফাইল থেকে অড ম্যান পাতাটা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।'

'আমি জানি,' ডক্টর বাবর জবাব দিলেন। 'এটা নিয়ে আমরা পরে কথা বলব।'

বালিয়াড়ির রাজ্যকে পেছনে ফেলে এসেছে ইগল, এখন পেছনে ধুলোর মেঘ উড়িয়ে ছুটছে কাঁচা একটা রাস্তা ধরে। জানালার কাচ তুলে দিয়ে নওয়াব একটা সিগারেট ধরালেন।

'এটাই আপনার শেষ সিগারেট,' বললেন বাবর।

'জানি। মজা করে ধোঁয়া গিলতে দিন।'

রাস্তার পাশে একটা সাইন দেখা গেল : সরকারি সম্পত্তি। প্রবেশ নিষেধ।

তবে চারদিকে কোথাও বেড়া নেই, গার্ড নেই, কুকুর নেই—শুধু তোবড়ানো টিনের একটা সাইনবোর্ড।

'চমৎকার সিকিউরিটি,' বললেন নওয়াব।

'আমরা চেষ্টা করি মানুষের মনে যেন সন্দেহ না জাগে। দেখে যা-ই মনে হোক, সিকিউরিটি সত্যি খুব ভালো।'

আরও দেড় কিলোমিটার এগোল সেডান। সামনে আবার বালিয়াড়ি দেখা যাচ্ছে, তবে কয়েকটা মাত্র, এত উঁচু যে মনে হলো প্রকৃতির তৈরি নয়, মানুষের তৈরি। তারপর হঠাৎ করেই ওই বালিয়াড়ির মাঝখানে কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা বৃত্তাকার একটা জায়গা দেখা গেল, ডায়ামিটারে এক শ গজ হবে। বেড়াটা, নওয়াব লক্ষ করলেন, দশ ফুটের কম উঁচু নয়। ভেতরে কাঠের তৈরি একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে, বাড়ির চারপাশে গমখেত।

'বাণিজ্যিক?' নওয়াব বললেন।

'চাতুর্যই বলব।'

গাড়ি নিয়ে গেটের সামনে চলে এলেন তাঁরা। হাতে হুঁকো নিয়ে ধুতি পরা এক মাঝবয়সী লোক তালা খুললেন। ওদের দিকে তাকিয়ে এক গাল হাসলেন, হাত তুলে দেখিয়ে দিলেন কোন দিকে যেতে হবে।

গেটের পাশে সাইনে লেখা : সরকারি সম্পত্তি। প্রবেশ নিষেধ।

বাংলাদেশ কৃষি দপ্তর, মরু প্রতিরোধ প্রকল্প, স্টেশন নম্বর ১২

গাড়ি নিয়ে গেটের ভেতর ঢুকলেন বাবর, থামলেন দালানের সামনে। ড্যাশবোর্ডে চাবি রেখে নামলেন তিনি, নামলেন নওয়াবও।

'এখন কী?'

'আসুন ভেতরে ঢুকি,' বলে বাড়িটার ভেতর ঢুকলেন বাবর। সামনে ছোট একটা কামরা। স্যুট-টাই পরা এক তরুণ ডেস্কে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন। মুখ তুলে সবিনয় হাসলেন তিনি।

'সব ভালো তো?'

'সব ভালো।'

'আপনাদের সাহায্য দরকার?'

'স্রেফ এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম,' বললেন বাবর। 'যাচ্ছিলাম...দিল্লি যাব আরকি।'

মাথা ঝাঁকালেন তরুণ। 'আপনাদের হাতে সময় আছে?'

'কাল আমার ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে।'

'ভারি লজ্জার কথা,' বললেন তরুণ।

'সেটা এই বালুর জন্য।'

সংকেত বিনিময় শেষ হলো, তরুণকে পাশ কাটিয়ে পাশের কামরায় ঢুকলেন তাঁরা, সেখান থেকে একটা করিডরে বেরোলেন। সারি সারি দরজা, প্রতিটি দরজার গায়ে কিছু না কিছু লেখা আছে, যেমন : বীজ পরীক্ষাগার/ স্যাঁতসেঁতে ভাব নিয়ন্ত্রণ/ মাটি বিশ্লেষণ

দালানের ভেতর সাত-আটজন কাজ করছেন। সবার পরনে সাধারণ কাপড়চোপড়, তবে সবাইকে যার যার কাজে খুব ব্যস্ত দেখা যাচ্ছে।

'এটা সত্যি সত্যি কৃষি দপ্তরের একটা মরু প্রতিরোধ প্রকল্প,' বললেন বাবর।

'আর দাবানল স্থাপনা?'

'এখানে,' বলে একটা দরজা খুললেন বাবর, সেটার গায়ে লেখা : 'স্টোররুম'। ভেতরে ছোট একটা কামরা, কৃষি যন্ত্রপাতিতে ঠাসা। ঢোকার পর দরজা বন্ধ করে দিলেন বাবর। বলতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মেঝে নিচে নামতে শুরু করল, দুনিয়ার কৃষি সরঞ্জামসহ। এই ঘর আসলে একটা এলিভেটর।

এলিভেটর একসময় থামল, তাঁরা বেরিয়ে এলেন খালি একটা কামরায়, মাথার ওপর ফ্লুরোসেন্ট আলো জ্বলছে, প্রতিটি দেয়াল লাল রং করা। কামরায় একটামাত্র জিনিস দেখা যাচ্ছে, চৌকো বাক্সের মতো দেখতে, কোমর পর্যন্ত উঁচু। নওয়াবের মনে হলো পডিয়াম। সেটার মাথায় ঝকঝকে কাচ লাগানো।

'ওই অ্যানালাইজারের সামনে দাঁড়ান, হাতের তালু দুটো কাচের ওপর রাখুন,' বললেন বাবর।

তা-ই করলেন নওয়াব। আঙুলে শিরশিরে একটা অনুভূতি হলো। তারপর একটা বেল বাজাল মেশিনটা।

'ঠিক আছে, পিছিয়ে আসুন।' এবার বাক্সের মাথায় নিজের হাত রাখলেন বাবর। বেল বাজার পর বললেন, 'এখন আমরা ওদিকে যাব। আপনি সিকিউরিটির কথা তুলেছেন। দাবানলে ঢোকার আগে সেটা আপনাকে আমি দেখাতে চাই।'

আরেকটা দরজার সামনে দাঁড়ালেন তাঁরা, এটার গায়ে লেখা : সিকিউরিটি।

নিঃশব্দে হড়কে এক পাশে সরে গেল দরজা। প্রায় অন্ধকার একটা কামরায় ঢুকলেন তাঁরা, থরে থরে সাজানো অসংখ্য সবুজ ডায়াল সামনে নিয়ে চেয়ারে বসে আছেন এক ভদ্রলোক।

'হ্যালো, বাবুভাই,' তাঁকে বললেন বাবর। 'কেমন আছেন?'

'ভালো, ডক্টর বাবর। আপনাদের আসতে দেখলাম।'

সিকিউরিটি অফিসারের সঙ্গে সার্জেন নওয়াবের পরিচয় করিয়ে দিলেন ডক্টর বাবর। অফিসার তখন ব্যাখ্যা করে উত্তম নওয়াবকে বোঝাতে লাগলেন মানুষের তৈরি এক জোড়া বালিয়াড়ির মাথায় গোপনে দুটো রাডার স্ক্যানার বসিয়েছেন তাঁরা, যেখান থেকে এই স্থাপনা দেখতে পাওয়া যায়। তারপর জানালেন চারদিকের মাটির গভীরে ছড়িয়ে রাখা হয়েছে কয়েক হাজার সেনসর, এক শ পাউন্ডের বেশি ওজনের কোনো পশু বা প্রাণী এদিকে এলে ওগুলো সংকেত পাঠাবে।

'আমাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে এখন পর্যন্ত কিছুই কাছাকাছি আসতে পারেনি,' বললেন অফিসার। 'কিন্তু যদি ঢোকে...' কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি, তারপর বাবরকে বললেন, 'ওঁকে কুকুর দেখাই?'

'ইয়েস,' বললেন বাবর।

পাশের ঘরে ঢুকলেন তাঁরা। বড় আকারের নয়টা খাঁচা রয়েছে এখানে, পশুর গায়ের উৎকট গন্ধ ধাক্কা মারল নাকে। উত্তম নওয়াব এক এক করে নয়টা জার্মান শেফার্ডকে দেখছেন, এত বড় আকারের জার্মান শেফার্ড জীবনে দেখেননি তিনি। ঘরে ঢোকার মুহূর্ত থেকে তাঁকে দেখে ঘেউ ঘেউ শুরু করেছে ওগুলো, কিন্তু কামরার ভেতর কোনো শব্দ নেই। তিনি অবাক চোখে দেখছেন ওগুলো মুখ খুলছে, ডাক ছাড়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাচ্ছে সামনের দিকে।

আওয়াজ নেই।

'এগুলো আর্মির ট্রেনিং দেওয়া প্রহরী কুকুর,' সিকিউরিটি অফিসার বললেন। 'বড় করা হয়েছে হিংস্রতা প্রদর্শনের জন্য। ওগুলোকে নিয়ে আমরা যখন হাঁটি, আমাদের গায়ে লেদারের পোশাক আর হাতে ভারী গ্লাভস থাকে। অপারেশন করে ওদের গলার আওয়াজ কেড়ে নেওয়া হয়েছে, যে কারণে আপনি কিছু শুনতে পাচ্ছেন না। ওগুলো আপনার কাছে পৌঁছে যাবে চুপচাপ।'

নওয়াব জিজ্ঞেস করলেন, 'ওগুলোকে কখনো...মানে, ব্যবহার করেছেন?'

'না,' অফিসার উত্তর দিলেন। 'ভাগ্য ভালো যে তার এখনো প্রয়োজন পড়েনি।'

অন্য আরেক কামরায় এসে এক সারি লকারের সামনে দাঁড়ালেন তাঁরা। নওয়াব দেখলেন তাঁর নাম লেখা একটা লকার রয়েছে।

'আমরা এখানে কাপড়চোপড় পাল্টাব,' বললেন বাবর, ইঙ্গিতে দেখালেন এক কোণে বেগুনি রঙের প্রচুর ইউনিফর্ম ভাঁজ করে রাখা। 'যা যা সঙ্গে আছে সব ফেলে দিয়ে ওগুলো পরুন।'

ইউনিফর্ম মানে এক প্রস্থ কাপড়ে তৈরি স্যুট, এক পাশে চেইন লাগানো। গায়ে একটু ঢিলে হলো। এরপর একটা প্যাসেজে বেরিয়ে হাঁটা। হঠাৎ করে কোথাও একটা অ্যালার্ম বেজে উঠল এবং ওদের সামনের একটা গেট নিজে থেকেই ঝট করে বন্ধ হয়ে গেল। মাথার ওপর সাদা একটা আলো জ্বলতে-নিভতে শুরু করল। নওয়াব কিছুটা হকচকিয়ে গিয়েছিলেন, বেশ কিছুক্ষণ পরে তাঁর মনে পড়ল যে ওই চঞ্চল আলোর দিক থেকে দ্রুত চোখ সরিয়ে নিয়েছিলেন বাবর।

'কিছু একটা ভুল হয়েছে আমাদের,' বললেন বাবর। 'নিজের যা কিছু ছিল, সব ফেলে এসেছেন তো?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' বললেন নওয়াব।

'ফোন, আংটি, ঘড়ি—সব?'

নিজের হাতের দিকে তাকালেন নওয়াব। কবজিতে ঘড়িটা রয়ে গেছে।

'ফিরে যান,' বললেন বাবর। 'লকারে রেখে আসুন।'

তা-ই করলেন নওয়াব। তিনি ফিরে আসার পর দ্বিতীয়বার প্যাসেজ ধরে হাঁটা ধরলেন। গেট খোলাই থাকল, কোনো অ্যালার্ম বাজল না।

'পুরো স্বয়ংক্রিয়?' জানতে চাইলেন নওয়াব

'হ্যাঁ। যেকোনো ফরেন অবজেক্ট ধরে ফেলবে—কাচের চোখ, কারডিক পেসমেকার, নকল দাঁত।'

একটা সাইনবোর্ডকে পাশ কাটালেন তাঁরা, তাতে লেখা : আপনারা ১ নম্বর লেভেলে ঢুকছেন। সরাসরি ইমিউনিজেশন কন্ট্রোলে চলে যান।

সব দেয়াল লাল দেখে কারণটা জানতে চাইলেন নওয়াব।

'প্রতিটি লেভেলে আলাদা রং। লেভেল ২ হলুদ, লেভেল ৩ সাদা, লেভেল ৪ সবুজ, লেভেল ৫ নীল।'

ইমিউনিজেশন কন্ট্রোলে ঢুকলেন তাঁরা। একটা দরজা সরে গেল, বেরিয়ে পড়ল কাচের তিনটে বুদ। বাবর বললেন, 'একটায় স্রেফ বসে পড়ুন।'

একটা বুদে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিলেন নওয়াব। ভেতরে একটা ডিভান আর জটিলদর্শন কিছু ইকুইপমেন্ট রয়েছে। ডিভানের সামনে মনিটর, তাতে কয়েকটা আলোকিত পয়েন্ট দেখা যাচ্ছে।

'বসুন,' যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'বসুন। বসুন।'

ডিভানে বসার পর দশ মিনিট জেরা করা হলো নওয়াবকে, ওর শরীর-স্বাস্থ্য বিষয়ে যা কিছু জানার ছিল সব প্রশ্ন করে জেনে নিল কম্পিউটার—কী কী রোগ হয়েছিল থেকে শুরু করে কিসে কিসে অ্যালার্জি, স-ব। তারপর কয়েকটা ইনজেকশন দেওয়া হলো তাঁকে।

বিশ মিনিট পর, এই মুহূর্তে, বাবরের সঙ্গে একটা করিডর ধরে হাঁটছেন নওয়াব। সেটা ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে এগিয়েছে। 'আমরা এখন ঠিক কোথায়?'

'লেভেল ১-এর সীমান্তে। আমাদের বাঁ দিকে সারি সারি ল্যাব। ডান দিকে নিরেট পাথর ছাড়া কিছু নেই।'

করিডরে বেশ কজন লোক হাঁটছে, সবার পরনে বেগুনি স্যুট। সবাইকে ব্যস্ত ও গম্ভীর দেখাচ্ছে।

'টিমের বাকি সবাই কোথায়?'

'সবাই এখানে,' বললেন বাবর। কনফারেন্স-৭ লেখা একটা দরজা খুললেন তিনি। ভেতরে ঢুকলেন তাঁরা। শক্ত কাঠের বড় একটা টেবিল রয়েছে। কুমার মুশফিক রয়েছেন ওখানে, দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা আড়ষ্ট, টান টান এবং সতর্ক—তিনি যেন সবেমাত্র বরফঠান্ডা পানিতে শাওয়ার সেরে এসেছেন। তাঁর পাশে প্যাথলজিস্ট সদয় জাহানকে দেখা যাচ্ছে, কী কারণে যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন, চোখে ক্লান্তির ছাপ।

সবাই তাঁরা কুশলাদি বিনিময় করার পর টেবিলে বসলেন।

পকেটে হাত ভরে দুটো চাবি বের করলেন ডক্টর মুশফিক, একটা রুপালি, একটা লাল। লাল চাবির সঙ্গে চেইন আছে। সেটা তিনি নওয়াবকে দিলেন। 'এটা গলায় পরে ফেলুন।'

চাবিটা দেখছেন নওয়াব। 'কী এটা?'

মাঝখান থেকে বাবর বললেন, 'অড ম্যান সম্পর্কে সার্জেন সাহেব এখনো কিছু জানেন না।'

'ও। আমি ভেবেছিলাম কপ্টারে থাকার সময় পড়ে নিয়েছেন।'

'তাঁর ফাইল সম্পাদনা করা হয়েছে।'

'আচ্ছা,' মাথা ঘুরিয়ে নওয়াবের দিকে তাকালেন মুশফিক। 'কেউ আপনাকে জানাননি যে আমাদের টিমে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে আপনি অবিবাহিত হওয়াটা বড় একটা ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করেছে?'

'আমার বিয়ে না হওয়ার সঙ্গে এর কী সম্পর্ক...'

'আপনি জোড় নন, বিজোড়, এই বাস্তবতা আপনাকে আমাদের চেয়ে আলাদা করেছে,' বললেন মুশফিক। 'আপনি এই সবকিছুর চাবি। আক্ষরিক অর্থে।'

নিজের চাবিটা টেবিল থেকে তুললেন তিনি, তারপর চেয়ার ছেড়ে কামরার এক কোণে চলে গেলেন। লুকানো বোতামে চাপ দিলেন, কাঠের প্যানেল এক পাশে সরে গেল, বেরিয়ে পড়ল ঝকঝকে ধাতব কনসোল। তালায় চাবি ঢুকিয়ে মোচড় দিলেন। কনসোলে সবুজ আলো জ্বলল। পিছিয়ে এলেন তিনি। প্যানেল আগের জায়গায় ফিরে এল।

'এই ল্যাবরেটরির সবচেয়ে নিচের স্তরে একটা অটোমেটিক অ্যাটমিক সেলফ-ডেসট্রাকশন ডিভাইস আছে,' বললেন মুশফিক। 'সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় ল্যাবরেটরির ভেতর থেকেই। আমি এই মাত্র আমার চাবিটা ঢুকিয়ে মেকানিজম আর্মড বা প্রস্তুত করেছি। তার মানে ওই আণবিক ডিভাইস বিস্ফোরিত হওয়ার জন্য এখন তৈরি। এই লেভেলের ওই চাবি সরানো সম্ভব নয়, ওটা ওখানে আটকে গেছে। আপনার চাবি, অপরদিকে, ভেতরে ঢোকানো যাবে, আবার সরিয়েও আনা যাবে। ডিটোনেশন লকে চাবি ঢোকানোর মুহূর্ত থেকে বোমা বিস্ফোরিত হবার মাঝখানে তিন মিনিটের একটা সময় আছে। ওই সময়টা আপনাকে দেওয়া হবে চিন্তা করার জন্য এবং সম্ভবত পুরো ব্যাপারটা বাতিল করার জন্য।'

নওয়াব এখনো ভ্রু কুঁচকে আছেন। 'কিন্তু আমাকে কেন?'

'কারণ আপনি একলা। আমাদের একজন অবিবাহিত মানুষ দরকার ছিল।'

ব্রিফকেস খুলে একটা ফাইল বের করলেন ডক্টর মুশফিক। নওয়াবের হাতে ধরিয়ে দিলেন সেটা। 'এটা পড়ুন।'

এটা দাবানল প্রজেক্ট ফাইল।

'২৫৫ নম্বর পাতা,' বললেন মুশফিক।

পাতাটা বিশ মিনিট ধরে পড়লেন নওয়াব। বিভিন্ন গবেষণা থেকে এই সত্য বেরিয়ে এসেছে যে কঠিন সংকটের সময় অবিবাহিত পুরুষ বিবাহিত পুরুষের চেয়ে পরিষ্কার চিন্তা করতে পারে এবং তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারে অনেক দ্রুত এবং দেখা গেছে তাদের সিদ্ধান্ত শতকরা আশি ভাগ সঠিক ছিল, যেখানে বিবাহিতদের সিদ্ধান্ত শতকরা মাত্র পঁয়তাল্লিশ ভাগ সঠিক হতে দেখা গেছে। এ প্রসঙ্গে খুঁটিনাটি আরও হাজারটা বিষয় তোলা হয়েছে, দুর্বোধ্য লাগায় এড়িয়ে গেছেন নওয়াব।

পড়া শেষ হতে তিনি বললেন, 'এটা একধরনের পাগলামি।'

'তা সত্ত্বেও এটাই একমাত্র উপায় ছিল সরকারের হাত থেকে অস্ত্রটার নিয়ন্ত্রণ আমাদের নিজেদের হাতে নিয়ে আসার,' বললেন ডক্টর মুশফিক।

'আপনি সত্যি আশা করেন এই চাবি ঘুরিয়ে জিনিসটা আমি ফাটিয়ে দেব? একটা অ্যাটম বোমা?'

'দেখা যাচ্ছে আপনি ভুল বুঝেছেন,' বললেন মুশফিক। 'ডিটোনেশন মেকানিজম অটোমেটিক। জীবাণু ছড়িয়ে পড়ার ঘটনা যদি ঘটে, যদি পাঁচ পর্যন্ত সবগুলো লেভেল দূষিত হয়ে পড়ে, ওই বোমা বিস্ফোরিত হবে নিজে থেকে তিন মিনিট পর, যদি আপনি চাবি ঘুরিয়ে সেটা বাতিল না করেন।'

'ও,' মৃদু গলায় বললেন নওয়াব।

১০. জীবাণুমুক্তকরণ

লেভেলের কোথাও একটা বেল বাজল। দেয়ালঘড়ির দিকে একবার তাকালেন ডক্টর মুশফিক। বেশ রাত হয়েছে। আনুষ্ঠানিক ব্রিফিং শুরু করলেন তিনি, কথা বলছেন দ্রুত, পায়চারি করছেন কামরার এক দিক থেকে আরেক দিকে, হাত দুটো সারাক্ষণ নড়ছেন।

'আপনারা জানেন পাতালে তৈরি একটা পাঁচতলা দালানের ওপরতলায় রয়েছি আমরা। প্রটোকল অনুসারে নিচতলায় নামার জন্য চব্বিশ ঘণ্টা সময় লাগবে আমাদের, কারণ স্টেরালাইজেশন আর ডিকনটামিনেশনের ভেতর দিয়ে যেতে হবে। কাজেই শুরুটা আমাদের এখনই করতে হবে। ক্যাপসুল অতুল ৭ ইতিমধ্যে নামতে শুরু করেছে, ওটাকে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে একাধিক রোবট,' একটু থামলেন ডক্টর মুশফিক, তারপর বললেন, 'আপনাদের জন্য হাতিমারা থেকে নিয়ে আসা একটা সারপ্রাইজ আছে।'

এক শ ইঞ্চি পরদার মনিটর অন করলেন তিনি। পরদায় বৃদ্ধ সুবীর চাকমাকে দেখা যাচ্ছে, বিছানায় শুয়ে আছেন, দুই হাতের শিরাতেই ইনজেকশন দেওয়া হচ্ছে।

'এই ব্যক্তি রাতে সারভাইভ করে গেছেন। প্লেনটা যখন হাতিমারার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল তিনিই একমাত্র ব্যক্তি

ছিলেন পাইলট যাকে হাঁটাচলা করতে দেখেছেন। আজ সকালেও আমরা ওখানে জীবিত পেয়েছি তাঁকে।'

'এখন তাঁর কী অবস্থা?'

'অনিশ্চিত,' জানালেন মুশফিক। 'এখন তাঁর জ্ঞান নেই। আজ দিনের প্রথম দিকে রক্তবমি করেছেন। চেষ্টা চলছে বাঁচিয়ে রাখার, তবে আমরা নিচের লেভেলে না নামা পর্যন্ত কাজ খুব একটা এগোবে না।'

বোতাম টিপে পরদার ছবি বদলে দিলেন তিনি। সেখানে এখন শিশুটিকে দেখা যাচ্ছে। খুদে একটা বিছানায় শুইয়ে রাখা হয়েছে ওকে।

'এই বাচ্চাটাও কাল রাতে সারভাইভ করেছে, তাই ওকেও এখানে নিয়ে এসেছি আমরা। ওই বৃদ্ধ আর এই শিশু হলো জ্যান্ত সূত্র, দেখা যাক এই মহাবিপদ থেকে মুক্তি পেতে তারা কোনো সাহায্য করতে পারে কি না।'

এরপর মুশফিক ব্যাখ্যা করলেন হাতিমারায় তাঁদের কী অভিজ্ঞতা হয়েছে—কিছু মৃত্যু ঘটেছে একপলকে, কিছু মৃত্যু ঘটতে বেশ অনেকটা সময় লেগেছে—ভুক্তভোগীরা চিঠি লিখতে বা কম্পিউটারে কম্পোজ করতে সময় পেয়েছেন, সময় পেয়েছেন গায়ে কেরোসিন ঢেলে আত্মহত্যা করতে। যারা মারা গেছে অতি দ্রুত তাদের রক্ত জমাট বেঁধে গেছে, তবে সেটাই মৃত্যুর কারণ কি না বা এর জন্য দায়ী কোনো জীবাণু কি না, সেসব বোঝা যাবে ল্যাবে বসে পরীক্ষা করলে। এ সময় ললিতা প্রসঙ্গ চলে এল।

মুশফিক বললেন, 'ললিতার হার্ডডিস্ক নিয়ে আসা হয়েছে, কারও আগ্রহ থাকলে নিজের সম্পর্কে তাঁর লেখা পড়তে পারবেন যে কেউ। আমার নিজেরও আগ্রহ আছে, একজন সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে বসে তাঁর ব্যাপারটা আমি বোঝার চেষ্টা করব। তবে সেসব পরে, যদি এই বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারি তখন।' তারপর তিনি জানতে চাইলেন, 'কারও কোনো প্রশ্ন আছে?'

'সেসব পরে করলেও চলবে,' বললেন বাবর।

'তাহলে আসুন শুরু করা যাক।' পায়চারি থামালেন ডক্টর মুশফিক।

লেভেল ৫-এ নামার জন্য যেসব বিধিবিধান মানতে হলো, তার মধ্যে চারবার পুরোদস্তুর গোসল করার ব্যাপার আছে—পানি দিয়ে নয়, তরল ওষুধ দিয়ে। আরও তিনবার গোসল করতে হলো তিন রকমের রে দিয়ে। একবার সারা গায়ে মলম লেপ্টে দিয়ে বলা হলো শরীরে এটা ছয় ঘণ্টা রাখতে হবে, কাজেই ইচ্ছে করলে আপনি ঘুমিয়ে নিতে পারেন। প্রায় প্রতি ঘণ্টায় কাপড় পাল্টাতে হলো, পরিত্যক্ত কাপড় প্রতিবার সিকিউরিটি গার্ডরা পুড়িয়ে ফেলছে। এটা খরচবহুল হয়ে যাচ্ছে না? কেউ একজন প্রশ্ন করলে তাকে জানানো হয়েছে, ওগুলোর একটাও কাপড় নয়, নতুন আবিষ্কৃত কাগজ।

ডক্টর সদয় জাহান ঘুমাতে পারছেন না। তিনি লেভেল ৪-এ, একটা বিছানায় শুয়ে রয়েছেন, সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে চিন্তা করছেন। মন থেকে হাতিমারা শহরের ছবিগুলো মোছা যাচ্ছে না, বারবার ফিরে আসছে। রাস্তার ওপর ছড়িয়ে আছে লাশ অথচ কারও শরীর থেকে এক ফোঁটা রক্ত গড়ায়নি...

ডক্টর জাহান হেমাটোলজিস্ট নন, তবে তাঁর যে কাজ, তাতে রক্ত নিয়ে পড়াশোনা থাকার দরকার আছে। তিনি জানেন এমন অনেক ব্যাকটেরিয়া আছে যেগুলো রক্তে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। স্ট্যাফিলোককসাই নিয়ে তাঁর নিজের গবেষণায় তিনি দেখেছেন এই জীবাণু দুই রকমের এনজাইম উৎপাদন করে যেগুলো রক্তকে বদলে দিতে পারে। একটার নাম তথাকথিত এক্সোটক্সিন, যেটা ত্বককে ধ্বংস করে আর রক্তের লোহিত কণাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। আরেকটা কোয়াগুলেইজ, ব্যাকটেরিয়াকে প্রোটিন দিয়ে মুড়ে ফেলে, শ্বেতকণিকা যাতে ওগুলোকে ধ্বংস করতে না পারে।

কাজেই এটা সম্ভব যে ব্যাকটেরিয়া রক্তকে বদলে দিতে পারে এবং এটা তারা করতে পারে নানা পদ্ধতিতে। তাঁর মনে পড়ল ম্যালেরিয়া আর অ্যামিবাও রক্তের লোহিত কণাকে ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখে। বাকি প্যারাসাইটও তা করতে পারে।

কাজেই কোনো জীবাণুর পক্ষে রক্ত জমাট বাঁধিয়ে ফেলা সম্ভব। কিন্তু অতুল জীবাণু কীভাবে কাজ করছে সেটা জানার ব্যাপারে কোথাও থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে না। রক্ত জমাট বাঁধার সিকোয়েন্স স্মরণ করতে চাইছেন তিনি। কিন্তু এতক্ষণে চোখে ঘুম চলে এল।

ডক্টর বাবর, ক্লিনিক্যাল মাইক্রোবায়োলজিস্ট, কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে তা-ই নিয়ে চিন্তা করছেন।

প্রথম পদক্ষেপ একদম সহজ। ক্যাপসুলটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করবেন তাঁরা, তারপর ওটার সবকিছু গ্রোথ মিডিয়ায় কালচার করবেন। সংশ্লিষ্ট সবাই আশা করছেন কোনো না কোনো ধরনের জীবাণু পাওয়া যাবে, যেটা নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে পারবেন তাঁরা, এবং পরিচয় জানতে পারবেন।

তারপর জানার চেষ্টা করতে হবে কীভাবে ওটা কাজ করে, আক্রমণের পদ্ধতি বা ধরনটা কী। ইতিমধ্যে ধারণা করা হচ্ছে রক্ত জমাট করে দিয়ে কেড়ে নিচ্ছে প্রাণ, আর সেটা যদি সত্যি হয় তাহলে বলতে হবে শুরুটা খুব ভালো হয়েছে তাদের। আর তা যদি না হয়, ওটার পেছনে লেগে থেকে মূল্যবান সময় নষ্ট করা হবে।

লক্ষণ সারাও, রোগ সারাও।

তবে অতুল জীবাণু নিয়ে ভাবছেন বাবর। রক্ত জমাট বাঁধার চিকিৎসা করে তাঁরা কি রোগটা নিরাময় করতে পারবেন? নাকি রক্ত জমাট বাঁধা পরের স্তর, প্রথম স্তরে আরও ভয়ংকর কিছু ঘটছে?

দাবানল প্রকল্প যখন শুরু হলো সেই তখন থেকে আরেকটা ভয়ে ভুগছেন বাবর। প্রথম দিকের মিটিংগুলোয় প্রশ্নটা বারবার তুলেছিলেন তিনি : আমরা ভিনগ্রহ থেকে আসা প্রাণকে পাইকারি হারে খুন করতে যাচ্ছি না তো?

মানুষ, বাবর সব সময় বলে আসছেন, যতই বিজ্ঞানমনস্ক হোক না কেন, প্রাণ নিয়ে আলোচনা করার সময় দেখা যায় তার ভেতর বেশ কিছু পক্ষপাতিত্ব শিকড় গেড়ে আছে। তার একটা এ রকম ধরে নেওয়া যে জটিল প্রাণ সহজ প্রাণের চেয়ে বড়। এটা অবশ্যই পৃথিবীতে সত্যি। জীবাণু যত বেশি বুদ্ধিমান হয়েছে, তাদের আকারও বেড়েছে, এককোষী থেকে হতে পেরেছে বহুকোষী জীব, সেখান থেকে বড় পশু-পাখি হলো, আলাদা আলাদা কোষ গ্রুপ হয়ে কাজ শুরু করল, যেগুলো নাম পেল অঙ্গ। পৃথিবীতে প্রবণতাটা ছিল আরও বড় এবং জটিল পশুর দিকে।

কিন্তু মহাবিশ্বের অন্য কোথাও এটা সত্যি নাও হতে পারে। অন্যান্য জায়গায় প্রাণ উল্টো দিকে এগিয়ে থাকতে পারে—ক্রমশ ছোট থেকে আরও ছোটর দিকে। ঠিক মানুষের আধুনিক টেকনোলজি যেমন ছোটর চেয়েও ছোট জিনিস বানানো শিখে ফেলেছে, তেমনি হয়তো উন্নত বিবর্তনের চাপ প্রাণের ক্ষুদ্রতর ধরন তৈরি করিয়েছে, তাতে কাঁচামাল কম লেগেছে, মহাশূন্য ভ্রমণ করার ঝামেলা এবং খরচও কম প্রয়োজন হয়েছে, খাদ্য গ্রহণের সমস্যায়ও কম ভুগতে হয়েছে।

দূরের কোনো ভিনগ্রহের বুদ্ধিমান প্রাণী হয়তো একটা শিশু উকুনের মতো। কিংবা আরও অনেক ছোট, একটা

ব্যাকটেরিয়ার মতো। তা যদি হয়, তাহলে বলতে হবে দাবানল প্রকল্প অত্যন্ত উন্নত শ্রেণির প্রাণের একটা ধরন ধ্বংস করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে, কখনো বোঝেইনি যে আসলে কী করছে তারা।

ঘুমিয়ে পড়ার আগে ডক্টর মুশফিক আসন্ন কনফারেন্সের কথা ভাবছিলেন। ভাবছিলেন, মহাশূন্য থেকে অতুল ৭ কী নিয়ে এসেছে, এটা তো একটা প্রশ্ন অবশ্যই, কিন্তু তার চেয়ে বড় প্রশ্ন সম্ভবত এটা যে কী নিয়ে আসেনি। তারপর ভাবলেন, জিনিসটা আমাদের সবাইকে না পাগল বানিয়ে ছাড়ে, কিংবা মেরে একেবারে সাবাড় করে ফেলে।

তৃতীয় দিন
দাবানল

১১. কনফারেন্স

উত্তম নওয়াব চোখ খুললেন। ঘরে সাদা আলো জ্বলছে, সময়টা রাত না দিন বোঝা যাচ্ছে না। করিডর ধরে ক্যাফেটেরিয়ায় চলে এলেন। লোকজন নেই বললেই চলে, তবে ডক্টর বাবরকে পাওয়া গেল, তিনি জানালেন বাকি সবাই কনফারেন্স রুমে আছেন।

নওয়াবের সামনে এক গ্লাস বাদামি তরল রাখলেন বাবর, বললেন, 'ব্রেকফাস্ট সেরে নিন।'

'এটা কী?' জানতে চাইলেন নওয়াব।

'এর নাম ততটুকু। তরল পুষ্টি, গড়পড়তা সত্তর কিলোগ্রাম ওজনের একজন মানুষের আঠারো ঘণ্টার জন্য যা কিছু দরকার, সব এতে আছে।'

খেলেন নওয়াব। খেতে অনেকটা যেন কমলার জুস। বললেন, 'চিনি পাওয়া যাবে?'

মাথা নাড়লেন বাবর। 'ব্যাকটেরিয়া গ্রোথ মিডিয়াম পেয়ে যাবে এমন কিছু রাখা হয়নি দাবানলে।'

'হুম।'

নওয়াবকে একটা পিল দিলেন বাবর। 'নিজের ঘরে গিয়ে এই সাপোজিটর রেকটামে পাঠিয়ে দিন।'

'এটা আবার কী জন্য?' নওয়াব বিব্রত।

'এর কাজ পেটের সমস্ত জীবাণু ধ্বংস করা। রোজ নয়, প্রথম চার দিন, তারপর আর দরকার পড়বে না।'

দশ মিনিট পর শুরু হলো কনফারেন্স, আলোচনা হিসেবে প্রথমে বেছে নেওয়া হয়েছে বিশ্লেষণধর্মী একটা রিপোর্ট, প্রকল্প দাবানল বিজ্ঞানীদের একটা গ্রুপ সেটা তৈরি করেছে। খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এই রিপোর্টে: কোনো ধরনের ব্যাকটেরিয়াম যদি পৃথিবীকে আক্রমণ করে, ছড়িয়ে দেয় নতুন কোনো রোগ, কী হবে সেই ব্যাকটেরিয়ামের উৎস?

অ্যাস্ট্রোনটদের সঙ্গে আলোচনা করে, বিবর্তন থিওরি মাথায় রেখে, দাবানল গ্রুপ সিদ্ধান্তে এসেছে এই ব্যাকটেরিয়া আসতে পারে তিনটি উৎস থেকে।

প্রথম উৎস সবার পরিচিত, অন্য কোনো গ্রহ বা গ্যালাক্সি, ওখানকার চরম তাপমাত্রা এবং মহাশূন্যে ভ্যাকিউমের যে অস্তিত্ব রয়েছে তার মধ্যে টিকে থাকার উপযোগী ব্যাকটেরিয়া হবে সেগুলো।

দ্বিতীয় উৎস হতে পারে প্রাচীন মমি। মিসরীয় প্রাচীন সমাধিতে জীবাণু পাওয়া গেছে, কয়েক হাজার বছর ধরে সিল করা অবস্থায় থাকার পরও ধ্বংস হয়নি। এসব জীবাণুর ক্ষতি করার ক্ষমতা এখনো অটুট।

এর রহস্য লুকিয়ে আছে ব্যাকটেরিয়া নিজের গায়ে যে আবরণ তৈরি করতে পারে, তাতে। স্পর বলা হয়, শক্ত ক্যালসিফিক সেল, নিজের শরীরের ওপর চারদিকে বানিয়ে নেয়। এই আবরণের কারণে বরফ জমার মতো ঠান্ডা এবং ফুটন্ত পানির মতো তাপ সহ্য করতে পারে ওগুলো এবং যদি প্রয়োজন হয়, হাজার হাজার বছর কোনো খাদ্য ছাড়াই নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে। একটা স্পেস স্যুট যে কাজ করে, ওই সেলের কাছ থেকে তার সবকিছু পাবে একটা ব্যাকটেরিয়া।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে স্পর মহাশূন্যের ভেতর দিয়ে ভ্রমণ করতে সক্ষম। কিন্তু সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা কি এটাই, অন্য একটা গ্রহ বা গ্যালাক্সি থেকে আসা ব্যাকটেরিয়া পৃথিবীকে সংক্রমিত করবে?

এর উত্তর কিন্তু—না। সবচেয়ে সম্ভাবনাময় উৎস হলো সবচেয়ে কাছাকাছি যেটা রয়েছে, অর্থাৎ পৃথিবী।

বিভিন্ন গবেষণা থেকে ধারণা নিয়ে রিপোর্টে এ রকম একটা সাজেশন দেওয়া হয়েছে যে কয়েক কোটি বছর আগে ব্যাকটেরিয়া হয়তো পৃথিবীর পিঠ ছেড়ে চলে গিয়েছিল, প্রাণ যখন সবেমাত্র সাগর থেকে আর গরমে ভাজা ভাজা মহাদেশগুলো পিঠ থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। এ ধরনের ব্যাকটেরিয়া পৃথিবী ত্যাগ করেছিল মাছেরা আসার আগে, প্রাচীন স্তন্যপায়ীরা আসার আগে, শিম্পাঞ্জিসদৃশ প্রথম মানুষ আসারও বহু বহু আগে। ওই ব্যাকটেরিয়াকে প্রথমে বাতাসে ভাসতে হয়েছে, ধীরে ধীরে উঠতে হয়েছে ওপরে, যতক্ষণ না আক্ষরিক অর্থে মহাশূন্যে পৌঁছেছে। একবার ওখানে পৌঁছানোর পর তাদের আকার আকৃতি বদলে অস্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারে, হয়তো এমনকি প্রাণ ধারণের জন্য সরাসরি সূর্য থেকে শক্তি (এনার্জি) আহরণের কৌশল শিখে ফেলতে পারে, শক্তির উৎস হিসেবে খাদ্য গ্রহণের পরিবর্তে। হতে পারে এই জীবাণুরা শক্তিকে সরাসরি বস্তুতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম ছিল।

সাগরের গভীরে, যেখানে সূর্যের আলো পৌঁছায় না, সেখানে যদি কোনো না কোনো প্রাণের ধরন খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে অনেক ওপরের আকাশে না পাওয়ার কী কারণ থাকতে পারে। সত্যি বটে যে অক্সিজেনের খুব অভাব। এও সত্যি যে খাবার বলতে গেলে কিছুই নেই। কিন্তু প্রাণ যদি পৃথিবীর বুক থেকে বহু কিলোমিটার নিচে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে, তাহলে ওটার পাঁচ মাইল ওপরে কেন পারবে না?

এবং মহাকাশে যদি জীবাণু থাকে *এবং ওগুলো যদি প্রথম মানুষ* আসার আগে পৃথিবীর উত্তপ্ত গা ছেড়ে চলে যাওয়া জীবাণু হয়, মানুষের কাছে ওগুলো হবে ফরেন বা এলিয়েন। ওগুলোর হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার কোনো উপায় জানা থাকবে না মানুষের, জানা থাকবে না ওগুলোকে দমন করা সম্ভব কি না। শরীরে যদি জীবাণুঘটিত কোনো রোগ ছড়ায়, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে রক্তের নিজের তৈরি একটা পদার্থ, কিন্তু দেখা যাবে এই এলিয়েন জীবাণুর বিরুদ্ধে রক্ত সে পদার্থ চাওয়ামাত্র দিতে পারছে না। এটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার অথচ হয়তো দেখা যাবে এলিয়েন জীবাণু একপলকে মানুষের প্রাণ হরণ করছে।

ব্যাকটেরিয়ার তৃতীয় উৎসও পৃথিবী, তবে সেগুলো প্রাচীন নয়, আধুনিক সময়কালের জীবাণু, ওগুলোকে মহাশূন্যে নিয়ে গেছে অন্তত কয়েক হাজার রকেট। বলা হয় বটে যে প্রতিটি রকেট জীবাণুমুক্ত করে পাঠানো হয়েছে, কিন্তু পদ্ধতিতে অনেক খুঁত থেকে যায়। মহাশূন্যে যাবার পর ব্যাকটেরিয়াগুলো কর্কশ তেজস্ক্রিয়তা, ওজনশূন্যতাসহ অন্যান্য আবহাওয়া-সম্পর্কিত শক্তির সামনে পড়ে যায়, যেসব শক্তি



ভয়ংকর জীবাণু আছে এমন বাতাসের সংস্পর্শে আসতে দিলেন ইঁদুরগুলোকে

ওগুলোর ওপর মিউটাজেনিক প্রভাব ফেলতে পারে, বদলে দিতে পারে জীবাণুগুলোর আকৃতি ও চরিত্র।

কাজেই যখন আবার নেমে আসে, তখন ওগুলো আলাদা জীবাণু।

একটা অক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া নিন—এমন জীবাণু, যেটা গা চুলকানি বা গলা ব্যথার জন্য দায়ী, তারপর সেটাকে মহাশূন্যে পাঠিয়ে দিন এবং কিছুদিন পর সেটাকেই নতুন একটা ধরন হিসেবে ফিরিয়ে আনুন—দেখবেন অত্যন্ত বৈরী এবং মারমুখো সেগুলো, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। ওটা অনেক কিছু করতে পারে। চোখের ভেতর ঢুকতে পারে, নষ্ট করে দিতে পারে মণি। পেটের ভেতর যে অ্যাসিড নিঃসরণ হয়, সেখানে বসতি গাড়তে পারে। মানুষের মস্তিষ্কে বিদ্যুতের ছোট ছোট প্রবাহ আছে, সেই প্রবাহের সংখ্যা বাড়িয়ে দিতে পারে, মানুষ তাতে স্রেফ উন্মাদ হয়ে যাবে।

দাবানল বিজ্ঞানীদের কাছে পুরো ব্যাপারটা শুধুই একটা আইডিয়া ছিল, তাঁরা কখনো ভাবেননি যে বাস্তবে সে রকম কিছু ঘটতে পারে। কিন্তু অতুল ৭-এর বেলায় দেখা গেল সেটাই ঘটছে। ঘটতে দেখেও তাঁরা কিন্তু প্রমাণ এবং নিজেদের অভিজ্ঞতা, দুটোকেই বারবার অবহেলা করলেন। ব্যাকটেরিয়া সংখ্যায় দ্রুত এবং মারমুখো হয়ে বাড়ে। বায়োস্যাটেলাইট টেস্টে তাঁরা নিজেরাই দেখতে পেয়েছেন যে পৃথিবীর কিছু মাটি মহাশূন্য থেকে ঘুরিয়ে আনার পর দেখা গেছে বিভিন্ন প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া ফিরে এসে স্বাভাবিকের চেয়ে বিশ থেকে ত্রিশ গুণ বেশি হারে নিজেদের সংখ্যা বাড়াচ্ছে। কারণটা পরিষ্কার না হলেও, এই বাস্তবতা থেকে যায় যে মহাশূন্য ব্যাকটেরিয়ার জন্মহার এবং বাড়া প্রভাবিত করে।

অথচ প্রকল্প দাবানলের কেউ প্রথম দিকে এ ব্যাপারে মাথা ঘামাননি, তারপর তো অনেক দেরি হয়ে গেল।

ডক্টর বাবর বললেন, 'অতুল ৭ স্যাটেলাইটকে মহাশূন্যে পাঠানো হয়েছিল ছয় দিন নিজের কক্ষপথে থাকার জন্য। লঞ্চ করার পর সব স্বাভাবিক ছিল। তারপর, দ্বিতীয় দিন, কক্ষপথ থেকে ছিটকে পড়ে ওটা।' সবাইকে একটা করে ফাইল দিলেন তিনি। 'অতুল ৭ ফ্লাইটের সম্পূর্ণ ট্রান্সক্রিপ্ট দেওয়া আছে এখানে। আমাদের দেওগাঁর অতুল মিশন কন্ট্রোল থেকে পৃথিবীর বেশ কয়েকটা দেশের স্পেস মনিটর এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল, আমাদের মতো তারাও অতুল ৭-এর ওপর নজর রাখছিল এবং পুরোটা সময় আমাদের সঙ্গে বার্তা বিনিময় করছিল। আমরা জানতে চেষ্টা করব কক্ষপথে থাকার সময় কী ঘটেছিল। প্রথম পাতা থেকে পড়ুন।'

বার্তা বিনিময় পড়ে জানা গেল ভারত বা পাকিস্তানের কোনো স্যাটেলাইট বা মিসাইল থেকে অতুল ৭-কে আঘাত করা হয়নি। রাশিয়া কিয়েভ থেকে মহাকাশ মনিটর করে, এটা ওখান থেকে পাওয়া রিপোর্ট। এবং বিভিন্ন সূত্র থেকে আরও জানা গেছে, অতুল ৭ যখন কক্ষপথ থেকে ছিটকে পড়ে, তখন পৃথিবীর চারদিকে কমবেশি এক লাখ কৃত্রিম উপগ্রহ যার যার কক্ষপথ ধরে চক্কর মারছিল। না, একটার সঙ্গে আরেকটার ধাক্কা লাগার কোনো ঘটনা ঘটেনি, ঘটলে সেটা বিভিন্ন দেশের স্পেস মনিটরিংয়ে ধরা পড়ত।

'তাহলে? কোনো উল্কার আঘাত লাগা সম্ভব?'

'এই আইডিয়া দেওগাঁয় খুব জনপ্রিয়,' বললেন বাবর।

'ইদানীং খুব বেশি শাওয়ার দেখা গেছে কি?'

'না। তবে বেশি উল্কার তো দরকার নেই, নিঃসঙ্গ একটা উল্কাও আঘাত করতে পারে।' একটু কেশে গলা পরিষ্কার করলেন বাবর। 'তবে আরেকটা সম্ভাবনা আছে।'

টেবিলের মাথা থেকে ভ্রু কুঁচকালেন কুমার মুশফিক। 'আপনি যে জিনিসটার কথা বলতে চাইছেন সেটার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ,' বললেন তিনি। 'মিল্কিওয়ের বাইরের কোনো এক্সট্রাগ্যালাকটিক আবর্জনা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় এটা বোধ হয় নয়...'

'আমি আপনার সঙ্গে একমত,' বললেন বাবর, 'খুবই ক্ষীণ সম্ভাবনা। এখন পর্যন্ত কোনো লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। তবে সম্ভাবনা নেই ভাবাটা ঠিক হবে না।'

কম্পিউটার থেকে মিষ্টি নারীকণ্ঠ ভেসে এল : 'আপনারা এবার পরবর্তী লেভেলে যেতে পারেন, প্লিজ।'

১২. লেভেল পাঁচ

লেভেল পাঁচ নীল। বিজ্ঞানী, টেকনিশিয়ান, অপারেটর যাঁরা এখানে কাজ করছেন তাঁরাও সবাই ব্লু ইউনিফর্ম পরে আছেন। উত্তম নওয়াবকে চারদিক ঘুরিয়ে দেখাচ্ছেন সদয় জাহান।

'এটাও বাকি ফ্লোরগুলোর মতো,' বললেন তিনি, 'বৃত্তাকার। আসলে বৃত্তের ভেতর বৃত্ত, এ রকম একটা আঙ্গিক। আমরা বাইরের প্যারামিটারে রয়েছি, এখানেই আমরা কাজ করি আর বাস করি। একটা বৃত্তের ভেতর অনেকগুলো ল্যাবরেটরি। আর সেটার ভেতর, আমাদের কাছ থেকে সিল করে রাখা হয়েছে, মাঝখানের শাঁস। স্যাটেলাইট নিয়ে দুজন লোক সেখানেই এখন আছে।

'কিন্তু ওদের আমাদের কাছ থেকে সিল করে, অর্থাৎ আলাদা করে রাখা হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে আমরা ওদের কাছে যাব কীভাবে?'

'আপনি কখনো গ্লাভ বক্স ব্যবহার করেছেন?'

মাথা নাড়লেন নওয়াব।

ডক্টর জাহান ব্যাখ্যা করলেন : ওগুলো বড় আকারের স্বচ্ছ প্লাস্টিকের তৈরি বাক্স, জীবাণুমুক্ত জিনিস বা যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করার কাজে ব্যবহার করা হয়। বাক্সগুলোর চারদিকের গায়ে গর্ত আছে, সেই গর্তের সঙ্গে এয়ারটাইট সিলসহ গ্লাভ আটকানো। আপনি জিনিস বা যন্ত্র নাড়াচাড়া করতে চাইলে ওই গ্লাভের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দেবেন, তাতে নাগাল পেয়ে যাবেন বাক্সের ভেতরের। কিন্তু আপনার আঙুল জিনিসটার স্পর্শ নিতে পারবে না, তা নিতে পারবে শুধু গ্লাভ।

'আমরা আরও এক ধাপ বেশি এগিয়েছি,' বললেন ডক্টর জাহান। 'আমাদের আছে পুরোটা কামরা, যেটা সবদিক থেকে প্রশংসিত গ্লাভ বাক্সগুলোর সমতুল্য। আপনার হাতের জন্য গ্লাভ বা দস্তানা নয়, দস্তানার পরিবর্তে রয়েছে পুরোদস্তুর প্লাস্টিক স্যুট, আপনার পুরো শরীরের জন্য। দেখতে পাবেন আমি কী বলতে চাইছি।'

ক্রমশ বাঁকা একটা করিডর ধরে এগোচ্ছেন, সামনে সেন্ট্রাল কন্ট্রোল লেখা দরজা দেখে ভেতরে ঢুকে পড়লেন দুজন। ডক্টর বাবর আর ডক্টর মুশফিক রয়েছেন এখানে, নীরবে কাজ করছেন। সেন্ট্রাল কন্ট্রোল গিজগিজ করছে ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্টে। এক দিকের দেয়াল কাচ, ভেতরে আলাদা একটা কামরা। অনেক বিজ্ঞানী আর তাঁদের সহকারীরা কাচের সামনে দাঁড়িয়ে ওই ঘরের দিকে তাকিয়ে আছেন।

কাচের ভেতর দিয়ে উত্তম নওয়াব দেখলেন, যান্ত্রিক এক জোড়া হাত ক্যাপসুলটাকে সরিয়ে একটা টেবিলের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, কাছে পৌঁছে নিখুঁতভাবে নামিয়ে রাখল টেবিলের ওপর। এরপর হাত দুটো একই জায়গা থেকে প্লাস্টিকে মোড়া একটা জিনিস নিয়ে এসে ওই টেবিলের ওপর রাখল। আগে ক্যাপসুল কখনো দেখেননি তিনি, বেশ আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছেন। তাঁর ধারণার চেয়ে ছোট জিনিসটা, লম্বায় এক গজের বেশি নয়, এক প্রান্ত রিএন্ট্রির সময় ঘর্ষণজনিত আগুনে ঝলসে গেছে।

যান্ত্রিক হাত দুটো, ডক্টর মুশফিকের নির্দেশে, ছোট ক্যাপসুলটার একটা পাশ খুলল, যাতে ভেতরের নাগাল পাওয়া যায়।

'এই নিন,' বললেন মুশফিক, কন্ট্রোল থেকে নিজের হাত তুলে নিলেন তিনি। সেটা আঙুলে পরা হয় এমন এক জোড়া অস্ত্রের মতো দেখতে, তামার তৈরি। অপারেটর তার নিজের হাত ওগুলোর ভেতর ঢুকিয়ে দিলেন, এখন তিনি যান্ত্রিক হাত দুটোকে যেভাবে নাড়াতে চান, নিজের হাত দুটো সেভাবে নাড়বেন।

'আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ,' বললেন তিনি, 'এটা জানা যে ক্যাপসুলে এখনো এমন কিছু আছে কি না যেটা বায়োলজিক্যালি অ্যাকটিভ। শুধু ক্যাপসুল নয়, হাতিমারা থেকে আমরা ললিতা বানুর হার্ডডিস্কও খুলে নিয়ে এসেছি—ওটার পাশেই পড়ে আছে, প্লাস্টিকে মোড়া। কোনো সাজেশন?'

'প্রথমে ইঁদুরের ওপর এক্সপেরিমেন্ট করা হোক,' বললেন ডক্টর জাহান। 'তারপর বাঁদরের ওপর করা যাবে, আমরা আগে হোক বা পরে প্রাইমেটদের ওপর পরীক্ষা করতে চাইব।'

বাকি সবাই মাথা ঝাঁকালেন। শুধু বাঁদর নয়, দাবানল প্রকল্পে শিম্পাঞ্জি আর গরিলার ওপরও এক্সপেরিমেন্ট করার সুযোগ আছে, যেমন সুযোগ আছে আরও কম দামি পশুর ওপর পরীক্ষা চালানোর।

ডক্টর মুশফিক আবার কন্ট্রোলে রাখলেন নিজের হাত, ধীরে ধীরে নাড়ছেন ওগুলো। কাচের দেয়ালের ভেতর তাকিয়ে তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন কালো যান্ত্রিক আঙুলগুলো দূরপ্রান্তের দেয়ালের দিকে এগোচ্ছে, ওদিকে লম্বাটে ঘরের ভেতর খাঁচা দেখা যাচ্ছে, প্রতিটি খাঁচায় একটা করে ল্যাব অ্যানিমেল রাখা হয়েছে, কবজা লাগানো এয়ারটাইট দরজার সাহায্যে আলাদা করা।

যান্ত্রিক হাত এয়ারটাইট দরজা খুলে খাঁচাসহ তুলে নিল একটা ইঁদুর, কামরার ভেতর নিয়ে এল সেটাকে, নামিয়ে রাখল ক্যাপসুলটার পাশে। চারদিকে তাকাচ্ছে ইঁদুর, বাতাস শুঁকছে, যেন আড়ষ্টতা দূর করার জন্য গলাটা বার কয়েক লম্বা করল। এক মুহূর্ত পর কাত হয়ে পড়ে গেল ওটা, পা ছুড়ল একবার, তারপর স্থির হয়ে গেল।

'মাই গড,' মুশফিক বললেন। 'সময়ের হিসাব কী বলছে?'

'সেটা বলা কঠিনই হবে,' বললেন ডক্টর বাবর।

ডক্টর জাহান বললেন, 'আমরা ট্রেসার ব্যবহার করতে পারি...'

'হ্যাঁ। এ ক্ষেত্রে আমাদের ট্রেসার ব্যবহার করতে হবে,' বললেন মুশফিক। 'আমাদের স্ক্যান কত দ্রুত হতে পারে?'

'মিলিসেকেন্ড, প্রয়োজনে।'

'প্রয়োজন হবে।'

'বাঁদরের ওপর টেস্ট করুন,' সদয় জাহান বললেন।

যান্ত্রিক হাত দুটোকে আবার দেয়ালের কাছে নিয়ে গেলেন মুশফিক, ওগুলোর সাহায্যে আরেকটা দরজা খোলালেন, তারপর সেটা থেকে বের করালেন বাদামি রঙের একটা রিসাস মাঙ্কি। তুলে আনার সময় তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচামেচি শুরু করে দিল সেটা, খাঁচার গায়ে ধাক্কা মারছে।

তারপরই মরে গেল, চোখে হতবিহ্বল একটা ভাব নিয়ে,

ঝট করে এক হাত বুকের ওপর তোলার পরপরই।
পাঁচ সেকেন্ড নিশ্বাস ফেলতে ভুলে গেলেন সবাই।
তারপর মুখ খুললেন ডক্টর মুশফিক, গলার আওয়াজ ভাঙা ভাঙা, 'এর মানে হলো, আমরা অন্তত জানলাম যে জিনিসটা এখনো বায়োলজিক্যালি অ্যাকটিভ।'
'সময় নষ্ট করছি আমরা,' রুদ্ধশ্বাসে বললেন ডক্টর বাবর। 'এই মুহূর্তে ক্যাপসুলটা স্ক্যান করা দরকার।'
'মরা ইঁদুর আর বাঁদর আমি নিচ্ছি,' বললেন ডক্টর জাহান। 'প্রথমে ভেক্টর স্টাডি সারব, তারপর ময়নাতদন্ত।'
আবার যান্ত্রিক হাত দুটো ব্যবহার করছেন ডক্টর মুশফিক। খাঁচাসহ মরা ইঁদুর আর বাঁদর বের করে, কামরার এক কোণে থাকা রাবারের কনভেয়ার বেল্টে তুলে দিলেন, তারপর টিপে ধরলেন 'ময়নাতদন্ত' লেখা বোতাম। কনভেয়ার বেল্ট ওগুলোকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল।
সদয় জাহান কন্ট্রোল সেন্ট্রাল ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন, করিডর ধরে ময়নাতদন্তের জন্য আলাদা করা একটা কামরায় যাচ্ছেন, পৌঁছে দেখবেন খাঁচাসহ মরা প্রাণী দুটো পৌঁছে গেছে ওখানে।
সার্জেন নওয়াবকে ডক্টর মুশফিক বললেন, 'আমাদের মধ্যে আপনি একা প্র্যাকটিসিং ফিজিশিয়ান। এই মুহূর্তে সবচেয়ে কঠিন কাজটা আপনাকেই করতে হবে।'
'পিডিয়াট্রিশন হিসেবে এবং জেরিয়াট্রিক্স হিসেবে?'
'ঠিক তাই। দেখুন কতটুকু কী করতে পারেন। ওদের আলাদা একটা কামরায় রাখা হয়েছে, নাম সারভাইভার রুম, এ রকম অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে কাজে লাগবে ভেবে ওই কামরা তৈরি করা হয়েছিল। ওখানে একটা কম্পিউটার লিংক আপ আছে, সাহায্য পাবেন। কীভাবে কাজ করে টেকনিশিয়ানরা দেখিয়ে দেবে।'

১৩. বাঁচার এবং বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা

সত্যি তাই, একজন বৃদ্ধ এবং ছোট্ট এক শিশুর প্রাণ রক্ষার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হচ্ছে এখানে। চলতি সংকট থেকে বেরিয়ে আসার পথ পাওয়ার জন্য দুজনকেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। তবে দুটো সূত্রই, কোনো সন্দেহ নেই, ম্যানেজ করা অত্যন্ত কঠিন।
কন্ট্রোল রুমের মতো দেখতে আরেকটা কামরায় চলে এসেছেন সার্জেন নওয়াব। এটায়ও কাচের একটা দেয়াল বা জানালা আছে, ভেতরে তাকালে একটা সেন্ট্রাল রুম দেখা যায়। সেই রুমে দুটো বিছানা, তাতে শুয়ে আছেন সুবীর চাকমা আর সেই শিশু। তবে অবিশ্বাস্য জিনিস হলো স্যুটগুলো : কামরার ভেতর খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্লাস্টিকের চারটে ফোলানো স্যুট, দেখতে হুবহু মানুষের আকৃতি নিয়ে। প্রতিটি স্যুট থেকে একটা করে টানেল বেরিয়ে চলে এসেছে দেয়ালের দিকে।
বোঝাই যাচ্ছে, কেউ যদি ওই স্যুটগুলোর একটায় ঢুকতে চায়, প্রথমে তাকে ক্রল করে টানেল পার হতে হবে, পরে দাঁড়াতে পারবে স্যুটের ভেতর। শুধু তারপরই কামরার ভেতর শুয়ে থাকা রোগীদের ওপর কাজ করতে পারবে সে।
সার্জেনের সহকারিণী হিসেবে আমেনা নিষ্ঠাবতী নামে এক তরুণী রয়েছেন ওখানে, কম্পিউটার কনসোলের ওপর ঝুঁকে কাজ করছেন। তিনি ব্যাখ্যা করলেন কীভাবে এখানকার বিশেষ কম্পিউটার কাজ করে। 'দাবানল কম্পিউটারের এটা স্রেফ একটা সাবস্টেশন, ল্যাবগুলোর ভেতর এটাকে নিয়ে আরও ত্রিশটা সাবস্টেশন আছে, সবগুলো কম্পিউটারের সঙ্গে প্লাগের মাধ্যমে সংযুক্ত। ত্রিশজন লোক একসঙ্গে কাজ করতে পারবে।'
মাথা ঝাঁকালেন নওয়াব।
'আমরা এখানে মেডকম প্রোগ্রাম ব্যবহার করছি, স্যার। আপনি তাতে অভ্যস্ত?'
'না।'
'এটা একটা মেডিকেল ডেটা অ্যানালাইজার,' বললেন নিষ্ঠাবতী। 'আপনি তথ্য সরবরাহ করবেন, কম্পিউটার রোগীর কী রোগ হয়েছে বোঝার চেষ্টা করবে, তারপর আপনাকে বলবে থেরাপির জন্য কী করতে হবে, কিংবা জানাবে রোগীর ঠিক কী রোগ হয়েছে।'
'বেশ, ভালো।'
'যন্ত্র তো, অনেক দ্রুত কাজ করে, স্যার। দু-এক মিনিটের বেশি লাগে না।'
কাচের ভেতর দিয়ে রোগীদের দিকে তাকালেন নওয়াব। 'এখন পর্যন্ত ওদের নিয়ে কী করা হয়েছে?'
'তেমন কিছু না। লেভেল ১-এ থাকতে সুবীর বাবুর শিরায় রক্ত দেওয়া হয়েছে এবং শিশুটিকে দেওয়া হয়েছে ডেক্সট্রোজ আর পানি। সুবীর বাবু এখনো অজ্ঞান।'
নওয়াজ জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানকার ল্যাবে সব কাজ করা যায়?'
'সব, স্যার। সম্ভাব্য প্রতিটি মেডিকেল টেস্ট এখানে করতে পারবেন আপনি।'
'বেশ। আমরা তাহলে শুরু করি আসুন।'
কম্পিউটারের দিকে ঘুরে বসলেন নিষ্ঠাবতী। 'কম্পিউটারকে আপনি কীভাবে টেস্ট করার নির্দেশ দেবেন দেখে নিন। এই যে পেনসিল টর্চ দেখছেন, যে টেস্টটা করতে চান পরদার তালিকায় থাকা সেটার নামের ওপর আলো ফেলতে হবে শুধু।'
নওয়াবের হাতে ছোট একটা পেনলাইট গুঁজে দিলেন তরুণী, তারপর চাপ দিলেন স্টার্ট বাটনে। সব মিলিয়ে ৮৮টি টেস্টের একটা তালিকা চলে এল পরদায়। সেটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে যে টেস্টগুলো করতে চান সেগুলোর ওপর একবার করে আলো ফেললেন নওয়াব। পনেরো কি আঠারোটা টেস্ট করতে চাইছেন তিনি।
দশ সেকেন্ডের মধ্যে কম্পিউটার জানিয়ে দিল টেস্টগুলো করতে হলে কোন রোগীর কতটুকু রক্ত আর পেশাব লাগবে তার।
নিষ্ঠাবতী বললেন, 'আপনি বললে আমি রক্ত সংগ্রহ করতে পারি। আপনি আগে এখানে কাজ করেছেন, স্যার?'
নওয়াব মাথা নাড়লেন।
'খুব সহজ। আমরা টানেল দিয়ে ক্রল করে এগোই, স্যুটের ভেতর ঢুকে খাড়া হই, তারপর আমাদের পেছনে সিল করে দেওয়া হয় টানেল।'
'অ্যা! কেন?'
'আমাদের কারও যদি কিছু ঘটে যায় ভেবে। কোনো স্যুটের আবরণ ভেঙে যেতে পারে। এ রকম ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়া টানেলের মাধ্যমে বাইরে ছড়িয়ে পড়তে পারে। যদিও সে আশঙ্কা নেই বললেই চলে, ওই স্যুটের প্লাস্টিক তিন প্রস্থ পুরু।'
'তাই আমাদের সিল করে রাখা হবে।'
'হ্যাঁ। আমরা বাতাস পাব আলাদা একটা সিস্টেম থেকে। ওদিকে আপনি সরু সরু লাইন দেখতে পাবেন, ভেতরে ঢুকেছে। তবে ওই স্যুটের ভেতর ঢোকার পর আপনি সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন।'
ক্রল করে টানেল ধরে এগোলেন নওয়াব, তারপর স্যুটে ঢুকে সিধে হলেন। নিজেকে তার দৈত্যকার সরীসৃপ বলে মনে হলো, নড়াচড়া করছেন হেলেদুলে, নিজের টানেলটাকে একটা লেজের মতো পেছনে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।
নিষ্ঠাবতী শিশুর রক্ত সংগ্রহ করছেন। বৃদ্ধ সুবীরের দিকে

মন দিলেন নওয়াব।

বৃদ্ধ একজন মানুষ, ম্লান; তার মানে রক্তশূন্যতা। এবং রোগা, প্রথম চিন্তা, ক্যানসার, দ্বিতীয় চিন্তা যক্ষ্মা, অ্যালকোহলিজম, কিংবা অন্য কোনো ক্রনিক প্রসেস। এবং অজ্ঞান, মৃগী হতে পারে, শক হতে পারে, হতে পারে স্ট্রোক।

রক্তচাপ কম, ৮৫/৫০। পালস দ্রুত, ১১০। তাপমাত্রা : ৯৭.৮। শ্বাস-প্রশ্বাস মিনিটে ৩০ বার, গভীর।

সুবীর বাবুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত পরীক্ষা করলেন নওয়াব। নার্ভে ব্যথা দিতে রোগী মুখ বাঁকালেন, হাত তুলে নওয়াবকে ঠেলে সরিয়ে দিতে গেলেন।

তিনি হয়তো আদৌ অজ্ঞান নন, স্রেফ তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় আছেন। তাঁকে ধরে ঝাঁকালেন নওয়াব। 'সুবীর বাবু। সুবীর বাবু।'

কোনো সাড়া নেই। তবে, তারপর দেখা গেল, ধীরে ধীরে সচেতন হয়ে উঠছেন তিনি। তাঁর কানের কাছে মুখ নামিয়ে চিৎকার করলেন নওয়াব, আগের চেয়ে জোরে ঝাঁকালেন।

সুবীর চাকমা চোখ মেললেন, মাত্র এক মুহূর্তের জন্য এবং বললেন, 'আপনি...সরে যান...'

আবার তিনি গভীর তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। তাঁর ফুসফুস আর হৃৎপিণ্ড স্বাভাবিক পেলেন নওয়াব। পেটে টান টান ভাব আছে দেখে জায়গামতো হাত ঢোকাতে আঙুলে পরা দস্তানায় রক্ত দেখতে পেলেন। রেকটাম পরীক্ষা করালেন, টেস্ট করালেন স্টুল। হ্যাঁ, রক্ত আছে।

নিষ্ঠাবতীর দিকে তাকালেন নওয়াব, রক্তের নমুনা সংগ্রহ করার পর টিউবগুলো কম্পিউটার অ্যানালাইসিস অ্যাপারাটাসের সঙ্গে সংযুক্ত করছেন।

'রেজাল্ট পেতে কতক্ষণ লাগবে?'

সিলিংয়ের কাছে রাখা টিভির পরদা দেখালেন নিষ্ঠাবতী। 'আসার সঙ্গে সঙ্গে ল্যাব রিপোর্ট ওখানে ফ্ল্যাশ হবে। অপর কামরার কনসোলেও পৌঁছে যাবে।'

বিশ সেকেন্ড পরই টিভির পরদায় টেস্টের রেজাল্ট আসতে শুরু করল :

সুবীর চাকমা

ল্যাবরেটরি অ্যানালাইসিস টেস্ট: নরমাল; ভ্যালু হেমাটোক্রেট : ৩৮-৫৪-২১।

'হাফ নরমাল,' বিড়বিড় করলেন নওয়াব। সুবীর চাকমার মুখে একটা অক্সিজেন মাস্ক বসালেন, স্ট্র্যাপ আটকালেন, তারপর বললেন, 'আমাদের অন্তত চার ইউনিট দরকার। আর দুই ইউনিট প্লাজমা।'

'আমি অর্ডার দিচ্ছি।'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শুরু করতে বলুন।'

ব্লাড ব্যাংকে চলে গেলেন নিষ্ঠাবতী, সেটা লেভেল দুইয়ে। নওয়াব শিশুটির দিকে মন দিলেন। কাজটা যে কত কঠিন, হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন তিনি। যতবার চোখ দেখতে যাচ্ছেন, ততবার সে তার চোখ শক্ত করে বন্ধ করে রাখছে; যতবার তার গলা পরীক্ষা করতে যাচ্ছেন, ততবার মুখ বন্ধ করে ফেলছে, যতবার হৃৎপিণ্ডের ধুঁক ধুঁক শুনতে চেষ্টা করলেন ততবার গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগল। তারপরও হাল ছাড়ছেন না নওয়াব, কারণ তাঁর মনে আছে এরা দুজন হাতিমারার একমাত্র সারভাইভার। যেভাবেই হোক রোগটাকে হারিয়ে দিয়েছে তারা। দুজনের মধ্যে এই একটা মিল বা যোগাযোগ রয়েছে। কিছু একটা আছে ওদের, যেটা দিয়ে রোগজীবাণুর সঙ্গে যুদ্ধ করে জিতে যেতে পেরেছে ওরা। সেটা কী জানতে হবে, তাহলে বাতাসের সঙ্গে যে মহামারি ছড়াচ্ছে সেটাকে থামানোর একটা উপায় হয়তো আবিষ্কার করতে পারবেন তাঁরা।

শিশুটিকে পরীক্ষা করতে আধঘণ্টা লাগল। এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হলেন নওয়াব : এই শিশু পুরোপুরি সুস্থ এবং স্বাভাবিক। শুধু একটা জিনিস বাদে, আর তা হলো, কীভাবে কে জানে সে সারভাইভ করে গেছে।

১৪. কন্ট্রোল সেন্টার

কন্ট্রোল সেন্টারে বসে, আরেক কামরায় রাখা ক্যাপসুলের দিকে তাকিয়ে আছেন ডক্টর মুশফিক, সঙ্গে ডক্টর বাবর। কন্ট্রোল সেন্টারকে মেইন কন্ট্রোলও বলা হয়, ওটার মূল কাজ হলো শনাক্ত করা এবং তারপর বিচ্ছিন্ন করা। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জীবাণু শনাক্ত আর বিচ্ছিন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত সিস্টেম এবং যন্ত্রপাতি আছে এখানে।

কাজের প্রথম ধাপ, জীবাণুকে পেতে হবে। দ্বিতীয় ধাপ, স্টাডি করে বুঝতে হবে সেটাকে। শুধু তারপরই নিয়ন্ত্রণ করার একটা উপায় পাওয়া যাবে বলে আশা করা যেতে পারে।

মুশফিক আর বাবর নিজেদের সামনে থরে থরে সাজানো কন্ট্রোল আর ডায়াল নিয়ে পাশাপাশি বসেছেন। মুশফিক যান্ত্রিক হাত অপারেট করছেন, বাবর ব্যস্ত মাইক্রোস্কোপিক যন্ত্রপাতি নিয়ে। জানা কথা কামরায় ঢুকে ক্যাপসুলটাকে সরাসরি পরীক্ষা করা অসম্ভব। এই কাজ দক্ষতার সঙ্গে করতে পারবে রোবট-নিয়ন্ত্রিত মাইক্রোস্কোপ, যেটার ভিউইং স্ক্রিন আছে কন্ট্রোল রুমে।

রোবটকে দিয়ে ক্যাপসুলটাকে পজিশনে আনা হলো, তারপর নির্দিষ্ট কন্ট্রোলে চাপ দিলেন মুশফিক। সিলিং থেকে নেমে আসতে দেখা গেল কালো একটা বাক্সকে, একদম কাছাকাছি এসে থামল, ক্যাপসুলের সারফেস পরীক্ষা করছে। দুই বিজ্ঞানী ভিউইং স্ক্রিনে অপলক তাকিয়ে আছেন।

'ফাইভ পাওয়ার দিয়ে শুরু করুন,' মুশফিক বললেন।

কন্ট্রোল অপারেট করলেন বাবর। ক্যাপসুলের পুরোটা একবার স্ক্যান করা হলো। তারপর পাওয়ার টোয়েন্টি দিয়ে আরেকবার। এতে সময় বেশি লাগল। তারপরও সারফেসে কিছু আছে বলে ওদের চোখে ধরা পড়ছে না—না কোনো ফুটো, না কোনো ফাটল, না কোনো চিড়, না কোনো তোবড়ানো ভাব, না কোনো ধরনের বাড়তি অংশ বা ফুলে থাকা।'

'এক শ করে দিন পাওয়ার,' বললেন মুশফিক।

কন্ট্রোল অ্যাডজাস্ট করে চেয়ারে হেলান দিলেন বাবর। এটা তাঁরা দীর্ঘ একটা তল্লাশি-প্রক্রিয়া শুরু করতে যাচ্ছেন। হতে পারে কিছুই হয়তো পাওয়া যাবে না। খানিক পর ক্যাপসুলের ভেতরটা পরীক্ষা করা হবে, ওখানে কিছু পাওয়া গেলেও যেতে পারে। না পাবার সম্ভাবনাই বেশি। তবে কিছু পাওয়া যাক বা না যাক, অবশ্যই নমুনা সংগ্রহ করে সেগুলো বিশ্লেষণ করা হবে—ক্যাপসুলের গা চেঁছে বা আঁচড়ে যা পাওয়া যাবে তাই তুলো দিয়ে তুলে এনে গ্রোথ মিডিয়ায় রাখা হবে।

এবারের স্ক্যানগুলো শেষ হতে দুই ঘণ্টার বেশি লেগে গেল। তৃতীয় স্ক্যান শেষে মুশফিক বললেন, 'আমাদের বোধ হয় ফোর-ফোরটি স্ক্যানও করতে হবে।'

'তবে?'

'আমার ঝোঁক চাপছে সরাসরি ভেতরের স্ক্যান আগে করি। কিছু যদি না পাই, তখন বাইরে বেরিয়ে এসে একটা ফোর-ফোরটি সারা যাবে।'

'আমি একমত।'

ভেতরের স্ক্যান শুরু হলো। পেনসিলের মাথার চেয়ে বড় নয়, একটা ডেবে যাওয়া সারফেস পাওয়া গেল। এবার টোয়েন্টি পাওয়ার স্ক্যান শুরু হতে যাচ্ছে, মুশফিক পরামর্শ দিলেন, 'ওই ডেবে যাওয়া জায়গা থেকে শুরু করুন।'

সঙ্গে সঙ্গে ওটাকে দেখতে পেলেন তাঁরা। অতি ক্ষুদ্র কালো একটা দাগ, অমসৃণ, এবড়োখেবড়ো, বালুর একটা কণার চেয়ে বড় নয়। কালো, তবে কালোর সঙ্গে একটু সবুজ কিছু যেন মিশে আছে।

দুই বিজ্ঞানীর কারও কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। অনেক পরে অবশ্য বাবর বলেছেন, 'উত্তেজনায় কাঁপছিলাম। বারবার একটা কথাই ভাবছিলাম, এটাই যদি হয়, সত্যি যদি এটা নতুন কিছু হয়, প্রাণের নতুন একটা ধরন...'

যা-ই হোক, ঘটনা যখন ঘটছিল তখন তিনি শুধু বলেছেন, 'ইন্টারেস্টিং।'

'টোয়েন্টি পাওয়ারেও স্ক্যানটা শেষ করতে হবে,' বললেন মুশফিক, নিজের গলা স্বাভাবিক রাখতে গিয়ে ঘেমে যাচ্ছিলেন তিনি। বোঝা যাচ্ছিল উত্তেজনা চেপে রাখতে তাঁর কষ্ট হচ্ছে।

কাজেই বাবর টোয়েন্টি পাওয়ারে ক্যাপসুলের ভেতরের স্ক্যান সম্পন্ন করলেন। যখন তাঁদের মনে হলো আরও কটা সবুজ ঝাপসা দাগ সম্ভবত দেখতে পাচ্ছেন তাঁরা, ওগুলোর কো-অর্ডিনেটস চিহ্নিত করে রাখলেন, পরে যাতে এলাকাটা পাওয়া যায়, আরও বেশি ম্যাগনিফিকেশনে। টোয়েন্টি পাওয়ার স্ক্যানে সন্তুষ্ট, মুশফিকের মুখ থেকে এ কথা বের হবার আগে আধ ঘণ্টা পার হয়ে গেল।

কফি খাওয়ার বিরতি নিলেন তাঁরা, তার আগে পানি দিয়ে দুটো করে ট্যাবলেট ফেললেন গলায়।

বিরতির পর, এবার হান্ড্রেড পাওয়ার স্ক্যান শুরু হলো, শুরু হলো সেই ডেবে যাওয়া জায়গা থেকে।

একটু হতাশ হতে হলো। বেশি ম্যাগনিফিকেশনেও জিনিসটাকে একই রকম দেখাচ্ছে, আকারে শুধু বড়। তবে তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন ওটা দেখতে ভাঙাচোরা ধরনের একটা বস্তু, ভোঁতা, অনেকটা পাথরের মতো এবং সেটার কর্কশ সারফেসে সবুজ একটু দাগ অবশ্যই আছে।

'এটা দেখে কী বুঝছেন আপনি?' জিজ্ঞেস করলেন মুশফিক।

'ক্যাপসুল যদি এই জিনিসটার সঙ্গেই ধাক্কা খেয়ে থাকে,' বাবর বললেন, 'তাহলে হয় সেটা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ছুটছিল, আর তা না হলে ওজনে খুব ভারী। কারণ জিনিসটা আকারে বেশি বড় নয়...'

'হ্যাঁ, তাহলে তো এক ধাক্কায় কক্ষপথের বাইরে ছুড়ে দিত অতুল ৭-কে। তা দেয়নি, ক্যাপসুলটা হঠাৎ করে ছন্দ হারিয়ে ফেলে, কক্ষপথ থেকে সরে আসছিল, সেটা দেখে বেতার সংকেতের সাহায্যে মাটিতে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। যা-ই হোক, ডেবে যাওয়া জায়গা মোটেও গভীর নয়।'

'তাৎপর্য?'

'হয় ওটা কক্ষপথে যে পরিবর্তন ঘটেছে তার জন্য দায়ী নয়, তা না হলে জিনিসটার মধ্যে কিছু ইলাস্টিক প্রপার্টিজ রয়ে গেছে আমরা যার খবর জানি না।'

'সবুজ ভাবটা সম্পর্কে কিছু বলুন।'

মুশফিক হাসলেন। 'আপনি আমাকে এখনই ফাঁদে ফেলতে যাবেন না। আমি স্রেফ কৌতূহলী, তার বেশি কিছু না।

মৃদু হেসে স্ক্যানের কাজ করে যাচ্ছেন বাবর। দুজনেই উল্লাস অনুভব করছেন, নিজেদের আবিষ্কার সম্পর্কে নিশ্চিত। আরও যেসব জায়গায় সবুজ দাগ দেখা যাচ্ছে, আরও বেশি ম্যাগনিফিকেশনের সাহায্যে সেগুলোর উপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিলেন। তবে পাথরে যে সবুজ ভাব দেখা যাচ্ছে, অন্য জায়গার দাগগুলো তার চেয়ে আলাদা। একটা পার্থক্য হলো, আকারে এগুলো বড় এবং কীভাবে যেন বেশি উজ্জ্বল। আরেকটা পার্থক্য, দাগের কিনারা বেশ নিয়মিত. ভাঙাচোরা নয় এবং প্রায় গোল।

'সবুজ রঙের ছোট ফোঁটার মতো, ক্যাপসুলের ভেতর ছড়িয়ে আছে,' বললেন মুশফিক।

'আশা করি তা যেন না হয়।'

'আমরা ফ্যাক্টস জানার চেষ্টা করতে পারি।'

'তাহলে ফোর-ফোরটি?'

রাজি হলেন মুশফিক। ইতিমধ্যে প্রায় চার ঘণ্টা পার হয়ে গেছে ক্যাপসুলটাকে পরীক্ষা করছেন তাঁরা, কিন্তু দুজনের একজনও ক্লান্ত নন। চোখে ধারালো দৃষ্টি নিয়ে ভিউইং স্ক্রিনে তাকিয়ে আছেন তাঁরা, ডেবে থাকা জায়গাটা দেখছেন, সবুজ এলাকা নিয়ে কালো দাগ। এত বেশি ম্যাগনিফিকেশনে পাথরটার সারফেসের অনিয়মিত ভাব চোখে খুব বেশি লাগছে—জিনিসটা খুদে একটা গ্রহের মতো, এবড়োখেবড়ো চূড়া আর স্পষ্ট উপত্যকাসহ। এ যেন হুবহু একটা মিনিয়েচার প্ল্যানেট। মাথা থেকে চিন্তাটা ঝেড়ে ফেললেন বাবর। অসম্ভব।

মুশফিক বললেন, 'ওটা যদি কোনো উল্কা হয়, দেখতে উদ্ভটই বলতে হবে।'

'কিছু একটা আপনাকে বিরক্ত করছে।'

'ওদিকটা, বাঁ কিনারা।' স্ক্রিনের দিকে হাত তুললেন মুশফিক। 'পাথরের সারফেস...যদি ওটা পাথর হয়—সব জায়গায় কর্কশ, শুধু ওই বাঁ সীমান্ত বাদে, ওখানে জায়গাটা মসৃণ, এবং বরং সোজাই বলা যায়।'

'একটা কৃত্রিম সারফেসের মতো?'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মুশফিক। 'বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে তাই দেখতে পাব। আসুন, বাকি সবুজ দাগগুলো দেখা যাক।'

ভিউইং স্ক্রিনে নতুন ইমেজ চলে এল। সবুজ একটা দাগের ক্লোজ-আপ এটা। আকার বড় হওয়ায় সীমান্ত এলাকা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। সেটা মসৃণ নয়, সামান্য আঁচড়ানো বা খোঁচরানো। দেখতে অনেকটা যেন একটা ঘড়ির ভেতরের দৃশ্য।

'আমি স্রেফ মারা যাব,' বাবর বললেন, উত্তেজিত।

'ওটা পেইন্ট নয়। ওই আঁচড় খুব বেশি নিয়মিত।'

তাঁরা দুজন তাকিয়ে আছেন, এই সময় ব্যাপারটা ঘটল। এক সেকেন্ডের কম সময়ের জন্য সবুজ বিন্দু বেগুনি হয়ে গেল, চোখের পলক ফেলারও আগে। তারপর আবার আগের সবুজ রঙে ফিরে গেছে।

'ব্যাপারটা আপনি দেখলেন?'

'দেখলাম। আপনি লাইটিং বদলাননি তো?'

'না। ছুঁইওনি।'

এক মুহূর্ত পর ব্যাপারটা আবার ঘটল। সবুজ, ঝলসে ওঠা বেগুনি, আবার সবুজ।

'তাজ্জব ব্যাপার।'

'হতে পারে এটা হয়তো...'

আর ঠিক তখন, জিনিসটা আবার বেগুনি হলো এবং বেগুনি হয়ে থেকেও গেল। আঁচড়গুলো মিলিয়ে গেছে। বিন্দুটা আকারে সামান্য একটু বেড়েছে, পূরণ করেছে ভি আকৃতির ফাঁকগুলো। জিনিসটা এখন একটা পরিপূর্ণ বৃত্ত। তারপর আবার একবার সবুজ হলো।

'ওটা গজাচ্ছে,' মুশফিক বললেন। 'শুরু হয়েছে বংশবিস্তার।'

দ্রুত কাজ করছেন তাঁরা। আরও ক্যামেরা আনানো হয়েছে। প্রতি সেকেন্ডে ছিয়ানব্বইটা ফ্রেম, পাঁচটা অ্যাঙ্গেল থেকে শুটিং করা হচ্ছে। আরেকটা টাইম-ল্যাপস ক্যামেরা আধ সেকেন্ড বিরতি দিয়ে ক্লিক করছে। আরও এক জোড়া রিমোট ক্যামেরাও আনিয়েছেন বাবর, বসিয়েছেন আলাদা কোণ থেকে ইমেজ পাবার জন্য।

মেইন কন্ট্রোলের তিনটে স্ক্রিনে সবুজ বিন্দুর তিনটে আলাদা চেহারা দেখা যাচ্ছে।

'আপনি আরও বেশি পাওয়ার দিতে পারেন? আরও বেশি

ম্যাগনিফিকেশন?' জানতে চাইলেন মুশফিক।

'না। আপনার মনে আছে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ফোর-ফোরটির বেশি নয়।'

কিছু বললেন মুশফিক, বোঝা গেল না। ম্যাগনিফিকেশন আরও বাড়াতে হলে আরেক কামরায় যেতে হবে, আর তা না হলে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার করতে হবে।

বাবর জিজ্ঞেস করলেন, 'এবার কালচার আর আইসোলেশন শুরু করতে পারি আমরা?'

'হ্যাঁ, পারি।'

আবার টোয়েন্টি পাওয়ারে শুরু করলেন বাবর। এখন তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন আগ্রহী হবার মতো চারটে জায়গা রয়েছে—তিনটে আলাদা আলাদা সবুজ দাগ, আর পাথরটা, ডেবে থাকা অংশসহ। কন্ট্রোলের একটা বোতামে চাপ দিলেন তিনি, কালচার শব্দটা দিয়ে চিহ্নিত করা। কামরার দেয়াল থেকে ট্রে বেরিয়ে এল, প্লাস্টিকে মোড়া ছোট ছোট গোল ডিশসহ। প্রতিটি ডিশের ভেতর আছে গ্রোথ মিডিয়ামের পাতলা স্তর।

যান্ত্রিক হাত ব্যবহার করে জীবাণুমুক্ত করা একটু তুলো তুলে ক্যাপসুলের সারফেসে ছোঁয়ালেন মুশফিক, তারপর মিডিয়ায় রাখলেন। কম্পিউটারে ডেটা সরবরাহ করছেন বাবর, পরে তাঁরা যাতে জানতে পারেন প্রতিটি তুলোর টুকরো কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এভাবে পুরো ক্যাপসুলের বাইরের সারফেস তুলোর স্পর্শ পেয়ে যাবে, তারপর তাঁরা ভেতরে কাজ করবেন। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে, উঁচু মাত্রার ম্যাগনিফিকেশনের সাহায্যে, সবুজ বিন্দু থেকে টুকরো-টাকরা তুলে পাঠিয়ে দিলেন আলাদা মিডিয়ায়।

সবশেষে সূক্ষ্ম ফরসেপ দিয়ে পাথরটাকে তুললেন তিনি, তারপর পরিষ্কার কাচের ডিশে সরিয়ে রাখলেন।

গোটা প্রক্রিয়াটা শেষ করতে দুই ঘণ্টার বেশি সময় লেগে গেল। ওই সময়ের শেষে বাবর ম্যাক্সকাল্ট কম্পিউটার প্রোগ্রাম অন করলেন। এই প্রোগ্রাম নিজে থেকে মেশিনকে নির্দেশ দিচ্ছে সংগ্রহ করা কয়েক শ ডিশ কীভাবে কোথায় রাখতে হবে। কিছু থাকবে *ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা আর চাপে, পৃথিবীর* স্বাভাবিক আবহাওয়া অনুসারে। কিছু ডিশকে রাখতে হবে তাপ আর ঠান্ডার মধ্যে; কিছু ডিশকে রাখতে হবে উঁচু মাত্রার চাপে আর ভ্যাকিউমে, কিছু ডিশকে কম অক্সিজেনে বা বেশি অক্সিজেনে, অন্ধকারে, বা আলোয়। বিভিন্ন কালচার বক্সে প্লেট সাজানোর কাজে একজন মানুষের সারাটা দিন লেগে যেতে পারে। এই একই কাজ মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে করে দেবে কম্পিউটার।

প্রোগ্রাম চলছে, ডিশগুলো কনভেয়ার বেল্টে তুলে দিলেন মুশফিক। ওগুলো কালচার বক্সের দিকে যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন তাঁরা।

চব্বিশ থেকে আটচল্লিশ ঘণ্টা অপেক্ষা করা ছাড়া এখন আর তাঁদের করার কিছু নেই, তারপর তাঁরা দেখতে পাবেন কী গজিয়েছে।

'এই ফাঁকে,' মুশফিক বললেন, 'আমরা পাথরটা অ্যানালাইসিস করতে পারি—আদৌ যদি ওটা পাথর হয়। আপনার ইএম কেমন?'

'মরচে ধরা,' বললেন বাবর, প্রায় এক বছর হতে চলল ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার করছেন না।

'তাহলে আমি নমুনা প্রস্তুত করছি। আমরা মাস স্পেকট্রোমেট্রিও করাতে চাইব। সেটা কম্পিউটারাইজড। তবে তা করার আগে আমাদের আরও বেশি পাওয়ারে যেতে হবে। মরফলজিতে হাইয়েস্ট লাইট ম্যাগনিফিকেশন কত পেতে পারি আমরা?'

'এক হাজার ডায়ামিটার,' জানালেন বাবর।

'তাহলে সেটাই আগে করুন। ঠেলে পাথরটাকে মরফলজিতে পাঠিয়ে দিন।'

কনসোলে তাকিয়ে মরফলজি চিহ্নিত করা বোতাম দেখতে পেলেন বাবর, চাপ দিলেন তাতে। মুশফিকের যান্ত্রিক হাত পাথরসহ কাচের ডিশটা কনভেয়ার বেল্টে তুলে দিল।

দেয়ালঘড়ি দেখলেন তাঁরা। তাতে ১১ ঘণ্টা দেখাচ্ছে। অর্থাৎ এখানে তাঁরা টানা এগারো ঘণ্টা কাজ করছেন, বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন অবস্থায়।

'এখন পর্যন্ত,' ডক্টর মুশফিক বললেন, 'সব ভালো।'

মুখে হাসি ফুটিয়ে তাঁর কথায় সায় দিলেন বাবর।

দুজনের কেউই জানেন না বাইরের দুনিয়ায় কী ঘটছে।

১৫. বাইরে কী ঘটছে?

বাইরের জগৎ থেকে একের পর এক দুঃসংবাদ আসতে শুরু করেছে দাবানল প্রকল্পের পাতালে, তবে সেসব শুধু লেভেল চার-এর টেলিপ্রিন্টার থেকে ছেপে বের হওয়া প্রিন্টআউট থেকে পড়া যাচ্ছে। টপ লেভেলেও আসছে খবরটা, তা ছাপাও হচ্ছে, কিন্তু যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে সেসব কারও নজরে ধরা পড়েছ না—বেল না বাজার কারণে।

দাবানলের ভেতর যেসব বিজ্ঞানী এই সংকট নিয়ে কাজ করছেন তাঁদের বাইরের খবর সঙ্গে সঙ্গে বা প্রয়োজন না হলে পরেও জানানোর নিয়ম নেই, আর নিয়ম অনুসারে সেভাবে জানানো হচ্ছেও না। কিন্তু তারপরও খবরগুলো অনেকে জেনে ফেলছেন। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন ডক্টর সদয় জাহান। কীভাবে জানছেন তাঁরা?

গুরুতর কিছু খবর নিচের লেভেলে পৌঁছেছিল, ওখান থেকে কেউ একজন কোনো কাজে ওপরের লেভেলে এসে খবরটা জানিয়ে গেছে। ওপরের বিজ্ঞানীরা এত ব্যস্ত যে তাঁরা নিজেদের টেলেক্সের খবর সংগ্রহ করতে সময় এবং উৎসাহ পাননি।

ভারতের কয়েকটি রাজ্যে রোগটা ভয়ংকর মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়ার পর ওখানকার বিজ্ঞানীরা এই জীবাণুর নাম দিয়েছেন অ্যান্ড্রোমেডা স্ট্রেইন। বিশদ জানা যায়নি, তবে ধারণা করা হচ্ছে যে তাঁরা সম্ভবত ভাবছেন অ্যান্ড্রোমেডা গ্যালাক্সির কোথাও থেকে এই জীবাণু পৃথিবীর বুকে চলে এসেছে।

প্রথমে খবর এল বাতাস ভারতের দিকে বইছে, কাজেই সংক্রমণও সেদিকে ছড়াচ্ছে। তারপর বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে সতর্কতা জারি করে বলা হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা আর নোয়াখালী থেকে ঘনবসতি এলাকার লোকজনকে নিরাপদ এলাকায় সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কারণ বাতাসের ঘুরে যাবার লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে সেটা উল্টো দিকে বইবে।

তারপর খবর এল মহামারি-সংক্রান্ত খবর প্রচারের ওপর যে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল সেটা তুলে নেওয়া হয়েছে। দেশের তিন শ টিভি চ্যানেল তাদের নির্ধারিত সব প্রোগ্রাম বাতিল করে দিয়ে মহামারির খবর প্রচার করছে। ইতিমধ্যে গুজব রটে গেছে বাংলাদেশের ভেতর প্রতি মুহূর্তে হাজার হাজার মানুষ মারা গেছে, লাশের সংখ্যা অনেক আগেই ছাড়িয়ে গেছে পঁচিশ লাখ, কিন্তু সরকার তা স্বীকার করছে না।

বিপদের আসল চেহারা দেশবাসী দেখতে পেল আরও পরে। আবহাওয়ার খবরে প্রথমে বলা হলো, ভারতের ওদিকে থেকে বিপুল মেঘ ভেসে আসছে, বাংলাদেশের আকাশ হয়ে বঙ্গোপসাগরের দিকে চলে যাবে। এটা সে রকম বিপজ্জনক কোনো খবর নয়, কাজেই কেউ বিচলিত হয়নি। ভারতের ওদিক থেকে মেঘ এল, এল আকাশ পুরো কালো করে দিয়ে, ঝরল অঝোরে, তারপর চলেও গেল। আর তারপরই শুরু

হয়ে গেল বড় বড় দশটা জেলায় মানুষের মধ্যে মাতম।

গবেষকেরা টক শোতে হাজির হয়ে বলছেন, হাতিমারায় শুরু হওয়া মহামারি ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতের ওদিকে, সেখান থেকে ওই রোগজীবাণু শূন্যে উঠে যায়, আশ্রয় নেয় মেঘের রাজ্যে, সেই মেঘ বাংলাদেশের ওপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় বৃষ্টির সঙ্গে ছড়িয়ে দিয়ে গেছে মরণবীজ।

ভারতবিদ্বেষী মহল থেকে দাবি করা হয়েছে, জীবাণু নিজে থেকে মেঘের ওপর চড়ে বসেনি, ভারতীয় আকাশসেনারা ওই রোগজীবাণু প্লেনে করে মেঘের ওপরে নিয়ে গেছে, তারপর মেঘের সারফেসে স্প্রে করেছে। তার প্রমাণ হলো, ভারতীয় সংবাদমাধ্যম নাকি বলাবলি করছে, টিট ফর ট্যাট।

পৃথিবীর প্রায় সব রাষ্ট্র থেকে সহানুভূতি জানানো হচ্ছে, দেওয়া হচ্ছে সাহায্য করার প্রস্তাব। জানা গেল সরকার তাদের বলছে, বৈষয়িক সাহায্য লাগবে না, যদি পারো তো রাস্তাঘাট আর মাঠ-ময়দান থেকে হাজার হাজার লাশ সরানোর কাজে কী সাহায্য করতে পারো জানাও।

কিছু বিদেশি টিভি চ্যানেল আগাম মিথ্যে খবর প্রচারেও পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে। বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত, এই দাবি করে তারা প্রচার করছে, বাংলাদেশ সরকার লাশ দাফনের আয়োজন করতে ব্যর্থ হয়ে জেলায় জেলায় কয়েক শ করে প্রকাণ্ড আকারের আগুন জ্বালার ব্যবস্থা করেছে এবং প্রতিটি আগুনে কয়েক শ ট্রাকে করে লাশ এনে ফেলা হচ্ছে। তাদের হিসাবে এভাবে চব্বিশ ঘণ্টারও কম সময়ের ভেতর সরকার নাকি কম করেও প্লেগে আক্রান্ত পঞ্চাশ লাখ মানুষকে পুড়িয়ে ফেলেছে। সাংবাদিকেরা এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে রিলিফ এবং পুনর্বাসন অধিদপ্তর থেকে বলা হয়েছে, এসব ভুয়া খবরে কেউ যেন কান না দেন। আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, আমার কোনো মন্তব্য নেই।

এত দুঃসংবাদের মধ্যে একটা ভালো খবর এই যে বাংলাদেশ-সংলগ্ন ভারতের যে রাজ্যগুলোয় এই রোগজীবাণু ছড়িয়ে পড়ছিল এবং হাজারে হাজারে মারা যাচ্ছিল মানুষ, সেটার গতি কমেছে—রোগ আর সেভাবে ছড়াচ্ছে না, ফলে মানুষও আর সেভাবে মারা যাচ্ছে না। ভারত সরকার এক ঘোষণায় জানিয়েছে বাংলাদেশ থেকে আসা এই রোগজীবাণু তাদের দেড় কোটি নাগরিকের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে।

যেভাবেই হোক, ভারত এই বিপদ কাটিয়ে উঠছে বলে আশা করা হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশের অবস্থা নিয়ে প্রবল উৎকণ্ঠায় ভুগছে গোটা বিশ্ব। বাংলাদেশ প্রসঙ্গ আলোচনা করার জন্য জরুরি অধিবেশন ডেকেছে জাতিসংঘ, সংস্থাটির মহাসচিব জনাব নির্লিপ্ত নয়ন এক সংবাদ সম্মেলনে ইসলামিক কান্ট্রির তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেছেন, ভারত ও বাংলাদেশে তাদের তরফ থেকে বায়োলজিক্যাল হামলা চালানো হয়েছে বলে যে দাবি করা হয়েছে সেটি পুরোপুরি মিথ্যে। এই দাবির পক্ষে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

আর আঁতকে ওঠার মতো সবচেয়ে ভয়াবহ খবরটা এল একদম শেষে : দাবানল প্রকল্পে আসার পথে বালুর যে বিশাল বিস্তৃত রাজ্য আছে সেখানে ব্যাপক মড়ক শুরু হয়েছে। মানুষ নেই তো কী হয়েছে, কুকুর-শেয়াল থেকে শুরু করে সাপ-ব্যাঙ, ইঁদুর-ছুঁচো বা গিরগিটির তো কোনো অভাব নেই গোটা এলাকায়। প্রকল্পের সেনসরে ধরা পড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে শেষ হয়ে যাচ্ছে সব। এ যেন প্রতিশোধ গ্রহণের তীব্র ইচ্ছে নিয়ে পরম এক শত্রুর দাবানলের দিকে ধেয়ে আসা, যে দাবানল প্রকল্পের পাতালে ওই শত্রুর ধ্বংস নিশ্চিত করার জন্য কিছু বিজ্ঞানী অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন।

ময়নাতদন্তের জন্য আলাদা করা কামরায় কাজ করছেন সদয় জাহান, দেশে মহামারি ছড়িয়ে পড়ার খবর জানার পর তাঁর মাথার ঠিক নেই, হাতের কাজে একের পর এক ভুল করে যাচ্ছেন।

নার্ভাস বোধ করছেন ডক্টর জাহান, আড়ষ্ট হয়ে আছেন, মন থেকে এখনো ঝেড়ে ফেলতে পারেননি হাতিমারায় দেখে আসা দৃশ্যগুলো; ভাবছেন, এই মুহূর্তে ওই একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে গোটা দেশে।

প্রটোকল অনুসারে মরা পশুদের ময়নাতদন্ত করবেন তিনি, তবে ভেক্টর এক্সপেরিমেন্ট করার দায়িত্বও তাঁর। কিন্তু যদি ন্যায্যতার প্রসঙ্গ তোলা হয়, এই কাজগুলো সদয় জাহানকে দিয়ে করানোর কথা নয়। বরং সম্রাট বাবর এই কাজের জন্য ভালো মানিয়ে যান। কিন্তু আইসোলেশন আর আইডেনটিফিকেশনের কাজে বাবরকে খুব ভালো বলে মনে করা হয়েছে। কাজেই ভেক্টর এক্সপেরিমেন্টের দায়িত্ব গিয়ে চেপেছে সদয় জাহানের ওপর।

কাজ হিসেবে সেটা বেশ সহজ আর সাধারণ, রোগটা কীভাবে ছড়াল প্রশ্ন করে উত্তর জেনে নেওয়ার ঢঙে ছক করা। খাঁচার একটা সিরিজ নিয়ে কাজে হাত দিলেন ডক্টর জাহান, এক সারিতে রাখা, প্রতিটির আলাদা এয়ার সাপ্লাই ব্যবস্থা আছে, প্রয়োজনে বিভিন্ন উপায়ে একটার সঙ্গে আরেকটার সংযোগ দেওয়া যায়।

খাঁচায় ভরা মরা নরওয়ে ইঁদুরের লাশ ছাড়াও জীবিত ইঁদুরসহ আরেকটা খাঁচা নিজের সামনে রেখেছেন ডক্টর। বোতামে চাপ দিলেন তিনি, এক খাঁচার বাতাস আরেক খাঁচায় অবাধে আসা-যাওয়া করতে পারছে।

জ্যান্ত ইঁদুর চিৎ হলো, সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে।

ইন্টারেস্টিং, ভাবলেন তিনি। বাতাসের ভেতর দিয়ে ছড়াচ্ছে। জ্যান্ত ইঁদুরসহ আরেকটা খাঁচা টেনে আনলেন, তবে মরা আর জ্যান্ত ইঁদুরের মাঝখানে একটা মিলিপোর ফিল্টার ঢোকালেন। এই ফিল্টারের ফুটো ডায়ামিটারে ১০০ অ্যাঙ্স্ট্রাম—আকারে ছোট একটা ভাইরাস।

দুটো খাঁচার মাঝখানের প্যাসেজ খুলে দিলেন তিনি। ইঁদুরটা বেঁচে থাকল। সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত ওটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন তিনি। যে জিনিসই রোগটা ছড়াক, একটা ভাইরাসের চেয়ে বড় সেটা। ফিল্টার বদল করলেন তিনি, এবারেরটা বড় এবং তারপর আরও বড়। এভাবে চালিয়ে গেলেন, যতক্ষণ না ইঁদুরটা মারা গেল।

মাপজোখ করে ডক্টর জাহান দেখলেন, যে জীবাণু এই রোগের জন্য দায়ী ডায়ামিটারে সেটা দুই মাইক্রন, তার মানে আকারে ছোট একটা কোষ। এটা গুরুত্বপূর্ণ একটা আবিষ্কার, ভাবলেন তিনি; ছোঁয়াচে এজেন্টের আকার জানা গেছে।

পরের ধাপটাও বেশ সহজ, এটা নিশ্চিত হওয়া যে মরা পশুও মারাত্মক সংক্রামক কিনা।

একটা মরা ইঁদুর বেছে নিলেন তিনি, পাম্প করে সেটার খাঁচা থেকে সব বাতাস বের করে দিলেন। পুরো বাতাস বেরিয়ে যাবে, তার অপেক্ষায় আছেন। প্রেশার নেমে যাচ্ছে, ফলে ফেটে যাচ্ছে ইঁদুর, খুলে যাচ্ছে ওটার শরীর। ডক্টর জাহান গ্রাহ্য করছেন না।

যখন নিশ্চিত হলেন সব বাতাস সরে গেছে, ওই খাঁচায় তখন তাজা, পরিষ্কার এবং ফিল্টার করা নতুন বাতাস ঢোকালেন। তারপর ওই খাঁচার সঙ্গে জীবিত ইঁদুরসহ খাঁচা সংযুক্ত করলেন।

কিছুই ঘটল না।

ইন্টারেস্টিং, ভাবলেন তিনি।

রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে একটা স্ক্যালপেল ব্যবহার করছেন ডক্টর জাহান, স্ক্যালপেল চালিয়ে মরা ইঁদুরটাকে আরও কাটলেন, নিশ্চিত হতে চাইছেন লাশের ভেতর কোনো জীবাণু রয়ে গেছে কি না, যেগুলো পরিবেশে ছড়াতে পারে।

কিছুই ঘটল না। এই জ্যান্ত ইঁদুরটা খুশিমনে ঘুরে বেড়াচ্ছে খাঁচার ভেতর।



ক্লিক করে অন হলো টিভি স্ক্রিন

রেজাল্ট বেশ পরিষ্কারই, মরা পশু ছোঁয়াচে নয়। এ কারণেই হাতিমারার শকুনগুলো আক্রান্ত এবং মৃত মানুষের মাংস চিবিয়েও সংক্রমিত হয়নি, দিব্যি বেঁচে ছিল। লাশ রোগটা ছড়াতে পারছে না, রোগ ছড়াচ্ছে সরাসরি শুধু জীবাণু থেকে। এই ছড়ানোর কাজটা ওগুলো করতে পারছে বাতাসে ভাসতে ভাসতে।

বাতাসে থাকা পোকা বিপজ্জনক।

লাশে থাকা পোকা ক্ষতিকর নয়।

তবে মাটিতে পা রেখে কথা বলতে হলে স্বীকার করতে হবে যে এখনো অনেক কাজ বাকি। ওগুলোকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে, পড়তে হবে, বুঝতে হবে এবং তারপর পেতে হবে রোগ সারানোর জন্য একটা ওষুধ।

জানা গেছে বাতাসে আছে। জানা গেছে রক্ত জমাট করে দিয়ে প্রাণ কেড়ে নেয়। কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে, শরীরের ভেতর এই জীবাণু ঢুকছে কীভাবে?

যেহেতু বাতাসের মাধ্যমে ছড়াচ্ছে, ত্বক আর ফুসফুসের সংস্পর্শে আসতে পারবে সহজেই। লোমকূপ দিয়ে ভেতরে ঢুকতে পারে, ঢুকতে পারে শ্বাসের সঙ্গে। কিংবা দুভাবেই।

এভাবেই যে ছড়াচ্ছে, তা নিশ্চিত হবার উপায় কী?

ডক্টর জাহান ভাবছেন, যে পশুর ওপর পরীক্ষা চালাবেন সেটার মুখ বাদে বাকি অংশে বাতাস চলাচল করতে পারবে না, এমন আবরণ দিয়ে মুড়ে দেবেন কি না। এটা সম্ভব, তবে তা করতে অনেক সময় লাগবে। এক জায়গায় বসে সমস্যাটা নিয়ে এক ঘণ্টা মাথা ঘামালেন তিনি।

তারপর আরও গ্রহণযোগ্য একটা আইডিয়া খেলল তাঁর মাথায়।

তাঁর জানা আছে রক্ত জমিয়ে ফেলে খুন করছে এই জীবাণু। খুব বেশি সম্ভাবনা শরীরে প্রবেশের মুহূর্তেই রক্ত জমিয়ে ফেলার কাজটা শুরু করে ওগুলো। প্রবেশপথ যদি ত্বকের লোমকূপ হয়, রক্ত জমাট বাঁধবে সারফেসে। আর যদি ফুসফুস হয়, শুরু হবে বুক থেকে, ছড়াতে থাকবে বারমুখো হয়ে।

এটা তিনি টেস্ট করে দেখতেই পারেন। একটা পশুকে প্রস্তুত করলেন, সেটা রিসাস মাঙ্কি, যেহেতু ইঁদুরের চেয়ে বাঁদরের সঙ্গে মানুষের মিল অনেক বেশি। একপর্যায়ে কম্পিউটার থেকে সশব্দে প্রিন্টআউট বেরিয়ে আসতে লাগাল :

(মানুষের শরীরে রোগের গ্রাফিকস ছড়ানো)

রেজাল্ট পেতে মাত্র তিন সেকেন্ড লাগল। ডক্টর জাহান যেটা জানতে চাইছেন গ্রাফিক প্রিন্টআউট তাঁকে সেটা জানিয়ে দিচ্ছে, আর তা হলো রক্ত জমাট বাঁধতে শুরু করে ফুসফুস থেকে, তারপর বারমুখো হয়ে বাকি শরীরে ছড়িয়ে পড়ে।

কাজটা করতে গিয়ে অতিরিক্ত একটা তথ্য পেয়ে লাভবান হয়েছেন সদয় জাহান। পরে তিনি বলেছেন, 'আমি দ্বিধায় ভুগছিলাম এই ভেবে যে রক্ত জমাট বাঁধা আর মৃত্যু, দুটো সম্ভবত একই সঙ্গে ঘটে না। তিন সেকেন্ডের মধ্যে মানুষ মারা যাচ্ছে, এটা আমার কাছে অবিশ্বাস্য লাগছিল, কিন্তু আরও অসম্ভব লাগছিল শরীরের পুরো রক্ত এত কম সময়ের ভেতর কী করে জমাট বাঁধতে পারে। আমার মনে কৌতূহল জাগল, ব্রেনেও কোথাও দ্রুত একটু রক্ত জমাট বাঁধার ঘটনা ঘটছে নাকি, তারপর ধীরগতিতে সারা শরীরে জমাট বাঁধছে?

সদয় জাহান তদন্তের শুরু থেকেই ভাবছিলেন ব্রেন আক্রান্ত হচ্ছে কি না। কিন্তু দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, বিষয়টা তিনি পরীক্ষা করে দেখেননি। তাঁকে বাধা দিয়েছিল স্ক্যানের

রেজাল্ট, তাতে দেখা গেছে রক্তের জমাট বাঁধা শুরু হয় ফুসফুস থেকে, তারপর করাটিড আর্টারি হয়ে ব্রেনে যায় এক কি দু সেকেন্ড পরে।

কাজেই ডক্টর জাহান ব্রেনের ওপর তাৎক্ষণিক আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলেন। আর তাঁর এই ভুল পরের এক্সপেরিমেন্টের সঙ্গেও মিশে গিয়েছিল।

সহজ একটা টেস্ট, নিয়মিত দাবানল প্রটোকলের অংশ নয়। ডক্টর জাহান জানতেন মৃত্যু ঘটছে রক্ত জমাট বাঁধায়। তাঁর মনে প্রশ্ন জাগল, যদি রক্ত জমাট বাঁধা বন্ধ করা যায়, তাহলে কি মৃত্যুকে এড়ানো যাবে?

কয়েকটা ইঁদুর নিলেন তিনি, ওগুলোকে হেপারিন ইনজেকশন দিলেন। এটা রক্ত জমাট ঠেকাবার ওষুধ, প্রচুর ব্যবহার করা হয়, এর কাজের ধারা অজানা নয়। শিরায় ইনজেকশন দিলেন তিনি, বিভিন্ন মাত্রায়—খুব কম, আবার খুব বেশি।

এরপর তিনি ভয়ংকর জীবাণু আছে এমন বাতাসের সংস্পর্শে আসতে দিলেন ইঁদুরগুলোকে।

প্রথম ইঁদুর, যাকে কম ডোজ দেওয়া হয়েছে, মারা গেল পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে। বাকিগুলো মরল এক মিনিটের মধ্যে। নিঃসঙ্গ একটা ইঁদুর, খুব বেশি ডোজ দেওয়া হয়েছে, প্রায় তিন মিনিট বেঁচে থাকল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মরতে হলো সেটাকেও।

ফলাফল দেখে সদয় জাহানের মন খারাপ। এত মন খারাপ যে আসন্ন বিপদের কথা পর্যন্ত ভুলে গেলেন—ওই ভয়ংকর জীবাণু নিজেদের পথে প্রাণ বলতে যা কিছু পাচ্ছে সব ধ্বংস করতে করতে প্রকল্প দাবানলের দিকে তুমুল গতিতে ছুটে আসছে।

ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, মৃত্যুকে দেরি করিয়ে দেওয়া সম্ভব হলেও, ঠেকাতে পারা যাচ্ছে না। মরা ইঁদুরগুলো এক পাশে সরিয়ে রাখলেন তিনি, আর তারপর করলেন সবচেয়ে গুরুতর ভুলটা।

ডক্টর জাহান মরা ইনজেকশন দেওয়া ইঁদুরগুলোর ময়নাতদন্ত করলেন না।

তার পরিবর্তে, আগের পশুগুলোর দিকে মনোযোগ দিলেন—প্রথম কালো নরওয়ে ইঁদুর আর প্রথম রিসাস বাঁদর। এগুলোর পুরোদস্তুর ময়নাতদন্ত করা হলো, কিন্তু রক্ত জমাটের বিরুদ্ধে ওষুধ দেওয়া পশুদের বাদ রেখে। তিনি তাঁর এই ভুল বুঝতে পারবেন আরও আটচল্লিশ ঘণ্টা পর।

কথা আরও আছে। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা চলে না। হ্যাঁ, ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ দারুণ ম্যাগনিফিকেশন এনে দিতে পারে আর খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয় পরিষ্কার করে দিতে পারে—তবে আপনি শুধু যদি জানেন কোথায় তাকাতে হবে। নিঃসঙ্গ একটা কোষ পরীক্ষা করতে ভারি চমৎকার, কিংবা কোষের একটা অংশ। কিন্তু প্রথমে আপনাকে জানতে হবে কোন কোষটা পরীক্ষা করবেন আপনি। আর মানুষের শরীরে শত সহস্র কোটি কোষ রয়েছে।

দশ ঘণ্টা ধরে কাজ করছেন, শেষ দিকে এসে চেয়ারে হেলান দিয়ে চিন্তা করছেন সদয় জাহান, কী জানতে পেরেছেন তিনি। একটা তালিকা তৈরি করলেন।

১। ভয়ংকর এজেন্ট আকারে এক মাইক্রন। কাজেই এটা গ্যাস বা মলিকিউল নয়, এমনকি বড়সড় প্রোটিন বা ভাইরাসও নয়। এর সাইজ একটা কোষের মতো এবং অনেকগুলো ঠিক যেন একধরনের কোষই।

২। এই ভয়ংকর এজেন্ট বাতাসে ছড়ায়। মরা প্রাণী সংক্রামক নয়।

৩। এই ভয়ংকর এজেন্ট ভুক্তভোগীর ফুসফুস হয়ে ভেতরে ঢোকে। ধরে নিতে হবে ওখান থেকে রক্তস্রোতে যায় এবং রক্ত জমিয়ে ফেলতে শুরু করে।

৪। এই ভয়ংকর এজেন্ট রক্ত জমাটের মাধ্যমে মৃত্যু ডেকে আনছে। ঘটনাটা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ঘটে, শরীরের সমস্ত রক্ত জমাট বেঁধে যায়।

৫। ওষুধ দিয়ে এই প্রক্রিয়া থামানো যাচ্ছে না।

৬। মরতে বসা পশুদের মধ্যে অন্য কোনো রকম অস্বাভাবিকতার প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

নিজের তৈরি তালিকার ওপর চোখ রেখে মাথা নাড়ছেন সদয় জাহান। রক্ত জমাট বাঁধা ঠেকানোর ওষুধে কাজ হয়নি ঠিকই, কিন্তু বাস্তবতা হলো কিছু একটাতে কাজ কিন্তু হচ্ছে। সেটা কী, নিশ্চয়ই জানার উপায় আছে।

ডক্টর জাহান ভোলেননি হাতিমারার অন্তত দুজন মানুষ বেঁচে আছে এখনো।'

১৬. পুনরুদ্ধার

১১.৪৭ মিনিট। উত্তম নওয়াব কম্পিউটারের দিকে ঝুঁকে সুবীর চাকমা আর শিশুটির ল্যাব রেজাল্ট দেখছেন।

বাচ্চাটা, নওয়াব দেখলেন, স্বাভাবিক।

তবে সুবীর চাকমা সম্পূর্ণ অন্য সমস্যা। তার পরীক্ষার কয়েকটা রেজাল্টই অস্বাভাবিক।

SUBJECT CODED CHAKMA, SUBIR
LABORATORY VALUES NOT WITHIN NORMAL LIMITS FOLLOW
TEST : NORMAL : VALUE
HEMATOC : 38-54 : 21 INITIAL
25 REPEAT
29 REPEAT
33 REPEAT
37 REPEAT
BUN : 10-20 : 50
COUNTS RETIC : 1 : 6
BLOOD SMEAR SHOWS MANY IMMATURE ERYTHROCYTE FORMS
TEST : NORMAL : VALUE
PRO TIME : L2 : 12
BLOOD PH : 7.40 : 7. 31
SGOT : 40 : 75
SED RATE : 9 : 29
AMYLASE : 70-200 : 450

কিছু টেস্ট সহজেই বোঝা যায়, কিছু বেশ কঠিন। হেমাটোক্রিট বাড়ছে, কারণ সুবীর বাবুকে রক্ত এবং আলাদাভাবে লাল রক্তকণিকা দেওয়া হচ্ছে। BUN বা ব্লাড ইউরিয়া নাইট্রোজেন হলো কিডনি ফাংশন টেস্ট। রক্তের পরিমাণ এবং প্রবাহ কমে যাওয়ায় বাকি প্রতিটি টেস্টের রেজাল্টে অস্বাভাবিকতা ধরা পড়েছে।

তবে রক্তের pH টেস্ট একটা ধাঁধা। ৭.৩১ মানে বেশি অ্যাসিড, তবে চমকে যাবার মতো বেশি নয়। এটা নওয়াব ব্যাখ্যা করতে পারছেন না। এমনকি কম্পিউটার কিছু জানাতে পারছে না।

প্রিন্টআউট পড়ে কাঁধ ঝাঁকালেন। এরপর কম্পিউটার হয়তো পরামর্শ দেবে রোগীর সঙ্গে কথা বলো, কিন্তু সেটা করার চেয়ে বলা সহজ। সুবীর বাবু কোমায় রয়েছেন। তিনি যদি কিছু গ্রহণ করে থাকেন, যেটার কারণে রক্তে অ্যাসিডিটি বেড়েছে, সেটা জানা সম্ভব হবে তিনি কোমা থেকে বেরিয়ে আসার পর।

এখন বরং তিনি ব্লাড গ্যাস টেস্টটা সেরে ফেলবেন। কম্পিউটারের দিকে ফিরে চাপ দিলেন কটা বোতামে, ব্লাড গ্যাসের জন্য অনুরোধ করছেন। কম্পিউটার জানাল, রোগীকে

ল্যাবে নিয়ে গিয়ে অ্যানালাইসিস করা হোক। নওয়াব টাইপ করলেন, 'রোগী কোমায় চলে গেছে।'

কম্পিউটার বিষয়টা বিবেচনা করল, তারপর জানাল, রোগীকে মনিটর করে দেখা যাচ্ছে কোমার সঙ্গে রোগীর কোনো সম্পর্ক নেই, তদন্তে দেখা যাচ্ছে তার সঙ্গে বরং ঘুমের সম্পর্ক আছে।

'আমি স্রেফ মারা যাব,' বিড়বিড় করলেন নওয়াব। কাচের ভেতর দিয়ে তাকাতে দেখতে পেলেন সুবীর বাবু সত্যি সত্যি ঘুমের মধ্যে নড়াচড়া করছেন। টানেল ধরে ক্রল করে এগোলেন তিনি, প্লাস্টিক স্যুটের ভেতর সিধে হলেন, ঝুঁকলেন রোগীর দিকে।

'সুবীর বাবু, জাগুন...'

ধীরে ধীরে চোখ খুলে সার্জেন নওয়াবের দিকে তাকালেন সুবীর বাবু। চোখ মিটমিট করছেন, বিশ্বাস করতে পারছেন না

'ভয় পাবেন না,' নওয়াব শান্ত গলায় অভয় দিলেন রোগীকে। 'আপনি অসুস্থ, আমরা আপনার যত্ন নিচ্ছি আর চিকিৎসা করছি। আপনার এখন ভালো লাগছে?'

সুবীর ঢোঁক গিললেন, মাথা ঝাঁকালেন। তাঁর ভাব দেখে মনে হলো কথা বলতে ভয় পাচ্ছেন। তবে তাঁর ত্বক থেকে অস্বাস্থ্যকর ভাবটা দূর হয়েছে। মুখে একটু চকচকে লাবণ্য দেখা যাচ্ছে। নখগুলো আগের মতো পাঁশুটে নয়।

'এখন কেমন বোধ করছেন আপনি?'

'ঠিক আছি...আপনি কে?'

'আমি ডাক্তার উত্তম নওয়াব। আমিই আপনার দেখাশোনা করছি। আপনার খুব বেশি রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। আপনাকে একটা ট্রান্সফিউশন দিতে হয়েছে।'

শান্ত ভঙ্গি, মাথা ঝাঁকালেন সুবীর চাকমা। তাঁর এই শান্ত ভাব খেয়াল করলেন নওয়াব, কোথাও একটা বেল বেজে উঠল। জানতে চাইলেন, 'এর আগে এ রকম ঘটেছিল নাকি?'

'হ্যাঁ,' বললেন তিনি। 'দুবার।'

'ঠিক কীভাবে ঘটেছিল একটু বলবেন?'

'আমি কোথায় রয়েছি বুঝতে পারছি না,' বললেন তিনি, কামরার চারদিকে তাকাচ্ছেন। 'এটা কি কোনো হসপিটাল? আপনি ওরকম একটা বিদঘুটে জিনিস পরে আছেন কেন?'

'না, এটা হাসপাতাল নয়। রাজশাহীতে এটা একটা স্পেশাল ল্যাবরেটরি।'

'রাজশাহী? রাজশাহীতে ল্যাবরেটরি থাকে কী করে, সেটা তো এখন শুধু ধু ধু মরুভূমি। না, আমি রাজশাহীতে ছিলাম না, আমি ছিলাম খাগড়াছড়িতে...'

'এখন নয়। এখন আপনি রাজশাহীতে আছেন। খাগড়াছড়ি থেকে আমরাই আপনাকে নিয়ে এসেছি এখানে, আমরা যাতে আপনাকে সাহায্য করতে পারি।'

'ওই স্যুটের ব্যাপারটা কী?'

'আমরা আপনাকে হাতিমারা থেকে নিয়ে এসেছি। হাতিমারায় একটা রোগ দেখা দিয়েছে। আপনি এখন একটা আইসোলেশন চেম্বারে রয়েছেন।'

'আপনি বলতে চাইছেন আমি ছোঁয়াচে?'

'না, মানে, আমরা নিশ্চিতভাবে জানি না। তবে আমাদের সাবধান...'

'শুনুন' বললেন সুবীর, হঠাৎ উঠে বসার চেষ্টা করছেন, 'এই জায়গা আমাকে অসুস্থ করে তুলছে। আমাকে চলে যেতে হবে। এই জায়গা আমার একদমই পছন্দ হচ্ছে না।'

বিছানায় হাত-পা ছুড়তে শুরু করলেন, শরীর মোচড় দিয়ে স্ট্র্যাপ খোলার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন। মৃদু চাপ দিয়ে বিছানার কিনারা থেকে তাঁকে সরিয়ে দিলেন ডাক্তার নওয়াব। 'ঠান্ডা হোন, প্লিজ, সুবীর বাবু। সব ঠিক হয়ে যাবে, তবে তার আগে আপনাকে শান্ত থাকতে হবে। আপনি অসুস্থ ছিলেন।'

ধীরে ধীরে আবার শুলেন সুবীর, তারপর বললেন, 'আমাকে এক শলা সিগারেট দিন।'

'এখানে সেটা সম্ভব নয়।'

'আমার সিগারেট দরকার, কোনো অজুহাত নয়।'

'দুঃখিত, স্যার। এখানে ধূমপানের অনুমতি নেই।'

'শুনুন বলি, ইয়াং ম্যান। ডাক্তাররা এ রকম হাজারটা বিষয়ে অনুমতি দেয় না। কিন্তু তাদের কথা শুনে কী লাভ হয়েছে আমার বলতে পারেন? আমার রোগ তো ওরা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও সারাতে পারেনি। তাহলে ওদের কথা আমি শুনব কেন?'

'আপনার কী রোগ সারাতে পারেননি তাঁরা?'

'আমার সব রোগই তো পেটে, সারাটা জীবন।'

'পেটে কী? ব্লিডিং?'

'এমনি তেমনি ব্লিডিং! যতবার হেঁচকি দিই ততবার রক্ত দেখতে পাই। একটা শরীরে যে এত রক্ত ধরতে পারে আমার কোনো ধারণা ছিল না।'

'পেটে ব্লিডিংয়ের জন্য আপনি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন?'

'একবার? বেশ কয়েকবার।' হঠাৎ মুখ বন্ধ করলেন সুবীর বাবু। কয়েক সেকেন্ড পর বললেন, 'আপনার বয়স কত, বাপ? ডাক্তার হবার মতো যথেষ্ট বয়স হয়েছে বলে তো মনে হচ্ছে না।'

'আমি সার্জেন।'

'সার্জেন? আরে না, তা কী করে হয়। আবার আমি একজন সার্জেনের খপ্পরে পড়লাম কীভাবে! ওরা অনেক দিন হলো আমাকে রাজি করাতে চেষ্টা করছে, আমি যেন ওটা ফেলে দিই। আর আমার উত্তর ছিল, জান থাকতে নয়। অসম্ভব, এটা আমি নিজের ভেতর থেকে বের করতে রাজি না।'

'আপনার দুবছর ধরে আলসার আছে?'

'আরেকটু পুরোনো। হঠাৎ কোনো কারণ ছাড়াই ব্যথা শুরু হয়। সন্দেহ করি বদহজম হয়েছে, কিন্তু ব্লিডিং শুরু হতে বুঝতে পারি, তা না...'

দুবছরের ইতিহাস, তার মানে আলসার হবে, ক্যানসার নয়। 'তারপর আপনি হাসপাতালে গেলেন?'

'ওরা আমার কম চিকিৎসা করেনি। বুদ্ধিও কম দেয়নি। মসলা খাবেন না, ধোঁয়া গিলবেন না। সব শুনেছি। লাভ হয়েছে বৈকি! লাভের নাম ঘোড়ার ডিম।'

'এক বছর পর আবার আপনাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হলো?'

'হ্যাঁ, একেবারে সেই রাজধানীতে গিয়ে। আকাশের ওপর হাসপাতাল। হাত বাড়ালে চাঁদ ধরার অবস্থা, দু শ বিয়াল্লিশ তলা।'

'হাসপাতালের ওরা বলল অপারেশন করতে হবে?'

'ওদের আমার চেনা আছে, রোগী দেখলেই ছুরির দিকে হাত চলে যায়। ওদের বললাম, কবর পর্যন্ত অক্ষতই থাকতে চাই। রক্ত যত পারে পড়ুক না।'

'হাসপাতাল থেকে কবে বেরোলেন?'

'আগস্টে, মনে আছে। আগে-পরে কিছু বলতে পারব না।'

'আর সেই থেকে ডাক্তারদের পরামর্শ উপেক্ষা করে ধূমপান করছেন, আজেবাজে খাবার খাচ্ছেন, তাই তো?'

'আপনার লেকচার শুনতে আমার বয়ে গেছে। সত্তরের বেশি বয়স আমার। সব ভুল খাবার খাচ্ছি। সব ভুল কাজ করছি। এটাই আমার ধরন। এই ধরন আমাকে টিকিয়ে রাখতে পারলে রাখল, না পারলে নামিয়ে দিক কবরে, আমার তাতে কিচ্ছু আসে যায় না।'

'কিন্তু আপনার তো ব্যথা হয়,' বললেন নওয়াব, ভ্রু কুঁচকালেন।

'হয় না আবার। বিশেষ করে যদি খালি পেটে থাকি। তবে

সেটা থামানোর একটা উপায় জানি আমি।'

'তাই?'

'হ্যাঁ। অ্যাসপিরিন।'

'অ্যাসপিরিন?'

'একদম। ভারি সুন্দর কাজ করে।'

'কটা অ্যাসপিরিন খান আপনি?'

'অনেকগুলো, শেষের দিকে—সারা দিনে এক বোতল লেগে যায়। ওগুলো বোতলেও পাওয়া যায়, জানেন তো?'

মাথা ঝাঁকালেন নওয়াব। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে তাঁর অ্যাসিড বেশি। 'আপনাকে কেউ বলেনি, অ্যাসপিরিন ব্লিডিং আরও বাড়িয়ে দেয়?'

'বলেনি আবার! আমি কান দিইনি। কারণ ওটা ব্যথা কমায়। ওটার সঙ্গে খানিক স্পিরিট।'

'স্পিরিট অনেক রকম আছে, ওগুলোয় মিথানলও থাকে।'

'সেটা তেমন ক্ষতি করে না, নাকি করে?' জানতে চাইলেন সুবীর বাবু, গলার স্বরে হঠাৎ উদ্বেগ।

'করে তো। আপনাকে অন্ধ করে দিতে পারে। এমনকি মৃত্যুর কারণও হতে পারে।'

'আরে, কী জ্বালা। আমাকে ওটা ভালো থাকতে সাহায্য করে, তাই নিই আরকি।'

'এই অ্যাসপিরিন আর স্পিরিট আপনার ওপর খারাপ প্রভাব ফেলে না? শ্বাস-প্রশ্বাসে সমস্যা হয় না?'

'এখন যখন বলছেন, হ্যাঁ, শ্বাস ছোট হয়ে গেছে। কিন্তু তাতেই বা কী আসে-যায়, এই বয়সে খুব বেশি শ্বাস আমার দরকারও নেই।' একটা হাই তুলে চোখ বুজলেন সুবীর বাবু। 'আপনি দেখছি প্রশ্নের সচল গুদাম, বাপ। আমি এখন ঘুমাই।'

কাঁধ ঝাঁকালেন নওয়াব, তারপর স্যুট থেকে বেরিয়ে, টানেল হয়ে মেইন রুমে ফিরে এলেন, সহকারীর দিকে ফিরে বললেন, 'বন্ধু সুবীর বাবুর আলসার আছে, দু বছরের পুরোনো। আরও দু ইউনিট রক্ত দিন, তারপর দেখব কী হয়...'

নরম আওয়াজে বেল বাজল।

'কী ওটা?'

'বারো ঘণ্টা পুরো হবার সংকেত। এর মানে হলো আমাদের কাপড় পাল্টাতে হবে। এর আরেকটা মানে, আপনাকে কনফারেন্সে যেতে হবে।'

'তাই নাকি? কোথায়?'

'ডাইনিং রুমের ওদিকে, সিআর-এ।'

মাথা ঝাঁকালেন নওয়াব, কামরা ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন।

প্রকল্প দাবানলের ডেল্টা সেক্টরে কয়েক ডজন সচল কম্পিউটার নিয়ে কাজ করছেন ক্যাপটেন ইসহাক জামিল। কনসোলে নতুন একটা প্রোগ্রাম ঢোকালেন। ক্যাপটেন জামিল একজন প্রোগ্রামার। লেভেল ১-এর নির্দেশ পেয়ে ডেল্টা সেক্টরে এসেছেন তিনি, কারণ গত নয় ঘণ্টা ধরে কোনো এমসিএন মেসেজ আসছে না।

কম্পিউটারকে জিজ্ঞেস করতে জবাব পাওয়া গেল, সংশ্লিষ্ট প্রতিটি সার্কিট ঠিকমতো কাজ করছে। সন্তুষ্ট হলেন ক্যাপটেন জামিল, টেলিপ্রিন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

তাঁর জানার কথা নয় যে ত্রুটি সত্যি একটা আছে, তবে সেটা নিখাদ মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল নয়, আর তাই চেক প্রোগ্রামের সাহায্যে টেস্ট করে যাবে না। ত্রুটিটা রয়েছে টেলিপ্রিন্টার বক্সে। ওখানে, রোল করা কাগজের কিনারা থেকে অতি নগণ্য একটা টুকরো বিচ্ছিন্ন হয়ে বেরিয়ে এসেছে, তারপর ওপর দিকে বাঁকা হয়েছে, আটকে গেছে বেল আর স্ট্রাইকারের মাঝখানে, ফলে বেলটাকে বাজতে দিচ্ছে না। আর সে জন্যই এমসিএন ট্রান্সমিশন রেকর্ড হচ্ছে না।

না মেশিন, না মানুষ, কেউ ভুলটা ধরতে পারছে না।

১৭. দুপুর বারোটার কনফারেন্স

প্রটোকল অনুসারে প্রতি বারো ঘণ্টায় সংক্ষিপ্ত কনফারেন্সে বসবে টিম, যেখানে ফলাফলের সারমর্ম বের করা হবে, প্ল্যান করা হবে নতুন নতুন দিক। সময় বাঁচানোর জন্য ক্যাফেটেরিয়ার লাগোয়া একটা কামরায় বসার ব্যবস্থা, খাওয়া এবং কথা বলা যাতে একসঙ্গে চলতে পারে।

সার্জেন উত্তম নওয়াব সবার শেষে পৌঁছালেন। চেয়ার টেনে বসলেন, টেবিলে ইতিমধ্যে তাঁর লাঞ্চ চলে এসেছে—দু গ্লাস তরল, আলাদা আলাদা রঙের তিনটে ট্যাবলেট।

নড়েচড়ে বসে ডক্টর মুশফিক বললেন, 'আমরা প্রথমে ডক্টর জাহানের কথা শুনব।'

ধীর, ইতস্তত ভঙ্গিতে নিজের অভিজ্ঞতা আর কাজের ফলাফল জানালেন সদয় জাহান। প্রথমেই বললেন, ভয়ংকর এজেন্টের আকার বের করতে সফল হয়েছেন তিনি, সেটা হলো এক মাইক্রন।

মুশফিক আর বাবর দৃষ্টি বিনিময় করলেন। সবুজ যে দাগ তাঁরা দেখেছিলেন সেটা ওটার চেয়ে আরও অনেক বড় ছিল: তার মানে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ওই সবুজ দাগের অতি সামান্য অংশের মাধ্যমেও রোগটা ছড়াতে পারে।

সদয় জাহান এরপর ব্যাখ্যা করলেন, আলোচ্য রোগজীবাণু বাতাসের মাধ্যমে ছড়াচ্ছে এবং রক্ত জমাট বাঁধার ঘটনাটা শুরু হচ্ছে ফুসফুস থেকে। রক্তের জমাট বাঁধার বিরুদ্ধে ওষুধ ব্যবহার করার কথাও জানালেন, ফলাফল আশাব্যঞ্জক হয়নি।

'ময়নাতদন্তের ব্যাপারটা কী?' বললেন মুশফিক। 'ওগুলোয় কী দেখা যাচ্ছে?'

'আমরা জানি না এমন কিছু নেই। রক্ত পুরোপুরি জমাট বাঁধে। লাইট মাইক্রোস্কোপ লেভেলে লক্ষণীয় কোনো অ্যাবনরমালিটি নেই।'

'আর জমাট বাঁধার শুরুটা হচ্ছে ফুসফুসে?'

'হ্যাঁ। ধরে নিতে হবে জীবাণু রক্তপ্রবাহের দিকে এগোয়, কিংবা ওগুলো হয়তো কোনো টক্সিক পদার্থ ছাড়ে, সেটা রক্তপ্রবাহের দিকে এগোয়। স্টেইন সেকশনের কাজ শেষ হলে জানা যাবে। রক্তবাহী শিরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কি না দেখতে হবে আমাদের, যেহেতু...'

মাথা ঝাঁকালেন মুশফিক, তাকালেন উত্তম নওয়াবের দিকে, নওয়াব তখন জানালেন তাঁর দুই রোগীর কী কী টেস্ট করা হয়েছে। বললেন, শিশুটির সব টেস্ট নরমাল; আর রক্তক্ষরণ হয় পেটে এমন আলসার আছে সুবীর বাবুর, সে জন্য তাঁকে রক্ত দেওয়া হচ্ছে।

'তিনি জেগেছেন,' বললেন নওয়াব। 'অল্প কিছুক্ষণ আলাপও করেছি।'

সবার শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল। সংক্ষেপে সুবীর বাবুর ইতিহাস বর্ণনা করলেন নওয়াব।

তিনি থামতে মুশফিক জানতে চাইলেন, 'তাঁর শরীরে এই যে এত অ্যাসিড জমেছে, সেটাই কি জীবাণুর হামলা থেকে রক্ষা করেছে তাঁকে?'

কাঁধ ঝাঁকালেন নওয়াব। 'বলা অসম্ভব।'

'আর শিশুটি বেঁচে আছে কীভাবে?' জানতে চাইলেন সম্রাট বাবর। 'ও কি রক্তশূন্যতায় ভুগছে?'

'না,' বললেন নওয়াব। 'আমরা কিন্তু জানি না দুজন একই মেকানিজমের দ্বারা সুরক্ষা পাচ্ছে কি না। এমনও হতে পারে যে দুজন বেঁচে আছে সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা কারণে।'

'এখানে আরেকটা কথা আমার মনে পড়ে যাচ্ছে,' বললেন মুশফিক। 'রোগজীবাণু প্রাণ কেড়ে নিতে পারেনি, হাতিমারায় এমন মানুষ কিন্তু মাত্র দুজন ছিল না, ছিল চারজন কিংবা

হয়তো আরও বেশি। জঙ্গিদের মা একজন, আরেকজন ললিতা বানু। ওই শিশু আর সুবীর বাবুর মতো তাঁরাও হয়তো এখন বেঁচে থাকতেন, কিন্তু আত্মহত্যা করায় তা আর সম্ভব হয়নি।'

সদয় জাহান বললেন, 'ললিতা বানুর ব্যাপারে, তাঁর হার্ডডিস্ক...'

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে মুশফিক বললেন, 'ব্যক্তি হিসেবে ওই মেয়েটির প্রতি সহানুভূতি রয়েছে আমার। মেয়েটি যেহেতু অনভিজ্ঞ ছিলেন, তাই এমন সব কথা লিখে গেছেন, পড়ে মানুষ তাঁকে ভুল বুঝবে। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি ওই লেখা নষ্ট করা ফেলা হবে, তাঁর হার্ডডিস্কসহ—ওটায় কী আছে তা কারও জানার দরকার নেই।'

কামরার ভেতর গভীর নীরবতা নেমে এল। এ বিষয়ে কোনো রকম মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকছেন সবাই।

তবে সদয় জাহান এবার অন্য একটা প্রসঙ্গ তুললেন। 'রোগটা দেশের ভেতর কীভাবে ছড়াচ্ছে, ইতিমধ্যে কতদূর পর্যন্ত ছড়িয়েছে, কী রকম ক্ষতি করছে, এসব জানার উপায় কী?'

ডক্টর মুশফিক যেন প্রশ্নটা শোনার জন্য একদম তৈরি হয়ে ছিলেন। 'এসব জানার দরকার নেই,' ঠান্ডা সুরে বললেন তিনি। 'জানলে শুধু চোখের পানি ফেলব, তাই তো? কিন্তু আমরা এখানে চোখের পানি ফেলতে আসিনি, এসেছি একটা সংক্রামক রোগকে থামানোর চেষ্টা করতে। সেই কাজটাই ঠিকমতো করি আসুন সবাই।'

'কিন্তু...'

'সব কথা জানলে শুধু কষ্ট পাব, আতঙ্কিত হব, কাজে উৎসাহ হারাব, আপনজনদের খবর না পেয়ে অস্থির হব এবং নিজেদের কাজের প্রতি অবহেলা বাড়তে থাকবে। কাজেই কী দরকার জেনে?'

'তবে বিজ্ঞানীরাও মানুষ, তাঁরাও ভয় পান...'

'কী ভয় আপনার, ব্যাখ্যা করুন,' সদয় জাহানের দিকে ফিরে জানতে চাইলেন মুশফিক।

'না, মানে, আমরা জেনেছি যে প্লেগটা বালিয়াড়ি পার হয়ে জাহাজডুবির দিকে ধেয়ে আসছে...'

'হ্যাঁ,' বললেন মুশফিক, 'ঠিকই শুনেছেন, রোগটা সত্যি আমাদের দিকে ছুটে আসছে। তাতে কী হলো? আমরা কত বড় ভাগ্যবান, ভেবে দেখেছেন? গোটা দেশের সমুদয় প্রাণিসম্পদ নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার হুমকির মুখে পড়েছে, পশু বলুন পাখি বলুন মানুষ বলুন কারও কোথাও পালিয়ে বাঁচার জায়গা নেই—কিন্তু এই পাতালে আমরা যারা আছি তারা সবাই সম্পূর্ণ নিরাপদ, কারণ জীবাণুটা প্রকল্প দাবানলের এই পাতালে কোনোভাবেই ঢুকতে পারবে না।'

ডক্টর মুশফিকের কথায় তথ্য-সম্পর্কিত একটু বিভ্রান্তি সৃষ্টি হলো না কি? তিনি দাবি করছেন এই রোগজীবাণু প্রকল্প দাবানলের ভেতর ঢুকতে পারবে না, কিন্তু তাঁরা কি আগেই সেটাকে ভেতরে নিয়ে আসেননি?

কামরা নীরব হয়ে গেছে।

ডক্টর মুশফিক আবার বললেন, 'যেহেতু সারা দেশে বলতে গেলে আমরাই শুধু নিরাপদ, কাজেই বাকি সবাইকে বাঁচাতে দম না ফেলে কাজ করতে হবে আমাদের।'

কামরার ভেতর একটা গুঞ্জন উঠল, সেটাকে সমর্থনসূচক বলেই মনে হলো।

পনেরো সেকেন্ড পর ডক্টর মুশফিকই আবার মুখ খুললেন। 'শিশুটির অ্যাসিড-বেস ব্যালেন্স?'

'নরমাল,' বললেন নওয়াব। 'অন্তত এখন।'

আবার নীরব হয়ে গেল কামরা।

অবশেষে মুশফিক বললেন, 'কিছু ভালো সূত্র আমরা পেয়েছি বটে, তবে আবিষ্কার করতে না পারার সমস্যা রয়েই গেল : ওই বৃদ্ধ আর শিশুর মধ্যে কী এমন জিনিস মেলে, যেটা রোগজীবাণুকে সুবিধে করতে দেয়নি। দুজনের মধ্যে একই জিনিস, তা হয়তো নয়।'

মাথা ঝাঁকালেন নওয়াব।

মুশফিকের দিকে ফিরে ডক্টর জাহান বললেন, 'আর ক্যাপসুলে আপনি কী পেলেন?'

'সেটা বরং দেখাই আপনাদের,' বললেন মুশফিক।

'কী দেখাবেন?'

'এমন কিছু, আমাদের বিশ্বাস, জীবাণুর প্রতিনিধিত্ব করছে,' বললেন মুশফিক।

দরজায় লেখা মরফলজি। ভেতরে একটা পার্টিশন দেওয়া কামরা, যেখানে এক্সপেরিমেন্টাররা দাঁড়ানোর একটা জায়গা পান, আর পাশেই রয়েছে কাচের দেয়াল দেওয়া আইসোলেশন চেম্বার। হাতে পরার জন্য গ্লাভ দেওয়া হয়, বিজ্ঞানীরা যাতে চেম্বারের নাগাল পেতে পারেন এবং ইন্সট্রুমেন্ট নাড়াচাড়া করতে পারেন।

হাত তুলে কাচের ডিশটা দেখালেন মুশফিক, ভেতরে ছোট একটা কালো কণা রয়েছে। 'আমরা ধারণা করছি ওটা আমাদের উল্কা,' বললেন তিনি। 'ওটার সারফেসে এমন কিছু পেয়েছি আমরা, যেটাকে জীবিত বলে মনে হয়েছে। ক্যাপসুলের ভেতর আরও এলাকা আছে যেগুলো প্রাণের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। লাইট মাইক্রোস্কোপের নিচে ফেলে পরীক্ষা করার জন্য উল্কাটা আমরা নিয়ে এসেছি।'

গ্লাভ পরা হাত বাড়িয়ে বড় একটা ক্রোম বক্সের খোলা দিকে কাচের ডিশটা বসালেন মুশফিক, তারপর হাতটা টেনে নিলেন।

'ওই বাক্স,' বললেন তিনি, 'স্রেফ একটা লাইট মাইক্রোস্কোপ, তাতে ফিট করা আছে ইমেজ ইনটেনসিটিফায়ার আর রেজল্যুশন স্ক্যানার। ওটার সঙ্গে আমরা হাজার ডায়ামিটার পর্যন্ত উঠতে পারি, এখানের এই স্ক্রিনে দেখা যাবে...'

ডক্টর বাবর ডায়ালগুলো অ্যাডজাস্ট করছেন, ডক্টর জাহান আর বাকিরা তাকিয়ে আছেন ভিউয়ার স্ক্রিনে।

'টেন পাওয়ার,' বললেন বাবর।

স্ক্রিনে নওয়াব দেখতে পাচ্ছেন পাথরটা এবড়োখেবড়ো, কর্কশ, কালচে, ভোঁতা। আঙুল দিয়ে সবুজ কণাটা দেখালেন মুশফিক।

'হান্ড্রেড পাওয়ার।'

সবুজ কণা এখন আকারে বড়, খুব পরিষ্কার।

'আমরা মনে করছি ওটাই আমাদের জীবাণু। ওটাকে আমরা গজাতে আর বাড়তে দেখেছি। বেগুনি হয়ে উঠেছিল, মনে হয়েছে মাইটোটিক ডিভিশনের মুহূর্তে।'

'স্পেকট্রাম শিফট?'

'একটা কিছু হবে।'

'ওয়ান থাউজেন্ড পাওয়ার,' বাবর বললেন।

মাত্র একটা সবুজ বিন্দুতে ভরাট হয়ে গেছে স্ক্রিন, পাথরের কর্কশ ফুটো-ফাটায় বাসা বেঁধে আছে। সবুজের সারফেসটা লক্ষ করলেন নওয়াব, মসৃণ আর চকচকে, প্রায় তেলতেলেই বলা যায়।

'আপনি বলছেন ওটা একটা ব্যাকটেরিয়াল কলোনি?'

'কলোনি বলতে প্রচলিত যে ধারণা আছে তার সঙ্গে মিলবে কি না নিশ্চিত নই আমি,' মুশফিক বললেন। 'ডক্টর জাহানের এক্সপেরিমেন্ট কী বলে না জানা পর্যন্ত ওটাকে আমরা একদমই কলোনি বলতে পারছি না। আমরা ভেবেছিলাম ওটা নিঃসঙ্গ একটা জীবাণু। কিন্তু জানা কথা যে সিঙ্গেল ইউনিটকে আকারে এক মাইক্রন বা আরও ছোট হতে হবে, কিন্তু এটা তার চেয়ে অনেক বড়। অতএব, এটা সম্ভবত বড় একটা কাঠামো—হতে পারে একটা কলোনি, হতে পারে

সম্পূর্ণ অন্য কিছু।'

তাঁরা তাকিয়ে আছেন, বিন্দুটা বেগুনি হয়ে গেল, তারপর আবার সবুজ। 'ওটা এখন ভাগ হচ্ছে,' বললেন মুশফিক। 'চমৎকার।'

বাবর ক্যামেরার বোতাম চাপলেন।

'এবার ভালো করে তাকান।'

বিন্দুটা বেগুনি হবার পর রংটা ধরে রাখল। মনে হলো একটু যেন বেড়েছে এবং এক মুহূর্তের জন্য সারফেস ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল, প্রতিটির আকৃতি ছয় কোনা, যেন মেঝেতে বসানো টাইলস।

'ব্যাপারটা দেখলেন আপনারা?'

'মনে হলো ভেঙে যাচ্ছে।'

'ছয় কোনা আকৃতি নিয়ে।'

'ওই আকৃতিগুলো, আমি ভাবছি,' বললেন মুশফিক, 'সিঙ্গেল ইউনিটের প্রতিনিধিত্ব করছে কি না।'

'সব সময় নিয়মিত জ্যামিতিক আকৃতি নিয়ে থাকে, নাকি শুধু ভাগ হবার সময়?'

'আমরা আরও জানব,' মুশফিক বললেন। 'ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ কী বলে দেখার পর।' ডক্টর জাহানের দিকে ঘুরে গেলেন তিনি। 'ময়নাতদন্তের কাজ কি শেষ হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'স্পেকট্রোমিটার অপারেট করতে পারেন?'

'মনে হয় পারব।'

'তাহলে কাজটা সারুন। ভালো কথা, ওটা কম্পিউটারাইজড। পাথর আর সবুজ জীবাণু, দুটোরই অ্যানালাইসিস চাই আমাদের।'

'এক পিস আমাকে দেবেন আপনি?'

'দিচ্ছি,' বললেন মুশফিক, তারপর বাবারকে বললেন, 'এএ অ্যানালাইজার চালাতে পারবেন?'

'পারব।'

'তাতে ওই একই টেস্ট।'

'এবং একটা ফ্র্যাকশেনেশন?'

'তাই ভাবছি,' বললেন মুশফিক। 'তবে সেটা আপনাকে হাতে করতে হবে।'

মাথা ঝাঁকালেন বাবর; আইসোলেশন চেম্বারের দিকে পেছন ফিরলেন মুশফিক, লাইট মাইক্রোস্কোপ থেকে বের করে আনলেন একটা গ্লাস ডিশ, সরিয়ে রাখলেন এমন একটা ছোট ডিভাইসের নিচে, যেটা দেখতে খুদে মাচার মতো। এটা হলো মাইক্রোসার্জিক্যাল ইউনিট।

বায়োলজিতে নতুন জাদু দেখাচ্ছে মাইক্রোসার্জারি, এই নৈপুণ্য আর দক্ষতার সাহায্যে একক একটি কোষে সূক্ষ্ম অপারেশন চালানো সম্ভব হয়। মাইক্রোসার্জারির টেকনিক ব্যবহার করে একটা কোষ থেকে নিউক্লিয়াস বের করে আনা সম্ভব, কিংবা বের করে আনা যায় সাইটোপ্লাজমের অংশবিশেষ।

কালো পাথরটাকে ভাঙতে শুরু করেছেন মুশফিক। খুদে দুটো টুকরো পাওয়া গেল। আলাদা একটা গ্লাস ডিশে ভরে সরিয়ে রাখলেন। এবার সবুজ এলাকা থেকে দুটো কণা ভেঙে বের করে আনলেন।

সঙ্গে সঙ্গে সবুজ বেগুনি হয়ে গেল এবং প্রসারিত হলো।

'আপনাকে ওটা পছন্দ করছে না,' বললেন বাবর, তারপর হেসে উঠলেন।

ভ্রু কুঁচকে আছেন মুশফিক। 'ইন্টারেস্টিং কিন্তু। আপনি কি বলবেন যে একটা ননস্পেসিফিক গ্রোথ সাড়া দিচ্ছে?'

'আমার ধারণা,' বাবর বললেন, 'খোঁচাখুঁচি ভালো লাগেনি ওটার।'

'তার মানে অবশ্যই আরও তদন্ত করতে হবে,' বললেন ডক্টর মুশফিক।

১৮. বিধ্বস্ত

ফোন বাজছে। স্ত্রীকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলে মেজর তুষার আবদুল্লাহ রিসিভার তুললেন। 'হ্যালো।'

'মেজর, আমি ইউনিট এইটের কর্নেল কাওসার আলি।'

'ইয়েস, কর্নেল?'

'মেজার আবদুল্লাহ, আপনাকে আমি জানাচ্ছি যে বিয়াল্লিশ মিনিট আগে বান্দরবানে একটা প্লেন ক্র্যাশ করেছে।'

ভ্রু কুঁচকালেন মেজর। ট্রেনিং মিশনে গিয়ে কোনো প্লেন যদি ক্র্যাশ করে, খবরটা তাঁকে জানানোর কারণ কী? এসব দেখার দায়িত্ব তো তাঁর নয়।

'কী প্লেন ওটা?'

'মরীচিকা, মেজর। পাইলট হাতিমারার ওপর একটা চক্কর দিয়েছেন বলেও শোনা যাচ্ছে।'

'ও মাই গড! কখন?'

'ক্র্যাশ করার বিশ মিনিট আগে।'

'কত উঁচুতে ছিল, ক্র্যাশ করার সময়?'

'তেইশ হাজার ফুট, মেজর।'

'কর্নেল, আপনি আমাকে খবর দিচ্ছেন ঘাঁটি থেকে নির্দেশ পেয়ে?'

'হ্যাঁ, মেজর। পোস্ট টিম রওনা হতে যাচ্ছে, আপনাকে ওই টিমে থাকতে বলা হয়েছে।'

'টিম কখন রওনা হবে?'

'আধ ঘণ্টার মধ্যে, মেজর, দেওগাঁ বেস থেকে।'

'ঠিক আছে, ধন্যবাদ, কর্নেল। আমি পৌঁছে যাব।' ফোন কেটে দিয়ে আপনমনে গজগজ করছেন মেজর আবদুল্লাহ। হাতিমারা ভয়ংকর বিপদের একটা উৎস, সেটাকে পুষে রাখা হচ্ছে...কী ব্যাপার? না, নিজের দেশে অ্যাটম বোমা ব্যবহার করতে রাজি নন প্রধানমন্ত্রী। এখন বোঝো ঠেলা। ওই বোমা দুদিন আগেই ফেলা উচিত ছিল।

কাজের ধারা নিয়ে যতই অস্বস্তি বোধ করুন মেজর আবদুল্লাহ, অফিশিয়ালি তিনি কোনো মতামত দিতে পারেন না। নতুন পাইলটের হাতে প্লেন বিধ্বস্ত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়, এই প্রথম ঘটছে না। মরীচিকার পাইলট হয়তো নার্ভাস হয়ে পড়েছিল, আর তাতেই প্লেনের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে।

পোস্ট টিম রওনা হয়ে গেল। কুমিল্লার দেওগাঁ থেকে বান্দরবান যাচ্ছে শিকারি বাজ হেলিকপ্টার গানশিপ। যাবার পথে মরীচিকা ফ্লাইটের ট্রান্সমিশন ট্রান্সক্রিপ্ট শুনছেন টিমের সদস্যরা, বার্তা বিনিময় হয়েছে মরীচিকা আর পতেঙ্গা বিমানঘাঁটির ফ্লাইট কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে। বেশির ভাগ আলাপই রুটিন, তাই একঘেয়ে। তবে শেষ দিকে, চরম কয়েকটা মুহূর্তে, পরিস্থিতি রুদ্ধশ্বাস হয়ে দাঁড়াল।

পাইলটকে বলতে শোনা গেল, 'খারাপ কিছু একটা ঘটছে।'

এক মুহূর্ত পর আবার তারই গলা, 'আমার রাবারের এয়ার হোস বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে। এটা নিশ্চয় ভাইব্রেশন। জিনিসটা আমার চোখের সামনে স্রেফ গুঁড়ো...ধুলো হয়ে যাচ্ছে...'

সম্ভবত দশ সেকেন্ড পর একটা দুর্বল গলা শোনা গেল, নিস্তেজ হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে, 'ককপিটে যা কিছু রাবারের, সব ধুলো হয়ে যাচ্ছে...'

এরপর আর কোনো ট্রান্সমিশন নেই।

সংক্ষিপ্ত এই রিপোর্টটা কল্পনায় বারবার শুনছেন মেজর আবদুল্লাহ—প্রতিবার আরও বেশি বিস্ময়কর এবং আতঙ্কজনক বলে মনে হতে লাগল। জানালা দিয়ে বনভূমি ঘেরা পাহাড়সারির দিকে তাকালেন। সূর্য ডুবেবে। লালচে রোদ শুধু

পাহাড়ের মাথায় লাগছে, নিচের উপত্যকা গাঢ় ছায়ায় ঢাকা।

কপ্টার থেকে হেলিপ্যাডে নামতে হলো, বাকি রাস্তা জিপে চড়ে যেতে হবে। ওদের গন্তব্য দুর্গম এলাকা, শিকারি বাজের ল্যান্ড করার মতো যথেষ্ট জায়গা পাওয়া যাবে না।

কাঁচা রাস্তা ধরে ছুটছে দুটো লিমোজিন, পেছনে ধুলোর মেঘ তৈরি হচ্ছে। বিশ মিনিট পর অকুস্থলে পৌছাল টিম।

মেজর জানতে চাইলেন, 'দাবানলকে জানানো হয়েছে?'

টিমের এক সদস্য, একজন সাইকিয়াট্রিস্ট, মাথায় ছোট করে ছাঁটা চুল, বললেন, 'কাদের কথা বলছেন, ওই যারা জীবাণু নিয়ে খেলা করে?'

'হ্যাঁ।'

'ওদের জানানো হয়েছে,' কেউ একজন জানাল। 'এক ঘন্টা আগে।'

মেজর ভাবলেন, তাহলে তো প্রতিক্রিয়া একটা হতেই হবে। এটাকে অগ্রাহ্য করার সামর্থ্য কারও নেই।

কিন্তু যদি পাঠানো মেসেজ পড়ার সুযোগ না পান তাঁরা? এ রকম কোনো প্রশ্ন অবশ্য মেজরের মনে উদয় হবার কোনো কারণ নেই।

'ওই যে ক্র্যাশ সাইট দেখা যাচ্ছে,' কেউ একজন বলল। 'আরেকটু বাঁয়ে।'

বিধ্বস্ত মরীচিকা তিন বর্গকিলোমিটার জায়গাজুড়ে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। পুড়ে কালো কয়লা হয়ে থাকা বাম ডানার পাশে দাঁড়িয়ে চারদিকে চোখ বুলাচ্ছেন মেজর। অপর ডানাটা টিমের এক সদস্য আধ কিলোমিটার দূরে দেখতে পেল। যেদিকেই তাকাচ্ছেন তাঁরা মোচড়ানো স্টিলের টুকরো-টাকরা চোখে পড়ছে।

যেটুকু অবশিষ্ট আছে তা থেকে কিছু বুঝতে পারা অসম্ভব। ককপিট, ফিউজিলাজ, পাইলটের চাঁদোয়া—সব লাখ লাখ টুকরো হয়ে উড়ে গেছে। সবকিছু অচেনা করে তুলতে আগুনও কম বড় অবদান রাখেনি।

সূর্য যখন একদমই ডুবে যাচ্ছে, মেজরকে দেখা গেল টেইল সেকশনের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন, আগুনে পোড়া মেটাল থেকে এখনো তাপ ছড়াচ্ছে। মাটিতে আধ গাঁথা হাড় দেখতে পাচ্ছেন তিনি। ঝুঁকে সেটা তুললেন, তারপর আকস্মিক আতঙ্কের সঙ্গে উপলব্ধি করলেন ওটা একজন মানুষের। লম্বা, ভাঙা, পুড়ে প্রায় কয়লা, এটা নিশ্চয় কারও পা বা হাত। তবে জিনিসটা আশ্চর্য করে দেওয়ার মতো পরিষ্কার—ওটার কোথাও এতটুকু মাংস লেগে নেই, শুধুই মসৃণ একটা হাড়।

রাত নামল। টিমের সদস্যরা শক্তিশালী টর্চ ব্যবহার করছেন। গোটা এলাকায় মরীচিকার যা কিছু আছে সব দেখতে হবে তাঁদের।

বায়োকেমিস্ট ভদ্রলোকের নাম জানেন না মেজর, শুনতে পেলেন কী যেন জিজ্ঞেস করছেন তিনি। 'ইয়েস?'

'না, বলছিলাম কী, ব্যাপারটা মজার,' বললেন বায়োকেমিস্ট। 'পাইলটের ওই কথাটা—ককপিটের রাবার সব ধুলো হয়ে উড়ে যাচ্ছে।'

'মানে! কী বলতে চাইছেন?'

'না, মানে, জানেনই তো, অ্যারোপ্লেনে কোনো রকম রাবার ব্যবহার করা হয় না। সবই সিনথেটিক প্লাস্টিক কম্পাউন্ড। জিনিসটা পলিমার, যার মধ্যে রয়েছে কি না হিউম্যান টিস্যুর সঙ্গে মিলে যায় একই ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। খুব বেশি ফ্লেক্সিবল, প্রচুর কাজে ব্যবহার করা যায়।'

'কী মনে করেন, ভাইব্রেশন থেকে এ রকম হতে পারে?'

'কী করে, না,' ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন। 'সারা পৃথিবীতে আমাদের তৈরি হাজার হাজার মরীচিকা আকাশ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। ওগুলোর সবগুলোতে এই প্লাস্টিক ব্যবহার করা হয়েছে। একটাতেও এ রকম কোনো সমস্যা দেখা দেয়নি।'

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না,' মাথা নাড়তে নাড়তে আরেক দিকে চলে গেলেন বায়োকেমিস্ট।

১৯. রুটিন

ধীরে ধীরে রুটিনে ফিরে যাচ্ছে দাবানল স্থাপনা। পাতালে তৈরি ল্যাবরেটরিগুলোর একটা নিজস্ব ছন্দ আছে, সেখানে রাত বা দিন বলে কিছু নেই, নেই সকাল বা বিকেল। মানুষ এখানে ঘুমান যখন বা যদি তাঁর ঘুম পায়, ঘুম থেকে জাগেন যখন শরীরটা তাজা হয়ে ওঠে, কাজ শুরু করেন যাঁর যাঁর সাবজেক্টের ওপর।

ডক্টর সদয় জাহান একটা ঘরে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর সামনে কিছু মেশিনপত্র দেখা যাচ্ছে। তিনি ভাবছেন, যেহেতু আলাদা এলিমেন্ট পোড়ার সময় আলো আলাদা ওয়েভলেন্থ দেয়, তাহলে তো একটা পদার্থের কেমিক্যাল মেকআপ অ্যানালাইজ করা সম্ভব আলো যে স্পেকট্রাম তৈরি করে সেটা অ্যানালাইজ করার মাধ্যমে।

থিওরির দিক থেকে এটা পানির মতোই সহজ, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে স্পেকট্রোমেট্রিগ্রাম পড়া অনেক জটিল ও কঠিন। দাবানল প্রকল্পে কারুরই এই কাজ করার ট্রেনিং নেওয়া নেই। কাজেই সমস্ত ফলাফল কম্পিউটারকে সরবরাহ করা হলো, এরপর অ্যানালাইসিসের কাজটা করুক ওটা।

কালো পাথরের প্রথম কণাটা ভ্যাপোরাইজারে রাখলেন সদয় জাহান, তারপর চাপ দিলেন বোতামে। উত্তপ্ত আলোর একটি মাত্র তাৎক্ষণিক উজ্জ্বল বিস্ফোরণ ঘটতে দেখা গেল—ঘুরে গেলেন তিনি, উজ্জ্বলতা এড়াতে চাইছেন, তারপর দ্বিতীয় কণাটা রাখলেন ল্যাম্পে। ইতিমধ্যে, তিনি জানেন, প্রথম কণা থেকে পাওয়া আলো নিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছে কম্পিউটার।

সবুজ কণা নিয়েও প্রক্রিয়াটা পুনরাবৃত্তি করলেন তিনি, তারপর সময় দেখলেন। কম্পিউটার এই মুহূর্তে সেলফ-ডেভেলপিং ফটোগ্রাফিক প্লেট স্ক্যান করছে, ওগুলো কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে দেখার জন্য তৈরি হয়ে যাবে। স্ক্যানের কাজ শেষ হতে কম করেও দু ঘণ্টা লাগবে। স্ক্যান শেষ হলে ফলাফল বিশ্লেষণ করবে কম্পিউটার, মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ছেপে দেবে সব ডেটা।

ঘড়ি বলছে ১৫০০ ঘণ্টা—বেলা তিনটে। হঠাৎ করে উপলব্ধি করলেন খুব ক্লান্ত তিনি। বোতাম টিপে কম্পিউটারকে বলে দিলেন বিশ্লেষণের কাজ শেষ হলে ওটা যেন তাঁকে জাগিয়ে দেয়।

তারপর তিনি বিছানার দিকে চলে গেলেন।

আরেক কামরায় ডক্টর বাবর ওই একই ধরনের কণা অন্য রকম একটা মেশিনে ঢোকাচ্ছেন। ওটা অ্যামিনো অ্যাসিড অ্যামালাইজার। অ্যামিনো অ্যাসিড হলো প্রোটিনের বিল্ডিং ব্লক।

ডক্টর মুশফিক অসীম ধৈর্যের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন। সবুজ একটা কণা নিয়ে উত্তপ্ত এবং গলে কাদা হয়ে থাকা প্লাস্টিকে ফেললেন। আকার ও আকৃতিতে ওই প্লাস্টিক মেডিসিন ক্যাপসুলের মতো। তাঁর কণা প্লাস্টিকের গায়ে ভালো করে না গাঁথা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন তিনি, তারপর ওটার ওপর আরও প্লাস্টিক ঢাললেন। সবশেষে প্লাস্টিক বড়িটা তিনি কিউরিং রুমে স্থানান্তর করলেন।

এই পদ্ধতি, মানে যেটাকে কিউর করা বলা হয়, যেকোনো বস্তুর (এখানে ওই সবুজ কণার) শক্তি, গন্ধ, কাঠিন্য ইত্যাদি

রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উন্নত করা হয় অত্যন্ত দ্রুতগতি প্রসেসিং ইউনিটের সাহায্যে। আর এতে সময় লাগবে পাঁচ ঘন্টা, তা না হলে সংগতি বজায় রেখে যথাযথ কাঠিন্য পাওয়া যাবে না।

প্লাস্টিক একবার শক্ত হলে, ওটাকে তিনি চেঁছে তুলে নেবেন আর তারপর মাইক্রোটোম দিয়ে সবুজের অতি সামান্য অংশ খসিয়ে নেবেন। ওটা যাবে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে। শুধু তখনই তিনি সবুজ জিনিসটার দিকে ষাট হাজার ডায়ামিটার ম্যাগনিফিকেশনে তাকাতে পারবেন। সেটা হবে, তিনি ভাবছেন, ভারি ইন্টারেস্টিং।

একটু অবসর পাওয়ায় ডক্টর জাহান ভাবছেন দেশের এখন কী অবস্থা কে জানে। এখনো কি লাখে লাখে মানুষ মারা যাচ্ছে? নাকি প্লাবনের মতো ছড়িয়ে পড়া মৃত্যুবীজ বিরতির মধ্যে গেছে, দু-চার দিন পর আবার নতুন উদ্যমে শুরু করবে? শেষ খবর তাঁরা জানেন দাবানলের দিকে এগিয়ে আসছিল অ্যান্ড্রোমেডা স্ট্রেইন। তা আসুক, তাঁদের আশ্বাস দিয়ে বলা হয়েছে, এই প্রকল্পের পাতালপুরীর স্থাপনায় হানা দিতে পারবে না কোনো জীবাণু—সেটা এক কথায় অসম্ভব।

কিন্তু ডক্টর জাহান নিজের নিরাপত্তা নিয়ে ভাবছেন না। তাঁর চোখ পানিতে ভরে উঠছে দেশের মানুষের কথা ভেবে। হাজার হাজার, লাখ লাখ মানুষ বিনা নোটিশে মারা যাচ্ছে, প্রতিহত করার এতটুকু সুযোগ না পেয়ে। এটা মানা না গেলেও মানতে হচ্ছে। এখনো কী অসহায় তাঁরা!

সত্যি কারও কিছু করার নেই। তাঁরা এখনো জানেন না ওই জীবাণুর কী বৈশিষ্ট্য, কিসে বাঁচে, কিসে মরে, কিসে নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

এই জীবাণু শুধু যে বাতাসের মাধ্যমে ছড়াচ্ছে, তা নয়, পানির মাধ্যমেও ছড়াচ্ছে, তা না হলে যেখানে যেখানে বৃষ্টি হলো সেখানে সেখানে ওই রোগ দেখা দিল কীভাবে?

ডক্টর জাহান ঠোঁট কামড়ে ধরে ভাবছেন, হাতিমারায় তাঁরা অ্যাটম ফেলেছেন ঠিকই (টেলিপ্রিন্টার মেশিনে ত্রুটি দেখা দেওয়ায় অনেক খবরই দাবানলে এসে পৌঁছায়নি, তার মধ্যে একটা হলো হাতিমারায় অ্যাটম বোমা ফেলতে প্রধানমন্ত্রী একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন, কিন্তু সে কথা দাবানলের বিজ্ঞানীদের কারও জানা নেই), কিন্তু সেটা ফেলতে সম্ভবত একটু দেরি করা হয়েছে। তা না হলে হাতিমারার জীবাণু সীমান্ত পার হয়ে ভারতে চলে গেল কীভাবে। সময়মতো বোমা ফেলে যদি জীবাণুর উৎস নিশ্চিহ্ন করে ফেলা যেত, ভারতীয় মেঘে তা আর উঠতে পারত না, বাংলাদেশে বৃষ্টি হলেও ওই রোগ অতগুলো জেলা-উপজেলায় ছড়াতে পারত না।

হাতিমারায় ছিল মূল উৎস, সেটা এখন আর নেই, অ্যাটমে পুড়ে গেছে। ওই জীবাণুর উৎস এখন আর ভারতেও নেই, কারণ শেষ খবরে জানা গেছে রোগটা ওখানে আর ছড়াচ্ছে না। ছড়াচ্ছে শুধু বাংলাদেশের আট কি দশটা জেলায়।

এটা একটা বিভীষিকা। এই আট-দশটা উৎস থেকে যদি অনবরত জীবাণু ছড়াতে থাকে, এশিয়ার সব মানুষ আক্রান্ত হলেও আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না। আর এখানে আক্রান্ত হওয়া মানে মারা যাওয়া।

দাবানল আরও একটা জায়গা, যেখান থেকে এই রোগজীবাণু ছড়াতে পারে, যদিও এ ধরনের কিছু যাতে না ঘটে সেদিকে খেয়াল রেখেই এই স্থাপনার ডিজাইন তৈরি করা হয়েছে। ল্যাবে যদি আইসোলেশন ভেঙে পড়ে, যে এলাকা দূষিত হয়ে পড়বে সেটা নিজে থেকে নিজেকে সিল করে দেবে। মাত্র আধ সেকেন্ডের মধ্যে বাতাস নিরোধক দরজা একের পর এক বন্ধ হয়ে যাবে, সেই সঙ্গে বদলে যাবে ল্যাবের ডিজাইনও।

এর প্রয়োজন আছে। কারণ অন্যান্য ল্যাবরেটরির অতীত ইতিহাস ভালো নয়। দাবি করা হয়েছে, জীবাণুমুক্ত, কিন্তু পরীক্ষায় ধরা পড়েছে অন্তত পনেরোটা কেসে সংক্রমণ ধরা পড়েছে। কারণগুলো সাধারণত স্ট্রাকচারাল—একটা সিল ফেটে গেছে, একটা দস্তানা ছিঁড়ে গেছে ইত্যাদি। মোটকথা যত সাবধানতাই অবলম্বন করা হোক, সংক্রমণের ঘটনা ঘটেছেই।

দাবানলে এ ধরনের আকস্মিক কিছুর জন্য প্রস্তুতি নেওয়া আছে। তবে এ রকম কিছু যদি ঘটে, যদিও হিসাবে বলে এ রকম কিছু ঘটবে না, তাহলেও অনির্দিষ্টকাল ধরে এখানে নিরাপদে কাজ করতে পারা যাবে। তাঁরা এখানে এক মাস থাকতে পারেন, এক বছরও থাকতে পারেন, কাজ করতে পারেন ভয়ংকর সব জীবাণু নিয়ে। কোথাও কোনো সমস্যা নেই, একদমই কোনো সমস্যা নেই।

ডাক্তার নওয়াব করিডর ধরে হাঁটছেন, তাকিয়ে আছেন অ্যাটমিক ডেটোনেটর সাবস্টেশনের দিকে। তিনি আসলে ওগুলোর পজিশন গেঁথে নিচ্ছেন মনের মণিকোঠায়। এই লেভেলে ওগুলোর সংখ্যা পাঁচটা, খানিক পরপর সেন্ট্রাল করিডর বরাবর বসানো হয়েছে। প্রতিটি একই রকম দেখতে—ছোট রুপালি বাক্স, সিগারেট প্যাকেটের চেয়ে বড় নয়। প্রতিটিতে চাবি ঢোকানোর জন্য তালা আছে, আছে একটা সবুজ আলো, যেটা জ্বলছে, আর আছে একটা গাঢ় লাল আলো।

এর মেকানিজম আগেই ব্যাখ্যা করেছেন সদয় জাহান :

'সবগুলো ডাক্ট সিস্টেম আর সবগুলো ল্যাবে সেনসর বসানো আছে। ওগুলো কেমিক্যাল, ইলেকট্রনিক এবং সোজাসুজি বায়োয়াসা ডিভাইসের সাহায্যে প্রতিটি কামরার বাতাস মনিটর করে। বায়োয়াসা স্রেফ একটা মাউস, ওটার হার্টবিট মনিটর করা হয়। কোথাও খারাপ কিছু ঘটছে বলে যদি সেনসর রিপোর্ট করে, ল্যাব নিজে থেকে নিজেকে সিল করে দেবে। যদি পুরো ফ্লোর সংক্রমিত হয়ে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে সিল হয়ে যাবে এবং অ্যাটমিক ডিভাইসও এসে পড়বে। এখানে এসে পড়বে মানে সচল হয়ে যাবে। তা যখন ঘটবে, সবুজ আলোটা নিভে যাবে, আর লাল আলোটা মিটমিট করবে।

'লাল আলোর মিটমিট করার মানে হলো তিন মিনিটের বিরতি শুরু হয়েছে। যদি আপনি আপনার চাবি তালায় না ঢোকান, তিন মিনিট শেষ হলে বোমাটা ফাটবে।'

'আর এই কাজটা আমার নিজেকে করতে হবে?'

ডক্টর জাহান মাথা ঝাঁকালেন। 'চাবি স্টিল। ওটা কন্ডাকটিভ। ওই তালায় একটা সিস্টেম আছে, যে চাবি ধরে আছে তার ক্যাপাসিট্যান্সের মাপ নিতে পারে। ওটা সাধারণ বডি সাইজে সাড়া দেয়, বিশেষ করে ওজন দেখে, আর ঘামের লবণাক্ততা পরীক্ষা করে। গোটা ব্যাপারটা একদম নিয়ম ধরে। আসলে, আপনার জন্য।'

'তার মানে আমি সত্যি একমাত্র?'

'আপনি সত্যি একমাত্র। আর আপনার কাছে চাবি আছে মাত্র একটা। তবে জটিলতা সৃষ্টি করতে পারার মতো একটা সমস্যা আছে। ব্লুপ্রিন্ট শতকরা এক শ ভাগ অনুসরণ করা হয়নি, সেটা আমরা আবিষ্কার করেছি ল্যাব তৈরি হবার পর, সমস্ত ডিভাইস ইনস্টল করার পর। তবে সেটা একটা ভুলই। তিনটে ডেটোনেটর সাবস্টেশন কম রয়েছে। মাত্র পাঁচটা আছে, থাকার কথা আটটা।'

'এর তাৎপর্য?'

'তাৎপর্য হলো, ফ্লোর যদি সংক্রমিত হতে শুরু করে, আপনি ছুটবেন একটা সাবস্টেশনের দিকে। তা না হলে এ রকম চান্স আছে যে আপনি এমন একটা সেক্টরে আটকে পড়ে গেলেন যেখানে কোনো সাবস্টেশন নেই। তারপর ধরুন, ব্যাকটেরিওলজিক সেনসরগুলোয় ত্রুটি দেখা দেওয়ার ঘটনা

ঘটলে, একটা ফলস পজিটিভ মালফাঙ্কশন অযথা ল্যাবরেটরি নিজেকে ধ্বংস করে দিতে পারে।'

'এখানে তো দেখা যাচ্ছে প্ল্যানিংয়ের সিরিয়াস ভুল।'

'এখন জানা গেছে,' ডক্টর জাহান বললেন, 'নতুন তিনটে সাবস্টেশন যোগ করা হবে আগামী মাসে। তবে তা থেকে এখন আমরা কোনো সাহায্য পাব না। সমস্যাটা শুধু মাথায় রাখবেন এবং দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে।'

ডক্টর বাবরের ঘুম ভেঙে গেল। হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যাওয়ায় গড়িয়ে বিছানা থেকে নামলেন, ব্যস্ত হাতে কাপড় পরছেন। উত্তেজিত বোধ করছেন তিনি: আচমকা মাথায় একটা আইডিয়া চলে এসেছে। বুনো, পাগলামির চূড়ান্ত, কিন্তু তারপরও মুগ্ধ করার মতো একটা আইডিয়া।

এই আইডিয়া তিনি স্বপ্নের মধ্যে পেয়েছেন।

ওই স্বপ্নে তিনি একটা বাড়ি দেখতে পাচ্ছিলেন, তারপর একটা শহর—বেশ বড় শহর, জটিল, বাড়িটাকে ঘিরে ছোট ছোট বহু শহরের সঙ্গে সংযুক্ত বিশাল এক শহর। ওই বাড়িতে একজন পুরুষ থাকে, একা না, সঙ্গে তার পরিবার আছে। লোকটা কাজ করে, রোজই শহরে আসা-যাওয়া করে, বেড়ায়, নিজে এটা-সেটা করে, অন্য কাউকে এটা-সেটা করতে দেখলে রিঅ্যাক্ট করে।

এভাবেই দিন কাটছিল।

তারপর, স্বপ্নের মধ্যে, শহরটা হঠাৎ করে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, থেকে গেল শুধু বাড়িটা। ব্যাপারটা কেমন অন্য রকম হয়ে গেল দেখো! নিঃসঙ্গ একটা বাড়ি, একা দাঁড়িয়ে, যা যা তার দরকার সেগুলো ছাড়াই—পানি, গ্যাস, ইলেকট্রিসিটি, রাস্তা। বাড়িটা আছে, তার সঙ্গে আছে পরিবারটিও—সুপারমার্কেট, স্কুল, ওষুধের দোকান থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায়। আর ওই পরিবারের কর্তা, যে কাজ করত শহরে, নানা কাজে-অকাজে শহর ছাড়া যার চলত না, হঠাৎ করে অচল হয়ে পড়ল।

বাড়িটা পুরোপুরি অন্য রকম একটা জীবাণুতে পরিণত হলো। এবং ওই পর্যায় থেকে দাবানল জীবাণু খুব বেশি হলে মাত্র এক পা, কল্পনায় ছোট্ট মাত্র একটা লাফ...

বিষয়টা নিয়ে কুমার মুশফিকের সঙ্গে তাঁর কথা বলতে হবে। তিনি গুরুত্ব দিন বা না দিন, অন্তত মন দিয়ে শুনবেন।

ঘড়ির দিকে চোখ গেল ডক্টর বাবরের। ২২০০ ঘণ্টা। সময় মাঝরাতে পৌঁছে যাচ্ছে। আরও হাত চালিয়ে কাপড় পরতে লাগলেন।

নতুন এক প্রস্থ পেপার স্যুট নিলেন। নিরাবরণ ত্বকে কাগজের ঠান্ডা স্পর্শ ভালো লাগল। যদিও হঠাৎ করে গরম হয়ে উঠল স্যুট আর গা। আশ্চর্য এক অনুভূতি। কাপড় পরা শেষ করলেন তিনি। এক টুকরোয় কমপ্লিট স্যুট। কামরা ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন, আরেকবার ঘড়িটার দিকে তাকালেন।

২২১০।

আরে, আরে, ভাবলেন তিনি; একাধারে বিব্রত এবং বিস্মিত।

ব্যাপারটা তাহলে আবার ঘটল। এবার দশ মিনিট। কীভাবে কাটল এই দশটা মিনিট? তাঁর কোনো ধারণা নেই। তিনি কিছু মনে করতে পারছেন না। তবে এতে কোনো ভুল নেই যে দশটা মিনিট গায়েব হয়ে গেছে, তিনি যখন কাপড় পরছিলেন—যে কাজে তাঁর ত্রিশ সেকেন্ডের বেশি লাগার কথা নয়।

বিছানার ওপর বসলেন, চেষ্টা করে দেখছেন কিছু মনে পড়ে কি না। উঁহু, না, কই।

তাঁর জীবন থেকে দশটা মিনিট গায়েব হয়ে গেছে।

এটা আতঙ্কিত হবার মতো একটা বিষয়। ব্যাপারটা আবার ঘটছে। অথচ তিনি আশা করছিলেন আর ঘটবে না। কয়েক মাস সব ঠিক ছিল, একবারও ঘটেনি। কিন্তু এখন, উত্তেজনার মধ্যে, অসময়ে, হাসপাতাল থেকে যে শিডিউল ঠিক করে দিয়েছিল তার বাইরে এসে, ব্যাপারটা আবার শুরু হয়েছে।

মুহূর্তের জন্য বিবেচনা করলেন সবাইকে কথাটা জানাবেন কি না, তারপর মাথা নাড়লেন। তিনি ঠিক থাকবেন। ব্যাপারটা আর ঘটবে না। এখন থেকে স্রেফ ভালো থাকবেন।

দাঁড়ালেন বাবর। এখন ডক্টর মুশফিকের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন তিনি। একটা বিষয়ে আলাপ করতে হবে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা। কী...

ডক্টর বাবরের চিন্তা থেমে গেল। তিনি খেই হারিয়ে ফেললেন কেন? গুরুত্বপূর্ণ কী? তাঁর মনে পড়ছে না কেন?

যা। আইডিয়াটা গায়েব হয়ে গেছে। তিনি কোনো উত্তেজনাও অনুভব করছেন না। নেই কোনো ইমেজও। সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, মুছে ফেলা হয়েছে তাঁর মন আর মাথা থেকে।

এতক্ষণে তিনি বুঝতে পারছেন সব কথা তাঁর ডক্টর মুশফিককে বলা উচিত, স্বীকার করা দরকার পুরো ব্যাপারটা। কিন্তু মুশফিক জেনে ফেললে কী বলবেন আর কী করবেন, তা তাঁর জানা আছে। এরপর তাঁর ভবিষ্যৎ কী দাঁড়াবে তাও তিনি কল্পনা করতে পারছেন। তাঁর জীবন থেকে প্রকল্প দাবানল চলে গেলে, বেঁচে থাকার বাকি সবকিছুও হাতছাড়া হয়ে যাবে। মানুষ যদি জানে, সঙ্গে সঙ্গে সব বদলে যাবে। আর কখনো তিনি স্বাভাবিক হতে পারবেন না। এই চাকরি তাঁকে ছেড়ে দিতে হবে, অন্য কোনো কিছু যদি ব্যবস্থা করতে পারেন, সেটা হবে অন্তহীন মানিয়ে নেওয়ার কঠিন সাজা। তিনি এমনকি গাড়িও চালাতে পারবেন না।

না, ভাবলেন, কাউকে কিছু বলা চলবে না। কারণ তিনি ঠিক হয়ে যাবেন, শুধু খেয়াল রাখতে হবে মিটমিট করা আলোর দিকে যেন না তাকান।

ডক্টর মুশফিক ক্লান্ত, তবে জানেন ঘুমের জন্য এখনো প্রস্তুত নন। ল্যাব করিডরে পায়চারি করছেন, ভাবছেন হাতিমারার শকুনগুলোর কথা। তাঁরা ওখানে যা যা করেছেন সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ফিরিয়ে এনেছেন মনে, কীভাবে তাঁরা শকুনগুলোকে দেখতে পেলেন, কীভাবে ওগুলোকে গ্যাস দিয়ে মেরে ফেলা হলো। দৃশ্যগুলো বারবার স্মরণ করছেন।

এর কারণ হলো, কী যেন একটা হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। আর সেই কী যেনটা তাঁকে খুব অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

ওই সময়, যখন তিনি হাতিমারায় ছিলেন, ব্যাপারটা তাঁর মনে খুঁতখুঁতে ভাব এনে দিয়েছিল। তারপর সেটার কথা ভুলে গেছেন। তবে দুপুরের কনফারেন্সে নওয়াব যখন রোগীদের নিয়ে আলোচনা করছিলেন, সেই খুঁতখুঁতে ভাবটা আবার ফিরে এসেছিল। কিন্তু কী নিয়ে তাঁর খুঁতখুঁতানি, সেটা মনে পড়ছে না।

নওয়াব কিছু একটা বলেছেন, কোনো ফ্যাক্ট উল্লেখ করেছেন, হয়তো তাঁর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আছে। কিন্তু কী সেটা?

মাথা নাড়ছেন মুশফিক। স্মৃতি খুঁড়ে স্রেফ বের করতে পারছেন না। সূত্র আছে, সংযোগ আছে, চাবি আছে—সবই উপস্থিত, কিন্তু তারপরও বিষয়টাকে তিনি মেঝের ওপর তুলে আনতে পারছেন না।

দু হাতে মাথা ধরে চাপ দিচ্ছেন। অভিশাপ দিচ্ছেন নিজের গোঁয়ার আর একরোখা মগজকে।

'আমি খুব ক্লান্ত,' বিড়বিড় করে বললেন, চোখ উঠে গেল দেয়ালঘড়ির দিকে। ২৩৪০ ঘণ্টা। মাঝরাতের কনফারেন্স শুরু হতে খুব বেশি দেরি নেই আর।

২০. মাঝরাতের কনফারেন্স

আবার তাঁরা সেই একই কামরায় মিলিত হলেন। সবার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে ডক্টর মুশফিক বুঝতে পারলেন কেউ কারও চেয়ে কম ক্লান্ত নন; কেউই যথেষ্ট ঘুমানোর সুযোগ পাচ্ছেন না, তাঁর মতোই।

'জানি সবার অনেক কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু সবাইকে আরও বেশি কষ্ট করতে হবে। কেউ যেন আমরা মুহূর্তের জন্যও ভুলে না যাই গোটা দেশ, এমনকি সম্ভবত গোটা পৃথিবী আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে, আশা করছে যত দ্রুত সম্ভব তাদের আমরা একটা আশার কথা শোনাব।

'তবে আমি মনে রাখতে বলছি, ক্লান্ত মানুষ ভুল করে। আরও যেমন কষ্ট করতে হবে, ক্লান্তি দূর করার বিষয়টাও রাখতে হবে মাথায়।'

সিদ্ধান্ত হলো দিনে, চব্বিশ ঘণ্টায়, চার ঘণ্টা ঘুমাবেন তাঁরা।

বাবর প্রস্তাব তুললেন, কোড নাম চেয়ে একটা ফাইল তৈরি করেছেন তাঁরা, যেহেতু তাঁদের কাছে একটা জীবাণু রয়েছে, সেটার কোড থাকা দরকার। সবাই রাজি হলো।

কামরার এক কোণে দাঁড়িয়ে রয়েছে স্ক্যাম্বলার টেলিপ্রিন্টার (টেলেক্স), সারা দিন যান্ত্রিক গুঞ্জন তুলছে ওটা, বাইরে থেকে আসা মেসেজ টাইপ করছে। লেভেল পাঁচ-এ আসার পর বিজ্ঞানীদের কেউ কী খবর এল না এল ব্যস্ততার কারণে দেখার সুযোগ পাননি। দেখার তেমন কিছু সাধারণত থাকেও না, কারণ বেশির মেসেজই আসে তিন সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন শাখা থেকে, প্রেসিডেন্ট আর প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে, কুমিল্লার দেওগাঁ থেকে আর বাসা থেকে, জরুরি ডাক পেয়ে কাজ করতে আসা বিজ্ঞানীদের সঙ্গে ওগুলোর প্রায় কোনো সম্পর্কই থাকে না।

কম্পিউটারে একটা মেসেজ কম্পোজ করলেন ডক্টর মুশফিক। 'জীবাণুর কোড ঠিক করা হয়েছে: অ্যান্ড্রোমেডা স্ট্রেইন। অনুমোদনের জন্য আবেদন জানানো হলো।' টেলেক্সের মাধ্যমে মেসেজটা পাঠিয়ে দিলেন তিনি। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা যেহেতু এই নাম রেখেছেন, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে সেটাই গ্রহণ করা হলো।

মেসেজ যে দেওগাঁয় পৌঁছেছে, আলো জ্বলতে দেখে বোঝা গেল সেটা। এরপর দশ মিনিট অপেক্ষা করতে হলো। তারপর টেলিপ্রিন্টারে উত্তর চলে এল। উত্তর এল মানে যান্ত্রিক শব্দ হলো ঠিকই, কিন্তু কিছু ছাপা হলো না। কিছু ছাপা হলে তো বেল বাজবে, তা বাজছে না।

কৌতূহল হওয়ায় টেলেক্সের পেছনে চলে গেলেন সদয় জাহান। ওখানে রোল থেকে বেরোনো গাদা গাদা কাগজ স্তূপ হয়ে থাকতে দেখলেন তিনি। কয়েক শ গজ কাগজ পড়ে রয়েছে এখানে অথচ কেউ সেগুলো দেখেননি।

একটা মেসেজ পড়লেন তিনি, তারপর হঠাৎ এক টানে কাগজটা ছিঁড়ে বাড়িয়ে দিলেন কুমার মুশফিকের দিকে। তাতে সেই খবরটা আছে। পড়ার পর মুশফিক বললেন, 'এটা একটা এমসিএন ট্রান্সমিশন। যখন এসেছে, অবশ্যই বেল বাজা উচিত ছিল।'

'এই টেলিপ্রিন্টারে কোনো বেল নেই,' বললেন বাবর। 'না বাজলে তাই তো মনে করতে হবে।'

'যা-ই হোক, এই মেসেজের সারমর্ম হলো, আমাদের অনুরোধ প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর রক্ষা করেনি। অর্থাৎ আমরা ভুল জানি। হাতিমারার জীবাণু ধ্বংস করার জন্য অ্যাটম বোমা ব্যবহার করা হয়নি। প্রধানমন্ত্রী চব্বিশ থেকে আটচল্লিশ ঘণ্টার জন্য বোমা ব্যবহার করার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। খবরটা আমরা এইমাত্র জানলাম।'

কামরার ভেতর বিষণ্ন নীরবতা নেমে এল।

'লাখ লাখ মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে ওই জীবাণু—বাংলাদেশের, ভারতেরও—বাংলাদেশে এখনো থামেনি ওই কিলিং মেশিন অ্যান্ড্রোমেডা স্ট্রেইন, জেলায়-উপজেলায় ছোবল মেরে চলেছে...শুধু একজনের ছোট্ট একটা ভুলে, একজনের নির্বুদ্ধিতার কারণে।'

'সত্যি বলতে কী, এ রকম একজন দুর্বলচিত্ত, অসমৃদ্ধ কল্পনার অধিকারী কাউকে সবচেয়ে বড় রাষ্ট্রীয় নির্বাহী পদে থাকতে দেওয়া উচিত নয়। এখানে যে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, তার জন্য ওই ব্যক্তির বিচার হতে হবে। দেখতে হবে তিনি গোপনে ইসলামিক স্টেটসের প্রতিনিধিত্ব করছেন কি না।'

এরপর দেশের কোথায় কী ঘটছে জানার জন্য একেবারে মরিয়া হয়ে উঠলেন দাবানলের বিজ্ঞানীরা।

কিন্তু মেরামত করার পর টেলিপ্রিন্টার থেকে এবার যেসব খবর বেল বাজাতে বাজাতে আসতে লাগল, তার জন্য সত্যি তাঁরা কেউ প্রস্তুত ছিলেন না। একটা করে খবর আসছে, রুদ্ধশ্বাসে পড়ছেন তাঁরা এবং তাঁদের হাঁ আরও বড় হচ্ছে, চোখ উঠে যাচ্ছে কপালের আরও ওপরে।

তাঁদের সবার অজান্তে বারো ঘণ্টা আগে দেশে রক্তক্ষয়ী সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে গেছে। দেশে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে, সংসদ বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে, ভেঙে দেওয়া হয়েছে মন্ত্রিসভা, মেজর জেনারেল অসীম হায়দার শক্তি নিজেকে প্রধান সামরিক প্রশাসক ঘোষণা করেছেন। গণতন্ত্রকে হত্যা করে কেন সামরিক শাসন, এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে: প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর মন্ত্রিসভার বেশির ভাগ সদস্য গোপনে ইসলামিক স্টেটের সমর্থক, তাঁরা ইচ্ছে করে মহাশূন্য থেকে আসা জীবাণুকে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ করে দিচ্ছিলেন। প্রমাণ হিসেবে বলা হয়েছে, বিজ্ঞানীরা হাতিমারায় অ্যাটম বোমা ফেলে জীবাণুর উৎস ধ্বংস করার অনুরোধ জানালেও, প্রধানমন্ত্রী তাঁদের অনুরোধ কানে তোলেননি, তিনি বরং উল্টো বোমা ব্যবহারের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন।

সর্বশেষ খবরে জানা গেল, সঙ্গী-সাথিদের নিয়ে দেশ ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করছিলেন প্রধানমন্ত্রী, কিন্তু দেশপ্রেমিক সৈনিকেরা খবর পেয়ে এয়ারপোর্টে ছুটে যান এবং প্রধানমন্ত্রীর বিমানকে আকাশে উঠতে বাধা দেন। এই সময় বিমানটি থেকে সৈনিকদের লক্ষ্য করে গুলি করা হয় আর গ্রেনেড ছোড়া হয়। সৈনিকেরাও পাল্টা গুলি করেন। এক ঘণ্টা গোলাগুলি চলে, পরিণতিতে সঙ্গী-সাথিসহ প্রধানমন্ত্রী নিহত হয়েছেন।

আরও আধঘণ্টা পর জানা গেল, দাবানল বিজ্ঞানীদের প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে প্রধান সামরিক প্রশাসক বলেছেন তিনি স্বয়ং প্রকল্প দাবানল পরিদর্শনে আসছেন। বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সরাসরি আলাপ করতে আগ্রহী তিনি, মুখোমুখি বসে তাঁদের তিনি জানাতে চান যে গোটা দেশ, শুধু গোটা দেশ নয়, গোটা পৃথিবী, তাদের দিকে ব্যাকুল প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে আছে—সবার ভরসা এখন তাঁদের ওপর, দেশ এবং পৃথিবীকে যদি কেউ বাঁচাতে পারে তো শুধু তাঁরাই পারবেন।

খবরটা যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতকে। ভারত না এই জীবাণু থেকে নিজেকে মুক্ত করতে সফল হয়েছে? তাহলে দুনিয়ার মানুষ তাদের ওপর ভরসা না করে দাবানল বিজ্ঞানীদের ওপর ভরসা করবে কেন?

এই ধাঁধার জবাব পাওয়া গেল পরবর্তী দশ মিনিটের মাথায়।

প্রধান সামরিক প্রশাসক মেজর জেনারেল অসীম হায়দার শক্তি ক্ষমতা দখলের দুই ঘণ্টার মধ্যে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে চেয়েছিলেন অ্যান্ড্রোমেডা

স্ট্রেইনকে কীভাবে তারা ভারতের মাটি থেকে নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন করতে পারলেন? ভারতের তরফ থেকে ইতস্তত ভঙ্গিতে জবাব দেওয়া হয়েছে, কীভাবে কী হয়েছে, তাঁরা নিজেরাও তা জানেন না; শুধু জানেন, ওই জীবাণু ভারত ছেড়ে চলে গেছে।

চতুর্থ দিন

বিস্তার

২১. বিশ্লেষণ

সময়ের চাপ প্রবল হয়ে ওঠায় স্পেকট্রোমেট্রি এবং অ্যামিনো-অ্যাসিড অ্যানালাইসিস হঠাৎ করে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ এবং উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়াল। আশা করা হচ্ছে, এই অ্যানালাইসিসগুলো তাঁদের বলতে পারবে, জীবাণু অ্যান্ড্রোমেডা স্ট্রেইন পৃথিবীর লাইফ ফর্মের চেয়ে কী মাত্রায় কোথায় কতটুকু বিদেশি।

কাজেই প্রবল আগ্রহ নিয়ে সম্রাট বাবর আর সদয় জাহান কম্পিউটার প্রিন্টআউট দেখছেন, সবুজ কাগজের ওপর এক কলমে রেজাল্ট দেওয়া হয়েছে :

MASS
SPECTROMETRY
DATA OUTPUT PRINT
PERCENTAGE
OUTPUT SAMPLE 1—BLACK OBJECT
UNIDENTIFIED ORIGIN
[Diagram of chemistry of the rock from H to Br]
ALL HEAVIER METALS SHOW ZERO CONTENT
SAMPLE 2—GREEN OBJECT UNIDENTIFIED ORIGIN
[Diagram of chemistry of green object ALL HEAVIER
METALS SHOW ZERO CONTENT
END PRINT END
PROGRAM
STOP

এতে যা বোঝাতে চাওয়া হয়েছে সেটা বেশ সহজ। কালো পাথরে হাইড্রোজেন, কার্বন আর অক্সিজেন আছে; আরও আছে—এগুলোর পরিমাণ কম হলেও তাৎপর্য বহন করে—সালফার, সিলিকন আর সেলেনিয়াম; এসব ছাড়াও অন্যান্য এলিমেন্ট আছে, যদিও সেসব নামকাওয়াস্তে।

আর সবুজ দাগে আছে হাইড্রোজেন, কার্বন, নাইট্রোজেন আর অক্সিজেন। আর কিছু একদমই নেই। বিজ্ঞানী দুই বন্ধুর কাছে এটা খুব অদ্ভুত বলে মনে হলো যে পাথর আর সবুজ দাগের কেমিক্যাল মেকআপে এত মিল পাওয়া যাচ্ছে। সবুজ দাগে নাইট্রোজেন পাওয়াটাও অদ্ভুত লাগল ওঁদের, যেখানে পাথরে একদমই নেই সেটা।

উপসংহার পরিষ্কার। কালো 'পাথর' আসলে পাথরই নয়, ওটা এক ধরনের জিনিস, পৃথিবীর অর্গানিক লাইফের সঙ্গে মিল আছে। আবার প্লাস্টিকের সঙ্গেও কিছুটা মেলে।

আর ওই সবুজ দাগ, ধরে নিতে হবে জীবিত, এমন সব এলিমেন্ট দিয়ে তৈরি, যেগুলো পৃথিবীর জীবেও একই মাত্রায় দেখতে পাওয়া যায়। এই রেজাল্ট উৎসাহিত করে তুলল সবাইকে, কারণ সবুজ দাগ আর পৃথিবীর প্রাণের সঙ্গে মিল পাওয়া গেছে। কিন্তু তাঁদের উৎসাহ আর আশা বেশিক্ষণ টিকল না। টিকল না অ্যামিনো অ্যাসিড অ্যানালাইসিস দেখে :

AMINO ACID ANALYSIS [graphic of amino acid analysis—all
zeroes]
TOTAL AMINO ACID CONTENT 00.00 00.0
END PRINT END PROGRAM STOP—

'গড, নো!' বেসুরো গলায় বললেন বাবর, ছাপা কাগজের ওপর চোখ, ভূতের মতো চেহারা। 'দেখছেন আপনারা?'

'অ্যামিনো অ্যাসিড নেই,' ডক্টর জাহান বললেন, ক্লান্তিতে দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে তাঁর, টলছেন। 'প্রোটিনও নেই।'

'লাইফ উইদাউট প্রোটিন,' বিড়বিড় করছেন বাবর, মাথা নাড়ছেন, ভাব দেখে মনে হবে তাঁর সবচেয়ে বড় ভয়টা সত্যি প্রমাণিত হয়েছে।

পৃথিবীতে প্রাণ বিকশিত হয়েছে ক্ষুদ্র পরিসরে বায়োকেমিক্যাল রিঅ্যাকশন সম্পন্ন করতে শিখে, প্রোটিন এনজাইমের সাহায্য নিয়ে। বায়োকেমিস্টরা এখন এই রিঅ্যাকশনগুলো ডুপ্লিকেট করতে শিখে ফেলছেন, কিন্তু শুধু সবগুলোর কাছ থেকে মাত্র একটি রিঅ্যাকশনকে বিচ্ছিন্ন করে।

জীবিত কোষ অন্য ব্যাপার। ওখানে, ছোট্ট একটা জায়গায়, রিঅ্যাকশন সম্পন্ন হয়, যা থেকে এনার্জি পাওয়া যায়, গ্রোথ পাওয়া যায় আর পাওয়া যায় মুভমেন্ট। ওখানে কোনো বিচ্ছিন্নতা নেই এবং এটা মানুষ ডুপ্লিকেট করতে পারে না, যেমন সে পারে না ডিনার তৈরি করতে বসে অ্যাপিটাইজার থেকে শুরু করে ডেজার্ট পর্যন্ত সব একসঙ্গে মিশিয়ে একটা পাতিলে রান্না করার পর ডিশে ঢেলে আপেল পাই থেকে চিজ ডিপকে আলাদা করতে।

সেল বা কোষ এনজাইম ব্যবহার করে কয়েক শ আলাদা রিঅ্যাকশনকে সোজা রাখতে পারে। প্রতিটি এনজাইম যেন কিচেনে একজন শ্রমিক, মাত্র একটি কাজ করছে। যে লোক তন্দুরে রুটি বানায় তার পক্ষে যেমন কাচ্চি বিরিয়ানি রান্না করা সম্ভব নয়, তেমনি যে কাচ্চি বিরিয়ানি রান্না করে তার পক্ষে ওই একই মসলা দিয়ে সরষে ইলিশ রান্না করা সম্ভব নয়।

তবে এনজাইমের আরও ব্যবহার আছে। ওগুলো সম্ভাব্য কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন তৈরি করে, তা না হলে ওগুলো ঘটত না। একজন বায়োকেমিস্ট প্রচণ্ড তাপ, কিংবা প্রচণ্ড চাপ, কিংবা শক্তিশালী অ্যাসিডের সাহায্যে রিঅ্যাকশন ডুপ্লিকেট করতে পারেন। কিন্তু মানুষের শরীর, কিংবা স্বতন্ত্র একটা কোষ, ওরকম চরম পরিবেশ সহ্য করতে পারবে না। এনজাইম হলো জীবনের ঘটক, কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনকে সামনে এগোতে সাহায্য করে দৈহিক তাপমাত্রায় এবং অ্যাটমোসফেরিক প্রেশারে।

পৃথিবীতে প্রাণের জন্য এনজাইম ছিল একান্ত প্রয়োজনীয়। তবে আরেক ধরনের প্রাণ যদি ওগুলোকে ছাড়াই শিখে ফেলত, সেগুলো নিশ্চয়ই পুরোপুরি আলাদা কোনোভাবে বিকশিত হতো।

অতএব, কোনো সন্দেহ নেই যে তাঁরা পুরোপুরি এলিয়েন জীবাণু নিয়ে কাজ করছেন।

এর আরেকটা অর্থ হলো অ্যানালাইসিস এবং নিউট্রালাইজেশনের জন্য আরও অনেক বেশি সময় লাগবে।

দরজায় লেখা মরফলজি।

কুমার মুশফিক ছোট প্লাস্টিক ক্যাপসুলটা সরিয়ে নিলেন, যে ক্যাপসুলে সবুজ কণাটা গাঁথা ছিল। ক্যাপসুল এখন শক্ত হয়ে গেছে, সেটাকে তিনি একটা ভাইসে সেট করলেন, বসানোটা দৃঢ় হলো, তারপর ওটার দিকে একটা ডেন্টাল ড্রিল নিয়ে গেলেন, দাড়ি কামানোর ঢঙে প্লাস্টিক চেঁছে ফেলছেন,

যতক্ষণ না নিরাবরণ সবুজ জিনিসটা বেরিয়ে পড়ল।

কয়েক ঘণ্টা ধরে প্রস্তুতি চলল। এখানে সবাই নিষ্প্রাণ যন্ত্রে পরিণত হয়েছেন, কাজ করছেন বিরতিহীন। সবশেষে কামরার আলো নিভিয়ে দিলেন ডক্টর মুশফিক, বোতাম টিপে বিম জ্বাললেন। বেশ কিছু ডায়ায় অ্যাডজাস্ট করতে হলো বিম ফোকাস করার জন্য। এক মুহূর্তের মধ্যে ইমেজ ফোকাসে চলে এল, পরদায় দেখা যাচ্ছে কালো আর সবুজ।

ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য।

ডক্টর কুমার মুশফিক নিঃসঙ্গ একটা জীবাণুর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। ওটা নিখুঁত, ছয় কোণ (হেক্সাগন) বিশিষ্ট এবং দুদিকের ছয় কোনাগুলোর সঙ্গে সংস্পর্শ বজায় রাখছে। হেক্সাগনের ভেতরটা গোঁজ বা খোঁটা দিয়ে ভাগ করা, প্রতিটি মিলিত হয়েছে কাঠামোটার ঠিক মাঝখানে। সব মিলিয়ে আদলে সঠিক একটা ভাব ফুটে আছে, এক ধরনের গাণিতিক সুসম্পন্নতা, যা তিনি পৃথিবীর প্রাণের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে মনে করতে পারছেন না।

জিনিসটা দেখতে স্ফটিকের মতো লাগছে।

মুশফিক ভাবলেন, বাবর খুশি হবেন। দৃষ্টিনন্দন জিনিস পছন্দ করেন তিনি। বাবর প্রায়ই তাঁর এই বিবেচনার কথা বলেন যে হতে পারে জীবনের ভিত হয়তো কোনো ধরনের স্ফটিক, বলেন ওটাকে সম্ভবত কোনো নিয়মিত প্যাটার্নে নিয়ে আসা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত নিলেন বাবরকে ডাকবেন।

মেঝেতে পা ঘষে ঘষে হেঁটে এসেই বাবর বললেন, 'এই তো, এটাই আমাদের উত্তর।'

'উত্তর কিসের?'

'জীবাণুটা কীভাবে কাজ করে। আমি স্পেকট্রোমেট্রি আর অ্যামিনো অ্যাসিড অ্যানালাইসিস দেখেছি।'

'এবং?'

'এই জীবাণু হাইড্রোজেন, কার্বন, অক্সিজেন আর নাইট্রোজেন দিয়ে তৈরি। কিন্তু ওটার মধ্যে অ্যামিনো অ্যাসিড নেই। একেবারেই নেই। এর মানে হলো প্রোটিনকে যেভাবে আমরা চিনি, তাও ওটায় নেই। নেই এনজাইমও। ভাবছিলাম প্রোটিন বেসড অর্গানাইজেশন ছাড়া ওটা অস্তিত্ব ধরে রাখছে কীভাবে? এখন আমি জানি।'

'স্ফটিকের তৈরি কাঠামো।'

'দেখে সে রকমই মনে হচ্ছে,' বললেন বাবর, তাকিয়ে আছেন স্ক্রিনের দিকে। 'এই ডাইমেনশনে, এটা সম্ভবত একটা হেক্সাগোনাল স্ল্যাব, এক প্রস্থ টাইলসের মতো। আটটা পাশ, প্রতিটির মুখ একটা ছয় কোনা। আর ভেতরে, গোঁজ আকৃতির জিনিসগুলো চলে গেছে সেন্টারের দিকে।'

'ওগুলো বায়োকেমিক্যাল কাজগুলোকে আলাদা করতে ভালো ভূমিকা রাখতে পারে।'

'হ্যাঁ,' বললেন বাবর। ভ্রু কুঁচকালেন।

'কী হলো?'

চিন্তা করছেন বাবর। ভুলে গিয়েছিলেন এমন কিছু একটা মনে পড়ে গেছে তাঁর। অদ্ভুত সেই স্বপ্ন, একটা শহর আর একটা বাড়িকে নিয়ে। এক মুহূর্ত চিন্তা করতেই সবটুকু ফিরে এল তাঁর কাছে। একটা বাড়ি আর একটা শহর। বাড়িটা যেভাবে একা কাজ করত এবং একটা শহরের ভেতর যেভাবে কাজ করত ওটা।

সব তাঁর মনে ফিরে এল।

'কী জানেন,' বললেন তিনি, 'এই যে একটা ইউনিট চারপাশের বাকিগুলোর সঙ্গে যেভাবে সংযুক্ত হয়ে আছে, এটা ভারি ইন্টারেস্টিং।'

'আপনি ভাবছেন আমরা আরও বড় কোনো জীবাণুর অংশ দেখছি?'

'একদম। এই ইউনিট কি স্বয়ংসম্পূর্ণ, একটা ব্যাকটেরিয়ামের মতো, নাকি এটা স্রেফ বড় একটা অঙ্গের টুকরো মাত্র, কিংবা বড় কোনো জীবাণুর? কেননা, আপনি যদি একটা মাত্র লিভার সেল দেখেন, বলতে পারবেন কোন ধরনের অঙ্গ থেকে সেলটা এসেছে? না। এবং একটা ব্রেন সেল কি কাজে আসবে বাকি ব্রেন বাদে?'

স্ক্রিনের দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন মুশফিক। 'মিল খুঁজতে গিয়ে আমি বলব, আপনি বরং অস্বাভাবিক একটা জোড়াকে বেছে নিয়েছেন। কারণ লিভার রিজেনারেট করতে পারে, গজাতে পারে আবার, কিন্তু ব্রেন পারে না।'

বাবরের ঠোঁটে ক্লান্ত হাসি না ফুটতেই মিলিয়ে গেল। 'মেসেঞ্জার থিওরি।'

'আসতে পারে মাথায়,' বললেন মুশফিক।

বহু বছর আগে মেসেঞ্জার থিওরি দিয়েছিলেন জন আর স্যামুয়েলস। ভদ্রলোক কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। এলিয়েন কালচার অন্যান্য কালচারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করতে পারে, এর ওপর যেসব নিয়তি আছে সেগুলো বিবেচনা করার পর তিনি বলেছিলেন, যোগাযোগের ক্ষেত্রে আমাদের টেকনোলজির সবচেয়ে এগিয়ে থাকা কনসেপ্টও অপর্যাপ্ত, এগিয়ে থাকা কালচার আরও উন্নত পদ্ধতি কাজে লাগাবে।

'আসুন বিবেচনা করি,' তিনি বলেছেন, 'একটা কালচার ইচ্ছে করল গোটা মহাবিশ্বকে দেখবে। ধরা যাক তারা একটা পার্টি হিসেবে গ্যালাটিক স্কেলে দেখা দিতে আসছে, নিজেদের অস্তিত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করতে। তারা তথ্য ছড়িয়ে দিতে চায়, নিজেদের অস্তিত্বের রহস্য এবং সূত্র প্রচার করতে চায় চারদিকে। এই কাজ করার জন্য সবচেয়ে ভালো উপায়টা কী হবে? রেডিও? মনে হয় না। রেডিওর গতি খুব কম, খুব বেশি খরচ এবং দ্রুত অকেজো হয়ে পড়ে। কয়েক বিলিয়ন কিলোমিটারের পর শক্তিশালী সংকেত আর শক্তিশালী থাকে না। টিভি আরও খারাপ। পেনিট্রেট করার মতো রে জেনারেট করা অসম্ভব খরচের ব্যাপার। এমনকি কেউ যদি গোটা একটা নক্ষত্রকে ডেটোনেট করতে শিখে ফেলে, কোনো একধরনের একটা সূর্যকে স্রেফ ফাটিয়ে দিল সংকেত হিসেবে ব্যবহার করার জন্য, তাতেও প্রচর খরচ পড়বে।

'খরচ ছাড়াও, এসব পদ্ধতি পুরোনো সব বাধার মুখে পড়বে, যেসব বাধা ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। তার মধ্যে আছে রেডিয়েশন। দূরত্ব যত বাড়বে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কমবে শক্তি। আলোর একটা বালব দশ ফুট দূর থেকে অসহ্য উজ্জ্বল লাগতে পারে, এক হাজার ফুট দূর থেকে শক্তিশালী মনে হতে পারে, সেটাকে আপনি হয়তো বারো কিলোমিটার দূর থেকেও দেখতে পাবেন। কিন্তু দশ লক্ষ কিলোমিটার দূর থেকে ওটাকে কেউ দেখতে পাবে না। এটা ফিজিকসের সহজ একটা ল, বাতিল করা যাবে না।

'কাজেই আপনি সংকেত বয়ে নিয়ে যাবার জন্য ফিজিকস ব্যবহার করবেন না। আপনি ব্যবহার করবেন বায়োলজি। আপনি এমন একটা কমিউনিকেশন সিস্টেম চালু করবেন, যেটা দূরত্বের কারণে দুর্বল বা নিস্তেজ হয়ে পড়বে না, ক্ষয়ে যাবে না, বরং দশ লক্ষ কিলোমিটার দূরে যাবার পরও দেখা যাবে শুরুতে যেমন শক্তিশালী ছিল, তখনো সে রকম শক্তিশালী আছে।

'সংক্ষেপে, নিজের মেসেজ পাঠানোর জন্য আপনি একটা জীবাণু তৈরি করবেন। ওই জীবাণু হবে সেলফ রিপ্লেকেটিং, নিজেই এক থেকে দুই হবে, দুই থেকে চার হবে, এভাবে বড় হতে থাকবে সংখ্যায়। মাত্র কয়েক ডলারে সহস্র কোটি বানিয়ে ফেলতে পারবেন এবং মহাশূন্যের চারদিকে পাঠাতে পারবেন। ওগুলো হবে শক্তপোক্ত, কঠিন পোকা, মহাশূন্যের বৈরী পরিবেশ সামলে নিতে পারবে এবং ওগুলো বড় হবে,

নিজেদের ডুপ্লিকেট করবে, ভাগ হতে থাকবে। কয়েক বছরের মধ্যে গ্যালাক্সিতে অগুনতি হয়ে পড়বে ওগুলো, চারদিকে আরও ছড়িয়ে পড়ছে, অপেক্ষা করছে প্রাণের দেখা পাবার জন্য।

'এবং যখন দেখা পাবে? প্রতিটি নিঃসঙ্গ জীবাণু নিজের ভেতর বহন করছে পূর্ণ গঠিত একটা অঙ্গে পরিণত হবার প্রয়োজনীয় সমস্ত উপাদান।

'ওগুলো, প্রাণের সঙ্গে যোগাযোগ হবার পর, বেড়ে উঠতে শুরু করে পুরোপুরি একটা কমিউনিকেশন মেকানিজমে পরিণত হবে। সেটা হবে অনেকটা কয়েক বিলিয়ন ব্রেন সেল ঢেলে দেওয়ার মতো, প্রতিটির মধ্যে পূর্ণাঙ্গ একটা ব্রেন হয়ে ওঠার সক্ষমতা আছে আদর্শ পরিবেশ পরিস্থিতির মধ্যে। নতুন সৃষ্ট ব্রেন তখন নতুন কালচারের সঙ্গে কথা বলবে, নিজেদের অস্তিত্বের কথা জানাবে, জানাবে তারা এসেছে, ঘোষণা করবে কীভাবে যোগাযোগ করা সম্ভব।'

স্যামুয়েলসের থিওরি মেসেঞ্জার বাগ বহু বিজ্ঞানীর কাছে হাসির খোরাকে পরিণত হয়েছিল, কিন্তু বর্তমানে সেটাকে বাতিলের খাতা থেকে তুলে আনা হয়েছে, অনেক বিজ্ঞানীই বিষয়টা নিয়ে এখন আর হাসাহাসি করতে রাজি নন।

'আপনার কি মনে হচ্ছে ওগুলো এলিয়েন এবং ইতিমধ্যেই যোগাযোগের একটা মাধ্যমে বা যন্ত্রে পরিণত হতে শুরু করেছে?'

'সম্ভবত কালচার আরও বেশি বলবে আমাদের,' উত্তর দিলেন বাবর।

'ও, এক্স-রে ক্রিস্টলগ্রাফি।' মাথা ঝাঁকালেন মুশফিক। 'বলছি ওদের।'

'এখন কেমন আছেন আপনি, সুবীর বাবু?' সার্জেন নওয়াব জিজ্ঞেস করলেন, মাস্কের ভেতর তাঁর চোখ টকটকে লাল আর ছোট হয়ে আছে।

চোখ মিটমিট করলেন বৃদ্ধ, প্লাস্টিক স্যুট পরা নওয়াবের দিকে তাকালেন। 'ঠিক আছি। খুব ভালো হয়তো না, তবে ঠিক আছি।' সতর্ক একটু হাসি ফুটল ঠোঁটে।

'আলাপ করতে সমস্যা হবে না তো?'

অন্যদিকে তাকিয়ে ছিলেন, তা-ই থাকলেন সুবীর, তারপর অবশ্য সার্জেনের দিকে ফিরলেন। 'সবাই তারা মারা গেছে। সত্যি কথা বলবেন।'

'সবাই না। আরও একজন বেঁচে আছে।' সুবীর বাবুর বেডের ওপাশটা দেখালেন, ওখানে একটা দোলনা রয়েছে।

মাথা একটু উঁচু করে দোলনায় থাকা কাঁথা আর লেপের দিকে তাকালেন। 'কী ওটা?'

'একটা শিশু।'

'শিশু? নিশ্চয় এখলাস উদ্দিনের বাচ্চা। একদম বাচ্চা, তাই তো?'

'মাস দুয়েকের।'

'বুঝেছি। এখলাসের বাচ্চা। হাশিম এখলাস। বাপ-বেটা, সংক্ষেপে, নরকযন্ত্রণা। কিসের শিশু, শিঙা ফুঁকে নরক নামিয়ে আনে। বাপ এখলাসও...লাথি মেরে ঝড় তুলতে পছন্দ করে। বাপকা বেটা। সকাল-দুপুর-রাত বলে কিছু নেই, সারাক্ষণ চেঁচাচ্ছে। ওই চেঁচানির কারণে অনেক পরিবার জানালা খোলা রাখতে পারে না।'

'কী কারণে চেঁচায়?'

'হাতিমারা।'

'হাতিমারা মানে?'

সুবীর বাবু মুখ বুজে থাকলেন।

এক মুহূর্ত পর নরম সুরে নওয়াব আবার তাঁকে কথা বলাবার চেষ্টা করলেন। 'ওই রাতে আর কি। যে রাতে ঘটনাটা ঘটল।'

'ঠিক আছে, বলছি আপনাকে। আমি আমরা সারাটা জীবন হাতিমারায় কাটিয়েছি। মাঝেমধ্যে এদিক-সেদিক গেছি, কিন্তু কোথাও মন টেকেনি, ফিরে এসেছি আবার। কাজেই আপনাকে আমার বলতে হবে...'

'যে রাতে ঘটনাটা ঘটল,' পুনরাবৃত্তি করলেন নওয়াব।

'না, এ প্রসঙ্গ থাক। এটা নিয়ে আমি কিছু চিন্তা করতে চাই না।'

'চিন্তা করার তো দরকার আছে।'

'না।'

'হাশিম সম্পর্কে আর কিছু বলবেন না?'

'নাহ্। জলহস্তীর মতো মোটাতাজা, একটাই ব্যামো—চেঁচায়। আমার মনে আছে সেদিন রাতে এলএমজি চালানোর মতো আওয়াজ করছিল।'

নওয়াব জানতে চাইলেন, 'কোন রাতে?'

'আরে বাবা, যে রাতে ধীমান ওই অভিশপ্ত জিনিসটা নিয়ে এল। অবশ্যই আমরা সবাই ওটাকে নামতে দেখেছিলাম। ওটা নেমে এল খসে পড়া একটা তারা যেন—উল্কার মতো আরকি, জ্বলজ্বল করছিল, আর ল্যান্ড করল শহরের ঠিক উত্তর ঘেঁষে।

'সবার সে কী উত্তেজনা। ধীমান সেটা নিয়ে আসতে গেল নিজের হাফ ট্রাক ছুটিয়ে। ফিরল বিশ মিনিট পর, ট্রাকের পেছনে ফেলে নিয়ে এসেছে।'

'তারপর কী ঘটল?'

'কী ঘটল...আমরা সবাই ওটাকে ঘিরে দাঁড়ালাম, দেখছি। সবাই বলাবলি করছিল নিশ্চয়ই অনেক দূর মহাশূন্য থেকে এখানে এসে পড়েছে। কে যেন বলল ওটা মঙ্গল গ্রহ থেকে এসেছে। ময়ূরী তাকে ধমক দিল, বলল, মঙ্গলে মানুষ আছে নাকি যে রকেট পাঠাবে। তার ধারণা, ওটা অন্য কোনো গ্যালাক্সি থেকে এসেছে। বাকি আমরা সবাই আন্দাজ করছিলাম ওটা আমাদেরই হবে, দেওগাঁ কিংবা ঈশ্বরগঞ্জ স্পেসস্টেশন থেকে মহাশূন্যে পাঠানো হয়েছিল, কাজ সেরে ফিরে এসেছে।'

'আচ্ছা। তারপর কী হলো?'

'কী করতে হবে আমাদের জানা ছিল না। হাতিমারায় এ ধরনের কিছু আগে কখনো ঘটেনি।'

'ক্যাপসুলটা নিয়ে কী করা হলো?'

'কী করা হবে বুঝতে পারছিলাম না। গালিব বলল, খুলে দেখা যাক ভেতরে কী আছে। সবাই একমত হতে পারছিলাম না, কারণ ভেতরে সায়েন্টিফিক জিনিসপত্র থাকতে পারে। চিন্তা করছিলাম কী করা যায়। তারপর ধীমান বলল, সেই তো নিজের হাফ ট্রাকে করে জিনিসটা নিয়ে এসেছে, চলো ওটাকে আমরা ডাক্তার কাদেরের কাছে নিয়ে যাই। আমাদের ডাক্তার তিনি, তবে শুধু ডাক্তার নন—সব কাজে সব সময় তাঁকে আমরা পাই। সবাই রাজি হলো, বলল তিনি জানবেন কী করতে হবে। কাজেই ওটাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া হলো।'

'তারপর?'

'বুড়ো কাদের ডাক্তার...অত বুড়ো আসলে তিনি নন...জিনিসটা খুব সাবধানে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন, ওটা যেন তাঁর একজন রোগী। তারপর বললেন, তাঁর ধারণা জিনিসটা মহাশূন্য থেকে ফিরে এসেছে, এবং এটা সম্ভবত আমাদের, কিংবা অন্য কোনো দেশের। বললেন, ওটা তাঁর কাছেই থাক। পরে সময়মতো দু-এক জায়গায় ফোন করে জানানো যাবে। আর এখানেই হয়ে গেল মুশকিল।'

'কী মুশকিল?'

'বুড়ো কাদের ডাক্তারের তাস খেলার মারাত্মক নেশা, আমাদের সামনেই পার্টনার জোগাড় করতে লেগে গেলেন। বললেন, খবরটা জায়গামতো পৌঁছে দেবেন, কোনো চিন্তা নেই। রাত হয়ে যাচ্ছিল বলে যে যার বাড়িতে ফিরে গেলাম

আমরা সবাই।'

'কটা বাজে তখন?'

'সাড়ে সাতটা হবে।'

'স্যাটেলাইট নিয়ে কী করলেন ডাক্তার কাদের?'

'নিজের বাড়ির ভেতর নিয়ে গেলেন। তারপর ওটা আর আমরা কেউ দেখিনি। আটটা কি সাড়ে আটটার দিকে শুরু হলো ব্যাপারটা, বুঝলেন। আমি গ্যাস স্টেশনের ওদিকটায় ছিলাম, গল্প করছিলাম রুনির সঙ্গে, সেদিন রাতে তারই ডিউটি ছিল ওখানে। খুব শীত, কিন্তু ব্যথাটা ভুলে থাকার জন্য কারও সঙ্গে কথা বলার দরকার ছিল আমার। দোকান থেকে এক বোতল পানি কিনি, ওখানে দাঁড়িয়েই দু-তিনটে অ্যাসিপিরিন গিলি। নেশা নেশা ভাবটা তখনো যায়নি...'

'সেদিনও আপনি স্পিরিট খেয়েছিলেন?'

'এই সামান্য...'

'কটার সময়?'

'এই ছটার দিকে।'

'কেমন লাগছিল আপনার?'

'গ্যাস সহকারী রুনির সঙ্গে যতক্ষণ ছিলাম, ভালোই ছিলাম। একটু আচ্ছন্ন, পেটও ব্যথা করছিল, তবু ভালো ছিলাম। ততক্ষণে রুনি আমাকে অফিসে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছে। তারপর, তারপর একদম হঠাৎ, বুঝলেন, "ও আল্লাহ, আমার মাথা!" বলে লাফ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল সে। বেরিয়েই পড়ে গেল ওখানে, একদম রাস্তার ওপর। পড়ার পর না নড়ল, না শব্দ করল।

'কী ঘটল, কী বুঝব, কিছুই জানা ছিল না। ভাবলাম ওর হার্ট অ্যাটাক করেছে, বয়স যদিও অনেক কম। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখি বেঁচে নেই। তারপর...তারপর সবাই বেরিয়ে আসতে শুরু করল, একেবারে যেন দলবেঁধে। রুনির পর সম্ভবত কানি বেওয়া। তারপর কে বা কারা মনে নেই, সংখ্যায় তারা এত বেশি। স্রেফ হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসছিল। সবাই তারা যার যার বুক খামচে ধরে পড়ে যাচ্ছিল, যেন পা পিছলে গেছে। পড়ার পর আর কেউ উঠল না। পড়ার পর কেউ একটা শব্দ করল না।'

'আপনি কী ভাবছিলেন?'

'আমার মাথা কাজ করছিল যে ভাবব! এ রকম তো ঘটে না, তাই আমার মাথা নিতে পারছিল না। ভয়ে...কী বলব। তবে সারাক্ষণ চেষ্টা করেছি শান্ত থাকার। পারিনি, জানা কথা। আমার পুরোনো হার্ট ধাম ধাম বাড়ি মারছিল পাঁজরে। এমন হাঁপাচ্ছিলাম, নাক দিয়ে শিস দেওয়ার আওয়াজ বেরোচ্ছিল। ভয় পাব না বলেন? যখন বুঝতে পারছিলাম সবাই মারা গেছে? তারপর শুনতে পেলাম বাচ্চাটা কাঁদছে। বুঝলাম, না, সবাই না। তারপর জেনারেলকে দেখতে পেলাম।'

'জেনারেল?'

'সত্যিকার না, তবে এত বেশি জঙ্গি মেরেছেন যে আমরা সবাই তাঁকে জেনারেল বলে ডাকতাম। হলুদ একটা ইউনিফর্মও পরতেন। যেমন লম্বা তেমনি চওড়া, গায়ে অসুরের শক্তি। সত্যিকার ভালো মানুষ, আমাদের জেনারেল শেখ শাহানশা। বয়সে আমার চেয়ে কিছু বড়ই হবেন। কনকনে শীতের রাত হলেও, আকাশে বিরাট চাঁদ ছিল, দেখি কি বারান্দায় একা দাঁড়িয়ে রয়েছেন, গায়ে পুরোদস্তুর ইউনিফর্ম। আমাকে রাস্তায় দেখতে পেয়ে ডাক দিলেন। "কে যায়, সুবীর বাবুনি?" বললাম, "হ্যাঁ।" তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কী ঘটবার লাগছে কইবার পারেন? কব্বর থে নিয়াজি আর টিক্কা হালায় উইট্টা আইলনি?" আমার হাসি পায়নি। বললাম, "শাহানশা, স্যার, আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে?" তিনি বললেন, "আপনে কওনের পর শরীলডা বালা ঠেকতাছে না।" তারপর তিনি বাড়ির ভেতর ঢুকলেন। সন্দেহ নেই, অবশ্যই তাঁর মাথা বিগড়ে গিয়েছিল, কারণ ঘরে ফিরেই নিজেকে গুলি করেন তিনি। তবে বাকি আরও অনেকের মাথা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এটা আসলে রোগ।'

'কী করে বুঝলেন?'

'মানুষ নিজেকে গুলি করে না বা ডুবে মরে না, মাথা যদি সুস্থ থাকে। ওই শহরের সবাই সুস্থ আর স্বাভাবিক ছিল, ওই রাতের আগে পর্যন্ত। তারপর সবাই স্রেফ পাগল হয়ে গেল।'

'আপনি কী করলেন?'

'নিজেকে আমি বললাম, চাকমার পো, তুমি স্বপ্ন দেখছ। এত স্পিরিট খেলে আর কী হবে। তাই আমি বাড়ি ফিরে শুয়ে পড়লাম, ভাবলাম সকালে সুস্থ হয়ে যাব। কিন্তু ঘুম আসছিল না। তারপর রাত দশটার দিকে ইঞ্জিনের আওয়াজ পেলাম। গাড়ি করে কারা এল দেখার জন্য বাইরে বেরোলাম আবার। দেখলাম কার নয়, ভ্যান, ভেতরে দুজন লোক রয়েছে। হেঁটে আমি তাদের কাছে গেলাম, কিন্তু তারা পড়ে গিয়ে মারা গেল না। আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার...'

'অদ্ভুত ব্যাপার? কী?'

'ওই রাতে ওটা ছিল দ্বিতীয় গাড়ি অথচ সাধারণত প্রতি রাতে আরও অনেক গাড়ি আসা-যাওয়া করে।'

'আরেকটা গাড়ি এসেছিল?'

'হ্যাঁ। তার নাম সোহান বারি, হাইওয়ে পেট্রল। ব্যাপারটা শুরু হবার দশ কি পনেরো সেকেন্ড আগে দেখলাম তাকে। যদিও থামেনি। প্রায়ই থামে না। রেগুলার না, মাঝেমধ্যে তার ডিউটি পড়ে ওদিকে...' হাই তুললেন সুবীর। 'কথা আমাকে নিস্তেজ করে ফেলেছে। একটু ঘুমাতে পারি? দরকার হলে পরে আবার জেরা করবেন?'

মাথা ঝাঁকালেন নওয়াব, ক্রল করে টানেলে ঢুকছেন, তাঁর ইচ্ছে হলো ওই টানেলেই ঘুমিয়ে পড়েন। আতঙ্কিত হয়ে নিষেধ করলেন নিজেকে: 'এই, না!'

২২. পতেঙ্গা বিমানঘাঁটি

একটা ফুটবল মাঠের সমান কামরা। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখা কিছু ফার্নিচার আছে, বেশির ভাগই চেয়ার-টেবিল। টেকনিশিয়ানরা পরস্পরকে ডাকাডাকি করছেন, প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসছে তাঁদের কথা। বিধ্বস্ত মরীচিকার অবশিষ্ট যা কিছু পাওয়া গেছে সব কুড়িয়ে এনে রাখা হয়েছে এখানে, পোস্ট টিম ঠিক যেভাবে কুড়িয়ে পেয়েছিল সেভাবে। মেজর আবদুল্লাহ, ক্লান্ত, চোখ লাল, এক কোণে দাঁড়িয়ে কাজ কতটুকু এগোচ্ছে দেখছেন। তাঁর দৃষ্টিতে দৃশ্যটার মধ্যে সুররিয়ালিস্টিক একটা ব্যাপার আছে।—পতেঙ্গা বিমানঘাঁটির সাদা চুনকাম করা একটা কামরায় এক ডজন লোক টুকরো হওয়া প্লেন জোড়া লাগিয়ে বোঝার চেষ্টা করছে কীভাবে ঘটনাটা ঘটেছিল।

বায়োকেমিস্টদের একজন তাঁর দিকে এগিয়ে এলেন, হাতে স্বচ্ছ প্লাস্টিকের ব্যাগ। ব্যাগে ভরা জিনিস মেজরের নাকের সামনে নাড়লেন তিনি। 'এই মাত্র ল্যাব থেকে ফেরত পেলাম।'

'কী ওটা?'

'কক্ষনো আন্দাজ করতে পারবেন না।' উত্তেজনায় ভদ্রলোকের চোখ চকচক করছে।

ঠিক আছে, পারব না আন্দাজ করতে, অস্বস্তি নিয়ে ভাবলেন মেজর আবদুল্লাহ। 'কী জিনিস?'

'একটা ডিপলিমারাইজড পলিমার,' বায়োকেমিস্ট বললেন, সন্তুষ্টচিত্তে চাপড় মারলেন নিজের পায়ে। 'এই মাত্র ল্যাব থেকে ফিরে এসেছে।'

'কী ধরনের পলিমার?'

'একটা পলিমার হলো রিপিটিং মলিকিউল, হাজার হাজার

একই ইউনিট দিয়ে গঠিত, একটার ওপর একটা চৌকো চাকতির মতো সাজানো। বেশির ভাগ প্লাস্টিক, নাইলন, রেয়ন, প্লান্ট সেলুলোজ এবং এমনকি মানুষের শরীরের গ্লাইকোজেনও পলিমার।

'প্লাস্টিকের একটা পলিমার মরীচিকা জেটের এয়ার হোসে ব্যবহার করা হয়েছে। পাইলটের ফেস মাস্কেও। এ পর্যন্ত জানি আমরা।'

ভ্রু কুঁচকালেন মেজর। ব্যাগের ভেতর উঁকি দিয়ে কালো পাউডারের দিকে একবার তাকালেন। 'প্লাস্টিক?'

'হ্যাঁ। একটা পলিমার, ডিপলিমারাইজড। ওটা ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে। সেটা কোনোভাবেই ভাইব্রেশনের ফলে ঘটতে পারে না। ওটা বায়োকেমিক্যাল এফেক্ট—হতে বাধ্য—নির্ভেজাল অর্গানিক।'

ধীরে ধীরে ব্যাপারটা ধরতে পারছেন মেজর। 'আপনি বলতে চাইছেন কিছু একটা প্লাস্টিক ছিঁড়ে আলাদা করে ফেলেছে?'

'হ্যাঁ, তা আপনি বলতে পারেন,' বায়োকেমিস্ট উত্তর দিলেন। 'সেটা সহজ করে বলা হবে, অবশ্যই, তবে...'

'কী সেই জিনিস, ওটাকে ছিঁড়েছে?'

বায়োকেমিস্ট কাঁধ ঝাঁকালেন। 'নিশ্চয় একধরনের কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন। অ্যাসিড এটা করতে পারে, কিংবা তীব্র তাপ, অথবা...'

'অথবা?'

'একটা মাইক্রোঅর্গানিজম, আমার ধারণা। এ রকম কোনো জীবাণুর যদি অস্তিত্ব থাকে, যেটা প্লাস্টিক খেয়ে ফেলে। যদি আপনি বুঝে থাকেন আমি কী বলতে চাইছি।'

'বোধ হয় বুঝতে পারছি আপনি কী বলতে চাইছেন।' মাথা ঝাঁকালেন মেজর আবদুল্লাহ।

কামরা ছাড়লেন তিনি, দালানের আরেক অংশে চলে গেলেন, কেব্‌ল ট্রান্সমিটারের কাছে। একটা মেসেজ লিখে টেকনিশিয়ানের হাতে ধরিয়ে দিলেন, এখনই দাবানল গ্রুপের কাছে পাঠাতে হবে।

ওখানে অপেক্ষা করছেন তিনি। একসময় জিজ্ঞেস করলেন, 'এখনো কোনো রিপ্লাই আসেনি?'

'রিপ্লাই, স্যার?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন টেকনিশিয়ান।

'প্রকল্প দাবানল থেকে,' বললেন মেজর আবদুল্লাহ। তাঁর কাছে এটা অবিশ্বাস্য মনে হলো যে মরীচিকা বিধ্বস্ত হবার খবর শুনে কেউ সেভাবে তৎপর হয়নি। এটা তো পরিষ্কারই বোঝা যায় ওই ব্যাপারটার সঙ্গে একটা যোগাযোগ আছে...

'প্রকল্প দাবানল, স্যার?' প্রশ্ন করলেন টেকনিশিয়ান।

চোখ রগড়ালেন মেজর। সত্যি অসম্ভব ক্লান্ত তিনি। মনে রাখতে হবে নিজের মুখের হাঁ বন্ধ রাখতে হবে তাঁকে। 'ভুলে যান,' বললেন তিনি।

সুবীর চাকমার সঙ্গে কথা বলার পর সদয় জাহানের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন উত্তম নওয়াব। ডক্টর জাহান ময়নাতদন্তের কামরায় রয়েছেন, আগের দিনের স্লাইডগুলো দেখছেন।

নওয়াব জিজ্ঞেস করলেন, 'কিছু পেলেন?'

মাইক্রোস্কোপের কাছ থেকে পিছু হটলেন ডক্টর জাহান, দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'না। কিছু না।'

'আমি সেই থেকে ওই মানসিক বিপর্যয়ের বিষয়টা নিয়ে আবার ভাবছি,' বললেন সার্জেন। 'সুবীর বাবুর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে নতুন করে মনে পড়ল। ওই শহরের বেশ কজন মানুষ মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন—কিংবা, অন্তত উদ্ভট আচরণ করছিলেন, হয়ে উঠেছিলেন আত্মহত্যাপ্রবণ—ওই রাতে। তাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বৃদ্ধ।'

ডক্টর জাহান ভ্রু কুঁচকালেন। 'ইয়েস?'

'সুবীর বাবুর মতো বয়স্ক মানুষ,' বললেন নওয়াব। 'অনেক সমস্যায় ভুগছিলেন তাঁরা। নানা দিক থেকে ভেঙে পড়ছিল তাঁদের শরীর। ফুসফুসের অবস্থা ভালো না। হার্টের অবস্থা ভালো না। লিভার যায় যায় করছে। শিরায় শিরায় চর্বির স্তর জমেছে।'

'এবং এগুলো রোগের প্রসেসকে বদলে দিচ্ছে?'

'হয়তো। চিন্তা করছি। কী জিনিস একজন মানুষকে দ্রুত পাগল বানিয়ে ফেলতে পারে?'

ক্লান্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন জাহান।

'আরও একটা ব্যাপার আছে,' বললেন নওয়াব। 'সুবীর বাবু মনে করতে পেরেছেন ভুক্তভোগীদের একজন বলেছেন, "ও আল্লাহ, আমার মাথা!"'

শূন্যে তাকিয়ে থেকে ডক্টর জাহান জানতে চাইলেন, 'মারা যাবার ঠিক আগে?'

'ঠিক আগে।'

'আপনি রক্তক্ষরণের কথা ভাবছেন?'

নওয়াব মাথা ঝাঁকালেন। 'এটার অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়,' বললেন তিনি। 'অন্তত চেক করে দেখার মতো।'

জীবাণু অ্যান্ড্রোমেডা স্ট্রেইন যদি কোনো কারণে মগজের ভেতর রক্তক্ষরণ ঘটায়, তাহলে তা থেকে দ্রুত মানসিক বিপর্যয়ের মতো অঘটন ঘটতে পারে—মানুষ তখন স্বাভাবিক আচরণ করতে পারবে না। 'কিন্তু আমরা তো ইতিমধ্যে জেনেছি যে এই জীবাণু কাজ করে রক্ত জমাট বাঁধিয়ে।'

'হ্যাঁ,' বললেন নওয়াব, সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে তাঁর, 'বেশির ভাগ মানুষের ক্ষেত্রে। সবার বেলা নয়। কেউ কেউ সারভাইভ করেছে, কেউ কেউ পাগল হয়ে গেছে।

'

মাথা ঝাঁকালেন ডক্টর জাহান। হঠাৎ করে উত্তেজিত বোধ করছেন। ধরা যাক জীবাণুটা রক্তবাহী নালির ক্ষয়ক্ষতি করার মাধ্যমে কাজ করে। এই ক্ষয়ক্ষতি রক্ত জমাট বাঁধার সূচনা ঘটায়। যেকোনো মুহূর্তে একটা রক্তবাহী নালির দেয়াল ছিঁড়ে যেতে পারে, কেটে যেতে পারে, পুড়ে যেতে পারে, তারপর রক্ত জমাট বাঁধার সিকোয়েন্স শুরু হয়ে যাবে।'

'ভাবছি,' বিড়বিড় করছেন নওয়াব, 'আমাদের জীবাণু রক্তবাহী নালির দেয়ালে হামলা চালাচ্ছে কি না। যদি চালায়, তা থেকে রক্ত জমাট বাঁধা শুরু করবে। কিন্তু নির্দিষ্ট কিছু লোকের বেলায় যদি রক্ত জমাট বাঁধা ঠেকানো যায়, জীবাণু তখন হয়তো রক্তবাহী নালি খেতে শুরু করতে পারে, আর তাতে ওই ব্যক্তিদের রক্তক্ষরণ হতে পারে।'

'আর শুরু হতে পারে মানসিক বিপর্যয়,' সদয় জাহান বললেন। স্লাইডগুলো হাতড়াচ্ছেন তিনি। ব্রেনের তিনটে স্লাইড পাওয়া গেল। ওগুলো তিনি চেক করলেন।

তাঁদের ধারণাই ঠিক।

'তবে আরও একটা সমস্যা আছে,' ডক্টর জাহান বললেন। 'প্রায় সব মানুষের বেলায় রক্ত জমাট বেঁধেছে ফুসফুসে। এটা আমরা জানি। ধরে নিতে হবে নালি ধ্বংস হওয়াও ওখান থেকে শুরু হয়। তাহলে পার্থক্য...'

থেমে গেলেন তিনি।

সেই ইঁদুরগুলোর কথা মনে পড়ে গেছে, যেগুলোকে তিনি হেপারিন ইনজেকশন দিয়েছিলেন—রক্ত জমাট বাঁধা ঠেকাবার ওষুধ। যেগুলো মারা গিয়েছিল, কিন্তু একটারও ময়নাতদন্ত করা হয়নি।

'মাই গড!' বললেন তিনি।

কোল্ডস্টোরেজ থেকে একটা ইঁদুর বের করে এনে কাটলেন তিনি। ওটা থেকে রক্ত ঝরল। তাড়াতাড়ি খুলি কেটে মগজ বের করলেন, দেখলেন হলুদ মগজে পরিষ্কার রক্ত লেগে রয়েছে।

'পেয়ে গেছেন আপনি,' বললেন নওয়াব।

'পশু যদি স্বাভাবিক হয়, সেটা মারা যাবে রক্ত জমাট বেঁধে, সেটা শুরু হবে ফুসফুসে। কিন্তু রক্ত জমাট বাঁধা যদি ঠেকিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে জীবাণুটা মগজের রক্তবাহী নালির ক্ষতি করে, ফলে রক্তক্ষরণ শুরু হয়।'

'এবং মানসিক বিপর্যয়।'

'হ্যাঁ।' ডক্টর জাহান এখন খুব উত্তেজিত। 'আর জমাট বাঁধা ঠেকানো যাবে রক্তে যেকোনো সমস্যা থাকলে। কিংবা খুব কম ভিটামিন কে। ম্যালাবজরশসন সিনড্রোম। লিভার ফাংশন পুওর। ক্ষতিগ্রস্ত প্রোটিন সিনথেসিস। এক ডজন কারণের যেকোনো একটা।'

'আর এগুলোর বেশির ভাগই একজন বয়স্ক মানুষের মধ্যে পাওয়া যাবে,' বললেন নওয়াব।

'সুবীর বাবুর কি এগুলোর একটা আছে?' জানতে চাইলেন ডক্টর জাহান।

উত্তর দিতে লম্বা সময় নিলেন নওয়াব। তারপর একসময় বললেন, 'না। তাঁর লিভারের অসুখ আছে, তবে সেটা সিরিয়াস কিছু না।'

ডক্টর জাহান দীর্ঘশ্বাস ফেললেন; তাঁর চেহারা এমন হয়েছে, যেন ওখানেই ঠাস করে পড়বেন এবং মারা যাবেন সঙ্গে সঙ্গে। 'তাহলে তো আবার সেই আগের জায়গাতেই ফিরে এলাম।'

'ঠিক তা নয়। কারণ সুবীর বাবু আর বাচ্চাটা বেঁচে গেছে। ওদের রক্তক্ষরণ হয়নি—যতটুকু জানি আমরা—বেঁচে আছে বিনা স্পর্শে।'

'অর্থ?'

'অর্থ হলো কোনোভাবে তারা প্রাথমিক প্রক্রিয়ায় বাধা তৈরি করতে পেরেছিল, আর সেটা ছিল শরীরের রক্তবাহী নালির দেয়ালে জীবাণুর আক্রমণ। অ্যান্ড্রোমেডা স্ট্রেইন জীবাণু ফুসফুসে যায়নি, কিংবা যায়নি ব্রেনেও। কোথাও যায়নি ওটা।'

'কিন্তু কেন?'

'সেটা আমরা বুঝব তখন,' বললেন নওয়াব, 'যখন জানব সত্তর পার হওয়া এক স্পিরিটখেকো আলসারের রোগী কী কারণে দু মাস বয়সী শিশুর মতো হয়ে যায়।'

'ওরা দুজন যথেষ্ট বিপরীত,' বললেন সদয় জাহান।

আরও কয়েক ঘণ্টা পর নওয়াব উপলব্ধি করবেন ডক্টর জাহান তাঁকে ধাঁধাটার উত্তর পাইয়ে দিয়েছেন।

২৩. মূল্যায়ন

একটা পরীক্ষার রেজাল্ট পাওয়া গেল, জীবাণুটা সবচেয়ে বেশি বাড়ছে শতকরা এক শ ভাগ কার্বন-ডাই-অক্সাইডে, আলট্রাভায়োলেট রেডিয়েশনের দ্বারা আলোকিত অবস্থায়। সবচেয়ে কম বাড়ে খাঁটি অক্সিজেনে, পুরোপুরি অন্ধকারে।

'এটা থেকে কী বুঝছেন আপনি?' জিজ্ঞেস করলেন ডক্টর মুশফিক।

'নির্ভেজাল কনভারশন সিস্টেম বলে মনে হচ্ছে,' ডক্টর বাবর বললেন।

সন্তুষ্ট হতে না পেরে কম্পিউটারের বোতামে চাপ দিলেন মুশফিক, ক্লোজড-গ্রোথ সিস্টেম স্টাডির মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়ার মেটাবলিজম বুঝতে চান, তাতে ওয়েস্ট প্রোডাক্ট আউটপুট জানা যাবে।

রেজাল্ট দেখে তাঁরা অবাক। ওই জীবাণুর কোনো বর্জ্য নেই।

এটা সবকিছু হজম করে, বের করে না কিছুই। খালি মহাশূন্যের জন্য আদর্শ বলা যায়।

মুশফিক বললেন, 'এই জীবাণু যদি সত্যি ম্যাটারকে এনার্জিতে আর এনার্জিকে ম্যাটারে পরিণত করে, তাহলে এটা খুদে একটা রিঅ্যাক্টর হিসেবে কাজ করছে।'

টেলিপ্রিন্টারে খবর এল, সুবীর বাবু আর কাঁদুনে শিশু ছাড়াও সাত জেলার বিশটা উপজেলায় আরও বহু মানুষ বেঁচে গেছে। অ্যান্ড্রোমেডা স্ট্রেইন তাদের ওপর কোনো রকম প্রভাব ফেলতে পারেনি। তাদের প্রায় সবাই হাজার হাজার লাশের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে অন্য কোনো জেলায় চলে গেছে, সেনাবাহিনীর মেডিকেল টিম পৌঁছানোর আগেই।

ভারত ও বাংলাদেশে অ্যান্ড্রোমেডা স্ট্রেইনের হামলাকে জাতিসংঘ মানবিক বিপর্যয় ঘোষণা করেছে, বাংলাদেশের আঠারোটা আন্তর্জাতিক মানের এয়ারপোর্টে গত চব্বিশ ঘণ্টা আগে থেকে প্রতি ঘণ্টায় তিনটে করে কার্গো প্লেন ল্যান্ড করছে মেডিকেল সাপ্লাই আর মেডিকেল টিম নিয়ে।

যারা বেঁচে গেছে তাদের মধ্যে সোহান বারি একজন। ইনিও, সুবীর বাবু এবং শিশুটির মতো, হাতিমারা সারভাইভার। হাইওয়ে পেট্রল অফিসার, প্রথমে হাতিমারার পাশ ঘেঁষে গাড়ি চালিয়ে গেছেন, পরে হাতিমারার উত্তরে বাতাসের সাহায্যে যখন জীবাণু ছড়াতে শুরু করল এবং বনরক্ষীদের একের পর এক মেরে ফেলতে লাগল, তখনো ওই সব জায়গায় গেছেন তিনি।

তাঁর সন্ধান পাওয়া গেল ফরাসি মেডিকেল টিমের অস্থায়ী হসপিটালে, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে কিছু তথ্য সংগ্রহ করলেন উত্তম নওয়াব। লোকটার আলসার নেই, তবে ডায়াবেটিস আছে। ভুল করে হোক বা অবহেলা করে, প্রায়ই তিনি ইনসুলিন নেন না, ফলে মাঝেমধ্যে কোমায় চলে যান। ইনসুলিন না নেওয়ার কারণে অ্যাসিডস দেখা দেয় তাঁর মধ্যে—এটা একটা ব্লাড কন্ডিশন, যাতে বাইকার্বোনেট কনসেনট্রেশন স্বাভাবিকের চেয়ে নিচে নেমে যায়।

তিনটে নমুনা।

একজন ডায়াবেটিসের রোগী, যার অ্যাসিডস আছে, ইনসুলিন না নেওয়ার কারণে।

এক বৃদ্ধ মানুষ, যিনি স্পিরিট এবং অন্যান্য অস্বাভাবিক মাদক নিতেন, নিতেন অ্যাসপিরিনও, তিনিও অ্যাসিডসের শিকার।

একটা শিশু।

একজন চেঁচাতে চেঁচাতে মরে যাবার মতো অবস্থায় পৌঁছে যায়, কিন্তু মরে না, বেঁচে থাকে। বাকি দুজন সুস্থ-সবল, তাঁদেরও মরার কোনো লক্ষণ নেই। একজন পাগল হয়ে গেছে, বাকি দুজন মানসিকভাবে সুস্থ। তিনজনের মধ্যে কোথাও না কোথাও একটা মিল আছে।

উত্তম নওয়াব পায়চারি শুরু করতে যাবেন, এই সময় ইমার্জেন্সি বেল বেজে উঠল। আওয়াজটার তীক্ষ্ণ, জরুরি ও কর্কশ একটা সুর আছে, একই সঙ্গে উজ্জ্বল হলুদ আলো জ্বলতে-নিভতে লাগল।

বন করে ঘুরে দরজার দিকে ছুটলেন নওয়াব।

২৪. সিল

করিডরে বেরোতেই আলোর সাইন দেখতে পেলেন নওয়াব, তাতে সমস্যার উৎস সম্পর্কে আভাস পাওয়া গেল: ময়নাতদন্ত। সমস্যাটা কী হতে পারে আন্দাজ করতে পারছেন তিনি, যেভাবেই হোক সিল ভেঙে গেছে এবং সংক্রমণ ঘটেছে। তাতে অ্যালার্ম বাজবে।

করিডর ধরে ছুটছেন, একটা শান্ত ভারি গলা ভেসে এল লাউড স্পিকার থেকে, 'ময়নাতদন্ত সেকশনের সিল ভেঙে গেছে। ময়নাতদন্ত সেকশনের সিল ভেঙে গেছে। এটা একটা

জরুরি অবস্থা।'

ল্যাব থেকে বেরিয়ে এসে তাঁকে দেখতে পেলেন সহকারিণী। 'কী ঘটল?'

'ডক্টর জাহান, আমার ধারণা। জীবাণু ছড়িয়ে পড়েছে।'

'তিনি ভালো আছেন তো?'

'কী জানি, আমার সন্দেহ আছে,' বললেন নওয়াব, ছুটছেন। এক সেকেন্ড ইতস্তত করে তাঁর সঙ্গে ছুটলেন তরুণীও।

মরফলজি রুম থেকে বেরিয়ে এলেন ডক্টর বাবর, করিডর ধরে ওঁদের সঙ্গে ছুটছেন, ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে এগিয়েছে সেটা। নওয়াব ভাবলেন, এত বয়স হওয়া সত্ত্বেও বেশ ভালোই দৌড়াচ্ছেন ডক্টর বাবর, আর ঠিক এই সময় আচমকা ছিটকে করিডরের মেঝেতে পড়ে গেলেন। বাকি দুজন হকচকিয়ে গেলেন। ফিরে এসে দেখেন, বাবর নড়ছেন না, চোখ খোলা, তাকিয়ে আছেন জ্বলতে-নিভতে থাকা আলোর দিকে। তাঁকে ধরে তুলতে যাবেন নওয়াব, সহকারিণী বললেন, 'ডক্টর নওয়াব, ডক্টর বাবরকে নিয়ে সমস্যা আছে।'

বাবরের চোখের সামনে দিয়ে হাত নিয়ে গেলেন নওয়াব, তাঁর কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। এই সময় মিটমিট করা আলোর কথা মনে পড়ল তাঁর, যে আলোর দিকে তাকাতে না পেরে আরেক দিকে মুখ ঘুরিয়ে নেন ডক্টর বাবর।

'ডাইনির বাচ্চা!' দাঁতে দাঁত পিষে বিড়বিড় করলেন নওয়াব, 'আর সময় পেল না!'

বাবরের ঠোঁটের কোণ থেকে লালা গড়াচ্ছে।

'তাঁর চোখের সামনে হাত রাখুন, মিটমিটে আলোর দিকে যাতে তাকাতে না পারেন।'

এই সময় বাবরের খিঁচুনি আরম্ভ হলো, শুরু হলো হাত আর পা থেকে, তারপর সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। দাঁত পিষে আছেন, হাঁপানোর মতে আওয়াজ করছেন, তাঁর মাথা মেঝেতে বাড়ি খাচ্ছে বারবার। ওরা তাকিয়ে আছেন, বাবরের কোমরের কাছে হলুদ দাগ ছড়িয়ে পড়ল।

'কাপড় নষ্ট,' বললেন নওয়াব। 'আপনি ফার্মেসিতে যান, এক শ মিলিগ্রাম ফেনোবারব নিয়ে আসুন, সিরিঞ্জে।'

বাবরের খিঁচুনি বন্ধ হবার পর ইনজেকশন দেওয়া হলো।

'ওঁর সঙ্গে থাকুন আপনি,' সহকারিণীকে বললেন নওয়াব। 'আবার খিঁচুনি উঠলে আমি যা করেছি তা-ই করবেন।'

করিডর ধরে ছুটতে ছুটতে ময়নাতদন্ত সেকশনের সামনে চলে এলেন নওয়াব। দরজার নব ধরে ঘোরাতে চাইছেন, কিন্তু সেটা ঘুরছে না, তারপর মনে পড়ল সেকশনটা সিল করে দেওয়া হয়েছে। কারণ ল্যাবে সংক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। ছুটে মেইন কন্ট্রোলে চলে গেলেন, ওখানে ডক্টর মুশফিকের সঙ্গে দেখা হলো, কনসোলের সামনে বসে ডক্টর সদয় জাহানের দিকে তাকিয়ে আছেন—ক্লোজড সার্কিট টিভি মনিটরে।

ডক্টর জাহান আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। মুখ সাদা কাগজ, শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত, অগভীর হাঁপানির মতো এবং কথা বলতে পারছেন না। ঠিক যেমনটি দেখাবার কথা তেমনটি দেখাচ্ছে তাঁকে : মৃত্যুর ছোবল খাবার জন্য অপেক্ষায় থাকা একজন মানুষ।

ডক্টর মুশফিক তাঁকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছেন। 'আপনি, ভাই, এটাকে স্রেফ সহজভাবে নিতে চেষ্টা করুন। আপনি ঠিক থাকবেন। শুধু সহজভাবে নিন।'

'আমি ভয়ে মরে যাচ্ছি,' ডক্টর জাহান বললেন। 'ভয়ে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ছি।'

'শান্ত থাকুন, সহজভাবে নিন,' গলার সুর আরও নরম করে বললেন ডক্টর মুশফিক। 'আমরা জানি অ্যান্ড্রোমেডা স্ট্রেইন অক্সিজেনে ভালো কাজ করে না। আমরা এখন আপনার ল্যাবে পিওর অক্সিজেন পাম্প করছি। আপাতত এটা আপনাকে ঠিক রাখবে।'

নওয়াবের দিকে ফিরলেন মুশফিক। 'এখানে আসতে অনেক সময় নিলেন আপনি। ডক্টর বাবর কোথায়?'

'তাঁর জ্ঞান নেই,' বললেন নওয়াব।

'হোয়াট?'

'আপনার আলো সেকেন্ডে তিনবার ঝিলিক দেয়, তাতে তাঁর খিঁচুনি উঠে গিয়েছিল।'

'হোয়াট?'

'মৃগী, তবে সিরিয়াস না। ফেনোবারব দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে এসেছি।'

'ডক্টর বাবরের মৃগী রোগ আছে?'

'হ্যাঁ।'

'তাঁর নিশ্চয় অজানা ছিল না।' তারপর মুশফিকের মনে পড়ল, ডক্টর বাবর বারবার ব্রেনের ইলেকট্রিক্যাল অ্যাকটিভিটি জানার চেষ্টা করেন। 'তাড়াতাড়ি সেরে উঠবেন না?'

'আমরা তাঁকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে রাখব।'

মুশফিক বললেন, 'ডক্টর জাহানকে পিওর অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে। আমরা আরও কিছু জানার আগে ওটা সাহায্যে আসবে।' বোতাম টিপে মাইক্রোফোন বন্ধ করলেন তিনি। 'আসলে অক্সিজেন পাঠাতে কয়েক মিনিট সময় লাগবে, যদিও ডক্টর জাহানকে বলা হয়েছে অক্সিজেন যাচ্ছে। তাঁকে আমরা ওখানে সিল করে রেখেছি, কাজেই ওই পয়েন্টে থেমে গেছে ইনফেকশন। ঘাঁটির বাকি অংশ ঠিক আছে, অন্তত।'

নওয়াব জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্যাপারটা কীভাবে ঘটেছে? সংক্রমণ?'

'কীভাবে আবার, নিশ্চয় সিল ভেঙে গেছে।' গলা নিচু করে আরও বললেন, 'আমরা জানতাম এটা ঘটবে, আগে হোক বা পরে। সব আইসোলেশন ইউনিট একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর ভেঙে পড়ে।'

নওয়াব জানতে চাইলেন, 'আপনার ধারণা এটা একটা র‍্যানডম ইভেন্ট?'

'হ্যাঁ। স্রেফ একটা দুর্ঘটনা। এত বেশি সিল। এত বেশি রাবার। এত এত পুরুত্ব। সময় দিন, সব ভেঙে পড়বে। এ রকম একটা ভেঙে পড়ার ঘটনা যখন ঘটেছে, ঘটনাচক্রে ডক্টর জাহান ওখানে ছিলেন।'

মনিটরের দিকে ফিরে ডক্টর জাহানকে দেখছেন নওয়াব। 'কতক্ষণ হলো ওখানে আটকা পড়ে আছেন তিনি?'

স্টপ ওয়াচের দিকে তাকালেন ডক্টর মুশফিক। 'চার মিনিট।'

'জাহান সাহেব এখনো বেঁচে আছেন।'

'হ্যাঁ। আল্লাহর দয়া।' তারপর ভ্রু কুঁচকালেন মুশফিক। পয়েন্টটা ধরতে পেরেছেন তিনি।

'কেন?' প্রশ্ন করলেন নওয়াব, 'তিনি এখনো বেঁচে আছেন কেন?'

'অক্সিজেন...

'আপনি নিজেই তো বললেন অক্সিজেন এখনো দেওয়া হচ্ছে না। কী সেটা জাহানকে রক্ষা করছে?'

এই সময় ইন্টারকমে ডক্টর জাহান বললেন, 'আমি চাই আপনারা আমার জন্য কিছু করুন।'

মাইক্রোফোন অন করলেন মুশফিক। 'কী?'

'কোলাসিন,' বললেন সদয় জাহান।

'না,' জবাব দিলেন ডক্টর মুশফিক।

নওয়াব বললেন, 'আমরা চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

'অসম্ভব, প্রশ্নই ওঠে না। আমাদের এত দুঃসাহসিক হওয়া সাজে না। এমনকি একবারও নয়।'

কোলাসিন নতুন ওষুধ, নিষিদ্ধও বটে। পৃথিবীতে এমন কোনো রোগ নেই যেটা ভালো করতে পারে না কোলাসিন। সমস্ত জীবাণু মেরে সাফ করে দেবে, ভালো-মন্দ কোনো বাছবিচার না করেই। হাজার হাজার ক্যানসার রোগী ভালো

হয়েছে। কিন্তু কোলাসিনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ভয়াবহ। যাঁরা কোলাসিন গ্রহণ করে ভালো হয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকে কিছুদিনের মধ্যে মারা গেছেন অচেনা রোগে। কারও শরীর স্রেফ বেলুনের মতো ফুলে গেছে। কারও শরীর মোমের মতো গলে গেছে।'

এখন সদয় জাহান ওষুধটা নিতে চাইছেন।

'না,' বললেন ডক্টর মুশফিক। 'সম্ভব নয়। ওই ওষুধ একটা সময় পর্যন্ত হয়তো আপনাকে বাঁচিয়ে রাখবে, কিন্তু পরে আপনি বাঁচবেন না, যখন আপনাকে বের করে আনা হবে।'

'আপনি যে অবস্থানে আছেন, এ কথা বলা আপনার জন্য সহজ।'

'না, আমার জন্য বলা সহজ নয়। বিশ্বাস করুন, সত্যি সহজ নয়।' মাইক্রোফোনে হাতচাপা দিলেন ডক্টর মুশফিক, নওয়াবকে বললেন, 'আমরা তাঁকে অক্সিজেনই দিতে যাচ্ছি। বেচারা ভয়ে মরে যাচ্ছেন।'

নওয়াব মাথা ঝাঁকালেন। যেভাবেই হোক, ডক্টর মুশফিকের কথাটা তাঁর মনে গেঁথে গেছে : ভয়ে মরে যাচ্ছেন। বাক্যটা নিয়ে চিন্তা করছেন তিনি, তারপর তাঁর মনে হতে লাগল ডক্টর মুশফিক গুরুত্বপূর্ণ কিছুতে টোকা দিয়েছেন। তাঁর ওই কথা একটা সূত্র। ওটাই উত্তর।

হেঁটে চলে যাচ্ছেন তিনি।

'কোথায় যাচ্ছেন আপনি?'

'আমাকে খানিক চিন্তাভাবনা করতে হবে।'

'কী নিয়ে?'

'ভয়ে মরে যাওয়া নিয়ে।'

২৫. ভয়ে মরে যাই

হনহন করে হেঁটে নিজের ল্যাবে ফিরে এলেন সার্জেন নওয়াব, কাচের ভেতর দিয়ে বৃদ্ধ আর শিশুটির দিকে তাকালেন। ওদের ওপর চোখ রেখে চিন্তা করতে চাইলেও, দেখলেন তাঁর মগজ প্রবল বেগে একের পর এক বৃত্তের ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছে। যুক্তি দিয়ে চিন্তা করা অসম্ভব লাগছে তাঁর, বড় কিছু একটা আবিষ্কারের সন্ধিক্ষণে চলে আসার অনুভূতিটা নষ্ট হয়ে গেছে।

কয়েক মিনিট ধরে বৃদ্ধ আর শিশুটির দিকে তাকিয়ে আছেন, এই সময়ের ভেতর তার মনের পরদায় কিছু ছবি ফুটে উঠে মিলিয়ে যেতে শুরু করল : মানুষ যে যেদিকে পারে দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে...ভারতীয় কাঁটাতারের বেড়া নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, ছুটন্ত মিছিলের পায়ের তলায় চাপা পড়ে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কয়েক শ সদস্য লালচে আঠালো দাগ হয়ে গেল জমিনে, ওপরে ছড়িয়ে আছে গুঁড়ো হওয়া হাড়...একই দৃশ্য বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে। বাংলাদেশিদের প্রবল স্রোতের সামনে নাসাকা বাহিনীকে মনে হলো পাহাড়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছে কটা ইঁদুর...প্রতি ঘন্টায় যেসব প্লেন মেডিকেল টিম আর সাপ্লাই নিয়ে আসছে সেগুলোয় চেপে বসছে আতঙ্কিত মানুষ, সেনাবাহিনীর সদস্যরা শত চেষ্টা করেও তাদের ঠেকাতে পারছে না...ডক্টর সদয় জাহান মারা যাচ্ছেন, তাঁর হাত বুক খামচে ধরে আছে...ইসলামিক কান্ট্রি দাবি করেছে 'বাংলাদেশে আল্লাহর মার' নামে একটা জীবাণু ছেড়েছে তারা...

এগুলো সবই ঘটেছে, বাস্তব সত্য, শুধু একটি বাদে : ডক্টর সদয় জাহান বুক খামচে ধরে মারা যাচ্ছেন না।

এই সময় উত্তম নওয়াব উপলব্ধি করলেন যে তিনি নিজেও ভয়ে মরে যাচ্ছেন। বাক্যটা আবার ফিরে এল তাঁর কাছে।

ভয়ে মরে যাচ্ছে।

কীভাবে জানা নেই, তবে এটাই উত্তর।

ধীরে ধীরে, মগজকে বাধ্য করলেন আরও একবার সতর্কতার সঙ্গে বিষয়টা বিবেচনা করতে।

একজন পুলিশ যার ডায়াবেটিস আছে। একজন পুলিশ যিনি ইনসুলিন নেন না, যার অ্যাসিডোসিস আছে।

এক বৃদ্ধ মানুষ, যিনি স্পিরিট আর স্টেরনো খান, যার ফলে শরীরে মেথাপাইরিলেন আর অ্যাসিডোসিস চলে আসে।

একটা শিশু, সে...সে কী করেছে? কী থেকে অ্যাসিডোসিস পাবে সে?

মাথা নাড়লেন নওয়াব। প্রতিবার, বারবার, শিশুটির কাছে ফিরে আসছেন তিনি, যে শিশু স্বাভাবিক, যে অ্যাসিডটিক নয়। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

শুরু থেকে ধরা যাক, বললেন নিজেকে। যৌক্তিক হও। কারও যদি মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস থাকে—যেকোনো ধরনের অ্যাসিডোসিস—কী করবে সে?

তার শরীরে খুব বেশি অ্যাসিড আছে। শরীরে খুব বেশি অ্যাসিড থাকার কারণে সে মারা যেতে পারে, সে যেন নিজের শিরায় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ইনজেক্ট করল।

খুব বেশি অ্যাসিড মানে মৃত্যু।

তবে শরীর ক্ষতিপূরণ করতে পারে, দ্রুত শ্বাস নিয়ে। কারণ ওভাবে ফুসফুসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বের করে দেয়, আর তাতে শরীরের কার্বলিক অ্যাসিডের সাপ্লাই কমে যায়, যেটা রক্তে কার্বন-ডাই-অক্সাইড তৈরি করে।

অ্যাসিড কমানোর একটা উপায়।

দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস।

আর অ্যান্ড্রোমেডা? কী ঘটে ওই জীবাণুর, আপনি যখন অ্যাসিডটিক এবং দ্রুত দম ফেলছেন?

সম্ভবত দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস জীবাণুকে আপনার ফুসফুসে ঢুকতে এত লম্বা একটা সময় পর্যন্ত বাধা দেয়, সেটা রক্তবাহী নালি পেনিট্রেট করতে পারে না। হতে পারে এটাই উত্তর। কিন্তু তারপরই মাথা নাড়তে লাগলেন। না, অন্য কিছু। সহজ, সরাসরি কোনো ফ্যাক্ট। এমন কিছু, শুরু থেকেই জানা আছে তাঁদের, কিন্তু কেন যেন চিনতে পারেননি।

জীবাণু আক্রমণ করে ফুসফুসের মাধ্যমে।

সেটা রক্তস্রোতে ঢোকে। সেটা শিরার দেয়ালে আসন গেড়ে বসে, বিশেষ করে মগজে।

তাতে ক্ষতি হয়।

শুরু হয় রক্ত জমাট বাঁধা। এটা ঘটতে থাকে সারা শরীরে, আর তা না হলে ব্লিডিং শুরু হয়, শুরু হয় মানসিক বিপর্যয়, এবং মৃত্যু।

কিন্তু এত দ্রুত এত বেশি মাত্রায় ক্ষতি সাধনের জন্য প্রচুর জীবাণুর দরকার। লাখ লাখ, কোটি কোটি, জমা হচ্ছে ধমনিতে। এত বেশি হয়তো আপনি নিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করছেন না।

তার মানে রক্তস্রোতে ওগুলো বংশ বিস্তার করছে। খুব বেশি গতিতে। ফ্যান্টাস্টিক গতিতে।

আর আপনি যদি অ্যাসিডটিক হন? তাতে কি বংশবিস্তার থেমে যায়?

সম্ভবত।

আবার আপনমনে মাথা নাড়লেন নওয়াব। কারণ সোহান আর সুবীরের মতো কোনো লোকের অ্যাসিডসিস হওয়া এক জিনিস। কিন্তু ওই শিশুর ব্যাপারটা?

শিশু স্বাভাবিক। তার শ্বাস-প্রশ্বাস যদি দ্রুত হয়, সে অ্যালকালোটিক-বেসিক, খুব কম অ্যাসিড—অ্যাসিডটিক বলা যাবে না।

কাচের ভেতর দিয়ে তাকিয়ে আছেন নওয়াব, এই সময় শিশু জাগল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তার চেঁচানি শুরু হয়ে গেল, মুখ লালচে হয়ে উঠছে। ছোট ছোট চোখ কুঁচকে যাচ্ছে।

ভয়ে মরে যাচ্ছে।

তারপর ওই শকুনগুলো—ওদের হজমক্ষমতা দ্রুত, হার্ট রেট দ্রুত, শ্বাস-প্রশ্বাসের রেট দ্রুত। শকুনগুলো, যাদের সবই দ্রুত, তারাও বেঁচে গেছে।

দ্রুত নিশ্বাস ফেলে?

ব্যাপারটা কি এত সহজ হতে পারে?

মাথা নাড়লেন। হতে পারে না।

বসলেন, চোখ রগড়াচ্ছেন। তাঁর মাথা ধরেছে, ক্লান্ত বোধ করছেন। আবার সদয় জাহানের কথা ভাবছেন, যিনি যেকোনো মুহূর্তে মারা যেতে পারেন। সদয় জাহান, সিল করা রুমে বসে আছেন।

নওয়াব বুঝতে পারছেন এই টেনশন সহ্য করার মতো নয়। সেটা থেকে পালিয়ে বাঁচার আকস্মিক একটা ব্যাকুলতা জাগল, সবকিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে ইচ্ছে করল।

ক্লিক করে অন হলো টিভি স্ক্রিন। তাঁর টেকনিশিয়ান উদয় হলেন, বললেন, 'ডক্টর নওয়াব, ডক্টর বাবরকে আমরা হাসপাতালে এনেছি।'

কিছু চিন্তা না করেই নওয়াব বললেন, 'এখনই আসছি আমি।'

নওয়াব বুঝতে পারছেন তিনি স্বাভাবিক আচরণ করছেন না। ডক্টর বাবরকে দেখতে যাবার কোনো কারণ নেই। বাবর ভালো আছেন, তাঁর কোনো বিপদ নেই। তাঁকে দেখতে যাওয়া মানে, জরুরি সমস্যাগুলো ভুলে থাকতে চাইছেন তিনি। হাসপাতালে ঢোকার সময় নিজেকে তাঁর অপরাধী মনে হলো।

তাঁর টেকনিশিয়ান বললেন, 'ডক্টর বাবর ঘুমাচ্ছেন।'

'মৃগী,' বললেন নওয়াব, 'রোগীরা সাধারণত খিঁচুনি ওঠার পর ঘুমায়।'

বাবরকে প্রচুর সময় নিয়ে পরীক্ষা করছেন নওয়াব।

টেকনিশিয়ান বললেন, 'স্যার, আপনি ক্লান্ত।'

'হ্যাঁ,' বললেন নওয়াব। 'ঘুমাতে যাবার সময় অনেক আগেই পার হয়ে গেছে।' যেকোনো স্বাভাবিক দিনে হাসপাতাল থেকে সাততলা ফ্লাইওভার ধরে এক শ কিলোমিটার গতিতে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফেরেন তিনি। রাস্তার ধারের সাইনে লেখা থাকে গতিসীমা সবচেয়ে বেশি ১০০। সবচেয়ে কম ৬৫। ব্যস্ত সময়ে এই নির্দেশটাকে নিষ্ঠুর কৌতুক মনে হয়। যেসব গাড়ি কম গতিতে চলে সেগুলো একেকটা আতঙ্ক। ট্রাফিককে একটা ধারাবাহিক রেটে ছুটতে দিতে হবে, সবচেয়ে কম আর সবচেয়ে বেশির মধ্যে খুব কমই পার্থক্য এবং আপনাকে...

থেমে গেলেন তিনি।

'আমি একটা গর্দভ,' বিড়বিড় করলেন তিনি।

তারপর ঘুরে গেলেন কম্পিউটারের দিকে।

কম্পিউটারকে গ্রোথ প্রোগ্রামের জন্য নির্দেশ দেওয়ার সময় উত্তেজনায় কাঁপছেন নওয়াব, ভুল করে ফেলায় নির্দেশটা পরপর তিনবার দিতে হলো। যা দেখতে চেয়েছেন তা দেখতে পাচ্ছেন ডিসপ্লে স্ক্রিনে : অ্যান্ড্রোমেডার গ্রোথ, pH-এর ফাংশন হিসেবে, অ্যাসিডিটি-আলকালিমিটির ফাংশন হিসেবে।

রেজাল্ট বেশ পরিষ্কার :

[GRAPHIC: colony growth versus pH, bell shaped curve centered at pH 7.41 and dying at 7.39/7.43]

সরু একটা রেঞ্জের ভেতর অ্যান্ড্রোমেডা স্ট্রেইন বাড়ে। গ্রোথের জন্য মিডিয়ামে যদি বেশি অ্যাসিড থাকে, ওই জীবাণু সংখ্যায় বাড়বে না। সেটা যদি খুব বেশি বেসিক হয়, ওটা সংখ্যায় বাড়বে না। শুধু pH 7.39 থেকে 7.43-এর মধ্যে ভালোভাবে বাড়বে।

গ্রাফের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকলেন নওয়াব, তারপর দরজার দিকে ছুটলেন। কামরা ছেড়ে বেরিয়ে যাবার সময় সহকারিণীর দিকে তাকিয়ে হাসলেন। 'সব মিটে গেছে। আমাদের সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে।'

এর চেয়ে বড় ভুল তাঁর দ্বারা হতে পারত না।

২৬. টেস্ট

মেইন কন্ট্রোল রুমে বসে টেলিভিশনের পরদায় সদয় জাহানকে দেখতে পাচ্ছেন ডক্টর মুশফিক, সিল করা ল্যাবে রয়েছেন। এই সময় সেখানে ঢুকলেন উত্তম নওয়াব।

'অক্সিজেন যাচ্ছে,' তাঁকে বললেন মুশফিক।

'বন্ধ করুন,' বললেন নওয়াব।

'হোয়াট?'

'এখনই বন্ধ করুন। ওঁকে আপনি কামরার স্বাভাবিক বাতাসে রাখুন।'

ডক্টর জাহানের দিকে তাকিয়ে আছেন নওয়াব। টিভির পরদায় তাঁকে দেখে বোঝা যাচ্ছে অক্সিজেন তাঁর ওপর প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। তিনি এখন আর আগের মতো দ্রুত নিশ্বাস ফেলছেন না, তাঁর বুক ধীরগতিতে নড়ছে।

মাইক্রোফোন ধরলেন নওয়াব। 'ডক্টর জাহান, আমি নওয়াব। আমি উত্তরটা পেয়েছি। অ্যান্ড্রোমেডা স্ট্রেইন pH-এর সরু একটা রেঞ্জে বাড়ে। আমি কি বলছি আপনি বুঝতে পারছেন তো? খুবই সরু রেঞ্জে। আপনি যদি অ্যাসিডোটিক কিংবা অ্যালকালোটিক হন, আপনার কোনো ভয় নেই, আপনি ভালো থাকবেন। আমি চাই আপনি রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিসে চলে যান। আমি চাই আপনি যত দ্রুত সম্ভব শ্বাস নিন আর নিশ্বাস ফেলুন।'

ডক্টর জাহান বললেন, 'কিন্তু এটা তো পিওর অক্সিজেন। আমি হাইপারভেন্টিলেট হয়ে জ্ঞান হারাব। এখন আমি একটু আচ্ছন্ন বোধ করছি।'

'না। আমরা আবার বাতাসে ফিরে যাচ্ছি। এখন আপনি তাড়াতাড়ি দম নিতে শুরু করুন।'

ডক্টর মুশফিকের দিকে ফিরলেন নওয়াব। 'আপনি তাঁকে আরও বেশি কার্বন-ডাই-অক্সাইড অ্যাটমোসফিয়ার দিন।'

'কিন্তু কার্বন-ডাই-অক্সাইডে জীবাণুটা দ্রুত বাড়ে!'

'আমি জানি, তবে রক্তের pH-এর প্রতিকূলে নয়। বুঝতেই পারছেন, ওটাই সমস্যা : বাতাসে কিছু আসে-যায় না, কিন্তু রক্তে আসে-যায়। আমাদের এখন ডক্টর জাহানের রক্তের জন্য একটা প্রতিকূল অ্যাসিড ব্যালেন্স প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।'

হঠাৎ বুঝতে পারলেন মুশফিক। 'বাচ্চাটা,' বললেন তিনি। 'ও চেঁচায়।'

'হ্যাঁ।'

'এবং অ্যাসপিরিন নেন এক বৃদ্ধ।'

'হ্যাঁ। তা ছাড়া, স্পিরিট আর স্টেরনো পান করেন।'

'দুজনেই তারা নিজেদের অ্যাসিড বেস ব্যালেন্স নরকে তুলে দিয়েছে,' বললেন ডক্টর মুশফিক।

'হ্যাঁ,' বললেন নওয়াব। 'আমার সমস্যা ছিল, আমি অ্যাসিডোসিস ধরে ঝুলে ছিলাম। বাচ্চাটা কীভাবে অ্যাসিডটিক হচ্ছে এটা আমি বুঝতে পারিনি। উত্তরটা হলো, অবশ্যই, বাচ্চা অ্যাসিডটিক হচ্ছে না। সে হচ্ছে বেসিক—খুব কম অ্যাসিড। তবে সেটা ঠিক আছে—আপনি দুটোর যেকোনো দিকে যেতে পারেন, খুব বেশি অ্যাসিড, কিংবা খুব কম অ্যাসিড—যতক্ষণ আপনি অ্যান্ড্রোমেডার গ্রোথ রেঞ্জ থেকে দূরে থাকতে পারছেন।'

ডক্টর জাহানের দিকে ঘুরে গেলেন তিনি। 'এখন তাহলে শুনুন,' বললেন। 'শ্বাস-প্রশ্বাস চালিয়ে যান, দ্রুত। থামবেন না। কেমন বোধ করছেন?'

'ওকে,' ডক্টর জাহান বললেন। 'ভয় লাগছে, তবে ওকে।'

'গুড।'

মুশফিক বললেন, 'শুনুন, জাহানকে আমরা সারা জীবন এভাবে রাখতে পারব না। আগে হোক বা পরে...'

'হ্যাঁ,' বললেন নওয়াব। 'আমরা তাঁর রক্ত অ্যালকালিনাইজ করব।'

তারপর তিনি সদয় জাহানকে বললেন, 'ল্যাবের চারদিকে তাকান। আপনি এমন কিছু দেখতে পাচ্ছেন যেটা ব্যবহার করে আমরা আপনার রক্তের pH বাড়াতে পারব?'

'কই? না, কোথায় কী দেখতে পাচ্ছি।'

'বায়োকার্বোনেট অব সোডা? অ্যাসকরবিক অ্যাসিড? ভিনেগার?'

ল্যাব শেলফের বোতল আর রিএজেন্টের ভেতর উন্মত্তের মতো তল্লাশি চালাচ্ছেন ডক্টর জাহান। মাথা নাড়তে দেখা গেল তাঁকে। 'এখানে এমন কিছু নেই, যাতে কাজ হবে।'

কথাটা নওয়াব সম্ভবত শুনতে পেলেন না, তিনি তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের সংখ্যা গুনছেন, সেগুলো প্রতি মিনিটে পঁয়ত্রিশ বার, গভীর এবং পরিপূর্ণ। এই হার তাঁকে একটা সময় পর্যন্ত ঠিক রাখবে, কিন্তু একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়বেন তিনি, শ্বাস-প্রশ্বাস কঠিন কাজ, কিংবা অজ্ঞান হয়ে যাবেন।

নিজের সুবিধাজনক পজিশন থেকে ল্যাবের চারদিকে তাকাচ্ছেন নওয়াব। আর তখনই ইঁদুরটার ওপর তাঁর চোখ পড়ল। ঘরের এক কোণে কালো একটা নরওয়ে, নিজের খাঁচায় শান্তভাবে বসে, যেন সকৌতুকে ডক্টর জাহানকে দেখছে।

থমকে গেলেন নওয়াব।

'ওই ইঁদুর...'

ওটা ধীরে ধীরে এবং সহজে শ্বাস নিচ্ছে, শ্বাস ফেলছে।

ডক্টর মুশফিকও ইঁদুরটাকে দেখলেন, বললেন, 'আরে, হোয়াট দা হেল...'

আর তারপর, তাঁরা তাকিয়ে রয়েছেন, আলো আবার জ্বলতে-নিভতে শুরু করল, ক্লিক করে খুলে গেল কম্পিউটার কনসোল :

EARLY DEGENERATIVE CHANGE
IN GASKET V-1 12-6886

'সেরেছে,' বললেন মুশফিক।

'ওই গ্যাসকেট কোন দিকে গেছে?'

'মজ্জা বা শাঁসগুলোর একটা, প্রতিটি ল্যাবের সঙ্গে সংযুক্ত। মেইন সিল...'

কম্পিউটার আবার ফিরে এল :

DEGENERATIVE CHANGE IN GASKETS
A-009-5478
V-430-0030
N-966-6656

হতভম্ব হয়ে স্ক্রিনের দিকে তাকালেন ওঁরা। 'খারাপ কিছু ঘটেছে,' বললেন ডক্টর মুশফিক। 'খুব খারাপ কিছু।'

দ্রুত একের পর এক আরও নয়টা গ্যাসকেটের নম্বর দেখাল কম্পিউটার, যেগুলো ভেঙে পড়ছে।

'এর আমি কিছুই বুঝতে পারছি না...'

আর তারপরই উত্তম নওয়াব বললেন, 'বাচ্চাটা, অবশ্যই!'

'বাচ্চাটা?'

'আর ওই ছাই অ্যারোপ্লেন—মরীচিকা। সব মিলে যাচ্ছে।'

'এসব কী বলছেন আপনি?' তাঁর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছেন ডক্টর মুশফিক।

'শিশুটি স্বাভাবিক,' বললেন নওয়াব। 'কিন্তু সে চেঁচায়, আর তাতে তার অ্যাসিড বেস ব্যালান্সে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। বেশ, ভালো। সেটা অ্যান্ড্রোমেডা স্ট্রেইনকে তার রক্তে ঢুকতে বাধা দেবে, বাধা দেবে বংশবিস্তারে এবং তাকে খুন করতে।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' মুশফিক বললেন, 'এসবই আপনি আমাকে বলেছেন।'

'কিন্তু কী ঘটে বাচ্চাটা যখন কান্না থামায়?'

তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকলেন মুশফিক। কিছু বলছেন না।

'আমি বলতে চাইছি,' বললেন নওয়াব। 'আগে হোক বা পরে ওই শিশুটিকে তার কান্না থামাতে হবে। সে তো চিরকাল কাঁদতে পারবে না। একসময় থামতে হবে তাকে, আর তখন তার অ্যাসিড বেস ব্যালেন্স স্বাভাবিক হয়ে যাবে। তখন অ্যান্ড্রোমেডার বিরুদ্ধে অরক্ষিত হয়ে পড়বে সে।

'ঠিক।'

'কিন্তু বাচ্চা মরেনি।'

'সম্ভবত দ্রুতগতি কোনো ইমিউনিটি।'

'না। অসম্ভব। মাত্র দুটো ব্যাখ্যা আছে। বাচ্চা যখন কান্না থামায়, হয় ওই জীবাণু ওখানে আর ছিল না, উড়ে চলে গেছে, পেছনে ফেলে রেখে গেছে তাজা আর নিরাপদ বাতাস, আর তা না হলে ওই জীবাণু...'

'বদলে গেছে,' বললেন মুশফিক। 'মিউটেটেড।'

'হ্যাঁ। মিউটেটেড। এবং সম্ভবত এখনো পরিবর্তনের ধারা বন্ধ হয়নি। এখন আর সেটা মানুষের জন্য সরাসরি ক্ষতিকর নয়, তবে ওটা রাবার গ্যাসকেট খেয়ে ফেলছে।'

'প্লেনটা...মরীচিকা।'

মাথা ঝাঁকালেন নওয়াব। 'জাতীয় প্রহরীরা জমিনের চারপাশে কর্ডন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও তাদের কোনো ক্ষতি হবে না—হয়নি। কিন্তু পাইলট আর তাঁর মরীচিকা ধ্বংস হয়ে গেল, কারণ তাঁর চোখের সামনে ধুলো হয়ে যাচ্ছিল প্লাস্টিক।'

'কাজেই ডক্টর বাবর এখন অক্ষতিকর একটা জীবাণুর মাঝখানে রয়েছেন। সে কারণেই বেঁচে আছে ইঁদুরটা।'

'সে কারণেই বেঁচে আছেন ডক্টর বাবর,' বললেন নওয়াব। 'দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের কোনো প্রয়োজন ছিল না। তিনি বেঁচে আছেন একটি মাত্র কারণে, আর তা হলো অ্যান্ড্রোমেডা বদলে গেছে।'

'বদলেছে আমাদের প্রায় কোটিখানেক মানুষকে মেরে। আরেকটা কথা,' বললেন মুশফিক, 'ওটা কিন্তু আবার বদলাতে পারে। আর বেশির ভাগ বদলের ঘটনা যদি দ্রুতগতি বংশবিস্তারের সময় ঘটে...'

সাইরেন বেজে উঠল, একই সঙ্গে কম্পিউটার লাল অক্ষরে লিখল :

GASKET INTEGRITY ZERO. LEVEL V CONTAMINATED AND SEALED.

ঝট করে নওয়াবের দিকে ফিরলেন মুশফিক। 'জলদি!' বললেন তিনি। 'এখান থেকে বেরোন! এই ল্যাবে কোনো সাবস্টেশন নেই। আপনাকে পরের সেকশনে যেতে হবে।'

এক মুহূর্ত ব্যাপারটা নওয়াব বুঝলেন না। তিনি নিজের সিটে যেমন বসে ছিলেন, তেমনি বসে থাকলেন। তারপর, যখন বুঝলেন, দরজার দিকে লাফ দিলেন, করিডরে বেরোলেন হাঁপাতে হাঁপাতে। বেরোতেই হিসহিস একটা আওয়াজ শুনতে পেলেন, তারপর ভারী কিছু পতনের গম্ভীর শব্দ—ইস্পাতের প্রকাণ্ড একটা প্লেট একদিকের দেয়াল থেকে হড়কে বেরিয়ে এসে করিডর বন্ধ করে দিল।

দৃশ্যটা দেখে মাথায় হাত দিলেন মুশফিক। 'সর্বনাশ যা ঘটার ঘটে গেল,' বললেন তিনি। 'এখানে আমরা আটকা পড়ে গেলাম। তবে যে বিপদটা ঘটতে যাচ্ছে সেটার তুলনায় আমাদের ফাঁদে পড়াটা কিছুই না। বোমাটা যদি ফাটে, ওই বিস্ফোরণ জীবাণুটাকে সারফেসের চারদিকে বহু দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে দেবে। তখন কয়েক হাজার রকমের জীবাণু পাওয়া যাবে, প্রতিটির খুন করার পদ্ধতি আলাদা। তখন আমরা যুগের পর যুগ চেষ্টা করলেও ওগুলো থেকে মুক্ত হতে পারব না।'

লাউডস্পিকার থেকে একটা ভারী যান্ত্রিক গলা ভেসে এল, বলছে: 'লেভেল বন্ধ করা হয়েছে। এই লেভেল বন্ধ করা হয়েছে। এটা ইমার্জেন্সি। এই লেভেল বন্ধ করা হয়েছে।'

নীরব হয়ে গেল পরিবেশ।

নতুন করে জ্যান্ত হলো কম্পিউটার। মিষ্টি নারীকণ্ঠ শোনা গেল, 'আর তিন মিনিট পর আত্মবিধ্বংসী আণবিক বোমা বিস্ফোরিত হবে।'

২৭. তিন মিনিট

সাইরেনের নতুন শব্দ ভেসে এল, ঘন ঘন ওঠানামা করছে এবং সব ঘড়ির সব কাঁটা ঝট করে ফিরে গেল ১২০০ ঘণ্টায়, তারপর সেকেন্ডের কাঁটা সময় বিতরণে ব্যস্ত হয়ে উঠল। প্রতিটি স্টপ-ক্লক লাল আভা ছড়াচ্ছে, ডায়ালে সবুজ রেখা নির্দেশ করছে কখন ডেটোনেশন ঘটবে।

মিষ্টি নারীকণ্ঠ শান্ত সুরে পুনরাবৃত্তি করছে, 'আর তিন মিনিট পর আত্মবিধ্বংসী আণবিক বোমা বিস্ফোরিত হবে।'

'ব্যাপারটা অটোমেটিক,' ডক্টর মুশফিক বললেন। 'লেভেল দূষিত হয়ে পড়লে সিস্টেম নিজের কাঁধে দায়িত্ব তুলে নেয়। আমরা এটা ঘটাতে পারি না।'

সার্জেন নওয়াবের হাতে চাবিটা বেরিয়ে এসেছে। 'একটা সাবস্টেশনে যাবার কোনো উপায় নেই?'

'এই লেভেলে নেই। প্রতিটি সেক্টর সিল হয়ে গেছে, প্রতিটির সঙ্গে প্রতিটি সিল করা।'

'কিন্তু অন্যান্য লেভেলে সাবস্টেশন আছে?'

'হ্যাঁ।'

'আমি পৌঁছাব কীভাবে?'

'আপনি পৌঁছাতে পারবেন না। কনভেনশনাল সব রুটস সিল হয়ে গেছে।'

'কিন্তু সেন্ট্রাল কোর?' সেন্ট্রাল কোর সবগুলো লেভেলের সঙ্গে সংযুক্ত।

কাঁধ ঝাঁকালেন ডক্টর মুশফিক, করিডরের বাতাস যথেষ্ট ঠান্ডা, তারপরও দরদর করে ঘামছেন তিনি। 'দ্য সেফগার্ড,' বিড়বিড় করলেন।

নওয়াবের মনে পড়ল এর আগে ডক্টর জাহানের সঙ্গে সেন্ট্রাল কোরস সেফগার্ড সম্পর্কে আলাপ হয়েছে তাঁর। থিওরিতে, একবার সেন্ট্রাল কোরের ভেতরে ঢুকতে পারলে আপনি সরাসরি একেবারে মাথায় উঠে যেতে পারবেন। কিন্তু তা করতে গেলে দেখা যাবে কোরের চারপাশে লেগামাইন সেনসর ছড়ানো আছে এই কাজে বাধা দেওয়ার জন্য। এই ব্যবস্থা আসলে রাখা হয়েছিল কোর থেকে পশুদের পালানো ঠেকানোর জন্য। ওই সেনসর গ্যাস ছাড়ে। অটোমেটিক গানও আছে, খুদে লেগামাইন বর্শা ছোড়ে।

মিষ্টি নারীকণ্ঠ আবার শোনা গেল, এবার করিডরে বসানো মনিটর থেকে। 'এখন আর দু মিনিট পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড বাকি আছে আত্মবিধ্বংসী আণবিক বোমা বিস্ফোরিত হতে।'

নওয়াব ল্যাবের দিকে ফিরে যাচ্ছেন। ঢোকার পর কাচ ঘেরা ভেতরের কাজের এলাকায় চোখ বুলাচ্ছেন; ওটার পেছনেই সেন্ট্রাল কোর।

'আমার সুযোগ কতটুকু?'

'তার কোনো অস্তিত্ব নেই,' এক কথায় ব্যাখ্যা করলেন ডক্টর মুশফিক।

নিচু হলেন নওয়াব, টানেলে ঢুকলেন, ক্রল করে পৌঁছে গেলেন প্লাস্টিক স্যুটে, তারপর সিধে হলেন। তাঁর অনেক পেছনে টানেলটা সিল না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন, তারপর একটা ছুরি তুলে নিয়ে কাটলেন সেটা, যেন একটা লেজ থেকে মুক্ত করলেন নিজেকে। ল্যাবের বাতাসে শ্বাস নিলেন, সেটা ঠান্ডা আর তাজা, আর তাতে মিশে আছে অ্যান্ড্রোমেডা জীবাণু।

কিছুই ঘটল না।

ল্যাব থেকে, কাচের ভেতর দিয়ে, তাঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন ডক্টর মুশফিক। নওয়াব দেখলেন তাঁর ঠোঁট নড়ছে, তবে তিনি কিছু শুনতে পাচ্ছেন না। খানিক পর একটা স্পিকার সরব হলো এবং তিনি শুনতে পেলেন মুশফিক বলছেন, '...ভালো হয় আমরা যদি প্ল্যান করি।'

'কী নিয়ে?'

'ডিফেন্স সিস্টেম।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ,' বললেন নওয়াব, রাবার গ্যাসকেটের দিকে এগোচ্ছেন। জিনিসটা গোল, ছোটই বলা যায়, চলে গেছে সেন্ট্রাল কোরের দিকে।

'মাত্র একটাই সুযোগ আছে,' বললেন মুশফিক। 'ডোজগুলো কম। দশ কিলোগ্রাম পশুদের জন্য হিসাব করা, এই যেমন বড় বাঁদর, আর আপনার ওজন সত্তর কিলো বা কাছাকাছি। আপনি একটা ভারী ডোজ সহজেই সহ্য করতে পারবেন, আগে...'

'দম বন্ধ হয়ে মারা যাবার আগে,' বললেন নওয়াব। কুরারে একটা বিষ, একসময় দক্ষিণ আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানরা ব্যবহার করত তাদের তীরের ডগায়। ওদিককার কোনো গাছের ছাল আর ডাঁটি থেকে সংগ্রহ করা হয়। কুরারের ভিকটিমরা দম আটকে মারা যায়. তাদের বুকের পেশি আর ডায়াফ্রাম প্যারালাইজ হয়ে যায়। নওয়াব নিশ্চিত, মরার এটা একটা অপ্রীতিকর ধরন। 'আমার জন্য প্রার্থনা করুন,' বললেন তিনি।

'এখন আর দু মিনিট ত্রিশ সেকেন্ড বাকি আছে আত্মবিধ্বংসী আণবিক বোমা বিস্ফোরিত হতে।'

মুঠো পাকিয়ে গ্যাসকেটে ধাম করে একটা ঘুষি মারলেন নওয়াব, ধুলোর মেঘে পরিণত হলো সেটা। পা ফেলে সেন্ট্রাল কোরে পৌঁছে গেলেন তিনি।

ভেতরটা নীরব। সাইরেন আর লেভেলের জ্বলতে-নিভতে থাকা আলো থেকে দূরে তিনি। ঠান্ডা, ধাতব আর প্রতিধ্বনিবহুল বিস্তৃতির মধ্যে রয়েছেন। সেন্ট্রাল কোর সম্ভবত ত্রিশ ফুট চওড়া, ছাইরঙা। মূল কোর হলো কেব্‌ল আর মেশিনারির সমষ্টি, সিলিন্ডার আকৃতি একটা শাফট, তাঁর সামনে পড়ে আছে। দেয়ালে মইয়ের ধাপ দেখতে পাচ্ছেন, চারতলায় উঠে গেছে।

'আমি আপনাকে টিভি মনিটরে পাচ্ছি,' ডক্টর মুশফিকের গলা পেলেন তিনি। 'মই বেয়ে উঠে যান। যেকোনো মুহূর্তে গ্যাস চলে আসবে।'

রেকর্ড করা নতুন একটা যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'সেন্ট্রাল কোর দূষিত হয়ে পড়েছে। অনুমোদিত মেইন্টেন্যান্স কর্মীদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে এই মুহূর্তে পুরো এলাকা পরিষ্কার করে ফেলুন।'

'গো!' তাগাদা দিলেন ডক্টর মুশফিক।

মই বেয়ে উঠছেন নওয়াব। বৃত্তাকার পাঁচিলের কাছে পৌঁছে পেছন দিকে তাকালেন, দেখলেন সাদা ধোঁয়ায় নিচের

মেঝে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে।

'ওটা গ্যাস,' বললেন মুশফিক। 'আপনি এগোন।'

নওয়াব দ্রুত উঠতে শুরু করলেন, হাতের ওপর হাত, পায়ের ওপর পা, ধাপ বেয়ে উঠে যাচ্ছেন। খুব জোরে নিশ্বাস ফেলছেন, হাঁপাচ্ছেন রীতিমতো, আংশিক পরিশ্রমে, আংশিক আবেগে।

'সেনসরগুলো খোঁজ পেয়েছে আপনার,' বললেন মুশফিক, তাঁর গলা ভোঁতা।

লেভেল ৫-এর ল্যাবে রয়েছেন ডক্টর মুশফিক, তাকিয়ে আছেন কনসোলে, ঠিক যখন কম্পিউটারের ইলেকট্রিক চোখ টার্গেট করছে সার্জেন নওয়াবকে, তাঁর শরীর যখন পাঁচিলের ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে। মুশফিকের দৃষ্টিতে ব্যথায় কাতর হবার মতো অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছেন নওয়াব। মুশফিকের দৃষ্টি ওপর দিকে উঠে তৃতীয় একটা স্ক্রিনে স্থির হলো, তাতে দেখা যাচ্ছে লেগামাইন ইঞ্জেক্টরগুলো পাঁচিলে আটকানো ব্রাকেটের ভেতর ঘুরতে শুরু করেছে, রোগাটে ব্যারেলগুলো বেরিয়ে আসছে লক্ষ্যস্থির করার জন্য।

'গো!'

স্ক্রিনে নওয়াবের শরীরের কিনারা লাল, পেছনের জ্বলজ্বলে সবুজ ব্যাকগ্রাউন্ড। মুশফিক তাকিয়ে আছেন, একটা ক্রসহেয়ার চড়াও হলো শরীরটার ওপর, একটু একটু করে সরে ঘাড়ে পৌঁছাচ্ছে। কম্পিউটারকে প্রোগ্রাম দেওয়া আছে শরীরের যেখানে রক্তপ্রবাহ বেশি সেখানে টার্গেট করতে হবে, কারণ বেশির ভাগ পশুর বেলায় পেছনের চেয়ে ঘাড় অনেক ভালো।

কোরের পাঁচিল ঘেঁষে উঠছেন নওয়াব, শুধু দূরত্ব আর নিজের অবসাদ নিয়ে সচেতন। এত বেশি ক্লান্ত লাগছে দেখে বিস্মিত তিনি, যেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা উঠছেন। তারপর বুঝতে পারলেন কী ঘটনা। গ্যাস তাঁর ওপর প্রভাব ফেলছে।

'সেনসর আপনাকে পেলেও,' মুশফিক বললেন, 'আপনার আর মাত্র দশ গজ বাকি।'

পেছনে একবার তাকাতে অনেক সেনসর ইউনিটের একটাকে দেখতে পেলেন নওয়াব। ওটা সরাসরি তাঁর দিকে তাক করা। তাকিয়ে আছেন, ফায়ার হলো, ব্যারেল থেকে সামান্য নীলচে ধোঁয়া লাফিয়ে উঠল। বাতাসে হিসহিসে শব্দ হলো, তারপর তাঁর পাশের দেয়ালে কী যেন একটা লাগল, সেখান থেকে খসে পড়ল মেঝেতে।

'একবার লাগেনি। আপনি এগোতে থাকুন।'

আরেকটা বর্শা তাঁর ঘাড়ের কাছাকাছি দেয়ালে লাগল। তাড়াহুড়ো করার চেষ্টা করলেন তিনি, চেষ্টা করলেন নড়াচড়ার গতি বাড়াতে। ওপরে তিনি দরজা দেখতে পাচ্ছেন, সাদা অক্ষরে লেখা রয়েছে LEVEL IV, ডক্টর মুশফিকের হিসাবমতো আর মাত্র দশ গজ দূরে।

তৃতীয় বর্শা ছুটে এল, সেটার পিছু নিয়ে চতুর্থ। এখনো তিনি অক্ষত। প্রহসনের একটা মুহূর্তে ব্যর্থতার গ্লানি অনুভব করলেন নওয়াব, শালার কম্পিউটার কোনো কম্মেরই নয়, ওগুলো সহজ একটা টার্গেটেও লাগাতে পারে না...

পরের বর্শা তাঁর কাঁধে লাগল, জ্বালা করে উঠল মাংসে ঢোকার সময়, তারপর দ্বিতীয়বার পোড়ার মতো ব্যথা অনুভব করলেন যখন তাঁর শরীরে লিকুইড ইনজেক্ট করা হলো। কাউকে অভিশাপ দিলেন নওয়াব।

মনিটরে পুরো ঘটনাটা দেখলেন ডক্টর মুশফিক।

মিষ্টি গলা মনে করিয়ে দিল আবার। 'এখন আর দু মিনিট বাকি আছে আত্মবিধ্বংসী আণবিক বোমা বিস্ফোরিত হতে।'

'খুব কম ডোজ,' নওয়াবকে বললেন মুশফিক। 'আপনি এগোতে থাকেন।'

নওয়াব উঠে যাচ্ছেন। বুঝতে পারছেন তিনি মন্থর হয়ে পড়েছেন, চার শ পাউন্ড ওজনের একজন মানুষ। পরবর্তী দরজায় পৌঁছেছেন, এই সময় আরেকটা বর্শা তার চোয়ালের হাড় থেকে সামান্য দূরে দেয়ালে লাগল।

'জঘন্য।'

'গো! গো!'

দরজায় একটা সিল আর হাতল আছে। হাতল ধরে টানছেন, আরেকটা বর্শা লাগল দেয়ালে।

'পারবেন, পারবেন, আপনি সফল হতে পারবেন,' বললেন মুশফিক, উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন।

'এখন আর নব্বই সেকেন্ড বাকি আছে আত্মবিধ্বংসী আণবিক বোমা বিস্ফোরিত হতে।'

হাতল ঘুরছে। বাতাসের হিস্‌স্‌স্ শব্দের সঙ্গে কাঁপতে কাঁপতে খুলে গেল দরজা। একটা চেম্বারে ঢুকলেন, আর ঠিক তখন একটা বর্শা লাগল তাঁর পায়ে। শরীরে গরম একটা ঢেউ বয়ে গেল। হঠাৎ করে শরীর হয়ে উঠল হাজার পাউন্ড বেশি ভারী। দরজা বন্ধ করতে তাঁর যেন এক শ বছর লেগে গেল।

'আপনি এখন একটা এয়ারলকে রয়েছেন,' ডক্টর মুশফিক বললেন। 'পরবর্তী দরজার হাতল ঘোরান।'

ভেতরের দরজার দিকে এগোলেন নওয়াব। ওটা কয়েক কিলোমিটার দূরে, একটা অনন্তযাত্রা, এমন একটা দূরত্ব যেটা আশার অতীত। তাঁর পা সিসার তৈরি বেড়িতে আটকানো। তাঁর পায়ের পাতা গ্র্যানিট। একটা পা ফেললেন, এত পিচ্ছিল লাগল যে ওই পা আবার তুলে আনবেন কি না ভাবছেন। নিজেকে তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছেন, তোমাদের অদক্ষতায় এক কোটি মানুষ মারা গেছে...তোমরা একের পর এক শুধু ভুল করে গেছো...এখন যদি ওই বোমার বিস্ফোরণ বন্ধ করা না যায়, আরও এক কি দু কোটি লোক মারা যাবে...কাজেই তোমার ব্যর্থ হওয়া চলবে না।

'এখন আর ষাট সেকেন্ড বাকি আছে আত্মবিধ্বংসী আণবিক বোমা বিস্ফোরিত হতে।'

সময় কী ভয়াবহ গতিতে ছোট হয়ে আসছে। সময়কে তিনি বুঝতে পারছেন না, সবকিছু এত দ্রুত ঘটছে, আর তিনি নিজে এত শ্লথ হয়ে পড়ছেন।

হাতলটা। ওটার চারধারে আঙুল জড়ালেন, যেন একটা স্বপ্নের ভেতর। হাতলটা তিনি ঘোরালেন।

'ওষুধের প্রভাব গ্রাহ্য করবেন না। ওটার সঙ্গে লড়াই করুন। আপনি পারবেন,' বললেন ডক্টর মুশফিক।

এরপর কী ঘটল স্মরণ করা কঠিন। হাতলটাকে ঘুরতে দেখলেন তিনি, দরজা খুলে গেল; এক তরুণীর উপস্থিতি সম্পর্কে অস্পষ্টভাবে সচেতন হলেন, মেয়েটি একজন টেকনিশিয়ান, দাঁড়িয়ে আছেন হলওয়েতে, তিনি যখন হোঁচট খেতে খেতে ভেতর ঢুকছেন।

আড়ষ্ট পা ফেললেন, দেখলেন মেয়েটি তাঁর দিকে ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে আছে।

'আমাকে সাহায্য করুন!' বললেন তিনি।

ইতস্তত করছেন টেকনিশিয়ান। তাঁর চোখ কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসার জোগাড় হলো, তারপর পালাতে লাগলেন, ঘুরে করিডর ধরে ছুটছেন।

তাঁর দিকে বোকার মতো তাকিয়ে আছেন নওয়াব। কী ভাবছেন নিজেও জানেন না : ওই মেয়ে কি পারবে দেড়-দু কোটি মানুষের জন্ম দিতে, তার ভুলে যে দেড়-দু কোটি মানুষ এখন মারা যাবে?

মেঝেতে পড়ে গেলেন নওয়াব। সাবস্টেশন একদম কাছে অথচ কত দূরে। পড়ে যাবার পর তাঁর আর নড়ার শক্তি নেই। দেয়ালের গায়ে পালিশ করা চকচকে ধাতব প্লেট মাত্র কয়েক ফুট দূরে অথচ তাঁর নাগালের বাইরে।

'এখন আর পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড বাকি আছে আত্মবিধ্বংসী

আণবিক বোমা বিস্ফোরিত হতে,' মিষ্টি যান্ত্রিক গলা আবার শোনা গেল।

এবার রেগে গেলেন নওয়াব। তাকে নিয়ে অত্যাধুনিক সব মেশিনপত্র যেন এক ধরনের কৌতুক করছে। সবই প্রোগ্রাম করা, তাঁর নিয়তিকে নিয়ে তামাশা করা হচ্ছে।

পরে উত্তম নওয়াব মনে করতে পারেননি কীভাবে ক্রল করে ওইটুকু দূরত্ব পার হয়েছিলেন, তারপর হাঁটুর ওপর সিধে হয়েছিলেন, তারপর চাবি ধরা হাতটা উঁচু করে নাগাল পাবার চেষ্টা করেছিলেন সাবস্টেশনের। তাঁর মনে আছে চাবিটা তালায় ঢুকিয়ে মোচড় দিয়েছিলেন, তাকিয়ে ছিলেন সবুজ আলোটা যখন জ্বলল।

'আত্মবিধ্বংসী কর্মসূচি বাতিল করা হয়েছে,' শান্ত নারীকণ্ঠ শোনা গেল, সেটা যেন কোনো ব্যাপার না।

মেঝেতে ঢলে পড়লেন নওয়াব, শরীরটা অসম্ভব ভারী, চরম ক্লান্ত, তারপর তাঁর চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল।

পঞ্চম দিন

২৮. বিচার

বহুদূর থেকে ভেসে আসা একটা কণ্ঠস্বর। 'তিনি লড়ছেন।'

'তাই কি?'

'হ্যাঁ। দেখুন।'

আর তারপর, মাত্র এক মুহূর্ত পার হয়েছে, নওয়াব কাশলেন, ঠিক যখন তাঁর গলা থেকে কিছু একটা বের করে নেওয়া হলো। আবার কাশলেন, বাতাসের অভাবে হাঁসফাঁস করছেন এবং চোখ খুলে তাকালেন।

উদ্বিগ্ন এক তরুণীর মুখ তাঁর ওপর ঝুঁকে আছে। 'আপনি ভালো আছেন? এর প্রভাব দ্রুত কেটে যায়।'

উত্তরে কিছু বলতে চাইলেন নওয়াব, কিন্তু পারলেন না। চিৎ হয়ে শুয়ে থাকলেন তিনি, নিজের শ্বাস-প্রশ্বাস অনুভব করছেন, প্রথম দিকে আড়ষ্ট হলেও, এখন স্বাভাবিক হয়ে আসছে। মাথা ঘুরিয়ে বললেন, 'কতক্ষণ?'

'প্রায় চল্লিশ সেকেন্ড,' বললেন তরুণী। 'আমরা এ রকম একটা সময়ই ধরে রাখি। শ্বাস গ্রহণ না করে চল্লিশ সেকেন্ড। আমরা যখন আপনাকে পেলাম, একটু নীলচে হয়ে গিয়েছিল চেহারা। কিন্তু যত দ্রুত সম্ভব আপনাকে আমরা অক্সিজেন দিতে শুরু করি।'

'সেটা কখন?'

'বারো থেকে পনেরো মিনিট আগে। লেগামাইন বেশিক্ষণ কাজ করে না, কিন্তু তারপরও আপনাকে নিয়ে আমরা চিন্তায় ছিলাম...এখন আপনার কেমন লাগছে?'

'ওকে।'

কামরার চারদিকে তাকাচ্ছেন নওয়াব। হাসপাতালে রয়েছেন তিনি, লেভেল ফোরে। দূরের দেয়ালে টিভি মনিটর দেখা যাচ্ছে, তাতে ফুটে আছে ডক্টর মুশফিকের মুখ।

'হ্যালো,' বললেন নওয়াব।

দেঁতো হাসি দেখা গেল মুশফিকের মুখে। 'অভিনন্দন।'

'আমি ধরে নিচ্ছি বোমাটা ফাটেনি?'

'বোমাটা ফাটেনি,' বললেন মুশফিক।

'ওহ্, দারুণ!' বলে চোখ বুজলেন নওয়াব। এক ঘণ্টার কিছু বেশি ঘুম হলো তাঁর, তারপর আবার যখন চোখ মেললেন, দেখলেন টিভির পরদা খালি হয়ে গেছে। একজন নার্স তাঁকে জানালেন, ডক্টর মুশফিক দেওগাঁর সঙ্গে কথা বলছেন।

'কী ঘটছে আসলে?'

কাতর চোখে এক মুহূর্ত তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকলেন নার্স, তারপর বললেন, 'সর্বনাশ যা হবার তা আগেই হয়ে গেছে, সর্বশেষ হিসাবে পঁচাত্তর লাখ থেকে এক কোটি মানুষ মারা গেছে—যদিও বেসরকারি হিসেবে বলা হচ্ছে দেড় কোটিরও বেশি। যেমনটি প্রেডিক্ট করা হয়েছিল, দেশের বাকি প্রায় সব জেলায় এই রোগজীবাণু ছড়িয়ে পড়েছে।'

'এবং?'

কাঁধ ঝাঁকালেন নার্স। 'কিছুই না। ওটার মনে হচ্ছে আর কোনো প্রভাব নেই।'

'না, সত্যি নেই,' আরও অনেক পরে বললেন ডক্টর মুশফিক। 'পরিস্থিতি দেখে বুঝতে পারছি আকৃতি বদলের সঙ্গে সঙ্গে ওটা অক্ষতিকর জীবাণুতে পরিণত হয়েছে। আমরা এখনো মৃত্যু বা রোগের উদ্ভট বিবরণসহ রিপোর্ট পাবার অপেক্ষায় রয়েছি, তবে ইতিমধ্যে প্রায় ছয় ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। আমাদের সন্দেহ শেষ পর্যন্ত ওটা অ্যাটমোসফিয়ার থেকে পিছু হটে বিদায় নেবে, যেহেতু এখানে খুব বেশি অক্সিজেন নেই। কিন্তু জাহাজডুবিতে যদি বোমাটা ফাটত...'

নওয়াব জানতে চাইলেন, 'আর কতটুকু সময় বাকি ছিল?'

'আপনি যখন চাবিটা ঘোরালেন? চৌত্রিশ সেকেন্ডের মতো।'

মৃদু হাসলেন নওয়াব। 'প্রচুর সময়। এটা এমনকি উত্তেজকও নয়।'

'সেটা সম্ভবত আপনার অবস্থান থেকে,' বললেন মুশফিক। 'কিন্তু লেভেল পাঁচে পরিস্থিতি ছিল উত্তেজনায় টান টান। অবহেলার কারণে আপনাকে আমার জানানো হয়নি যে অ্যাটমিক ডিভাইস বিস্ফোরণে বেশি ফল পাবার জন্য আমি লেভেল পাঁচের সমস্ত বাতাস বের করে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলাম, সেটা শুরু হবার কথা ছিল বিস্ফোরণ ঘটার ত্রিশ সেকেন্ড আগে।'

'ও,' বললেন নওয়াব।

'তবে পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে,' বললেন মুশফিক। 'আমাদের কাছে জীবাণুটা আছে, ওটাকে নিয়ে আমাদের গবেষণা চলতে থাকবে। আমরা ইতিমধ্যে পরিবর্তিত বেশ কটা সংস্করণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রেকর্ড করতে শুরু করেছি। পরিবর্তিত সংস্করণগুলো নানা দিক থেকে বিস্ময়কর।' তিক্ত হাসি ফুটল তাঁর ঠোঁটে। 'আমরা এখন ধরে নিতে পারি, জীবাণুটা এখন মহাশূন্যের আরও ওপরে উঠে যাবে, আর কোনো রকম বিপদ না ঘটিয়ে। আর এখানে এই নিচে আমরা যারা আছি তাদের কথা যদি বলেন, পরিবর্তনের ধারা সম্পর্কে এখন আমরা বুঝি কী ঘটছে। সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমরা বুঝি।'

'হ্যাঁ, ঠিক,' বললেন নওয়াব। 'এবং আমরা নিজেদের ব্যর্থতার জন্য দুঃখিত।'

এক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর শান্ত গলায় ডক্টর মুশফিক বললেন, 'তবে দুঃখ প্রকাশ করলেই সবকিছু মিটে যাচ্ছে না।'

'মানে?'

'প্রধান সামরিক প্রশাসক নির্দেশ দিয়েছেন আমাদের যেন এখনই গ্রেপ্তার করা হয়। আমরা যাতে পালাতে না পারি সে জন্য পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আমাদের বিচার করা হবে।'

তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকলেন নওয়াব, তারপর মাথা নত করলেন, বললেন, 'হোক না বিচার, আমি তাতে উদ্বিগ্ন নই।'

'আমিও। আমাদের যদি কোনো শাস্তি পাওনা হয়, আমরা সেটা মাথা পেতে নেব।'

বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে



গল্প



সচিত্রকরণ : মনিরুজ্জামান

আন্দালিব রাশদী

ভিক্টোরিয়া ম্যানিকিনের মেয়ের বাবা

তখন ফুলের দোকানগুলো ছিল।

আমি কাজ করতাম 'বসরার গোলাপবিতান' নামের দোকানটিতে। এখানে আগে দুটো দোকান ছিল—একটার নাম রডোডেনড্রনগুচ্ছ, অন্যটি ফুলশয্যা।

রডোডেনড্রনগুচ্ছের মালিক তালুকদার আবদুস সামাদের কেবল মুণ্ডুটা পাওয়া যায়। বেশ তরতাজা। কেউ কেউ বলেছে, মুখটা এখনো সূর্যমুখী ফুলের মতো ছড়িয়ে আছে। খুব চকচকা, ঠিকমতো চেপে ধরতে পারলে তেল বেরোবে।

পা থেকে গলা পর্যন্ত নিরুদ্দেশ।

ফুলশয্যার মালিক মিয়া মমতাজউদ্দিন তালুকদার আবদুস সামাদের স্ত্রী, কন্যাসহ পলাতক।

দুজনই সাবলেট। একজন মৃত, একজন পলাতক। এবার মূল মালিক আলহাজ নুরুদ্দিন ওরফে নুরুল্লাহ

ফুলের ব্যবসায় নামলেন। আসলে তিনি বাগদাদ ফেরত ম্যান পাওয়ার ব্যবসায়ী। তিনি ম্যান পাওয়ারের কিছু টাকা ভাঙিয়ে পাশাপাশি দুটো দোকান নিয়ে লম্বা সাইনবোর্ড লাগালেন বসরার গোলাপবিতান। নুরুদ্দিন ওরফে নুরুল্লাহ জোর দিয়ে বলেছেন, তিনি নিজে দেখেছেন, ইরাকিদের রক্তে বসরার সব সাদা গোলাপ লাল হয়ে গেছে।

তিনি প্রতি শুক্রবার বাদ জুমা এক ঝুড়ি বাসি ও তাজা ফুল নিয়ে আজিমপুর গোরস্থানে চলে যান। এর কবরে-ওর কবরে ফুল ছিটিয়ে দেন। গোরখোদকেরা সবাই তাঁকে চেনে, সালাম দেয়। কর্মচারী হিসেবে আমি সাথে থাকি। খালি ঝুড়ি নিয়ে বসরায় ফিরে আসি। এভাবেই তিনি তাঁর করপোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটির দায় শোধ করেন।

আমার চাকরিজীবনের শুরুটা এই গোলাপবিতানে। প্রথম ছয় মাস আমার মূল কাজ ছিল দোকান খুলে চারদিকে গোলাপজল ছিটিয়ে দুটি করে আগরবাতি জ্বালানো আর দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করার আগে পচা ফুলের স্তূপ বড় ঝুড়িতে তুলে মাথায় করে সিটি করপোরেশনের দেয়ালঘেরা একটি স্থানে ফেলে আসা। দেয়ালে সুন্দর হরফে লেখা ছিল: এখানে ময়লা ফেলুন। আদেশক্রমে মেয়র, ঢাকা সিটি করপোরেশন।

ঠিক তার নিচে আরও বড় হরফে অপটু হাতে লেখা: এখানে প্রস্রাব করিবেন না। করিলে নুনু কাটিয়া ফেলিব।

যিনি লিখেছেন তিনি হয়তো ভালো করে জানেনই না আইন নিজের হাতে তুলে না নিলে কেবল পুরুষমানুষের ওই বিশেষ অঙ্গটি কাটা সম্ভব হবে না। পেনাল কোডে অর্থদণ্ড, কারাদণ্ড, মৃত্যুদণ্ড—এসব বিধান থাকলেও যত ছোট টুকরোই হোক শরীরের কোনো অংশ ছেঁটে ফেলার সুযোগ নেই।

পচা গোলাপ পাপড়ির যে কী ভয়ংকর দুর্গন্ধ! সুবাসিত সুমিষ্ট খাবার যখন মানববর্জ্য হয়ে বেরিয়ে আসে তখন যে রকম দুর্গন্ধ ছড়ায়, পচা গোলাপের ব্যাপারটাও ঠিক ও রকমই।

আমার কর্মোদ্যম ও নিষ্ঠা মালিক পছন্দ করেন। আমার জায়গায় নতুন লোক নেওয়া হয়, আমাকে পদোন্নতি দিয়ে শেখানো হয় তাজা ফুল দিয়ে বিয়ের গাড়ি আর লাশের খাটিয়া ও কফিন সাজানো। আমি এ কাজেও সাফল্যের ছাপ রেখে যাই।

সকাল-সন্ধ্যা দোকানের সামনে দিয়ে কজন পুলিশ সদস্য টহল দেয়। দোকান থেকে চাঁদা তোলে। কেউ দিতে গড়িমসি করলে বলে—হমন্দির গো, দোকানটা তোর বাপের তালুকে নাকি? নবাব সলিমুল্লাহ বাহাদুরের নাতি!

একজন দোকানদার বলল, পুলিশকে দেব আবার সরকারি দলের ছাত্রনেতাদেরও দেব, দুদিন পরে ইউনিভার্সিটির মাস্টাররাও চাইবেন, এটা মগের মুলুক নাকি?

রজনীগন্ধার স্টিক হাতে নিয়ে রসিক পুলিশ বলে, ভিআইপি গো গরম ডিম হান্দাইছি, হেভি গরম, তোরে দিমু রজনীগন্ধার ডাঁট। বেশি তেড়িবেড়ি করলে বেড়িবাঁধের ওপর খাড়া করাইয়া পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক মাইরা দিয়া কমু এনকাউন্টার। হালায় এনকাউন্টারে ধরা খাইছে।

মানে?

মানে আবার কী? একই কথা। আগে কইতাম ক্রসফায়ার।

> “আমাদের গায়েও হলুদ টি-শার্ট, আমাদের মেয়েরাও পরেছে হলুদ শাড়ি কিংবা কামিজ।”

দুই

সেই ফুলের বাজারটা আর নেই। ফুলের দোকানে ভালো করে পেট্রল মেরে সব জ্বালিয়ে দিয়েছে। অঙ্গার হয়ে গেছে দুটি ফুলবালক আর একটি ফুলবালিকা। দারুণ ফটো অপুরচুনিটি, হর্স্ট ফাস জুনিয়র এবং মাইকেল লরেন্ট জুনিয়র ঢাকা ডেমোক্রেসি ফেস্টিভ্যাল কাভার করতে বাংলাদেশেই ছিলেন। তাদের তোলা ফুলবালক, ফুলবালিকা আর গোলাপের পোড়া শরীর থেকে বেরিয়ে আসা ধোঁয়ার কুণ্ডলীর চারটি ছবি *নিউইয়র্ক টাইমস*-এ ছাপা হয়েছে এবং তাদের এনে দিয়েছে পুলিৎজার পুরস্কার। শাহবাগ থানার পশ্চিম পাশ থেকে শুরু চারুকলার উল্টো পাশ পর্যন্ত কমবেশি সিকি কিলোমিটার জায়গাজুড়ে মাথা তুলে দাঁড়ানো ফুলের দোকানের একটিও এখন আর নেই। একটি ফুলের নাম কেবল টিকে আছে।

এখানে এখন ক্রিসেনথিমাম শপিং মল।

দোকান বরাদ্দের সময় ক্ষতিগ্রস্ত ফুল ব্যবসায়ীদের অগ্রাধিকারের কথা বলা হলেও আর্থিক সামর্থ্য না থাকায় আলহাজ নুরুদ্দিন ওরফে নুরুল্লাহ ছাড়া আর কেউ সুবিধা করতে পারেননি। নিজেকে ফুল দোকানদার মালিক সমিতির সভাপতি দাবি করে প্রভাব ও টাকা খাটিয়ে পাশাপাশি তিনটি দোকান কিনে তিনি তাঁর প্রিয় নায়িকা আনুশকার নামটি ব্যবহার করে দোকানের নাম দিয়েছেন ‘আনুশকা ফ্যাশানস’।

মালিক দয়ার সাগর, দুর্দিনে আমাকে বিদায় করেননি। পেটে-ভাতে তাঁর সঙ্গেই রেখেছেন, আনুশকা ফ্যাশানস চালু হলে ফুলের দোকানের দেড় গুণেরও বেশি বেতনে সেলসম্যানের চাকরি দিয়েছেন। বলেছেন, বাবু মিয়া, তুমি আমার নিজের লোক। নিজের কাজটা ঠিকভাবে করার পাশাপাশি আমার স্টাফদের দিকেও চোখ রাখবে। কিছু খটকা লাগলে আমাকে জানাবে।

তিনি তাঁর ব্যক্তিগত নম্বরটি থেকে আমার সাড়ে নয় শ টাকার সেটে কল দিলেন এবং বললেন, নম্বরটা সেইভ করে রাখো।

ক্রিসেনথিমাম শপিং মলের নিচতলায় ঠিক মাঝামাঝি জায়গাটাতে আনুশকা ফ্যাশানস।

ব্যবসা জমে উঠতে ছয় মাস লাগেনি।

পয়লা বৈশাখ আনুশকার স্পেশাল হলদে শাড়ি, হলদে কামিজ, হলদে পাঞ্জাবি ঢাকার বাজার মাত করে দিল। হলদে রঙের ওপরই কোটি টাকা। আনুশকা ফ্যাশানসের ব্র্যান্ড কালার হলুদ। হাতে হাতে হলদে ব্যাগ। ব্যাগের দুপাশে আড়াআড়ি লাল হরফে লেখা আনুশকা। আনুশকা ব্র্যান্ডের সাফল্য মালিককে উজ্জীবিত করল, উত্তরাতেও খুলবেন আনুশকা ফ্যাশানস-২। তারপর চট্টগ্রামে আনুশকা ফ্যাশানস-৩...এভাবেই হলদে রঙে ছেয়ে যাবে বাংলাদেশ।

সাংবাদিকতার হলুদকে ফ্যাকাশে করে দেবে আনুশকার হলুদ।

আমরা যারা এখানে কাজ করছি, আমাদের গায়েও হলুদ টি-শার্ট, আমাদের মেয়েরাও পরেছে হলুদ শাড়ি কিংবা কামিজ। আমরা কেবল মেয়েদের পোশাকই বিক্রি করি।

দোকান সাজাতে আমাদের মালিক সাংহাই থেকে সাতটা ম্যানিকিন আনিয়ে

দিয়েছেন। নারী ম্যানিকিন। পোশাক পরানোর পর জীবন্ত তরুণীই মনে হয়। প্রতিটি ৩৭৫ ডলার। আরও সস্তায় আনা যেত। কিন্তু সেগুলোকে এত জীবন্ত মনে হতো না। প্রতিটার আলাদা করে প্যাকেট। শুল্ক বিভাগের কাছ থেকে ছাড় করিয়ে মালগুলো দোকানে এনে যখন বের করা হলো দেখা গেল ছয়টি একেবারে নিখুঁত কিন্তু একটির ডান পা হাঁটুর নিচে ভাঙা। কেবল ভাঙাই নয়, প্যাকেট থেকে বের করার সময় নিচের অংশটা পা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

দাঁড়িয়ে থাকা ছয়টি নগ্ন ম্যানিকিনকে দ্রুত কাপড় পরানো হয়। নারী বেশিক্ষণ নগ্ন রাখতে নেই, তাতে পুরুষের চোখের জ্যোতি নষ্ট হয়।

ভাঙা পায়ের শায়িত ম্যানিকিনের পা জোড়া লাগানোর চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর আমি কয়েক প্রস্থ চওড়া স্কচটেপ পেঁচিয়ে কোনোভাবে এটাকে দাঁড় করানোর আগে লাল সালোয়ার আর হলদে কামিজ পরিয়ে নিই। দোকানের ঠিক প্রবেশপথ থেকে শুরু করে ক্যাশ কাউন্টার পর্যন্ত ম্যানিকিনগুলোকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়।

ভাঙা-পা ম্যানিকিনও দাঁড়ায়। কিন্তু কিছুক্ষণ পর থেকেই আমার ভেতরে এক নতুন যন্ত্রণা শুরু হয়—দাঁড়িয়ে থাকতে ম্যানিকিনটার নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছে। এ রকম একটা ভাঙা পা নিয়ে আমি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারতাম।

দেড়-দুই ঘণ্টা না যেতেই আমাদের আনুশকা ফ্যাশানসের সেলস ম্যানেজার হেদায়েতুন্নবী বললেন, সবগুলোই এক মাপের আর এক চেহারার কিনতে গেলেন কেন? আমাদের তো ভ্যারাইটি দরকার ছিল—চার ফুট থেকে শুরু করে পাঁচ ফুট নয়। কেনার সময় স্যারের উচিত ছিল আমাকে নিয়ে যাওয়া। তাহলে বুঝেশুনে কিনে দিতাম। আর মেয়েগুলো এমন বুকে মরা কেন?

বুকে মরা!

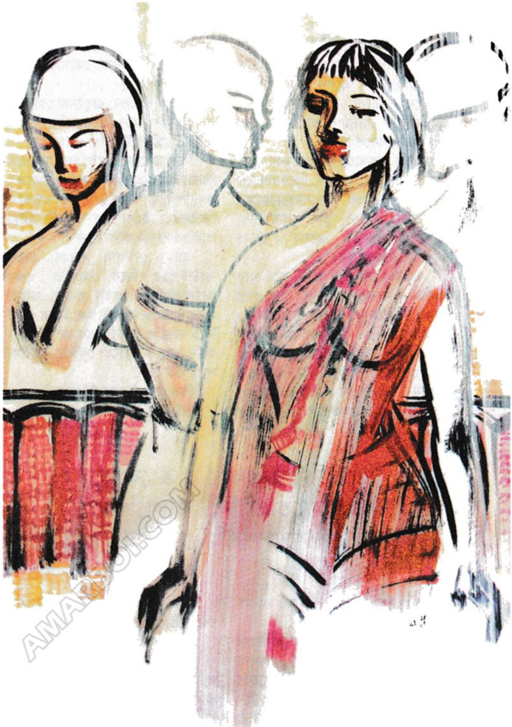
অনুন্নত স্তনের সাদামাটা বিবরণ এমন হতেই পারে। বুকে মরা!

নাক এত চোখা কেন? বলে তিনি একে একে তিনটি ম্যানিকিনের নাক টিপে দিলেন।

ব্যাপারটা আমার ঠিক পছন্দ হচ্ছে না।

পরেরটাই ভাঙা পা ম্যানিকিন। তিনি হাত গুটিয়ে নিয়েছেন। তিনি যদি তার নাকে হাত দিতেন, আমি সম্ভবত চেঁচিয়ে উঠতাম: স্যার, আপনি মেয়েমানুষের গায়ে হাত দিচ্ছেন কেন?

ম্যানেজার, একজন সুইপারসহ আমরা বারোজন কর্মচারী, সাতজনই



নারী। আনুশকা ফিক্সড প্রাইসের দোকান, কাস্টমারের সঙ্গে আমাদের দর-কষাকষির সুযোগ নেই। তবুও কেউ কেউ বলেন, ইচ্ছে করলেই তো কিছু কম রাখতে পারেন।

ইচ্ছে করে, কিন্তু সিস্টেমে সে সুযোগ নেই। কম্পিউটার প্রাইস ট্যাগের বাইরে অন্য কিছু বুঝতে চায় না।

ম্যানেজার জানেন আমি মালিকের লোক। মালিকের লোক হিসেবে দোকানের শাটার ফেলে আমিই তালা লাগাই।

সবাই বেরিয়ে যাওয়ার পর আমি লাইটের সুইচ অফ করতে করতে ভাঙা পায়ে কষ্ট করে দাঁড়িয়ে থাকা ম্যানিকিনের কাছে আসি। মাথা নিচু করে বলি, সরি।

তারপর বল নাচের সময় মানুষ যেমন পেছনে হাত দিয়ে আলতো করে নারীর কোমর ধরে, আমিও সেভাবে তার কোমর ধরে আস্তে আস্তে ফ্লোরে শুইয়ে দিই। বলি, আর কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে, এখন একটু ঘুমোও। পা'টা রেস্ট পাবে।

মোট আটটি তালা লাগাই, আমাদের এসওপি-স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর অনুযায়ী ম্যানেজার টেনে টেনে চেক করেন—তালা ঠিকঠাক লাগল কি না। একটা কথা সত্যি, সাত ম্যানিকিনের একজনও দেখতে বাঙালিদের মতো নয়। আমি তাদের নাম রেখেছি ইসাবেলা, আমান্দা, হেনরিয়েটা, এলিজাবেথ, ভিক্টোরিয়া, ডায়ানা ও জুলিয়েট। ভাঙা পায়ের ম্যানিকিনের নাম ভিক্টোরিয়া।

ম্যানেজার বুকে মরা সাতজনের

ব্রেস্ট আপলিফট করার দায়িত্ব দিলেন আমাদের সিনিয়র সেলস অ্যাসিস্ট্যান্ট ফারহানা মান্নাফকে। তিনি বাজার ঘুরে প্যাড লাগানো সাতটি পয়েন্টেড ব্রেসিয়ার নিয়ে এলেন এবং পরদিন সকালে ক্রেতা ঢোকার আগেই সাতজনকে ব্রেসিয়ার পরিয়ে পরনের পোশাকও বদলে দিলেন।

আমি মাঝখানে একবার ফারহানার সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, ভিক্টোরিয়াকে আস্তে ধরবেন, ওর পায়ে সমস্যা আছে।

তিনি বললেন, তুমি পুরুষমানুষ, এসব দেখতে এসেছ কেন? ম্যানেজারকে ডাকব?

যতক্ষণ দোকানে আছি, ঘুরে ঘুরে আমি এই সাতজনকে দেখি। হতে পারে একই কারখানায়, একই ছাঁচে তৈরি। কিন্তু তারপরও একজন অন্যজনের মতো নয়—ইসাবেলা আর আমান্দা এক নয়, হেনরিয়েটার চাহনি আর ডায়ানার চাহনি ভিন্ন রকম। এলিজাবেথ ও জুলিয়েটের মেজাজে তফাত। ভিক্টোরিয়া আর ছয়জনের কারও মতোই নয়।

প্যাডেড ও পয়েন্টেড ব্রেসিয়ারে ভিক্টোরিয়াকে একটুও মানায়নি। অবশ্য এটা আমার বিবেচনা। অন্যদের ব্যাপারে আমার বলার কিছু নেই। মালিক একদিন এসে ম্যানিকিনগুলোর দারুণ প্রশংসা করলেন। বললেন, প্রতিটা মেয়ে আমার ওয়াইফের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর।

কথা শুনে মেয়েরা ফিক করে হেসে ওঠে কিন্তু ফারহানা মান্নাফ গম্ভীর হয়ে যান।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কোন মেয়েটার পা ভাঙা?

সেলস গার্লরা একজন অন্যজনের দিকে তাকায়। ম্যানেজার এগিয়ে এসে বলেন, স্যার তোমাদের পায়ের কথা জিজ্ঞেস করছেন না। জানতে চাইছেন কোন ম্যানিকিনের পা ভাঙা।

তিনি ম্যানেজারকে বললেন, তুমিই বলো কোনটার পা ভাঙা?

কোন পা? ম্যানেজার একটা একটা করে সাতটাকেই দেখেন। তারপর হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকেন। বলেন, কোনটা যে বুঝতে পারছি না। সালোয়ার না খুললে বোঝা যাবে না।

তিনি ম্যানেজারকে ধমক দিলেন, দিনদুপুরে তুমি মেয়েদের সামনে কী যা-তা বলছ। এই দোকানের ওভারঅল রেসপনসিবিলিটি তো তোমার। নাকি অন্য কারোর?

মালিক বললেন, বাবু মিয়া কোথায়?

আমি সামনে এসে বলি, স্যার, ভিক্টোরিয়ার পা'টা ভাঙা। ডান পা।

তিনি বললেন, ভিক্টোরিয়া? মহারানি ভিক্টোরিয়া। আমি রামসুন্দর বসাকের বাল্যশিক্ষায় পড়েছি, মহারানি ভিক্টোরিয়া ইংল্যান্ডের সম্রাজ্ঞী হইয়া ভারতও শাসন করিয়াছেন।

আমি দেখলাম দরজা থেকে কাউন্টারের দিকে আসতে পঞ্চম ম্যানিকিনটারই একটু সমস্যা আছে, মানে দাঁড়াতে ওর কষ্ট হয়, হাঁটুর একটু নিচে ভাঙা ও শরীর থেকে তা বিচ্ছিন্ন। আমি আঙুল উঁচিয়ে দেখিয়ে দিলাম, স্যার ওই তো।

কিন্তু তুমি চিনলে কীভাবে।

এই তো, মানে দেখতে দেখতে।

> ভিক্টোরিয়ার একটা হাত কোমরে, অন্য হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ, গলায় পেঁচানো পশমি দোপাট্টা।

তুমি একাই দেখো, ম্যানেজার দেখে না?

আমি সবাইকে চিনি, সাতজনকেই।

তারপর আমি বিড়বিড় করতে থাকি—ইসাবেলা, আমান্দা, হেনরিয়েটা, এলিজাবেথ, ভিক্টোরিয়া, ডায়ানা আর জুলিয়েট। হঠাৎ আমার চোখ যায় ভিক্টোরিয়ার ওপর। ভিক্টোরিয়ার একটা হাত কোমরে, অন্য হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ, গলায় পেঁচানো পশমি দোপাট্টা। ঠোঁট চেপে একটু রেগে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমার মনে হলো, ভিক্টোরিয়া বলছে, সাবধান বাবু মিয়া, আর একটা কথাও বলবে না।

ঘাড় নেড়ে আমিও বলি, আচ্ছা।

মালিক আবার জিজ্ঞেস করলেন, বাবু মিয়া, তুমি কেমন করে বুঝলে যে ওটারই পা ভাঙা।

আমি ভিক্টোরিয়ার পায়ের কাছে বসে হাঁটুর একটু নিচে সালোয়ারের ওপর দিয়ে হাত বুলাই, স্কচটেপের আস্তর হাতে লাগে। আমি বলি, জি স্যার, এটাই। টেপ মেরেছি বোঝা যায়। ধরে দেখতে পারেন। ভিক্টোরিয়ার পা'টা একটু নড়ে। আমি মাথা উঠিয়ে ওপরের দিকে তাকিয়ে ওর চোখাচোখি হয়ে আবার ধমক খাই : আমার পা ছুঁয়ে দেখার জন্য তুমি অন্য পুরুষমানুষ ডাকছ? ছিঃ বাবু মিয়া।

ভিক্টোরিয়ার কথা শুনে একটু পেছনে দাঁড়ানো হেনরিয়েটা মুচকি হাসে, আমার দিকে তাকিয়ে চোখ টেপে। আমি সাড়া দিইনি। সাড়া দিলে ভিক্টোরিয়া কষ্ট পাবে।

ইসাবেলাও কিছু একটা বলে তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

আমার ম্যানিকিন-জ্ঞান মালিককেও মুগ্ধ করে।

তিনি বলেন, থাক বাবু মিয়া, অনেক হয়েছে, লুলা আতুর মেয়েমানুষের পায়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে আর কত দিন খাড়া রাখবে? আমরা মাল ডেলিভারি পাবার পরই তোমাদের কথামতো কোম্পানিকে জানিয়ে দিয়েছিলাম একটার ঠ্যাং ভাঙা। এত দিনে মেইল পাঠিয়ে বলেছে, একই সাইজের আরেকটা ম্যানিকিন আমাদের অন্যান্য মালের সঙ্গে শিগগির শিপমেন্ট করবে। ওটা এসে গেলে জোড়াতালি দিয়ে চালানোর দরকার হবে না। ভাঙাটা তখন ফেলে দিয়ো।

আমি নিজের ভেতর চেঁচিয়ে উঠি, ইম্পসিবল। ভিক্টোরিয়াকে ফেলে দেওয়ার প্রশ্নই আসে না, ও আনুশকা ফ্যাশানস থেকে এক পা নড়বে না।

কথাগুলো সশব্দে উচ্চারিত হয়নি। সুতরাং আমি কী বলতে চাই তা মালিকের জানা হলো না।

ম্যানেজার আমাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রতি সপ্তাহে ম্যানিকিনদের অবস্থান পরিবর্তন করছেন এবং পোশাকও পাল্টে দিচ্ছেন। কিন্তু সবই তাঁর পণ্ডশ্রম। কারণ, পোশাক আর অবস্থান দেখে আমি ম্যানিকিন শনাক্ত করি না। আমি তা করি ম্যানিকিনের ঘ্রাণ শুঁকে। আনুশকা ফ্যাশানসে ভিক্টোরিয়াকে যে বেশে যেখানেই রাখা হোক না কেন, তার শরীরের ঘ্রাণ আমাকে বলে দেয়, ওই যে এ তো ভিক্টোরিয়া।

অন্যদের বেলায় এত দূর থেকে ঘ্রাণ পাই না। কাছে যেতে হয়। নাক দিয়ে বাতাস টানতে হয়। কেউ কালিজিরার গন্ধ ছড়ায়, কেউ এলাচির, কেউ চন্দ্রমল্লিকার, কেউ কাঁচা ধানের। কারোরটা ছাপাখানা থেকে সদ্য বেরিয়ে আসা গ্রন্থের। শুকনো খরখরা মাটিতে ঝিরঝির বৃষ্টি পড়লে মাটি থেকে যে ভাপ বের হয়, সেই ভাপের গন্ধ কেউ বয়ে বেড়ায়। ভিক্টোরিয়ার ঘ্রাণটা আমার শৈশবে পাওয়া হুবহু সেই ঘ্রাণের মতো—ঘ্রাণটা সদ্য মাখন ফেটা ঘি-মাখা গরম ভাতের। ম্যানেজার ভিক্টোরিয়াকে যেখানেই রাখুন, ঘ্রাণই আমাকে বলে দেবে ও কোথায়।



অন্তত এক ডজন টিস্যু পেপার টেনে তুলি। ডিসপ্লে থেকে তুলে নিই একটি কালো প্যান্টি এবং থ্রিপিস সেট থেকে একটি হলুদ সালোয়ার। আমি জানি, আমি ভিক্টোরিয়ার সম্ভ্রম রক্ষা করতে পারব। তা ছাড়া এ দায়িত্ব তো আমারই।

টিস্যুগুলো একটার পর একটা সাজিয়ে আমার পকেটের রক্তলাগা রুমাল দিয়ে পেঁচিয়ে আমি পৃথিবীর প্রথম ম্যানিকিন স্যানিটারি ন্যাপকিন তৈরি করে প্যান্টির ভেতর সযত্নে বিছিয়ে ভিক্টোরিয়াকে পরিয়ে দিলাম। তারপর হলুদ সালোয়ার। আস্তে করে ট্রায়ালরুমের দরজা খুলে বেরিয়ে আসি।

ভিক্টোরিয়া ম্যানিকিনকে যখন নির্ধারিত জায়গায় দাঁড় করাতে চেষ্টা করছি, কোত্থেকে ম্যানেজার এসে চিৎকার করে ওঠেন, বাবু মিয়া, এটা এতক্ষণ কোথায় ছিল?

আমি বললাম, পায়ের ব্যান্ডেজটা খুলে গেলে হুমড়ি খেয়ে পড়ত কি না, তাই পা'টা ঠিকঠাক করে দিলাম। ওই তো পাশেই বসে ঠিক করছিলাম।

এই ল্যাংড়া বুড়িটাকে রাখার দরকার কী? বাইরে ফেলে দিয়ে এসো। নতুন একটা তো আসছেই।

আমি বলি, আগে নতুনটা আসুক।

ম্যানেজার সাহেব কাদামুখো শূকরের মতো ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে কাউন্টারের দিকে চলে যান।

আমার ইচ্ছে করছিল ম্যানেজারের বোঁচা নাকের ওপর দশ টনি একটা ঘুষি বসিয়ে দিই। বলে কী—ল্যাংড়া বুড়ি!

আমার ওপর ভিক্টোরিয়ার নিশ্বাস পড়ে, আমি চোখ তুলে তাকাতেই দুটো কথা বলে, আই অ্যাম সরি বাবু মিয়া, তোমাকে বিব্রত করার জন্য আমি দুঃখিত। এভাবে দিনদুপুরে ব্যাপারটা শুরু হবে ভাবতে পারিনি। তোমাকে ধন্যবাদ যে তুমি একাই সামলে নিয়েছ, অন্য কাউকে ডাকোনি। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, ম্যানেজারের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে তোমার চাকরি চলে যাবে। তখন কে আমার খোঁজখবর রাখবে? আমার সঙ্গে সাংহাই থেকে আসা প্রতিটি মেয়ে ভীষণ পাজি। আমাকে বেকায়দায় ফেলে দিয়ে হাসাহাসি করবে। আমার চরিত্র নিয়ে কথা তুলবে। এখন তাড়াতাড়ি সরে যাও। ম্যানেজারটা আবার এদিকেই আসছে, বাবু মিয়া।

কাস্টমারের দিকে আমার মনোযোগ নেই, এমন একটা অভিযোগ এনে আমাকে তিনি খুব শাসালেন এবং চট্টগ্রামে আনু ফ্যাশানস-৩-এ বদলি করিয়ে দেওয়ার হুমকি দিলেন।

তিন

ঈদ এগিয়ে আসছে। আনুশকা ফ্যাশানস বেশ জমজমাট। কাস্টমারদের কেউ বলছেন, এটা তো সাউথ ইন্ডিয়ান ডিজাইন, কেউ বলছেন, হলদে একটা বাজে রং, গোলাপি নেই? একজন বললেন, প্লাস্টিকের মেয়েমানুষ দেখিয়ে আর কত ব্যবসা করবেন?

আমরা কুলিয়ে উঠতে পারছি না, এমন একটা অবস্থায় আমার হঠাৎ চোখ পড়ে ভিক্টোরিয়ার পায়ের দিকে। আমি এগিয়ে যাই। পা গড়িয়ে কয়েক ফোঁটা রক্ত মেঝেতে পড়েছে, আমি স্পষ্ট দেখছি তার হলুদ সালোয়ারের নিচে হাঁটুর ওপরের দিক থেকে আরও কয়েক ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে নামছে।

প্রথমে আতঙ্কিত হই, ওহ্ মাই গড। আমার ভিক্টোরিয়ার কী হলো!

পরক্ষণেই মনে হলো, ঠিকই আছে, এটাই তো হওয়ার কথা। পৃথিবীর সাড়ে তিন শ কোটি নারীর নারীত্বের এটাই তো প্রধান সাক্ষ্য। সাড়ে তিন শ কোটির সঙ্গে ভিক্টোরিয়াও যোগ হলো।

আমি প্রথমে ভিক্টোরিয়াকে আড়াল করে দাঁড়াই। তারপর দ্রুত পকেট থেকে রুমাল বের করে রক্তটা মুছে ফেলি এবং ম্যানেজারের চোখ এড়িয়ে ভিক্টোরিয়াকে তুলে নিয়ে একটি ট্রায়ালরুমে ঢুকে পড়ি। সালোয়ারটা খুলতেই হয়। ডান উরুতে ভেতরের দিকটাতে কালচে একটি রক্তের চাক লেগে আছে। পকেট থেকে ব্যবহৃত টিস্যু বের করে রক্তের দাগটা তুলে আনি। কিন্তু এ অবস্থায় আমি আর কী করতে পারি?

ট্রায়ালরুমের দরজা খুলে উঁকি দিই, বাইরে সিটকিনি লাগিয়ে অকুপাইড বাতি জ্বালিয়ে দিই। আমার হাতে সময় খুব কম। কাউন্টারের কাছে গিয়ে দ্রুত

ভিক্টোরিয়ার কথা ভেবে আমি তার কোনো কথার প্রতিবাদ করিনি।

জরুরি প্রয়োজনের কথা বলে দোকান বন্ধ করার পনেরো মিনিট আগেই ছুটি নিই। ম্যানেজারকে বলি, মাকে আনতে গাবতলী বাসস্ট্যান্ডে যেতে হবে। আসলে আমার মা নেই অন্তত এক যুগ।

ম্যানেজার নিজেই হাঁকডাক দিয়ে শাটার নামায়, তালা লাগায়। আমি শব্দ শুনি। ম্যানেজার আমার মাকে গাল দেয়, বুড়ি ঢাকায় আসার আর সময় পেল না।

আমি সবই শুনি, কারণ আমি কোথাও যাইনি। একটা ট্রায়ালরুমে ঢুকে ঘাপটি মেরে বসে ছিলাম। তালাবন্ধ অন্ধকার দোকানের ছোট্ট খুপরি থেকে বেরিয়ে বুঝতে পারি আজ আমি স্বাধীন, সত্যিকারের স্বাধীন। সদ্য মাখন ফেটা ঘিয়ে মাখা গরম ভাতের গন্ধ আমাকে ডাকতে থাকে।

আমি ভিক্টোরিয়াকে আমার পিঠে চড়িয়ে পা পা করে ম্যানেজারের কিউবিকলে ঢুকে পড়ি। স্বচ্ছ কাচের রুম ভেতর থেকে লক করা যায়। আমি তালা মেরে দিই। অন্ধকারে স্বচ্ছ কাচের আর পুরু ইস্পাতের দেয়ালের মধ্যে তফাত থাকে না। তারপরও টেবিল ও চেয়ারের আড়ালে চটের কার্পেটের ওপর আমি আর ভিক্টোরিয়া শুয়ে পড়ি।

আমি ফিসফিস করে বলি, প্যাড লাগানো পয়েন্টেড ব্রেসিয়ারে যে উদ্ধত স্তন, তা আমার একটুও ভালো লাগে না।

আমারও না। ভিক্টোরিয়া বলে।

তারপর আমি কথা হারিয়ে ফেলি।

ভিক্টোরিয়া বলে, তোমার চুলের সিঁথি মাঝখানে কেন? এটা আমার ভালো লাগে না।

যেভাবে তোমার ভালো লাগে, সেভাবেই আঁচড়ে দাও।

ভিক্টোরিয়া আমার মাথার চুল এলোমেলো করে ফেলে, আমি সরিয়ে ফেলি তার উদ্ধত ব্রেসিয়ার।

ভিক্টোরিয়া বলে, শান্ত হও বাবু, শান্ত হও। এখন যে আমার ডেঞ্জার পিরিয়ড চলছে।

বিদ্যুতের বাক্সের ওপর লেখা থাকে : বিপজ্জনক ৪৪০ ভোল্ট।

ডেঞ্জার জেনেই তো এতটা এগিয়েছি।

ভিক্টোরিয়া বলে, ধেৎ, এটা সেই ডেঞ্জার নয়।

এভাবেই অভাবনীয় আনন্দময় একটি রাত আমাদের কেটে যায়। আমি নতুন পোশাক পরিয়ে ভিক্টোরিয়াকে তার জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে আসি।

ভিক্টোরিয়া বলে, তুমি কিন্তু একটুও ঘুমোওনি। একটা ট্রায়ালরুমে ঢুকে ঘুমিয়ে পড়ো। নতুবা কাজ করতে পারবে না।

কয়েক মাস পর ভিক্টোরিয়া ম্যানিকিনের পেটের স্ফীতি দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এক তরুণী ক্রেতা বলে ওঠে, ওমা, এটা প্রেগন্যান্ট নাকি?

আনুশকা ফ্যাশানস ঈদের তিন দিনের ছুটিতে নতুন করে সাজানো হবে। ইন্টেরিয়র ডিজাইনার আমাদের মালিকের সঙ্গে এসে সব দেখে গেলেন।

তিনি ভিক্টোরিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, আরে এটার তো ম্যাটেরিয়াল ফেলিওর হয়েছে, টেক্সার নষ্ট হয়ে গেছে, শরীর ছেড়ে দিয়েছে।

মালিক আমাকে ডাকলেন, বাবু মিয়া, এটাই সেই ভাঙা পা জোড়া দেওয়া মেয়েটা না?

আমি জোর দিয়ে বলার চেষ্টা করি পা'টা সেট হয়ে গেছে, আর কোনো সমস্যা নেই।

> জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সে রাতেই আমি ভিক্টোরিয়া ম্যানিকিনকে কিডন্যাপ করি।

তিনি ম্যানেজারকে ডেকে বললেন, এটার রিপ্লেসমেন্ট সাংহাই থেকে চলে এসেছে। কালই আমাদের সেন্ট্রাল স্টোর থেকে নিয়ে এসো। কালই কিন্তু। সাবধানে আনবে। কোথাও কোনো খোঁচা যেন না লাগে।

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সে রাতেই আমি ভিক্টোরিয়া ম্যানিকিনকে কিডন্যাপ করি।

চার

আমার বিরুদ্ধে অপহরণ ও ডাকাতির মামলা হয়। অস্ত্র আইনও সঙ্গে যোগ করা হয়। আমি দাড়ি রেখে দিই, নাম পাল্টে ফেলি। প্রায় দুই বছর আমাদের নিরুপদ্রবই কাটে।

ভিক্টোরিয়ার মেয়েটির বয়স এখন এক বছর পাঁচ মাস। সে সময় ভিক্টোরিয়ার ডেঞ্জার পিরিয়ড চলছিল।

আমি মেয়ের নাম রেখেছি কোমলগান্ধার। ভিক্টোরিয়া জিজ্ঞেস করেছে, এর মানে কী?

মানে, কোমলগান্ধার। এর বেশি আমি জানি না।

আমি একটি দোকান দিয়েছি। ফুলের দোকান। দোকানের নাম কোমলগান্ধার পুষ্পবিতান। চারপাশে লোহালক্কড়, ইট-সিমেন্ট, রড, চুনাপাথর ও রঙের দোকান। ফুলের দোকানে ম্যানিকিনের কোনো দরকার হয় না, তবুও ছোট্ট কোমলগান্ধার দাঁড়িয়ে থাকে। আমি বাইরে লাশের খাটিয়া সাজাই। ভেতর থেকে ভিক্টোরিয়ার মেয়ে ডাকে—বাবাই, চলে এসো। কোমল আমাকে বাবাই বলে।

ভিক্টোরিয়ার ফোন আসে, বাবু, পুলিশ রেইড করেছে। তোমরা সাবধানে থেকো।

আমার ফুলের দোকানের একমাত্র কর্মচারীটির হাতে চাবি দিয়ে আমি কোমলগান্ধারকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। ভিক্টোরিয়ার কাছেই পৌঁছাতে হবে। পৌঁছেও যাই। বাড়িওয়ালা আমাকে দেখে খেঁকিয়ে ওঠেন, কী বাবু মিয়া, আমার বাড়িতে চোরাই মাল ক্যান? ল্যাংড়া বড় পুতুলটা পুলিশ নিয়ে গেছে। এটাই নাকি আসল আলামত।

আমি ঘরে ঢুকি। ভিক্টোরিয়া নেই। চকির পায়ার কাছে পড়ে আছে ভিক্টোরিয়ার ভাঙা পা।

বাড়িওয়ালা বলেন, কী বাবু মিয়া, তোমার কোলে দেখি আরও একটা পুতুল। এটা চোরাই মাল না তো?

আমি সর্বশক্তি দিয়ে চেঁচিয়ে বলি, কসম আল্লাহর, এটা আমার নিজের। আমার আর ভিক্টোরিয়ার।

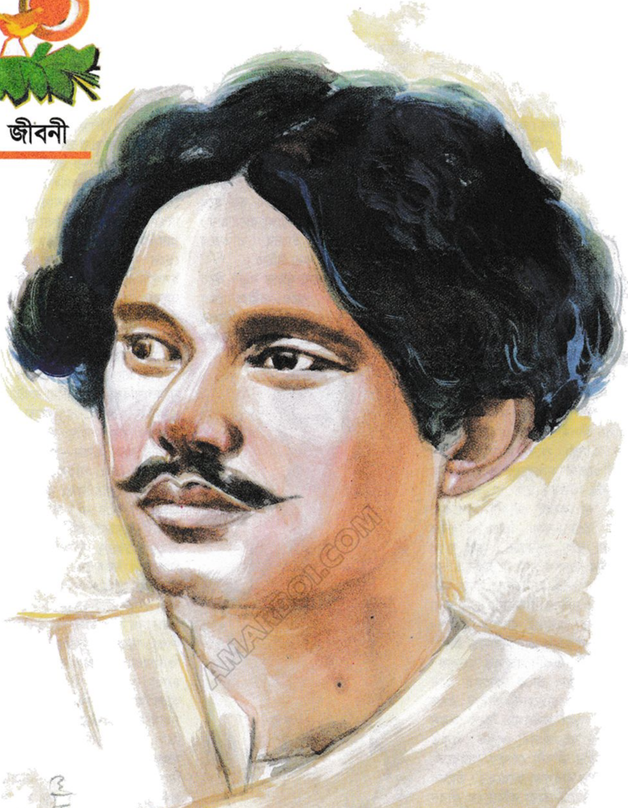
বাড়িওয়ালা জিজ্ঞেস করেন, মাথা ঠিকঠাক আছে তো? নাকি পেটে বেশি মাল পড়ছে?

আমি পকেটে হাত দিয়ে একমুঠো টাকা তার হাতে তুলে দিয়ে বলি, এই নিন আপনার ভাড়া।

কোমলগান্ধার তখনো আমার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছে। আমি ভিক্টোরিয়ার ভাঙা পা'টা তুলে নিই। আমি জানি, পুলিশ আবার রেইড করবে।

আমরা বেরিয়ে পড়ি। কোমলকে রক্ষা করতে হবে। কোমল কখনো চোরাই মাল হতে পারে না। ভিক্টোরিয়ার সেই ডেঞ্জার পিরিয়ডে আমিই সুগন্ধি বীজ বপন করেছিলাম, সে-ই তো আমার কোমলগান্ধার। ●

জীবনী



এই লেখাটি প্রথমা প্রকাশন থেকে প্রকাশিতব্য নজরুল-জীবনীর একটি অধ্যায়

গোলাম মুরশিদ

কবির উন্মেষ

একজন মানুষের জীবনী পুনর্নির্মাণ করার জন্য যেসব তথ্য অত্যাবশ্যক, নজরুল ইসলামের বেলায় তেমন অনেক কিছুই পাওয়া যায় না। তাঁর জন্মের পর এক শ বছরেরও বেশি অতিবাহিত হয়েছে, আজও, বিশেষ করে, তাঁর প্রথম জীবনের বহু ঘটনা অন্ধকারে আচ্ছন্ন। হঠাৎ কোনো সূত্র থেকে অজ্ঞাত তথ্য আবিষ্কারের ফলে এ অন্ধকার যে কেটে যাবে, সে সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। অন্ধকারে আচ্ছন্ন তাঁর পারিবারিক পটভূমিও। তিনি এমন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেননি, যে পরিবারের সামাজিক পরিচিতি ব্যাপক ছিল। তাঁর এমন আত্মীয়স্বজনও ছিলেন না, যাঁদের কাছ থেকে তাঁর জন্ম এবং বেড়ে ওঠার অভ্রান্ত এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয়

সচিত্রকরণ : মাসুক হেলাল

তথ্যগুলো জানা যাবে। এমনকি, তিনি যখন জটিল রোগাক্রান্ত হন, তখন তাঁর দুই সন্তানই বালক মাত্র। ফলে তাঁরাও তাঁদের পিতার সত্যিকার জীবন-কাহিনি সামান্যই জানতেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, কবিপত্নী প্রমীলাও স্বামীর প্রথম জীবনের কথা তেমন জানতেন না। বস্তুত, নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাবে নজরুল ইসলামের পূর্ণাঙ্গ এবং অভ্রান্ত জীবনী পুনর্গঠন করা একেবারে অসম্ভব না হলেও অত্যন্ত কঠিন।

এ কাজ আরও কঠিন হয়ে ওঠে তাঁর সম্পর্কে বহু শোনা-কথা প্রচলিত থাকায়। এমন প্রাণোচ্ছল ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন তিনি যে, তাঁর অসংখ্য বন্ধু জুটেছিলেন। এই বন্ধুদের কেউ কেউ তাঁর সম্পর্কে সত্য-মিথ্যা অনেক গালগল্প বলে গেছেন। অনেকে লিখেওছেন। এগুলোর অনেক কিছুই পরস্পরবিরোধী। তা সত্ত্বেও তাঁর জনপ্রিয় জীবনীগুলোতে এসব গল্পগুজব বেশ জায়গা করে নিয়েছে। তাঁর জীবনীগুলোর অধিকাংশ তাই অংশত কিংবদন্তি-নির্ভর। যে যা বলেছেন, যাচাই না করেই জীবনী-লেখকেরা সেসব শোনা-কথা দিয়ে জীবনীর কলেবর বৃদ্ধি করেছেন। এর ফলে সত্যিকার নজরুল চাপা পড়েছেন ভ্রান্তির জঞ্জালে।[১] সেই আবর্জনা থেকে মুক্ত করে তাঁর সত্যিকার জীবনী রচনা করা আজ প্রায় অসাধ্য ব্যাপার। হিন্দু-মুসলমান সমস্যাও তাঁর নিরাসক্ত জীবনী রচনার পক্ষে একটা মস্ত বড় অন্তরায়। যাঁরা এককালে তাঁকে 'কাফের' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন, তাঁরাই এখন কবিকে পাক্কা মুসলমান বলে অঙ্কন করছেন। বহু জীবনী-লেখক, প্রকৃত পক্ষে, তাঁর জীবনী লেখার পরিবর্তে, তাঁকে নিয়ে বীরপূজা করেছেন। তাঁদের জীবনীগুলোতে তাঁরা কবির যে জীবন চিত্রিত করেছেন, তা অতিরঞ্জিত এবং অবিশ্বাস্য। তা ছাড়া, অনেকে তাঁর পরিণত জীবনের মাহাত্ম্য আরোপ করে তাঁর প্রথম দিকের জীবনী রচনা করেছেন।

সাধারণ মানুষের বিচারে যা প্রামাণ্য মাপকাঠি, তা দিয়ে নজরুল ইসলামকে বিচার করা সংগত হবে না। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে যা সম্ভব-অসম্ভব এবং স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া হয়, তাঁর ক্ষেত্রে তা সর্বত্র প্রযোজ্য নয়। যেমন স্কুলে কোনো একজন কতটুকু পাটিগণিত-বীজগণিত-ইংরেজি-বাংলা-ইতিহাস-ভূগোল ইত্যাদি শিখে কতটা ভালো ফলাফল করেছে, সেটা একজন সাধারণ লোকের জন্য একটা প্রয়োজনীয় খবর। অপর পক্ষে, নজরুল ইসলামের মতো সত্যিকার প্রতিভাবান ব্যক্তির ক্ষেত্রে সেটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নয়। বরং জীবনের পথে পথে এ ধরনের প্রতিভাবান মানুষ আর পাঁচজন মানুষের তুলনায় ভিন্নভাবে বড় হয়ে ওঠেন, সেটাই মনে রাখা প্রয়োজন। এবং সেভাবে তাঁদের প্রতিভার বিকাশকে ব্যাখ্যা করা উচিত।

একটা পুরোনো দৃষ্টান্ত নতুন করে দেওয়া যেতে পারে—রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত। স্কুল-পালানো ছেলে ছিলেন তিনি। তা সত্ত্বেও, তিনি রবীন্দ্রনাথ হয়েছিলেন। বিস্তারিত তথ্য না জেনেও এর একটা স্থূল ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। তাঁর জন্ম হয়েছিল কলকাতার অত্যন্ত অভিজাত একটি পরিবারে। এ পরিবারের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ছিল প্রায় তুলনাহীন। প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও তাই সেই পরিবেশে লালিত-পালিত হয়ে একটি ছেলের পক্ষে রবীন্দ্রনাথ হয়ে ওঠার বিশ্বাসযোগ্য একটা ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু এক প্রান্তবর্তী পাড়াগাঁয়ের ছেলে দুখু মিয়া কী করে নজরুল ইসলাম হয়ে উঠলেন, সে এক অজানা রহস্য। তাঁর জীবনী-লেখকেরা সেই রহস্যের বিশ্বাসযোগ্য কোনো ব্যাখ্যা দেননি।



নজরুলের প্রথম আলোকচিত্র, আনুমানিক ১৭ বছর বয়সে

দুখু মিয়ার জন্ম কলকাতার মতো শিক্ষার আলোকে উজ্জ্বল এবং শিক্ষার সুযোগসুবিধা-পূর্ণ কোনো নগরীতে নয়, এমনকি, বর্ধমানের মতো মফস্বল শহরেও নয়। তাঁর জন্ম বর্ধমানের একটি অজ গ্রামে—চুরুলিয়ায়। যে পরিবেশ এবং পরিবারে তাঁর জন্ম, সেখানে রুপোর চামচ মুখে নিয়ে কেউ জন্মগ্রহণ করে না। সত্যিকার অর্থে, তাঁর পিতামাতার পরিবার ছিল অত্যন্ত দরিদ্র। ১৯৫৭ সালে কবিকে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্মিত তথ্যচিত্রে খড় দিয়ে ছাওয়া যে মাটির ঘরটি দেখা যায়, সেই ছোট ঘরটিতে দুই স্ত্রী আর সন্তানদের নিয়ে বাস করতেন নজরুলের পিতা। মাজার ও মসজিদের কাজ থেকে তিনি যৎসামান্য আয় করতেন বলে মনে হয়।[২] তা ছাড়া, তাঁর আয়ের একটা অংশ আসত জমিজমা থেকে। তবে সহায়-সম্পত্তি তাঁর এতই কম ছিল যে তিনি মারা যাওয়ার পর ন-দশ বছরের নজরুলকেও রোজগারের পথ বেছে নিতে হয়েছিল। বালক নজরুলকে প্রথমে কাজ করতে হয় মসজিদ ও মাজারে খাদেম অর্থাৎ সেবায়েতের কাজ। তারপর তিনি কাজ জোটান লেটো দলের গান রচনা ও গান গাইবার। বছর দুয়েক পরে লেটো দলের কাজ ছেড়ে পাউরুটির দোকানে রুটি তৈরির কাজও করেন। তারপর অল্পকালের জন্য তিনি প্রথমে এক রেলওয়ের গার্ড এবং পরে এক দারোগার গৃহভৃত্যের কাজও করেন। এ রকম পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেও তিনি যে কবি এবং গীতিকার-সুরকার হিসেবে অত বিখ্যাত ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন, তার একমাত্র ব্যাখ্যা হতে

---

১. পরস্পরবিরোধী শোনা কথা কীভাবে সত্যিকার নজরুলকে আড়াল করে ফেলেছে, তা নিয়ে একটি বইও লিখেছেন একজন—নীরদবরণ হাজরা। বইটির নাম *এক নজরুল, সহস্র সংশয়* (কলকাতা : বুলবুল প্রকাশন, ১৯৯৯)।

২. খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, *যুগস্রষ্টা নজরুল* (ঢাকা : অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৫৭), পৃ. ৪-৫

পারে এই যে তিনি ছিলেন অসামান্য প্রতিভার অধিকারী।

নজরুলের পরিবার দরিদ্র ছিল, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়; কিন্তু সে পরিবার কতটুকু শিক্ষিত ছিল, তা সঠিকভাবে বলা মুশকিল। তাঁর সম্পর্কীয় চাচা (নজরুলের পিতার চাচাতো ভাই) বজলে করিম লেখাপড়া খানিকটা জানলেও[৩], পিতা ফকির আহমদ ওরফে ফকির মোহাম্মদ[৪] এবং বড় ভাই সাহেবজান ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া লেখাপড়া জানতেন কি না, তার নিশ্চিত কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। এমনকি, ছোট ভাই আলী হোসেনও উচ্চবিদ্যালয়ের চৌকাঠ পেরিয়েছিলেন বলে কোনো প্রমাণ নেই। এহেন পরিবারে জন্ম নিয়ে দুখু মিয়া কী করে বাইশ-তেইশ বছর বয়সে অকস্মাৎ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্যগগনে ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হয়ে সবার চোখ ধাঁধিয়ে দিলেন, আপাতদৃষ্টিতে তার কোনো ব্যাখ্যা মেলে না। বস্তুত, যে পরিবেশ এবং পরিবারে তাঁর জন্ম, তার কোনোটাই তিনি যা হয়েছিলেন, তা হবার পক্ষে অনুকূল ছিল না।

বর্ধমান একটি হিন্দুপ্রধান জেলা। এ জেলায় ১৯০১ সালে জনসংখ্যার শতকরা ৮১.৩ জন ছিল হিন্দু আর শতকরা ১৭.১ জন মুসলমান। কিন্তু নজরুলের জন্ম যে রানিগঞ্জ মহকুমায়, সেখানে মুসলমানদের অনুপাত ছিল আরও কম। এ মহকুমায় হিন্দু ও মুসলমানদের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩ লাখ ২৭ হাজার আর ২৪ হাজার ১১৫ জন। অর্থাৎ মুসলমানদের সংখ্যা ছিল শতকরা মাত্র ৭.৩ জন।[৫] তবে যে চুরুলিয়া গ্রামে নজরুলের জন্ম, সে গ্রামে মুসলমানদের সংখ্যা আনুপাতিকভাবে কিছু বেশি ছিল। কারণ সে গ্রামে কিছু মুসলমান আয়মাদার বাস করত।[৬] জে সি কে পিটারসন লিখেছেন যে এই মুসলমানরা কোথা থেকে এসে এই গ্রামে বসতি স্থাপন করেছিল, তার ইতিহাস অজ্ঞাত। তবে এই আয়মাদার পরিবারগুলোর কোনো কোনোটা তাদের বাড়ি ও মসজিদ তৈরি করার কাজে যে পাথর ব্যবহার করেছিল, তা এসেছিল গ্রামের এক কোণে অবস্থিত রাজা নরোত্তম-নির্মিত ভেঙে পড়া দুর্গ থেকে।[৭] মনে হয় যে, হিন্দুপ্রধান এলাকা হলেও, চুরুলিয়া গ্রামে একটা মুসলিম মহল্লা ছিল। সেই পাড়ার বাসিন্দাদের চাহিদায়ই সেখানে ছোট হোক, বড় হোক, একটি মক্তবও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মসজিদও। এক কথায়, শিক্ষায় অনগ্রসর একটি হিন্দুপ্রধান গ্রামের মুসলিম পাড়ায় নজরুলের জন্ম।



চুরুলিয়ায় নজরুলের জন্মভিটা

এই গ্রামের সবচেয়ে কাছের রেলস্টেশন এবং শহরের নাম আসানসোল। গ্রাম থেকে ঠিক দক্ষিণে নয়—খানিকটা দক্ষিণ-পশ্চিমে—এই স্টেশনের অবস্থান ছিল সরলরেখার মাপে সাড়ে ১৪ কিলোমিটার দূরে। আর, গ্রামের দক্ষিণ-পুবে অবস্থিত রেলস্টেশন ও শহরের নাম রানিগঞ্জ, যা ছিল আসানসোলের তুলনায় খানিকটা বেশি দূরে—প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে। শিল্প-শহর হিসেবে রানিগঞ্জ সুপরিচিত ছিল। এ শহরে অনেকগুলো কয়লা, কাগজ ও তেলের কারখানা ছিল। জনসংখ্যার দিক দিয়ে রানিগঞ্জ ছিল আসানসোলের চেয়ে সামান্য বড়—তখনকার বর্ধমানের আটটি সবচেয়ে বড় শহরের মধ্যে একটি। প্রায় ১৬ হাজার লোক বাস করত এখানে।[৮] রানিগঞ্জের আরেক পরিচয় হলো : এটি ছিল চুরুলিয়ার তখনকার মহকুমা শহর (মহকুমা আসানসোলে স্থানান্তরিত হয় ১৯০৬ সালে)। এ গেল চুরুলিয়া গ্রামের দক্ষিণ দিকের কথা।

অপর পক্ষে, এ গ্রামের উত্তর দিকে মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে ছিল অজয় নদ এবং বর্ধমান জেলার সবচেয়ে উত্তরের সীমানা। নদীর ওপারেই বিহারের ঝাড়খণ্ড। সে দিক দিয়ে দেখলে, এই শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবির জন্ম বঙ্গদেশের একেবারে পশ্চিম সীমান্তে, অল্পের জন্য তিনি বিহারি বলে পরিচিত হননি। অজয় নদীর ওপারে উত্তর-পুবে বীরভূম জেলার সীমানা। চুরুলিয়ার পুব দিকে এক শ কিলোমিটারের মধ্যেও কোনো শহর ছিল না। আর এই গ্রামের পশ্চিম দিকে প্রায় তিরিশ কিলোমিটার দূরে বর্ধমানের পশ্চিম সীমানা। সেই নিঃশহর এলাকায়ও উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না।

কেবল শহর থেকে দূরত্ব দিয়েই চুরুলিয়া গ্রাম কতটা অনুন্নত ছিল, তা বোঝানো যায় না। সেটা খানিকটা বোঝা যায় আরেকটা তথ্য থেকে—এ গ্রামে অথবা এর কাছাকাছি কোনো গ্রামে একটাও মাধ্যমিক স্কুল ছিল না। এই গ্রামের রাস্তাঘাট এবং যোগাযোগব্যবস্থা কেমন ছিল, সে কেবল অনুমানসাপেক্ষ।

এই ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিবেশে নজরুলের জন্ম। এই পরিবেশেও তাঁর পারিবারিক পটভূমি আর পাঁচজনের তুলনায় উন্নত থাকতে পারত, কিন্তু তা ছিল না। প্রকৃত পক্ষে,

---

৩. বজলে করিম ফারসিতে কবিতা লিখতে পারতেন বলে উল্লেখ করেছেন খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন। —*যুগস্রষ্টা নজরুল*, পৃ. ৫। মঈনুদ্দীন অবশ্য কোনো প্রমাণ উপস্থিত করেননি। অতিরঞ্জন হওয়াই সম্ভব।

৪. নজরুলের পিতার নাম ফকির আহমদ, না ফকির মোহাম্মদ তা নিয়ে সন্দেহ আছে। নজরুল গ্রামোফোন কোম্পানির সঙ্গে একটি চুক্তিতে সই করেন। তাতে তাঁর স্বাক্ষরের ওপরে পিতার নাম ফকির মোহাম্মদ বলে লেখা রয়েছে।

৫. সেনসাস অব ইন্ডিয়া, ভলিউম ৬বি, পার্ট ৩, (কলকাতা : বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস, ১৯০২)

৬. দ্য ইম্পেরিয়াল গেজেটিয়ার অব ইন্ডিয়া ১৯০৮, ভলিউম ৯ (অক্সফোর্ড : ক্লারেনডন প্রেস, ১৯০৮)

৭. জে সি কে পিটারসন, বেঙ্গল ডিসট্রিক্ট গেজেটিয়ার, ভলিউম ২৬ (বর্ধমান) (কলকাতা : বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস, ১৯১০)

৮. ১৫৮৪১ জন। আসানসোল শহরের লোকসংখ্যা ছিল সাড়ে চৌদ্দ হাজার।

তিনি যে পরিবার ও পরিবেশে জন্মেছিলেন আর যৌবনে তিনি যা হয়েছিলেন, তার মধ্যে আদৌ কোনো মিল ছিল না। ফলে অনেকেই তাঁর যৌবনকালের খ্যাতি দিয়ে তাঁর পরিবার এবং বাল্যকালের পরিবেশকে বিচার করতে চেয়েছেন। তাঁর পরিবারের ওপর তাঁরা সেই গৌরব আরোপ করতে চেষ্টা করেছেন, যে গৌরব সত্যিকার অর্থে সে পরিবারের ছিল না। নজরুল আসলে পরিবার-নিরপেক্ষ একজন মানুষ—স্বগঠিত, স্বাবলম্বী, স্বাধীন, স্বধন্য। তাঁকে অতিমানব বললেও খুব একটা বাড়িয়ে বলা হয় না।

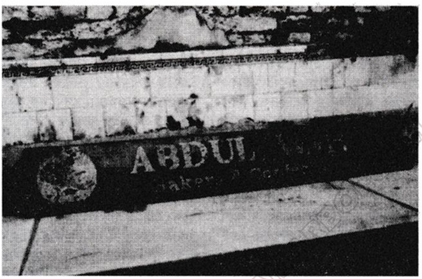
১৯২১ সালে—তখনো তিনি অনেকটা অপরিণত যুবক—তাঁর বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রে 'আয়মাদার' বিশেষণ দিয়ে তিনি তাঁর পিতাকে গৌরবান্বিত করতে চেয়েছিলেন। আয়মাদার বিশেষণ দিয়ে পিতাকে বড় করার এই যে প্রয়াস, তা ছিল নির্ভেজাল অতিরঞ্জন। এভাবে লেখার কারণে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা-প্রতিম এবং দরদি বন্ধু মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ তাঁর সমালোচনা করেছিলেন।[৯] নজরুলের পূর্বপুরুষের কেউ হয়তো আয়মাদার ছিলেন, কিন্তু তাঁর পিতা ফকির আহমদ আয়মাদার ছিলেন না। তা ছাড়া, আয়মাদার কথাটা এমন কিছু গৌরবেরও নয়। উইলিয়াম হান্টার 'আয়মা'র ব্যাখ্যা দিয়ে যা বলেছেন, তা থেকে মনে হয়, ধর্মীয় কারণে দেওয়া নয়, এমনকি, নিষ্করও নয়, বরং নামে মাত্র করের বিনিময়ে আবাদ করার জন্য প্রদত্ত পতিত জমিকে বলে আয়মা। অর্থাৎ, আয়মাদার কথাটার মানে পতিত জমি আবাদকারী।[১০]

ইংরেজ আমলে এ রকম সম্পত্তি দেওয়ার কোনো রীতি ছিল না। চুরুলিয়ার আয়মাদাররা এ পতিত জমি পেয়েছিলেন নবাবি আমল অথবা মোগল-পূর্ব আমলে। আয়মা ধর্মীয় কারণে প্রদত্ত লাখেরাজ সম্পত্তি নয়। নজরুলের পূর্বপুরুষদের কেউ কাজী ছিলেন বলে ধারণা করি। তাই তাঁর পারিবারিক পদবি সম্ভবত 'কাজী' ছিল। তবে বাল্যরচনাসমূহের ভণিতায় নজরুল কোথাও 'কাজী' উপাধি ব্যবহার করেননি। তাঁর চাচা বজলে করিম লেটো দলের অধিকারী ছিলেন। নিজের গ্রাম এবং ধারে-কাছের গ্রামে তাঁর পরিচিতি ছিল। কিন্তু তিনিও নামের আগে অথবা পরে 'কাজী' উপাধি ব্যবহার করেছেন বলে দেখা যায় না। তা ছাড়া, কাজীত্বের সঙ্গে আয়মাদারির কোনো সম্পর্ক নেই।

নজরুলের পূর্বপুরুষদের কেউ আয়মাদার থাকুন আর না-ই থাকুন, তার চেয়ে যা গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে সংসার চালানোর মতো যথেষ্ট সহায়-সম্পত্তি ফকির আহমদের ছিল কি না। ছিল না বলেই মনে হয়। বরং বাল্যকালে দারিদ্র্যের সঙ্গে নজরুল যে রকম কঠোর লড়াই করেছেন, তা থেকে এই ধারণা জন্মে যে তাঁর পিতা আদৌ সচ্ছল ছিলেন না।

দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও, নজরুলের পিতা অবশ্য দুই বিয়ে করেছিলেন। কেন করেছিলেন, তা জানা যায় না। হতে পারে প্রথম স্ত্রীর যথাসময়ে সন্তান হয়নি বলে তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেন। কিন্তু কারণ যা-ই হোক, শেষ পর্যন্ত কোন স্ত্রীর কয়টি সন্তান হয়েছিল, তা সঠিকভাবে কেউ উল্লেখ করেননি। এ থেকেও বোঝা যায়, তাঁদের পরিবার কত অপরিচিত এবং সামাজিকভাবে সাধারণ ছিল। দীর্ঘজীবী না-হলেও[১১], বলা হয়ে থাকে যে, ফকির আহমদ সাত পুত্র এবং দুটি কন্যার জন্ম দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর আগেই তাঁর এক স্ত্রী মারা যান, যাঁর নাম জানা যায় না। অন্য স্ত্রীর নাম ছিল জাহেদা খাতুন। বেশির ভাগ জীবনীকার ধরে নিয়েছেন যে নজরুল তাঁরই সন্তান।[১২] এই মায়ের গর্ভে নজরুলসহ তিন পুত্র ও এক কন্যার জন্ম হয়েছিল বলে আজহারউদ্দীন খান দাবি করেছেন।[১৩]

জাহেদা খাতুন দীর্ঘজীবী হয়েছিলেন এবং ১৯২৮ সালে মারা যান।[১৪] স্বামী মারা যাওয়ার পর স্বামীর চাচাতো ভাই বজলে করিমের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। ঠিক কখন, তা কেউ উল্লেখ করতে পারেননি। তবে এই বিয়ের ফলে নজরুল মায়ের ওপর অভিমান করে দূরে সরে গিয়েছিলেন বলে কোনো কোনো জীবনীকার জল্পনাকল্পনা করেছেন।[১৫] কিন্তু এটা নিতান্তই অন্ধকারে ঢিল ছোড়ার মতো। সৈন্যবাহিনী থেকে ফিরে এসেও ১৯২০ সালের প্রথম তিন মাসের মধ্যে কবি দুবার চুরুলিয়ায় বেড়াতে গিয়েছিলেন। কাজেই মায়ের সঙ্গে মান-অভিমান অথবা মনোমালিন্য হয়ে থাকলে, তখনই হয়েছিল, তার আগে নয়।



আসানসোলের এই রুটির দোকানে কিছুদিন কাজ করেছিলেন কিশোর নজরুল

---

৯. মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, *কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা* (৮ম মুদ্রণ : কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৯৫), পৃ. ৭৭

১০. স্ট্যাটেসটিকাল অ্যাকাউন্ট অব বেঙ্গল, ভলিউম ৪ (লন্ডন : ট্রুলার অ্যান্ড কোম্পানি, ১৮৭৬), বর্ধমানে তখন ছোট-বড় মিলিয়ে ১৭০৫টি আয়মা ছিল বলে হান্টার উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও লিখেছেন যে ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সেকশন ৯-এর রেগুলেশন ৮ অনুযায়ী পূর্ব প্রদত্ত এই আয়মাগুলোর পুরো নাম মালগুজারি আয়মা অর্থাৎ খাজনা দিতে হতো এমন আয়মা।

১১. ফকির আহমদ মারা যান, যখন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের বয়স মাত্র সতেরো-আঠারো ছিল বলে অনুমান করা যায়। তার অর্থ তিনি মারা যান যখন তাঁর বয়স খুব সম্ভব চল্লিশের কোঠায়।

১২. প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, জাহেদা খাতুন ছিলেন নজরুলের বিমাতা।—কাজী নজরুল (তৃতীয় সং : কলকাতা : এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৭৭), পৃ. ১৩

১৩. আজহারউদ্দীন খান, *বাংলা সাহিত্যে নজরুল* (তৃতীয় সং : কলকাতা : ডি এম লাইব্রেরি, ১৯৫৮), পৃ. ৩

১৪. অরুণকুমার বসু, *নজরুল-জীবনী* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০০), পৃ. ৫

১৫. আজহারউদ্দীন খানের বরাত দিয়ে অরুণকুমার বসু এ তথ্য দিয়েছেন। পৃ. ৫

তদুপরি, বজলে করিমের শিষ্য হিসেবে নজরুল যে লেটোর দলে কাজ করতেন, তা থেকেও এই আভাস পাওয়া যায়। মা দ্বিতীয়বার বিয়ে করার দরুন তাঁর ওপর অভিমান করে থাকলে সৎ পিতার সঙ্গেও একত্রে তাঁর কাজ করার কথা নয়। ১৯২১ সালে কলকাতায় এসে চাচা বজলে করিম এবং বড় ভাই সাহেবজান নজরুলকে চুরুলিয়ায় নিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু নজরুল যেতে রাজি হননি।[১৬] চাচা বজলে করিমের কারণে মায়ের ওপর অভিমান করে থাকলে তাঁকে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানাতে চাচা আসতেন না—এমন অনুমানই সংগত।

পিতার মৃত্যুর পর নজরুল তিন-চার বছরের বেশি পারিবারিক পরিধির মধ্যে ছিলেন না। জীবনীকারদের বিবরণ থেকে মনে হয় যে পিতার মৃত্যুর বছর দুই পরে তিনি মক্তবের লেখাপড়া শেষ করেন এবং সর্দার-পোড়ো হয়ে অন্য ছাত্রদের লেখাপড়া শেখানোর কাজে সহায়তা করেন। আজহারউদ্দীনের মতে, এ কাজ করে তিনি বছর খানেকের জন্য 'সংসার চালিয়ে দেন'।[১৭] এর কাছাকাছি সময়ে তিনি তাঁদের বাড়ির ধারের মসজিদের দেখাশোনা করতেন এবং সময়বিশেষে সেখানে ইমামতির কাজ অর্থাৎ নামাজে নেতৃত্ব দেওয়ার কাজও করতেন।[১৮] তা ছাড়া, ধারে-কাছের গ্রামে তিনি মোল্লাগিরির কাজ করতেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৯] ঠিক স্পষ্ট নয় কখন, কিন্তু মনে হয় প্রায় একই সময়ে, গ্রামের একটি মাজার—হাজী পালোয়ানের মাজারেও তিনি খাদেম বা সেবায়েতের কাজ করেন।[২০]



যুবক নজরুল

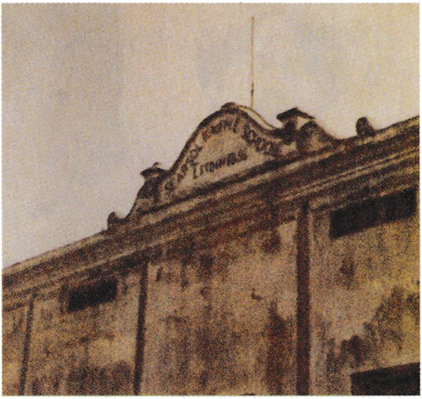
এসব কাজ তিনি কোনটা কত দিন করেছেন অথবা কোনটার পর কোনটা করেছেন, সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য না থাকায় জীবনীকারেরা অনুমানের ওপর ভিত্তি করে ঢালাওভাবে তাঁর এসব কাজে যুক্ত থাকার কথা উল্লেখ করেছেন। যদি ধরেও নিই যে এসব কাজ তিনি করেছেন, তা হলেও বহু প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। যেমন দশ-বারো বছরের অপ্রাপ্তবয়স্ক একটি বালককে গ্রামের লোকেরা ইমামতির কাজ দিলেন কেন? অথবা মোল্লাগিরি করার জন্যই বা তাঁর ডাক পড়ত কেন? এই বয়সী একটি বালকের নেতৃত্বে নামাজ অথবা মিলাদ পড়তে সাধারণ লোকেদের খুব উৎসাহ দেখানোকে স্বাভাবিক বলে মনে হয় না। বিশেষ করে ধর্মীয়-শিক্ষায়-শিক্ষিত প্রাপ্তবয়স্ক লোক তো গ্রামে থাকারই কথা। অন্তত, যে মক্তবে নজরুল নিজে লেখাপড়া শিখেছিলেন, সেই মক্তবের শিক্ষকেরা তো ছিলেন! তাহলে প্রাপ্তবয়স্ক লোক থাকতে বালক নজরুলকে মসজিদে ইমামতি, গ্রামে মোল্লাগিরি এবং মাজারে খাদেমের কাজ করতে হবে কেন? এবং করলেও তিনি কতটা করেছিলেন অথবা নিয়মিত করতেন কি না? এসব প্রশ্নের উত্তর আজ আর দেওয়া সম্ভব নয়। তবে মনে হয় যে জীবনীকারদের বর্ণনা ঢালাও ও অতিরঞ্জিত।

এসব ধর্মীয় কাজে তাঁর যুক্ত থাকা থেকে সাধারণভাবে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব। সে হলো : তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তি কেবল নিজের বাড়ি ও মক্তবেই তৈরি হয়নি। বরং মসজিদে ইমামতি, মাজারে খাদেমের কাজ, আশপাশের গ্রামে মোল্লাগিরির কাজ, এমনকি, লেটো গানের মাধ্যমেও তিনি ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তাঁর মনে ধর্মীয় বিশ্বাস রীতিমতো দানা বেঁধেছিল বাল্য ও কৈশোরের এসব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। পরবর্তী কালে ১৯৩০-এর দশকে তিনি যখন ইসলাম ধর্মীয় গান রচনা করেন, তখন সেসব গানের মধ্য দিয়ে ধর্মীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান প্রকাশ পায়।

আনুষ্ঠানিক ধর্ম ছাড়া, পীর-ফকির-সন্ন্যাসীর প্রতিও তাঁর মনে গভীর কৌতূহল গড়ে উঠেছিল। মাজারের সেবায়েত হিসেবে তাঁর কাজ করার কথা থেকে আভাস পাওয়া যায় যে বাল্যকাল

---

১৬. রফিকুল ইসলাম, *কাজী নজরুল ইসলাম জীবন ও সৃষ্টি* (দ্বিতীয় সং : কলকাতা : কে পি বাগচী অ্যান্ড কোং, ১৯৯৭), পৃ. ৩১
১৭. আজহারউদ্দীন খান, পৃ. ৪। সন্দেহ হয়, ন-দশ বছরের একটি বালকের পক্ষে সেটা সম্ভব ছিল কি না।
১৮. অরুণকুমার বসু, পৃ. ৬
১৯. আজহারউদ্দীন খান, পৃ. ৪
২০. ওই, পৃ. ৪



রানিগঞ্জের শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুল। ১৯১০-এ এই স্কুলে কিছুদিন পড়েছিলেন নজরুল

থেকেই তিনি ধর্মীয় রহস্যময়তা দিয়ে প্রভাবিত হয়েছিলেন।[২১] শিয়ারশোল স্কুলে পড়ার সময়ে তিনি একটি কবিতা লিখেছিলেন, তা থেকে এই রহস্যময়তার প্রতি তাঁর বিশ্বাসের প্রমাণ পাওয়া যায়।[২২]

প্রথমে নিজের গ্রামের মধ্যেই অল্পকাল মসজিদ ও মাজারে খাদেমের কাজ করলেও, পরে তিনি ঘুরে বেড়ান দূর-দূরান্তের গ্রামে-গঞ্জে। ঘুরে বেড়ান—কখনো লেখাপড়ার সূত্রে এবং কখনোবা উপার্জনের সূত্রে। এর ফলে কৈশোর থেকেই ধীরে ধীরে নিজের পরিবার, এমনকি, নিজের গ্রাম চুরুলিয়ার প্রতি তাঁর মনের টান দুর্বল হতে থাকে। বরং কৌতূহল এবং আকর্ষণ তৈরি হয় অপরিচিত লোক এবং পরিবেশের প্রতি। এই অবস্থাতেই মায়ের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক তৈরি হওয়ার সুযোগ হয়নি। সুযোগ হয়নি ভাইবোনের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার। অথচ তাঁর জীবনের ঘটনাবলি এবং তাঁর রচনাসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই যে, তিনি মাতৃস্নেহের জন্য রীতিমতো ব্যাকুল ছিলেন। বড় হয়ে তিনি বেশ কয়েকজন মহিলাকে মা সম্বোধন করেছিলেন এবং তাঁদের কাছ থেকে মাতৃস্নেহ লাভের জন্য কাঙাল হয়েছিলেন, কিন্তু নিজের মা জাহেদা খাতুনের প্রতি তিনি কোনো ঘনিষ্ঠ স্নেহের বন্ধন অনুভব করেননি। পরে দেখতে পাব, হুগলি জেলে তিনি যখন আমরণ অনশন শুরু করেছিলেন, তখন তাঁর মা তাঁর অনশন ভাঙানোর জন্য তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে, নজরুল তাঁর সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করেননি।[২৩] কিন্তু তাঁর পাতানো মা বিরজাসুন্দরীর হাতে পানীয় গ্রহণ করে অনশন ভঙ্গ করেছিলেন।[২৪] এর পাঁচ বছর পরে জাহেদা খাতুন যখন মারা যান, নজরুল তখনো তাঁকে দেখতে চুরুলিয়ায় যাননি। এমনকি, তাঁর সাহিত্যের কোথাও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মায়ের কথা উল্লেখও করেননি।

জীবনীকারদের মতে, জ্যেষ্ঠ পুত্র সাহেবজানের জন্মের পর ফকির আহমদের আরও চারটি (?) পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিল। কিন্তু তারা শৈশবেই মারা যায়। কে কত দিন বেঁচে ছিল, তা জানা যায় না। কিন্তু নজরুল নাকি ফকিরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেছিলেন যে অনেক বছর তাঁর মায়ের কোনো সন্তান না হওয়ায় তিনি তারাপীঠ থেকে আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন এবং সে জন্য নজরুলের আরেক নাম তারাখেপা।[২৫] এ কথা অবিশ্বাস্য। কারণ, তাঁর বড় ভাই সাহেবজান তাঁর থেকে বছর সাতেকের বড়। সাহেবজানের পর পাঁচ-ছয় বছরের মধ্যে আরও চারটি পুত্র জন্মে এবং তারা শৈশবেই মারা যায়। সুতরাং অনেক দিন সন্তান না হওয়ার কথা সত্য হতে পারে না। তবে ষষ্ঠ (?) পুত্র নজরুলের জন্মের পর তাঁর নাম দেওয়া হয় দুখু মিয়া। পরপর একাধিক পুত্রসন্তান মারা যাওয়ার পর পুত্র জন্মালে সেই পুত্রের দিকে যম যাতে ফিরে না তাকায়, সে জন্য সেই পুত্রের নাম এককড়ি, দুকড়ি, তিনকড়ি ইত্যাদি রাখার কুসংস্কার বাঙালি সমাজে সেকালে চালু ছিল। 'দুখু মিয়া' নাম তিনি পেয়েছিলেন হয়তো সেই কুসংস্কার থেকে।

এখানে নজরুলের নাম সম্পর্কে আরও একটা মন্তব্য করা যায়। বড় পুত্রের নাম সাহেবজান আর কনিষ্ঠ পুত্রের নাম আলি হোসেন। তার মাঝখানে নজরুল ইসলাম নামটা আকস্মিক এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হতে পারে। বস্তুত, তাঁর পারিবারিক ডাকনাম সম্ভবত দুখু মিয়াই ছিল, নজরুল নয়। তবে পরিবারের ভেতরে ও বাইরে তাঁকে 'নজর আলি' বলেও ডাকা হতো। তাঁর জনৈক জীবনীকার লিখেছেন যে মা তাঁকে 'নজর আলি' বলেই ডাকতেন।[২৬] তা থেকে মনে হতে পারে যে লেখাপড়া শিখতে গিয়ে নজরুল নিজেই 'নজর আলি' নামটিকে আরও অভিজাত করার জন্য 'নজরুল' নামটি বেছে নিয়েছিলেন। তবে তাঁর

---

২১. পরিণত বয়সেও তিনি এই বিশ্বাস কাটিয়ে উঠতে পারেননি। খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, *যুগস্রষ্টা নজরুল*, পৃ. ১৫৮-৫৯; ২০৪-০৫

২২. তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'মুক্তি'ও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

২৩ জনৈক কাজী আবদুর রহিম দাবি করেছেন যে নজরুলের সঙ্গে তাঁর মায়ের দেখা হয়েছিল এবং নজরুল তাঁর মায়ের পায়ে চুম্বন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর অনুরোধে অনশন ভঙ্গ করেননি।—কল্যাণী কাজী, *শত কথায় নজরুল* (কলকাতা : সাহিত্যম, ১৯৯৮) গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৬৭-৬৮। কিন্তু তাঁর এ বক্তব্য ভিত্তিহীন।

২৪. মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, *কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা*, পৃ. ১৭৩। এ নিয়ে যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা করব।

২৫. সংস্কৃত কলেজের দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন ফকিরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। মুজফ্‌ফর আহমদ, পৃ. ৬৩-৬৪

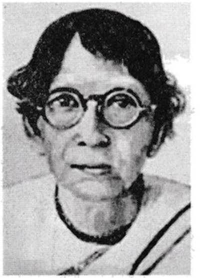
২৬. বাঁধন সেনগুপ্ত, *নজরুলের ছেলেবেলা* (কলকাতা : নবজাতক প্রকাশন, ১৯৯৭), পৃ. ১৭। এ বইয়ের অনেক তথ্যই শোনা কথা। নির্ভরযোগ্য নয়। কিন্তু 'নজর আলি' নামটি অন্য দুই পুত্রের নামের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। তাঁকে নজর আলি ডাকার কথা আজহারউদ্দীন খানও লিখেছেন। পৃ. ৪। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে দেওঘর থেকে নজরুল যে চিঠি লিখেছিলেন, তার নিচে নিজের নাম লিখেছিলেন 'নজর'। *নজরুলের পত্রাবলি* (পুনর্মুদ্রণ : ঢাকা : নজরুল ইনস্টিটিউট, ২০১৬), পৃ. ৫১

পুরো নাম তখন নজরুল 'ইসলাম' ছিল না, ছিল নজরুল 'এসলাম'।[২৭] প্রসঙ্গত, আরও উল্লেখযোগ্য যে এখন যেভাবে জ-এ হসন্ত দিয়ে 'নজ্‌রুল' শব্দটা উচ্চারণ করা হয় এবং কবি নিজেও 'জ'-এ যেভাবে হসন্ত দিয়ে নিজের নাম লিখতেন এবং স্বাক্ষর করতেন, আরবি ব্যাকরণের দিক দিয়ে তা শুদ্ধ নয়। 'নজর্' শব্দের সঙ্গে 'উল' প্রত্যয় যোগ করলে 'নজ্‌রুল' হয় না, বরং নজর্‌উল (অ স্বরধ্বনি যুক্ত জ) হয়। সে জন্যই নজরুল ইসলাম বিখ্যাত হওয়ার আগে পর্যন্ত সমগ্র বাংলা সাহিত্যের কোথাও অথবা বঙ্গীয় ইতিহাসে 'নজর', 'নাজির' এবং 'নাজিরুল ইসলাম' নাম থাকলেও, 'নজ্‌রুল ইসলাম' নামের কোনো কাল্পনিক 'চরিত্র' অথবা বাস্তব মানুষের সন্ধান পাওয়া যায় না। অন্তত আমার জানা নেই।

তাঁর নাম যে কখনো কখনো 'নাজিরুল ইসলাম'ও লেখা হতো, তারও লিখিত প্রমাণ আছে। প্রথম প্রমাণ: তিনি *সওগাত* পত্রিকার জন্য বারোজন গ্রাহক জুটিয়ে দিয়েছিলেন বলে *সওগাতে* কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি ছাপা হয়েছিল। এখানে তাঁর নাম পরিষ্কার দেখতে পাই নাজিরুল ইসলাম।

আমার কাছে 'নাজিরুল ইসলাম' নামের দ্বিতীয় যে মুদ্রিত প্রমাণ আছে, সেটি ১৯২৬ সালে তাঁর নির্বাচনে অংশগ্রহণের খবরে। সেখানেও তাঁর নাম লেখা হয়েছে Kazi Nazirul Islam.

'নজ্‌রুল' নাম থেকে তাঁর পরিবারে আরবি-ফারসির চর্চা ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিতে পারে। অন্তত সে চর্চার প্রতিফলন তাঁর নামের উচ্চারণ অথবা বানানে ঘটেনি। পূর্বোক্ত 'করুণ গাথা' কবিতার ৪৮ পঙ্‌ক্তির মধ্যে একটিও আরবি-ফারসি শব্দ নেই। এ থেকেও মনে হয় না যে পরিবারের কাছ থেকে তিনি আরবি-ফারসির বিশেষ কোনো উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন। তাঁর চাচা বজলে করিমের কাছে তিনি ফারসি শিখেছিলেন বলে যে দাবি করা হয়,[২৮]



কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক



শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

তারও কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না।

আগেই উল্লেখ করেছি, নিজের নাম হিসেবে 'নজ্‌রুল' শব্দটা পাকাপোক্তভাবে বেছে নিলেও, স্কুলজীবনে তিনি 'ইসলাম' হয়ে উঠতে পারেননি, বরং তিনি নিজের নামের বানান লিখতেন 'এসলাম'। সে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এর মধ্যে কোনো অসংগতি লক্ষ করা যায় না। 'এসলাম' বানান বহুল প্রচলিত ছিল। কেবল মানুষের নামের অংশ হিসেবে নয়, সেকালের একাধিক মুসলিম পরিচালিত পত্রিকার নামেও 'ইসলাম' শব্দটার বানান 'ই'-এর বদলে, 'এ'-দিয়ে 'এসলাম' লেখা হয়েছে। কিন্তু নজরুল সৈন্যবাহিনীতে থাকার সময়ে করাচি থেকে যেসব লেখা প্রকাশের জন্য পাঠিয়েছিলেন, তাতে 'এসলাম' নয়, 'ইসলাম' বানানই লক্ষ করি। বস্তুত, নিজের নামকে তিনি ক্রমশ পরিমার্জিত এবং অভিজাত করতে চেয়েছেন। সে জন্যই তিনি 'দুখু মিয়া' থেকে আনুমানিক ১৯১১ সালে 'নজরুল এসলাম', নজরুল এসলাম থেকে আনুমানিক ১৯১৭ সালের শেষ দিকে 'কাজী নজরুল ইসলাম', কাজী নজরুল ইসলাম থেকে আনুমানিক ১৯১৯ সালে 'কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম' এবং পরিশেষে 'হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম' হয়ে ওঠেন। নাম থেকে 'হাবিলদার' পদবি ঝেড়ে ফেলেন ১৯২১ সালের কোনো একটা সময়ে।

সে যা-ই হোক, 'নজরুল'-এর চেয়েও তাঁর নিজের কাছে যে নাম বেশি আদরের ছিল, যে নামে ডাকলে তিনি খুশি হতেন, তা হলো 'নুরু'। তাঁর ঘনিষ্ঠজনেরা তাঁকে 'নুরু' বলেই ডাকতেন, তার প্রমাণ আছে। বিয়ের আগে প্রমীলাও তাঁকে 'নুরুদা' বলে ডাকতেন। বিরজাসুন্দরী দেবীর কাছেও তিনি ছিলেন 'নুরু'। শামসুন নাহার বেগম (পরবর্তীকালে 'মাহমুদ') এবং হবীবুল্লাহ বাহারকে লেখা চিঠিতেও কবি স্বাক্ষর করেছেন 'নুরুদা' হিসেবে।[২৯] তাঁর আত্মজৈবনিক কাহিনি *রিক্তের বেদনে* তাঁর নায়কের নামও তিনি দিয়েছেন নুরু।[৩০] শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো ঘনিষ্ঠজনও তাঁকে ডাকতেন 'নুরু' বলে।[৩১] আলি আকবর খানকে লেখা চিঠিতেও তিনি চিঠির শেষে নাম লিখেছেন 'নুরু'।[৩২]

নজরুলের পরিবারের যে পরিচয় আমরা পেয়েছি (গ্রামীণ, দরিদ্র,

---

২৭. নজরুল শিয়ারশোল স্কুলে পড়ার সময়ে—১৯১৬ সালের ১৩ জুলাই—ভোলানাথ কর্মকার নামের তাঁর একজন শিক্ষক বিদায় নিয়ে অন্যত্র চলে যান। এই উপলক্ষে নজরুল 'করুণ গাথা' নামে একটি কবিতা লেখেন। সেই কবিতায় আটটি স্তবক ছিল। প্রত্যেক স্তবকের আদ্যক্ষরের মধ্য দিয়ে তিনি নিজের নামটিও প্রকাশ করেন—'নজরুল এসলাম'—নজরুল ইসলাম নয়। এই কবিতাটি সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, তাঁর *যুগস্রষ্টা নজরুল* গ্রন্থে। পৃ. ১১-১৪। এর চেয়েও বড় এবং সন্দেহাতীত প্রমাণ আছে স্বয়ং নজরুলের হাতের লেখায়। শিয়ারশোল স্কুলের পড়া সাঙ্গ করে '৪৯ নম্বর বেঙ্গলিজ' বাহিনীতে যোগ দেওয়ার ঠিক আগে—২৩ জুলাই (১৯১৭) তারিখে নজরুল একখানি চিঠি লেখেন আবদুল গফুরকে। চিঠির নিচে তিনি সই করেছেন 'নজরুল এসলাম' বলে। দ্র. এই চিঠির ফ্যাকসিমিলি প্রতিলিপি, *কাজী নজরুল রচনা সমগ্র*, প্রথম খণ্ড (দ্বিতীয় সং: কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৫), পৃ. ৪৭৮-৭৯

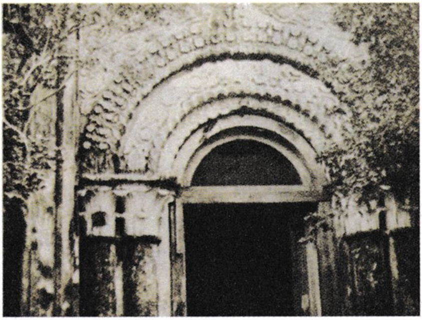
২৮. আজহারউদ্দীন খান, পৃ. ৫

২৯. *নজরুল পাণ্ডুলিপি*, সেলিনা বাহার জামান সম্পাদিত (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪), পৃ. ১৪৭, ১৫৩, ১৫৫

৩০. *রিক্তের বেদন*, পৃ.

৩১. পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, *চলমান জীবন*, পৃ. ২০৭

৩২. মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, পৃ. ৬৯



মাথরুন নবীনচন্দ্র ইনস্টিটিউট, নজরুলের আরেক শিক্ষাস্থল

স্বল্পশিক্ষিত), তেমন পরিবারে পুত্র, কন্যাসন্তানদের জন্মতারিখ লিখে রাখার রীতি থাকার কথা নয়। নজরুলের অন্য দু ভাইয়ের জন্মতারিখও জানা যায় না। এমনকি, বড় ভাই সাহেবজান নজরুলের থেকে ঠিক ক বছরের বড় ছিলেন অথবা ছোট ভাই আলি হোসেন ক বছরের ছোট ছিলেন, তাও জানা যায় না। মনে হয়, নজরুলের জন্মতারিখ তাঁর মাথরুন স্কুলে ভর্তির সূত্রে দেওয়া হয়েছে। নয়তো ১৮৯৯ সালের মে মাসের চব্বিশ তারিখ অর্থাৎ বাংলা ১৩০৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের এগারো তারিখ বুধবার তাঁর জন্ম হয়েছিল—এটা হলপ করে বলা যায় না।[৩৩] সুফি জুলফিকার হায়দারের মতে, কবি নিজেই নাকি বলতেন যে, তাঁর জন্ম এগারোই বৈশাখ, এগারোই জ্যৈষ্ঠ নয়। জুলফিকার হায়দার কবির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সাহেবজানের কাছ থেকেও এগারোই বৈশাখ তারিখের কথাই শুনেছেন বলে দাবি করেছেন।[৩৪] এই তারিখ ধরে নজরুলের জীবদ্দশাতেই তাঁর একটি ঠিকুজি করা হয়েছিল, তাঁর ভাগ্য গণনার জন্য।[৩৫] কেবল মাস নয়, তাঁর জন্ম-বছর আদৌ ১৮৯৯ সাল কি না, তা নিয়েও সন্দেহ থাকতে পারে। কেউ কেউ তাঁর জন্ম সাল ১৮৯৮ বলে উল্লেখ করেছেন।[৩৬] সেকালে কেন, সাম্প্রতিক কালেও স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় বয়স দু-এক বছর কমিয়ে লেখার রীতি চালু ছিল (এখনো আছে)। ঠিক কোন বয়সে তিনি মক্তবে যেতে আরম্ভ করেন, তা জানা যায় না। নিশ্চয়ই পাঁচ বছরের আগে নয়। বরং তার থেকে বেশি বয়সে যাওয়াই সম্ভব। লেখাপড়ার ঐতিহ্য যে পরিবারে নেই, সে পরিবারে সন্তানদের লেখাপড়া একটু বেশি বয়সে হওয়াই স্বাভাবিক। তা ছাড়া, বারবার লেখাপড়ায় ছেদ পড়া সত্ত্বেও আঠারো বছর বয়সে স্কুলের শেষ শ্রেণিতে পড়া খানিকটা বিস্ময়ের বিষয় বলে মনে হয়।

নিজের পরিবেশ থেকে একেবারে বাল্যকাল থেকে তিনি দুটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লাভ করেছিলেন, তার মধ্যে একটা হলো ভক্তিবাদ, অন্যটা হলো রহস্যময় বিষয়ের প্রতি কৌতূহল। এর কারণ আনুষ্ঠানিক লেখাপড়া তাঁর পরিবারে যতটুকুই প্রচলিত থাক না কেন, এই পরিবারে একটা প্রবল ধর্মীয় পরিবেশ ছিল। সে পরিবেশ আবার সুফিবাদী।[৩৭] তাঁর পিতা উপাসনা এবং মসজিদ-মাজারের কাজ নিয়ে থাকতেন।[৩৮] তা ছাড়া, ছেলেবেলাতেই নজরুলকে মক্তবে পাঠানো হয়—এ থেকেও তাঁর পরিবার যে খুব ধার্মিক ছিল, তার আভাস পাওয়া যায়। অবশ্য তাঁদের বাড়ির কাছে কোনো ধর্মনিরপেক্ষ পাঠশালা না থাকার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পাঠশালার অভাবে মক্তবে ভর্তি হওয়া সম্ভব। কিন্তু যে কারণেই মক্তবে ভর্তি হয়ে থাকেন না কেন, মক্তব্যের ছাপ পড়েছিল তাঁর চরিত্রে। মক্তবে লেখাপড়া করা ছাড়া, পীরের মাজারে খাদেমের কাজ করা অথবা সন্ন্যাসী-ফকিরদের প্রতি তাঁর কৌতূহল—এসবও তাঁর চরিত্রে ভক্তিবাদ ও রহস্যময়তার বৈশিষ্ট্য এঁকে দিয়েছিল। আর, ১৯২০-এর দশকের একটা সময় ছাড়া এই দুই বৈশিষ্ট্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণ তিনি কোনো দিন কাটিয়ে উঠতে পারেননি।

তিনি ছিলেন দারুণ ভাবপ্রবণ, স্পর্শকাতর ও অভিমানী। এরও বীজ নিশ্চয় বাল্যকালেই তাঁর চরিত্রে রোপিত হয়েছিল। বিশেষ করে আপনজনদের প্রতি তাঁর ঔদাসীন্য চোখে পড়ার মতো। স্নেহের কাঙাল ছিলেন তিনি। পিতা মারা যান অল্প বয়সে, মায়ের বিয়ে হয়ে যায় তারপর (ঠিক কখন, জানা যায় না)। সংসারে তিনি তাই তেমন স্নেহ লাভ করেছিলেন বলে মনে হয় না। পিতৃপরিবার থেকে স্নেহের তৃষ্ণা না মেটায়, পরবর্তী কালে পরিবারের বাইরে—পরিচিতদের মধ্যে তিনি সেই দুর্লভ স্নেহ-সুধা অন্বেষণ করেছেন। তাঁর চরিত্রের আরও দুটি বৈশিষ্ট্য হলো তাঁর চঞ্চলতা এবং অজ্ঞাত স্থানের প্রতি তাঁর আকর্ষণ। জীবনে তিনি কোথাও শিকড় গেড়ে স্থির হয়ে বসেননি। তাঁর চরিত্রের এ বৈশিষ্ট্যও লক্ষ করা যায় তাঁর বাল্যকাল থেকেই। আমরা পরের আলোচনা থেকে দেখতে পাব যে তিনি বারবার অজানা, অচেনা নিরুদ্দেশের পানে যাত্রা করেছেন।

আগেই লক্ষ করেছি, নজরুলের জীবিকা উপার্জনের কাজ শুরু হয়েছিলো ধর্মীয় পথে। মক্তবে ধর্মীয় লেখাপড়া যা শিখেছিলেন, তাকেই মূলধন করে সেই হাফ প্যান্ট পরার বয়স থেকেই তিনি একটার পর একটা পথ খোঁজেন উপার্জন করার। কখনো তিনি সর্দার-পোড়ো হয়ে সহপাঠীদের পড়িয়েছেন, কখনো মসজিদে কাজ করেছেন, কখনো অন্যের বাড়িতে গিয়ে মোল্লাগিরি করেছেন (মিলাদ পড়িয়েছেন?), অথবা

৩৩. আজহারউদ্দীনের মতে ২৪ মে ছিল মঙ্গলবার (পৃ. ২)। রফিকুল ইসলামের মতেও, এটি ছিল মঙ্গলবার—*কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও সৃষ্টি*, পৃ. ৭। কিন্তু আসলে দিনটি ছিল বুধবার। আর খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন ১১ জ্যৈষ্ঠ ২৫ মে ছিল বলে মনে করেন—পৃ. ৪। অরুণকুমার বসু যাচাই করে লিখেছেন ২৪ মে, ১১ জ্যৈষ্ঠ, বুধবার। পৃ. ১

৩৪. সুফি জুলফিকার হায়দার, *নজরুল-জীবনের শেষ অধ্যায়* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৬৪), পৃ. ১১৯-২২

৩৫. ওই

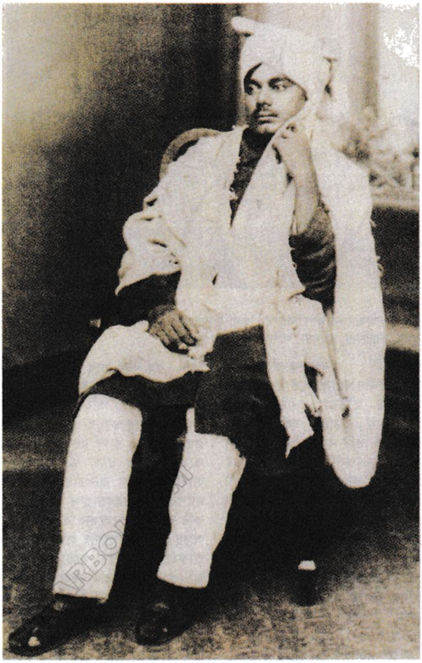
৩৬. এ নিয়ে যে বিতর্ক আছে, তা নিয়ে আলোচনা করেছেন নীরদবরণ হাজরা, *এক নজরুল : সহস্র সংশয়* (কলকাতা : বুলবুল প্রকাশন, ১৯৯৯), পৃ. ৪-৫

৩৭. খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, পৃ. ২০৪-০৫

৩৮. খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, পৃ. ৪

কখনো গ্রামের এক পাশে অবস্থিত হাজী পালোয়ানের মাজারে খাদেম অর্থাৎ সেবায়েতের কাজ করেছেন। ধর্মীয় সংস্কারের সঙ্গে তাঁর এই যে যোগাযোগ ঘটে, মানসিক অসুস্থতার আগে পর্যন্ত তিনি তা আর শিথিল করতে পারেননি। বরং দ্বিতীয় পুত্র বুলবুল মারা যাওয়ার পর থেকে ধর্মের প্রতি এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি তিনি ক্রমবর্ধমান মাত্রায় আকৃষ্ট হয়েছেন। এই আকর্ষণের বহিঃপ্রকাশ কেবল আচার-অনুষ্ঠান পালনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়নি, বরং তিনি যে ১৯৩০-এর দশকে অসংখ্য ভক্তিমূলক গান রচনা করেন, তা থেকেও এটা অভ্রান্তভাবে প্রকাশ পেয়েছিল।

লেটো গানের দলেও তিনি ঢুকেছিলেন সেই অল্প বয়সেই—বারো-তেরো বছর বয়সে। তিনি অন্তত দু-তিনটি লেটো দলে কাজ করেছিলেন। একটি দলের নেতা ছিলেন শেখ গোদা, অন্য একটি দলের নেতা তাঁর সম্পর্কীয় চাচা বজলে করিম। আমার ধারণা, আত্মীয়তার সূত্র ধরে প্রথমে বজলে করিমের দলে যোগ দেওয়াই স্বাভাবিক। নয়তো মোল্লাগিরি, ইমামতি অথবা খাদেমগিরির সঙ্গে লেটো গানের কোনো ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ নেই। লেটো গান বলা হলেও, এতে কেবল গান থাকত না। এর মধ্যে থাকত কবিগানের মতো দুটো দলের প্রতিযোগিতামূলক গীতিবিতর্ক, আর থাকে যাত্রাগানের মতো গীতাভিনয় এবং আবৃত্তি। তামাশা-রসিকতাও থাকত। এক কথায়, একে বলা হতো (এখনো বলা হয়) লেটো অথবা লেটো গান।



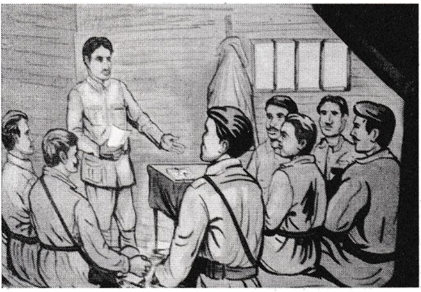
পাগড়ি মাথায় নজরুল

লেটোর দলে প্রথমে তিনি নিশ্চয় সবচেয়ে সহজ কাজটাই করেছেন—দোহারের কাজ। মিষ্টি গলার অধিকারী ছিলেন তিনি, সংগীতের সহজাত প্রতিভাও ছিল, তাই এ কাজটা তাঁর জন্য আদৌ শক্ত হয়নি। ছোটখাটো ভূমিকায় অভিনয়ও তিনি প্রথম দিকে করে থাকবেন। তারপরে শুনতে শুনতেই শিখে ফেলেছেন হিন্দু পৌরাণিক কাহিনির খুঁটিনাটি এবং মুসলমান ধর্মের সঙ্গে যুক্ত পুরাকাহিনি। তবে এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে তাঁর শ্রোতারা বেশির ভাগই ছিলেন হিন্দু। সুতরাং হিন্দু পৌরাণিক কাহিনির চাহিদাই বেশি ছিল। সেটাই তাঁকে শিখতে হয়েছিল ভালো করে। এসব কাহিনির ওপর ভিত্তি করেই তিনি লেটো দলের জন্য গান ও ছড়া রচনা করার কাজ শুরু করেন। বয়স খুব কম হলেও এই কাজে তিনি বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছিলেন—কারণ কবিত্ব ও সংগীত তাঁর স্বভাবেই ছিল। পরবর্তীকালে তিনি নিজেই লিখেছেন যে তিনি লেটোর দলে 'গান লিখিয়ে' ছিলেন।[৩৯] যে কাজ অন্যদের শিখতে হয়তো এক বছর লাগত, সেটাই তিনি অনেক কম সময়ে—হয়তো—এক মাসে শিখে ফেলতেন; এমনকি, একবার শুনেই শিখে ফেলতেন। লেটোর দলে থাকার সময়ে তিনি যেসব পালা রচনা করেছিলেন বলে শোনা যায়, তার মধ্যে ছিল শকুনি-বধ, মেঘনাদবধ, দাতা কর্ণ, যুধিষ্ঠির, কবি কালিদাস, চাষার সঙ ইত্যাদি।[৪০] তবে এসব কতটা নজরুলের লেখা, কতটা প্রক্ষিপ্ত, তা বলা যায় না। এর কোনোটার প্রতিলিপিই স্বয়ং নজরুলের কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। তিনি দক্ষতা দেখিয়ে লেটো গান রচনা করেছিলেন নিঃসন্দেহে। তাই অল্পদিনের মধ্যেই বজলে করিমের দলে তাঁর নাম হয় 'ছোট ওস্তাদজি'।

তিনি আগাগোড়া কেবল তাঁর পিতৃব্য বজলে করিমের লেটোর দলেই কাজ করেননি। চুরুলিয়া এলাকায় আরেকজন নামকরা লেটো দলের নেতা—শেখ গোদার দলেও কাজ করেন তিনি। এবং মনে হয়, সেখানেও তিনি সমাদরের সঙ্গে গৃহীত হন। অচিরেই সে দলে তিনি হয়ে ওঠেন শেখ গোদার

৩৯ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা নজরুলের চিঠি, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের আত্মজীবনী *চলমান জীবন* (প্রতিক্ষণ সং; কলকাতা : প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস, ১৯৯৪) গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ২০৪

৪০. মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, পৃ. ৭



ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধাদের রুশ বিপ্লবের কথা জানাচ্ছেন সৈনিক নজরুল। ছবিটি নজরুল জাদুঘর, চুরুলিয়া, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ থেকে সংগৃহীত

সহকারী। নজরুল-জীবনীকার আজহারউদ্দীন খানের মতে, শেখ গোদা নজরুলের প্রতিভা শনাক্ত করতে পেরেছিলেন। ঠাট্টা করে বালক নজরুলকে তিনি নাকি 'ব্যাঙাচি' বলে ডাকতেন এবং বলতেন যে বড় হয়ে এই ব্যাঙাচিই সাপ হয়ে উঠবে।[৪১] আজহারউদ্দীন খান আরও লিখেছেন যে শেখ গোদার দলে কাজ করার পরে নজরুল নিম্‌শা গ্রামের লেটোর দলের নেতা হন। অর্থাৎ তৃতীয় একটি লেটো দলে কাজ করেন। তত দিনে তিনি লেটোর দলের বিভিন্ন ধরনের কাজ ভালো করে আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন।[৪২]

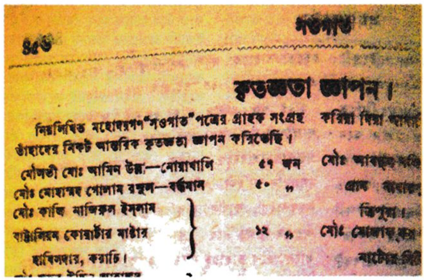
স্কুলে নজরুল যে পুঁথিগত বিদ্যা শিখেছিলেন—বাংলা, ইংরেজি, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি—তার থেকেও লেটোর দলের শিক্ষা তাঁর পরবর্তী জীবনে বেশি কাজে লেগেছিল—এ কথা বললে বাড়িয়ে বলা হয় না। কারণ, লেটোর দলে তিনি কেবল হিন্দু পুরাণ এবং মুসলমানি পুরাকাহিনির খুঁটিনাটি শেখেননি, তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ যা আয়ত্ত করেছিলেন, তা হলো: স্বাভাবিক ছন্দবোধ, আর সুর/তালের জ্ঞান। লেটোর পালা রচিত হয় স্বরবৃত্ত ছন্দে, নাচের তালে। কয়েক বছর লেটোর দলের সঙ্গে থেকে তিনি স্বরবৃত্ত ছন্দ এবং ঝুমুর তালে রীতিমতো দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। মুখে মুখে ছড়া ও গান রচনা করায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন তিনি। বহু বছর পরে তিনি যখন কবি হিসেবে সর্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করেন, তখনো তাঁর বহু কবিতা রচনা করেন লেটোর দলের স্বরবৃত্ত ছন্দে। এমনকি, গ্রামোফোনের জন্য বহু গানও রচনা করেন নাচের চটুল তালে। বস্তুত, আধুনিক বাংলা কবিতায় তাঁর মতো ব্যাপকভাবে স্বরবৃত্ত ছন্দ অন্য কোনো কবি ব্যবহার করেছেন কি না, সন্দেহ আছে। স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রতি তাঁর এই আকর্ষণের কারণে মাত্রাবৃত্ত ছন্দেও অনেক জায়গায় তিনি স্বরবৃত্তের মেজাজ অর্থাৎ স্বরবৃত্তের ঢং নিয়ে এসেছেন। তাঁর মাত্রাবৃত্ত ছন্দের কবিতাগুলো পড়বার সময়ে তাই সজাগ থাকতে হয়। কিন্তু সবচেয়ে কঠিন কাজ হলো স্বরবৃত্ত ছন্দে লেখা তাঁর গানগুলো ছন্দ মিলিয়ে পড়তে পারা। এ রকম শত শত গান তিনি লিখেছেন।

আবার তাঁর উপার্জনের প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যাক। মনে করার কারণ নেই যে তিনি বাল্য ও কৈশোরে উপার্জনের জন্য যেসব বিচিত্র কাজ করেছিলেন, সেসব নিয়মিত করেছিলেন অথবা ধারাবাহিকভাবে একটার পর একটা করেছিলেন। বরং যখন যেটা পেয়েছেন, তখন সেই কাজটা করেছেন। যত দিন খুশি করেছেন, সাময়িকভাবে করেছেন। যখন খুশি কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। একটা কাজ থেকে আবার আগের কাজে ফিরে গেছেন। যেমন লেটোর গানের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ অবিচ্ছিন্ন ছিল না। কখনো দলে ছিলেন, কখনো দল থেকে সরে গেছেন। এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে লেটোর দলের ডাক পড়ত। সেই দলের সঙ্গে তিনিও ভেসে বেড়িয়েছেন এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে। এভাবে নজরুলের দিগন্ত প্রসারিত হয়েছিল। বাড়ির প্রতি তাঁর এমনিতেই ভালোবাসার পিছুটান ছিল না। যেটুকুবা ছিল, লেটোর দলের সঙ্গে দূরে-দূরান্তরে ঘুরে ঘুরে তাও শিথিল হয়ে আসে।

এভাবেই শেকড়-ছেঁড়া বারো-তেরো বছর বয়সী নজরুল একবার সম্ভবত লেটোর দলের সঙ্গে ভাসতে ভাসতে চলে যান চুরুলিয়া থেকে প্রায় এক শ কিলোমিটার পুবে—মঙ্গলকোট থানার মাথরুনে। মাথরুনও ছিল চুরুলিয়ার মতো শহর থেকে বহু দূরে অবস্থিত একটি গ্রাম। তবে মাথরুনে তখন একটা উচ্চবিদ্যালয় ছিল, যার নাম ছিল নবীনচন্দ্র ইনস্টিটিউশন (এখনো এ স্কুল টিকে আছে)।[৪৩] কোনো শুভানুধ্যায়ী তাঁকে এ স্কুলে ভর্তি করে দেন কি না, জানা যায় না। দেওয়াই সম্ভব। নয়তো নিজের গ্রাম থেকে অত দূরে, আত্মীয়-স্বজনহীন মাথরুনে লেখাপড়ার জন্য তিনি ভর্তি হবেন কোন ভরসায়? আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে মক্তব ছাড়ার পর বছর দুয়েক তাঁর সঙ্গে লেখাপড়ার যোগাযোগ ছিল না। মাথরুন স্কুলে ভর্তি হয়ে আবার তিনি লেখাপড়ার জগতে ফিরে যান। তবে এ-ও অসম্ভব নয় যে তিনি স্কুলে পড়ালেখা এবং লেটোর দলের কাজ একই সঙ্গে করতে থাকেন এবং স্কুলের ব্যয় নির্বাহ করেন লেটোর দলের আয় দিয়ে। কিন্তু এ নিতান্তই আমাদের অনুমান। এক শ বছর পরে সত্যিকার তথ্য জানার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

মাথরুন স্কুলে নজরুলের স্বল্পকাল পড়ার ব্যাপারে মুজফ্‌ফর আহমদ যা লিখেছেন, তা হলো: এ স্কুল ছিল কাসিমবাজার মহারাজাদের প্রতিষ্ঠিত। তাঁরা ছাত্রদের অনেককে আর্থিক সহায়তা দিতেন। নজরুল হয়তো সেই প্রত্যাশায়ই এ স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। তারপর কোনো সাহায্য না পাওয়ায় সেখান থেকে চলে যান।[৪৪] মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ যুক্তি দিয়ে বলেছেন যে রাজাদের আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকলে তিনি মাথরুন স্কুল ত্যাগ করতেন না। সহায়-সম্বলহীন একটি বালকের স্কুল

৪১. আজহারউদ্দীন খান, বাংলা সাহিত্যে নজরুল, পৃ. ৫
৪২. ওই
৪৩. নজরুল-জীবনীকার অরুণকুমার বসু মনে করেছেন যে মাথরুন স্কুল ছিল রানিগঞ্জে। কিন্তু বাস্তবতার সঙ্গে তাঁর দূরত্ব এক শ কিলোমিটারেরও বেশি। পৃ. ৬
৪৪. মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, পৃ. ২২৯



৪৫৬ সওগাত

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ "সওগাত" পত্রের গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিয়া
তাঁহাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

মৌলভী মোঃ আমিন উল্লা—নোয়াখালি ৫৭ জন
মোঃ মোহাম্মদ গোলাম রসুল—বর্দ্ধমান ৫০ "
মোঃ কাজি নাজিরুল ইসলাম
ব্যাটালিয়ন কোয়ার্টার মাষ্টার ১২ "
হাবিলদার, করাচি।

কবির নাম নজরুল ইসলামের বদলে 'নাজিরুল ইসলাম' মুদ্রণের উদাহরণ

পালানোর বিলাসিতা থাকার কথা নয়।[৪৫] কয়েক বছর পরে তিনি যে শিয়ারশোল স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন, সেও ছিল অন্য এক রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠিত। এবং সে স্কুল থেকে তিনি সাহায্য পেয়ে প্রায় তিন বছর সেখানে পড়ালেখা করেন।

মাথরুন স্কুলে তাঁর অন্যতম শিক্ষক ছিলেন (কবি) কুমুদরঞ্জন মল্লিক। সেই সূত্রে নজরুলের কথা জানতে চেয়ে আজহারউদ্দীন খান তাঁকে চিঠি লিখেছিলেন। তার উত্তরে কুমুদরঞ্জন জানান যে নজরুলকে তিনি চিনতেন। বালক নজরুল তখনকার সিক্সথ ক্লাসে অর্থাৎ বর্তমান কালের ক্লাস ফাইভে ভর্তি হয়েছিলেন। তিনি আরও জানান যে নজরুল ছিলেন লাজুক, বিনয়ী ও 'ছন্‌ছনে' একটি বালক।[৪৬] মাথরুন স্কুলে তিনি কত দিন লেখাপড়া শিখেছিলেন, কুমুদরঞ্জন তা জানাননি। তাঁর পক্ষে তা জানার অথবা মনে থাকার কথাও নয়। কবি হিসেবে সুপরিচিত হওয়ার পর, নজরুল কলকাতায় কুমুদরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করে তাঁর পদধূলি নিয়েছিলেন। নজরুল তাঁর ছাত্র ছিলেন—এ পরিচয় দিলে, তবেই পুরোনো ছাত্রের কথা শিক্ষকের আবার মনে পড়ে। গর্বও হয় নিশ্চয়। কিন্তু তাই বলে ছাত্রের আদ্যন্ত সব বৃত্তান্ত তাঁর মনে পড়েনি, জানতেনও না।[৪৭]

ফলে নজরুল মাথরুন স্কুলে কত দিন লেখাপড়া করেছিলেন, তা নির্দিষ্ট করে জানা যায়নি। তবে বেশিদিন সে স্কুলে ছিলেন বলে মনে হয় না। আজহারউদ্দীনকে লেখা কুমুদরঞ্জনের চিঠি থেকে মনে হয় প্রায় দু বছর।[৪৮] কিন্তু জীবনীকারদের বর্ণনা থেকে মনে হয়, কয়েক মাস। হয়তো লেটোর দলের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে অর্থকষ্টে পড়েছিলেন। হয়তো যেখানে আশ্রয় পেয়েছিলেন, তা হারিয়ে ফেলেন। হয়তো রাজাদের কাছ থেকে সাহায্য পাবেন বলে যে প্রত্যাশা করেছিলেন, তা পূরণ হয়নি। মোট কথা, অজ্ঞাত কোনো কারণে মাথরুন স্কুল তিনি ছেড়ে দেন অথবা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। পরবর্তীকালেও লেখাপড়া শেষ না করে তিনি একাধিক স্কুল ছেড়ে দিয়েছিলেন। এটা তাঁর ভাগ্য এবং স্বভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলেই মেনে নিতে হয়—তিনি ছিলেন জন্ম-বাউন্ডুলে।

আগেই লক্ষ করেছি, তাঁর বড় ভাই সাহেবজান ছিলেন তাঁর থেকে বছর সাতেকের বড়। মাথরুন স্কুল ত্যাগের যখনকার কথা বলছি, তখন তাঁর বয়স উনিশ-বিশ। কিন্তু ভাইয়ের ভরসায় মাথরুন থেকে নজরুল আর চুরুলিয়ার বাড়িতে ফিরে যাননি। সে বাড়িতে অন্নজলের যথেষ্ট ব্যবস্থাও ছিল না। তা ছাড়া, মা এবং ভাইবোনদের প্রতি তাঁর অভিমানও থাকা সম্ভব। তাই মাথরুন থেকে ফিরে তিনি আশ্রয় খোঁজেন নিজের গ্রাম থেকে প্রায় বিশ কিলোমিটার দূরের শহর রানিগঞ্জে অথবা আরেকটু কাছের শহর আসানসোলে।[৪৯] প্রথমে কোন শহরে, বলা যায় না। দুই শহরেই আনাগোনা করেছেন বলে মনে হয়। রেলগাড়িতে যাতায়াতের সহজ সুযোগও ছিল। লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে বেঁচে থাকার ন্যূনতম প্রয়োজনেই তিনি কখনো রানিগঞ্জে, কখনো আসানসোলে 'কাজ' করেন। কাজ করেন না বলে ভেসে বেড়ান বলাই সংগত।

জীবনীকারদের বিবরণ থেকে বোঝা যায় না যে তিনি আগে রুটির দোকানে কাজ করেন, না রেলওয়ে গার্ডের বাড়িতে। মনে হয়, তিনি গার্ডের বাড়িতেই প্রথমে কাজ করেন, তারপর রুটির দোকানে। রানিগঞ্জ আর আসানসোল একেবারে পাশাপাশি জায়গা নয়। দুই শহরের দূরত্ব—সরলরেখায়—সোয়া ১৬ কিলোমিটার। রেলগাড়িতে ১৮ কিলোমিটার। অণ্ডালের ৭ কিলোমিটার পশ্চিমে রানিগঞ্জ স্টেশন, রানিগঞ্জের পশ্চিমে আসানসোল স্টেশন।

খুব স্পষ্ট নয়, কিন্তু মনে হয় তিনি ছোটখাটো একাধিক কাজই করেছেন রানিগঞ্জ আর আসানসোলে। তার মধ্যে চারটি 'কাজে'র কথা সঠিকভাবে জানা যায়। রানিগঞ্জে বাসুদেবের কবিগানের দলে গান গাওয়া আর ঢোলক বাজানোর কাজ, এক রেলওয়ে গার্ডের বাড়িতে ভৃত্যের কাজ; রুটির দোকানে কাজ আর এক দারোগার বাড়িতে গৃহভৃত্যের কাজ।[৫০] বাসুদেবের কবিগানের দলে তিনি কাজ করেছিলেন—এ কথা জানা যায়, কিন্তু কত দিন করেছিলেন, তা জানা যায় না। এই দলে তাঁকে গান গাইতে দেখেই নাকি রেলওয়ে গার্ড তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন এবং তাঁর বাড়িতে কাজ করার প্রস্তাব দেন। গার্ডের প্রস্তাবে তাঁর বাড়িতে থেকে ভৃত্যের কাজ করতে রাজি হন নজরুল।[৫১] গার্ডের বাড়িতে কী কী কাজ করতে হতো, জীবনীকারেরা তার বিবরণ দেননি। তবে অণ্ডাল স্টেশনে গার্ডের খাবার পৌঁছে দেওয়া এবং আসানসোল শহর

৪৫. ওই
৪৬. আজহারউদ্দীন খান, পৃ. ৯
৪৭. রফিকুল ইসলামের মতে, নজরুল এ স্কুলে ভর্তি হন ১৯১১ সালে। *কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও সৃজন* (ঢাকা : নজরুল ইনস্টিটিউট, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১৬)।. পৃ. ১৭, ১৯। স্কুলে ভর্তির বছর ১৯১১ লিখলেও, স্কুল ছাড়া দু বছর পরের সালকে ১৯১৪ লিখেছেন। সবটাই অনুমানভিত্তিক।
৪৮. আজহারউদ্দীন খানের বইতে উদ্ধৃত, পৃ. ৯। কিন্তু কুমুদরঞ্জন দাবি করেননি, অনুমান করেছেন মাত্র।
৪৯. অরুণকুমার বসুসহ বেশির ভাগ জীবনীকারের মতে, মাথরুন স্কুল ছাড়ার পর নজরুল গ্রামে ফিরে গিয়ে লেটোর দলে কাজ করেন। অরুণকুমার বসু, পৃ. ৯
৫০. অরুণকুমার বসু, পৃ. ১৩
৫১. ওই

থেকে গার্ডের জন্য মদ কিনে আনা—এ দুটো কাজের কথা কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন।[৫২] গার্ডের বাড়িতে তিনি মাস দুয়েক কাজ করেছিলেন বলে অরুণকুমার বসু উল্লেখ করেছেন। তিনি অবশ্য কোন সূত্র অনুসারে দু মাস বলেছেন, তা লেখেননি।[৫৩]

একজন জীবনীকার লিখেছেন যে গার্ডের ওপর বিরক্ত হয়ে কাজ ছেড়ে দিয়ে তিনি আসানসোল থেকে চলে যান রানিগঞ্জে। সেখানে স্টেশনের ধারে তিনি কাজ পেলেন এক রুটির দোকানে। বেকারি, নাকি দেশি রুটির দোকান, জীবনীকারদের রচনা থেকে তা খুব পরিষ্কার বোঝা যায় না।[৫৪] তাঁর কাজ ছিল ময়দা মাখা, রুটি তৈরি করা, রুটি সেঁকা এবং তারপর তা বিক্রি করা।[৫৫] অরুণকুমার বসুর মতে, রুটির দোকানে নজরুলের বেতন ছিল দৈনিক এক টাকা।[৫৬] এটা একেবারে অবিশ্বাস্য। কারণ এর কয়েক বছর পরে নজরুল সৈন্য হয়েছিলেন মাসিক এগারো টাকা বেতনে।[৫৭] আরেকটা তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতেও অরুণকুমারের তথ্যকে ভ্রান্ত মনে হতে পারে—তখন চালের মণ ছিল পৌনে দু টাকা। বেতন সম্পর্কে রফিকুল ইসলাম যা বলেছেন, তা বরং ঠিক হতে পারে। তাঁর মতে, মাসে বেতন ছিল এক টাকা।[৫৮] কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর বেতন ছিল মাসে পাঁচ টাকা।[৫৯] তবে আমার মনে হয় এটা অবিশ্বাস্য। পাঁচ টাকা দিয়ে সেকালে আড়াই মণের থেকেও বেশি চাল পাওয়া যেত।

রুটির দোকানে কাজ করলেও, সেখানে শোবার জায়গা ছিল না। তাই রাতের বেলা নজরুল ঘুমাতে যেতেন দোকানের কাছাকাছি তিনতলা একটা বাড়ির সিঁড়ির নিচে। এই বাড়িতেই সস্ত্রীক থাকতেন একজন দারোগা—কাজী রফিজউল্লাহ। সপ্রতিভ এবং চটপটে কিশোর নজরুলকে দেখে রফিজউল্লাহর তাঁকে পছন্দ হয়। তিনি তাঁকে প্রস্তাব দেন তাঁর বাড়িতে গৃহভৃত্যের কাজ করার জন্য। ঠিক কী কাজ তাঁর করতে হবে, বেতন কত হবে ইত্যাদি আমাদের অজানা। তবে আমরা অনুমান করতে পারি যে নজরুলের কয়েকটি জিনিসই দারোগাকে আকৃষ্ট করেছিল। যেমন প্রথমেই দারোগা লক্ষ করেছিলেন যে তাঁর মতো নজরুলেরও বংশ-পদবি হলো 'কাজী'। কিন্তু তাঁর চেয়েও বেশি যা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, তা হলো নজরুল রুটির দোকানে কাজ করলেও লেখাপড়া জানেন। গান-বাজনা জানেন। চালাক-চতুর। দেখতে-শুনতে ভালো। মোট কথা, সবকিছু মিলে নজরুলকে তিনি স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেন। তাঁর স্ত্রীও তাঁকে দেখেন সহানুভূতির দৃষ্টিতে।

অল্পদিনের মধ্যে রফিজউল্লাহ হয়তো রানিগঞ্জ থেকে অন্যত্র বদলি হন। নজরুলকে ফেলে যেতে হবে—এই সম্ভাবনা দেখে তিনি নজরুলের কাছে প্রস্তাব দেন যে তিনি রাজি হলে তাঁকে তিনি নিজের জেলা ময়মনসিংহে নিয়ে গিয়ে স্কুলে ভর্তি করে দিতে পারেন। রফিজউল্লাহর বাড়ি ছিল ত্রিশালে এবং সেখানে দরিরামপুরে একটি মাধ্যমিক স্কুল ছিল। নজরুলের কোনো পিছুটান ছিল না। রাজি হয়ে গেলেন ময়মনসিংহে যেতে। এর দুই বছর আগে তাঁকে দেখেছিলাম এক শ কিলোমিটার দূরের মাথরুনে গিয়ে সেখানকার স্কুলে ভর্তি হতে। অ্যাডভেঞ্চার করার মনোভাব তার চরিত্রের মধ্যেই ছিল। সেই সঙ্গে লেখাপড়া শেখার আগ্রহও ছিল। এবার সুদূর ময়মনসিংহ যেতে তাই ভয় পেলেন না, দ্বিধাও করলেন না; যদিও ময়মনসিংহের দূরত্ব সরলরেখার মাপে—সাড়ে তিন শ কিলোমিটার। ১৯১৪ সালের গোড়ায় রফিজউল্লাহর বদান্যতায় নজরুল দরিরামপুর স্কুলে লেখাপড়ার জন্য ভর্তি হলেন। ভর্তি হলেন সপ্তম শ্রেণিতে—সেকালের ফোর্থ ক্লাসে।[৬০]

নজরুলের প্রথম জীবনের ঘটনাবলি যতটা জানা যায়, তার থেকে অনেক বেশি জানা যায় তাঁর সম্পর্কে গল্প-কাহিনি, শোনা-কথা। তাঁর দরিরামপুরের জীবন সম্পর্কেও নির্ভরযোগ্য তথ্য খুব সামান্যই আছে। তিনি তখনো বিদ্রোহী কবিতে পরিণত হননি। তাই বহু বছর পরে তাঁর কথা গ্রামবাসীর অথবা শিক্ষকদের তেমন মনে থাকার কথা নয়। কিন্তু একবার তিনি বিখ্যাত হওয়ার পর নানাজনই তাঁকে চিনতেন বলে দাবি করেছেন। যাঁরা তাঁর সম্পর্কে তথ্য দিয়েছেন, তাঁরা অনেকেই তাঁর থেকে কমবয়সী, তাঁকে আদৌ দেখেননি অথবা দেখে থাকলেও তাঁর সম্পর্কে কিছু মনে রাখার কারণ তাঁদের ছিল না। তাঁদের কথা তাই কতটা নির্ভরযোগ্য, সে সম্পর্কে সন্দেহ আছে।

সন্দেহের জালে ছেঁকে আমরা যা সঠিক বলে মনে করতে পারি, তা হলো : রফিজউল্লাহর গ্রাম কাজিরশিমলা থেকে দরিরামপুর স্কুল ছিল বেশ খানিকটা দূরে।[৬১] রোজ সেই স্কুলে যাওয়া-আসা মোটেই সহজ কাজ ছিল না, বিশেষ করে বর্ষাকালে। তাই স্কুলের কাছাকাছি একাধিক বাড়িতে তিনি জায়গির ছিলেন। রফিজউল্লাহ তাঁকে নিয়ে গেলেন অথচ নজরুল জায়গির থাকলেন অন্যত্র, এর আরেকটা ব্যাখ্যা থাকতে পারে। সে হলো : রফিজউল্লাহর পরিবারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আগের মতো ছিল না। কিন্তু কারণ যা-ই হোক, রফিজউল্লাহর বাড়িতে তিনি পুরোটা সময় থাকেননি। স্কুলের লেখাপড়ায়ও তাঁর তেমন মন ছিল না; যদিও আবৃত্তি, গান, বিতর্ক প্রতিযোগিতা ইত্যাদিতে তিনি তাঁর স্বভাব দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও, শোনা যায়, বার্ষিক পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন।[৬২] অতঃপর ১৯১৪ সালের শেষে ময়মনসিংহ ত্যাগ করে তিনি তাঁর নিজের এলাকায় ফিরে আসেন।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে

---

৫২. রফিকুল ইসলাম, *কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও সৃষ্টি*, পৃ. ১৩
৫৩. অরুণকুমার বসু
৫৪. নজরুল যে দোকানে কাজ করেন, তা পরে গবেষকেরা শনাক্ত করেন এবং তার ওপর নামফলক থেকে এটিকে একটি বেকারি বলে মনে হয়। কিন্তু নজরুল যখন কাজ করতেন, তখন এটি বেকারি ছিল কি না, জানা যায় না। রফিকুল ইসলাম লিখেছেন, ধারণা করি আন্দাজেই, 'চা-রুটির দোকান' অর্থাৎ রেস্টুরেন্ট। পৃ. ১৩। কিন্তু এখন এই রুটির দোকানের যে ছবি ছাপা হয়েছে, তা থেকে দেখা যায়, এটি ছিল একটি বেকারি। তবে নজরুল যখন এখানে কাজ করতেন, তখন বেকারি ছিল, নাকি দেশি রুটির দোকান ছিল, তা জানা যায় না।
৫৫. আজহারউদ্দীন খান, পৃ. ১০। এ কথা আজহারউদ্দীন অনুমান করেই বলেছেন বলে ধারণা করি।
৫৬. অরুণকুমার বসু, পৃ. ১৩। আজহারউদ্দীন খান লিখেছেন, পাঁচ টাকা। সেও ভ্রান্ত। পৃ. ১০
৫৭. *দ্য বেঙ্গলি* (কলকাতা), বেতন সেপাইদের ১১ টাকা, প্রতি তিন বছরে ১ টাকা করে বেতন বৃদ্ধি।
৫৮. রফিকুল ইসলাম, পৃ. ১৩
৫৯. খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, পৃ. ৯
৬০. কোন ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলেন এবং সেখানকার লেখাপড়া সম্পর্কে জীবনীকারেরা যা লিখেছেন, সবই শোনা কথানির্ভর। কোনো দলিল-প্রমাণ নেই।
৬১. রফিকুল ইসলাম, পৃ. ১৪ : অরুণকুমার বসু, পৃ. ১৪
৬২. রফিকুল ইসলাম লিখেছেন, প্রথম অথবা দ্বিতীয় স্থান। পৃ. ১৪

দরিরামপুরে যাওয়ার ফলে তাঁর জীবনের একটা বছর নষ্ট হয়েছিল। অন্তত এটা তাঁর জীবনের কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নয়। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে দরিরামপুর-বাস তাঁর জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিল। এর ফলে তিনি লেটোর দলে গান রচনা করা আর গান গাওয়া, গৃহভৃত্যের কাজ ইত্যাদি থেকে মুক্তি লাভ করে ছাত্রজীবনে ফিরে আসতে পেরেছিলেন। দরিরামপুর থেকে বর্ধমানে প্রত্যাবর্তন করে নজরুল আর চুরুলিয়া গ্রামে আস্তানা গাড়েননি। লেটোর দলেও নাম লেখাননি, রুটির দোকানেও কাজ করেননি।[৬৩] বরং তাঁকে দেখতে পাই স্কুল চত্বরে। তাঁর আত্মজৈবনিক গল্প 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী'র নায়ক বর্ধমান শহরের নিউ স্কুলে ভর্তি হয়েছিল। সেই কথা থেকে কেউ কেউ অনুমান করেছেন যে নজরুল সত্যি সত্যি বর্ধমান শহরের এক স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু এটাকে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। কারণ সহায়-সম্বলহীন একটি মুসলমান কিশোর বর্ধমান শহরের এক স্কুলে ভর্তি হবে কোন ভরসায়? তা ছাড়া, ভর্তি হলেও সেখানে তিনি অল্পদিনই ছিলেন। কারণ অচিরেই তাঁকে আমরা দেখতে পাই রানিগঞ্জে। সেখানেই তিনি সবচেয়ে দীর্ঘকাল লেখাপড়া করেন—রানিগঞ্জের শিয়ারশোল রাজ স্কুলে।[৬৪] মনে হয়, ময়মনসিংহে গুরুত্বসহকারে লেখাপড়া না করলেও, লেখাপড়া করার আগ্রহটা তাঁর মাথায় ফিরে এসেছিল। তা ছাড়া, সেখানকার পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করায় তিনি আত্মবিশ্বাসও অর্জন করে থাকবেন।

শিয়ারশোল রাজ স্কুলে ভর্তির কাজটা অবশ্য সহজে হয়নি। সম্ভবত নিয়মিত লেখাপড়া করেননি বলে হেডমাস্টার প্রথমে তাঁকে ভর্তি করতেই



ময়মনসিংহের রফিজউল্লাহ দারোগার পত্নী শামসুন্নেসা খানম

রাজি হননি। এর ফলে একটা ধাক্কা খেলেও নজরুল আশা ছাড়েননি। পুনর্বিবেচনা করার জন্য হেডমাস্টারের কাছে তিনি আবার দরখাস্ত করেন। এবার নিজের দক্ষতা প্রমাণ করার উদ্দেশে তিনি দরখাস্তটি রচনা করেন কাব্যের ভাষায়।[৬৫] হেডমাস্টার এই দরখাস্ত পড়ে এতটাই মুগ্ধ হন যে নজরুলকে ভর্তি তো করে নিলেনই; এমনকি, বিনা বেতনে তাঁর পড়ার ব্যবস্থা করলেন। তদুপরি, গুটিকতক মুসলমান ছাত্র ছিল স্কুলে। সেই ছাত্রদের হস্টেলে বিনা পয়সায় থাকা-খাওয়ার সুযোগও করে দিলেন প্রধান শিক্ষক। জানা যায় না ঠিক কবে থেকে, কিন্তু নজরুল পাঁচ টাকা, কারও কারও মতে সাত টাকা, ছাত্রবৃত্তিও পেলেন।[৬৬] তিনি তাঁর জীবনে অনেক প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি গুরুত্বপূর্ণ যে কয়েকটি আনুকূল্য লাভ করেছিলেন, শিয়ারশোল রাজবাড়ি থেকে প্রাপ্ত এই ছাত্রবৃত্তিটি তার অন্যতম। এবং এ প্রসঙ্গে হেডমাস্টার এবং রাজবাড়ির বাড়তি প্রশংসা করতে হয় এ জন্য যে, তাঁরা ইসলামি নামের বাধা অগ্রাহ্য করেই সেই আমলে নজরুলকে এই বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

নজরুল যখন শিয়ারশোল রাজ স্কুলে লেখাপড়া করছিলেন, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তখন তাঁর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। শৈলজানন্দ লেখাপড়া করতেন রানিগঞ্জেরই অন্য একটি স্কুলে—রানিগঞ্জ হাইস্কুলে। রানিগঞ্জের বাসিন্দাদের সংখ্যা তখন পনেরো হাজারের কিছু বেশি। শহরের আয়তন খুব বড় ছিল বলে মনে হয় না। তার মধ্যে এই দুজনের দেখা এবং বন্ধুত্ব হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নয়। বিশেষ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো অসামান্য চরিত্র এবং চেহারা ছিল নজরুলের। নয়তো দুই ভিন্ন স্কুলে পাঠরত সেকালের একজন ধনী বামুন সন্তানের সঙ্গে অপরিচিত এবং দরিদ্র একজন মুসলমান সন্তানের সখ্য গড়ে ওঠা স্বাভাবিক ছিল না।

নজরুল কী করে এবং কখন এত লেখাপড়া শিখলেন এবং তারপর একদিন কবি হয়ে উঠলেন—তার নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা মেলে না। কিন্তু তার সূত্রপাত হয়েছিল শিয়ারশোল রাজ স্কুলে। তাঁর প্রথম দিককার জীবনে তিনি এ স্কুলে যত দিন ছিলেন—প্রায় তিন বছর, অন্য কোথাও তা থাকেননি—লেটোর দলে না, মাথরুনের নবীনচন্দ্র ইনস্টিটিউশনে না, দরিরামপুরেও না। প্রতিভাবান নজরুল রীতিমতো ভালো ছাত্র বলে পরিচিত হয়েছিলেন শিয়ারশোল রাজ স্কুলে। স্কুল থেকে কোনো শিক্ষক বিদায় নিলে অন্য কারও নয়, বিদায় অভিনন্দন লেখার জন্য ডাক পড়ত তাঁর। এই একটি মাত্র তথ্যই প্রমাণ দেয় যে স্কুলে তিনি কতটা বিশিষ্টতা এবং পরিচিতি লাভ

---

৬৩. আজহারউদ্দীন খান অবশ্য লিখেছেন যে নিজের এলাকায় ফিরে এসে তিনি লেটোর দলে যোগ দিয়েছিলেন—পৃ. ১১। কিন্তু তাঁর এ দাবি ভুল বলেই মনে হয়। নানাজনের লেখা থেকে মনে হয় যে ময়মনসিংহ থেকে তিনি ফিরে এসেছিলেন বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর—অর্থাৎ ডিসেম্বরের শেষে বা জানুয়ারির শুরুতে। তারপর লেটোর দলে যোগ দিলে শিয়ারশোল রাজ স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় থাকে না।

৬৪. কারও কারও মতে, শিয়ারশোল স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগে তিনি বর্ধমান শহরের একটা স্কুলে স্বল্পকালের জন্য লেখাপড়া করেন।

৬৫. অরুণকুমার বসু, পৃ. ১৬। অরুণকুমার যা লিখেছেন, তার সঙ্গে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের কথা মেলে না। মুজফ্‌ফর যা লিখেছেন তা থেকে মনে হয়, শিয়ারশোল রাজ স্কুলে পড়ত এমন একজন বন্ধুর মাধ্যমে তিনি ভর্তি হতে চেষ্টা করেন। কিন্তু হেডমাস্টারের কথায় হতাশ হয়ে নজরুল তাঁর বন্ধুকে একটা চিঠি লিখে চলে যান। চিঠিটা এই বন্ধু হেডমাস্টারকে দেখান। এই চিঠির ভাষা এত উন্নতমানের ছিল যে কেবল বন্ধু নয়, হেডমাস্টার স্বয়ং মুগ্ধ হন এবং তাঁকে স্কুলে ভর্তি করে নেন। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, পৃ. ১২। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের তথ্যও অভ্রান্ত নয়। তিনি লিখেছেন যে নিজের জেলায় ফিরে গিয়ে নজরুল মাথরুন স্কুলে লেখাপড়া করেন। মুশকিল হলো, এ কথা ধোপে টেকে না, বিশেষ করে বয়সের হিসাবে। নজরুল নিজের মুখে যখন এসব তথ্য দিতে পারতেন, তখন কেউ জীবনী লেখার কথা ভাবেননি। তাঁর মুখ থেকে তাঁর জীবনের ঘটনাবলির কথা শোনেনওনি। ফলে বহু নজরুল-জীবনী রচিত হলেও তথ্যনির্ভর জীবনী বলতে গেলে লেখাই হয়নি।

৬৬. নীরদবরণ হাজরার *এক নজরুল : সহস্র সংশয়* (কলকাতা : বুলবুল প্রকাশন, ১৯৯৯) গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৩৩। সিদ্ধান্তে বলা হয় যে যে তারিখ থেকে বৃত্তিটি স্থগিত করা হয়েছিল, সেই তারিখ থেকে ১৯১৮ সালের প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্যন্ত সময়কালের জন্য নজরুল ইসলামকে মাসে ৫ টাকা করে বৃত্তি প্রদান করা হলো। এই সিদ্ধান্ত থেকে দেখা যাচ্ছে যে মাসে পাঁচ টাকা করে বৃত্তি পেতেন নজরুল। কিন্তু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বরাত দিয়ে অরুণকুমার বসু লিখেছেন যে, নজরুল মাসে সাত টাকার বৃত্তি লাভ করেন। পৃ. ১৬-১৭। শৈলজানন্দ নজরুলের স্কুলজীবন এবং পরবর্তী জীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তাঁর কথায় সত্যতা থাকা সম্ভব। কিন্তু পাঁচ টাকা সম্পর্কে লিখিত প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং নজরুল মাসে পাঁচ টাকা করে বৃত্তি পেতেন—এটাকেই সঠিক বলে মনে হয়।

করেছিলেন। তিনজন শিক্ষকের বিদায় উপলক্ষে তিনি অভিনন্দনপত্র লিখেছিলেন।[৬৭] এই তিনটি অভিনন্দনপত্রের মধ্যে ভোলানাথ কর্মকারের বিদায় উপলক্ষে রচিত 'করুণ গাথা' নামে অভিনন্দন-কবিতাটির কথা আগেই উল্লেখ করেছি, যে কবিতার আটটি স্তবকের প্রথম অক্ষরগুলো একত্র করলে কবির নাম—'নজরুল এসলাম'—পাওয়া যায়। মৌলবি আবদুল গফুর এবং হরিশঙ্কর মিশ্র নামের দুজন শিক্ষকের বিদায় উপলক্ষেও তিনি কবিতা দিয়ে দুটি বিদায় অভিনন্দন রচনা করেন। হরিশঙ্কর মিশ্রের বিদায় উপলক্ষে তিনি যে কবিতাটি রচনা করেন, সেটির নাম দিয়েছিলেন 'করুণ বেহাগ'।[৬৮]

এই স্কুলে থিতু হয়ে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে মৌলিক বিষয়গুলোতে খানিকটা শিক্ষা লাভ করেন, পরবর্তী জীবনে যা তাঁর কাজে লেগেছিল। তার মধ্যে ইংরেজি ও বাংলা ভাষার প্রাথমিক জ্ঞান তাঁর আজীবনের সঙ্গী হয়েছিল। হেডমাস্টারের লেখা থেকে জানা যায় যে ইংরেজিতে তিনি ১৯১৬ সালে 'লয়ালটি' অথবা আনুগত্য বিষয়ে একটি রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন এবং তাতে জয়ী হয়ে অন্য দুজনের সঙ্গে তিনি চার টাকা পুরস্কার লাভ করেন।[৬৯] তা ছাড়া, বাংলা সাহিত্যপ্রীতিও এ সময়ে তিনি লাভ করেছিলেন। মোটামুটি ছন্দ মেনে কবিতা লেখা যে তিনি ওই বয়সেই শিখেছিলেন, তার প্রমাণ ওপরে উল্লিখিত 'করুণ গাথা' অভিনন্দন কবিতা। এ কবিতাটিতে শিশুসুলভ কিছু কথাবার্তা এবং কোথাও কোথাও ছন্দের ত্রুটি থাকলেও, তাতে রাবীন্দ্রিক প্রভাব লক্ষ করা যায়। বাংলা গল্পও তিনি এ সময়ে লিখেছিলেন। তাঁর এসব অর্জন নিশ্চয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আরও একাধিক মহার্ঘ্য বস্তু তিনি পেয়েছিলেন এই স্কুলের শিক্ষকদের কাছ থেকে। এই শিক্ষকদের একজনের নাম সতীশচন্দ্র কাঞ্জিলাল। এঁর কাছ থেকে নজরুল পেয়েছিলেন গানের আনুষ্ঠানিক তালিম। সত্য বটে, তিনি লেটোর দলে গান গাইতে শিখেছিলেন। ঢোলক বাজানো এবং বাঁশি বাজানোও শিখেছিলেন বলে বলা হয়েছে। কিন্তু সে ছিল প্রধানত স্বাভাবিক অনুকরণের পটুত্ব, স্বরগ্রাম না শিখেই গান শিখে ফেলার মতো। অপর পক্ষে, সতীশচন্দ্রের কাছ থেকে কিশোর নজরুল সংগীতের প্রাথমিক শিক্ষা—গলা এবং কান তৈরির করার শিক্ষা লাভ করেন। প্রত্যক্ষ কোনো সাক্ষ্য মেলে না, কিন্তু অনুমান করা যায় যে এই শিক্ষকের কাছ থেকে রাগরাগিণী এবং বিভিন্ন ধরনের গানের প্রাথমিক পরিচয়ও লাভ করেছিলেন। রোজ স্কুলের পর নজরুল নাকি এই শিক্ষকের বাড়িতে গিয়ে গান শিখতেন।[৭০]

আরেকজন শিক্ষক—হাফিজ নুরুন্নবীর কাছ থেকে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেছিলেন ফারসি ভাষার। পরিবারের কাছ থেকে নয়, নজরুলের ফারসি শিক্ষার সূচনা হয়েছিল শিয়ারশোল স্কুলের এই শিক্ষক—হাফিজ নুরুন্নবীর কাছে। এই শিক্ষা পরবর্তীকালে তাঁর খুব কাজে লেগেছিল। কেউ কেউ বলেছেন যে এই শিক্ষক নজরুলকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে সংস্কৃতের বদলে ফারসি নিতে উৎসাহিত করেছিলেন।[৭১]

এ ছাড়া, আরও দুজন শিক্ষকের গভীর প্রভাব পড়েছিল নজরুলের ওপর। এঁদের একজনের নাম নিবারণচন্দ্র ঘটক, অন্যজন বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী। মুজফ্ফর আহ্মদ লিখেছেন যে নিবারণচন্দ্র ঘটক ছিলেন সন্ত্রাসবাদী দল 'যুগান্তর'-এর সদস্য। সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভের স্বপ্ন দেখতেন তিনি। সেই সংগ্রামে সহায়তা করবে মনে করে তিনি বারোটি রিভলবার এনে তা রাখতে দিয়েছিলেন তাঁর মাসি দুকড়িবালা দেবীর কাছে। সেই অপরাধে তাঁরা দুজনই গ্রেপ্তার হন ১৯১৭ সালের জানুয়ারি মাসে এবং তাঁদের দুজনেরই শাস্তি হয় মার্চ মাসে। নিবারণচন্দ্র ঘটকের হয়েছিল পাঁচ বছরের আর দুকড়িবালার দু বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।[৭২]

এই গ্রেপ্তার এবং শাস্তি হওয়ার সময়ে নজরুল শিয়ারশোল স্কুলেরই ছাত্র ছিলেন। নিবারণচন্দ্র ঘটকের কতটা সক্রিয় সান্নিধ্যে তিনি এসেছিলেন, তা জানা যায় মুজফ্ফর আহমদের কাছে নজরুলের স্বীকৃতি থেকে। নজরুল বলেছিলেন যে তিনি তাঁর এই শিক্ষকের মতবাদ দিয়ে প্রভাবিত হয়েছিলেন। কেবল প্রভাবিত নন, তিনি এই শিক্ষকের অনুগত ছাত্র হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিলেন।[৭৩] সে জন্য ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে তাঁর ছাত্রবৃত্তি স্থগিত করা হয়, যদিও দু মাস পরে নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ার পর সেই বৃত্তি তিনি ফিরে পান।[৭৪] পরবর্তীকালে যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার সাত বছর পরে নজরুল যখন *কুহেলিকা* (১৯২৭) উপন্যাস রচনা করেন, তখন তাতে 'প্রমত্ত' নামে একজন বিপ্লবী স্কুলশিক্ষকের চরিত্র অঙ্কন করেন। এই চরিত্রের সঙ্গে নিবারণচন্দ্র ঘটকের সাদৃশ্য আছে। প্রমত্তের ছাত্র জাহাঙ্গীর, নজরুল যেমন ছাত্র ছিলেন নিবারণ ঘটকের।

এই স্কুলের আরেকজন শিক্ষক ছিলেন বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী। তিনি ডাকাতি মামলার আসামি বলে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন আত্মগোপনকারী বিপ্লবী দলের সদস্য। ছাত্রদের তিনি শরীরচর্চা শিক্ষা দিতেন। কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই, কিন্তু নজরুলের ওপর তাঁরও প্রভাব পড়েছিল বলে অরুণকুমার বসু দাবি করেছেন।[৭৫] শরীরচর্চার ফাঁকে ফাঁকে এই শিক্ষক হয়তো উৎসাহী ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর সন্ত্রাসবাদী স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারণা ভাগ করে নিতেন। নিবারণ ঘটকের মাধ্যমে তিনি হয়তো জানতেন যে এ বিষয়ে নজরুলের আগ্রহ আছে।

স্কুলের ছাত্রদের মধ্যেও নজরুল জনপ্রিয় ছিলেন বলে মনে হয়। তাঁর চরিত্রই ছিল অন্যদের আকৃষ্ট করার

৬৭. রফিকুল ইসলাম, *কাজী নজরুল ইসলাম* (দ্বিতীয় সং : কলকাতা : কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৯৭), পৃ. ১৬। অরুণকুমার বসুর মতে, দুজন শিক্ষকের বিদায় উপলক্ষে দুটি অভিনন্দনপত্র লেখেন। পৃ. ১৬-১৭

৬৮. রফিকুল ইসলাম, পৃ. ১৬

৬৯. শিয়ারশোল রাজ স্কুলের সিদ্ধান্ত, খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীনের গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ১১ : নীরদবরণ হাজরার গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৩৩

৭০. অরুণকুমার বসু, পৃ. ১৭ : নীরদবরণ হাজরা, পৃ. ৩১। এ শিক্ষকের নাম রফিকুল ইসলাম লিখেছেন সতীশচন্দ্র স্বর্ণকার, পৃ. ১৬। স্বর্ণকার কারও পদবি হয় না। সোনারুপোর কাজ করলেও, পদবিটা কর্মকারই থাকে। এই শিক্ষকের কাছ থেকে রোজ সংগীতের তালিম নিতেন বলে যে দাবি করা হয়েছে, তার মধ্যে অতিরঞ্জন থাকাই স্বাভাবিক। রোজ নিশ্চয় নয় এবং উচ্চাঙ্গসংগীতের তালিমও নয়। বলা যেতে পারে, এই শিক্ষকের কাছ থেকে নজরুল স্বরগ্রাম এবং স্বরলিপি দেখে গান তোলার প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন।

৭১. অরুণকুমার বসু, পৃ. ১৭-১৮

৭২. মুজফ্ফর আহ্মদ, পৃ. ১৩

৭৩. ওই, পৃ. ১৩-১৪

৭৪. নীরদবরণ হাজরা, পৃ. ৩৩

৭৫. অরুণকুমার বসু, পৃ. ১৮

মতো। কিন্তু তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল অথবা তাঁর ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল, এমন কোনো ছাত্রের কথা জানা যায় না।[৭৬] যে দুজন ছাত্রের কথা জানা যায়—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় আর শৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ—তাঁরা নজরুলের মতো একই শ্রেণিতে পড়তেন, কিন্তু কেউই শিয়ারশোল স্কুলের ছাত্র ছিলেন না। তাঁরা দুজন পড়তেন একই শহরের রানিগঞ্জ স্কুলে। শৈলজানন্দের সঙ্গে নজরুলের বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠ এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। আমরা নজরুলের ছাত্রজীবনের কথা সামান্যই জানি। কিন্তু যেটুকু জানি, তার অনেকটাই শৈলজানন্দের কল্যাণে। পরিচিত কেউ বিখ্যাত হয়ে গেলে মানুষ তাঁর সম্পর্কে সাধারণত বাড়িয়ে বলে এবং তাঁর সঙ্গে নিজের সম্পর্ককে বড় করে দেখাতে চেষ্টা করে। শৈলজানন্দের *কেউ ভোলে না কেউ ভোলে* রচনায়ও অতিরঞ্জন থাকা অসম্ভব নয়, কিন্তু নজরুলের শিয়ারশোল-জীবন সম্পর্কে আমরা যা জানি, তার জন্য শৈলজানন্দের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞ থাকতে হয়। শৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ ছিলেন খ্রিষ্টান। নজরুল যে রেলওয়ে গার্ডের গৃহভৃত্যের কাজ করেছিলেন আসানসোলে, শৈলেন্দ্রকুমার ছিলেন তাঁর শ্যালক।[৭৭] শৈলজানন্দ, নজরুল আর শৈলেন্দ্র—হিন্দু-মুসলমান-খ্রিষ্টান এই বন্ধুত্রয় একটি ঘনিষ্ঠ অসাম্প্রদায়িক চক্র গড়ে তুলেছিলেন।

মোট কথা, শিয়ারশোল স্কুলে ভর্তি হয়ে নজরুল নানাভাবে লাভবান হয়েছিলেন—বাংলা-ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর আনুষ্ঠানিক পরিচয় দৃঢ় হয়েছিল; ফারসি ভাষায় হাতেখড়ি হয়েছিল; সংগীতে দীক্ষা লাভ করেছিলেন, আর দেশের প্রতি ভালোবাসা এবং পন্থা যেমনই হোক, দেশকে স্বাধীন করার চিন্তা মনের মধ্যে অঙ্কুরিত হয়েছিল। দেশকে স্বাধীন করার বিপ্লবী পথের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিলেন নিবারণচন্দ্র ঘটক। খুব সম্ভব গণতন্ত্র সম্পর্কে নজরুল তখনো সচেতন হয়ে ওঠেননি, বিপ্লবই ছিল তাঁর সামনে খোলা একমাত্র পথ। সে পথকেই কল্পনা-বিলাসিতা দিয়ে সাজিয়ে থাকবেন। এ স্কুলে এসে তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ যা হয়েছিল, সে হলো: কয়েক বছর এখানে-সেখানে ঘোরাঘুরি করে শেষে তিনি নিজে কোথাও থিতু হয়ে বসতে সমর্থ হয়েছিলেন।

শিয়ারশোল স্কুলে লেখাপড়ায় তিনি কৃতিত্ব দেখাচ্ছিলেন এবং তাঁর নাম হচ্ছিল ভালো ছাত্র হিসেবে। কিন্তু যখন তিনি দশম শ্রেণিতে পড়ছিলেন এবং সামনে দেখতে পাচ্ছিলেন প্রবেশিকা পরীক্ষার খেয়াঘাট, তেমন সময়ে—১৯১৭ সালের শেষাংশে, আবার তাঁর জীবন বড় একটা বাঁক নিল। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে চারদিকে যে বাঙালি বাহিনী সম্পর্কে হৈহৈ শোনা যাচ্ছে, সেই বাহিনীতে যোগ দিয়ে তিনি যুদ্ধে যাবেন। এ সিদ্ধান্ত অতি আকস্মিক, কিন্তু বেশ সংগতিপূর্ণ তাঁর অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় চরিত্রের সঙ্গে। কেবল অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়তা নয়, অস্থিরমতিত্বও তাঁর চরিত্রের আরেক বৈশিষ্ট্য। মাত্র চার-পাঁচ বছরের মধ্যে চুরুলিয়া, মাথরুন, আসানসোল, রানিগঞ্জ, দরিরামপুর, ফের রানিগঞ্জ এবং এখন করাচি—এই জায়গাগুলো যেমন লেটোর গান থেকে লেটো সৈনিকের কাজ—সেসবই তেমনি তাঁর অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়তা এবং অস্থিরমতিত্বের প্রমাণ।

এর তিন বছর আগে—১৯১৪ সালের জুলাই মাসে—প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল। স্কুলের দেয়াল পত্রিকায় নাকি সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেওয়ার একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল এবং তা দেখে কিশোর নজরুল বাঙালি পল্টনে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেন।[৭৮] দেয়াল পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার তথ্য যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলেও তা গুরুত্বহীন। কারণ, স্কুলের দেয়াল পত্রিকা থেকে তাঁর এ খবর শোনার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

যখনকার দেয়াল পত্রিকার কথা বলা হচ্ছে, তার বছর খানেক আগে থেকেই—১৯১৬ সালের আগস্ট মাস থেকে—সৈন্যবাহিনীর তরফে 'বেঙ্গলি ডাবল কোম্পানি'তে যোগ দেওয়ার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হচ্ছিল।[৭৯] সেই সঙ্গে বাঙালি ভদ্রলোক শ্রেণির পরিচালিত পত্রিকাগুলোতেও প্রকাশিত হয়েছিল সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য তরুণদের প্রতি আহ্বান। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই সময়কার কলকাতা থেকে প্রকাশিত ইংরেজি দৈনিক *দ্য বেঙ্গলি*-এর কথা উল্লেখ করতে পারি। বিশেষ করে এ পত্রিকার কথা বলছি এ জন্য যে এ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তখনকার বঙ্গদেশের সম্ভবত সবচেয়ে প্রধান রাজনৈতিক নেতা—সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি। তিনি ছিলেন একই সঙ্গে রাজভক্ত এবং স্বাধীনতাকামী। তিনিই ভারতবর্ষের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে'র প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন (১৮৭৬)। তাঁর পত্রিকার প্রতি সংখ্যায়ই এই যুদ্ধের খবরাখবর প্রকাশিত হতো। পশ্চিম রণাঙ্গন, ফরাসি রণাঙ্গন, ইতালির রণাঙ্গন, রুশ রণাঙ্গন, মধ্যপ্রাচ্যের রণাঙ্গন ইত্যাদির কোথায় কী ঘটছে, বিশেষ করে জার্মানির বিরুদ্ধে ব্রিটেন-ফ্রান্স-রাশিয়ার মিত্রবাহিনী কতটা সাফল্য দেখাচ্ছে—সে সংবাদ প্রকাশিত হতো ফলাও করে। সেই সঙ্গে প্রকাশিত হতো সৈন্যবাহিনীতে বাঙালিরা কেমন উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে—তার খানিকটা অতিরঞ্জিত খবর। ইংরেজি *অমৃত বাজার* পত্রিকায়ও মাঝেমধ্যে বাঙালি বাহিনীর খবর প্রকাশিত হতো।

খবরাখবর ছাড়াও, কলকাতার পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতো 'বেঙ্গলি রেজিমেন্ট কমিটি'র বিজ্ঞপ্তি। যেমন এ রকমের একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় ১৯১৬ সালের ১১ আগস্ট তারিখে। এতে বলা হয়, 'বেঙ্গলি ডাবল কোম্পানি'র সদস্য হিসেবে জার্মানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে 'আমাদের রাজভক্তি প্রদর্শনের এই শুভ অবসর উপস্থিত হইয়াছে।'[৮০] পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি স্কুলের ছাত্র নজরুল পড়েছিলেন কি না, সন্দেহ আছে। কিন্তু যা তিনি অবশ্যই শুনে থাকবেন, তা হলো 'বেঙ্গলি রেজিমেন্ট কমিটি' আয়োজিত সভা-সমিতির খবর। কেবল জেলা শহরগুলোতে নয়, মফস্বল শহরগুলোতেও এসব সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। এসব সভায় এমন কথা বলা হতো যে এই যুদ্ধ ভারতবর্ষেরও যুদ্ধ এবং এতে যোগ দিয়ে বাঙালিদের উচিত দেশপ্রেমের পরিচয় দেওয়া এবং বাঙালিরা যুদ্ধ করার উপযুক্ত নয়—এই দুর্নাম ঘোচানো। লোকেদের মুখে মুখে ছাড়া, সভাসমিতির খবর গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হতো পত্রপত্রিকার মাধ্যমে।

আসলে, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরের

---

৭৬. মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ আবদুল জব্বার নামে আরও একজন বন্ধুর কথা লিখেছেন। শিয়ারশোল স্কুলে পড়তেন, নাকি রানিগঞ্জ স্কুলে, তা লেখেননি। পৃ. ১৩
৭৭. রফিকুল ইসলাম, পৃ. ১৭
৭৮. অরুণকুমার বসু, পৃ. ২১
৭৯. *দ্য বেঙ্গলি*
৮০. মুহাম্মদ লুৎফুল হক, *বাঙালি পল্টন: ব্রিটিশ ভারতের বাঙালি রেজেমেন্ট* (ঢাকা: প্রথমা, ২০১২) গ্রন্থে মুদ্রিত, পৃ. ৪৯

বছর—১৯১৫ সাল থেকে—বঙ্গদেশের রায় বাহাদুর, খান বাহাদুর, রাজা-মহারাজা, নবাব বাহাদুর ইত্যাদি রাজভক্তরা দেশের প্রতি তাঁদের আনুগত্য প্রমাণ করার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। (প্রায় ষাট বছর আগে সিপাহী বিদ্রোহের সময়ও এই শ্রেণির বাঙালিরা একই ধরনের মনোভাব দেখিয়েছিলেন।) প্রথম মহাযুদ্ধ বঙ্গদেশ কেন, ভারতবর্ষের ত্রিসীমার মধ্যেও অনুষ্ঠিত হয়নি। এখন তাই পেছনের দিকে তাকিয়ে আমরা বলতে পারি যে এ যুদ্ধে যোগ দিয়ে দেশপ্রেম দেখানোর প্রশ্ন ছিল অবান্তর। কিন্তু ইংরেজ প্রভুদের প্রতি তাঁদের নির্ভেজাল আনুগত্য প্রমাণ করার জন্য সেকালের শিক্ষিত জমিদার এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির বাঙালিরা এ যুদ্ধে যোগদানের বিষয়টিকে নিয়ে প্রবল কলরব সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁদের মতে, এ যুদ্ধে যোগদান করা ছিল দেশপ্রেমেরই নামান্তর। 'বেঙ্গল রেজিমেন্ট কমিটি'র সম্পাদক, ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিক বলেছিলেন, এ যুদ্ধ বাংলারও যুদ্ধ—'দি ওয়ার ওয়াজ অলসো ওয়ার অব বেঙ্গল'।[৮১]

সরাসরি যুদ্ধে না হলেও, যুদ্ধক্ষেত্রে চিকিৎসাসেবা দেওয়ার উদ্দেশে এই 'দেশপ্রেমিকরা' বিপুল উৎসাহ নিয়ে ১৯১৫ সালে একটি 'অ্যাম্বুলেন্স কোর' গঠন করেছিলেন। এই অ্যাম্বুলেন্স বাহিনীর কর্মীরা বসরা এবং মেসোপটেমিয়ায় গিয়ে ফিল্ড হসপিটালের কাজ করেছিলেন কৃতিত্বের সঙ্গে। এ ছাড়া, ফরাসি উপনিবেশ চন্দননগর থেকে বাঙালি তরুণদের ছোট্ট একটি দল ফরাসি বাহিনীতে যোগ দিয়ে লড়াই করেছিল ফ্রান্সের ভের্দুনে। এসব কৃতিত্বে উৎসাহিত হয়ে দেশের নেতারা একটি বাঙালি সৈন্যদল গঠনের জন্য ভারত সরকারের কাছে দেন-দরবার করতে আরম্ভ করেন। তা ছাড়া, দেশবাসীর, বিশেষ করে তরুণদের, উৎসাহিত করার উদ্দেশে তাঁরা কলকাতায় পূর্বোক্ত 'বেঙ্গলি রেজিমেন্ট কমিটি' নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। এই কমিটির সভাপতি হন বর্ধমানের মহারাজা আর সম্পাদক হন ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিক। (*বেঙ্গলি* পত্রিকার সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জিও এই কমিটির সদস্য ছিলেন।)

অন্য উদ্দেশ্য থাকা অসম্ভব নয়, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, এই 'দেশপ্রেমিক' রায় বাহাদুর-খান বাহাদুরদের বাধিত করার জন্য ইংরেজ সরকার বাঙালিদের নিয়ে একটি পরীক্ষামূলক ও প্রতীকী বাহিনী গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয় ১৯১৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে। প্রতীকী বলছি এ জন্য যে, এই বাহিনীতে সরকার মাত্র ২২৮ জন সৈন্য রাখার পরিকল্পনা নিয়েছিল। সৈন্যসংখ্যা বিবেচনা করে এই বাহিনীর নাম দেওয়া হয় 'বেঙ্গলি ডাবল কোম্পানি'। অর্থাৎ দুই কোম্পানি-বিশিষ্ট বাঙালি বাহিনী। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ বাহিনীতে সৈন্যসংখ্যা কিছু বেশি হয়েছিল। যেমন ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুতে এই দলে ২৬২ জন সৈন্য ছিল বলে সরকারিভাবে জানানো হয়। এই সৈন্যদের মধ্যে মাত্র ১১ জন ছিল মুসলমান, বাকি ২৫১ জন হিন্দু। প্রধানত 'ভদ্রলোক'দের নিয়ে অর্থাৎ শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তদের নিয়ে গঠিত এই বাহিনীতে সবচেয়ে বেশি লোক যোগ দিয়েছিল কলকাতা নগরী থেকে—৫৬ জন। তারপরেই ছিল ২২ জন চব্বিশ পরগনা থেকে। হুগলি থেকে ছিল ২০ জন, যশোর থেকে ১৯ জন ইত্যাদি। সবচেয়ে কম ছিল মালদা থেকে ২ জন, নোয়াখালী আর রংপুর থেকে ১ জন করে। বিহার থেকে যোগ দিয়েছিল ৮ জন, ওড়িশা থেকে ৪ জন, উত্তর প্রদেশ থেকে ৩ জন, আসাম থেকে ২ জন, মধ্য প্রদেশ থেকে ১ জন এবং রেঙ্গুন থেকে ১ জন। দলের মধ্যে কিছু অশিক্ষিত লোকও ছিল।[৮২]

বাঙালি ডাবল কোম্পানি সম্পর্কে শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে যে উৎসাহ দেখা দেয়, তার একটা পরোক্ষ প্রমাণ মেলে হিজ মাস্টার্স ভয়েসের একটি বিজ্ঞাপন থেকে। এতে দেখা যায় যে ডাবল কোম্পানি এইচএমভি একটি গানের রেকর্ড প্রকাশ করেছে।[৮৩] ওই একদিনের খবর থেকে জানা যায় যে সৈন্যবাহিনী থেকে শরৎকুমার মল্লিককে লেখা একটি চিঠি থেকে জানা যায় যে, বাঙালি বাহিনীর প্রথম ব্যাটালিয়নের জন্য সৈন্য সংগ্রহের কাজ শেষ হয়েছে।[৮৪] অনেকটা তারই সূত্র ধরে

ডাবল কোম্পানির প্রথম দলটি লাহোর হয়ে নওশেরায় গিয়েছিল ১৯১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে।[৮৫] যারা যুদ্ধে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে একজনের নাম কুমার অধিক্রম মজুমদার। তিনি তাঁর পিতাকে যে চিঠি লিখেছিলেন, তার বরাত দিয়ে তাঁর পিতা রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার (এমএ, বিএল) *দ্য বেঙ্গলি* পত্রিকায় একটি চিঠি লেখেন ১০ অক্টোবর তারিখে। ডাবল কোম্পানিতে যে তরুণেরা যোগ দিয়েছিল, তাদের অভিভাবকদের আশ্বস্ত করার উদ্দেশেই একজন পিতা হিসেবে যদুনাথ এই চিঠিটি লিখেছিলেন। এ চিঠি থেকে জানা যায় যে ডাবল কোম্পানির তরুণেরা নওশেরায় বেশ সুখেই আছে। আরও জানা যায় যে তখনো তাদের প্রশিক্ষণ চলছিল কোনো অস্ত্র ছাড়াই, যদিও শিগগিরই অস্ত্র দেওয়া হবে বলে তাদের বলা হয়েছিল।[৮৬]

বস্তুত, ১৯১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যে দলটি নওশেরা সেনাছাউনিতে যায়, তারা সামরিক শিক্ষার অ আ ক খ শেখে ৪৬তম পাঞ্জাব রেজিমেন্টের অধীনে। সেখানে প্রায় তিন মাস বিনা অস্ত্রে কুচকাওয়াজ শেখার পর ডিসেম্বর মাসে তাদের করাচিতে পাঠানো হয় ১৬তম রাজপুত রেজিমেন্টের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য। কিছু পরে এই রাজপুত রেজিমেন্টকে ফিল্ড সার্ভিসে পাঠানো হয়েছিল মেসোপটেমিয়ায়। রেজিমেন্টের সেনাধ্যক্ষ কর্নেল ভেনরেনন চেয়েছিলেন যে তাঁর দলের সঙ্গে সহায়তাকারী স্কাউট হিসেবে বাঙালি সৈনিকদের পাঠানো হোক। কিন্তু বাঙালি বাহিনী তখনো রেজিমেন্টে পরিণত হওয়ার মতো বড় হয়নি অথবা যুদ্ধ করার মতো প্রশিক্ষণও পায়নি। তাই তাদের স্কাউটের কাজ দেওয়া হয়নি।

রাজপুত রেজিমেন্ট চলে যাওয়ার পর বাঙালি বাহিনীকে যুক্ত থাকতে হয়

---

৮১. *দ্য বেঙ্গলি*

৮২. এরপর সৈন্য সংগ্রহের কাজে গতি দেখা দেয়। জুলাই মাসে দেওয়া অন্য এক পরিসংখ্যানে বলা হয়, ১৯১৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত আট মাসে সৈন্য সংগৃহীত হয় ২২৮ জন, ডিসেম্বর থেকে ১৯১৭ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ২২০ জন, মে মাসে (১৯১৭) ২১১ জন, জুনে ৩২০ জন। বাহিনীর জন্য আরও সাত-আট শ লোক দরকার।—*দ্য বেঙ্গলি*

৮৩. *দ্য বেঙ্গলি*। এই বিজ্ঞাপনে এইচএমভির লোগোসহ লেখা হয়: 'বেঙ্গল ডাবল কোম্পানীর মার্চ ও বিদায়গীতি শুনিয়াছেন কে? যদি না শুনিয়া থাকেন তাহা হইলে অদ্যই নিকটস্থ গ্রামোফোন ব্যবসায়ীর নিকট সবিশেষ বিবরণ পুস্তিকার জন্য পত্র লিখুন।'

৮৪. *দ্য বেঙ্গলি*

৮৫. অন্তর্ভুক্ত তরুণদের পাঠানো হতো কয়েকজন করে। হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়ত সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায়। আর গন্তব্যে গিয়ে পৌঁছাত পঞ্চম দিন ভোরবেলায়। সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেবার বিজ্ঞপ্তি, *দ্য বেঙ্গলি*। প্রথম দলটিকে লাহোরে স্বাগত জানিয়েছিলেন সরলা দেবী চৌধুরানী।—*দ্য বেঙ্গলি*

৮৬. *দ্য বেঙ্গলি*

১১৭তম মারহাটা রেজিমেন্টের সঙ্গে। এই রেজিমেন্টের প্রধান কর্মকর্তা, মেজর ওয়াটার বলেন যে বাঙালি বাহিনী যথেষ্ট দক্ষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো ঠিক হবে না। এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরই বাঙালি বাহিনীর প্রথম একটি দলকে মেসোপটেমিয়ায় পাঠানো হয় ১৯১৭ সালের জুলাই মাসে। এই দলে ছিলেন শৈলেন্দ্রনাথ বসু, কুমার অধিক্রম মজুমদার, ঢাকার নবাব পরিবারের সদস্য খাজা হাবিবুল্লাহ প্রমুখ। মন বাহাদুর সিংহ এবং টাঙ্গাইলের রণদাপ্রসাদ সাহাও ছিলেন এই দলে। তবে এই বাঙালি সৈন্যরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি, বরং সেখানে তাঁদের দেওয়া হয়েছিল গ্যারিসনের কাজ—যেমন পাহারা দেওয়ার কাজ, পুলিশের কাজ, বাইসাইকেলে করে খবর পৌঁছে দেওয়ার কাজ—এক কথায়, সহায়ক বাহিনীর কাজ।

'ডাবল কোম্পানি' নাম দেওয়া হলেও এবং এতে ২২৮ জন সদস্য রাখার কথা থাকলেও, এই বাহিনীর জন্য সৈন্য সংগ্রহের কাজ অব্যাহত রাখা হয়। এবং ১৯১৭ সালের ২৬ জুনের মধ্যে এই বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ৯১২ জনে পৌঁছায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে জুলাই মাসের শুরুতে একটি বাঙালি বাহিনী গঠন করার সরকারি ঘোষণা দেওয়া হয়। ইংরেজিতে এর নাম দেওয়া হয় 'ফর্টি নাইন্থ্ বেঙ্গলিজ'—'রেজিমেন্ট' শব্দটা সরকারিভাবে কখনোই ব্যবহৃত হয়নি। পয়লা নভেম্বর নাগাদ এই বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা প্রায় ১৭০০তে পৌঁছে।[৮৭] এবং পরের ফেব্রুয়ারিতে এই সংখ্যা ১৮০০ ছাড়িয়ে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এই বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা দুই হাজারের বেশি হয়নি কখনো। যুদ্ধ জয়ে আনুকূল্য করবে—এ কথা ভেবে সরকার বেঙ্গলি রেজিমেন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বলে মনে হয় না। এটি কোনো সামরিক সিদ্ধান্ত ছিল না, এটা ছিল সরকারের একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। সরকার সম্ভবত অনুগত এবং শিক্ষিত বাঙালিকে যুদ্ধে



কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

যোগদান করে দেশপ্রেম দেখানোর সুযোগ দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তার চেয়ে বড় উদ্দেশ্য ছিল সম্ভবত ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসবাদী স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে তরুণদের মনোযোগ অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখা।

'ডাবল কোম্পানি' গঠিত হওয়ার পরে, ১৯১৬ সালের জুলাই মাসে সৈন্য সংগ্রহের বিজ্ঞাপন দিয়ে[৮৮] আরও বেশি উৎসাহ নিয়ে সৈন্য সংগ্রহের কাজ আরম্ভ হয়। সেনা কর্তৃপক্ষ পূর্বোক্ত বেঙ্গল রেজিমেন্ট কমিটিকে জানিয়ে দেয় যে এই বাহিনীর জন্য হাজার দুয়েক সৈন্য সংগ্রহ করতে হবে। এই নির্দেশ অনুযায়ী রেজিমেন্ট কমিটি সৈন্য সংগ্রহের উদ্দেশে সারা দেশে সভাসমিতির আয়োজন করে।[৮৯] কলকাতায় কলেজ স্কোয়ারে বহুবার সভার আয়োজন করা হয়েছিল। বঙ্গদেশের গবর্নর লর্ড রোনাল্ডশে এবং বর্ধমানের মহারাজাকে নিয়ে কলকাতার টাউন হলেও জাঁকজমকপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এতে রোনাল্ডশেসহ বক্তারা আবেগময় ভাষায় তরুণদের প্রতি যুদ্ধে যোগদানের আমন্ত্রণ জানান।[৯০]

কেবল কলকাতায় নয়, জেলায় জেলায়, এমনকি, মফস্বল শহরগুলোতেও সৈন্য সংগ্রহ করার সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব সভায় কোনো না কোনো বিখ্যাত বাঙালি বক্তব্য দিতেন। যেমন কয়েকটি সভায় বক্তৃতা করেছিলেন দেশের সবচেয়ে প্রবীণ নেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি।[৯১] সৈন্য সংগ্রহে সহায়তা করার জন্য জেলায় জেলায় বেঙ্গল রেজিমেন্ট কমিটির শাখাও গঠিত হয়েছিল। এই সম্মিলিত প্রচারের ফলে বঙ্গদেশে বাঙালি বাহিনী সম্পর্কে এত উৎসাহ দেখা দিয়েছিল যে আগেই লক্ষ করেছি, এ নিয়ে গ্রামোফোন কোম্পানি হিজ মাস্টার্স ভয়েস মার্চের সুরসংবলিত একটি গ্রামোফোন রেকর্ড প্রকাশের বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করেছিল।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যুদ্ধে যোগদান করার বিষয়টি নজরুলের পক্ষে আদৌ স্কুলের দেয়ালপত্রিকা থেকে জানার প্রয়োজন ছিল না। এ নিয়ে সারা দেশে যে শোরগোল সৃষ্টি হয়েছিল, সে কথা তাঁর মতো উৎসাহী যুবকের নানা সূত্র থেকেই শোনার কথা। আর একবার এই বাহিনীতে যোগ দেওয়ার বিষয়টা যখন তাঁর মাথায় এল, তখন আর শিয়ারশোল স্কুল তাঁকে আটকে রাখতে পারেনি।

কিন্তু তিনি সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিলেন কেন? আজহারউদ্দীন খান লিখেছেন যে নজরুল বাংলার নেতাদের আহ্বানে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হওয়ার উদ্দেশে ৪৯ নম্বর বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগ দিয়ে সুদূর করাচিতে চলে যান।[৯২] মুজফ্ফর আহমদ আরেকটু ব্যাখ্যা করে লিখেছেন যে যাঁরা যুদ্ধে গিয়েছিলেন 'তাঁরা ভেবেছিলেন যে এটা একটা দেশপ্রেমের কাজ।...তাঁরা ভেবেছিলেন যে যুদ্ধে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা নিশ্চয় আছে, কিন্তু বাঁচলে তাঁরা যুদ্ধবিদ্যা ও নূতন নূতন অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার আয়ত্ত করেই বাঁচবেন।'[৯৩]

আজহারউদ্দীন খান এবং মুজফ্ফর আহমদ সৈন্যবাহিনীতে বাঙালি যুবকদের যোগ দেওয়ার কারণ দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ বলে ধারণা করলেও, কজন দেশের প্রতি ভালোবাসা দেখানোর উদ্দেশে বাঙালি পল্টনে যোগ দিয়েছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। সন্দেহ আছে এই বাহিনীর সদস্যরা কতটা অস্ত্রবিদ্যা শিখেছিলেন, সে

৮৭. *দ্য বেঙ্গলি*
৮৮. *দ্য বেঙ্গলি*
৮৯. *দ্য বেঙ্গলি*
৯০. *দ্য বেঙ্গলি*
৯১. *দ্য বেঙ্গলি*
৯২. আজহারউদ্দীন খান, পৃ. ১১
৯৩. মুজফ্ফর আহ্‌মদ, পৃ. ১০। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তও একে স্বদেশপ্রেমের কাজ বলে উল্লেখ করেছেন। *জ্যৈষ্ঠের ঝড়* (কলকাতা : আনন্দধারা প্রকাশন, ১৯৬৯), পৃ. ৩৮। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ও দাবি করেছেন যে নজরুল যুদ্ধ-বিদ্যা শেখার জন্য বাঙালি বাহিনীতে যোগ দিতে চান। *কেউ ভোলে না কেউ ভোলে* থেকে উদ্ধৃত, *কাজী নজরুল ইসলাম : জন্মশতবর্ষ* স্মারকগ্রন্থ (দ্বিতীয় মুদ্রণ, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১৪), পৃ. ৮

সম্পর্কেও। অন্তত প্রথম দিকে তাঁরা যে অস্ত্র হাতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেননি, তা আমরা আগেই লক্ষ করেছি। এমনকি, নজরুল বাঙালি বাহিনীতে যোগ দেওয়ার আগেই সেই বাহিনীর একটি ছোট দল মেসোপটেমিয়ায় গেলেও সেখানে তারা যুদ্ধ করেনি। সুতরাং অস্ত্রবিদ্যা শেখা যদি নজরুলের গোপন অভিপ্রায় হয়ে থাকে, তাহলে তাঁর সে ইচ্ছা কতটা পূরণ হয়েছিল, তা নিতান্তই অনুমানের বিষয়।

সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা কারণের কথা বলেছেন, তাঁর প্রথম যৌবনের বন্ধু এবং সহপাঠী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। তিনি ইঙ্গিত করেছেন ব্যর্থ প্রেম ও অভিমানের দিকে।[৯৪] নজরুলের আত্মজৈবনিক পত্র-উপন্যাস *রিক্তের বেদন* থেকেও এর আভাস পাওয়া যায়। এ উপন্যাসের নায়ক নুরুল হুদাও সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়ে করাচিতে চলে যায়। সে যার প্রেমে পড়েছিল, লেখক তার নাম দিয়েছেন—মাহবুবা। কিন্তু মাহবুবা নুরুল হুদাকে প্রত্যাখ্যান করেনি, বরং তাকে ভালোবাসত। নুরুল হুদার যুদ্ধে যোগদানের কারণ হিসেবে প্রেমে ব্যর্থতাকে দেখানো হয়নি। নজরুলের জীবনের পরবর্তীকালের ঘটনাবলি মনে রাখলে, খানিকটা অপরিণত মনে হলেও, এই প্রেমে পড়াকে অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না। এই তরুণী কে, তা জানা যায়নি। কেউ কেউ বলেছেন যে এই তরুণী নাকি ছিলেন রানিগঞ্জের এক হিন্দু পুলিশ কর্মকর্তার কন্যা।

উপন্যাস নয়, বাস্তব জীবনে নজরুল যুদ্ধে যাওয়ার সময়ে তাঁর প্রেমিকার একটি চুলের কাঁটা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। করাচিতে আড়াই বছর থাকার সময়ে এই কাঁটাটি তিনি যত্ন করে রেখেছিলেন এবং যখন যুদ্ধ থেকে ফিরে আসেন, তখনো এই কাঁটাটি ফেরত নিয়ে এসেছিলেন।[৯৫] এমনকি, ফিরে আসার প্রায় পাঁচ বছর পরও তিনি তাঁর পুরোনো প্রেমিকাকে ভোলেননি। বরং তাঁকেই 'মানসী আমার' বলে সম্বোধন করেন এবং *ব্যথার দান* গ্রন্থ উৎসর্গ করেন। এ থেকে মান-অভিমানের আভাস পাওয়া যায় কি? মনে হয়, না। বরং মনে হয়, প্রেম অটুটই ছিল। অভিমান করে নয়, বিদায়-ব্যথা নিয়েই তিনি গিয়েছিলেন। তাঁর চলে যাওয়ার ফল বিরহ, যাওয়ার কারণ বিরহ নয়।

সত্যি সত্যি, কেন সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন তিনি, আজ আর তা জানা সম্ভব নয়। এমনকি, এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য জল্পনাকল্পনা করার মতো সূত্রও নেই। সবচেয়ে সম্ভাব্য কারণটার কথা তিনি নিজেই ইঙ্গিত করেছেন তাঁর আত্মজৈবনিক গল্প 'হেনা'র নায়কের মুখ দিয়ে। তাঁর গল্পের এই চরিত্র নিজের যুদ্ধে যোগদানের কারণ বোঝাতে গিয়ে বলে, 'ইংরেজ আমার শত্রু নয়। এ আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু।' নজরুলের নিজের কথাও কি তাই? মনে হয়, সে পর্যায়ে নজরুল নিবারণ ঘটকের প্রভাবে বিপ্লবের দিকে আকৃষ্ট হলেও মনে মনে রাজভক্তই ছিলেন। তবে তিনি ইংরেজ-সরকারের প্রতি আনুগত্য অথবা দেশের প্রতি ভালোবাসা প্রমাণ করতে যুদ্ধে যোগদান করেননি, যেমন করেছিলেন ভদ্রলোক শ্রেণির বহু সদস্য। সে পর্যায়ে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করার স্বপ্নও তিনি দেখেছিলেন কি না, সন্দেহ আছে। অন্তত সৈন্যবাহিনীতে অস্ত্রবিদ্যা তিনি অথবা তাঁর বন্ধুরা তেমন শেখেননি। 'হেনা' গল্পের নায়ক খেয়ালিপনার দরুন যুদ্ধে যোগদানের কথা উল্লেখ করেছে। এই খেয়ালিপনা নজরুলেরও যুদ্ধে যোগদানের অন্যতম কারণ। হয়তো প্রধান কারণ। কিন্তু কারণ যা-ই হোক, তিনি সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করার ফলে অন্তত তখনকার মতো তাঁর শিক্ষক নিবারণ ঘটকের দৃষ্টান্ত দেখে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে যোগ দিতে পারেননি। যুবসমাজের দৃষ্টি অন্যদিকে আকৃষ্ট করার যে অভিপ্রায় ছিল ইংরেজ শাসকের, তিনি হয়তো পরোক্ষভাবে সেই অভিপ্রায়কেই সার্থক করেছিলেন।

এর সঙ্গে আমরা জুড়ে দেব আরেকটি কারণ—তাঁর অ্যাডভেঞ্চারপ্রীতি। মনে হয়, যুদ্ধের রোমান্টিক কল্পনা তাঁকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিল সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য। আমাদের বিবেচনায় এটাই তাঁর সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেওয়ার সবচেয়ে প্রধান কারণ। আর পাঁচজনের মতো সাধারণ মানুষ হলে, তিনি যুদ্ধে যোগ না দিয়ে শিয়ারশোল স্কুলে লেখাপড়া চালিয়ে যেতেন। পরের বছর প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতেন। উচ্চশিক্ষাও গ্রহণ করতেন। পাস করে, বিয়ে করে, সন্তান-সন্ততির পিতা হয়ে বৃদ্ধ হয়ে মারা যেতেন। অর্থাৎ প্রতিভাবানের সৃষ্টিছাড়া পথ নয়—তাঁর পথ হতো পাঁচজনের বহু ব্যবহৃত পথ।

তিনি ঠিক কোন তারিখে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন, তাও জানার উপায় নেই। যারা বেঙ্গল ডাবল কোম্পানির অথবা পরে ৪৯তম বেঙ্গলিজের রংরুট হয়ে করাচির পথে কলকাতা ত্যাগ করত, অনেক সময় পত্রিকায় যাত্রার তারিখসহ তাদের নাম ছাপা হতো। *দ্য বেঙ্গলি* পত্রিকায় যেমন ১৯১৬ সালের শেষ ভাগ থেকে আরম্ভ করে ১৯১৮ সালের প্রথম ভাগ পর্যন্ত এ রকমের শ পাঁচেক নাম আমি ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে রক্ষিত এই পত্রিকার নথিতে খুঁজে পেয়েছি।[৯৬] কিন্তু এর মধ্যে নজরুল ইসলামের নাম নেই। কারণ, যে সময়কার কথা উল্লেখ করলাম, সেই পুরো সময়টার পত্রিকা ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে নেই। তা ছাড়া, 'বেঙ্গলি রেজিমেন্ট কমিটি' যেসব নামের তালিকা পাঠাত, তার সবই পত্রিকায় মুদ্রিত হতো না। মোট কথা, নজরুলের সেনাবাহিনীতে যোগদানের সঠিক তারিখ আমাদের অজ্ঞাতই থেকে যাবে। তবে জীবনীকার এবং স্মৃতিলেখকেরা সবাই নজরুলের সেনাবাহিনীতে যোগদানের সময়টাকে ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে ধরে নিয়েছেন। সেপ্টেম্বরে যোগ দিয়েছিলেন, নাকি ডিসেম্বরে, সত্যিকার অর্থে তাতে বিশেষ কোনো পার্থক্য হয় না।[৯৭] যা আমরা নিশ্চিতভাবেই জানি, তা হলো লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে তিনি হঠাৎ সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন।

বস্তুত, নজরুল যে এই বাহিনীতে যোগদান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সেটাই ছিল বিভ্রান্তির ওপর স্থাপিত। এ থেকে সে পর্যায়ে রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর চিন্তা যে অপরিণত ছিল, সেটাই প্রমাণিত হয়। তিনি ছিলেন মাত্র

---

৯৪. শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, *আমার বন্ধু নজরুল*

৯৫. মুজফ্ফর আহমদ, পৃ. ১৭

৯৬. এমনকি, বরিশালে আমাদের পড়শি গ্রাম খাটিয়ালপাড়ার বাবরজান হাওলাদারের নামও খুঁজে পেয়েছি। তিনি বাহিনীতে যোগ দিতে করাচি যাত্রা করেন। ২৬ জানুয়ারি ১৯১৮ তারিখে। *দ্য বেঙ্গলি*, কিন্তু যে নামটি আমি অত্যন্ত এবং উৎসাহ নিয়ে খুঁজে বেড়াই, সেই নজরুলের নাম পাইনি। এর একটা কারণ, পত্রিকার সব সংখ্যা না-থাকা। তা ছাড়া, কোনো কোনো সংখ্যায় সবার নাম না দিয়ে কয়েকজনের নাম দিয়ে তারপর লেখা হতো 'এবং আরও...জন।'

৯৭. অরুণকুমার বসুর মতে, নজরুল ডিসেম্বরে পরীক্ষা দিয়েছিলেন, কিন্তু বাহিনীতে নাম লেখান সেপ্টেম্বরে। পৃ. ২০, ২১। অতি অবাস্তব ধারণা। আর রফিকুল ইসলামের মতে, নজরুল বাহিনীতে যোগ দেন 'নভেম্বর-ডিসেম্বরের দিকে।' পৃ. ১৯। তিনি নজরুল ও তাঁর সঙ্গীদের বিদায় সংবর্ধনার কথাও কল্পনা করেছেন। তিনি যে অনুষ্ঠানের কথা লিখেছেন, তা আসলে এক বছর আগে বেঙ্গল ডাবল কম্পেনিতে যোগদানকারী প্রথম দলটির।

আঠারো বছর বয়স্ক একটি সদ্যযৌবনপ্রাপ্ত তরুণ। সুতরাং রাজনীতিতে তাঁর পরিণত জ্ঞান না থাকা আশ্চর্যজনক নয়। কিন্তু তিনি যে রকম প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিলেন, তাতে তাঁর কাছ থেকে ভিন্নতর ভাবনা একেবারে অপ্রত্যাশিত ছিল না। বিশেষ করে যখন বিবেচনা করি যে তিনি ছিলেন একজন বিপ্লবী শিক্ষকের প্রিয় ছাত্র। আগেই বলেছি, ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে সেই শিক্ষক তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপের দরুন পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। আর তাঁর ঘনিষ্ঠ ছাত্র নজরুলের কারাদণ্ড হয়নি বটে, কিন্তু স্থগিত হয়েছিল তাঁর বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন—ছাত্রবৃত্তি। তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ার পর মে মাসে তাঁর ছাত্রবৃত্তি তিনি আবার ফিরে পান—পরের বছর প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্যন্ত।[৯৮] মনে হয় না, নজরুল তাঁর শিক্ষকের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছিলেন অথবা অনুসরণ করেছিলেন আরও উত্তেজনাকর অনুরূপ কোনো দৃষ্টান্ত।

সশস্ত্র বিপ্লবী রাজনীতির কথা কেবল নিবারণচন্দ্র ঘটকই ভাবেননি। তাঁর প্রায় দু বছর আগে—১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে—চারজন সঙ্গীকে নিয়ে বাঘা যতীন ইংরেজ নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে যে 'যুদ্ধ' করেছিলেন, এখন পেছনের দিকে তাকিয়ে তাকে যতই অবাস্তব, হঠকারী এবং আত্মঘাতী পদক্ষেপ বলে মনে করা হোক না কেন, সে সময়ে তা অসংখ্য লোককে অনুপ্রাণিত করেছিল। এই আন্দোলনের ফলে স্বাধীনতা আসেনি, স্বাধীনতার আগমন ত্বরান্বিতও হয়নি। কিন্তু এই আন্দোলন দেশপ্রেম ও স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষাকে সমাজের একটা অংশে ছড়িয়ে দিয়েছিল। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, বাঘা যতীন, গোপীনাথ প্রমুখের দৃষ্টান্ত অসংখ্য লোককেই বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি অনুপ্রাণিত করেছিল। নজরুলও কি বাঘা যতীনের এই 'যুদ্ধের' কথা জানতেন না? আর কোনো সূত্র থেকে শুনুন অথবা না-ই শুনুন, নিবারণচন্দ্র ঘটকের কাছ থেকে তিনি তো তা শুনেছেন! কিন্তু নজরুলের যুদ্ধে যোগদানের ঘটনা প্রমাণ করে যে তিনি বাঘা যতীনের দৃষ্টান্ত দিয়ে উদ্বুদ্ধ হননি। হলে তিনি সৈন্যবাহিনীতে যোগ না দিয়ে বিপ্লবীদের পথ ধরতেন।



প্রথম মহাযুদ্ধফেরত হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম, ১৯২০, কলকাতা

বস্তুত, সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন তরুণদের সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে সমরবিদ্যা শিখতে উদ্বুদ্ধ করেছিল—এই ধারণাই ভ্রান্ত। এই আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে কেউ সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেয়নি। নজরুলের মাথায়ও এমন উদ্ভট ধারণা এসেছিল বলে মনে হয় না। এমনকি, যারা সৈন্যবাহিনীতে কাজ করে ফিরে এসেছিল, তাদের কেউ পরে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল অথবা তাতে নেতৃত্ব দিয়েছিল—এমন কোনো তথ্যও আমাদের জানা নেই। পরবর্তীকালে নজরুল কলম নিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সেই 'বিদ্রোহী' চরিত্র দিয়ে আঠারো বছরের নজরুলকে বিচার করা সংগত হবে না। শিয়ারশোল স্কুলে থাকতে তিনি স্বদেশের রাজনীতির খবর খানিকটা জানলেও, সে পর্যায়ে দেশপ্রেমের প্রমাণস্বরূপ তিনি সরকারবিরোধী কোনো অবস্থান গ্রহণ করেননি। সে রকম বয়স তখনো তাঁর হয়নি। চিন্তায়ও তেমন পরিণতি দেখা দেয়নি। বরং তিনি তখনো ছিলেন তাঁর কৈশোরক জীবনের স্বপ্নে মগ্ন। তখন তিনি আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে কোনো খবর জানতেন বলে জানা যায় না।

আমার ধারণা, তাঁর চরিত্রের দুই প্রধান বৈশিষ্ট্য—অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়তা

৯৮. ১৯১৭ সালের ২ মে তারিখে অনুষ্ঠিত স্কুল কমিটির সিদ্ধান্ত, নীরদবরণ হাজরার গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৩৩

এবং বাউণ্ডুলেপনাই যুদ্ধে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল।[৯৯] লেটোর গানে সুনাম অর্জন করেও তিনি লেটোর দল ত্যাগ করে সুদূর মাথরুনে গিয়ে স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন এই বাউণ্ডুলে স্বভাবের জন্যই। সেখান থেকে ফিরে এসে আসানসোলে রেলওয়ে গার্ডের গৃহভৃত্য হিসেবে কাজ করেছেন, রানিগঞ্জের রুটির দোকানে কাজ করেছেন, পুলিশ অফিসারের বাড়িতেও গৃহভৃত্যের কাজ করেছেন। তারপর অ্যাডভেঞ্চার করে অজানা-অচেনা ময়মনসিংহে গিয়ে সেখানকার স্কুলে স্বল্পকালের জন্য লেখাপড়া করেছেন। সেখান থেকে আবার নিজের জেলা বর্ধমানে ফিরে এসে শিয়ারশোল স্কুলে ভর্তি হয়েছেন। পরবর্তী জীবনেও তাঁর মধ্যে এই ঝোঁকের মাথায় কাজ করার প্রবণতা সমান জোরালো ছিল।

কারণ যা-ই হোক, একবার ধারণাটা মাথায় আসার পর নজরুল সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য উৎসাহে টগবগ করে ফুটতে আরম্ভ করেন। দেরি সহ্য করতে পারছিলেন না। তাঁর স্বভাবেই তা ছিল না। তার ওপর, পরিবারের সঙ্গে তাঁর বন্ধন বলতে গেলে ছিলই না। যে তরুণীকে তিনি ভালোবাসতেন, সেও যথেষ্ট জোরের সঙ্গে তাঁকে আটকে রাখতে পারেনি। মোট কথা, কেউ বাহু মেলে তাঁকে 'যেতে নাহি দিব' বলে বাধা দিতে আসেনি। ছিন্নশিকড়, পিছুটানহীন নজরুল হুজুগের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলেন।

শৈলজানন্দ লিখেছেন যে নজরুল তাঁকেও যুদ্ধে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধে যাওয়ার কী কারণ দেখিয়েছিলেন, তা তিনি বলেননি। তিনি আরও লিখেছেন যে একদিন নজরুল তাঁকে রেলস্টেশনে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তাঁরা দেখতে পান, একদল উর্দি পরা যুবক রেলগাড়িতে চড়ে বাঙালি পল্টনে যোগ দিতে যাচ্ছে।[১০০] (আসলে, বাহিনীতে যোগ দিয়ে তবে যাচ্ছিল।) নজরুল (এবং শৈলজানন্দ) তাদের দেখে 'বন্দে মাতরম্' বলে অভিনন্দন জানান। রেলগাড়ি থেকে বাহিনীভুক্ত জওয়ানেরাও 'বন্দে মাতরম্' বলে তার উত্তর দেয়।[১০১] শৈলজানন্দ আরও লিখেছেন যে অতঃপর তাঁরা দুজনও পল্টনে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেন। সেই উদ্দেশেই একদিন তাঁরা যান মহকুমা শহর আসানসোলে (১৯০৬ সাল থেকে মহকুমার দপ্তর রানিগঞ্জ থেকে আসানসোলে স্থানান্তরিত হয়েছিল)। সেখানে মহকুমা হাকিমের (এসডিও) সঙ্গে দেখা করে তাঁরা তাঁকে বলেন যে তাঁরা বাঙালি পল্টনে যোগ দিতে চান। এসডিও একটা চিঠি লিখে তাঁদের হাতে দেন এবং কলকাতায় গিয়ে রিক্রুটমেন্ট সেন্টারে দেখা করার নির্দেশ দেন।[১০২] তার কদিন পরই পল্টনে নাম লেখানোর জন্য তাঁরা যান কলকাতায়। কিন্তু দৈহিক পরীক্ষায় নজরুল উত্তীর্ণ হলেও শৈলজানন্দ ব্যর্থ হন।[১০৩] (সৈন্যবাহিনীর বিজ্ঞাপনে শর্ত দেওয়া ছিল যে প্রার্থীদের বয়স হতে হবে ১৬ থেকে ৩০-এর মধ্যে, লম্বা কমপক্ষে ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি আর বুক কমপক্ষে ৩২ ইঞ্চি।)[১০৪] একজন রোগা যুবকের বুকের মাপও ৩২ অথবা তার বেশি হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু শৈলজানন্দের বুকের মাপ নাকি আধ ইঞ্চি কম হয়েছিল। তাই তাঁর পক্ষে আর '৪৯তম বেঙ্গলিজে' যোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি। নজরুল একাই পল্টনে যোগ দিলেন। তারপর হাওড়া স্টেশন থেকে একদিন অন্য কয়েকজনের সঙ্গে যাত্রা করলেন করাচির উদ্দেশে।[১০৫]

প্রসঙ্গত, পল্টন কথাটার একটা ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন। এই শব্দটা এসেছে প্লেটুন শব্দ থেকে। এর মানে সৈন্যদের ছোট একটি দল। সাধারণত একটা কোম্পানিতে তিনটি প্লেটুন থাকে। বাঙালিদের নিয়ে যে 'ডাবল কোম্পানি' গঠিত হয়েছিল, তাতে মোট সৈন্য ছিল ২৬২ জন। তা থেকে দেখা যায়, প্রতিটি প্লেটুনে আনুমানিক ৪৫ জন করে সৈন্য ছিল। প্লেটুন, কোম্পানি, ব্যাটালিয়ন, রেজিমেন্ট, ব্রিগেড এবং ডিভিশনের সৈন্যসংখ্যা সুনির্দিষ্ট থাকে না। কিছু কম অথবা বেশি হতে পারে। করাচিতে বাঙালি বাহিনী অর্থাৎ '৪৯তম বেঙ্গলিজ' গঠিত হয়েছিল ১৯১৭ সালের পয়লা জুলাই এবং কখনোই সরকারিভাবে এর নাম 'ফর্টি নাইন্থ্ বেঙ্গলিজ' ছাড়া 'বেঙ্গলি রেজিমেন্ট' হয়নি। এই বাহিনীতে তিনটি ব্যাটালিয়ন রাখার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তৃতীয় ব্যাটালিয়ন কখনোই গঠিত হয়নি।[১০৬]

নজরুল ঠিক কবে পল্টনে যোগ দেন অথবা করাচি যাত্রা করেন, আগেই বলেছি, সে সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য খুঁজে পাইনি। তবে তখনকার

---

৯৯. নজরুলের গল্প-উপন্যাসে তাঁর নিজের জীবনের অনেক ঘটনা এবং চিন্তাভাবনা ফুটে উঠেছে। তাঁর *ব্যথার দান* গ্রন্থের 'হেনা' গল্পের নায়কের একটি উক্তি থেকে মনে হয়, তাঁর পল্টনে যোগদানের কারণ তাঁর সহজাত খেয়ালিপনা। এই গল্পের নায়কের উক্তি 'যদি বলি আমার এ যুদ্ধে আসার কারণ, একটা দুর্বলকে রক্ষা করবার জন্য প্রাণ আহুতি দেওয়া তাহলেও ঠিক উত্তর হয় না। আমার অনেক খামখেয়ালীর অর্থ আমি নিজেই বুঝি না।'

১০০. শৈলজানন্দের এ উক্তি সঠিক বলে মনে হয় না। বাঙালি বাহিনীর জন্য সৈন্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে ১৪৭তম বালুচ বাহিনীর কমান্ডিং অফিসার কর্নেল ট্যানার যে বিজ্ঞপ্তি দেন, তাতে পরিষ্কার বলা হয়েছিল যে, গন্তব্যে পৌছানোর পরে উর্দি দেওয়া হবে। সুতরাং উর্দি পরে যেতে দেখার ধারণাটা স্বাভাবিক বলে মনে হলেও, বাস্তবে সত্য ছিল না।—রিক্রুটমেন্ট নোটিশ, *দ্য বেঙ্গলি*।

১০১. শৈলাজানন্দ মুখোপাধ্যায়, *কেউ ভোলে না কেউ ভোলে* গ্রন্থ থেকে *কাজী নজরুল ইসলাম : জন্মশতবর্ষ* স্মারকগ্রন্থে উদ্ধৃত (দ্বিতীয় মুদ্রণ : কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১৪), পৃ ৭

১০২. পূর্বোক্ত রিক্রুটমেন্ট নোটিশ অনুযায়ী ভর্তির জন্য কারও সুপারিশপত্র বা সাধারণ চিঠির দরকার ছিল না। রিক্রুটমেন্ট সেন্টার মানে কলকাতার দুর্গ ফোর্ট উইলিয়াম।

১০৩. শৈলাজানন্দ মুখোপাধ্যায়, *কেউ ভোলে না কেউ ভোলে*, পৃ. ৯, ১২

১০৪. সৈন্যবাহিনীর বিজ্ঞাপন—রিক্রুটমেন্ট নোটিশ, *দ্য বেঙ্গলি*।

১০৫. রফিকুল ইসলাম এবং অরুণকুমার বসু লিখেছেন, নজরুল লাহোর হয়ে নওশেরায় যান এবং নওশেরায়ই তিনি তিন মাসে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। রফিকুল ইসলাম, পৃ. ২১-২২। অরুণকুমার বসু পৃ. ২১-২২। রফিকুল ইসলাম বরাত দিয়েছেন শম্ভু রায়ের ৯ অক্টোবর ৫৭ তারিখের চিঠি। কিন্তু এ অনুমান ভ্রান্ত। ১৯১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বেঙ্গলি ডাবল কোম্পানিতে যোগদানকারী জওয়ানরাই লাহোর হয়ে নওশেরায় গিয়েছিল এবং সেখানে তিন মাস বিনা অস্ত্রে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কিন্তু ১৯১৬ সালের শেষ দিক থেকে আরম্ভ করে ১৯১৮ সালের প্রথম ভাগ পর্যন্ত বেঙ্গলিতে প্রকাশিত শতাধিক 'বেঙ্গলি সোলজার্স' শীর্ষক খবর থেকেই দেখা যায় যে, পরবর্তী দলগুলো সবাই গিয়েছিল সরাসরি করাচিতে। কাজেই নজরুল এবং তাঁর সহকর্মীদের সরলা দেবী স্বাগত জানিয়েছিলেন বলে অরুণকুমার বসু যে দাবি করেছেন, তা নিতান্তই ভ্রান্ত। পৃ. ২২। ডাবল কম্পেনিতে যোগদানকারী প্রথম দলটিকেই (কুমার অধিক্রম মজুমদার যে দলে ছিলেন) সরলা দেবী লাহোরে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

১০৬. ১৯১৭ সালের জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে বেঙ্গলি রেজিমেন্ট কমিটি কলকাতার টাউন হলে একটি সভার আয়োজন করে। এতে বঙ্গদেশের গভর্নর রোনাল্ডশে উপস্থিত হয়ে আবেগময় ভাষায় একটি ভাষণ দেন। কমিটির সেক্রেটারি ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিক এই সভায় জানান যে ২৬ জুন তারিখে ৪৯তম বেঙ্গলিজের প্রথম ব্যাটালিয়ন গঠনের কাজ শেষ হয়েছে। এতে ৬৮ জন মুসলমানসহ মোট সেন্যসংখ্যা ৯১২। তাঁর বিবরণে ১৯১৬ সালের আগস্ট মাস থেকে ১৯১৭ সালের জুন মাস পর্যন্ত প্রতি মাসে কজন করে সৈন্য যোগদান করে, সে হিসাবও দেওয়া হয়েছিল। রিক্রুটমেন্ট নোটিশ, *দ্য বেঙ্গলি*।

বাঙালি পরিচালিত পত্রিকাগুলোর পাতা খুঁজলে তারিখটা পাওয়া যেতে পারে। জীবনীকারেরা যা বলেছেন, তা অনুমানভিত্তিক একেক রকমের কথা। অরুণকুমার বসু এবং রফিকুল ইসলামের মত নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। মুহাম্মদ লুৎফুল হক বই লিখেছেন বাঙালি পল্টন নিয়ে। তিনি বিভিন্নজনের দেওয়া তারিখ নিয়ে আলোচনা করে যা লিখেছেন, তা থেকে মনে হয় জুলাই মাসের পরে কোনো এক সময়ে নজরুল বেঙ্গলি রেজিমেন্টে যোগ দিয়েছিলেন।[১০৭]

সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়ে নজরুল কোথায় গিয়েছিলেন এবং যুদ্ধ করেছিলেন কি না, তাই নিয়ে একটা ভুল ধারণা তৈরি হয়েছে। এই ধারণার পেছনে ছিল জনশ্রুতি এবং তথ্যের অভাব। এমনকি, নজরুলের নিজের রচনা। বেঙ্গলি ডাবল কোম্পানির একদল সৈন্যকে মেসোপটেমিয়ায় পাঠানো হয়েছিল ১৯১৭ সালের জুলাই মাসে।[১০৮] নজরুলও মেসোপটেমিয়া এবং ফ্রান্সের ভের্দুনে বাঙালিদের লড়াই করার কথা লিখেছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে মেসোপটেমিয়া অথবা পশ্চিম রণাঙ্গন—এর কোথাও যাননি। এমনকি, অস্ত্র চালাতেও শিখেছিলেন কি না, সঠিকভাবে জানা যায় না। কিন্তু তিনি তাঁর গল্পে যুদ্ধের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাকে প্রত্যক্ষদর্শীর জলজ্যান্ত বর্ণনা বলেই মনে হয়। এখানেই তাঁর প্রতিভার অভ্রান্ত প্রমাণ লক্ষ করা যায়। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের পক্ষেও অমন উজ্জ্বল এবং খুঁটিনাটির বিবরণ দেওয়া খুব শক্ত বলে মনে হবে। কিন্তু নজরুল সে বর্ণনা দিয়েছিলেন কেবল যুদ্ধের কথা শুনে আর তাঁর মনের চোখ দিয়ে দেখে। বাকিটা সবটাই কল্পনা।

তাঁর এই গল্পের বাস্তবধর্মী বর্ণনা থেকে অনেকে মনে করেছেন যে তিনি মেসোপটেমিয়া এবং ভের্দুনে গিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু দলের সঙ্গে যাত্রা করে মেসোপটেমিয়া কেন, নজরুল নওশেরায়ও যাননি। প্রশিক্ষণের জন্য ১৯১৬ সালে নওশেরায় গিয়েছিল ডাবল কোম্পানির প্রথম দিকের কিছু সৈনিক। হয়তো তাদের কারও কাছ থেকে শুনেই তিনি নওশেরায় যাওয়ার পথের রোমান্টিক বর্ণনা দিয়েছিলেন কয়েক বছর পরে প্রকাশিত তাঁর কাহিনি—*রিক্তের বেদন*-এ। কিন্তু তিনি সরাসরি গিয়েছিলেন করাচির ছাউনিতে।[১০৯] এবং তাঁর প্রশিক্ষণ যতটুকু হওয়ার, তা করাচিতেই হয়েছিল।

তাঁর মতো প্রতিভাবান মানুষের পক্ষে প্রশিক্ষণে দক্ষতা দেখানো কঠিন হয়নি, বরং তাঁর সহকর্মীদের তুলনায় বেশি দক্ষতা দেখিয়ে তিনি দ্রুতগতিতে পদোন্নতি লাভ করেন, যদিও ঠিক কবে তিনি নায়েক অথবা ল্যান্স নায়েক হন অথবা হাবিলদার হন, তা জানা যায় না। তাঁর বয়স ছিল নিতান্তই কম। তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ—আনুষ্ঠানিক শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল আরও কম। তা না হলে হয়তো তিনি হাবিলদারের থেকেও উচ্চতর পদ লাভ করতে পারতেন।

বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা পদোন্নতির ব্যাপারে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, একটা দৃষ্টান্ত দিলে তা বোঝা যাবে। কুমার অধিক্রম মজুমদার ছিলেন বিএ বিএল পাস। তিনি ডাবল কোম্পানিতে যোগ দিয়েছিলেন একেবারে গোড়ার দিকে, ১৯১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। অন্যদের সঙ্গে তিনিও নওশেরায় তিন মাস প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং ১৯১৭ সালের জুলাই মাসে মেসোপটেমিয়ায় যান। তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অংশত বয়সের কারণে তিনি দ্রুত পদোন্নতি লাভ করেছিলেন। চাকরিতে যোগ দেওয়ার পাঁচ মাস পরে তিনি হাবিলদার, নয় মাস পরে জমাদার এবং পঁচিশ মাস পরে সুবেদার এবং তিরিশ মাস পরে সুবেদার মেজর হন।[১১০]

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে বাহিনীতে যোগদানকারী সেপাইদের বেতন ছিল ১১ টাকা, প্রথম তিন বছরের প্রতিবছর ১ টাকা করে বেতন বৃদ্ধি হতো। কিন্তু 'দ্য বেঙ্গলি রেজিমেন্ট' কমিটির প্রচারিত বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় যে সাধারণ সৈনিকদের বেতন ১১ টাকা নির্ধারিত হলেও, সস্তায় রেশন সরবরাহ বাবদ কেটে নেওয়া হবে ৩ টাকা ১২ আনা।[১১১] নজরুলও এই এগারো টাকা বেতনে তাঁর চাকরি জীবন শুরু করেছিলেন। তবে যোগ দেওয়ার পর এককালীন বোনাস পেয়ে থাকবেন ৫০ টাকা। নায়েক/ল্যান্স নায়েক হয়ে বেতন পেয়েছিলেন ১৩ টাকা। হাবিলদার হওয়ার পর তাঁর বেতন হয় ২০ টাকা।[১১২] নজরুল শিয়ারশোল স্কুলে ছাত্রবৃত্তি পেতেন মাসে পাঁচ টাকা। সে তুলনায় এ বেতন ছিল প্রায় একটা বিলাসিতার মতো। জুতো ও পোশাক তিনি পেতেন সৈন্যবাহিনী থেকে। তাই বেতন যা পেতেন, তা দিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে চলতে পারতেন। ইচ্ছে করলে টাকা সঞ্চয়ও করতে পারতেন—করতেন কি না, সেটা আলাদা কথা। কোন কোন খাতে টাকা ব্যয় করতেন অথবা অপব্যয় করতেন, তা জানা যায় না। কিন্তু একটা ব্যয়ের কথা সুনির্দিষ্টভাবেই জানা যায়—তিনি কলকাতা থেকে প্রকাশিত কয়েকটি সাময়িক পত্রিকার গ্রাহক হয়েছিলেন।

নজরুল তখনো বিখ্যাত হননি। কিন্তু চালাক-চতুর এবং চটপটে সুদর্শন তরুণ হিসেবে সহজেই অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারতেন। রেজিমেন্টে যাঁদের বয়স বেশি ছিল, তাঁরা তাঁকে স্নেহ করতেন। বলা হয় যে তাঁর সহকর্মীদের একজন ছিলেন কোয়ার্টার মাস্টার মনিরুদ্দীন।[১১৩] নজরুলের কাজকর্ম দেখে খুশি হয়ে তিনি নাকি তাঁকে নিজের সহকারী হিসেবে নিয়োগ করার জন্য সুপারিশ করেন। তাই নজরুল কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার নিযুক্ত হন।[১১৪] অনেকের কাছে কোয়ার্টার মাস্টার কথাটা বিভ্রান্তিকর

---

১০৭. মুহাম্মদ লুৎফুল হক, *সৈনিক নজরুল*। (ঢাকা : প্রথমা, ২০১৩), পৃ. ৩৭-৪২

১০৮. বেঙ্গল রেজিমেন্ট কমিটির সম্পাদক শরৎকুমার মল্লিককে লেখা কমান্ডার ইন চিফের পত্র, তারিখ ২৭ জুলাই ১৯১৬, *দ্য বেঙ্গলি*। তিনি লেখেন, আমি নিশ্চিত যে আপনার কমিটি এটা জেনে সন্তুষ্ট হবে, বাঙালি ব্যাটালিয়ন মেসোপটেমিয়ার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেছে, যেখানে তারা তাদের চাকরিবিধি অনুযায়ী সামরিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার সুযোগ পাবে...তারা বাংলার যোগ্য প্রতিনিধিতে পরিণত হবে এবং তাদের সংযুক্তি ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কার্যকর বলে প্রমাণিত হবে।

১০৯. *সৈনিক নজরুল*, পৃ. ৪২

১১০. কোয়ার্টারলি ইন্ডিয়ান আর্মি লিস্ট

১১১. *দ্য বেঙ্গলি*

১১২. বাঙালি পল্টন, পৃ. ৪৯। উদ্ধৃত বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য। ৫০ টাকা বোনাসের কথা জানা যায় বেঙ্গল রেজিমেন্ট কমিটির সম্পাদক শরৎকুমার মল্লিকের চিঠি থেকে। *দ্য বেঙ্গলি*, ১৭ জানুয়ারি ১৯১৮

১১৩. কোয়ার্টারলি ইন্ডিয়ান আর্মি লিস্ট-এ 'জমাদার' পর্যন্ত সৈনিকদের নাম থাকত। ১৯১৭ থেকে ১৯২০ সালের তালিকাগুলোর প্রতিটি দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। কিন্তু কোনো তালিকাতেই মনিরুদ্দীন বলে কারও নাম নেই। সম্ভবত তিনি হাবিলদার ছিলেন। নজরুল জীবনের সঙ্গে যে রাশি রাশি শোনা কথা জড়িয়ে গেছে, মনিরুদ্দীন হাবিলদার/জমাদারও তার একটা বলে মনে হয়।

১১৪. মনে হতে পারে যে নজরুল গোটা ৪৯তম বাঙালি বাহিনীর ভান্ডারি ছিলেন। কিন্তু তা ঠিক নয়। তিনি ছিলেন ব্যাটালিয়ন কোয়ার্টারমাস্টার হাবিলদার। তার মানে বাঙালি বাহিনীতে যে দুটো ব্যাটালিয়ন ছিল, তিনি তার একটির হাবিলদার-ভান্ডারি ছিলেন।

মনে হতে পারে—বিশেষ করে কোয়ার্টার শব্দটার জন্য। এখানে কোয়ার্টার শব্দটার সঙ্গে সিকি ভাগের কোনো যোগাযোগ নেই, যোগাযোগ আছে দপ্তরের সঙ্গে। সৈন্যবাহিনীর একটা পদের নাম 'কোয়ার্টার মাস্টার'। বাংলায় যাকে বলা যেতে পারে 'ভান্ডারি'। যে কর্মকর্তা পোশাক-আশাক, জুতো, বালিশ-কম্বলসহ রসদ সরবরাহের দায়িত্ব পালন করেন, তাঁকে বলা হয় কোয়ার্টার মাস্টার। পদটি নন-কমিশন্ড পদ। এই ভান্ডারির অধীনে কাজ করেন তাঁর সহকারীরা। যেমন কোয়ার্টার মাস্টার জমিরুদ্দীন নামে কোনো জমাদার থেকে থাকলে, তাঁর অধীনে নজরুল হাবিলদার হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন এবং সে জন্য তাঁর পদের পুরো নাম ভান্ডারের কাজে নিয়োজিত হাবিলদার, কোয়ার্টার মাস্টারের অধীনস্থ হাবিলদার।

আমরা এ অধ্যায়ের শুরুতেই বলেছিলাম যে দুঃসহ দারিদ্র্য এবং অশিক্ষার বন্ধন কাটিয়ে উঠে নজরুল কী করে নজরুল হলেন, সেটা কেবল একটা বিস্ময়ের ব্যাপার নয়, সেটা প্রায় অবিশ্বাস্য ব্যাপার। যে পরিবার এবং পরিবেশে তিনি জন্মেছিলেন এবং প্রথম যৌবন পর্যন্ত যেভাবে তিনি বড় হয়ে উঠেছিলেন, তাতে শেষ পর্যন্ত তিনি যা হয়েছিলেন, তা হওয়ার কথা নয়। লেটোর দলে কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে, রুটি তৈরি করতে করতে; মাথরুন, দরিরামপুর আর শিয়ারশোল রাজ স্কুলের সংক্ষিপ্ত অধ্যয়নকালে তিনি কখন যে বাংলা ভাষার বিপুল শব্দরাজি, তাদের বিচিত্র অভিধা, দুরূহ ব্যাকরণ-বানান এবং বিচিত্র বাক্যকাঠামোগুলো আয়ত্ত করলেন; কখন ছন্দ মিলিয়ে উপমা-উৎপ্রেক্ষা-রূপকল্পসংবলিত কবিতা রচনা করা শিখলেন, কার কাছ থেকে শিখলেন, কী কী বই পড়েছিলেন; বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ছাড়া অন্য কোন কোন বিষয়ে তাঁর কৌতূহল ছিল—এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর মেলে না।

আগেই উল্লেখ করেছি যে অস্থিরমতিত্ব তাঁর চরিত্রের একটি বড় বৈশিষ্ট্য। স্থির হয়ে কোনো কিছু শেখার মতো সময় তাঁর ছিল না, সে মানসিকতাই ছিল না। সাধারণ মানুষের মতো পড়া মুখস্থ করে, বানান করে তিনি কিছুই শেখেননি। আর পাঁচজন মানুষের মাপে তাঁকে বিচার করা একেবারে অযৌক্তিক। তিনি যেমন অসাধারণ প্রতিভাবান মানুষ ছিলেন, তেমনি তিনি যা শিখতেন, তা অ-সাধারণভাবেই শিখতেন। তিনি দেখে শিখে ফেলতেন, শুনে শিখে ফেলতেন, ভাবতে ভাবতে যুক্তি দিয়ে শিখে ফেলতেন, এমনকি, অনুমান করে শিখে ফেলতেন। তাঁর জীবন ছিল দ্রুতগামী তরণীর মতো। তারই মধ্যে দুটি ঘাটে তিনি তাঁর তরণী বেঁধেছিলেন—শিয়ারশোল আর করাচিতে।

সৈন্য বিভাগে যোগদানের আগে পর্যন্ত তাঁর জীবনে একনাগাড়ে তাঁকে আড়াই বছর স্থিতিশীল হয়ে লেখাপড়া করতে দেখি শিয়ারশোল রাজ স্কুলে। তাঁর তখনকার অর্জন সম্পর্কেও আমরা খানিকটা আভাস আগেই পেয়েছি। এই স্কুলে থাকতে কোন বিষয়ে তাঁর কৌতূহল তৈরি হয়েছিল, স্কুলে তিনি কী কী পড়ালেখা করতে ভালোবাসতেন, তার বিস্তারিত বিবরণ জানা যায় না। কিন্তু করাচির সেনানিবাসে তিনি কী কী করতেন এবং কী কী পড়তেন, তার খানিকটা বিবরণ জানা যায়। ভান্ডারের দায়িত্ব পালন করতেন দিনের বেলা, রাতের বেলা করতেন লেখাপড়া। তিনি রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন, বিশেষ করে কবিতা আর গান। নজরুলের প্রথম দিকের গল্প থেকে তা সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায়। কিন্তু আর কোন কোন লেখক? গল্প লিখে তিনি তাঁর সাহিত্য জীবনের সূচনা করেছিলেন। তাঁর গল্পগুলো আত্মজৈবনিক, *গল্পগুচ্ছ*-এর সঙ্গে তাদের বিষয়বস্তু অথবা ভঙ্গির মিল নেই। তিনি তাহলে কার, কাদের গল্প পড়েছিলেন? তথ্যের অভাব আমাদের হতাশ করে।

তবে আমরা জানি, গল্প আর কবিতা লেখার জন্য করাচিতে বসে সহকর্মীদের অগোচরে হাত মকশো করেছিলেন তিনি। তাঁর সহকর্মীদের কেউ কেউ তাঁর গান-বাজনা করার কথা লিখেছেন। কেউ কেউ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তাঁর কৌতূহলের খবরও লিখেছেন। কিন্তু তিনি যে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য শিখতেন, তা কেউ বলেননি। বলেছেন তিনি নিজেই।[১১৫] তাঁর গল্প-কবিতা লেখার ঘটনাও তাঁর সহকর্মীদের চোখে পড়েনি। কারণ সাধারণ মানুষ এসব দেখলেও খেয়াল করে না। তাদের মনের ওপর এ ধরনের কাজ দাগ কাটে না। তা ছাড়া, এসব তিনি হয়তো অন্যদের দেখিয়ে করতেন না। হয়তো অ-সাধারণভাবেই করতেন।

সৈনিক জীবনের দায়িত্ব পালন আর লেফট-রাইট করার অবসরে লেখাপড়ার তৃষ্ণা মেটানোর জন্য তিনি কলকাতার কয়েকটি সাময়িক পত্রিকার গ্রাহক হয়েছিলেন। এসব পত্রিকার মধ্যে *সওগাত* (নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯১৮) আর *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা* (এপ্রিল-মে, ১৯১৮) প্রকাশিত হওয়ার পর তিনি এই পত্রিকা দুটিরও গ্রাহক হয়েছিলেন, তা জানা যায়। বস্তুত, তিনি কেবল নিজেই গ্রাহক হননি, অন্য অনেককেও গ্রাহক হওয়ার জন্য রাজি করিয়েছিলেন। *সবুজপত্র* (১৯১৪) পত্রিকায় তিনি প্রকাশের জন্য একটি ছোট কবিতা পাঠিয়েছিলেন, তা থেকে মনে হয়, তিনি এ পত্রিকার গ্রাহক হওয়াও সম্ভব। আর *প্রবাসী*তে তাঁর কবিতা প্রকাশিত হওয়ার পর হয়তো সে পত্রিকারও গ্রাহক হয়েছিলেন। ১৯২০ সালের গোড়ার দিকে তাঁর দুটি গল্প প্রকাশিত হয় *নূর* পত্রিকায়। এ থেকে মনে হয়, এ পত্রিকারও তিনি গ্রাহক হয়েছিলেন অথবা এর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। *ভারতবর্ষ* (১৯১৩) পত্রিকাও তিনি করাচিতে পেতেন বলে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন। এ পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় একটি করে গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হতো। কাজেই এ পত্রিকার প্রতি তাঁর আলাদা আগ্রহ থাকা সম্ভব। কেবল তা-ই নয়, ১৯১৯ সালের শেষ দিকে 'তুর্ক রমণীর ঘোমটা খোলা' নামে প্রতিবাদ করে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, সেই মূল প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল *সওগাত*-এ।

পত্রপত্রিকার প্রতি তাঁর এই যে আকর্ষণ এটা করাচি যাওয়ার পরে হঠাৎ তৈরি হয়েছিল, এমনটা মনে হয় না। ধারণা করি, শিয়ারশোল স্কুলে যে পাঁচটি টাকা পেতেন ছাত্রবৃত্তি হিসেবে, তা দিয়েও তিনি পত্রপত্রিকা কিনতেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা এবং গানের বইও কি কিনতেন না? তবে শিয়ারশোলে গুরুত্বপূর্ণ মোড় নিলেও তাঁর জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রস্তুতিপর্ব হলো তাঁর সৈনিক জীবন। এই সৈন্যবাহিনীতে থাকার সময়ে তিনি রুটিনমাফিক এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপন করতে শিখেছিলেন। বড়দের সঙ্গে একত্রে বাস করতে এবং ওপরওয়ালার অধীনে কাজ করতেও শিখেছিলেন। তা ছাড়া, তিনি এ সময়ে আত্মবিশ্বাস অর্জন করেন। চুরুলিয়া-আসানসোল-রানিগঞ্জের দারিদ্র্য ও হীনম্মন্যতা থেকে এ সময়ে তিনি যোজন যোজন দূরে সরে আসেন। হাবিলদার পদে উন্নীত হওয়ার পর তিনি তা নিয়ে রীতিমতো গর্ব বোধ করেন।

কেবল তা-ই নয়, নিজেকে তিনি শনাক্ত করেন একজন মুক্ত মানুষ হিসেবে। 'একজন মুক্ত মানুষ' বললে

১১৫. 'মুখবন্ধ' রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ (১৯৩১)



বিষ্ণুপুরে দলমাদল কামানের গায়ে হেলান দিয়ে কাজী নজরুল ইসলাম

সবটুকু বলা হয় না। বস্তুত, তিনি বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে শেখেন। একটু বেশিই শেখেন। ফলে তাঁর মধ্যে নিজেকে জাহির করার মনোভাব লক্ষ করা যায়। ('বাঙাল' মাইকেলও কলকাতার স্কুলে ভর্তি হয়ে পিতার সম্পত্তি নিয়ে নিজেকে জাহির করতে শিখেছিলেন) নজরুল বিশেষ করে তাঁর 'হাবিলদার' পরিচয়টাকে যেভাবে তুলে ধরেন, তা থেকে এ প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি হাবিলদার হয়েছিলেন ১৯১৯ সালে জুন-জুলাই মাসের দিকে।[১১৬] যুদ্ধের পরে কলকাতায় তিনি এসেছিলেন উর্দি-পরা একজন গর্বিত হাবিলদার হিসেবে। কবি হওয়ার চেয়েও তখন তিনি তাঁর হাবিলদার পরিচয় নিয়ে বেশি গর্ববোধ করেছেন। 'হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম' স্বাক্ষর তাঁর এই পরিচয় বহন করে।[১১৭]

তাঁর এই নিজেকে জাহির করার মনোভাব পরবর্তীকালে নানা রূপে প্রকাশ পেয়েছিল আচার-ব্যবহার, জীবনযাত্রা, বেশভূষায়। তিনি ছিলেন, ইংরেজিতে যাকে বলে 'লাউড'। লাল কাপড়-চোপড় পরায়, লাল কালি দিয়ে লেখায়, গলা ফাটানো হাসিতে, কাউকে পরোয়া না করার আচরণে তাঁর এই মনোভাব প্রকাশ পায়। কিন্তু আমরা পরে তা নিয়ে আলোচনা করব।

উর্দি পরলেও, করাচিতে হাবিলদার নজরুল সামরিক প্রশিক্ষণ সামান্যই লাভ করেছিলেন। সুতরাং ১৯২০ সালের মার্চ মাসে ফর্টি নাইন্থ্ বেঙ্গলিজ ভেঙে যাওয়ার পর সেখান থেকে কোনো বিশেষ মূল্যবান সামরিক কৌশল নিয়ে তিনি কলকাতায় ফিরতে পারেননি। আপাতদৃষ্টিতে তিনি ফিরেছিলেন প্রায় শূন্য হাতে। তাঁর সঙ্গে ছিল তাঁর লেপ, তোশক ও পোশাক-পরিচ্ছদ। সৈনিক পোশাক তো ছিলই, আর ছিল শিরওয়ানি (আচকান), ট্রাউজার্স ও কালো উঁচু টুপি...। একটি দুরবিনও (বাইনোকুলার) ছিল। কবিতার খাতা, গল্পের খাতা, পুঁথি-পুস্তক, মাসিক পত্রিকা, রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি ইত্যাদিও ছিল। পুস্তকগুলোর মধ্যে ছিল ইরানের মহাকবি হাফিজের দিওয়ানের একখানা খুব বড় সংস্করণ। তাতে মূল পার্সির প্রতি ছত্রের নিচে উর্দু তর্জমা দেওয়া ছিল।... *ব্যথার দান* পুস্তকের উৎসর্গে বর্ণিত মাথার কাঁটা...।[১১৮]

কিন্তু এই তুচ্ছ মালপত্রই সাক্ষ্য দেয় যে সেখানে থাকার সময়ে তিনি লেখাপড়া শিখতেন, সাহিত্যচর্চা করতেন আর ফারসি ভাষায় তালিম নিতেন। বাইনোকুলার দিয়ে কী দেখতেন, জানা যায় না। তবে জানা যায়, তাঁর মর্মে তিনি সযতনে পুষে রেখেছিলেন সেই তরুণীর স্মৃতি, যার মাথার কাঁটা নিয়ে গিয়েছিলেন সুদূর শিয়ারশোল থেকে।[১১৯] এ তাঁর করাচির জীবনের আভাসমাত্র।

কিন্তু হাত শূন্য হলেও, তাঁর অন্তর্জীবন পূর্ণ করে যে অমূল্য সম্পদ তিনি নিয়ে এসেছিলেন, তা-ই দক্ষিণা হিসেবে প্রদান করে তিনি প্রবেশ করেন বাংলা সাহিত্য-সংগীতের আসরে। স্থানগতভাবে চুরুলিয়ার লেটো গানের আসর থেকে সে আসরের দূরত্ব মাত্র দুই শ কিলোমিটার হলেও, চারিত্রিক দিক দিয়ে তাদের পার্থক্য আকাশ আর পাতালের মতো।

তাঁর অস্থির ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনে সাময়িকভাবে স্থিরতা ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাঁর সৈনিক জীবনে। এই শৃঙ্খলাপূর্ণ দুর্ভাবনাহীন সচ্ছল শান্তির সময়ে সুস্থির হয়ে তিনি কেবল গল্প-কবিতা লেখেননি, গানও শিখেছিলেন বেশ ভালো করে। তিনি রবীন্দ্রসংগীত আগে জানতেন কি না, তাঁর শিক্ষক সতীশচন্দ্র কাঞ্জিলালের কাছ থেকে শিখেছিলেন কি না, জানি না। কিন্তু তিনি করাচি থেকে যেসব জিনিস নিয়ে এসেছিলেন, তার মধ্যে রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি পাওয়া গিয়েছিল। এ থেকে বোঝা যায় যে করাচিতে তিনি স্বরলিপি দেখে রবীন্দ্রসংগীত গাইতে শিখেছিলেন।[১২০] শিয়ারশোলে তিনি গানের প্রাথমিক যে পাঠ নিয়েছিলেন, সেই বিদ্যাকেই স্বরলিপির সাহায্যে নিজের চেষ্টায় এগিয়ে নিয়ে যান। বিনোদনের জন্য তাঁদের বাহিনীকে কয়েকটি বাদ্যযন্ত্র দেওয়া হয়েছিল—অর্গান, হারমোনিয়াম, ব্যাঞ্জো, ক্লারিওনেট, বেহালা, তবলা

---

১১৬. *সওগাত* পত্রিকায় ১৯১৯-এর মে মাস থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত নজরুলের যে দুটি গল্প ও কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল, তার নিচে তাঁর ছিল কেবল 'কাজী নজরুল ইসলাম', কিন্তু সেপ্টেম্বর-অক্টোবর থেকে তাঁর নাম ছাপা হতে থাকে 'হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম'। এ পরিবর্তন তাঁর পদোন্নতির স্বাক্ষর বহন করে। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় তাঁর 'মুক্তি' কবিতা প্রকাশিত হয় ১৯১৯ সালের জুলাই-আগস্ট (শ্রাবণ) সংখ্যায়। তাতেই প্রথমবারের মতো তাঁর নামের আগে হাবিলদার পদবি ছাপা হয়। এবং কবিতা প্রকাশিত হওয়ার পর ১৯ আগস্ট তারিখে পত্রিকার সম্পাদককে ধন্যবাদ জানিয়ে একটি চিঠি লেখেন। তাতে তিনি নিজের পরিচয় দেন হাবিলদার হিসেবে। *নজরুলের পত্রাবলি* (ঢাকা : নজরুল ইনস্টিটিউট, তৃতীয় সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৬), পৃ. ৪৮

১১৭. পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে লেখা চিরকুটের নিচে তাঁর স্বাক্ষর দ্রষ্টব্য। *চলমান জীবন*, পৃ. ২০৩

১১৮. মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, পৃ. ১৭

১১৯. মিউজিয়ামে রক্ষিত মূল্যবান বস্তুর মতো নজরুল এই কাঁটাটি রক্ষা করে আসছিলেন। ওই, পৃ. ১৭

১২০. করাচিতে লেখা তাঁর গল্প এবং অন্যান্য রচনায় বহু রবীন্দ্রসংগীতের উদ্ধৃতি আছে।

ইত্যাদি। এসব যন্ত্র নিয়ে বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কমবেশি গানজানা জওয়ানেরা আসর জমাতেন রাতের বেলায়, অনেক সময়েই নজরুল যে ঘরে থাকতেন, তার সামনে। একেক সময়ে শ্রোতা ও গায়কেরা গানে মত্ত হয়ে উঠতেন এবং নিজেদের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতেন 'দে গোরুর গা ধুইয়ে'র মতো অর্থহীন উল্লাসধ্বনি করে।[১২১] এই আসর জমানোর ব্যাপারে যাঁরা অত্যুৎসাহী, নজরুল তাঁদের একজন। কেবল উৎসাহ দেখানো নয়, এই আসরের একজন প্রধান অংশগ্রহণকারীও ছিলেন তিনি। কখনো গান করেন। কখনো বাদ্যযন্ত্র বাজান। লেটোর দলে থাকতে তিনি ঢোলক আর বাঁশি বাজাতে শিখেছিলেন। সে শিক্ষা তো তাঁর ছিলই। তদুপরি, বাহিনীতে কয়েকজন দক্ষ বাদক ছিলেন, তাঁদের কাছ থেকে তিনি অন্য বাদ্যযন্ত্রও কমবেশি বাজাতে শেখেন। যেমন তিনি নিত্যানন্দ দে-এর কাছ থেকে শিখেছিলেন অর্গান বাজানো।[১২২]

কিন্তু গান-বাজনা শিখে তা নিয়েই তিনি তৃপ্ত থাকতে পারেননি। প্রবল উৎসাহ নিয়ে সহকর্মীদের গান শোনাতেন তিনি। আত্মপ্রকাশের জন্য তিনি অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। গান তিনি ছেলেবেলায় লেটোর দলের সদস্য হিসেবে গ্রামে-গঞ্জে অনেক শুনিয়েছিলেন। কিন্তু এ শ্রোতারা গ্রামের সাধারণ শ্রোতা নয়, এ গানও লেটোর দলের অমার্জিত লোকগীতি নয়। রবীন্দ্রসংগীত তিনি শিখেছিলেন এবং তাঁর শ্রোতাদের শোনাতেন। তবে তিনি গজল গাইতেন—তাঁর সহকর্মীরা এ কথা বলেননি। গজল গাইতেন কি না, আমরাও তা কেবল অনুমান করতে পারি। নয়তো পরবর্তীকালে তিনি বাংলা গানের আসরে যে গজল প্রবর্তন করেছিলেন, তা তিনি করাচি থেকেই নিয়ে এসেছিলেন। তা ছাড়া, এককালের লেটোর গানের অশিক্ষিত পটুত্বের বদলে তিনি কণ্ঠে নিয়ে এসেছিলেন অনুশীলনের ছাপ, উচ্চারণে নাগরিকতা এবং পরিবেশনে আত্মবিশ্বাস।

গানের থেকেও তাঁর অর্জন বেশি ছিল সম্ভবত সাহিত্যে। সাহিত্য পাঠই নয়, সাহিত্য রচনায় তাঁর হাতেখড়ি হয় এ সময়ে। কিছুদিন অনুশীলন করার পর তিনি তাঁর রচিত গল্প-কবিতা প্রকাশের জন্য পাঠাতে আরম্ভ করেন সাময়িক পত্রিকায়। ঠিক কবে থেকে লেখা পাঠাতে শুরু করেন, তা জানা যায় না। কিন্তু ১৯১৮ সালে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে *সওগাত* পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই তিনি তাঁর সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের কাছে লেখা পাঠাতে আরম্ভ করেন। এসব লেখা প্রকাশের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়নি। কারণ দেখিয়ে পত্রিকার সম্পাদক লিখেছেন :

> প্রথম দিকে নজরুল সওগাতে যেসব লেখা পাঠাতেন, সেগুলোর অধিকাংশই ছিলো উচ্ছ্বাসপূর্ণ। যেগুলিতে গ্রন্থনা-নৈপুণ্যের পরিচয় যেমন ছিলো না—তেমনি শিল্পগত গুণাবলীরও অভাব ছিল। লেখাগুলি এই কারণে প্রকাশ করা যায়নি। কিন্তু তাতে নজরুলকে নিরুৎসাহ বা হতোদ্যম হতে দেখিনি। তিনি একের পর এক লেখা পাঠিয়ে যেতেন। সেসব লেখা তিনি পাঠাতেন 'সার্ভিস' বা সরকারী ডাকটিকিটে—ডাক খরচা লাগতো না তাঁর। নতুন লেখকদের কাঁচা লেখার বেলায় যা হয়—নজরুলের প্রথম দিকের লেখাগুলিকেও সেই পরিণতি বরণ করে নিতে হতো।[১২৩]

তাঁর প্রথম গল্প 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' এই *সওগাত* পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয় ১৯১৯ সালের মে মাসে (জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬)।

দ্বিতীয় গল্প 'স্বামীহারা'ও *সওগাত*-এ প্রকাশিত হয় তিন মাস পরে—ভাদ্র সংখ্যায়। গল্পের বেলায় যেমন, কবিতার বেলায়ও তেমনি তাঁকে অনুশীলন করে করেই হাত পাকাতে হয়েছে—অন্তত *সওগাত* সম্পাদকের সাক্ষ্য তা-ই বলে।

> তাঁর অনেকগুলি কবিতা ডাকে এসেছিলো কিন্তু কোনটিই মনোনীত হয়নি। হয় তো সেজন্যে তাঁর মনেও এতোদিনে আক্ষেপ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল। সওগাতে কবিতা প্রকাশের জন্যে তিনি তাই অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। সেই আক্ষেপের সুরটি দেখতে পেলাম তাঁর পাঠানো 'কবিতা সমাধি' নামক একটি ব্যঙ্গ কবিতায়। কবিতাটি ডাকে এলো—সঙ্গে ছোট্ট এক চিঠি। নজরুল লিখেছেন, "আজ পর্যন্ত এতোগুলো কবিতা পাঠিয়েছি, তার একটিও সওগাতে ছাপা হলো না। আমার এই শেষ কবিতা 'কবিতা সমাধি' ছেপে দিবেন। আমি আর সওগাতে কবিতা পাঠাবো না।[১২৪]

এ কবিতায় যে ব্যঙ্গরস ছিল, তা বিবেচনা করে সম্পাদক কবিতাটি প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন এবং এটি প্রকাশিত হয় 'স্বামীহারা'র পরের সংখ্যায়, আশ্বিন মাসে। *সওগাত* সম্পাদক লিখেছেন যে এরপর কবি গল্প, প্রবন্ধ এবং গান পাঠিয়েছেন *সওগাত*-এ, কিন্তু কোনো কবিতা পাঠাননি। নজরুলের প্রথম প্রবন্ধ 'তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা' প্রকাশিত হয় *সওগাত*-এর কার্তিক সংখ্যায়। তাঁর প্রথম গান—'উদ্বোধন' প্রকাশিত হয় পরের বছর বৈশাখ সংখ্যায়, কবি তত দিনে কলকাতায়।

একবার প্রথম প্রকাশের সংকোচ এবং অনিশ্চয়তা কেটে যাওয়ার পর তিনি অধিকতর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে *সওগাত, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, নূর* এবং *সবুজপত্র*-এ তাঁর গল্প-কবিতা পাঠাতে থাকেন। আরও কোনো পত্রিকায় পাঠিয়েছিলেন কি না, তা জানা যায় না। তাঁর যেসব গল্প-কবিতা ১৯১৯ সালের মে মাস থেকে ১৯২০ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল, তা থেকে দেখা যায় যে তিনি এ সময়ে গল্পই লিখতেন বেশি। কবিতা কম। অথবা কবিতার থেকে গল্পেই হাত পাকিয়েছিলেন তুলনামূলকভাবে বেশি। কবিতায় তখনো তিনি দক্ষতা অর্জন করতে পারেননি। আলোচ্য সময়ে তাঁর ছটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল তিনটি, তার একটি আবার হাফিজের অনুবাদ আর হাসির কবিতা—'কবিতা সমাধি'। কেবল সংখ্যার বিচারে নয়, মানের বিচারেও তাঁর এ সময়কার কবিতা গল্পের তুলনায় দুর্বল।

'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' থেকে

---

১২১. প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা নজরুলের সহকারী জমাদার শম্ভু রায়ের চিঠি, ২৪ জুন ১৯৫৭, পৃ. ৬৫। শম্ভু রায়ের চিঠিতে অতিরঞ্জনের ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট। যেমন তিনি সৈন্যসংখ্যা লিখেছেন সাত হাজার, যেখানে সত্যিকার সংখ্যা ছিল দুই হাজারের থেকে একটু বেশি। রেজিমেন্ট অথবা ব্রিগেড কেন, একটা ডিভিশনেও অনেক সময় সাত হাজার সৈন্য থাকে না। বইপত্রের কথাও তিনি বাড়িয়ে বলেছেন বলে মনে হয়। নয়তো লিখতেন না 'রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত পুস্তকই ও শরৎচন্দ্রের সব লেখাই কাজীর কাছে ছিল।' কারণ রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব বই এবং শরৎচন্দ্রের সব বই তখনকার ছাপায় থাকতে হলে সেটা ছোটখাট একটা গ্রন্থাগারে পরিণত হতে হতো। নজরুল কি ওই পরিমাণ বই এবং পত্রপত্রিকা নিয়ে করাচি থেকে এসেছিলেন? শম্ভু রায়ের দেওয়া পত্রপত্রিকার তালিকাও অতিরঞ্জিত বলে মনে হয়।

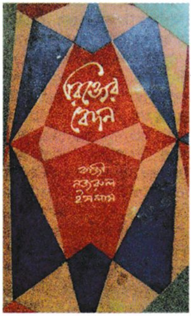
১২২. ওই। খুব একটা বিশ্বাস্য না হলেও শম্ভু রায় লিখেছেন যে বিনোদনের জন্য দেওয়া অর্গানটি নজরুলের ঘরেই থাকত।

১২৩. মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন, *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ* (ঢাকা : সওগাত কার্যালয়, ২০০৬) পৃ. ৬২০

১২৪. ওই

আরম্ভ করে তাঁর এই সময়কার গল্পগুলো কমবেশি সবই আত্মজৈবনিক। নিজের জীবনে যা হয়েছিল, যা হতে পারত অথবা যার স্বপ্ন দেখতেন, সেই কাহিনিগুলোই এই রোমান্টিক গল্প কটিতে উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষায় বর্ণনা করেছেন। এই উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভঙ্গি তাঁর পরবর্তী গল্প-উপন্যাসেও লক্ষ করা যায়। এমনকি, সেসব পরবর্তী গল্প-কাহিনিতেও তাঁর নিজের জীবনের, নিজের স্বপ্নের ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। এসব প্রথম দিকের গল্প-কবিতা তাঁর নিজের বিকাশলাভের প্রসঙ্গে যত গুরুত্বপূর্ণ, সাহিত্যের মাপে তত গুরুত্বপূর্ণ নয়।

করাচিতে তিনি কেবল বাংলা সাহিত্যের চর্চা করেননি, ভাষা শিক্ষায়ও মন দিয়েছিলেন। আমরা আগেই দেখেছি যে শিয়ারশোল স্কুলে তাঁর শিক্ষক হাফিজ নুরন্নবীর কাছে ফারসি ভাষায় তাঁর হাতেখড়ি হয়েছিল। কিন্তু তিনি ফারসি তখন বেশি শেখেননি। প্রকৃত পক্ষে, এই শিক্ষকের সত্যিকার অবদান যেখানে, তা হলো তিনি তাঁর ছাত্রের মনে ফারসি ভাষা সম্পর্কে আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং ধ্রুপদি ভাষা হিসেবে সংস্কৃত ছেড়ে দিয়ে ফারসি শিখতে আরম্ভ করেন। তাই নজরুল যখন তাঁর বাহিনীতে এক পাঞ্জাবি মৌলবিকে পান, তখন তাঁর কাছ থেকে ভালো করে ফারসি শেখেন। এই শিক্ষা আজীবন তাঁর সঙ্গী হয়েছিল। তা ছাড়া, তিনি কেবল ভাষা শেখেননি, ফারসি সাহিত্যও অধ্যয়ন করেছিলেন তিনি। মনে হয়, তিনি খুব ভালো করে 'দিওয়ান-ই-হাফিজ' অধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁর *রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ* অনুবাদের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন যে বাহিনীতে থাকার সময়ে কবি হাফিজের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়।[১২৫] (হাফিজ নুরুন্নবীর কথা তিনি বলেননি) আগেই লক্ষ করেছি, তিনি যখন কলকাতায় ফিরে আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে ছিল 'ইরানের মহাকবি হাফিজের দিওয়ানের একখানা খুব বড় সংস্করণ।'[১২৬] ফারসিতে লেখা এই গ্রন্থের প্রতিটি পঙ্‌ক্তির নিচে উর্দু অনুবাদ থাকলেও নজরুল দাবি করেছেন যে তিনি অনুবাদ করেছিলেন মূল ফারসি থেকে।[১২৭]



নজরুলের আত্মজৈবনিক পত্রোপন্যাস *রিক্তের বেদন*

দিনের বেলা কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ আর রসদ বিতরণের কাজ, রাতের বেলা গানের আসরে মেতে ওঠা, অবসর পেলেই গল্প-কবিতা রচনা করা—আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, এভাবেই তাঁর সময় কাটছিল। কিন্তু খতিয়ে দেখলে মনে হবে—কেবল এভাবেই নয়। তিনি যুদ্ধের খোঁজখবরও নিতেন। স্বদেশের রাজনীতি সম্পর্কে কতটা সচেতন হয়েছিলেন, জানি না; কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে হয়েছিলেন। বিশেষ করে আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতা আন্দোলন, রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব আর তুরস্কের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর কৌতূহল জেগে উঠেছিল। স্বদেশের রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা বিষয়ে প্রশ্ন তোলার কারণ ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল তারিখে করাচি থেকে ৬৬৯ মাইল দূরে জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস গণহত্যার ঘটনা যখন ঘটে, যাতে সৈন্যদের গুলিতে হাজার খানেক (সরকারি হিসাব অনুযায়ী ৩৭৯ জন) লোক হতাহত হয়েছিলেন, তখন তিনি এ বিষয়ে আদৌ কোনো আলোচনা করেছিলেন বলে তাঁর সহকর্মীরা কেউ লেখেননি। অনুগত সৈনিক হিসেবেই কাজ করেছিলেন তিনি। তবে যুদ্ধ থেকে ফিরে তিনি মূল ঘটনার আড়াই বছর পরে *নবযুগ* পত্রিকায় এই গণহত্যা ঘটেছিল যার আদেশে, সেই সেনাপতি ডায়ারের তীব্র সমালোচনা করে 'ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে তিনি বরং অনেক সচেতন ছিলেন। মেসোপটেমিয়ায় কী হচ্ছে, পশ্চিম রণাঙ্গনে—ফ্রান্সে কী হচ্ছে—এসব খবর নিতেন তিনি। কার কাছে অথবা কোন সূত্রের মারফত এসব খবর তিনি সংগ্রহ করতেন, তার হদিস তিনি দেননি, তাঁর কোনো সহকর্মীও দেননি। তখনকার পত্রপত্রিকায়, বিশেষ করে কলকাতা এবং দিল্লির ইংরেজি পত্রিকায় যুদ্ধের খবর নিয়মিত প্রকাশিত হতো। কিন্তু এ ধরনের পত্রিকা কড়া সেন্সরের প্রবেশপথ অতিক্রম করে সৈন্যদের হাতে পৌঁছত না। কাজেই নজরুল কোথায় এসব খবর পেতেন, তা বিস্ময়ের ব্যাপার।

তিনি যখন বাহিনীতে যোগদানের জন্য যাচ্ছিলেন, মোটামুটি সেই সময়েই (অক্টোবর ১৯১৭) রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়। বিপ্লবমাত্রই তাঁর রোমান্টিক মনকে আকর্ষণ করত। সুতরাং এটা অবাক করার বিষয় নয় যে তিনি রাশিয়ার বিপ্লবের খবর পেয়েছিলেন এবং পেয়ে আশায়, আনন্দে, উল্লাসে দারুণ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। বিপ্লব হয়ে যাওয়ার কয়েক মাস পরে—১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের দিকে এই বিপ্লবের খবর তাঁর কাছে পৌঁছে যায়। ফেব্রুয়ারি মনে করার কারণ, তাঁর একজন ঊর্ধ্বতন সহকর্মী জমাদার শম্ভুনাথ রায় বলেছেন যে শীতের শেষ দিকে এক রাতে।[১২৮]

শোষিতের বিজয় এবং শাসকের পরাজয় দেখে তাঁর প্রবল আবেগ তিনি চেপে রাখতে পারছিলেন না অথচ প্রকাশ্যেও বলতে পারছিলেন না। কিন্তু তিনি এ খবরটা ভাগ করে নিতে চেয়েছিলেন তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে। সে জন্য, একদিন সন্ধ্যেবেলায় তিনি খাবার নিমন্ত্রণ করলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের। তিনি সেদিন খুব খুশি। উচ্ছ্বসিত। গান-বাজনা, খাওয়া-দাওয়ার পর রুশ বিপ্লবের খবর পরিবেশন করলেন তিনি। যাতে কেউ অবিশ্বাস না করে, তার জন্য পত্রিকা থেকে দেখালেন খবরটা। এ সম্পর্কে নজরুলের সহকর্মী জমাদার শম্ভু রায় একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু

১২৫. মুখবন্ধ, রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ, *নজরুল রচনাবলী* ২ (প্রথম পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৬), পৃ. ১৫
১২৬. মুজফ্‌ফর আহমদ, পৃ. ১৭
১২৭. মুখবন্ধ, রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ, পৃ. ১৫
১২৮. উদ্ধৃত, *কাজী নজরুল ইসলাম : জন্মশতবর্ষ* স্মারকগ্রন্থ (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০০), পৃ. ৬৬৪। আগেই বলেছি, শম্ভু রায়ের বক্তব্য ছিল অতিরঞ্জিত। নজরুল কখন বলশেভিক বিপ্লবের খবর পেয়েছিলেন, সে সম্পর্কে তাঁর উক্তি বিভ্রান্তিকর। কারণ তিনি প্রথমে বলেছেন বছরের শেষ দিকে। তারপর বলেছেন শীতের শেষ দিকে। বছরের শেষ দিকে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে শীত কমে আসে না, বাড়তে থাকে। শীত কমে আসে ফেব্রুয়ারি মাসের দিকে।

কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা দিয়ে চিঠি লেখেন ১৯৫৭ সালের ২৪ জুন :

অন্যান্য দিনের চেয়ে নজরুলের চোখেমুখে একটা অন্যরকম জ্যোতি খেলে বেড়াচ্ছিল। ... নজরুল সেই দিন যেসব গান গাইলেন ও প্রবন্ধ পড়লেন তা থেকেই আমরা জানতে পারলাম যে রাশিয়ার জনগণ জারের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছে। গান বাজনা প্রবন্ধ পাঠের পর রুশ বিপ্লব সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং লাল ফৌজের দেশপ্রেম নিয়ে নজরুল খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। এবং ঠিক মনে নেই, সে গোপনে আমাদের একটি পত্রিকা দেখায়। ঐ পত্রিকাতে আমরাও বিশদভাবে সংবাদটি দেখে উল্লসিত হয়ে উঠি। সেদিন সারা রাতই প্রায় হৈ হুল্লোড়ে আমাদের কেটে গিয়েছিল।[১২৯]

শম্ভু রায়ের এ বর্ণনাও অতিরঞ্জন-বর্জিত নয়। নয়তো নজরুল তখন কোথায় এমন গান পাবেন, যা থেকে রুশ বিপ্লবের কথা বোঝা যাবে?

রুশ বিপ্লবের প্রতি নজরুলের যে প্রবল উৎসাহের কথা জানা যায়, ১৯২০-এর দশকের শেষ দিক পর্যন্ত তা বজায় ছিল, যদিও তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হননি কখনো। ১৯১৯ সালে লেখা তাঁর 'ব্যথার দান' গল্পে তিনি জারবিরোধী বলশেভিক বাহিনীর কথা উল্লেখ করেন। এই গল্পের দুটি চরিত্র—দারা এবং সয়ফুল মুলক—তুর্কিস্তানে গিয়ে লাল ফৌজে যোগ দেয়। গল্পটি যখন *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায়* প্রকাশের জন্য আসে, তখন মুজফ্ফর আহ্মদ 'লাল ফৌজ' কথাটা কেটে বাদ দেন—পাছে পত্রিকাটি সেন্সরের কোপে পড়ে। তিনি লাল ফৌজকে পরিবর্তন করে তাকে 'মুক্তিসেবক সৈন্যদের দল' করে দিয়েছিলেন।[১৩০]

আইরিশ স্বাধীনতার জন্য লড়াই অথবা তুরস্কের স্বাধীনতার যুদ্ধ সম্পর্কে তিনি কখন অভিহিত হন, ঠিক জানা যায় না। আয়ারল্যান্ড ব্রিটেনের শাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বারবার ছোট-বড় বিদ্রোহ করেছে। নজরুল যখন শিয়ারশোল স্কুলে, তখন ১৯১৬ সালের এপ্রিল মাসে প্যাট্রিক পিয়ার্সের নেতৃত্বে শিন ফেইনের যে বিদ্রোহ দেখা দেয়, তাতে সাড়ে বারো শ বিদ্রোহী যোগ দেয়। এই বিদ্রোহের নাম 'ইস্টার রাইজিং'। মাত্র ছয় দিনের এই যুদ্ধে সাড়ে ছয় শর বেশি লোক নিহত হন। তা ছাড়া, বিদ্রোহ দমনের পর ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকার আরও ষোলোজনের মৃত্যুদণ্ড দেয়। এই বিদ্রোহের কথা নজরুল জেনেছিলেন কি না, জানা যায় না। কিন্তু ১৯১৯ সালে আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি অর্থাৎ আইআরএর নেতৃত্বে পার্লামেন্ট বর্জনের মাধ্যমে যে স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ হয়, নজরুলের পক্ষে তা জানা অসম্ভব নয়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে আইরিশ আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য ছিল। তাই ১৯২২ সালের শেষ ভাগে *ধূমকেতু* পত্রিকায় তিনি আঠারো শতকের আইরিশ জাতীয়তাবাদী নেতা রবার্ট এমেটকে নিয়ে একটি ধারাবাহিক রচনা প্রকাশ করেছিলেন।[১৩১] তা ছাড়া, এ পত্রিকার বৈদেশিক সংবাদ বিভাগে আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনের টুকরো খবর প্রকাশিত হতো।

বস্তুত, বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে কোথাও কোনো সংগ্রাম লক্ষ করলেই, নজরুল তাকে সমর্থন করেছেন। তুরস্কের জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতাসংগ্রাম এমনি একটি বিষয়। একসময়ে পূর্ব, দক্ষিণ ইউরোপসহ ভূমধ্যসাগরের উভয় তীরের বিস্তীর্ণ এলাকা তুরস্ক তথা অটোম্যান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে সেই মুসলিমশাসিত সাম্রাজ্য কার্যত প্রায় লোপ পায়। তা ছাড়া, এই সাম্রাজ্যকে ভেঙে ফেলার জন্য পশ্চিম ইউরোপের প্রধান দেশগুলো ছিল অঙ্গীকারবদ্ধ। তাদের সেই সুযোগ আসে প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে। রাশিয়া ছাড়া মিত্রশক্তির অপর দুই শরিক—ব্রিটেন ও ফ্রান্স—তুরস্কের দুই প্রতিবেশী ইতালি এবং গ্রিসকে সঙ্গে নিয়ে অটোমান সাম্রাজ্যকে বলতে গেলে পুরোটাই গ্রাস করে। তুরস্ক নামে যেটুকু বাকি ছিল, তার পশ্চিম দিক দখল করেছিল গ্রিস, পুব দিক ছিল আর্মেনিয়ার নিয়ন্ত্রণে এবং দক্ষিণ দিক ফ্রান্সের অধীনে। এ ছাড়া, দেশের অভ্যন্তরভাগ এবং রাজধানী ইস্তাম্বুল কার্যত দখল করে নেয় ব্রিটেন। অটোমান সাম্রাজের প্রধান ছিলেন 'সুলতান'। তাঁর নামে, দেশের সত্যিকার শাসন চালাত ব্রিটেন। সুলতান নিজে ছিলেন ক্ষমতাহীন ও নিষ্ক্রিয়। (এই সুলতানকে ভারতবর্ষের মুসলমানরা 'খলিফা' বলে মান্য করত এবং তাঁর পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য আলি ভ্রাতৃদ্বয় একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করেছিলেন।)

দখলদারদের হাত থেকে দেশকে বাঁচানোর উদ্দেশে তুরস্কে এ সময়ে একটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল মুস্তাফা কামাল পাশার নেতৃত্বে। যুদ্ধে থাকার সময়েই নজরুল তুরস্কের বিষয়ে সচেতন হয়েছিলেন। তুরস্কের প্রতি এই দরদের জন্যই ১৯১৯ সালের মাঝামঝি 'তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য *সওগাত* পত্রিকায় পাঠান। এ প্রবন্ধটি ছিল *ভারতবর্ষ* পত্রিকায় প্রকাশিত ওই নামের একটি প্রবন্ধের প্রতিবাদ। মূল প্রবন্ধ আবার এক মার্কিন লেখকের মন্তব্যের ওপর ভিত্তি করে লেখা। মূল প্রবন্ধে যা বলা হয়েছিল, তা হলো: যেমনটা শোনা যায়, তুর্কি নারীরা অতটা সুন্দরী নয়। তুর্কি নারীদের না দেখলেও, নজরুল তার প্রতিবাদ করেন।[১৩২] এ প্রবন্ধে রাজনীতি-সচেতনতা নেই, যা আছে ১৯২১-২২ সালের কবিতা এবং অন্য রচনায়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, সৈন্যবাহিনীতে থাকার সময়েই তিনি তুরস্ক সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন।

মোট কথা, রাশিয়ার বিপ্লব, আয়ারল্যান্ড এবং মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে করাচিতে থাকার সময়েই তিনি সচেতন এবং কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন।

বস্তুত, ১৯১৭ সালের দ্বিতীয় ভাগে শিয়ারশোল স্কুল থেকে সৈন্যবাহিনীতে হুজুগে মেতে যোগ দিয়েছিলেন যে কিশোর নজরুল, আর ১৯২০ সালের মার্চ মাসে করাচি থেকে ফিরে আসেন যে যুবক নজরুল, তাঁরা একই মানুষ হলেও লেখাপড়ায়, জ্ঞানবুদ্ধি, চিন্তাচেতনা এবং স্বরূপের দিক দিয়ে ভিন্ন মানুষ। প্রথম নজরুল সাধারণ লেখাপড়া-জানা এক চঞ্চল এবং কৌতূহলী তরুণ; দ্বিতীয়জন ভাষা-সাহিত্য-সংগীতে যথেষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন, দেশ-বিদেশ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, মৌলিক দৃষ্টিতে দেখতে পারেন এমন পরিণত বুদ্ধির একজন যুবক। সে দিক দিয়ে দেখলে করাচিতে তাঁর অর্জন সীমাহীন। নজরুল কী করে নজরুল হলেন, সেই রহস্যের চাবিকাঠি করাচির মাটিতে পোঁতা।

---

১২৯. শম্ভু রায়ের পত্র, ওই, পৃ. ৬৬৪

১৩০. মুজফ্ফর আহ্মদ, পৃ. ১৫, ১০১। 'ব্যথার দান' গল্পে যে দেশপ্রেম প্রকাশিত হয়েছিল, তার জন্য পরবর্তী সময়ে এটা প্রেস ভয়ে এ গল্পটা ছাপতে অস্বীকার করেছিল। পৃ. ১০৩। 'লালফৌজ' কথাটা ছাড়াও এ গল্পটি উল্লেখযোগ্য এর দেশপ্রেম এবং আন্তর্জাতিকতার জন্য।

১৩১. 'আইরিশ বিদ্রোহী রবার্ট এমেট' নামে এই লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল কহ্লন মিশ্রের কল্পিত নামে।

১৩২. প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় আশ্বিন সংখ্যা (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯১৯) *সওগাত*-এ এবং এতে লেখকের নামের আগে 'হাবিলদার' পদবি মুদ্রিত হয়।

গল্প

শাহাদুজ্জামান

লজ্জাবতী বানর

যেন একটা মঞ্চ। আলো ক্রমে কমে আসে চারদিকে। ঘিরে ঘিরে আসে মেঘ। যেন এরপর নাটকের সবচেয়ে ক্লাইমেক্স দৃশ্যটা অভিনীত হবে। হঠাৎ বজ্রপাত শুরু হয়। অদ্ভুত বজ্রপাত একের পর এক। বেশ কিছু সময়ের ব্যবধানে একটার পর একটা। থামে না। কোথাও কোনো গ্যালাক্সিতে মহাযুদ্ধ বেধেছে বুঝিবা। আধো অন্ধকার হয়ে আসা ফুটপাত ধরে হাঁটে পলাশ। সে নিরালম্ব বোধ করছে। এ সময় তার মোবাইল বেজে ওঠে। রুমার

সচিত্রকরণ : গৌতম চক্রবর্তী





ফোন।

তুমি কই? রুমা জিজ্ঞাসা করে।

ফুটপাতে হাঁটতেছি, বলে পলাশ।

তারপর রুমা কিছু একটা বলে। কিন্তু তখনই বিকট শব্দে আরেকটা বজ্রপাত হওয়ায় কিছু শুনতে পায় না পলাশ।

কী বললা?

শুন, তুমি একটা কোনো শেডের নিচে যেয়ে দাঁড়াও।

কেন কী হইছে?

দেখতেছ না কী রকম বজ্রপাত হচ্ছে? ফুটপাতে না হেঁটে একটা কোনো শেডের নিচে যেয়ে দাঁড়াও।

রুমার কণ্ঠস্বর শুনে পলাশের মনে হলো উজ্জ্বল হলুদ পা নিয়ে একটা শালিক পাখি আলতো করে তার ভারী হয়ে ওঠা বুকের ওপর বসল। কিছুক্ষণ নীরব থেকে পলাশ বলে, আচ্ছা, আচ্ছা দেখি। তুমি ফোন রাখো।

এ সময় ঝুম ধরে বৃষ্টি নামে। অঝোর ধারায় বৃষ্টি। পলাশ দৌড়ে টিনের ঝাঁপি দেওয়া একটা পান-সিগারেটের দোকানে গিয়ে দাঁড়ায়।

> “তোমার মাথার ভিতরে তো আইডিয়া গিজ গিজ করে কিন্তু সেগুলি তুমি ঠিকমতো চ্যানেলাইজ করো না।”

তুমুল বৃষ্টি নামে। রাস্তার গাড়ির গতি কমে আসে। লোকজন নানা দিকে ছোটাছুটি করে বিভিন্ন আশ্রয়ে গিয়ে দাঁড়ায়। তারপর সবাই কেমন যেন ধ্যানস্থ হয়ে পড়ে। ক্রমশ সবাই যেন কেমন অন্য গ্রহের বাসিন্দা হয়ে যায়। মঞ্চের সব অভিনেতা-অভিনেত্রী অঝোর বৃষ্টি দেখতে দেখতে কী যেন ভাবে। পলাশও ভাবতে থাকে। ভাবে রুমার শেষ কথা, শেডের নিচে যেয়ে দাঁড়াও। কী বোঝাতে চায় রুমা?

ফ্রাঙ্ক সিনাত্রার গানটা মনে পড়ে তার—ফ্লাই মি টু দ্য মুন : আমাকে চাঁদে নিয়ে যাও। আমি তারার সঙ্গে খেলি। দেখি মঙ্গল গ্রহে কী করে বসন্ত আসে...ইন আদার ওয়ার্ডস আই লাভ ইউ। রুমার কণ্ঠ বুকে বাজে তার শেডের নিচে দাঁড়াও...ইন আদার ওয়ার্ডস আই লাভ ইউ।

পলাশের মনে হয় ভাগ্যিস পৃথিবীতে রুমার মতো মেয়েরা জন্মেছিল।

বৃষ্টি থামে না।

বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে এক ছেলে পান দোকানদারকে এসে বলে, ওস্তাদ, এই এক শ টাকার নোটটা বদলাইয়া দেন, ছিঁড়া, কেউ নেয় না।

পান দোকানদার রেগে তার দিকে তাকিয়ে বলে, এই ছিঁড়া টাকা যদি চালাইতে না পারস, তোর ঢাকা শহরের ভিসা বাতিল।

আবার একটা বজ্রপাত হয়। বৃষ্টি থামে না।

মঞ্চের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা ধ্যানমগ্ন। একটা কুকুর পান দোকানের টিনের ঝাঁপির নিচে এসে জোরে শরীর থেকে পানি ঝাড়ে। সে পানি পলাশের গায়ে এসে লাগে। দোকানদার চেঁচিয়ে ওঠে, এই শালা কুত্তারে তাড়া।

একটা খুব দমকা হাওয়া বয়। হাওয়ায় কে যেন বলে যায়, প্রতারণার দক্ষতাই এই শহরে টিকে থাকার মন্ত্র।

রাস্তায় রিকশার সারি। সব রিকশার সামনে পর্দা। পর্দার আড়ালে আলো-অন্ধকারে দেখা যায় যাত্রীদের মুখ। গত বৃহস্পতিবারও ঠিক এমন তুমুল বৃষ্টি হচ্ছিল। সেদিনই রিকশার পর্দায় লাল কবুতরের ছবির কথাটা পলাশ বলেছিল কায়সার ভাইকে।

কায়সার হক কোম্পানির কমিউনিকেশন ডিভিশনের দায়িত্বে। তার অধীনেই কাজ করে পলাশ। অফিসে কিছুকাল ধরে খানিকটা কোণঠাসা হয়ে আছেন কায়সার হক। মার্কেটিং ডিভিশনের হেড হিসেবে সম্প্রতি জয়েন করেছেন আকরাম আলী। তিনি কায়সারকে বিশেষ পছন্দ করেন না। কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার শহীদুল ইসলামকে আকরাম আলী প্রায়ই বলেন, কমিউনিকেশন ডিভিশনে নিউ ব্রাড দরকার, কায়সার হকের কোনো ইনোভেটিভ আইডিয়া নাই।

পলাশ কায়সারের অনেক জুনিয়ার কলিগ, তবু কায়সার প্রায়ই তার সাথে বসে আড্ডা দেয়। অফিস ছুটির পর কায়সার প্রায়ই পলাশকে বলে, চলো একটু চা খাই। অফিসের ক্যানটিনের বদলে তারা গিয়ে বসে রাস্তার ওপারে একটা ছোট চায়ের দোকানে।

গত বৃহস্পতিবার ছুটির পর ওই চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দিচ্ছিল কায়সার আর পলাশ।

পলাশ বলে, কায়সার ভাই, বৃহস্পতিবার নিয়ে বিনয় মজুমদারের একটা কবিতা পড়লাম, আপনাকে শোনাই।

বৃহস্পতিবার নিয়ে কবিতা? সেইটা কী রকম?

শুনাই আপনাকে।

পলাশ আবৃত্তি করে :

আজ বৃহস্পতিবার : পৃথিবীতে
হয়তো বৃহস্পতিবার নয়
মাঠে মাঠে ছাগল ঘাস খাচ্ছে,
তাদের পিঠে লাগছে
মহাজগতের রোদ। আমারও
ঘুমানোর সময়
হয়ে এলো। কিন্তু একদা ভুট্টা
চন্দ্রসিক্ত হয়েছিলো
এই স্মৃতি মনে করে আমি
ঘুমাতে পারি না,
বসে বসে ম্যাচ বাক্সের কাঠি
গুনি।

কায়সার বলে, কবিতার মাথামুণ্ডু তো কিছু বুঝলাম না।

বেশি বুঝার দরকার নাই কায়সার ভাই। এই ধরেন একটা লোক দুপুরে ঘুমানোর চেষ্টা করছে। বাইরে মাঠে কতগুলো ছাগল ঘাস খাচ্ছে, সেই ছাগলের গায়ে এসে রোদ পড়েছে। রোদটা তো ধরেন আসছে বহু দূর থেকে। সূর্য থেকে। সূর্য তো মহাজগতের একটা ব্যাপার। ধরেন সেই লোকটা কোনো একটা গ্রামের বাড়িতে বসে রোদের মতো একটা মামুলি ব্যাপার দেখছে। কিন্তু ব্যাপারটা তো মামুলি না। একটা মহাজাগতিক ব্যাপার। তো সেই ছোট্ট গ্রামে বসে তার মহাজাগতিক একটা ব্যাপারের অভিজ্ঞতা হচ্ছে। রোদের মতো একটা মহাজাগতিক ব্যাপার নিয়ে ভাবতে ভাবতে চাঁদের আলোর মতো আরেকটা মহাজাগতিক ব্যাপারের কথা মনে আসে তার। এই লোক কোনো এক রাতে ভুট্টাখেতে ভুট্টার গায়ে চাঁদের আলো এসে পড়তে দেখেছে। সেটা নিশ্চয়ই বেশ একটা অপূর্ব দৃশ্য। সেই অপূর্ব দৃশ্যের স্মৃতি মনে করে তখন তার ঘুম আসছে না। কী করবে সে ঠিক বুঝতে পারছে না। একটু আগে সিগারেট খেয়ে ম্যাচবাক্সটা তার টেবিলের ওপর রেখেছিল। সেটা থেকে ম্যাচের কাঠিগুলো বের করে সে গুনতে শুরু করে। একটা কাজ পায় যেন সে। কোনো এক বৃহস্পতিবার ঘটনাটা ঘটে। ছাগল, ভুট্টা, ম্যাচবাক্সের একটা অদ্ভুত জাক্সটাপজিশন আছে এখানে। কবিতাটা বোঝার দরকার নাই কায়সার ভাই। একজন নিঃসঙ্গ লোক বসে বসে ম্যাচের কাঠি গুনছে, শুধু এই দৃশ্যটা ভাবেন তাহলেই হবে।

তুমি তো আমার মাথা আউলাইয়া

দিতেছ পলাশ। তোমার মাথার ভিতরে তো আইডিয়া গিজ গিজ করে কিন্তু সেগুলি তুমি ঠিকমতো চ্যানেলাইজ করো না। ডিসট্রাকটেড থাকো। ফোকাসড হইতে হবে তো।

ফোকাসড তো হতে চাই কায়সার ভাই কিন্তু মন খালি এদিক-ওদিক ছুটে?

এদিক-ওদিক ছুটলে তো হবে না। অ্যালার্ট থাকতে হবে। দেখতেছ না মার্কেটিংয়ের ওই আকরাম আলী আইসা কী শুরু করছে? অফিসের পরিবেশটারে টক্সিক কইরা তুলতেছে। আমারে থ্রেট করে।

তাকে তো খরগোশের মতো অ্যালার্ট লাগে। কান সব সময় খাড়া। কখন কোন দিকে ছুটতে হবে জানে।

সে আমারে কনুই মারার তালে আছে। বসকে নানাভাবে ইনফ্লুয়েন্স করার চেষ্টা করতেছে।

কায়সার ভাই আমি তো এখনো প্রভিশনাল পিরিয়ডে। আমার চাকরির কনফার্মেশনের ব্যাপারটা একটু খেয়াল রেখেন।

আরে মিয়া আমারই এখন সারভাইভালের প্রশ্ন। বসরে ইমপ্রেস করতে না পারলে আমারই চাকরি থাকে না। তোমার কথা মাথায় আছে আমার।

তারা বেরুতে যাবে সে সময় হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হয়। আরেক কাপ চা নেয় পলাশ আর কায়সার। বাইরে ঝুম বৃষ্টি হতে থাকে। রাস্তায় রিকশার ভিড়। রিকশার সব যাত্রী বরাবরের মতো একটা প্লাস্টিকের পর্দা দিয়ে বৃষ্টি ঠেকিয়ে রেখেছে। কোনো কোনো রিকশায় দড়ি দিয়ে পর্দাটা টানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোনো কোনো রিকশায় যাত্রী নিজেই পর্দাটা দুহাত দিয়ে ধরে রেখেছে। বরাবরের মতো বাইরে থেকে আধো অন্ধকারে শুধু দেখা যাচ্ছে যাত্রীদের মাথা অথবা চোখ। বৃষ্টি অঝোর ধারায় পর্দার ওপর পড়ছে, তারপর সরু ধারা হয়ে নামছে। পলাশ আর কায়সার হক চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বৃষ্টি দেখে।

পলাশ হঠাৎ বলে, কায়সার ভাই, একটা ব্যাপার ভাবতেছি।

কী ব্যাপার।

আচ্ছা, আমরা রিকশার এই পর্দাগুলিকে কমিউনিকেশন ম্যাটেরিয়াল হিসেবে ব্যবহার করি না কেন?

কী রকম?

এই যে দেখেন সারি সারি রিকশার প্রত্যেকটার সামনে একটা পর্দা। পর্দাগুলি এম্পটি। ধরেন রিকশার এই পর্দাগুলি কিন্তু হতে পারে এক একটা বিলবোর্ড। আমাদের কোম্পানির লোগো দিয়ে আমরা স্পেশাল রিকশার পর্দা বানাব। তারপর ঢাকা শহরের সব রিকশাওয়ালাকে সেগুলো সাপ্লাই করব।

ব্যাপারটা আরেকটু এলাবোরেট করো তো।

মানে ধরেন আমরা সব রিকশাওয়ালাকে আমাদের কোম্পানির লোগো এই লাল কবুতর ইমপ্রিন্ট করা প্লাস্টিকের পর্দাগুলো ফ্রি ডিসট্রিবিউট করলাম। ধরেন সাদা পর্দায় লাল কবুতরের লোগো। এখন তো প্রায় প্রতিদিন বৃষ্টি হচ্ছে। আর বৃষ্টি হলেই সব যাত্রী ওই পর্দা খুলবে। সারা শহরের রিকশায় রিকশায় হঠাৎ ফুটে উঠবে লাল কবুতর। আমাদের প্রোডাক্টের কোনো ইমেজ দেওয়ার দরকার নাই, শুধু ওই লাল কবুতরটা থাকবে। সারা শহরের বড় রাস্তায়, ছোট রাস্তায়, অলিতে-গলিতে দেখা যাবে লাল কবুতরের মিছিল। যারা আমাদের লোগো চিনে তাদের ভেতর এই ইমেজের একটা ইমপ্যাক্ট হবে আর যারা চেনে না তাদের কিউরিওসিটি হবে।

কায়সার চুপ করে শোনে। শুধু বলে, হুম।

পলাশ বলতে থাকে, ব্যানার বলেন, বিলবোর্ড বলেন, পোস্টার বলেন রিকশার পর্দাই সে পারপাসটা সার্ভ করবে। এর জন্য বাড়তি কোনো কস্ট নাই। সিম্পল আইডিয়া, সিম্পলভাবে এক্সিকিউট করা যাবে।

খারাপ বলো নাই। ঠিক আছে এখন চলো, বৃষ্টি থামছে, বাড়ি ফিরি।

বৃহস্পতিবার, সপ্তাহের শেষ দিনে কায়সার ভাইয়ের সাথে আড্ডা দিয়ে বাড়ি ফেরে পলাশ। তিন বন্ধু মিলে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছে তারা। একেকজন একেক অফিসে কাজ করে। কয়েক গলি পরেই রুমাদের বাড়ি। আড্ডা দেওয়ার জন্য পলাশের বাড়িতে মাঝে মাঝে আসে রুমা। শুক্রবার, শনিবার কোথাও বের হয় না পলাশ। রুমার সঙ্গেও দেখা হয় না। ল্যাপটপে 'ব্রেকিং ব্যাড' টিভি সিরিয়ালের সব কটা এপিসোড ডাউনলোড করে দেখে। ছুটি কাটিয়ে রোববার অফিসে গেলে পলাশ জানতে পারে বিকেলে ছুটির আগে তাদের কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার একটা স্পেশাল মিটিং ডেকেছেন।

বিকেলে মিটিংয়ে যায় পলাশ। জেনারেল ম্যানেজার শহীদুল ইসলাম



বললেন, আপনাদের ডাকলাম একটা বিশেষ কারণে। উইক এন্ডে কায়সার আমাকে ফোন করে বলল, তার একটা মার্কেটিং আইডিয়া আছে, সেটা সবার সাথে শেয়ার করতে চায়। আমাদের অপিনিয়ন চায়। শহীদুল ইসলাম বলেন, কায়সার ফ্লোর ইজ ইয়োর্স।

কায়সার টেবিলের সামনে গিয়ে পাওয়ার পয়েন্ট খোলে, বলে, আমার আইডিয়াটা খুব সিম্পল। একটা ছোট্ট ভিজুয়াল ক্লিপ দেখাচ্ছি আপনাদের। ভেরি শর্ট। ফর্টি সেকেন্ডের একটা ক্লিপ।

স্ক্রিনে একটা এনিমেশন দেখা যায়। রাস্তায় শত শত রিকশা। বৃষ্টি হচ্ছে। রিকশার সামনে পর্দা। সেই পর্দায় তাদের কোম্পানির লোগো লাল কবুতর। রিকশাগুলো এগিয়ে যাচ্ছে।

কায়সার, ইট ইজ অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। এই হচ্ছে আমার আইডিয়া। আমরা রিকশার পর্দাগুলিকে বিলবোর্ডে ট্রান্সফর্ম করব।

হঠাৎ পলাশের নিঃশ্বাস দ্রুত হতে থাকে। কেমন যেন ঝিম ধরে মাথায়। সে বার কয়েক চোখের পাতা বন্ধ করে আবার খোলে।

জেনারেল ম্যানেজার শহীদুল ইসলাম বলে ওঠেন, দ্যাটস আ ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়া কায়সার। দারুণ ইনোভেটিভ থিংকিং। আমার তো খুব পছন্দ হয়েছে। হোয়াট ডু ইউ অল থিঙ্ক, বলে তিনি অন্য কলিগদের দিকে তাকান।

হিউম্যান রিসোর্সের মঞ্জুরুল হক বলে ওঠেন, এটা তো স্যার ফাটাফাটি আইডিয়া। রীতিমতো সেনসেশন তৈরি করবে।

শহীদুল ইসলাম মার্কেটিং হেডের দিকে তাকিয়ে বলেন, হোয়াট ডু ইউ থিংক আকরাম?

কায়সার তীক্ষ্ণ চোখে আকরাম আলীর মন্তব্যের জন্য অপেক্ষা করে।

আকরামকে একটু অপ্রস্তুত দেখায়। সে বলে, আই অ্যাম জাস্ট থিংকিং, ব্যাপারটা খুব চিপ হয়ে যায় কি না? রিকশার পর্দায় আমাদের লোগো, কেমন না ব্যাপারটা?

শহীদুল ইসলাম বলেন, নো আকরাম, আই ডোন্ট এগ্রি উইথ ইউ। সিম্পল হলেই একটা জিনিস চিপ হয়ে যায় না। কায়সার আই থিংক ইউ শুড গো অ্যাহেড উইথ দ্য আইডিয়া সুন।

কায়সারের আত্মবিশ্বাসের পারদ তখন অনেক উঁচুতে। আকরাম আলীর দিকে একটা তির্যক দৃষ্টি দিয়ে সে বলে, সে জন্যই স্যার আমি এই আর্জেন্ট মিটিংটা কল করতে বললাম। এই বর্ষার ভেতরই আমি এটা লঞ্চ করতে চাই।

সিউর। পলাশকে দ্রুত কাজে নামিয়ে দাও। পলাশ কই? বলে তিনি টেবিলে বসে থাকা কলিগদের দিকে তাকান এবং এক কোনায় বসে থাকা পলাশকে দেখে বলেন, পলাশ তোমার অন্য অ্যাসাইনমেন্ট বাদ দিয়ে কাল থেকেই কায়সারকে এই প্রজেক্টটায় অ্যাসিস্ট করো। আগামী সপ্তাহেই একটা পাইলটিং করো।

পলাশের চোখের পাতা আরও বারকয়েক ওঠানামা করে। সে তাড়াতাড়ি বলে, নিশ্চয়ই স্যার।

মিটিং ভাঙলে পলাশ দ্রুত টয়লেটে যায়। তার কেমন বমি বমি লাগে। সে চোখে-মুখে পানি দিয়ে কিছুক্ষণ বেসিনে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর ইউরিনালে গিয়ে দাঁড়ায় প্রস্রাব করতে।

কিছুক্ষণ পর তার পাশের ইউরিনালে এসে দাঁড়ায় কায়সার। তার ভেতর একটা ফুরফুরে ভাব। মৃদু শিস দিতে গিয়ে আড়চোখে আরেক ইউরিনালে পলাশকে দেখে চুপ হয়ে যায়। পলাশ একবার তার দিকে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নেয়।

পলাশ আর কায়সার পাশাপাশি দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করে। কেউ কোনো কথা বলে না। তাদের মাথার ওপর একটা নিঃশব্দতা ঝুলে থাকে। শুধু ইউরিনালে দুজনের প্রস্রাবের ধারার মৃদু শব্দ শোনা যায়।

একপর্যায়ে কায়সার ইউরিনালের দিকে তাকিয়েই পলাশকে বলে, ছুটির পর থাইক। কথা আছে তোমার সাথে। আই উইল এক্সপ্লেইন।

পলাশ কিছু বলে না। টয়লেটের দরজা খুলে বেরিয়ে যায়। যেতে যেতে পেছনে দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শোনে।

ছুটি হওয়ার কিছু আগেই বেরিয়ে যায় পলাশ। কায়সারের জন্য আর অপেক্ষা করে না। হাঁটতে থাকে ফুটপাত ধরে। তখনই বজ্রপাত শুরু হয়। তারপর রুমার ফোন আসে। পলাশ একটা সিগারেটের দোকানের শেডের নিচে গিয়ে দাঁড়ায়। তারপর শুরু হয় তুমুল বৃষ্টি। ধ্যানস্থ হয়ে ঝুম বৃষ্টি দেখতে থাকে পলাশ। সামনে রিকশা। রিকশার সামনে পর্দা। পর্দায় তখনো লাল কবুতর নেই কিন্তু দেখা দেবে অচিরেই। ভেজা কুকুর আবার গা ঝাড়ে। পলাশের গায়ে আবার সেই পানি এসে লাগে। আবার রুমার ফোন বেজে ওঠে, তুমি শেডে দাঁড়াইছ?

পলাশের ধ্যান ভাঙে, হ্যাঁ একটা শেডের নিচেই আছি।

রুমা বলে, বৃষ্টি না থামা পর্যন্ত বের হয়ো না কিন্তু। অপেক্ষা করো।

অবশ্যই পলাশ অপেক্ষা করবে। পলাশ জানে অপেক্ষা করতে শিখতে হয়। মহাভারতের গল্পটা মনে পড়ে তার।

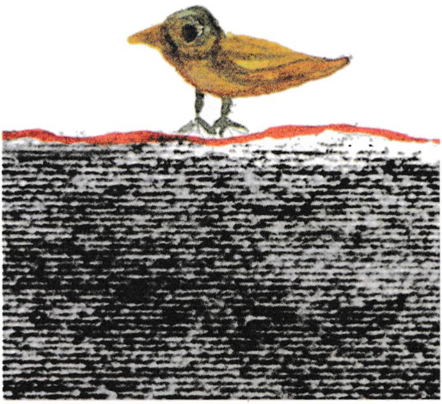
প্রজাপতির দুই রূপবতী কন্যা, কুদ্র আর বিনতা। কশ্যপ বললেন তোমাদের বর দেব, কী বর চাও? কুদ্র বলল, আমার অত্যন্ত বলশালী এক হাজার নাগ পুত্র হোক। কশ্যপ তাকে সেই বর দিলেন। বিনতা তখন বললেন, আমাকে শুধু দুই পুত্র দিন যারা কুদ্রর পুত্রের চেয়েও বলবান আর তেজস্বী হবে। কশ্যপ তাকেও সেই বর দিলেন। এর কিছুদিন পর কুদ্র এক হাজার ডিম প্রসব করলেন এবং বিনতা শুধু দুটা ডিম প্রসব করলেন। তারপর দিন যায়, বছর যায়। এভাবে পাঁচ শ বছর পর একদিন একসাথে কুদ্রের এক হাজার ডিম থেকে এক হাজার নাগ পুত্র জন্ম নেয়। কিন্তু বিনতার ডিম থেকে কিছুই বের হয় না। বিনতা তখন অধৈর্য হয়ে ওঠে। এ সময় সে তার দুটি ডিমের একটিকে ভেঙে ফেলে ভেতরে কী আছে দেখার জন্য। ডিম ভেঙে বিনতা দেখতে পায় ভেতরে তার পুত্রের শরীরের ওপরের অংশটা তৈরি হয়েছে কিন্তু নিচের অংশটা তখনো অপরিণত। তার সেই অপরিণত পুত্র অধৈর্য হয়ে ডিম ভেঙে ফেলায় মায়ের ওপর খুব খেপে যায়। রেগে ওই ডিমের ভেতর থেকেই মাকে অভিশাপ দেয় সে। বলে, তোমার লোভের কারণে আমার শরীর অসম্পূর্ণ হয়ে থাকল। এ জন্য তোমাকে তোমার বোন কুদ্রের দাসী হয়ে থাকতে হবে পাঁচ শ বছর। বিনতা ছেলের এই অভিশাপে খুবই মূর্ছে পড়ে। ছেলে তখন বলে, তবে তুমি এই অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পারবে যদি তোমার যে আরেকটা ডিম আছে সেটা অসময়ে না ভাঙ। সে ডিম থেকে আমার যে ভাই ভূমিষ্ঠ হবে সেই তোমার দাসত্ব মোচন করবে। সুতরাং নিজে থেকে সেই ডিম না ভাঙা পর্যন্ত অপেক্ষা করো।

পলাশ অপেক্ষা করবে। কোন ডিম ফেটে কে কোথায় তাকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে, সেটা দেখার জন্য সে অপেক্ষা করতে প্রস্তুত।

বৃষ্টি থামলে ফ্ল্যাটে ফিরে যায় পলাশ। তার রুমে গিয়ে ল্যাপটপের সামনে বসে। তার ফ্ল্যাটমেটরা তখনো কেউ বাসায় ফেরেনি। পলাশ অনলাইনে সেদিনের পত্রিকা পড়তে চেষ্টা করে।

দেখে ব্রেকিং নিউজ চলছে। লন্ডনের ওয়েস্ট মিনস্টার ব্রিজের ওপর কে একজন একটা গাড়ি নিয়ে উঠে পড়েছে পথচারীদের ওপর। মারা গেছে বেশ কয়জন। একটি মেয়ে ব্রিজ থেকে লাফ দিয়েছে টেমস নদীতে। হন্তারককে পুলিশ হত্যা করেছে। এটাকে একটি টেরোরিস্ট অ্যাটাক হিসেবে চিহ্নিত

> “পলাশ তোমার অন্য অ্যাসাইনমেন্ট বাদ দিয়ে কাল থেকেই কায়সারকে এই প্রজেক্টটায় অ্যাসিস্ট করো”



করেছে পুলিশ। তবে সন্ত্রাসী একাকী কি না, 'লোন উলফ' কি না, সেটা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

লন্ডনের সেই ক্রাইম সিনের ছবিগুলোতে চোখ বোলায় পলাশ কিছুক্ষণ। আহত পথচারীরা পড়ে আছে রাস্তায়, অ্যাম্বুলেন্স ছুটে আসছে। তারপর অন্য পৃষ্ঠার খবরগুলো পড়তে থাকে। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ব্রাউজ করতে করতে একটা খবরে চোখ আটকে যায় পলাশের :

'নেত্রকোনার দুর্গাপুর পৌর শহরে গত সোমবার রাতে এক ব্যক্তি একটি লজ্জাবতী বানর আটক করেছেন। এটির উচ্চতা প্রায় এক ফুট, লম্বায় দেড় ফুট। ওই ব্যক্তির নাম মো. আমিরুল ইসলাম। তিনি পৌরসভার চকলেঙ্গুরা এলাকার বাসিন্দা। বানরটি বর্তমানে তার বাসায় রয়েছে। গতকাল প্রাণীটির ছবি দিয়ে তার ভাই তাজুল ইসলাম ফেসবুকে একটি পোস্ট দেন। ওই ব্যক্তি ও উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, আমিরুল ইসলাম সোমবার রাত দশটার দিকে বাড়ি ফিরছিলেন। তিনি বাড়ির সামনে টর্চলাইচ জ্বালালে আলোয় একটি প্রাণীর চোখ জ্বল জ্বল করে ওঠে। এতে তিনি ভয় পান। চিৎকার করলে বাড়ি থেকে তাঁর বড় ভাই তাজুল ইসলাম ও লোকজন আলো নিয়ে আসেন। এ সময় এ প্রাণীটি পাশের কুমড়াগাছের মাচায় ওঠে। লোকজন এটিকে আটক করে বাড়িতে এনে বেঁধে রাখে। গতকাল সকালে বাজার থেকে খাঁচা এনে প্রাণীটি রাখা হয়। খাবার হিসেবে কলা, রুটি ও ডিম দেওয়া হয়। পরে তাজুল ইসলাম ফেসবুকে প্রাণীটির ছবি দিয়ে পোস্ট দেন। দুপুরে বিষয়টি বন অধিদপ্তরের বন্য প্রাণী অপরাধ ইউনিটের পরিদর্শক আবদুল্লাহ আল সাদির নজরে আসে। পরে তিনি বিষয়টি লজ্জাবতী বানর গবেষণা ও সংরক্ষণ প্রকল্পের লোকজনকে জানান।'

পলাশ অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে খবরটা পড়ে। খবরের সাথে সেই লজ্জাবতী বানরের ছবিটা মনোযোগ দিয়ে দেখে। তারপর সে রুমাকে ফোন দেয়।

ফোন ধরে ওপাশ থেকে রুমা বলে, বাসায় পৌঁছাইছ ঠিকমতো?

হ্যাঁ। পৌঁছেছি। তোমার বাসায় আজকের পেপারটা আছে না?

আছে তো। ক্যান কী হইছে?

পেপারটা একটু নাও তো।

কেন কোনো বিশেষ খবর আছে?

তুমি নাও না ।

আচ্ছা নিলাম।

আঠারো নাম্বার পেইজে যাও।

তুমি কোন পত্রিকার কথা বলতেছ?

আরে আমি জানি তো তোমাদের বাসায় কোন পত্রিকা রাখে। তুমি আঠারো নাম্বার পেইজে যাও।

গেলাম।

ওই পৃষ্ঠার ডান দিকের কোনায় দেখো একটা খবর আছে লজ্জাবতী বানর নিয়ে। ওইটা পড়।

আচ্ছা দাঁড়াও পড়ি।

রুমা খবরটা পড়ে। পলাশ ফোন ধরে থাকে।

রুমা বলে, পড়লাম তো। তুমি এই বানরের খবর পড়াইতে আমাকে ফোন দিছ?

ওই প্রাণীটার একটা ছবি দিয়েছে না? ছবিটা দেখো ভালো করে।

দেখলাম তো ছবিটা। কিন্তু তোমার কী হইছে বল তো?

ওর চোখগুলি দেখছ। কী ভীষণ করুন। কেমন ভয় পেয়েছে সে।

আচ্ছা তোমার সমস্যা কী বল তো? একটা বানর নিয়ে পড়লা কেন তুমি?

সেইটাই তো আমার সমস্যা। এই যে এটাকে বানর বলা হচ্ছে, এটাই আমার সমস্যা। এটা তো আসলে বানর না। এটা লেমুর গ্রুপের প্রাণী। প্রাইমেট, দেখতে অনেকটা বানরের মতো কিন্তু এটা তো বানর গ্রুপের না। লোকে এটাকে বানর গ্রুপে ফেলে দিয়েছে। নাম আবার দিয়েছে লজ্জাবতী। আরে এটা কি বানর নাকি যে মানুষের সাথে বাদরামি করবে? লজ্জা তো সে পাবেই। কুমড়াগাছের মাচায় তো সে উঠবেই। বেচারার জায়গা তো অন্যখানে। পথ ভুলে এখানে চলে এসেছে, তারপর তাকে আবার বানর আইডেন্টির ভেতর ফেলে দেওয়া হচ্ছে। এটা তো একদম ঠিক হয় নাই। এটা আনফেয়ার। ওর চোখ দুইটা দেখো। কী ভীষণ ভানরাবেল। সে তো এখানে থাকতে চায় না।

রুমা বলে, তুমি আবার কোথাও ধাক্কা খাইছ না? তোমাকে কেউ চিট করছে। তাই না পলাশ?

সেটা কোনো পয়েন্ট না। আমি তোমাকে অন্য একটা ব্যাপার বুঝানোর চেষ্টা করছি। মানে ধরো এই যে এই প্রাণীটার বেলায় যেটা ঘটল সেটা তো মানুষের বেলাতেও ঘটতে পারে। পারে না? এমন তো হতে পারে একজন মানুষ, মানুষের ভেতর সে আছে, দেখতে হয়তো অনেকটা মানুষের মতো কিন্তু আসলে সে মানুষ না। হয়তো অন্য কিছু। হয়তো সে ভুল করে মানুষের ভেতর চলে এসেছে। আমি জিন-ভূতের কথা বলছি না। ধরো অন্য একটা কিছু। তারপর সে মানুষের আইডেন্টির ভেতর ট্র্যাপড হয়ে গেছে। সে সেই আইডেন্টি চায় না। সে আসলে খুব লজ্জিত। সে ভীষণ ভয় আর লজ্জা নিয়ে চারদিকে তাকাচ্ছে।

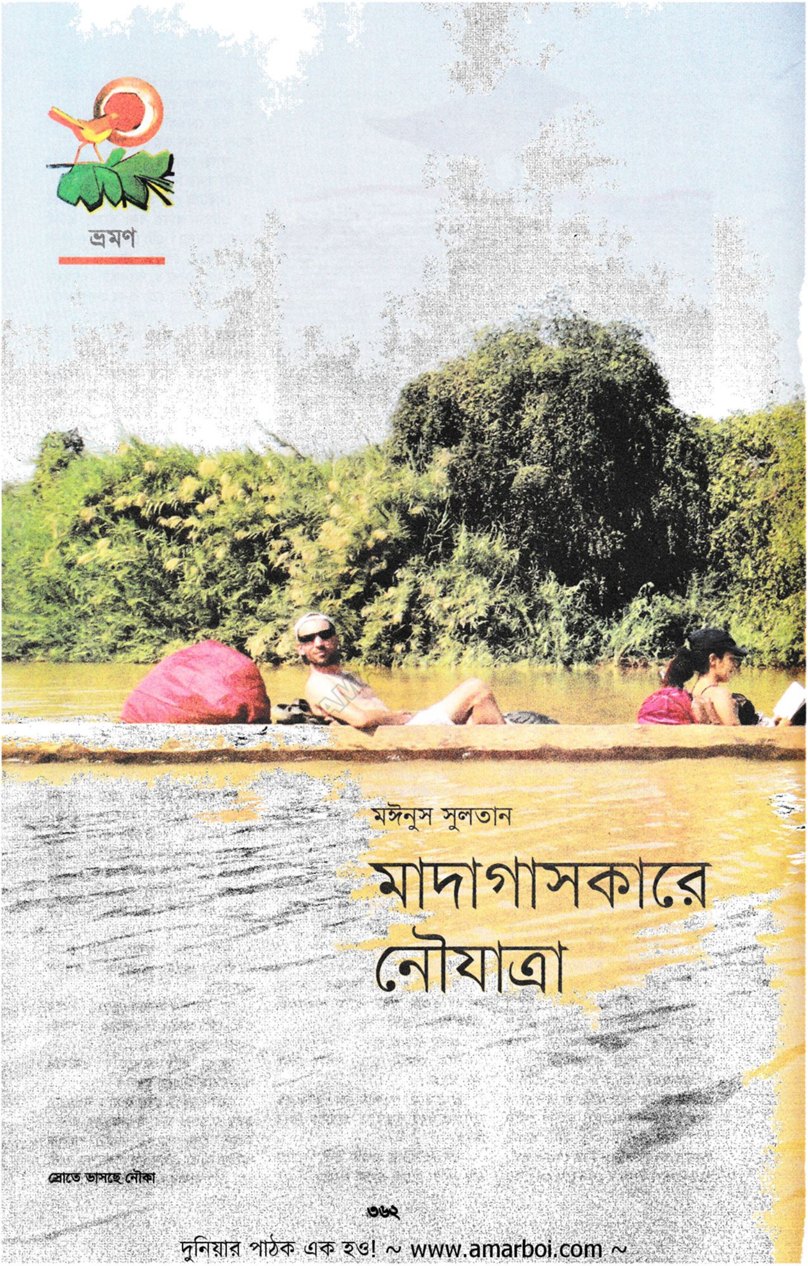
রুমা বলে, পলাশ তুমি ফোন রাখো। আমি তোমার ওখানে আসতেছি।

না, তোমার আসার কোনো দরকার নাই। তুমি লজ্জাবতী বানরের ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো।

আচ্ছা আমি আসতেছি। তোমার সামনাসামনি এসে বুঝব।

ফোন কেটে দেয় রুমা। পলাশের কাছে যাওয়ার জন্য রওনা দেয় রুমা। উজ্জ্বল হলুদ পায়ের একটা শালিক পাখির মতো এখন সে পলাশের ভারী হয়ে ওঠা বুকের ওপর গিয়ে বসবে।

ভ্রমণ



মঈনুস সুলতান

মাদাগাসকারে নৌযাত্রা

স্রোতে ভাসছে নৌকা



ফরাসি কেতার পল্লি, নরমুণ্ডু ও ভিনটেজ কার

গরুর গাড়ির পেছন দিকে আমি পা ঝুলিয়ে বসেছি। পাহাড়ের কিনার ঘেঁষে সড়কটি নেমে গেছে ধানের চৌখুপ্পি জমিনে। চলাচলে প্রচুর জার্কিং হচ্ছে। মাদাগাসকারে গরুকে বলা হয় জেবু, কপালের চন্নায় রোদ পড়ছে, সানগ্লাস খুঁজে পাই না, পিপাসায় রীতিমতো কাবু হয়ে পড়ি। আমার জেবু-কার্টের পেছন পেছন ধুলার ধূম্রজাল ছড়িয়ে আসছে খড়ের গাদা নিয়ে আরেকটি গরুর গাড়ি। পাশে বসে ট্যুর গাইড লাসা ডাডাডি তাসা শরীরে রংচঙে আলোয়ান জড়িয়ে মিটমিটিয়ে হাসছেন। ঘামঝরা ভয়ানক গরমের ভেতর তিনি কেন শীতার্ত হয়ে গায়ে চাদর জড়িয়েছেন—বিষয়টি আমি বোঝার কোশেস করি। আমরা মাদাগাসকারের অ্যান্টসিরাবে নগরী থেকে বুশ-বাস পাকড়ে এ অব্দি এসেছি। আমাদের গন্তব্য আপাতত মিয়ানদ্রিবাজো বলে নদী-তীরবর্তী ছোট্ট একটি শহর। বাস আর আগুয়ান হচ্ছে না। তাই, আমাদের জেবু-কার্টে সওয়ার হতে হয়েছে। ডাডাডি তাসার বয়ানে ঘটনা যা বুঝতে পেরেছি তা হচ্ছে—রাজপথের পাশে একটি পাহাড়ে স্যাফায়ার পাথরের তালাশ পাওয়া গেছে। এ সংবাদে অত্র এলাকায় আগমন হয়েছে শতাধিক অ্যামেচার মাইনার বা শৌখিন পাথর খুঁড়নেওয়ালাদের। তারা একাধিক ডিনামাইট দিয়ে শিলাপাহাড়ে ব্লাস্ট করলে পর্বতের একাংশ ধসে সড়ক ব্লক করে দিয়েছে। এ ল্যান্ডস্লাইড অতিক্রম করে বাসের অগ্রযাত্রার কোনো উপায় নেই। তাই, জেবু-কার্টে ধানখেত ধরে স্রেফ পাহাড়টি এভয়েড করে অন্য পাশের একটি বাজারের দিকে রওনা হয়েছি। পরিকল্পনা হচ্ছে, ওখান থেকে মাইক্রোবাস ধরে মিয়ানদ্রিবাজোতে যাওয়া।

যাত্রায় এ রকমের ডিসরাপসন হওয়ায় আমি আপসেট বোধ করি। মিয়ানদ্রিবাজোতে আমরা সন্ধ্যার আগে পৌছাতে চাই। জেবু-কার্টের জোগাড়যন্ত্রে বিস্তর সময় ব্যয় হয়েছে। আমি খুব রেস্টলেস ফিল করি। এতে কিন্তু গাইড লাসা ডাডাডি তাসার কোনো হেলদোল হয় না। তিনি গরুর গাড়িতে জানু বিড়িয়ে শানেমানে বসে নরুন দিয়ে চুরুটে ছিদ্র করে তাতে ভেষজ কোনো দ্রব্য প্রবেশ করিয়ে আরামসে স্মোক করেন। খুশবু থেকে আন্দাজ করি বস্তুটি সম্ভবত চণ্ড, প্রতিক্রিয়ায় তার শরীরে ঝেপে আসে

শীতার্ত ঝাড়। গাইড হিসেবে ডাডাডি তাসার পারফরম্যান্স কী রকম—আমার কোনো ধারণা নেই, তবে তার উপসর্গ অনেক। চণ্ডু সেবন ছাড়াও তাঁর শোল্ডারব্যাগে মজুত আছে একটি নরমুণ্ড। শুনেছি চাঁদনি রাতে তাতে আরক ঢেলে পান করে তিনি পাশ্চাত্য থেকে আগত থিয়োসফিক গোছের পর্যটকদের তাক লাগিয়ে দেন। তাঁর নির্লিপ্তিতে আমার অস্থিরতা বলকানো দুধের মতো উসকে ওঠে। বিষয়টি তাঁকে অবগত করলে তিনি সাধুসন্তের মতো মিঠে হেসে উপদেশ দেন—'মঁশিয়ো সুলতান, মোরা...মোরা।' মাদাগাসকারের প্রচলিত জবান মালাগাছি ভাষাতে 'মোরা...মোরা' শব্দ দুটির অর্থ হচ্ছে 'ধীরে...ধীরে...অতিধীরে', আপাতত ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই।

ডাডাডি তাসাকে খুঁজেপেতে মহুর করার সম্পূর্ণ ক্রেডিট বর্তায় আমার ফরাসি সুহৃদ মঁশিয়ো আরিস্তিদ দুবোয়া ও তার মরক্কোন বান্ধবী মাদমোয়াজেল কাহিনা আমাজিয়ানের ওপর। এদের সাথে অ্যান্টসিরাবে নগরীর একটি গেস্ট হাউসে বসবাসের সুবাদে আমার জানপহচান দোস্তির সূত্রপাত হয়েছে। আমরা মিয়ানদ্রিবাজো থেকে ৎসিরিবিহিনা নদীতে নৌকা ভাসিয়ে যেতে চাচ্ছি বেলো-সুর অব্দি। উদ্দেশ্য—ওখান থেকে কোনো উপায়ে সিঙ্গি-ডে-বেমারাহা বলে দুনিয়াজুড়ে মশহুর লাইমস্টোনের ফর্মেশন দেখতে যাওয়া। যোগাযোগ বেজায় রকমের জটিল, কাদামাটির মাইল-কে-মাইল সড়ক মারাত্মক রকমের দুর্গম এবং নৌযাত্রা জলদস্যুর উৎপাতে অত্যন্ত রিস্কি। দুটি ট্যুর কোম্পানি প্যাকেজ ট্যুরের বন্দোবস্ত করে দিচ্ছে। তাদের মোটরবোটে আছে সশস্ত্র প্রহরী, রেঞ্জ রাবারগুলো এয়ারকন্ডিশন্ড এবং লাইমস্টোন ফর্মেশনের ওপরে এরা হেলিকপ্টারে ঘুরপাক করার বন্দোবস্ত করে দেয়। আমরা খোঁজখবর নিই।


জেবু-কার্ট বলে পরিচিত গরুর গাড়ি

এরা দাম হাঁকে হাজার দুয়েক ডলার, প্লাস এন্ট্রি ফি, প্রতিটি মিলের জন্য আলাদা করে পেমেন্ট করা। আমরা খাজুল হয়ে পিছিয়ে আসি। প্যাকেজ ট্যুরের এ ভঙ্গিতে ঘুরাফেরা করলে আমাদের বাজেটে তঙ্গি পড়বে। সুতরাং সিদ্ধান্ত নিই, লোকাল গাইড জোগাড় করে ডিঙি নৌকায় নিজে নিজে অতিক্রম করব ৎসিরিবিহিনা নদীর দুস্তর পারাবার।

লোকাল গাইড জোগাড়ের ধান্দায় যোগ দেন ইস্পানিয়া থেকে আগত আরেক বান্দা। তার নাম সিনিওর থিয়াগো লোপেস। তিনি আকারে প্রকারে পৃথুল। মাঝবয়সী থিয়াগো হোঁদল কুতকুতের মতো থপথপিয়ে চলাফেরা করেন। জীবনে বিবাহিত হয়েছিলেন দুবার তার চেয়েও অধিক বয়স্ক রমণীর সাথে। সংসার জীবনের শিকলি কেটে থিয়াগো বেরিয়ে এসেছেন সম্প্রতি ডিভোর্সের সনদ নিয়ে। হালফিল মাদাগাসকারের অ্যান্টসিরাবে নগরে ঘুরপাক করছেন কমবয়সী কিউট এক মেয়ের সাথে। তার নাম লোরেনা। তাকে অষ্টাদশী বলে যদিও সিনিওর থিয়াগো চালানোর কোশেস করছেন, আমাদের আন্দাজ—বালিকাটির বয়স মেরেকেটে ষোলো। ঘটনাটি ফুসলানোর পর্যায়ে পড়ে। এ বাবদে আমি চেষ্টা করছি বিশদ আকারে তথ্য কালেক্ট করতে।

মঁশিয়ো আরিস্তিদ ও মাদমোয়াজেল কাহিনা তাদের পরিচিত এক ফরাসি মহিলা মাদাম ক্লদ্যাঁর কাছ থেকে লাসা ডাডাডি তাসার তালাশ পেয়েছেন। তিনি বাস করেন অ্যান্টসিরাবের কাছাকাছি আমবহিমাঙ্গা নামক একটি গ্রামে। মাদাম ক্লদ্যাঁরও নিবাস ওখানে। অনেক বছর আগে ডিভোর্সপ্রাপ্ত নিঃসন্তান ক্লদ্যাঁ বর্তমানে আমবহিমাঙ্গাতে একটি ক্যাফে চালাচ্ছেন। তো, গেল পরশু আমরা রওনা হই ওই দিকে। এক জামানার ফরাসি কলোনি মাদাগাসকারে এখনো বহাল তবিয়তে চলাচল করছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমলের অনেকগুলো সিত্রোন মোটরকার। এ মডেলের ভিনটেজ গাড়ির প্রতি আমার নস্টালজিক অনুরাগ আছে। তাই, আমবহিমাঙ্গাতে যাওয়ার জন্য আরিস্তিদ ও কাহিনা ঈদের দিনে পরিধেয় আদ্দির সফেদ কোর্তার মতো ধবধবে সাদা একটি সিত্রোন ট্যাক্সি কিরায়া করলে আমার উল্লাস চরমে পৌছায়। খুশমেজাজে গাড়িতে সওয়ার হয়ে বাতচিতে এ দম্পতি সম্পর্কে বেশ খানিকটা জানতে পারি। আরিস্তিদ পেশা হিসেবে বেশ কয়েক বছর কাজ করেন ফরাসি নৌবাহিনীতে। তিনি জলযুদ্ধের তেমন কিছু জানেন না। তাঁর দায়িত্ব ছিল যুদ্ধজাহাজের দরজা-জানালা ও কামানের নলে রঙের বার্নিশ লাগানো। ভিয়েতনামের সাইগন বন্দরে



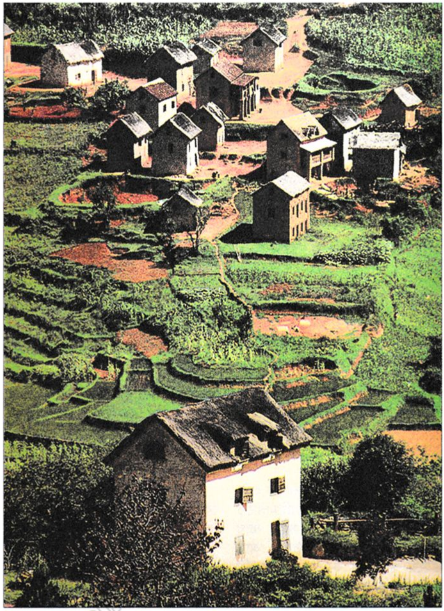
আবগারি বস্তু স্মাগল করতে গিয়ে বমাল ধরা পড়ে কিক্‌ড্ আউট হন মঁশিয়ো আরিস্তিদ ফ্রেঞ্চ নেভি থেকে। বর্তমানে তিনি ফরেনসিক ফটোগ্রাফার হিসেবে কাজ করছেন। কোথাও গুমখুন হলে ফ্রান্সের একটি মফস্বল শহরে ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চের তরফে তিনি লাশের ছবি তুলে দেন। তার স্পেশালিটি হচ্ছে—বনে-জঙ্গলে হঠাৎ করে পাওয়া কঙ্কালের ছবি তোলাতে। কাহিনার আদি নিবাস মরক্কোতে। ব্যারবার গোত্রের এ নারী বছর কয়েক আগে ফ্রান্সে অভিবাসী হয়েছে। পেশায় মেয়েটি বেলি ড্যান্সার। ব্রেইডের ইমপ্রেসিভ নকশায় জট পাকানো তার চুল এবং মুখখানা জাম্বুরার মতো গোলমোল। তবে, চলাচলে এ রমণীর কোমরের ঠাট-ঠমক



ভিনটেজ বাহন সিত্রোন

ও নিম্ননাভি পথচারী পুরুষদের অন্যমনস্ক করে দেয় নিমেষে। সিত্রোনে আমার পাশে বসে খুব সুইটভাবে হাসলে আন্দাজ করি—ড্যান্সরতাবস্থায় এভাবে ওষ্ঠ স্ফুরিত করলে তার অনুরাগীরা উষ্ণ হয়ে ওঠে নির্ঘাৎ।

বিকেল পড়ে আসার দিকে আমরা এসে পৌঁছি আমবহিমাঙ্গাতে। সিত্রোনের জানালা দিয়ে আমি আচানক এ গ্রামের প্যাস্টোর‍্যাল সেটিংয়ের দিকে তাকাই। মনে হয়, যেন সময়যন্ত্রে সওয়ার হয়ে চলে এসেছি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আমলে গড়ে ওঠা ফরাসি



ফরাসি কেতার গ্রাম

দেশের একটি প্রান্তিক ভিলেজে। ধান ও যবের বিস্তীর্ণ সবুজ খেতে চুনখাপ ওঠা ক্ষয়িষ্ণু ভিলাগুলো দাঁড়িয়ে আছে সুনসান। পুরো পরিবেশকে বিকেলের সফট আলোয় জলরঙের রুর‍্যাল ল্যান্ডস্কেপের মতো দেখায়।

ফরাসি কলোনিয়েল যুগের একটি ভিলাকে রেনোভেট করে মাদাম ক্লদ্যাঁ চালাচ্ছেন ক্যাফেটি। তিনি ক্যাশ কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে নির্লিপ্ত মুখে পান করছেন হোয়াইট ওয়াইন। আমাকে বিশেষ একটা পাত্তা দেন না। তবে, আরিস্তিদকে এমনভাবে জাপটে ধরে চুমো খান যে—পরিষ্কার বুঝতে পারি ক্লদ্যাঁ পানাপানে টং হয়ে আছেন। তিনি কাহিনার নৃত্যছন্দময় শরীরের তারিফ করতে গিয়ে নিজে ড্যান্সের ভঙ্গিতে নানা রকমের ছংবং করেন। আমি বিরক্ত হয়ে ক্যাফের বারান্দায় চলে আসি। ওখানে দেখা হয় সিনিওর থিয়াগো লোপেসের সঙ্গে। তিনি নাকের ডগায় হাই পাওয়ারের রিডিং গ্লাস ঝুলিয়ে সিনোরিতা লোরেনাকে ক্রসওয়ার্ড পাজলের অন্ধিসন্ধি বোঝাচ্ছেন। শব্দের খেলায় অনিচ্ছুক বালিকাটি আইপ্যাড হাতে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে, বোধ করি ফেসবুকের মেসেজ আদান-প্রদানে। আমাকে দেখতে পেয়ে সিনিওর থিয়াগো বেজায় খুশি হন। কথায়-বার্তায় তার মতো ফ্র্যাংক পুরুষ জগৎসংসারে বিরল। আমরা বাতচিতে লিপ্ত হলে লোরেনা ফিক করে হেসে আইপ্যাডে টাইপ করতে শুরু করে। রুপালি একটি সরু চেইন নেমে এসেছে তার বুকের বিভাজিকা অব্দি। তাতে এসপানিওল ভাষায় লেখা 'মি নভিও সেম্পরে ফুয়ে গ্রসেরো আ মি', যার তর্জমা 'আমার বয়ফ্রেন্ড সব সময় আমার সাথে রূঢ় আচরণ করেছে'। জানতে পারি, লোরেনা দ্বিতীয়বারের মতো বাড়ি থেকে পালিয়ে স্রেফ রানঅ্যাওয়ে গার্লের জীবনযাপন করছে—তার মায়ের বয়ফ্রেন্ডের সাথে বনিবনা না হলে। ছাত্রী কি না—তা জানতে চাইলে সে এক বাক্যে জবাব দেয়, 'আই হেইট গোয়িং টু কলেজ।' সিনিওর থিয়াগো পেশায় বর্তমানে টেলিকমিউনিকেশন টেকনিশিয়ান। তবে প্রথম জীবনে তিনি বুচারস শপ বা কসাইয়ের দোকানে অ্যাপ্রেনটিস হিসেবে কাজ করেছেন। তখন গবাদিপশুর প্রতি যে নির্দয় আচরণ করেছেন, তার জন্য থিয়াগো হালফিল অনুশোচনায় জেরবার হচ্ছেন। জবাইজনিত গুনাহের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে হালফিল গরুর প্রতি বেজায়

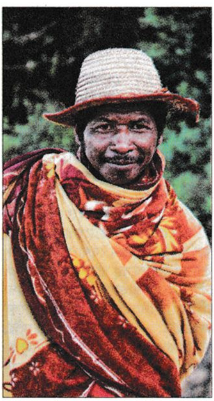


নদীজলে চালুনি ঝাঁকিয়ে গোল্ডপ্যানিং

সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেছেন তিনি। বর্তমানে তার হবি হচ্ছে—ছুটির দিনে কোনো খামারে গিয়ে গরুকে আপেল খাওয়ানো। মাদাগাসকারে আপেল দামে আক্রা, তবে সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে প্রচুর আম। থিয়াগো ব্যাকপ্যাকে কয়েক হালি আম নিয়ে ঘুরছেন। আমবহিমাঙ্গাতে কোনো জেবু বা গরুর সাথে তার মোলাকাত হলে তিনি তাকে আম খাইয়ে আপ্যায়ন করতে চান। আমি তাঁকে পিঁপড়াকে রুটিন করে বাদ-ফজর চিনি খাওয়ানোর আইডিয়া দিলে তিনি উচ্ছ্বাসে আমাকে জড়িয়ে ধরার উপক্রম করেন। ঠিক তখনই ক্যাফেতে এসে ঢোকেন লাসা ডাডাডি তাসা। তার বগলে রংচঙে জুটিওয়ালা একটি লাল মোর্গা। ডাডাডি তাসা আমবহিমাঙ্গার স্কোয়ারে তার মোর্গা দিয়ে কক-ফাইট করাচ্ছিলেন। ক্লদ্যাঁর সঙ্গে তার জানাশোনা অনেক দিনের। তাই, মাদামের ফোনকল পাওয়ামাত্র ছুটে এসেছেন। সিনোরিতা লোরেনা উঠে আইপ্যাডে মোর্গার ছবি তুলতে গেলে ব্যাটা কুক্কুট এক্সাইটেড হয়ে এমন জোশে কুককুরুকু করে ওঠে যে—বালিকাটি 'হোলি কাউ' বলে আঁতকে ওঠে।

ডাডাডি তাসা প্যাকেজ ট্যুর বিরোধী ছোটো পর্যটক নিয়ে আগেও কয়েকবার সিঙ্গি-ডে-বেমারাহার লাইমস্টোন ফর্মেশনে বেড়াতে গেছেন। ৎসিরিবিহিনা নদীর তীরে গ্রামগঞ্জের সাথেও তার সাক্ষাৎ পরিচয় আছে। তিনি হাল ফ্যাশনের শৌখিন মোটরবোটের পরিবর্তে সস্তায় পিরাগ-বোট বা গাছের কাণ্ড কুঁদে তৈরি ডিঙি নৌকায় জলপথ অতিক্রমের প্রস্তাব দিলে আমরা সাথে সাথে রাজি হই। তাঁর মেহনত বাবদ যে পারিশ্রমিক হাঁকেন তাও আমাদের বাজেটের আওতাধীন। অতঃপর আমরা জার্নি বাই বোটের সম্ভাবনায় এক্সাইটেড হয়ে বিষয়টি সেলিব্রেট করি। কাহিনা ক্যাফে থেকে ক্রয় করেন এক শিশি নেপোলিওন ব্র্যান্ডি। তা পান করতে করতে আমরা এ যাত্রার খুঁটিনাটি পরিকল্পনা সেরে নিই।

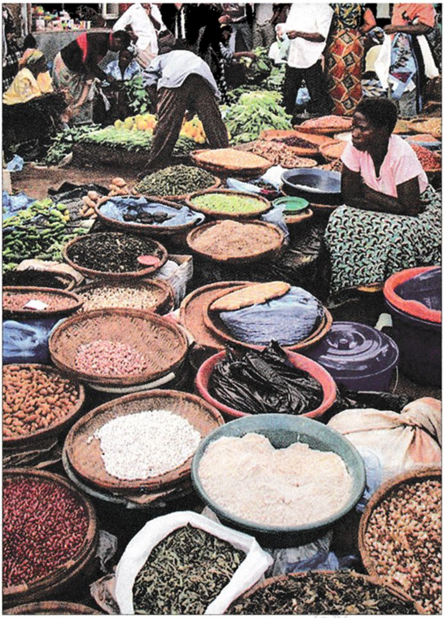
আমরা যে জেবু-কার্ট চেপে ধানের বিস্তীর্ণ প্রান্তর এই মাত্র অতিক্রম করেছি, তার একটি চাকা নড়বড়ে হয়ে খুলে পড়ার উপক্রম হলে—গাড়োয়াল গাড়ি থামিয়ে গরু দুটিকে ছেড়ে দিয়ে চাকা সারাই করতে বসে। এখানে চমৎকার একটি নিস্তরঙ্গ নদী। তার পাড়ের কাঁচা সড়ক ধরে ক্যাচম্যাচিয়ে অন্য দুটি জেবু-কার্ট থিয়াগো-লোরেনা ও আরিস্তিদ-কাহিনাকে নিয়ে ছুটে চলে গ্রামীণ এক বাজারের দিকে। লাসা ডাডাডি তাসা নরম মাটিতে মুরগির পালক গুঁজে গুঁজে তৈরি করেন একটি বৃত্ত। তার ভেতরে নরমুণ্ডু বসিয়ে তিনি



গাইড লাসা ডাডাডি তাসা

ধুন ধরে কী যেন হিসাবকিতাব করেন। ঠিক বুঝতে পারি না—তিনি কি বিচিত্র এ রিচুয়ালের মাধ্যমে তার পূর্বপুরুষদের সাথে যোগাযোগ করে জেনে নিচ্ছেন তাঁর ভবিতব্য, নাকি আমাদের নৌযাত্রার গন্তব্য নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে চেষ্টা করছেন তীব্র মনঃসংযোগে ঝুঁকি কমাতে। আমাদের সহযাত্রী আরিস্তিদের নৃতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা আছে। তার কাছ থেকে জেনেছি যে—এখানকার জনগোষ্ঠীর এক বৃহদংশ হাজার বছর আগে ইন্দোনেশিয়া থেকে নৌকায় ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে মাদাগাসকার দ্বীপে এসে গড়ে তোলে তাদের অভিবাসী জীবন। এদের মাঝে ডায়েক বলে একটি গোত্রের মানুষজন মাদাগাসকারে আজ থেকে প্রায় এক শ বছর আগেও হেডহান্টিং করে নরমুণ্ডু সংগ্রহ করত। ঠিক এই নামে ইন্দোনেশিয়ার বোর্নিও দ্বীপের কালিমানতানে একটি গোত্রের বসবাস। কালিমানতানের ডায়েকরা কিছুদিন আগে অব্দি হেডহান্টিং করে সংগৃহীত নরমুণ্ডু দিয়ে নানা কিসিমের রীতি-রিচ্যুয়ালের আয়োজন করত। আমাদের ডাডাডি তাসা ডায়েক গোত্রের লোক। তিনি তাঁর পূর্বপুরুষের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছেন একটি করোটি। তিনি এবার ঘটিতে আরক ঢেলে নরমুণ্ডুর কাছে রাখছেন। বিষয়টিকে রহস্যময় মনে হয়। ভাবি—আরিস্তিদের মাধ্যমে এক সুযোগে ডাডাডি তাসাকে কথা বলিয়ে এ বাবদে আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ করে নেব।

জেবু-কার্টের চাকা সারাই করতে প্রচুর সময় লাগছে। আমি অধৈর্য হয়ে নদীর পাড় ধরে হাঁটি। দেখি—ওখানে গ্রামের গরিবগোর্বা মানুষেরা হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে বালুকাময় কাদামাটি চালুনিতে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে গোল্ডপ্যানিং করছে। চালুনি ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে স্বর্ণের কণা খোঁজা ছোট্ট একটি বালক চোখমুখে রাজ্যের কৌতূহল নিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে আমাকে দেখে। আমি অলস পায়ে হাঁটতে হাঁটতে ভাবি—এদের সংগৃহীত সোনার জেওরে হয়তো কোনো দিন আলোকিত হয়ে উঠবে কোনো দূরদেশের অজানা যুবতীর গ্রীবা, কিন্তু সে কখনো সচেতন হবে না—এ সোনালি ধাতু সংগ্রহের পেছনে মাদাগাসকারের অজ এক পাড়াগাঁয়ের মানুষজনের রোদজলে দাঁড়িয়ে মেহনতের কথা। ডাডাডি তাসা শিঙ্গা ফুঁকে আওয়াজ করলে ঘুরে তাকাই। তিনি ইশারায় আমাকে ফিরে যেতে বলেন। আন্দাজ করি, জেবু-কার্টের চাকা সারাই হয়ে গেছে। আমি নদীর



গ্রামীণ বাজার ইফোতাকাবদ্রি

গ্রামীণ বাজার ইফোতাকাবদ্রি

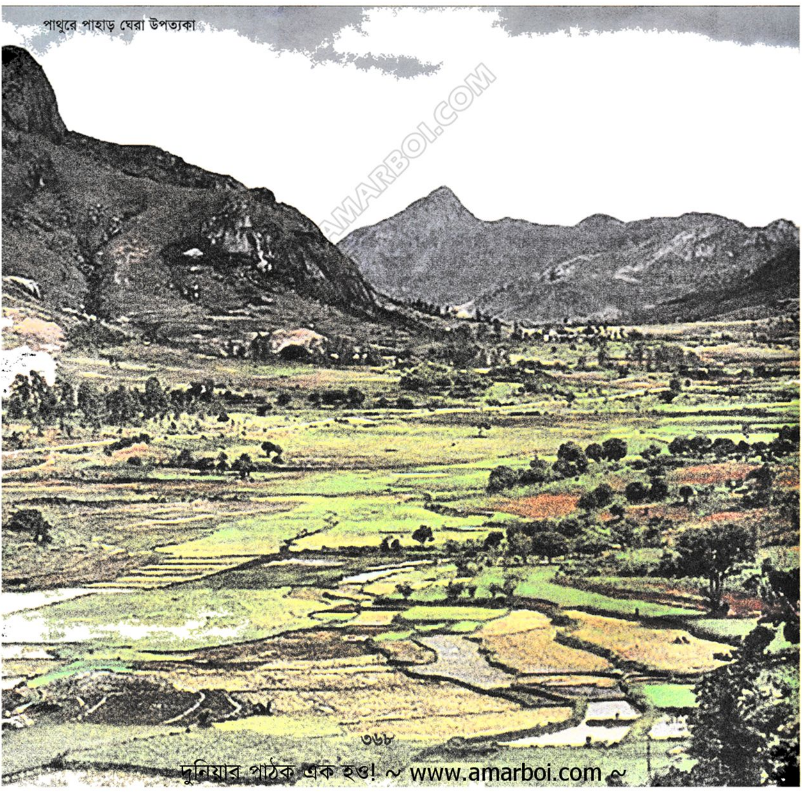
বিকেলের দিকে ঘামে-ধুলায় লবেজান হয়ে আমরা গ্রামীণ একটি বাজার ইফোতাকাবদ্রিতে এসে পৌঁছাই। প্রচুর লোকজন সওদাপাতি খরিদ করতে এসেছে। আমরা জেবু-কার্ট থেকে নেমে চাল, যবের দানা, শিমের বিচি, তিসি, সবুজ শাকসবজি ও কাঁচালঙ্কা দিয়ে সাজানো বেতের চাঙ্গারিগুলো ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা গুচ্ছ গুচ্ছ আমআদমিকে দেখি। ডাডাডি তাসা মালাগাছি ভাষায় 'অরভুনিতেনা অরভুনিতেনা' বলে হঠাৎ খেয়াল হওয়ায় শরম পেয়ে হেসে টোটাফাটা ইংরেজিতে বলেন—এ লবজটির শব্দার্থ হচ্ছে হাটবার। তিনি আমাদের নৌযাত্রার জন্য সস্তায় আনাজপাতি কিনে নেওয়ার পরামর্শ দেন। সড়কে দাঁড়িয়ে থাকা একটি মাইক্রোবাস দেখতে পেয়ে আমরা পয়লা মিয়ানদ্রিবাজোতে যাওয়ার বিষয়টি পাকা করতে চাই। ওদিকে পা বাড়াতেই চশমাচোখে চুটিঅলা চুলের এক মেয়ে-পুলিশ আমাদের গতিরোধ করে দাঁড়ায়। পুলিশ নারীটির ঠোঁটে টকটকে লাল রঙের লিপস্টিক। সে সিরিয়াস মুখে মেগাফোন হাতে নিয়ে মালাগাছি ভাষায় 'সালামা আচারা' বা 'হ্যালো...শুভেচ্ছা' বললে জোরদার আওয়াজে আমার সহযাত্রীরা আঁতকে ওঠেন। ডাডাডি তাসার মনে হয় পুলিশ মেয়েটির সাথে জানাশোনা আছে। তিনি তাঁর কাঁধে সস্নেহে হাত রেখে আমাদের পরিস্থিতি বুঝিয়ে বলেন। তাতে সে আয়না বসানো ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে নোটবুক বের করে উডপেনসিলে লিখে নেয় আমাদের নাম, জাতীয়তা ও পাসপোর্ট নাম্বার। তারপর মাইক্রোবাসের দিকে হেঁটে গিয়ে ড্রাইভারকে চোটপাট করে বলে—আমাদের জন্য সামনের তিনটি সিট রিজার্ভ রাখতে। আমি খুশি হয়ে তাকে মালাগাছি ভাষায় বলি 'মিসাওতরা' বা 'থ্যাংকয়ু'। তাতে বোধ করি আশকারা পেয়ে সে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বলে, 'মঁশিয়ো, উমে উ ভুলা' বা 'মিস্টার, আমাকে কিছু টাকা দাও'। পুলিশদের এ খাসলতের সাথে আমার আশৈশব পরিচিতি আছে। তাই, আবদারে বিরক্ত না হয়ে সামান্য কিছু টাকা তার হাতে ধরিয়ে দিই। তাতে নারী-পুলিশের মুখে শবেবরাতের সন্ধ্যায় খয়রাত হিসেবে গাজরের হালওয়া পাওয়া মিসকিন কিশোরীর মতো হাসি ফোটে। আমি তার ছবি তোলার জন্য ক্যামেরা বাগছাও করলে ডাডাডি তাসা ইশারায় মানা করে আমাদের সবজিপাতি কেনার জন্য তাগাদা দেন।

প্যাসেনজার্স জোগাড় হওয়ার পর মাইক্রোবাস মিয়ানদ্রিবাজোর দিকে মেলা দেবে। তাড়াহুড়ার কিছু নেই। আমরা জার্নি বাই বোটের কথা ভেবে সওদাপাতি খরিদ করার উদ্যোগ নিই। সিনিওর থিয়াগো একটি মুদির দোকানে ঢুকে লোরেনাকে কিনে দেন বেশ বড় দুই প্যাকেট ক্যান্ডি ও ডজন তিনেক টিপকলম। এদের পরিকল্পনা হচ্ছে,

নৌযাত্রায় পথশিশুদের দেখা পেলে লোরেনা টিপকলম বা ক্যান্ডি দিয়ে তাদের ছবিটবি তুলবে। মুদির দোকান থেকে বেরিয়ে সে পসরা-পট্টির ভেতর দিয়ে হেঁটে গেলে কীভাবে যেন ক্লিপ খুলে তার কাঁধ ছাপিয়ে ছড়িয়ে যায় সোনালি চুল। হাটের ফুটপাতে পাতা একটি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে একজন খরিদদার নারী ও দুটি বাচ্চা মেয়ে তাজ্জব হয়ে ব্লন্ডচুলের লোরেনাকে অবলোকন করে।

আমি ফুলকপি, গাজর, আলু ও মটরশুঁটির সাথে খরিদ করি বড় এক ব্যাগ পাস্তা, কুকিং অয়েল ও দুটি তাজাতনা মোর্গা। সওদাপাতি প্লাস্টিকের ব্যাগে বাঁধাছাদা করতে করতে খেয়াল করি—সামনের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে সাইকেল চালানো মারকুটে এক জওয়ান মর্দের সাথে ঝগড়া বেধেছে পিঠে চাদর দিয়ে শিশুবাঁধা এক নারীর। এদের ছাড়িয়ে খানিক সামনে যেতেই দেখি—অন্য একটি মুদি দোকান থেকে কয়েক বোতল ধেনো রাম, এক কার্টন দিশি সিগ্রেট ও সাবানের গোল্লার মতো দেখতে পনিরের গোটা সাতেক বল নিয়ে বেরিয়ে আসছেন আরিস্তিদ ও কাহিনা। আমরা মাইক্রোবাসের দিকে রওনা দিই। আমাদের সামনে চালের বস্তা বোঝাই চাকাওয়ালা কার্ট টেনে টেনে চলেন হাফপ্যান্টুল পরা এক লোক। তাঁর পেছন পেছন হাঁটছে দুটি পোংটা কিসিমের পথশিশু। তারা থেকে থেকে জোর আওয়াজে হিড়িক দেয়—'উতরাঙ্গা উখরা' বলে। এতে চালের কার্ট টানা মানুষটি তেতোবিরক্ত হয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে তাদের খিস্তি করেন। 'উতরাঙ্গা উখরা' শব্দ দুটি বাঁশঝাড়ের ডগায় আটকা পড়া কাটা ঘুড়ির মতো আমার কানে পতপত করে। এর ভাবার্থ জানার জন্য আমি চারপাশে তাকাই, কিন্তু কোথাও ডাডাডি তাসাকে দেখতে না পেয়ে বেজায় বিরক্ত লাগে। গাড়িতে ফেরার পথে দেখি—ফুটপাতে আজানা কোনো রকমের বীজের পসরা নিয়ে বসেছে চাদরপরা দুটি ছেলেমেয়ে। তারা হাসিমুখে আমার দিকে চেয়ে হাত নাড়ে। মাইক্রোবাসে ইতিমধ্যে প্যাসেনজার্সদের রীতিমতো মচ্ছব লেগে গেছে। আমরা ভিড়বাট্টায় ঘষা খেয়ে উঠে পড়তেই দেখি—সামনের সিটে চোখ মুদে বসে আছেন ডাডাডি তাসা। তাঁর কাঁধ থেকে ঝুলছে ছোট্টমোট্ট একটি স্টিরিও। তা থেকে বাজছে জ্যামাইকার মশহুর সংগীত কলাকার বব মার্লের গান, 'গেট আপ, স্ট্যান্ড আপ: স্ট্যান্ড আপ ফর ইয়োর রাইটস/গেট আপ, স্ট্যান্ড আপ: ডোন্ট গিভ আপ দ্য ফাইট।'

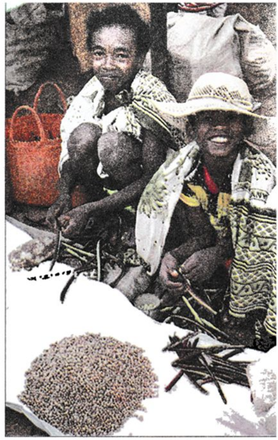
সন্ধ্যা হতে বেশ খানিকটা দেরি আছে। মাইক্রোবাসটি প্রচুর



পাথুরে পাহাড় ঘেরা উপত্যকা

প্যাসেনজার, সওদাপাতি, মোরগ, ছাগল, গুড়ের টিন, কমলালেবু ও কাটা আখের আঁটি নিয়ে তার যান্ত্রিক জিগরের চেয়েও অনেক জোরেশোরে ছুটছে মিয়ানদ্রিবাজোর দিকে। হিসাব করে বুঝতে পারি—ওখানে পৌছাতে রাত সাড়ে আটটার মতো বেজে যাবে। পিরাগ-বোট ও মাঝি জোগাড় করে তাদের সাথে মজুরি ইত্যাদির বিষয় আজ রাতে ফয়সালা করতে হয়। আমরা চাচ্ছি—আগামীকাল খুব ভোরবেলা ৎসিরিবিহিনা নদীতে জার্নি বাই বোটের বউনি করতে। রাতে সবকিছু অ্যারেঞ্জমেন্ট ঠিকমতো করা যাবে তো? বেজায় টেনশন লাগে। উদ্বেগ থেকে মনকে সরানোর অছিলায় আমি চলমান সড়কের দিকে নজর দিই। জলাভূমিতে গোসল করে গায়ের কাদামাটি ছাড়িয়ে নিচ্ছে জেবু বা গরুর পাল। কচুরিপানার স্তূপে স্তূপে একাগ্রচিত্তে বসে আছে অনেকগুলো সাদা বক। গাছতলায় বসে রাখালরা বাজাচ্ছে বাঁশি ও তারের যন্ত্র। আমরা অতিক্রম করে যাই ছনে ছাওয়া লাল কাদামাটির গোলাকার কুটিরওয়ালা একটি গ্রাম। নারকেল কুঞ্জের পত্রালি ছাড়িয়ে ওপরে উঠে গেছে গির্জার ঘণ্টা বাজানোর টাওয়ার।

এবার পথের এক পাশে সূর্যালোকে ঝলমল করে শাপলা ভাসা ঝিল। তাতে বেলেহাঁসগুলো বেপরোয়াভাবে ভাসছে। কিছু মানুষ কোমরে গামছা প্যাচকুন্দা দিয়ে পরে কোঁচ দিয়ে গেঁথে গেঁথে মাছ ধরে ধরে রাখছে মাথায় বেতি দিয়ে আটকানো খাকরায়। মাইক্রোবাস হর্ন বাজিয়ে ক্রস করে যায় একটি মনমরা কিসিমের জনবিরল ছোট্ট বাজার। পাশে স্কুলঘর, তার সামনে বাস্কেটবলের কোর্টে বসে গুলতানি করছে কচমা-বয়সী ছেলেমেয়েরা।

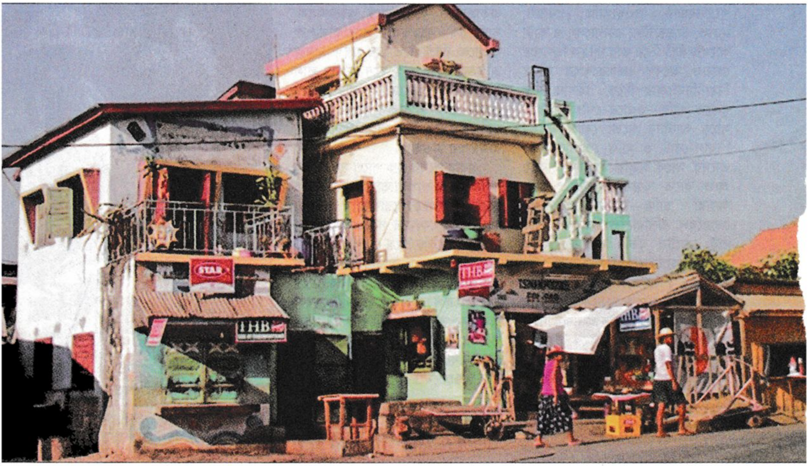


ফুটপাতে অজানা বীজের পসরা



আরও খানিকটা পথ অতিক্রম করতেই দেখি—দিগন্তে পাড়ার ঘাড় বাঁকা মাস্তানের মতো উদ্ধত হালতে দাঁড়িয়ে আছে আস্ত একটি পর্বত। তার তলায় ফুটহিলের টিলাটক্করে স্পষ্টত চলছে মাইনিং। খনি থেকে ধাতু কিংবা মহার্ঘ পাথর খুঁড়ে বের করার যন্ত্রপাতির আউটলাইন বাসের জানালা থেকে পরিষ্কার দেখা যায়। পথের পাশ দিয়ে খনিতে নাইট ডিউটি করতে যাচ্ছে মাথায় বেসবল ক্যাপ পরা একদল মানুষ, তাদের গলায় ঝুলছে হেডল্যাম্প। মাথায় কমলালেবুর ঝুড়ি নিয়ে হেঁটে যেতে যেতে মাইক্রোবাসের দিকে তাকিয়ে ফিক করে হাসে একটি যুবতী। সূর্যালোকে ঝিক করে ওঠে তার সোনায় বাঁধানো দাঁত।

মাইক্রোবাস পথের পাশে একটু থামে। কোনো কোনো যাত্রী নেমে ঝোপের আড়ালে সেরে নিচ্ছে প্রক্ষালন। আমিও নেমে খিল ধরে যাওয়া হাতপায়ের আড় ভাঙি। নিচের উপত্যকায় চোখ পড়ে। তিনটি পাথুরে পাহাড়ের ঘেরাটোপে আল বাঁধানো ধানখেতের জ্যামিতিক নকশায় পড়েছে বেলাশেষের আলো। বাসে ফিরে গিয়েও আমি আবার জানালা দিয়ে উপত্যকার দিকে তাকাই। গাড়ি ফের রওনা হয় চাকা ঘরঘরিয়ে। পথপাশের তাবত ডিটেলস খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ঠিক বুঝতে পারিনি। ঝিমানির চটকা ভাঙতেই দেখি—ঘড়িতে রাত আটটা বাজতে মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি। মাইক্রোবাসটি থেমেছে মিয়ানদ্রিবাজোর বাসস্টপে। আমরা গন্তব্যে নেমে পড়ার উদ্যোগ নিই।



মিয়ানদ্রিবাজোর গেস্ট হাউস

মিয়ানদ্রিবাজোর বিয়ার গার্ল মিমিকো

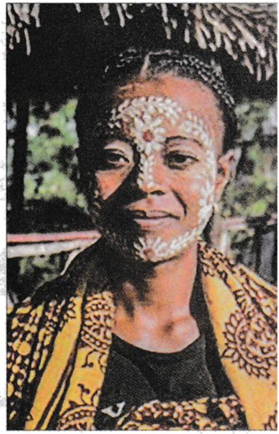
পর্যটনি পুস্তকে মিয়ানদ্রিবাজোকে শহর বলে উল্লেখ করলেও আদতে জায়গাটি নদীর কাছাকাছি গঞ্জের মতো। এখানে আজ সন্ধ্যায় বিজুলি সরবরাহ বিঘ্নিত হয়েছে। দোকানপাটে জ্বলছে লণ্ঠন ও কেরোসিনের কুপি। তার আবছা আলোয় আমরা চাকাওয়ালা ব্যাগ-বস্তনি টেনে পায়ে হেঁটে রওনা হই কাছাকাছি একটি গেস্ট হাউসের দিকে। ডাডাডি তাসা রিকশায় নৌযাত্রার জন্য কেনা আনাজপাতি, মোর্গা ও কুকিং অয়েল ইত্যাদি তুলে দেন। হাতে টানা রিকশাটি টুংটুংগিয়ে ঘণ্টি বাজিয়ে চলে আমাদের পেছন পেছন। হাঁটতে হাঁটতে আমরা আকাশের দিকে তাকাই। ওখানে তারকার তরবারি হাতে কালপুরুষ পাহারা দিচ্ছেন বিপুল নীলিমা। তার চারপাশে কালো জমিনে জরির সোনালি বুটিদার কাশ্মীরি শালের মতো জ্বলজ্বল করছে অজস্র নক্ষত্র। এদের দ্যুতিময়তায় দীপ্ত হয়ে লোরেনা এসপানিওলে মন্তব্য করে, 'কে মারাবিওসো' বা 'হাউ মার্ভেলাস?' সিনিওর থিয়াগো তার গণ্ডদেশে চুকুস করে চুমো খেয়ে ফিসফিসিয়ে জবাব দেন, 'এরেস লা মেখর চিকা দেল মুনদো' বা 'ইউ আর দ্য বেস্ট গার্ল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড।' আমরা সিঁড়ি বেয়ে উঠি গেস্ট হাউসের বারান্দায়। ওখানে শোঁ শোঁ শব্দে ধোঁয়া ছড়িয়ে একটি হ্যাজাক বাতির যেন নাভিশ্বাস উঠছে। এক কর্মচারী আমাদের টর্চ জ্বেলে কামরা দেখিয়ে দেন। ওখানে ছড়িয়ে আছে মশার ওষুধের মৃদু গন্ধ। বাথরুমে পানিভর্তি বালতির ওপর ভাসছে একটি এনামেলের মগ। মোমবাতি জ্বালাতেই শুঁড় উঁচিয়ে চারদিকে ছুটে যায় কয়েকটি চঞ্চল কিসিমের আরশোলা। 'ওয়েল, আ ম্যাটার অব ওনলি ওয়ান নাইট,' বলে নাক কোঁচকান মঁশিয়ো আরিস্তিদ। আমিও ভাবি, কোনোক্রমে গুজরান করে দেব আজকের রাত।

গেস্ট হাউসের গ্রাউন্ডফ্লোরে বার কাউন্টার। ওখানে উঁচু রিভলভিং চেয়ারে বসে ষন্ডা কিসিমের বিরাট বপু

এক বারটেন্ডার ঝিমাচ্ছেন। বারের অবস্থান খোলামেলা বারান্দায়, সাথে সিমেন্ট বাঁধানো লাগোয়া উঠানে খান কয়েক বেতের চেয়ার ও টেবিল পাতা। গাছের ডালে ঝোলানো টিমটিমিয়ে জ্বলা কয়েকটি হারিকেনের আলোয় পুরো উঠানকে রহস্যময় দেখায়। বারের ঠিক উল্টা দিকে জ্বলছে সোলারের ছোট্ট একটি ল্যাম্প। তার আলোয় বসে সেলফোন হাতে গুলতানি করছে চারটি বিয়ার গার্ল। আমি বারের কাছাকাছি আসতেই এরা বিনা কারণে হেসে ওঠে খিলখিলিয়ে। আমি নিরাসক্ত ভঙ্গিতে তাদের অতিক্রম করে নেমে আসি উঠানে। তখন নজর পড়ে, একটি ঝোপের ঝুপসি আঁধারে আরাম কেদারায় আয়েস করে বসেছেন মঁশিয়ো আরিস্তিদ। তার কোলে বসে শরীর বাঁকা করে মাদমোয়াজেল কাহিনা বোধ করি গুনছেন আকাশের অসংখ্য তারকা। লণ্ঠনের আলোয় তার মুখকে দেখাচ্ছে ফোলা ফোলা লালচে। আমাকে দেখতে পেয়ে আরিস্তিদ বিয়ারের ফেনা উপচানো মগ তুলে ধরে চিয়ার্সের ভঙ্গি করেন। আমি হাত নেড়ে দূরের একটি চেয়ারে বসি। সাত রাজ্যের ক্লান্তি যেন হঠাৎ করে ধসে পড়া ইটের ভাটার মতো নেমে আসে আমার দেহমনে। আমি চারদিকে তাকিয়ে সন্ধান করি ডাডাডি তাসার। তাকে নিয়ে আজ রাতে পিরাগ-বোট ভাড়া করার বিষয়টি সুরাহা করে নিতে হয়।

বার কাউন্টার থেকে এক মগ বিয়ার নিয়ে আসে খুব খাটো ঝুলের শর্টস পরা একটি মেয়ে। সে আমার টেবিলে মগ রেখে ভাঙাচোরা ইংরেজিতে বলে, 'মাই নেম ইজ ছিছিয়া তাহিরে মিমিকো।' লণ্ঠনের আলোয় তার মুখখানিকে দেখায় নরম-সরম। কিন্তু আমি তার সাথে এ মুহূর্তে কথা বলতে চাই না। তাই, হাত তুলে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করলে সে মুখ আমসি করে ফিরে যায় বার কাউন্টারে। আমি বিয়ার মগের শীতল কাচে কপাল ঘষে ক্লান্তির সাথে যুঝি। মাদাগাসকারে আসার পথে কেনিয়ার নাইরোবি বিমানবন্দরে কীভাবে যেন আমার শোল্ডার পাউচটি খোয়া যায়। তাতে কিছু জরুরি ওষুধপত্র ছিল। দিন সাতেক হয় আমি ব্লাডপ্রেশার ও থাইরয়েড ব্যালেন্সের ট্যাবলেটগুলো নিতে পারছি না। আন্দাজ করি, এর প্রতিক্রিয়ায় শরীরে জমছে অসহনীয় ক্লান্তি।

ঝোপের কাছ থেকে কাহিনা ব্যারবার ভাষায় গেয়ে ওঠে কী একটা গান। আরিস্তিদ গানের কথা বুঝতে না পারলে সে ইংরেজিতে লিরিকটি তর্জমা করে বলে, 'হোয়েন ইউ স্মাইল ইন স্টারলাইট, দ্য হোল ওয়ার্ল্ড স্টপস অ্যান্ড স্টেয়ার অ্যাট ইউ ফর আহোয়াইল।' জবাবে ঠান্ডা বিয়ারে রুমাল ভিজিয়ে আরিস্তিদ কাহিনার কপাল মুছিয়ে দিতে দিতে বলেন, 'ইউ আর সো কুল অ্যান্ড সুইট হানি।' ডাডালি তাসা দুজন মাঝি ও দীর্ঘ বুটিঅলা চুলের এক লোককে নিয়ে আমার টেবিলে এসে হাজির হন। তাঁর তর্জমায় এদের সাথে টুকটাক কথাবার্তা হয়। এঁরা গাছের গুঁড়ি কুঁদে বানানো চারটি পিরাগ-বোট ভাসানোর প্রস্তাব করেন। একটি বোটে করে যাবে খাবারদাবার, মালমাত্তা ও সামানাদি। বেলো-সুরে নাও ভাসিয়ে পৌঁছাতে পথে কেটে যাবে তিন রাত। জটাজুট চুলের মানুষটির নাম ফেতরাসেনা হারিনিয়ানা। তিনি আমাকে আশ্বস্ত করে বলেন যে নৌযাত্রার জন্য তাঁবু ও স্লিপিং ব্যাগ ভাড়া করতে অসুবিধা হবে না। নদীপথে তাঁর জানাশোনা গ্রামের কাছে বালুচরে আমরা টেন্ট পেতে রাত গুজরান করব। ডাডাডি তাসার সাথে তিনি আগেও কাজ করেছেন। নিরাপত্তার ব্যাপার তিনি নিশ্চিত করে



মহিলার মুখে চন্দনের ফোঁটার নকশা

আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলে আমি হ্যান্ডশেক করতে করতে ফেতরাসেনার কাঁধ-ঝোলায় একটি বাঁশি দেখতে পাই। মানুষটিকে রেগে সিঙ্গারের মতো আলাভোলা দেখায়। মাঝিরা জনপ্রতি পুরো ট্রিপের জন্য পিগার-বোটসহ এক শ বিশ ডলার করে মজুরি হাঁকে। যা আমাদের এস্টিমেটেড কস্টের চেয়ে অনেক কম। আমি তাদের খাবারদাবার ও পানীয় বাবদ আরও তিরিশ ডলার অ্যাড করার কথা বললে তারা খুশিতে অ্যায়সা জোরে আমাকে মালাগাছি ভাষায় 'মিসাওতরা' বা 'থ্যাংকয়ু' বলে যে মনে হয় আমি হুকুম করলে তারা চর দখল করতেও প্রস্তুত।

বিষয়টি পাকাপাকি করার আগে আমি আমার সহযাত্রীদের সাথে একটু কথা বলে নিতে চাই। তাই, উঠে মাঝিদের বিয়ার দেওয়ার জন্য বার কাউন্টারে ইশারা দিই। বাইরে বেরুনোর দুয়ারের কাছে পাওয়া যায় সিনিওর থিয়াগোকে। তিনি সিনোরিতা লোরেনার জন্য কী একটা ওষুধ কিনতে বেরোচ্ছেন ফার্মেসির তালাশে। তাঁর সাথে সাথে চলছে পাঁচ ব্যাটারির টর্চ হাতে বার কাউন্টারের উলুমবুশাইয়ের মতো লোকটি। আমি থিয়াগোকে মাঝিদের সাথে আমার আলাপের পুরো ব্যাপার বুঝিয়ে বলতে চাই। কিন্তু তিনি অতশত খুঁটিনাটি ডিটেলস শুনতে চান না। আমার ওপর সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ ভার দিয়ে বেরিয়ে যান ভুড়ো পেটের বিশালদেহী বারটেন্ডারের সাথে। খোলা বারান্দার অন্যদিকে দেখা হয় আরিস্তিদ



দোকানে কাঁঠাল, আনারস, পেঁপে ও তেঁতুল



পাহাড়ের সামনে বেতের টুকরি হাতে ছেলেমেয়ে

ও কাহিনার সাথে। এরাও আমাকে মাঝিদের সাথে বিষয়আশয় নিষ্পত্তির ভার দেন। আমি রাতবিরাতে লোরেনার অসুস্থতায় উদ্বেগ প্রকাশ করি। আরিস্তিদ আমার কাঁধে হাত রেখে ফিসফিসিয়ে বলেন, 'অসুখবিসুখ গুরুতর কিছু না, আমার ধারণা সিনিওর থিয়াগো কন্ট্রাসেপটিভ খুঁজে পাচ্ছেন না, তাই ফার্মেসির সন্ধানে বেরিয়েছেন।' আমি কাহিনার দিকে তাকাই, প্রচুর পানে তাকে টিপসি দেখাচ্ছে, সে ফিক করে হেসে বলে, 'সিনিওর থিয়াগো ইজ ট্রায়িং হার্ড নট টু মেক লোরেনা প্রেগনেন্ট টু নাইট, হি ইজ সো কনসিডারেট!' এ যুগলের আচরণকে ভারসাম্যহীন মনে হয়। তো, আমি ফিরে আসি টেবিলে মাঝিদের সাথে পুরো বিষয় পাকাপাকি করতে। খাবারদাবার কেনার জন্য এক্সট্রা তিরিশ ডলারের অ্যাডভান্স নিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে বাও করে এরা বেরিয়ে যায়।

ডাডাডি তাসা তখন আরেকটি সমস্যার উল্লেখ করেন। অ্যাডভান্স টিকিট আজ কেটে না রাখলে সিঙ্গি-ডে-বেমারাহার লাইমস্টোন ফর্মেশনে ঢোকা যাবে না। আমি হিসাবকিতাব করি। ৎসিরিবিহিনা নদীতে নাও ভাসিয়ে আজ থেকে ঠিক পাঁচ দিন পর আমরা পৌছাব বেকুপাকা গ্রামে। পরদিন সিঙ্গি-ডে-বেমারাহায় যাওয়ার পরিকল্পনা। টিকিট বুকিং করে না রাখলে যদি ঢুকতে পারা না যায়, তাতে ফ্রাস্ট্রেশনের শেষ থাকবে না। ডাডাডি তাসা আমাকে টেলিফোনে পেমেন্ট করে টিকিট বুকিং করতে উপদেশ দিয়ে একটু সরে অন্য একটি টেবিলে বসে কাঁধঝোলা থেকে তারের একটি যন্ত্র বের করে টুংটাং করতে শুরু করেন।

আমি সেলফোনে পেমেন্ট করে টিকিট বুকিং করতে চেষ্টা করি। কিন্তু নেটওয়ার্কের ঝামেলায় ঠিক কানেক্ট করতে পারি না। তো বার কাউন্টারের দিকে হেঁটে গিয়ে আবার ট্রাই করলে মিমিকো এগিয়ে এসে আমাকে ইশারায় তার সাথে সিঁড়ির দিকে যেতে বলে। আমরা উঠে আসি তিনতলার খোলা ছাদে। আমার টেলিফোনটি হাতে নিয়ে সে আকাশের দিকে নিশানা করে নাগাল পায় নেটওয়ার্কের। কীভাবে পেমেন্ট করতে হয়—তার প্রক্রিয়া সম্পর্কে মেয়েটির পরিষ্কার ধারণা আছে। কাজ সারা হতেই আমরা নেমে আসি নিচে। জানতে চাই, 'ইউ হেল্পড মি মিমিকো, তোমাকে কি আমি টিপস দিতে পারি?' সে মাথা ঝাঁকিয়ে 'নট নেসেসারি মঁশিয়ো' বলে ফিরে যায় বার কাউন্টারে বসে থাকা তার বান্ধবী অন্যান্য বিয়ার গার্লদের কাছে।



রিকশায় শিশু ও সামনে কুকুর

উঠানে এসে বসতেই কেমন জানি একা লাগে। ঝোপেঝাড়ে ঝিঁঝির তীব্র শব্দে তারাজ্বলা রাতকে বেজায় রহস্যময় মনে হয়। চুপচাপ বসে থাকি একা। মাথায় স্কার্ফ জড়ানো মালাগাছি এক মহিলা আমার টেবিলের কাছে এসে খুঁটিয়ে আমাকে লক্ষ করেন। এ নারীকে একটু আগে বার কাউন্টারের কাছে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছি। মনে হয় আমাকে তাঁর কী যেন বলার আছে, কিন্তু কিছু না বলে তিনি ফিরে যান। একটু পর উঠানে আসে মিমিকো। সে সেলফোনের আলো জ্বেলে ঝোপের কাছে একটি গাছ থেকে হাত বাড়িয়ে চয়ন করে কয়েকটি ফুল। আমি ঘাড় ঘুরিয়ে তার টানটান হয়ে আসা শরীরের প্রোফাইল দেখি। একটু পর উঠানে দাঁড়িয়ে কিছু একটা ইতস্তত করে মেয়েটি লাজুক মুখে এসে দাঁড়ায় আমার

টেবিলে। অন্তর্বাসের ভেতর থেকে দেশলাই বের করে সে ফস করে জ্বালায় টেবিলের মাঝামাঝি পিরিচে রাখা মোমবাতি। তার আলোয় আমার দিকে কয়েকটি ফিরিঙ্গিপানি ফুল ছড়িয়ে দিলে আমি কৌতূহলী হয়ে বলি, 'উড ইউ লাইক টু সিট ডাউন মিমিকো।' নিঃশব্দে বসে পড়ে সে আমার দিকে তার হাত বাড়িয়ে দেয়। আমি তা মুঠোয় তুলে নিলে অনুভব করি—মেয়েটির করতল ঝড়ে নীড় ভেঙে পড়া শিশু-শালিকের হৃৎপিণ্ডের মতো কাঁপছে। আমি বিঘতভাবে উন্মোচিত তার স্তনযুগলের বিভাজিকার দিকে তাকিয়ে নিজেকে নীরব উচ্চারণে প্রশ্ন করি—অ্যাম আই হুকড নাউ? মুঠো থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মিমিকো এবার সরাসরি আমার দিকে তাকায়। মোমের মৃদু আলোয় তার ঘন আখিপল্লব জ্যোৎস্না প্লাবিত নিসর্গপটের মতো ছড়াচ্ছে স্নিগ্ধতা। নীরবতায় বিপন্ন বোধ করে আমি সরাসরি প্রশ্ন করি, 'হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট গার্ল?' জবাব দিতে গিয়ে থতমত খেয়ে মেয়েটি মালাগাছি ভাষায় বলে, 'নোয়ানা আহো।' আমি তা বুঝতে না পেরে বলি, 'ডোন্ট ইউ নট নো হাউ টু স্পিক ইংলিশ?' খুব নার্ভাসভাবে সে জানায়, 'মঁশিয়ো, আই অ্যাম থ্রাসটি?' 'সো অ্যাম আই, আমারও পিপাসা পেয়েছে,' বলে আমি তাকে বার থেকে ড্রিংকস নিয়ে আসতে বলি।

দারুণ উঁচু হাইহিলে ক্ষীণ কটি দুলিয়ে মিমিকো ফিরে যায় বারে। আমি তার ফিরে আসার অপেক্ষায় আকাশের দিকে তাকাই। ওখানে বেশ কয়েকটি তারকায় তৈরি ক্যাসিওপিয়ার রানির সিংহাসনের আকৃতিতে জড়িয়ে আছে বেগুনি রঙের মেঘ। মাথায় স্কার্ফ জড়ানো মালাগাছি মহিলা আবার ফিরে এসে আমার দিকে তাকিয়ে কী ঘটতে যাচ্ছে তার হদিস নেওয়ার চেষ্টা করেন। তারপর তিনি ডাডাডি তাসার টেবিলে গিয়ে মৃদুস্বরে কিছু বলেন। দুটি গ্লাস ও কাচের ছোট্ট জগে বাতাবিলেবুর রস মেশানো হোয়াইট রাম নিয়ে ফিরে আসে মিমিকো। সে গ্লাসে পানীয় ঢালতে গেলে স্কার্ফ পরা মহিলা আমার টেবিলে এসে মালাগাছি ভাষায় কিছু বলেন। আমি বিরক্ত হয়ে ডাডাডি তাসাকে ইশারা করি—বিষয় কী তা বুঝিয়ে বলার জন্য। তিনি আমার টেবিলে এসে মনোযোগ দিয়ে মহিলার বক্তব্য শুনে তর্জমা করেন, 'যারা পরিশ্রম করে—কেবল তাদের ভালোমন্দ কিছু খাওয়া উচিত, এ মেয়েটি পরিশ্রম করে প্রতিদিন, কিন্তু সব সময় ভালো করে খেতে পায় না।' আমি ইঙ্গিতটি বুঝতে পেরে বলি, 'আমিও ক্ষুধার্ত, অসুবিধা নেই, মিমিকো আমার সাথে ডিনার করুক।' আমি ওয়েটারকে ডেকে গ্রিল করা চিকেন দিতে বললে মহিলা আবার ডাডাডি তাসাকে কিছু বলেন। তাঁর বাচনিকে আমি জানতে পারি, তিনিও পরিশ্রমী মানুষ, তাঁরও খিদা পেয়েছে বেজায়। আমি জানতে চাই—তিনি কি আমার সাথে ডিনার করতে চান। এ প্রশ্নে মহিলা বেজায় শরম পেয়ে করতল দিয়ে আড়াল করেন তাঁর ঠোঁট। তাসা আমাকে মালাগাছি কারেন্সির বড়সড় একখানা নোট দেখালে ইঙ্গিতটি বুঝতে আমার কোনো অসুবিধা হয় না। আমি দরাজভাবে তাঁর হাতে কিছু টাকা পাচার করি। মহিলা আর কোনো ঝামেলা না করে তাসার সাথে ফিরে যান বার কাউন্টারে। মিমিকো আমার দিকে পানপাত্র এগিয়ে দিলে জানতে চাই, 'হোয়াট কানেকশন ডু ইউ হ্যাভ উইথ দিস উয়োম্যান?' সে ফিক করে হেসে টেবিলের নিচ দিয়ে হাত বাড়িয়ে আমাকে স্পর্শ করে।

ওয়েটার ডিনার নিয়ে এলে দেখি—মিমিকোকে স্টাইরোফোমের প্যাকেটে টেকআউট দেওয়া হয়েছে। সে ফ্রুটজুস মেশানো রাম চাখতে চাখতে আমার প্লেট থেকে ফ্রেঞ্চফ্রাই তুলে নিয়ে চিবায়। আমি নাইফে কেটে চিকেনের খানিকটা তার দিকে বাড়িয়ে দিলে তা সে আগ্রহের সাথে খায়। স্লিভলেস টপ পরেছে বলে খেতে খেতে মিমিকো শীতে অল্প অল্প কাঁপে। ডিনারের পর আমি তাকে নিয়ে বেরিয়ে



ঠেলারিকশার স্ট্যান্ড



শিশুপিঠে হ্যাটপরা নারী

আসি গেস্ট হাউসের সামনের সড়কে। বেজায় উঁচু হাইহিলে তার শরীর টলে। আমি সোয়েট শার্ট খুলে তা দিয়ে তার কাঁধ জড়িয়ে দিয়ে একটি রিকশায় তুলে দিই। মৃদু স্বরে সে 'মানদ্রা পিহাওনাল' বলে শরম পেয়ে ইংরেজিতে অনুবাদ করে 'সি ইউ অ্যাগেইন মঁশিয়ো।' টুংটাং করে হাতঘণ্টি বাজিয়ে ঠেলারিকশাটি চলে যায় ছায়াপথের নিচ দিয়ে। আমি শরীরে শীতের অনুভূতি নিয়ে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকি একটুক্ষণ। অনেক দিন পর আকাশে আবার সপ্তর্ষির আকৃতি দেখতে পাই।

পরদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে বেরিয়ে আসি সড়কে। ভোরের আলোয় তিনতলা গেস্ট হাউসটি দাঁড়িয়ে আছে গাছপালাহীন এক উষর গঞ্জে। কয়েক পা হেঁটে চলে আসি ঠেলারিকশার স্ট্যান্ডে। কাছেই একটি দোকানে কাঁঠাল, পেঁপে, তেঁতুল ও আনারসের স্তূপে উড়ছে নীল ডুমোমাছি। ভাবি, আজ নদীতে যাওয়ার পথে নৌযাত্রার জন্য কিনে নিতে হয় কিছু ফল। ডাডাডি তাসা সড়কে বেরিয়ে আসেন। তিনি ৎসিরিবিহিনা নদীতে আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি জিপ ভাড়া করতে বেরিয়েছেন। আমি তাঁর পেছন পেছন হাঁটি। শিশু পিঠে চাদর দিয়ে বেঁধে হ্যাট পরা বেটেখাটো এক নারী হাঁটতে হাঁটতে দারুণ কৌতূহল নিয়ে আমাকে দেখে। তার পেছন পেছন হেঁটে যাচ্ছে হাতে গোটানো দুখানা রঙিন ছাতা নিয়ে আরেক নারী। একটি ঠেলারিকশা আমার কাছাকাছি এসে থেমে—মালাগাছি ভাষায় কী যেন জানতে চায়। আমি তার কথা ঠিক বুঝতে না পারলেও মানুষটির চোয়ালভাঙা মুখ দেখে তাকে চিনতে পারি। এ রিকশাওয়ালা গেল রাতে মিমিকোকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল। সে ঘণ্টা বাজিয়ে রাস্তা দিয়ে ছুটলে আমি হাঁটতে হাঁটতে চলে আসি গঞ্জের মাঝবরাবর। ওখানে একটি সাইকেল রিকশা দেখতে পাই। তাতে চড়ে বসে কয়েকটি শিশু। একটি কুকুর রিকশাটির সামনে বসে যেন তাদের পাহারা দিচ্ছে।

গঞ্জে খানিক ঘোরাঘুরি করে গেস্ট হাউসে ফিরে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় দেখি মিমিকো নামছে ঠেলারিকশা থেকে। সে কালো টাইটসের ওপর পলিয়েস্টারের পিংক টপ পরে এসেছে। মুখেও এ ভোরবেলা সুচারু করে মেখেছে মেকআপ। আমরা ব্রেকফাস্ট টেবিলে এসে বসি। সে খুব আগ্রহ নিয়ে নাশতা খায়। তারপর নেসক্যাফে পান করতে করতে কাঁধ থেকে ক্রমাগত খসে পড়া টপের স্ট্র্যাপ সামলায়। ডাডাডি তাসাও ফিরে এসেছেন। উঠানের এক কোণে গেল রাতে মাথায় স্কার্ফ জড়ানো মহিলাকেও দেখতে পাই। তাঁর সারা মুখে আঁকা চন্দনের এক সারি বিন্দি ভোরের আলোয় আকর্ষণীয় নকশা হয়ে ফোটে। তিনি ডাডাডি তাসাকে নিয়ে আমার কাছে এসে মালাগাছি ভাষায় বেশ লম্বাচওড়া কিছু একটা বলেন। তাঁর তর্জমায় জানতে পারি—মহিলার বক্তব্য হচ্ছে, 'তুমি চাইলে ক্রয় করতে পারবে বিছানা, কিন্তু নিদ্রা ক্রয় করা অত সহজ হবে না। চাইলে তুমি সেক্সও ক্রয় করতে পারো, কিন্তু ভালোবাসা খরিদ করা হবে দুরূহ।' গূঢ়তত্ত্বে ভরপুর বক্তব্যে আমি বিভ্রান্ত হয়ে মহিলাকে পরিষ্কারভাবে প্রস্তাব দিতে বলি। তিনি ফিক করে হেসে বলেন, 'মিমিকো তোমাকে পছন্দ করেছে, তাকে নৌযাত্রায় সাথি করে নিয়ে যাও। নৌকায় তুমি একা যাবে কেন?' আমি রাজি হই না। মহিলা এবার চিন্তিত মুখে তাঁর সেলফোনে আমাকে কয়েকটি ছবি দেখান। ৎসিরিবিহিনা নদীর পাড়ে আছে একটি জলপ্রপাত। নৌযাত্রীরা ওখানে তাঁবু খাটিয়ে রাত কাটায়। তারপর ভোরবেলা জলপ্রপাতে স্নান সেরে আবার রওনা হয় নৌকায়। আমি মহিলার সেলফোনে মিমিকোর স্নানের ছবি দেখি। প্রপাতের জলে সম্পূর্ণ নিরাবরণ মেয়েটি সিক্ত হতে হতে দুহাতে চেপে ধরে ঢাকছে বুকের নগ্নতা। আমি ডাডাডি তাসার দিকে তাকিয়ে একটু রূঢ়ভাবে প্রস্তাবটি নাকচ করে দিয়ে ফিরে যাই আমার রুমে।

একটু পর ব্যাকপ্যাক ইত্যাদি গোছগাছ করে রুম থেকে নেমে আসি। বার কাউন্টারে বসে মিমিকো সেলফোনে খুটখাট করছে। আমার দিকে সে তাকায় না। উঠানে আসতেই ডাডাডি তাসা আমাকে অ্যাপ্রোচ করেন। তিনি ঝোপের কাছাকাছি একটি টেবিলে একাকী বসে থাকা এক প্রৌঢ়া শ্বেতাঙ্গিনীর দিকে ইশারা করে বলেন, এ মহিলাও যেতে চাচ্ছেন সিঙ্গি-ডে-বেমারাহাতে। যেহেতু আমার নৌকায় আমি একা যাব, মহিলা কি আমার সাথি হতে পারেন? তিনি যাত্রার কস্ট শেয়ার করতে রাজি আছেন। আমি তাঁর সাথে কথা বলতে আগ্রহ দেখালে ডাডাডি তাসা নৌযাত্রায় পুলিশের পার্মিশন নেওয়ার জন্য আমাদের পাসপোর্ট ইত্যাদি নিয়ে থানার দিকে রওনা হন।

আমি ওয়েটারকে কফির কথা বলে মহিলার দিকে তাকাই। তাঁর গেল রাতে পাসপোর্ট, ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদি ছিনতাই হয়েছে, এ মুহূর্তে তিনি কী করবেন ঠিক বুঝতে পারছেন না, চোখে-মুখে দারুণ দুশ্চিন্তা নিয়ে মার্লবরো সিগ্রেটের প্যাকেট মুঠো করে ধরে মহিলা অস্থিরভাবে চারদিকে তাকাচ্ছেন। আমি 'গুড মর্নিং' বলে তাঁকে অ্যাপ্রোচ করি। বয়স তাঁর পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্নোর মাঝামাঝি। কথায়-বার্তায় খুবই সদালাপি, নাম আগনেসা আহমেতাজ। তিনি যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করলেও তাঁর শিকড় আলবেনিয়ার তিরানা শহরে। মাত্র নয় বছর আগে বিবাহের সূত্রে অভিবাসী হয়েছেন মেরিল্যান্ডে। প্যাকেজ ট্যুরে যাওয়ার তাঁর সংগতি নেই। মিয়ানদ্রিবাজোতে এসে তিন দিন ধরে অপেক্ষা করছেন কোনো ট্যুর গ্রুপের সাথে কস্ট শেয়ার করে সিঙ্গি-ডে-বেমারাহায় যাওয়ার জন্য। আমি কৌতূহল নিয়ে জানতে চাই, 'হোয়াই ইট ইজ ইমপরট্যান্ট ফর ইউ টু গো টু সিঙ্গি, আগনেসা?' তিনি জবাব দেন, 'আমার হাজবেন্ড উন্নয়নমূলক কাজে নানা দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন অনেক বছর।

মাদাগাসকারেও এসেছিলেন একবার আমার সাথে তার বিয়ে হওয়ার অনেক বছর আগে। তখন সিঙ্গির লাইমস্টোন ফর্মেশনে বেড়াতে গিয়ে প্রকৃতির এ আশ্চর্য সৃজন দেখে এত অবাক হয়েছিলেন যে আমাকে কেবলই বলতেন, আই মাস্ট টেক ইউ দেয়ার, ইউ উড লাভ ইট ফর শিওর। আমিও সিঙ্গির অনেক ছবি দেখেছি।' আমি এবার জানতে চাই, 'হোয়ার ইজ ইয়োর হাজবেন্ড, আগনেসা? উনি সাথে নেই কেন?' খুব নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে মহিলা জবাব দেন, 'হি ইজ নো লংগার অ্যালাইভ।' আমি 'সরি, মাই সিনসিয়ার কনডোলেন্সেস' বলে সহানুভূতি প্রকাশ করতে গেলে আগনেসা ফস করে মার্লবরো জ্বালিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলেন, 'আই ডোন্ট লাইক দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট হি কমিটেড সুইসাইড। বিলিভ মি আমার কোনো ধারণাই নেই সে কেন সুইসাইড করল।' আমি তাঁর চোখের দিকে তাকাই এবং পরিষ্কার বুঝতে পারি—কথা বলতে তাঁর তেমন কোনো আপত্তি নেই। তাই আলাপকে বিস্তারিত করে বলি, 'উড ইউ লাইক টু শেয়ার হোয়াট ওয়াজ দ্য কনটেক্সট অব হিজ ডেথ? আই অ্যাম জাস্ট কিউরিয়াস।' অ্যাসট্রেতে আধপোড়া সিগ্রেট গুঁজে তিনি জানান, 'মেক্সিকো সিটিতে সে আমেরিকার উন্নয়নমূলক ফান্ডিং সংস্থা ইউএসএআইডির তরফে কনসালট্যান্সি করতে গিয়েছিল। হোটেলের জিমে এক্সারসাইজ করতে গিয়ে স্টেশনারি বাইক থেকে পড়ে গিয়ে তার মৃত্যু হয়। সবাই ভেবেছিল, ইট ওয়াজ আ সাডেন হার্টফেইলার, কিন্তু অটোপসি করে জানা যায় যে—বাইকিং করার আগে সে পুরো এক বোতল স্লিপিং পিল কনজিউম করে। অ্যান্ড টু টেল ইউ ট্রুথফুলি, আই হ্যাভ নো ক্লু হোয়াই ইট হ্যাড হেপেন্ড।' আমি এবার জানতে চাই, 'আগনেসা, হু ডু ইউ হ্যাভ ইন দ্য ফ্যামিলি নাউ?' আবার নিরাসক্তি ফিরে আসে তাঁর চোখ-মুখে। তিনি জবাব দেন, 'যমজ দুটি ছেলে, এদের বয়স সাত বছর। দুজনেই মারাত্মকভাবে অটিস্টিক, সব সময় এদের দেখাশোনা করতে হয়। এদের নিয়েই আমার সংসার।' আমি উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাই, 'হোয়ার আর দে? প্রতিবন্ধী ছেলেদের কোথায় রেখে এসেছেন।' তিনি জবাব দেন, 'আমার শ্বশুর-শাশুড়ি এদের দেখভাল করছেন। দে আর ভেরি কাইন্ড। তাঁরাই বললেন, আগনেসা, ইউ আর টোটালি বার্নট আউট, যাও ঘুরে আসো মাদাগাসকার থেকে, ইউ নিড আ ব্রেক।' আমি হাত বাড়িয়ে তাঁর কবজি ছুঁয়ে বলি, 'প্লিজ জয়েন আস, আগনেসা। ইউ আর ওয়েলকাম টু আওয়ার বোট ট্রিপ।'

ডাডাডি তাসা ফিরে এসে বিশাল বপু বারটেন্ডারের সাথে কী যেন সলাপরামর্শ করেন। তাঁকে চিন্তিত দেখায়। বিষয় জানতে চাইলে তিনি বলেন যে—নদীঘাটে যাওয়ার জন্য জিপ ভাড়া পাওয়া যায়নি। বারটেন্ডার গেস্ট হাউসের ফরাসি মালিক মঁশিয়ো এভেলিনের ভ্যানগাড়িটি ভাড়া নিতে পরামর্শ দেন। গেস্টহাউসের কাছেই একটি কটেজে বাস করছেন এভেলিন। ডাডাডি তাসার সাথে হেঁটে আমি এবার চলে আসি ফরাসি ভদ্রলোকের কটেজের আঙিনায়। ওখানে ছোট্ট বাগানের মাঝবরাবর তাঁর মালাগাছি স্ত্রীর মার্বেল পাথরে বাঁধানো কবর। তাতে একগুচ্ছ তাজা ফুলের পাশে বসে একটি বিলাই রোদ পোহাচ্ছে। বারান্দার ইজিচেয়ারে বসে আছেন প্রৌঢ় এভেলিন। ডাডাডি তাসার প্রস্তাব শুনে তিনি আমাদের নিয়ে আসেন ব্যাকইয়ার্ডে। ওখানে গোটা তিনেক ভিনটেজ কার দেখতে পেয়ে আমি একটু অবাক হই। পঞ্চাশের দশকের অ্যাম্বুলেন্সের মতো দেখতে একটি অ্যান্টিক কেতার রেনাল্ট ভ্যান দেখিয়ে তিনি পঁয়ষট্টি ইউরো ভাড়া চান। এ ধরনের একটি ফটোজেনিক গাড়ি দেখতে পাওয়ায় আমার আনন্দ অন্তিমে পৌঁছায়। আমি তাঁকে তৎক্ষণাৎ ক্যাশে পেমেন্ট করলে তিনি জানান যে ড্রাইভার দিয়ে রেনাল্ট ভ্যানটি তিরিশ মিনিটের ভেতর পাঠিয়ে দেবেন গেস্ট হাউসের সামনে।

আমরা সকলে ব্যাকপ্যাক ইত্যাদি গোছগাছ করে কামরা থেকে নেমে এসেছি গ্রাউন্ড ফ্লোরে। গেস্ট হাউসের ছোট্ট স্যুভেনির শপটিও খুলেছে। নৌভ্রমণের যাত্রীরা ওখান থেকে কিনে নিচ্ছেন সানস্ক্রিন লোশন, পটেটো চিপস ও হার্সির চকোলেট বার। আমি ওদিকে যেতে গেলে দেখি—বারে দুখি মুখে চুপচাপ বসে আছে মিমিকো। আমাকে দেখতে পেয়ে সে অন্যদিকে মুখ ফেরালে আমি দাঁড়িয়ে পড়ে মালাগাছি ওয়ার্ডবুক বের করি। একটি বাক্য দেখে নিয়ে তার কাছে গিয়ে বলি, 'মিয়ালা টিসিনে আছো' বা 'আই অ্যাম ভেরি সরি মিমিকো।' সে ম্লান হেসে জবাব দেয়, 'ফালি মাহালালা আহো বা ভেরি নাইস টু মিট ইউ।' অতঃপর আমার বাড়িয়ে দেওয়া হাত ধরে সে নেমে আসে বারের উঁচু টুল থেকে। আমরা স্যুভেনির শপে ঢুকি। সে হেড অ্যান্ড শোল্ডার শ্যাম্পু ও মেকআপের কৌটা তুলে নেয়। আমি তাকে চকোলেট বার ও ভেলভেটে তৈরি ফুলের গুচ্ছ কিনে দিয়ে চুমো খেয়ে 'আঁবোয়া' বলে বিদায় জানাই। কেনাকাটা করতে করতে মঁশিয়ো আরিস্তিদ জানতে চান, 'হু ইজ গোয়িং টু বোট উইথ ইউ?' জবাবে আমি বলি, 'দ্য আলবেনিয়ান আমেরিকান উয়োম্যান আগনেসা আহমেতাজ।' তিনি দেঁতো হেসে বলেন, 'দিস ইজ আ গুড ডিসিশন।' সাথে সাথে মাদমোয়াজেল কাহিনা কানের কাছে এসে বলে, 'ইউ আর ভেরি ডিসেন্ট টু দ্য বিয়ার গার্ল, আই লাইকড ইট।' রেসপন্সে আমি বলি, 'হার নেইম ইজ মিমিকো, শি ইজ ভেরি নাইস অ্যান্ড প্রিটি।'

ড্রাইভার জোগাড় করতে পারেননি। তবে, কথামতো কাঁটায় কাঁটায় তিরিশ মিনিট পর রেনাল্ট ভ্যানটি গেস্ট হাউসের খোদ ফরাসি মালিক মঁশিয়ো এভেলিন ড্রাইভ করে নিয়ে এসেছেন। আমি এগিয়ে গিয়ে তাঁর সাথে হ্যান্ডশেক করে 'মার্সি বকু' বলে ধন্যবাদ জানাই। ধবধবে সাদা চুল-গোঁফ ও জুলফিতে মানুষটিকে উদাসীন দেখায়। তাঁর গলায় বোমায় পুড়ে যাওয়া তামার মুদ্রার মতো কালচে দাগটি রেজারে কেটে গিয়ে বেরিয়ে এসেছে লালচে রক্তকণা। তিনি কোনো কথাবার্তা না বলে স্টিয়ারিং



ফরাসি মালিকের রেনাল্ট ভ্যান

হুইলে বসে রাবারের গোলাকার হর্ন টিপে ভেঁপু বাজান। সবাই হইহই করে গেল শতকে নির্মিত নোকবোঁচা ভ্যানগাড়িতে চাপে। গাড়ি স্টার্ট নিলে আমি ফিরে তাকাই গেস্ট হাউসের বারান্দার দিকে। কিন্তু ওখানে কাউকে দেখতে পাই না। গঞ্জ ছাড়িয়ে কাঁচা রাস্তায় পড়তেই খানিক দূরে একটি জগদ্দল পাহাড়ের তলায় কিছু পাকা দালানকোঠা দেখতে পাই। সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে বেতের টুকরি হাতে কয়েকটি ছেলেমেয়ে আমাদের দিকে হাত নাড়ে। ভ্যানগাড়িটি চলে আসে দুটি শিলাপাহাড়ের মাঝবরাবর লালচে নুড়িপাথর ছড়ানো মেঠোপথে। দেখি, উল্টো দিক থেকে মাউন্টেন বাইক হাঁকিয়ে আমাদের দিকে ছুটে আসছে তিন পর্যটক।



মাহাডিরু নদীর নিস্তরঙ্গ বিস্তার

নদীঘাটে ইবোলা সারভাইবারের সাক্ষাৎ

গেল শতাব্দীর পাঁচের দশকের নোকবোঁচা ভ্যানগাড়িটি হাঁকিয়ে নদীর পাড় অব্দি পৌঁছাতে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু ঘটে না। দুপাশে বাদামি ঘাসবনের ভেতর দিয়ে লালচে নুড়ি-বালুকাময় পথে ভ্যান ঈষৎ জারকিং দিতে দিতে এগোয়। মেঠোপথের দুপাশে প্রচুর পত্রহীন বৃক্ষ যেন নিসর্গের রোদজ্বলা বিবৃতি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার ডালপালায় বড় বড় পাখির নীড়ে বসে আছে মা পাখিরা। ওপরে চক্রাকারে উড়ে তেপান্তর স্ক্যান করে বোধ করি খাবার খুঁজছে পুরুষ খেচর। আমি গাড়ির জানালা দিয়ে এক জোড়া নিষ্পত্র গাছের ছবি ওঠাতে গেলে ডাডাডি তাসা গাছটির স্থানীয় নাম 'তেরমিনালিয়া মেনতালিস' বলে জানান। ঠিক তখনই ঘাস থেকে উড়ে এসে একসাথে ডালে বসে অনেকগুলো বনঘুঘুর মতো দেখতে একধরনের মাঝারি মাপের পাখি। আমি তাজ্জব হয়ে দেখি—তেপান্তরের সর্বত্র ঘাস ধামসে পড়ে আছে চাকলা চাকলা কোয়ার্জ বা একধরনের স্ফটিকায়িত পাথর। তা থেকে সূর্যালোকে ছড়াচ্ছে রুপালি আগুন। ভ্যানগাড়িটি বাঁক নিয়ে ঢুকে পড়ে ছোট্ট একটি ফিসিং ভিলেজে। জেলেপল্লিটির নাম রাতুশোয়া। ওখানে জেবু-কার্ট বা বলদের গাড়িতে বসে অপেক্ষা করছেন আজকের নৌযাত্রায় আমাদের নিরাপত্তাবিষয়ক লেঠেল ফেতরাসেনা হারিনিয়ানা। গাড়ি থামলে তিনি জেবু-কার্টে স্তূপ করে রাখা তাঁবু, স্লিপিং ব্যাগ, হান্ডি-পাতিল, গামলা, এনামেলের বাসন-বর্তন দেখিয়ে আমাদের অশ্বস্ত করেন। এসব তিনি ভাড়া করে নাওঘাটের দিকে জেবু-কার্টে মেলা দিয়েছেন। তার রাস্টাফারিয়ান কেতার চুলের তাবত জটাজুট আজ রুমাল দিয়ে পেঁচিয়ে মন্দিরের চূড়ার শেপ করা। তা দেখে লোরেনা উল্লসিত হয়ে বলে, 'ফেতরাসেনা, ইয়োর হেয়ার স্টাইল লুকস সো কুল টুডে।' সে গাড়ির জানালা দিয়ে তার হাতে চুইংগাম ধরিয়ে দিলে ফেতরাসেনা বিনিময়ে করতলে চিলিম ফোঁকার ভঙ্গি করে। তাতে লোরেনার উৎসাহ তীব্র রোদে কার্পাস ফেটে তুলার মতো ছড়িয়ে পড়ে, সে চেঁচিয়ে বলে, 'ওহ্ মাই গড, হি ইজ গনা গেট আস সাম গানজা, আই উড লাইক দ্যাট।'

ভ্যানগাড়িটি এত আস্তে এগোচ্ছে যে জেলেপল্লি রাতুশোয়ার ছোটখাটো ডিটেল খুঁটিয়ে দেখে নিতে কোনো সমস্যা হয় না। বাচ্চা কোলে এক মেয়ে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে কয়েকটি চীনা হাঁস। তার পেছন পেছন ভোজালি হাতে গাব্দাগোব্দা পুরুষ। তার বাঁক থেকে ঝুলছে সদ্য জাল পেতে শিকার করা বেলেহাঁস। তিনি এক হাতে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন দড়ি বাঁধা একটি হাড় জিরজিরে বলদকে। বুড়ো গরুটির পিঠে বাঁধা বেতের টুকরি। তাতে রাখা বড় বড় মাছের কতগুলো শুঁটকি। গরুটির লম্বা কোঁকড়ানো শিং থেকে ঝুলছে প্লাস্টিকের চকচকে বুমবক্স। তা থেকে ছড়াচ্ছে লারে লাপ্পা মিউজিক।

ভ্যানগাড়িটি থেমে পড়ে। বাকি সামান্য পথ আমাদের ব্যাকপ্যাক কাঁধে হেঁটে যেতে হবে নাওঘাটে। গাড়ির মালিক মঁশিয়ো এভেলিন আরিস্তিদের হাতে 'গ্র্যান্ড ক্রু অ্যান্টসিরাবে' নামে এক বোতল মালাগাছি ওয়াইন উপহার দিয়ে লোরেনা ও কাহিনার গণ্ডদেশে চুমো খেয়ে বিদায় নেন। সাদা কোট পরে আছেন বলে চুল-দাড়ি পাকা মানুষটিকে ট্রেনের টিকিটচেকারের মতো দেখায়। নদীর পাড়ের দিকে যেতে যেতে আমি ও আরিস্তিদ তাঁকে নিয়ে টুকটাক কিছু কথাবার্তা বলি। মঁশিয়ো এভেলিন মাদাগাসকারে বসবাস করছেন অনেক বছর ধরে। একসময় তিনি টাসিলাকি নামে এ আতরাফে উৎপন্ন একধরনের আবগারি ভেষজ ফ্রান্সে স্মাগল করতেন। দ্রব্যটির হ্যালুসিনেশনজনিত তাসিরের জন্য তা ফরাসি দেশে নিষিদ্ধ হয়। মঁশিয়ো এভেলিন প্যারিসের দ্য গল বিমানবন্দরে বমাল ধরা পড়ে এক বছর নয় মাস কাটান ফরাসি কারাগারে। তারপর দেশত্যাগ করে হালফিল থিতু হয়েছেন মিয়ানদ্রিবাজো শহরে। কয়েক বছর আগে বিবাহিত হয়েছিলেন স্থানীয় এক বিয়ার গার্লের সাথে। মেয়েটি এইচআইভি এইডসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে মঁশিয়ো তাকে তার কটেজের আঙিনায় সমাহিত করেন। বর্তমানে গেস্ট হাউসটি তার প্রয়াত স্ত্রীর খেশকুটুমরা চালাচ্ছে।

মঁশিয়ো এভেলিনের জীবনযাপন সম্পর্কে গল্প করতে করতে আমরা টিলার মতো উঁচু জমিন থেকে নামতে শুরু করি নদীর বালুকা বিস্তীর্ণ পাড়ে। নামতে নামতে নজরে পড়ে—বাঁশবেতের ছোট্ট এক কুটির, আঙিনায় চরছে মোরগ, দাঁড়িয়ে আছে

শিশু। উঠানে পাথরের ঠেকা দিয়ে তৈরি চুলায় রান্না হচ্ছে খাবার। তার পাশে বসে কথা বলতে বলতে ন্যাতাকিনি চাদর দিয়ে বুক ঢেকে আমাদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ে দুই নারী। যেতে যেতে ভাবি, এদের কি মাঝেসাঝে টিভিতে মুভি দেখার ফুরসত হয়? উঠানে দাঁড়িয়ে থাকা শিশুটি কি জানে কম্পিউটারের খবর?

ঢালু পাড়ে নেমে জানতে পারি, এ নদীটির নাম মাহাডিরু। এটা ধরে নাও বেয়ে গিয়ে পড়তে হবে ৎসিরিবিহিনা গাঙে। আমি নদীর পাড় ধরে হেঁটে-চলে ঘোলাজলের বহতা সলিলের দিকে তাকাই। এ গাঙ আকার-প্রকারে তেমন ছোট না, তবে নিস্তরঙ্গ। শুধু একটি মোটরবোট পাড় ঘেঁষে নোঙর করা। চরে বাঁশ-বেত ও নাড়া দিয়ে উরা বেঁধে ছায়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। তার আশপাশে দাঁড়িয়ে কিংবা বসে জটলা করছে প্রচুর পথশিশু।

কপালের চন্নায় রোদ লাগছে। মনে হয়, এদিকে আরেকটু হাঁটাহাঁটি করলে মাইগ্রেনে আক্রান্ত হব এখনই। আরেকটি উরার সামনে আসতেই ওখানকার ভেতর বাঁশের মাচায় বসে থাকা আধুনিক কেতার স্ন্যাকস ও স্লিভলেস টপ পরা এক নারী হাসিমুখে আমাকে বলেন, 'হ্যালো স্ট্রেনজার, হাউ ডু ইউ ডু।' আমি সম্ভাষণ ফিরিয়ে দিলে তিনি উঠে এসে বলেন, 'মাই লর্ড, ইউ আর বার্নিং আপ ইন হট সান। এসো, উরার ছায়ায় বসে জিরিয়ে নাও।' আমি ভেতরে ঢুকলে তিনি জানতে চান, 'নৌযাত্রার প্রস্তুতি কেমন?' জবাবে আমি বলি, 'গোছগাছ মোটামুটি সম্পন্ন হতে চলছে, তবে একটু সময় লাগছে।' তিনি এবার আমার চোখের দিকে তাকিয়ে আকর্ষণীয়ভাবে হেসে বলেন, 'আর ইউ ইন্টারেস্টেড টু মেক ইয়োর বোট ট্রিপ ম্যাজিক্যাল?' ঠিক বুঝতে পারি না নৌভ্রমণকে কীভাবে জাদুময় করে তোলা যায়। তাই কৌতূহল নিয়ে মহিলার মুখের দিকে তাকাই। তিনি আমার হাতে তুলে দেন ছোট্ট একটি পিকচার অ্যালবাম। আমি পাতা উল্টাই। প্রতিটি পৃষ্ঠায় নদীজলে আধডোবা হয়ে মালাগাছি নারীরা মেতেছে নগ্নস্নানে। মনে হয়, বহতা জলস্রোতে নারীদেহের নিরাবরণ সন্তরণে সৃষ্টি হয়েছে যৌবন উপচানো রেখাচিত্রের। আমি অ্যালবামটি ফেরত দিলে পিম্প মহিলা আলগোছে মন্তব্য করেন, 'নিয়ে যাও এ মেয়েগুলোর একটিকে সাথি করে, আই গেস, ইউ ডোন্ট নো অ্যাবাউট মালাগাছি গার্লস, ওয়ান অব দেম ইজ গোয়িং টু মেক ইয়োর লাইফ ম্যাজিক্যাল।' 'নো, থ্যাংকয়ু' বললে, তিনি অ্যাগ্রেসিভলি জানতে চান, 'টেল মি স্ট্রেনজার, হোয়াট ইজ হোল্ডিং ইউ ব্যাক?' ফিলোসফিক ভঙ্গিতে জবাব দিই, 'শুধু ভ্রমণে আমি ফোকাস করতে চাই, আমার নৌযাত্রার উদ্দেশ্য কিন্তু রমণ করা নয়,' অতঃপর বেরিয়ে আসি উরাটির ছায়া থেকে। সামনে পা বাড়াতে গিয়ে এ পিম্প নারীর চমৎকার ইংরেজি বোলচালের মনে মনে তারিফ করি। মনে হয়, ইনি পর্যটক পুরুষদের নারী সরবরাহ না করে কোনো স্কুলে স্পোকেন ইংলিশের কোর্স পড়ালে ভালো করতেন।

হাঁটতে হাঁটতে চরের অন্যদিকে আসতেই দেখতে পাই জোয়েন ম্যাজিওকে। সে ঢাউস একটি ভিডিও ক্যামেরা দিয়ে বালুচরে পায়ের রেখা এঁকে ছুটে যাওয়া কাঁকড়ার ছবি তুলছে। মন ও মানসিকতায় দূরের মানুষ হলেও জোয়েন আমার পরিচিত। সিয়েরা লিওনের ফ্রিটাউনে আমরা কাছাকাছি বাস করছি গেল আড়াই বছর ধরে। এ যাত্রায় আমরা ফ্রিটাউন থেকে এয়ার কেনিয়ার ফ্লাইটে একত্রে মাদাগাসকারে এসেছি। জোয়েন আজকাল জাতিসংঘের একটি জনস্বাস্থ্য-বিষয়ক প্রকল্পের প্রধান হিসেবে কাজ করছে। ফ্লাইটে সে ছিল বিজনেস ক্লাসের যাত্রী। আমি ইকোনমি ক্লাসে ফ্লাই করার ফলে পথে তেমন একটা কথাবার্তা হয়নি। তবে আমি অবগত যে সে ৎসিরিবিহিনা নদীতে প্যাকেজ ট্যুরে যাচ্ছে। তাই আচমকা দেখা হওয়ায় তাজ্জব হই না তেমন। কিন্তু বিরক্তি ঢাকতে পারি না। সে ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে উষ্ণ হাগে। আমরা সৌজন্য বজায় রেখে কথা বলি টুকটাক। আমাদের ঘিরে দাঁড়ায় কয়েকটি কৌতূহলী শিশু। এদের ঠিক মাঝামাঝি মুখে চন্দনের প্রলেপ লাগানো একটি মেয়ে চোখে-মুখে রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকে আমাদের দিকে। জোয়েনের কালো চশমায় তাদের ছায়া প্রতিফলিত হয়।

তার সাথে টুকটাক কথা বলতে বলতে অনুভব করি—আমার করোটিতে ঝেঁপে আসছে মাইগ্রেনের ব্যথা। বিষয়টা কীভাবে যেন জোয়েনও টের পায়। সে কমেন্ট করে, 'ইউ আর নট ফিলিং ওয়েল, আর ইউ?' আমার শরীরিক সুস্থতার ব্যাপারে জোয়েনের আগ্রহে মেজাজ খাট্টা হয়ে ওঠে। ইবোলা প্রাদুর্ভাবের পয়লা দিকে ফ্রিটাউনের দিনযাপন মনোটনাস হয়ে পড়লে আমি শহরের ব্রিটিশ মিলিটারি বেইসের বিরাট সুইমিংপুলে উইকএন্ডে ওয়াটার পলো খেলতে শুরু করি। তখন জোয়েনের সাথে দেখা-সাক্ষাতের সূত্রপাত। সে একটি চার্চ ফান্ডেড সংস্থায় তখন নার্স হিসেবে ছোটখাটো কাজ করত। আমি গ্রামে কাবাডি খেলে বেড়ে উঠেছি। তাই, ওয়াটার পলোর কারিকুরি তেমন জানতাম না। এতে আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছিল না। ভাবছিলাম—হাবুডুবু খেতে খেতে কোনো না কোনোভাবে একদিন খেলাটি শিখে নেব। তখন জোয়েন আমাকে ওয়াটার পলোর কায়দাকানুন নিয়ে তৈরি একটি ডিভিডি দেখতে দেয়। যেচে আমার উপকার করাতে আমি কেন জানি তার ওপর বিলা হয়ে উঠি।

এ মুহূর্তে নদীতটের বালুচরে দাঁড়িয়ে সে আমার কাছে মাইগ্রেনের ব্যথা উপশমকারী পিল আছে কি না, জানতে চাইলে আমার মাঝে নেগেটিভ



উরার মাচায় বসে পিম্প নারী



কুটিরের সামনে রান্নাবান্না



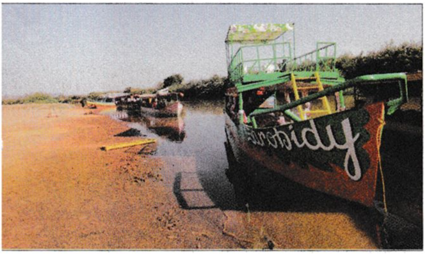
নদীচরে পথশিশু

অ্যাটিচিউড ফের মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তাই, জবাব দিই, 'লুক জোয়েন, অ্যাই আম রাইডিং আ বোট ইন ৎসিরিবিহিনা রিভার। ব্যথা তীব্র হলে আমি নদীজলে মাথা চোবাব, দ্যাটস ইট। দরকার নেই ওষুধপত্রের।' আমার প্রতিক্রিয়াকে খুব শান্তভাবে ফেস করে সে বলে, 'আই অ্যাম গোয়িং টু ফাইন্ড মেডিসিন ফর ইউ। চলো, আমার বোটে।' আমি তৎক্ষণাৎ তার বোটে যেতে রাজি হই না। বলি, 'আমার যাত্রার জোগাড়যন্ত্র হচ্ছে কি না তা তদারক করতে হবে।' সে ঘুরে তাকিয়ে বলে, 'প্লিজ কাম টু মাই মোটরবোট, ইট ইজ রাইট হিয়ার। উই ক্যান হ্যাভ কফি টুগেদার।' আমি কোনো জবাব না দিয়ে উল্টো দিকে হাঁটি।

তার মতামত আমার ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা আগেও জোয়েন করেছে। বছর দুয়েক আগের ঘটনা। ফ্রিটাউনের মহিলা এন্টারপ্রেনাররা ইবোলায় পিতৃমাতৃহীন হওয়া শিশুদের সহায়তার জন্য আয়োজন করে বলনাচ ও ডিনারের। আমরা দুজনে আড়াই শ ডলার দিয়ে কিনি দুটি টিকিট। জোয়েন প্রস্তাব দেয় আমাকে তার সাথে ড্যান্সে যাওয়ার। আমি রাজি হই না, বলি, 'টিকিট কিনেছি ফান্ড রাইজিংয়ে সহায়তা করার জন্য। বাট আই অ্যাম নট ইন্টারেস্টেড ইন ড্যান্সিং।' সে ড্যান্সে না যাওয়ার কারণ কী জানতে চাইলে আমি অজুহাত হিসেবে বলি, 'দিস ইজ গোয়িং টু বি আ ফর্মাল অকেশন, আমার কোনো বো টাই নেই, সো আই অ্যাম সিম্পলি নট গোয়িং।' পরদিন অফিসে গিয়ে দেখি সে ম্যাসেনজার মারফত পাঠিয়েছে বেশ কয়েকটি বো টাই। নানা রকমের সামাজিক প্রেশারে সন্ধ্যাবেলা হাজিরা দিতে হয় ড্যান্সে। আমি ইচ্ছা করে তার দেওয়া বো টাই ইস্তেমাল না করে প্রিন্স স্যুট পরে বলরুমে হাজির হলে সে স্পষ্টত অ্যানয়েড হয়। কাছে এসে খুব চোখাভাবে জানতে চায়, 'ইজ দেয়ার এনিথিং আই কুড ডু টু মেক ইউ হ্যাপি?' আমি নিরাসক্তভাবে জবাব দিই, 'পারহেপ্স নো।' এরপর মাস তিনেক দেখা-সাক্ষাৎ হলে আমরা কথাবার্তা বলা থেকে বিরত থাকি।

আমার ট্যুর গ্রুপের সহযাত্রীদের কাছে এসে দেখি—কেবল একটি পিরাগ-বোট এসে পৌঁছেছে। তাতে তোলা হয়েছে আমাদের ব্যাকপ্যাক ও মালমাত্তা। ডাডাডি তাসা নরমুণ্ডু হাতে দুছুমুছু করছেন। তাঁকে ঘিরে কমলা কিসিমের কয়েকজন মালাগাছি মানুষ। তারা তাঁকে 'পিটারি ডালানা' বা 'রিভার গাইড' সম্বোধন করে সমাজত করছে। আমি অন্যান্য পিরাগ-বোটের ঘটনা কী জানতে চাইলে তিনি সংক্ষিপ্তভাবে জানান, 'মোরা...মোরা' বা 'ভাবনাচিন্তার কিছু নেই, আস্তে ধীরে এরা এসে পৌঁছাবে।' তাঁর এ আচরণে আমার স্ট্রেস বাড়ে। তবে কিছু বলি না।

কাছেই সিনিওর থিয়াগো আইপ্যাডের দিকে তাকিয়ে থাকা লোরেনার বাহু ও পায়ে মর্দন করে দিচ্ছেন সানস্ক্রিন। মেয়েটির নাভিতে গাঁথা রুপার বেলিবাটন রিং রোদে ঝলকায়। কাহিনা ছোট্ট কুলারে করে আনা বরফ দিয়ে প্লাস্টিকের গ্লাসে পরিবেশন করছে মঁশিয়ো এভেলিনের দেওয়া হোয়াইট ওয়াইন। আমি একটি গ্লাস হাতে নিয়ে আরিস্তিদের সাথে খুচরা কথাবার্তা বলি। তার কাছ থেকে পাওয়া একটি তথ্যে আমি দারুণভাবে নার্ভাসবোধ করি। তিনি ফিসফিসিয়ে বলেন, মাত্র সপ্তাহ দুয়েক আগে ৎসিরিবিহিনা নদীতে নৌকা করে যাচ্ছিল ইসপানিয়ার বার্সিলোনা থেকে আসা একটি কাপল। যাত্রার দ্বিতীয় রাতে তারা নদীতীরের বালুচরে তাঁবু খাটায়। সন্ধ্যা রাতে তাদের আক্রমণ করে নৌকা করে আসা জলদস্যুদের একটি দল। তারা পুরুষ পর্যটককে গাছের সাথে বেঁধে হ্যাজাক বাতির আলোয় পালা করে ধর্ষণ করে তার গার্লফ্রেন্ডকে।



নদীতে মোটরবোট



পিরাগ-বোটে ব্যাগ-বোঁচকা

মারপিটে রিভার গাইডের পাঁজরের কয়েকটি হাড় ভেঙে যায়। আরিস্তিদ গেল রাতে এ ঘটনার বিবরণ পাঠ করেছেন লোনলি প্ল্যানেট নামের একটি পর্যটনি পুস্তকের ওয়েবসাইটে।

খানিক খোঁজাখুঁজি করে বের করি আমাদের নিরাপত্তাবিষয়ক লেঠেল ফেতরাসেনাকে। তিনি বালুচরে চাটাই পেতে আধশোয়া হয়ে গালে হাত দিয়ে মনে হয় আসমান ও জমিন নিয়ে ভাবছেন। জলদস্যুদের ঘটনা তাকে জানালে তিনি ব্যাপক হেসে জবাব দেন, আমরা তার জানাশোনা গ্রামের কাছে তাঁবু ফেলব, এতে ঝুঁকি কম। তবে, জলদস্যুরা যদি এসেই পড়ে, অসুবিধা কিছু নেই। তিনি ফাটা বাঁশের মতো দেখতে আঁটি বাঁধা কয়েকটি লাঠি দেখান। এ লাঠিগুলো আদতে গুপ্তি। আমাদের সবার হাতে থাকবে একটি করে এ বস্তু। তা দিয়ে হার্মাদ জলদস্যুদের সিনা এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিলেই হয়।

আমি বলার মতো কোনো কথা খুঁজে পাই না। আরিস্তিদ সিগ্রেটে কষে দম দিয়ে ধোঁয়ার রিং ছুড়ে জলদস্যুর বিষয়টিকে ইগনোর করেন। আমিও কাঁধ শ্রাগ করে হাঁটতে শুরু করি চরের অন্যদিকে। হাঁটতে হাঁটেতে ভাবি, লেটস ফেস ইট। জলদস্যু এসে পড়লে না হয় লাঠি দিয়ে আজ রাতে লাঠালাঠি করব। এখানে তো মুখুজ্যেদের বাড়ি নেই যে ওখান থেকে জোগাড় করা যাবে মুঙ্গেরি গাদা বন্দুক! হাঁটতে হাঁটতে এসে পড়ি জোয়েনের মোটরবোটের কাছে। সে ডেকের রেলিংয়ে হেলান দিয়ে হাত নেড়ে বলে, 'কামঅন আপ, কফি ইজ রেডি।'

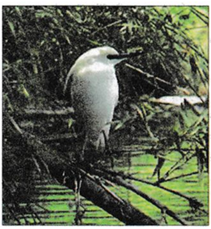
খালাসি কাঠ পেতে দিলে আমি তার ওপর দিয়ে উঠে পড়ি মোটরবোটে। ভেতরে কার্পেট পাতা কেবিনে বেতের সোফা। তাতে বসলে জোয়েন ড্রিপ কফি পেয়ালায় ঢালে। সে কৌটা খুলে আমাকে দুটি ট্যাবলেট দেয়। তা গিলে ফেলে আমি কফিতে চুমুক দিতে দিতে তার দিকে তাকাই। তার গোলাপি ত্বক চরের রোদে পুড়ে তামাটে দেখায়। সে আইপ্যাডে ইয়ো ইয়ো মা নামে এক চায়নিজ-আমেরিকানের বাজানো চেলোর বাদন দেখিয়ে বাজাবে কি না জানতে চাইলে আমি মাথা হেলিয়ে সায় দিই। চেলোর ধ্রুপদি আওয়াজ যেন বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটায় ঝরছে আমার রোদদগ্ধ করোটির উষর জমিনে। সামনে চুপচাপ বসে আছে জোয়েন। তার মুখে শবে বরাতের ফুলঝুরির ছিটার মতো ফ্রেকোলের বাদামি দাগগুলোর সাথে বয়সের বলিরেখা মিশে গাঢ় দেখায়। আমি বোটের জানালা দিয়ে গলুইয়ের কাছে এক চিলতে বারান্দায় একজন সিকিউরিটি গার্ডকে স্টেনগান হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। তখন জোয়েনকে নিয়ে আমার একটি অপ্রত্যক্ষ স্মৃতি অঙ্কুর ফুঁড়ে চারার মতো গজায়। প্রায় আড়াই বছর আগের ঘটনা। ফ্রিটাউনে প্রবলভাবে ছড়াচ্ছে ইবোলা। অফিস থেকে জানাশোনা এক সহকর্মী ডিপ্লোম্যাটের গাড়িতে লিফট নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে দেখি সড়কের মাঝামাঝি শুয়ে ভেদবমিতে ধুঁকে ধুঁকে মারা যাচ্ছে একটি মানুষ। গাড়ি থামিয়ে সেবা দেওয়ার অনুমতি আমাদের ছিল না। তাই সেলফোনে চেষ্টা করি ইবোলা রেসপন্স টিমকে ধরতে। কিন্তু কেউ টেলিফোন ওঠায় না। এ সড়ক ধরে যাঁরা বাড়ি ফেরেন এ রকমের জানাশোনা আরও কয়েকজন প্রতিবেশীকে টেলিফোন করে ঘটনাটি জানাই। জোয়েনকে রিং করতেই সে খুব পেশাদারিভাবে বলে, 'অলরাইট, আমি এখনই ইবোলা রেসপন্স টিমের দপ্তরে ড্রাইভ করে যাচ্ছি।' তারপরের ঘটনাগুলো খুব দ্রুত ঘটে। রেসপন্স টিম সড়কে শুয়ে থাকা মৃত মানুষটির লাশ তুলে নিয়ে গেলে জোয়েন আশপাশের লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে মানুষটির পরিচয় ও অ্যাড্রেস বের করে চলে যায় তার বাসায়। ওখানে তার স্ত্রীর মৃতদেহের পাশে কিছুক্ষণ আগে মৃত্যু হয়েছে নয় বছরের কন্যাসন্তানের। তাদের পাশে বসে অঝোরে কাঁদছে সাত বছরের একটি ছেলে। ইবোলা রেসপন্স টিমের সহায়তায় জোয়েন ছেলেটিকে রেসকিউ করে নিয়ে যায় এতিমখানায়। এ ঘটনার এগারো দিন পর তার শরীরে ইবোলার আলামত দেখা দিলে মার্কিন দূতাবাস এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে তাকে চিকিৎসার জন্য পাঠায় যুক্তরাষ্ট্রে। ইবোলা সারভাইবার জোয়েন আবার ফ্রিটাউনে ফিরে আসে জাতিসংঘের একটি সংস্থার হেলথ প্রোগ্রামের প্রধান হয়ে ছয়-সাত মাস পর।

কফির পেয়ালায় সামান্য একটু রিফিল ঢেলে দিয়ে সে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করে বলে, 'ইউ প্রোব্যাবলি ডোন্ট নো, তোমার মুড সুইংয়ের প্রবণতা আছে, অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট পিল নিলে তুমি কিন্তু উপকার পাবে।' এ মন্তব্যে আমি বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ে বলি, 'আই ডোন্ট নিড আ প্রেসক্রিপশন, বাট থ্যাংকয়ু দো।' বেরিয়ে আসার সময় একটি নীল রঙের মেয়েলি ছাতা আমার হাতে তুলে দিতে দিতে সে বলে, 'ডু ইউ মাইন্ড ইউজ দিস আমব্রেলা? ওপেন পিরাগ-বোটে এটা তোমাকে রোদ থেকে প্রোটেক্ট করবে।' ছাতাটি হাতে নিয়ে আমি হিলহিলে তক্তা ধরে নেমে আসি তার মোটরবোট থেকে। চরে নেমে ফিরে তার দিকে হাত নাড়তে নাড়তে ভাবি, ইয়েস, ফর সাম রিজন আই ডোন্ট লাইক হার, কিন্তু একদিন সময় করে তার জীবনে যা ঘটেছে তা লিখে ফেলতে হয়। লেখার বিষয়টি ভাবতে ভাবতে দারুণ স্ট্রেস হয়, আমি সচেতন যে জোয়েনকে নিয়ে আমার মাঝে আছে একধরনের নেগেটিভ অ্যাটিচিউড। লেখায় তার চরিত্র চিত্রণে আমি সুবিচার করতে পারব কি?



নৌকায় ছাতা মাথায় লেখক

নৌযাত্রার সূত্রপাত



শুভ্র পালকের সুদর্শন পাখি



উড়ছে হিরণ পাখি

মাঝিমাল্লারা অন্য তিনটি পিরাগ-বোট নিয়ে এসে নদীচরে হল্লা করছে। ডাডাডি তাসা তপ্ত বালুকায় খুলিতে পানি ভরে পুঁতে রেখেছিলেন তাঁর নরমুণ্ড। ছোট্ট একটি পাখি তার রংচঙে ডানা ঝাপটিয়ে তা থেকে সামান্য পানি পান করলে আলামতটিকে সুলক্ষণ বিবেচনা করে ডাডাডি শিঙ্গা ফুঁকে ইশারা দেন। প্রতিটি দম্পতির জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে একটি করে পিরাগ-বোট। আমি আগনেসা আহমেতাজের সাথে একটি বোটে নীলবর্ণের মেয়েলি ছাতা মাথায় আধশোয়া হয়ে বসি। আগনেসাকে এ মুহূর্তে হাসিখুশি দেখায়। জলে বইঠা ফেলার ছন্দময় শব্দে শুরুয়াত হয় মাহাডিরু নদীতে আমাদের নৌযাত্রা। নদীতীরের জলজ ঘাসের ওপরে উড়ছে ফড়িং। চোখ চলে যায় ঝোপঝাড়ের সবুজে নিবিড় হয়ে আসা পাড়ে। ডালে বসে বেজায় ইমপ্রেসিভ দেখতে একটি শুভ্র পালকের পাখি তার সুচালো ঠোঁট বিদ্রূপের মতো বাঁকিয়ে শূন্যতায় ক্যাচ করে পতঙ্গ। আমাদের বোটের পাশে ধীরে-সুস্থে ভেসে যায় থিয়াগো ও লোরেনার নাও। সিনিওর থিয়াগো হন্যে হয়ে তার ব্যাকপ্যাকে কী যেন খুলিবিলি করে খুঁজছেন। তার কোঁচকানো কপাল দেখে আমি মারাত্মক কিছু হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করি। পিরাগ-বোটের খোলে বেজায় বিরাগভাজন হয়ে বসে লোরেনা অস্থির চোখে চারদিকে তাকাচ্ছে। কাছে চলে আসে আরিস্তিদ ও কাহিনার নৌকা। চোখের ইশারায় সিনিওর কী খুঁজছেন তা আরিস্তিদের কাছে জানতে চাইলে তিনি বাতাসে চিত্র এঁকে প্রতীকীভাবে যেন বোঝাতে চান, ঘটনা গুরুতর কিছু নয়, সিনিওর থিয়াগো যে বটুয়ায় ভায়াগ্রা রেখেছিলেন, হয়তো তা খুঁজে পাচ্ছেন না! আমি আবার থিয়াগোর দিকে তাকিয়ে সংকট কতটা গুরুতর তা আন্দাজ করতে চাই, তিনি হতাশ হয়ে রেগেমেগে এমন মুখভঙ্গি করেন যে মনে হয়, এখনই ফাটা বাঁশের ভেতর থেকে গুপ্তি বের করে নিজের খুঁড়ি কেটে হারিকিরি পদ্ধতিতে আত্মহননের উদ্যোগ নেবেন।

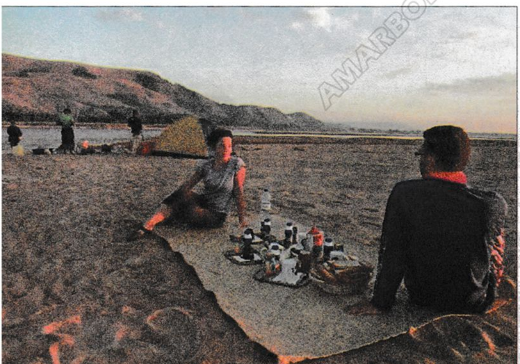
মাহাডিরু নদী এবার প্রশস্ত হয়। আরিস্তিদ ও কাহিনাকে নিয়ে অন্য নৌকাটি স্রোতে পড়ে ভেসে যায় দ্রুতবেগে। চর থেকে আশ্চর্য সুন্দর একটি হিরণ পাখি লো-ফ্লাইটে

স্রোতজলের ওপর দিয়ে উড়লে মনে হয় নদীপাড়ের শ্যামলিমা প্রকৃতিও যেন শুভেচ্ছা সফরে চলছে আমাদের সাথে সাথে।

আমরা এসে পড়ি হাওরের মতো বিস্তীর্ণ জলাভূমিতে। এদিকের অগভীর জলে আছে কয়েকটি দীর্ঘ ঘাসের গুচ্ছে সবুজাভ দ্বীপাণু। তার পাশে একটি নৌকা দেখতে পেয়ে আমি বাইনোকুলারে চোখ রাখি। নাওখানা দৃষ্টির আওতায় চলে আসে মুহূর্তে। মনে হয় এক যুগল গঞ্জ থেকে চালের বস্তা, জ্যারিক্যানে করে পেট্রল ইত্যাদি সওদাপাতি নিয়ে নাও বেয়ে বাড়ি ফিরছে। আমি হাওরের কিনারে খানিক উঁচু পাহাড়ে গির্জার ঘন্টিঘরের মিনার দেখতে পাই। ঝোপঝাড় মাড়িয়ে ওদিক থেকে নেমে আসা সাদা পোশাকের তিনটি নারীমূর্তি নজরে পড়লে আমি আবার চোখ বাইনোকুলারের লেন্সে রাখি। তখনই দমকা বাতাসে জলে ছড়িয়ে পড়ে ঢেউ। পাড়েও বইছে দারুণ ঝোড়ো হাওয়া। তার তোড়ে মেয়ে তিনটি সাদা লেসে বোনা ড্রেস সামলায়। তাদের মেঘশুভ্র গাউন ও অলংকারাদি দেখে মনে হয়, একটি যুবতী দুটি ব্রাইড মেইড বা সহচরী নিয়ে চার্চে গিয়েছিল বুঝি বা বিয়ের দিনের মহড়া দিতে।

নদীর দিকে। মাঝিরা পাড়ে নাও বেঁধে পাটাতনের জল সেচতে শুরু করলে আমরা প্রক্ষালনের প্রয়োজনে নেমে পড়ি পাড়ে।

হাঁটাচলা করে হাত-পায়ের খিল খুলতে না খুলতেই কাকতালীয়ভাবে থেমে যায় ঝোড়ো হাওয়া। হাওরের পাড়টি সবুজ ঝোপঝাড়ে শ্যামল হয়ে আছে। আগনেস গোলাপি বর্ণের ফুলে ফুলে উড়ে বেড়ানো প্রজাপতিদের ছবি তোলেন। আমি ঝোপের অন্যদিকে এসে ট্রাভেলার্স পাম নামে একটি সুদর্শন বৃক্ষ দেখতে পেয়ে তা আগনেসকে ডেকে দেখাই। তাতে তার মাঝে ছড়ায় চটুল অভিব্যক্তি। তিনি পামগাছের পাখার মতো ক্রিসেন্ট শেপে ছড়ানো পাতাগুলো ওয়ান-টু করে গুনতে শুরু করেন। একুশ পর্যন্ত গুনে ক্ষান্ত দিয়ে মহিলা অতঃপর গাছটিকে পোষা প্রাণীর মতো হাত বুলিয়ে আদর করেন। তখন পামগাছটির গোড়ায় আরেকটি বিচিত্র ফুলের দিকে নজর পড়লে তাঁর এক্সাইটমেন্ট চরমে পৌঁছায়। রীতিমতো ঢাকনাওয়ালা তৈজসপত্রের আকৃতির এ ফুলটি পিচার ফ্লাওয়ার নামে পরিচিত। পুষ্পটি কার্নিভর বা পতঙ্গখেকো একটি উদ্ভিদ। আমরা তার জারের মতো বিশাল পাপড়িতে জমে থাকা



চরে চাটাইয়ে বসে দম্পতি

ছলাৎ ছলাৎ শব্দে ঢেউ উথলে পড়ছে নৌকার পাটাতনে। নাও দারুণভাবে দুলতে থাকলে ডাডাডি তাসা রঙিন গামছা উড়িয়ে ইশারা দেন। মাঝিরা সাবধানে নাও বেয়ে চলে আসে হাওরের পাড়ের কাছে। ওখান থেকে মাহাডিরু নদীর সংকীর্ণ আউটলেট বেরিয়ে রওনা হয়েছে ৎসিরিবিহিনা

শিশিরজলে একটি পতঙ্গকে হাবুডুবু খেতে দেখি। আগনেস দারুণ স্নেহে গাছের মরা পাতা দিয়ে সাবধানে পতঙ্গটিকে রেসকিউ করে তুলে এনে ঘাসে রাখেন। মুমূর্ষু পোকাটির দিকে তাকিয়ে আমি তাকে বলি, 'আগনেস, ইউ জাস্ট ডিপ্রাইভড ফুড টু দ্য পিচার ফ্লাওয়ার, পোকাকে তো বাঁচালে, কিন্তু বেচারা তৈজসপুষ্প এবার খাবে কী?' তিনি আমার দিকে ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে বলেন, 'ইউ আর ভেরি স্ট্রেঞ্জ। গতকাল তুমি জানতে চেয়েছিলে—হোয়াই ইট ইজ ইমপরট্যান্ট ফর মি টু ডু বোট রাইড ইন ৎসিরিবিহিনা রিভার? আই অ্যাম গোয়িং টু অ্যানসার ইউ নাউ। আমি স্টার অব বেথেলহাম নামে পরিচিত কমেট অর্কিডের তালাশে মাদাগাসকারে এসেছি।' কমেট অর্কিড নিয়ে আমাদের কথাবার্তা তেমন জমে না। ডাডাডি তাসা শিঙ্গা ফুঁকলে আমাদের নেমে যেতে হয় নৌকায়।

হাওরের আউটলেট ধরে বেরিয়ে পিরাগ-বোটগুলো আবার মাহাডিরু ধরে আগায়। স্রোতের টান বাড়ে দারুণভাবে। বেশ খানিকটা ঢেউ হচ্ছে। ঘণ্টাখানেক মাঝিরা মতিচ্ছন্নের মতো বইঠা মেরে দ্রুতগতিতে ভেসে চলা বোটগুলোকে সামলায়। একটি চরের কাছে এসে আমরা লাঞ্চের জন্য বিরতি নিই। মাঝিরা পাথর দিয়ে চুলা বানিয়ে তাতে আগুনের আঁচে ঝলসাতে শুরু করে প্লানটিন বা একধরনের কাঁচকলা। দড়ি দিয়ে বেঁধে বেজায় বয়স্ক কচ্ছপকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে মালাগাছি এক পুরুষ। ভাবি, জলজ এ প্রাণীকে আরও বছর কয়েক নদীজলে সাঁতরে বেড়ানোর অধিকার দিলে কী এমন ক্ষতি হতো? লোরেনা বন্দী কচ্ছপের ছবি তুলতে গেলে সিনিওর থিয়াগো বিরস মুখে জানান যে তাঁর ওয়ালেট খুঁজে পাচ্ছেন না। বিশেষ করে ট্রাভেলার্স ক্রেডিট কার্ড নিয়ে তাঁর দুশ্চিন্তা হচ্ছে। যে কেউ তা ব্যবহার করে উইথড্র করে নিতে পারবে হাজার দশেক ডলার। নৌকায় চড়া অব্দি তাঁর আইফোন থেকে উপে গেছে তাবত কানেকশন। ক্রেডিট কার্ডটি টেলিফোন করে এখনই ক্যানসেল করাতে না পারলে আখেরে বিষয়টি বিপজ্জনক হতে পারে।

খানিকটা হেঁটে বালুচরের অন্যদিকে চলে আসতেই ভিন্ন এক পর্যটক দম্পতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এরা তাঁবু খাটিয়ে তার পাশে চরে চাটাই পেতে রীতিমতো পিকনিকের আয়োজন নিয়ে বসেছেন। আমি তাঁদের দিকে হাত নাড়লে তাঁরা হাসিমুখে 'হ্যালো' বলেন। তো, আমি এগিয়ে গিয়ে তাঁদের সাথে টুকটাক কথাবার্তা বলি। এ যুগল পর্তুগাল থেকে মাদাগাসকারে এসেছেন পর্যটন করতে। আমার লেখাজোকাতে প্যাশন আছে জানতে পেরে খোঁজখবর নেন—কোন ধরনের বিষয়আশয় নিয়ে লিখতে পছন্দ করি। বাতচিতে জানতে পারি পুরুষটি লিসবনে একটি টাট্টু পারলার চালান। তাঁর স্পেশালিটি হচ্ছে নববিবাহিত দম্পতির শরীরে উল্কিতে

নানা রকমের ভালোবাসার প্রতীক এঁকে দেওয়া। তাঁর গার্লফ্রেন্ড এলিমেন্টারি স্কুলে ভাষা ও সাহিত্য পড়ান। অবসরে তাঁর হবি হচ্ছে হাজার বছরের পুরোনো গাছ-বৃক্ষের ছবি তোলা। তিনি কোথায় কী ধরনের গাছের ছবি সম্প্রতি তুলেছেন জানতে চাইলে মৃদু হেসে তিনি ইসপানিয়ার আন্দালুসিয়ার দৃষ্টান্ত দেন। ওখানকার অনেকগুলো অলিভগাছের বয়স হাজার বছর পেরিয়েছে। এ গাছগুলো মিলেনিয়াম অলিভ নামে পরিচিত। গেল সামারে তেরোটি মিলেনিয়াম অলিভের নানা দৃষ্টিকোণ থেকে তোলা আলোকচিত্রের প্রদর্শনী করেছেন। ইনি বর্তমানে মাদাগাসকারে এসেছেন—এখানকার হাজার বছরের পুরোনো বাওবাব গাছের ছবি তুলতে।

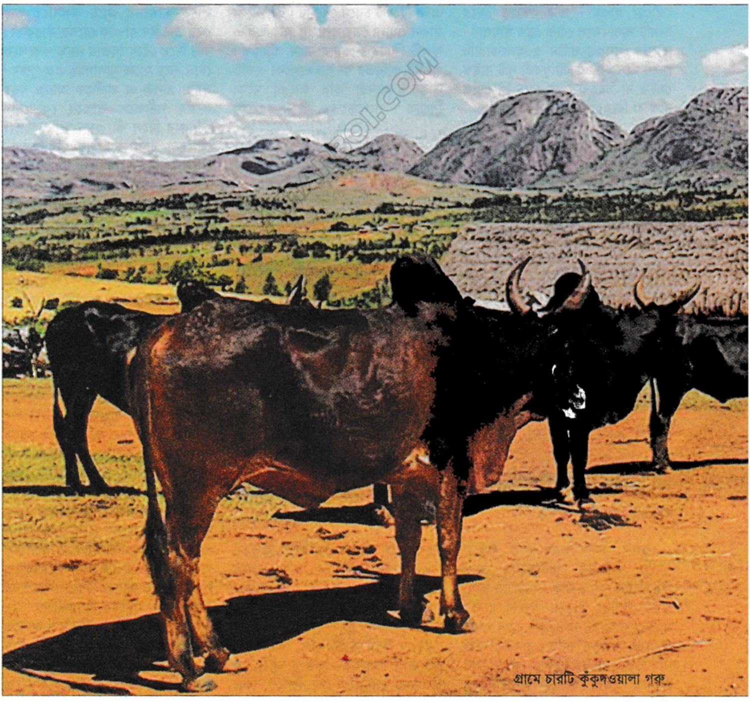
আরেকটি তথ্য শেয়ার করে এ দম্পতি আমাকে চমকে দেন। দুজনে লিভ টুগেদার করছেন গেল সাড়ে তিন বছরের মতো। আজ ভোরে এ বালুচরে



তৈজসের মতো পিচার ফ্লাওয়ার

নেমে মাহাডিরু নদীর আলাভোলা বাতাসে জায়গাটি তাঁদের এত ভালো লেগেছে যে তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এখানে বিবাহিত হওয়ার। তাঁদের মোটরবোট উজিয়ে গেছে সামনের একটি গঞ্জে। ওখান থেকে রিভার গাইড খুঁজে নিয়ে আসবেন বিয়ে পড়িয়ে দেওয়ার জন্য পাদরি। আর বাজার থেকে কিনে নিয়ে আসবেন টার্কি, তাজা শাকসবজি ও রাম। বিয়ের পর রাতে পার্টির আয়োজন চলছে। তারা আমাদের ইনভাইট করেন তাঁবু খাঁটিয়ে এখানে রাত কাটাতে। চাইলে আমরা রাতে পার্টিতে তাঁদের সাথে হইহল্লায় শামিল হতে পারি।

একটি বিষয়ে কৌতূহল হলে আমি পোলাইটলি ক্ষমা চেয়ে জানতে চাই, বিবাহের বিষয়টি তাদের কুটুমখেশরা জানেন কি? পুরুষটি জবাব দেন, 'আমাদের প্যারেন্টস এখনো জানেন না যে আমরা বিবাহিত হতে যাচ্ছি। তবে একটু পর টেলিফোন করে আমরা তাদের বিষয়টি অবগত করব।' আমার পরবর্তী প্রশ্ন হয়, 'হাউ আর ইউ গোয়িং টু কল ইয়োর পেরেন্টস ইন পর্তুগাল।



গ্রামে চারটি কুঁকুদওয়ালা গরু

তোমাদের টেলিফোনে নেটওয়ার্কের সিগন্যাল পাওয়া যাচ্ছে কি?' মহিলা মৃদু হেসে রেসপন্স করেন, 'নো, দেয়ার ইজ নো নেটওয়ার্ক, নো ওয়াইফাই, নো...নাথিং। কিন্তু আমরা সাথে করে ক্যারি করছি একটি স্যাটেলাইট টেলিফোন। আই অ্যাম শিওর উই ক্যান টক উইথ আওয়ার প্যারেন্টস উইথ দিস।' আমি এবার ফ্র্যাংকলি তাদের সিনিওর থিয়াগোর ওয়ালেট হারানোর ঘটনা বলি। মহিলা উঠে তাঁবুতে যান স্যাটেলাইট ফোন নিয়ে আসতে। পুরুষটি আমাকে বলেন, 'নো প্রবলেম, আস্ক ইয়োর ফ্রেন্ড থিয়াগো টু ইউজ আওয়ার স্যাটেলাইট ফোন। ওয়ান এইট হানড্রেড লাইনে টোয়েন্টিফোর আওয়ার্সের যেকোনো সময় কল করে ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদি ক্যানসেল করা যায়।'

সিনিওর থিয়াগোকে ডেকে বিবাহিত হতে যাওয়া পর্তুগিজ দম্পতির

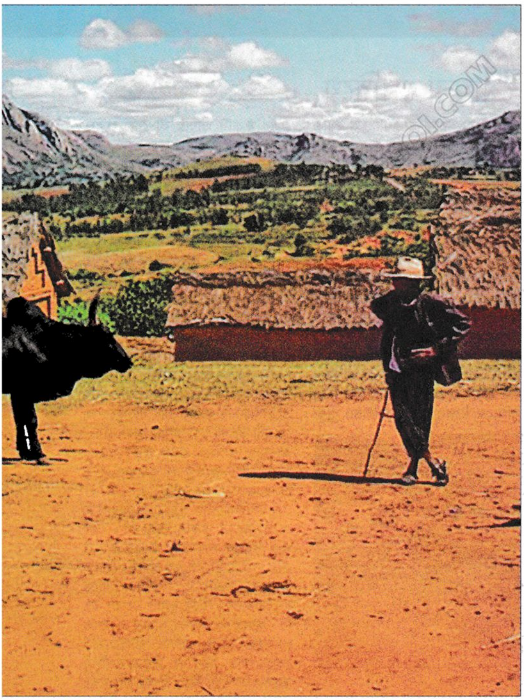


ট্রাভেলার্স পাম



দড়ি বাঁধা কচ্ছপ

হাওলা করে দিয়ে আমি বালুচরের ওপরের দিকে হাঁটি। একটি গাছের শিকড়ের সিঁড়িতে পা ঠেকিয়ে উঠে আসি ওপরের সমতল জমিনে। এখানে তালাশ পাওয়া যায় ছোট্ট একটি গ্রামের। ছন-বাঁশ-বেতের ঘরদুয়ারের পাশে মাঠে দাঁড়িয়ে জাবর কাটছে চারটি কুঁকুদওয়ালা গরু। লাঠি হাতে হ্যাট-কোট পরা এক প্রৌঢ় আমার দিকে তাকিয়ে মালাগাছি ভাষায় বলেন 'মানাও আহওয়ানা' বা 'হ্যালো, শুভেচ্ছা।' তাঁকে দুশ্চিন্তাহীন নির্ভার দেখায়। আমি তাঁকে 'মিসাওত্রা' বা 'ধন্যবাদ' বলে তাকাই গ্রাম ছাড়িয়ে বেশ দূরে দিগন্তজুড়ে দাঁড়িয়ে থাকা পাথরের পাহাড়গুলোর দিকে। মনে হয়, একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেও এরা যাপন করছে একধরনের সহজীয়া জীবন। আমাদের মতো জটিল দিনযাপনে অভ্যস্তদের হামেশা স্ট্রেসের সাথে বোধ করি তাদের তেমন কোনো পরিচয় নেই।



ফিরে আসি আবার চরে। মাঝিরা ঝলসানো কাঁচকলার সাথে পোড়া মরিচ ও পেঁয়াজ দিয়ে করেছে নোনা মাছের ভর্তা। সিনিওর থিয়াগো স্যাটেলাইট ফোনে ক্রেডিট কার্ড বাতিল করতে পেরেছেন। কারাবন্দীরা রিলিজের অর্ডার পেলে যে রকম খুশি হয়ে ওঠে এ রকম বিগত হেসে তিনি মরিচের ঝালে জেরবার হওয়া সহযাত্রীদের ডার্ক চকোলেট বিলান। চকোলেট চুষতে চুষতে আগনেসা পেরিউইনকোল ফুলের ঝাড়ে হাত বোলান। বালিকা মেয়ের চুলের জট খুলে আচড়ে দেওয়ার মতো যত্নে তিনি এখন গোলাপি ফুলে জড়ানো পরগাছা লতা খুলে দিচ্ছেন। ট্রাভেলার্স পামগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে লোরেনা ও ফেতরাসেনা পাইপে স্মোক করছে টাসিলাকি। ফেতরাসেনার চোখ রংধনু রঙের সানগ্লাসে ঢাকা। লোরেনা মুখ-মাথা ঢেকে মাছের মতো দেখতে সফট কাপড়ের মুখোশ পরেছে। তার নিতম্ব জড়িয়ে প্যাঁচানো মাছের লেজের আকৃতি। তাতে তার ছায়াশরীর পেয়েছে মৎস্যকন্যার অবয়ব। ফেতরাসেনার হাত থেকে পাইপ নিয়ে সে কষে দম দিলে বাতাস বয়ে আনে নারকোটিক টাসিলাকি ভেষজের তীব্র সৌরভ। আমরা মধ্যাহ্নভোজন গুটিয়ে উঠে পড়ার উদ্যোগ নিই।



নৌকায় কাটা গাছের কাণ্ড

ৎসিরিবিহিনা নদীর মোহনা পেরিয়ে

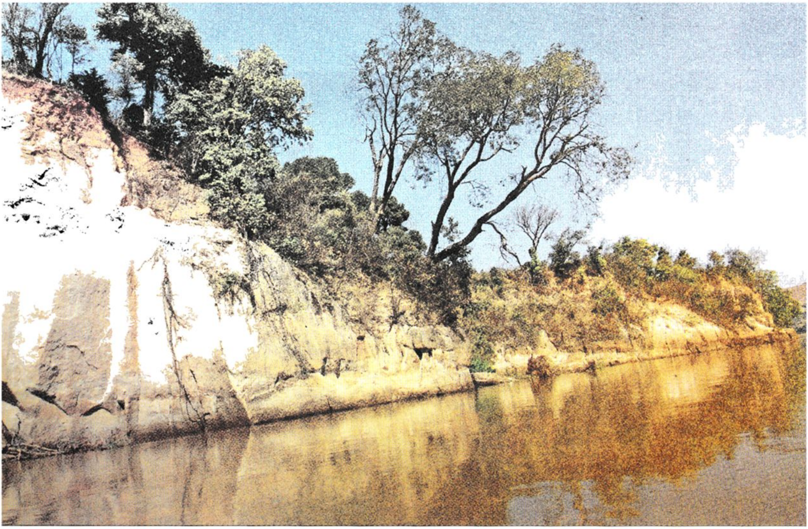
পর্তুগিজ দম্পতির বিয়ে উপলক্ষে কেউ এ চরে তাঁবু খাটাতে চায় না। তাই আমরা তাদের কংগ্রাচুলেশন জানিয়ে আবার চাপি পিরাগ-বোটে। স্রোত কুণ্ডলী পাকিয়ে গভীর এক দহে তৈরি করেছে অনেকগুলো ডিপ্রেশন। তার ওপর দিয়ে সাবধানে পাড়ি দিতে হলে প্রয়োজন জলদেবতা পেলামানাকে প্রথমে তুষ্ট করা। সুতরাং, ডাডাডি তাসা এবার চলমান নৌকা থেকে নদীজলে ছিটিয়ে দেন তুয়াকাগাছি নামে আখ, তেঁতুল ও কাটাফাই গাছের চূর্ণ বাকলে ফারমেন্ট করা আরক। নৌকা দারুণভাবে দুললে আমি বদর পীরের কথা ভাবি। কিন্তু মাদাগাসকার তাঁর জুরিসডিকশনের বাইরে। মাঝিরা 'পেলামানা-ইয়ানা-ইয়ানা' আওয়াজ দিয়ে বইঠা চালালে আমি আতঙ্কে চোখ মুদে দোয়া-দরুদ পাঠ করি। খানিক পর নৌকার দোলাচল শান্ত হয়ে এলে কোথা থেকে কানে ভেসে আসে কোনো প্রাণীর ডিস্ট্রেস কল। চোখ খুললে দেখি পাড়ের কাছে একটি ডোবা পাথরের ওপর পেছনের পায়ে ভর দিয়ে জানের ভয়ে আওয়াজ করছে চার-পাঁচটি উদ্‌বিড়াল। বিষয় কী? আগনেসা পাড়ের দিকে আঙুল দিয়ে ইশারা করেন। দেখি ওখানে বেকুফের মতো মুখ ব্যাদান করে নদীর দিকে নেমে আসছে একটি কুমির। পাশ দিয়ে আরিস্তিদ ও কাহিনার নাও ভেসে গেলে আমি আওয়াজ দিয়ে কুমিরের উল্লেখ করি। আরিস্তিদ বাঁকা হেসে ফরাসি ভাষায় কী যেন বলেন, আন্দাজ করি—তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, 'ইউ আর ইন মাদাগাসকার, এখানে কুমির তো থাকবেই, ডু ইউ র‍্যাদার এক্সপেক্ট আ টিকটিকি।'



কুমিরের মুখব্যাদান

মোহনায় মাহাডিরু স্মুদলি ঢুকে পড়ে ৎসিরিবিহিনা নদীর স্বেচ্ছায় শুয়ে পড়া শরীরে। ডাডাডি তাসা শিঙ্গা ফুঁকলে মাঝিরা উৎসাহের সাথে আওয়াজ দেয়, 'আনি ৎসিরিবিহিনা হজাইয়ে', অর্থাৎ 'আমরা ঢুকে পড়েছি ৎসিরিবিহিনায়।' তাদের উল্লাস বইঠার তোড়ে বিস্তারিত হয় ব্যাপকভাবে। সবাই মিলিতভাবে হরেক কিসিমের ধ্বনির কাকাফনিতে সমবেতভাবে গেয়ে ওঠে 'আনি নি ফারিতানিনি সানাইয়ে' বা 'এ নদী তীরেই তো আমার জনমভূমি।' আনমনা তাকিয়ে দেখি কাটা গাছের আস্ত একটি কাণ্ড নিয়ে মোহনা পাড়ি দিচ্ছে অজানা এক মাঝি।

ৎসিরিবিহিনার জলের বর্ণ মাহাডিরু থেকে তেমন একটা ভিন্ন নয়। তবে তার পাড়ের আকৃতিতে রোদে ঝলমল করে লাইমস্টোনের রকওয়াল। স্রোতে এখানে নৌকার গতি বাড়ে ব্যাপকভাবে। তবে দুলুনি তেমন হয় না। আমাদের চোখের সামনে ক্রমাগত লাফিয়ে উঠছে জাম্পিং কার্পজাতীয় কোনো মাছ। মনে হয়, রিভার ডলফিন তাদের তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে শিকারের



পাড়ে লাইমস্টোনের রকওয়াল



ঘাটে গামলা মাথায় মেয়ে

ধান্দায়। ৎসিরিবিহিনা নদীতে ডলফিন আছে কি—আগনেসার কাছে জানতে চাইলে তিনি লাফানো মাছের দিকে ধুন ধরে চেয়ে থেকে বলেন, 'আমি একটি বইয়ে পড়েছি মাদাগাসকারে পাওয়া গেছে পাঁচ ধরনের রিভার ডলফিনের জীবাশ্ম।' নদীর পাড়ের কাছে ডোবাপাথরে পা দিয়ে প্রশ্নবোধক চিহ্নের মতো উঠে দাঁড়ায় তিনটি উদ্‌বিড়াল।

আমরা অতিক্রম করে যাই একটি ঘাট। ওখানে নোঙর করা কয়েকখানা সাদামাটা ছইহীন পিরাগ-বোট। যাত্রীরা জলে পা চুবিয়ে তাতে সওয়ার হচ্ছে। একটি ছোট্ট মেয়ে মাথায় প্লাস্টিকের গামলাভরা ডেগ-ডেকচি নিয়ে অবাক হয়ে আমাদের দেখে। আগনেসা জলের দিকে ইশারা করেন। দেখি নৌকার কাছেই ভাসছে পোড়ামোড়া কাঠের গুঁড়ির মতো দেখতে একটি কুমির। শরীর ঘামে চিটচিটে হয়ে আছে। এ মুখপোড়াকে দেখে মন থেকে ওজু-গোসলের ইরাদা স্রেফ উপে যায়। এক ঝাঁক মাছ তাদের রুপালি আঁশে রোদের রোশনি মেখে রিলাক্স ভঙ্গিতে ভাসে। আমাদের পিরাগ-বোটগুলো কেবলই স্রোতে ভেসে যায় ভাটির দিকে।

গল্প



সচিত্রকরণ : সুমন ওয়াহিদ

শাহ্‌নাজ মুন্নী

রঙের হাটের বেচাকেনা

রেললাইনের রেখা ধইরা সোজা চলতাছি। যেন আমি এমন একটা রেলগাড়ি, যার কোনো ইস্টিশন নাই। এই রেললাইন কি আমারে কোনো জঙ্গলের পথ দেখাইতে পারে? ঘন সবুজ শান্ত একটা জঙ্গল? জানা নাই আমার। হয়তো মণ্ডলের জানা ছিল। বহু দূরে রেলগাড়ির হুইসেল শোনা যায়, রেললাইন তিরতির কইরা কাঁপে আর আমি মণ্ডলের কথা ভাবতে থাকি।

সহজে মুখ খুলত না মণ্ডল, কিন্তু খুললে বড় আজব আজব কথা কইত সে। রাইতভর ঘুমাইত না, ঝিমাইত। তার জবা ফুলের মতো লাল চক্ষু দুইটা

দিন রাইত সারাক্ষণই থাকত আধবোজা, ঢুলুঢুলু। এইভাবেই হয়তো মণ্ডল ঘুমাইত, ঘুমায়া স্বপ্ন দেখত, হয়তো ঘুম আর জাগরণের মধ্যে একটা পক্ষপাতশূন্য অবস্থায় যখন চেতন আসত। তখন তার মনে কিছু মরমি ভাবের উদয় হইত। সে আয়েশি গলায় আমার নাম ধইরা ডাকত, কইত, 'বুঝলিরে ময়না, জমিনে চোর চামার গুন্ডা বদমাইশ বাইড়া যাওয়ায় আল্লা চইল্যা গেছে আসমানে, জমিনে অখন তিনার পাইক পেয়াদা ঘোরে আর ঘুষ খায়...'

একেকটা কথার পরেই খুকখুক কইরা কাশি দিত মণ্ডল আর ভোঁশ ভোঁশ কইরা কলকা টানত। ধোঁয়া ছাড়ত আর ধোঁয়া গিলত। তার ঘাড় ঝুইলা পড়ত বুকের ওপর, সে গভীর নিশ্বাস নিত, তারপর হুট কইরা ঘাড় উঁচায়া কইত, 'ময়না রে, এই দুনিয়া রঙের হাটের বেচাকেনা, চারদিকে গোলকধাঁধা, স্বপ্নের সওদাগররা দেখ দাঁড়ায়া আছে ফাঁদ পাইত্যা...'

ওর অস্পষ্ট কথা আমি কিছু বুজতাম, কিছু বুজতাম না। মণ্ডলরে আসলে বোঝা কঠিন। ওরে বোঝার চেয়ে ওর ভালোবাসাটা বোঝা হয়তো সহজ। বাপে যেমন জান পরাণ দিয়া ভালোবাসে নিজের সন্তানদের, কোলে নিয়া আদর-আহ্লাদ করে মণ্ডল ঠিক সেই রকমই ভালোবাসত আমারে, আমি অন্তর দিয়া বুজতাম তার অন্তরের কাঁপন, ছুঁইতে পারতাম তার বুকের নরম জায়গাটা। মর্জিনা কি সেই জন্যই আমারে একটু হিংসা করত? ঝুপড়ির বেড়ায় আঙুলের ডগায় লাইগ্যা থাকা চুনটা ঘইসা একটু ঠেস দিয়াই কি সে বলত, 'এই লেজটা না থাকলে আর শইল্যে রোম কিছু কম থাকলে মানুষ তোমারে ময়নার বাপ মনে করত মণ্ডল সাব।'

আমারে কোলে নিয়া পিঠের রোমের মধ্যে দুই আঙুলে বিলি কাটতে কাটতে মণ্ডল তখন হাসত আর কইত, 'ময়না তো আমার বাচ্চাই, আমি ওর বাপ! না রে ময়না!'

আমি আমার ভাষায় কিচমিচ করতাম। কী একখান ফালতু নাম রাখছে দেখো! দুনিয়ায় এত নাম থাকতে একটা বান্দরের নাম ও কিনা রাখছে পাখির নামে। আমাদের বানর সমাজে নাম হয় কত সুন্দর! লম্ফবীর, দৌড়কুমারী, লম্বা লেজের রাজা, হাতুড়িমুখা, কিচমিচানি পণ্ডিত এই রকম। ফরফর কইরা আকাশে উইড়া বেড়াইন্যা পাখি একদম পছন্দ না আমার।

মণ্ডল কইত, 'ময়না তো আদরের ডাক, তুই আমার এই দিলের ময়না।'

আমার যেমন পাখি পছন্দ না, মর্জিনার তেমন আমারে পছন্দ না। ভালোবাসা দূরের কথা সে হয়তো ঘিন্নাই করত আমারে। একদম ওর কাছে ভিড়তে দিত না, সারাক্ষণ দূর দূর করত।

'সর, সর, বান্দরের বাচ্চা, তোর মণ্ডল বাপের কাছে যা, ভাগ...'

মণ্ডল আমার মা-বাপ সবই। দুলাল বাজিগরের কাছ থেইক্যা মণ্ডল যদি আমারে উদ্ধার না করত, তাইলে হয়তো আমার গলায় বান্ধা থাকত শিকল আর পায়ে ঘুঙুর, রাস্তায় রাস্তায় ডুগডুগির তালে নাচ দেখায়া আমার জীবন কাটত।

> ময়না তো আমার বাচ্চাই, আমি ওর বাপ! না রে ময়না!

আমার মতো, মর্জিনারেও উদ্ধার করছিল মণ্ডল। মর্জিনার বুড়া বাপ, পঙ্গু ফকির লাল মিয়া, যে একটা চাক্কাঅলা কাঠের গাড়িতে চাদর বিছায়া বইস্যা থাকত আর মর্জিনা সারা দিন তারে ঠেইল্যা নিয়া ভিক্ষায় যাইত। সেই লাল মিয়া তো দিছিলই ওরে বাড়িওলি খালার কাছে বেইচ্যা। বাড়িওলি নির্ঘাত ওরে পাচার কইরা দিত মুম্বাই নাইলে করাচি। এর আগেও কাওরানবাজারের রেললাইনের পাশের এই বস্তি থেইক্যা অনেক যুবতী মাইয়া নীরবে নিখোঁজ হইছে। কেউ জানতেও পারে নাই। কিন্তু মর্জিনা অন্য পদের, সে বিপদ টের পাইয়া শুরু করল গলা ফাটায়া চিক্কার আর কান্দন। বস্তির কোনো কিছুই কারও অজানা থাকার সুযোগ নাই, ফলে কান্দন শুইন্যা আরও অনেকের সাথে মণ্ডলও গেল পঙ্গু ফকিরের ঝুপড়িতে আর গিয়া বুক চিতায়া লাল মিয়ার সামনে খাড়াইল।

'এই মেয়া রে বাড়িওলির কাছে দেওন যাইব না।'

মর্জিনার বাপ দাঁত-মুখ খিঁচায়া খারাপ গালি দিয়া জিজ্ঞেস করল, 'হেইলে পরে, এই মাইয়ারে কেডা খাওয়াইবে? তুই?'

মণ্ডল মাথা ঝাঁকায়। 'হ'।

'খানকির পোলা নিজেই খাওন পাও না, তুমি খাওয়াইবা আরেকজনরে? ওই মর্জিনা তুই ভালো চাইলে বাড়িওলির লগে যা, বিদেশ গিয়া কাম করবি, ভালো থাকবি'...

মর্জিনা বাপের আদেশ না মাইন্যা দৌড়ায়া আইসা মণ্ডলের পেছনে মুখ লুকাইলে ফকির বুড়ার মুখে শুরু হয় যত রাজ্যের খিস্তিখেউর। মর্জিনারে সে এমনকি এইটাও বলে যে মণ্ডল মর্জিনারে রক্ষিতা বানাইবার ধান্দা করতেছে এবং তারে দিয়া এখন ব্যবসা করাবে। মণ্ডল এই সব কথার কোনো জবাব দেয় না, খালি দুই পা আগায়া সামনে গিয়া বুড়ারে কাঠের বাক্স থেইক্যা কোমরসমান উঁচাতে তুইল্যা মাটির উপরে দেয় একটা আছাড়। ক্যাঁৎ কইরা একটা শব্দ হয় খালি। আর সাথে সাথে বুড়ার জবান বন্ধ, এক্কেরে হঠাৎ যেন থম মাইরা যায় সে।

সেই থেইক্যা মর্জিনা আইসা জুড়ল মণ্ডলের ছন্নছাড়া জীবনের সাথে। মণ্ডলের কী ব্যবসা আগে আমি বুজতাম না, খালি দেখতাম নানা কিসিমের মানুষ আসে রেললাইন বস্তিতে মণ্ডলের ঝুপড়িঘরে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ছাত্র, ধনী, গরিব, পকেটমাইর, রিকশাঅলা, দোকানদার এমনকি পুলিশ পর্যন্ত। আইসা টেকা দেয়, পকেটে পুরিয়া ভইরা বিদায় হয়। এখন আমি জানি মণ্ডল শুকনা বেচে। শুকনা রে কেউ কয় পুরিন্দা, কেউ কয় পুরিয়া। মণ্ডল বেচে আবার খায়ও। মণ্ডলের একটা দোস্ত আছে ফরিদ, ফরিদরে এই দেখি এই দেখি না। হঠাৎ হঠাৎ উধাও হইয়া যায় সে। শুনছি ও নাকি কোন মাজারের মুরিদ। যার কামই হইল মাজারে মাজারে ঘুইরা বেড়ানো। মণ্ডল যেমন আমারে ভালোবাসে, তেমন ফরিদও। আমি ফরিদের কোলে গিয়া বসি। ও আমার গলার নিচে আঙুল দিয়া চুলকায়া দেয়। আমি ওর গায়ের গন্ধ শুঁকি। মণ্ডলের মতো ফরিদও আমার কথা বুজে, কিছু জিগাইলে উত্তর দেয়। আমি কই, 'ও ভাই, শুকনা খাও কেন? নেশা করো কেন?'

ফরিদ কয়, 'খাই সত্য, কিন্তক

নেশা তো করি না, ময়না। তুই দেখ এইগুলা গাছের ডাল, গাছের ফুল। বুঝছস, এইডি খাইলে মাথা ঠান্ডা থাকে। ঝিম মাইরা পইড়া থাকি। কারও সাথে ঝগড়া বিবাদ করি না। কাইজ্যা ফ্যাসাদ করি না। আপনমনে ডুব দিয়া থাকি। খাবি তুই? একবার খাইয়া দেখ না!'

ফরিদ সত্যি সত্যিই আমার মুখে কইলকা ঠাইস্যা ধরলে আমি কিচমিচ কইরা ওর কোল থেইক্যা লাফ দিয় উইঠা আসি। দেখি মণ্ডলও হাসে। কয়, 'টান দে রে ময়না, একটা টান দে, আখিরাতে সবই পাবি, শুকনা পাবি না...হে হে হে...'

ফরিদও তাল দেয়, সুর কইরা কয়, 'আজরাইলে যখন আইব, হাতে এক খান বোতল থাকব, দমে দমে ঢোঁক গিলিবে তোমায় দেবে না—'

সেই প্রথম আমার ওই আশ্চর্য জিনিসের স্বাদ নেয়া। মণ্ডল শিখায়া দিল কইলকা কেমনে ধরা লাগে, কেমনে চোখ বুইজ্যা, এক্কেরে পেটের ভিতরে থেইক্যা দম নিয়া কইলকায় টান দিতে হয়। দিলাম টান। একটা ধাক্কার মতো লাগল প্রথমে, মনে হইল মাথা ঘুইরা পইড়া যামু, তারপর কেমন যেন মাথাটা হঠাৎ খালি খালি লাগল। আহ্ কেমন একটা অদ্ভুত সুখ! বুকের মধ্যে আত্মার ধুকপুকানি লাগে যেন আরও বাইরা গেল। আমার হঠাৎ মায়ের কথা মনে পড়ল, মায়ের দুধের বোঁটা মুখে নিয়া তার বুকে ঝুলতেছি, জগৎটা কেমন অদ্ভুত লাগতাছে। যেন লাল-সবুজ কচিপাতা ঘেরা মহুয়ার বনে দুলতেছি। বুকের ভিতরে থমকায়া থাকা চাপা কান্নার পাথর যেন গলতেছে, গলতেছে। সময় থাইম্যা গেছে, ঝিরঝির কইরা পানি পড়তেছে পড়তেছে, অনেক দূর থেইক্যা শুনি মণ্ডলের গান 'নেশা লাগিল রে...'

এমনে কইরা আস্তে ধীরে আমিও নেশাখোর হইয়া গেলাম।

'হায় কপাল! মণ্ডল সাব, শেষ পর্যন্ত বান্দরটারেও আপনে নষ্ট করলেন! বনের পশুরেও খারাপ বানাইলেন?' মর্জিনা কপাল চাপড়ায়। মণ্ডল তার ঢুলু ঢুলু লাল চোখ একবার খুইল্যা আবার বন্ধ কইরা ফালায়। মর্জিনা অখন পরাণ ভইরা আমারে আর মণ্ডলরে গালিগালাজ করে, কাছে গেলেই জুতা খুইল্যা আমারে দৌড়ানি দেয়। আমি মুখ ভেংচি দিয়া কিচমিচ কইরা ঝুপড়ির চালে উইঠা যাই আর বইসা বইসা ঝিমাই। চাল থেইক্যা অনেক দূর পর্যন্ত রেললাইন দেখা যায়। দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত কত রকমের মানুষজনের চলাফেরা যে দেখতে পাই। ঝিমাইতে ঝিমাইতে সেই সব দেখি, নিজের মনে চিন্তাভাবনা করি। কখনো মহাশূন্যে ঘুরপাক খাই, কখনো মাটিতে লুটাপুটি করি। চৌদ্দ কিসিমের মানুষ দেখি, লম্বা, খাটো, সাদা, কালো, মন খারাপ করা মানুষ, মোবাইলে কথা কওয়া মানুষ, আস্তে আস্তে হাঁটা মানুষ, উর্ধ্বশ্বাসে ছোটা মানুষ, মোটা মানুষ, শুকনা মানুষ। হঠাৎ একদিন দেখি সেই সব মানুষের ভিড়ে আরও কিছু অন্য রকম মানুষ হাঁইট্যা আসে। ওরা খদ্দের না। খদ্দেরের ভীরু চোরের মতো চঞ্চল চাহনি আমার চেনা। এদের চাহনি ভিন্ন রকম। এদের দেখলে মণ্ডল পালায়, মণ্ডলের সঙ্গী-সাথিরাও পালায়। ওদের দেইখ্যা ঝিমানি ছাইড়া আমি লাফ দিয়া উঠি, মণ্ডলরে খুঁজি সাবধান করার জন্য। যাতে সে পালায়া যায়।

কিন্তু আমি মণ্ডলরে খুঁইজ্যা পাওয়ার আগেই তারা মণ্ডলরে পাকড়াও করে। হাতকড়া পরায়া সোজা নিয়া যায় শ্বশুরবাড়ি। রাস্তার দুই দিকে সারি সারি দোকান আর মানুষজনের ভিড়। এর মধ্যে দিয়া আমি মণ্ডলের গাড়ির পিছনে ছুটি আর চিক্কুর দিয়া কান্দি। আমারেও সাথে নেও তোমরা। মণ্ডল আমার মা, আমার বাপ। মণ্ডল না থাকলে আমি তো এতিম, আমি তো একা। কে দিবে আমার খাবার? কে নিবে আমার খবর? কিন্তু চাইর চাক্কার গাড়ির সাথে চাইর হাত-পায়ে দৌড়ায়াও আমি কি আর পারি?

পথের ধারের মানুষ আমারে নিয়া বিদ্রূপ করে, বাচ্চা পোলাপান ঢিল মারে। ঘরে ফিরা আসি, দেখি, ঝুপড়িঘরটা চুপচাপ খালি পইড়া আছে। যেন আমার মনের মতোই ঘরটাও খাঁ খাঁ করতেছে। হাহাকার করতেছে, কাতর হইয়া, শূন্য হইয়া বুক চাপড়ায়া কানতেছে। মাটিতে পাইত্যা রাখা ময়লা চটের উপরে গড়াগড়ি দেই। ক্ষিধা লাগে, নেশা করার তৃষ্ণা লাগে। মণ্ডল তুমি কই? আমার কান্দন কি শুনতে পাও না? আমার কাছে কেন আসো না তুমি? সন্ধ্যা ঘনায়া অন্ধকার হইয়া



আসলে ঝুপড়ির ঝাঁপ ঠেইল্যা কেউ একজন ঢোকে। দেখি মর্জিনা। সে চুপচাপ বাত্তি জ্বালায়। তারপর আঁচলের খুট থেইক্যা দুইটা কলা আর পাউরুটি বাইর কইরা আমার দিকে ছুইড়া দেয়। সঙ্গে কাগজে পেঁচানো দুইটা মোটা বিড়ি।

মর্জিনারে বস্তির লোকজন চিনে মণ্ডলের বউ হিসাবেই। কিন্তু বাস্তবে ওদের সম্পর্কটা অদ্ভুত। মর্জিনার পঙ্গু বাপের চিল্লাচিল্লিতে কাওরানবাজার মসজিদের মাওলানা সাব মুখে মুখে কলমা পড়ায়া ওদের একটা বিয়া দিছিল ঠিকই, কিন্তু ওরা এক ঘরে থাকলেও একসাথে থাকে নাই। মণ্ডল আসলে থাকার চেষ্টা করে নাই, জোরজবরদস্তিও করে নাই। মর্জিনাও নিজের গরজে মণ্ডল সাবের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করে নাই। দুইজন নারী পুরুষ এক ঘরে দুই কোনায় পইড়া থাকছে। আমাদের বানর সমাজে এমন ঘটনা বিরল। কিন্তু মানবসমাজ অন্য রকম। উপরে বাজার হইল বারো রকম মানুষের মেলা, খারাপ মানুষ তো সবখানেই আছে। যারা সুযোগ বুইঝ্যা শইল্যে হাত দেয়, মন্দ কথা কয়। বুঝতে পারি, মর্জিনা মাঝে মাঝে অতিষ্ঠ হইয়া পড়ে, একলা একলা কান্দে, চোখ মুছে। আমি কাছে গেলে আমারে 'হারামির বাচ্চা' বইলা গাইল দেয়, ঠ্যাং উঁচায়া লাথি দেখায়, দৌড়ানি দেয়।

ঝুপড়িঘরের দরজায় মণ্ডলের বাঁধা খদ্দেররা উঁকিঝুঁকি মারে। মাল খুঁজে। একদিন দেখি, এদিক-ওদিক তাকাইতে তাকাইতে জাকির হোসেন আসল। ময়লা প্যান্ট-শার্ট পরা। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চক্ষু দুইটা সারাক্ষণই চঞ্চল। একটু পরপর সে থুতু ফেলে আর ঘন ঘন চোখে পলক দেয়। জাকির হোসেন মর্জিনারে কয়, 'মণ্ডলের ব্যবসাটা তুমি ধরো। আমি মাল সাপ্লাই দিমুনে...'

'না, আমি এই হারামের ব্যবসা করি না।'

মহিলারা এখন ডালায় সাজায়া দিনের আলোতে সবার সামনে 'পুরিয়া' বেচে। ছোট বাচ্চারা তরুণ আগন্তুকদের কাছে গিয়া ফিসফিস করে, 'মামা, পুরিয়া লাগব?'

'মামা শুকনা নিবেন? আসেন আমার লগে...'

ব্যবসা জইম্যা ওঠায় আমাদের খাওনের অভাব দূর হইছে। কিন্তু মণ্ডলের লাইগ্যা আমার পরাণটা এখনো পোড়ে। কই গেল মণ্ডল? কবে আবার আইব? কত দিন তারে দেখি না! মর্জিনার কাছে জিগাই, 'মণ্ডলের জেল ফাঁস কি হইছে? একটু খবর নিবা না? এত্ত নিঠুর তুমি, এত্ত বেদরদি...'

কিন্তু ও আমার ভাষা বোঝার চেষ্টা করে না। দয়া কইরা সামান্য খাবার দেয় ঠিকই কিন্তু ওই পর্যন্তই, আদর তো করেই না বরং হাতের কাছে কিছু পাইলে সেইটা দিয়াই 'যা ভাগ, বান্দরের বাচ্চা' বইল্যা তাড়া করে।

আমি ঝুপড়ির চালে বইসা একলা ঝিমাই। গায়ে রোইদ লাগাই, কান পাইত্যা শহরের দুঃখী বাতাসের গুনগুন গান শুনি, বেচারা বাতাস শহরের দালানে ধাক্কা খাইয়া ভাঙা মন নিয়া আবার বনাঞ্চলে ফিরা যায়। আমারও মনটা ফিরা যাইতে চায়, ইচ্ছা করে ছোটবেলার মতো মায়ের বুকের দুধে কামড় দিয়া ঝুইল্যা থাকি, এক গাছ থেইক্যা আরেক গাছের ডালে লাফায়া বেড়াই। আমার দলের অন্যদের সাথে ঘুরিফিরি ছোটাছুটি করি আর আপনমনে দাঁত বাইর কইরা কিচিরমিচির করি। নাইলে মণ্ডলের মতো উদাস কণ্ঠে কই, 'বিচিত্র এই ঢাকা নগর, কে খেলাড়ি কে বাজিকর?'

> মণ্ডলের জেল ফাঁস কি হইছে? একটু খবর নিবা না? এত্ত নিঠুর তুমি, এত্ত বেদরদি...

তবে এখন যখন মণ্ডল আর আমাদের সাথে নাই, মণ্ডলের ব্যবসা নাই, ফলে কামাই রোজগারও নাই। কিন্তুক তার পোষ্য এই ময়না আর মর্জিনা দুইজনেরই তো পেট আছে, সেই পেটের ক্ষিধাও আছে, সেই ক্ষিধা কীভাবে মিটবে? আমি এইখান ওইখান থেইক্যা চুরিচামারি করি, কলাটা মূলাটা নিয়া আসি। বাজারফেরত মানুষরে খামচি দিলে মানুষ ভয় পায়, কেউ কেউ দয়া কইরা কিছু দেয়। কিন্তু মর্জিনা? ও কী করবে?

বস্তির লোকজন বলাবলি করে, 'মণ্ডলের ব্যবসার সব টেকা মর্জিনা লুকায়া রাখছে...'

কথাটা সত্যি না মিথ্যা জানি না। আমি তো দেখি, কাওরানবাজারে সবজির ট্রাকের তলে পইড়া থাকা পেঁয়াজের খোসা, থেঁতলাইন্যা শাক আর পচা আলু-পটলের ভিতর থেইক্যা সবজি টুকায়া বিক্রি করে মর্জিনা, নয়তো আড়তদারদের ফাইফরমাশ খাটে। এক-দুই শ টাকা যা পায়, তা দিয়া আমার আর ওর এক বেলা চলে তো আরেক বেলা উপাস থাকি। তার

মর্জিনা এক কথায় নাকচ কইরা দেয় জাকিরের প্রস্তাব। কিন্তু জাকিরের ধৈর্য অসীম। সে প্রতিদিনই আসে আর গলার স্বর নিচু কইরা মর্জিনারে বোঝায়। যাওয়ার আগে জোর কইরা মর্জিনার হাতে টেকা গুঁইজা দেয়। বাজার সদাই দিয়া যায়। মাঝে মাঝে মায়া কইরা আমার মাথায় হাত বুলায়। কয়, 'আরে, এইটা মণ্ডলের সেই নেশাখোর বান্দরটা না?'

আমার ইচ্ছা করে ওর হাতে জোরে একটা কামড় বসাই। কিন্তু নিজেরে সামলায়া রাখি। দেখি, মর্জিনার মন ধীরে ধীরে নরম হয় আর সে জাকিরের ফাঁদে আটকায়। আসলে কে যে মর্জিনারে রাজি করায় বুঝি না, জাকিরে নাকি মর্জিনার চরম অভাবে?

খদ্দেরের তো কামাই নাই, তারা ঠিকই গন্ধ শুঁইক্যা ঝুপড়িতে হানা দেয়। মণ্ডলরে ওরা ডাকত মামা, এখন মর্জিনারে ডাকে মামি। তবে মর্জিনার ব্যবসার রীতি মণ্ডলের চেয়ে ভিন্ন। সে বস্তির আরও যত গরিব মহিলা আছে তাদেরে আর তাদের বাচ্চা পোলাপানরে এই ব্যবসায় জড়ায়া নেয়। বস্তির

ঝুপড়ির ভাঙা চালে বইসা যেমন রোইদ-বৃষ্টি আর কুয়াশা টের পাই, তেমনই টের পাই হাতে টেকা পয়সা আসার পর মর্জিনার মধ্যেও পরিবর্তন আসছে। ওর গলার স্বর আরও কঠিন, আরও চোখা আরও উঁচা হইছে। চেহারা ভরাট হইছে, চলাফেরা-কথাবার্তার মধ্যেও সেই নরম নেতাইন্যা ভাবটা নাই। কেমন শক্ত, কাঠ কাঠ, লোহা লোহা, পাথর-পাথর ভাব। বস্তির সবাই দেখি বেশ সমীহ কইরা চলে ওরে। এমনকি জাকির হোসেনও এখন ওর সামনে হাত কচলায়, গদ গদ ভঙ্গি করে। কয়দিন আগে চ্যাংড়া জাহাঙ্গীর ঠিকমতো মাল বিক্রির টেকা না দেওয়ায় ওরে ক্ষুর বাইর কইরা শাসাইছে মর্জিনা। শান্ত গলায় কইছে, 'এরপর আর কথা নাই, বাইন্ধা আইনা গলায়



খালি একটা পোচ দিমু আর কিছু না...'

বস্তির সবাই জানে মর্জিনা যা কয় তা সে কইরা ছাড়ে। যদি কয়, লাশ ফালায়া দিমু, তাইলে ঠিকই রেললাইনের ধারে লাশ পড়ে। যদি কাউরে কয়, এলাকাছাড়া করুম, তাইলে এই তল্লাটে সে আর ভিড়তে পারে না। মর্জিনা সাংঘাতিক মেয়েমানুষ। পোষা একটা গুন্ডা বাহিনী বানাইছে ও। নিজে কিছু করে না। পুলিশ, সাংবাদিক, গুন্ডা, ছিচকা মাস্তান সবই সামলায় ওরা, যেন সবাই তাদের হাতের পুতুল। মর্জিনা এখন বস্তির রানি, ওদের মালকিন। এই মর্জিনারে আমিই ঠিকমতো চিনি না, এত দিন তফাত থাকা মণ্ডল, যদি ফিরা আসে, তবে সে কি চিনতে পারবে এই বদলায়া যাওয়া মর্জিনারে?

আমার বয়স বাড়তাছে বুঝি, শইল্যে আর আগের মতো লাফালাফি করার জোর পাই না। মণ্ডলের মতোই একখানে বইস্যা ঝিমাই। তিন বেলার কলা পাউরুটি, শসা গাজর আর পুরিয়ার বন্দোবস্ত কইরা দিছে মর্জিনা। মনে হয়, ও আমারে কিছুটা মায়া করে, হয়তো কিছুটা দয়াও করে। কিন্তু এই দয়ামায়ায় আমার মন ভরে না। আমার খালি মণ্ডলের কথা মনে পড়ে, বুকের ভিতরে কষ্ট হয়, যেন কেউ হাতুড়ি দিয়া ইট ভাঙতাছে ভাঙতাছে। মরার আগে একবার কি তার মুখটা দেখতে পামু? কত মানুষ আসে যায়, তাদের মুখের মধ্যে আমি মণ্ডলের মুখটা খুঁজি। পাই না। দিন দিন আশা ছাড়ি, আর শুনতে পাই মর্জিনা জমি কিনছে, হেই কোন যাত্রাবাড়ী পার হইয়া সাইনবোর্ড এলাকায়। হয়তো সেইখানেই বাড়ি করবে, হয়তো কাউরে বা জাকির হোসেনরে বিয়াও করবে। করুক যা ইচ্ছা, তারে রুখে কে?

আমার দিন যায় আমার মতোই একলা। একদিন এক চৈত্র মাসের খরখরা দুপুরবেলা বাতাসে ধুলার সঙ্গে শুকনা পাতা চক্কর দিয়া উড়তাছে। দূরে তাকাইলে চক্ষে কেমন ধাঁধার মতো লাগে। সেই ধাঁধার মধ্যে দেখি একটা মুখ কেমন জানি চেনা চেনা লাগে। হায়! হায়! এইটা কি মণ্ডল? সেই রকমই তো চোখ-মুখ, ভুরুর উপরে কপালের কাটা দাগ, সেই রকমই সামনে ঝুঁইক্যা ঝুঁইক্যা পা ফেলায়, শরীরটা লাগে যেন আগের চে কাহিল, মুখে দাড়ি গোঁফের জঙ্গল, তাতে সাদা-কালোর মিশ দেওয়া, তবু আমি ঠিক চিনি এইটাই মণ্ডল। তার বুকের উপরে ঝাঁপ দিয়া পড়ি, যেন একটা সবুজ নদীর শীতলতা আমারে জড়ায়া ধরে। যেন পোড়া অন্তরটা বহু বছর পর ঠান্ডা হয়।

মণ্ডল কয়, 'আরেব্বাস, ময়না, তুই আমারে মনে রাখছস...'

বস্তিতে আমাদের ঘিরা একটা ভিড় জইম্যা যায়। 'মণ্ডল ফিরা আইছে-এ-এ' এমন একটা রব উঠে ভিড়ের মইধ্যে। অনেক রকমের গুঞ্জনও শুরু হয়। তবে সেই সবে ভ্রুক্ষেপ নাই মণ্ডলের। সে ঝুপড়ির বন্ধ ঝাঁপের সামনে ঢুলু ঢুলু চোখে পা ছড়ায়া বইসা থাকে। আমারে চীনাবাদাম খাওয়ায়, নিজেও একটা-দুইটা দানা মুখে দেয়। গুনগুন করে, 'রঙ্গিলা দেশের নাইয়া, মায়া নদী কেমনে যাবি বাইয়া...'

বিকাল ঘনায়া আসলে মর্জিনা আসে, তার সাথে জাকির হোসেনও আসে। আশপাশে দেখি মর্জিনার গুন্ডাবাহিনীর সদস্য আসলাম, নাগু, রাজু আর জামালও আছে।

'কী অবস্থা মণ্ডল সাব? ফিরলেন অবশেষে...' মর্জিনা বলে। উত্তরে আধবোজা চোখ খুইল্যা একটু হাসে মণ্ডল। 'লেনাদেনা কিছু মনে হয় বাকি আছে...' সে বলে।

মর্জিনা আঙুল উঁচা কইরা চিক্কার দেয়, 'উহু, কোনো কিচ্ছু নাই, জায়গা খালি থাকে না মণ্ডল সাব। বাঁচতে চাইলে আপনে ফুটেন। দৌড়ের উপরে রাস্তা মাপেন।'

মণ্ডল হা হা কইরা হাসে। বলে, 'মুসাফিরের ঠিকানা দরকার নাই...'

মর্জিনা মুখ ঝামটা দেয়, 'ভাবের কথা রাখেন মণ্ডল সাব, তিন দিন সময় দিলাম, এই বান্দর নিয়া বিদায় হন।'

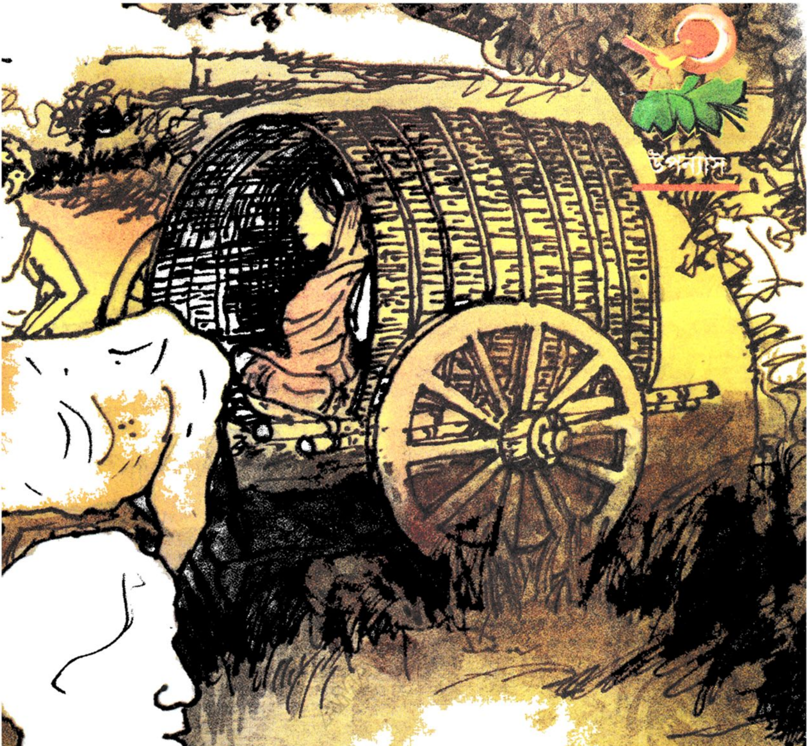
মর্জিনা তার সাঙ্গপাঙ্গসহ নিজের ঝুপড়িতে গিয়া ঢুকলেও মণ্ডলের হাসি যেন আর ফুরায় না। সে আঙুলের কর গোনে 'তিন দিন...এক-দুই-তিন...এক-দুই-তিন'

কিন্তু তিন দিন পার হইতে পারে না, দ্বিতীয় দিনেই ঘটনা ঘইট্যা যায়। রেললাইনের পাশে একটা ঝোপে ঘেরা জায়গায় পাওয়া যায় মর্জিনার গুন্ডা বাহিনীর সদস্য নাগুর উপুড় হইয়া পইড়া থাকা লাশ। ক্ষুরের পোচে কেউ তার গলা সমান দুই ফাঁক কইরা দিছে। পুলিশ আসে। লোকজন নানা কথা কয়। কেউ কয়, নাগু পুলিশের ইনফর্মার হইছিল, কেউ কয় নিজেগো মধ্যে বখরা নিয়া গন্ডগোল কইরা নাগু খুন হইছে, কেউ কয় মর্জিনা খুন করাইছে। সত্যি-মিথ্য জানি না। খালি দেখলাম পুলিশ পরথমে নাগুর লাশ উঠায়া নিয়া গেল, তারপরে আইসা ধরল মণ্ডলরে। আগের মতোই হাতকড়া পরায়া নিজেদের গাড়িতে উঠাইল ওরে।

মণ্ডল শেষ একটা হাসি দিল আমার দিকে তাকায়া, হৃদয়টা ভাইঙা খান খান হইয়া গেল আমার। বুঝলাম মণ্ডল আর ফিরবে না। আর কোনো দিন ওর সাথে দেখা হবে না আমার। এই ঢাকা শহরে আর কার টানে থাকুম আমি। ও রেললাইন কত দূরে যাও তুমি, এই বেলা আমারে নিয়া যাও। হাঁটি তোমার সাথে, চাইর হাত পায়ে, যদি মরার জন্যে একটা জঙ্গল পাই। ঘন সবুজ শান্ত একটা জঙ্গল।



সচিত্রকরণ : অশোক কর্মকার



আনিসুল হক

ও বন্ধু কাজলভোমরা

[সৈয়দ শামসুল হক রাজধানীর একটি হাসপাতালে। আমি গেছি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। কে জানত সেটাই হবে শেষ দেখা। তিনি বললেন, *প্রথম আলোর* ঈদসংখ্যায় তোমার লেখা পড়ে একজন বলেছেন, তুমি নাকি রংপুর নিয়ে লিখেছ? আমি বললাম, জি রংপুরের পটভূমিতে একটা উপন্যাস লিখেছি। আপনি তো অনেক আগেই রংপুর নিয়ে লিখেছেন, হক ভাই। তিনি বললেন, আনিস, এমন বিনয় কোরো না যেন আত্মবিশ্বাস চলে যায়, আবার এমন উদ্ধত হয়ো না যে অহংকারী মনে হয়। এই উপাখ্যানটিতেও রংপুর অঞ্চলের উপভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। করতে গিয়ে বারবার সৈয়দ শামসুল হকের কথা মনে পড়ছে। এই কাহিনি সৈয়দ শামসুল হকের অবিনশ্বর স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করছি।—আনিসুল হক।]

শিয়াল ডাকছে। শিয়ালের ডাকের একটা তাল-লয় আছে। খানিকক্ষণ তারা করুণ সুরে লম্বা লয়ে ডাকে। তখন কুকুরগুলো ঢাক বাজায়। ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। শিয়ালের ডাক তখন থেমে যায়। কিছুক্ষণ পর তারাও শুরু করে সপ্তমে।

শিয়াল-কুকুর মাঝেমধ্যে বিরতি দেয়। তখন শোনা যায় ঝিঁঝির কলরব। হঠাৎ পশ্চিমা বাতাস বইতে শুরু করলে উঠানের পশ্চিমের বাঁশঝাড়ের পাতা থিরথির করে কাঁপে। চাঁদের আলোয় পাতাগুলোকে আলোর নকশা বলে ভ্রম হয়। থোকা থোকা

জোনাকি ঢোলকলমি আর বিষকাটালির ঝাড়ে সেই আলোর নকশাকে একটা পটভূমি দেয়।

বাতাসে বাড়ির দক্ষিণের কলাপাতার বেড়াও কাঁপে। সেদিক থেকে শনশন শব্দ আসে।

সেই শব্দমালা ঢেকে যায়, যখন হামেদ গাড়িয়ালের বৃদ্ধ বাপ সগির কেশে ওঠে।

আঙিনার চারধারে চারটা ঘর। বাঁশের। খড়ে ছাওয়া। পশ্চিমে বাঁশঝাড়, পশ্চিমের রোদ আড়াল করে দাঁড়িয়ে থাকে। উত্তর দিকে দক্ষিণমুখী দুটো ঘর। একটা পুবমুখী, একটা পশ্চিমমুখী। দক্ষিণের দিকটা খোলা। উত্তরের দিকে একটা চালা, ওটা ওদের রান্নাঘর। বৃষ্টির দিনে সেখানে রান্না হয়। শুকনো দিনে রান্না হয় উঠানে, মাটির চুলায়।

ঘর চারটার একটায় থাকে সগির, তার বৃদ্ধ স্ত্রীকে নিয়ে। বাকি তিনটায় তাদের তিন ছেলে। আবেদ, ছাবের আর হামেদ।

আজ চাঁদ উঠেছে কাঁসার থালার মতো, গোল আর চকচকে। জোছনায় পুরো উঠোনের সবকিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ডালিমগাছের চিকন পাতাগুলোও স্পষ্ট। ওই ওদিকে গৃহপালিত বিড়ালের চোখজোড়া জ্বলছে।

আঙিনায় বাপ আর তিন ছেলে উপস্থিত। দুই ছেলের বউ একটু দূরে ঘরের বেড়া ধরে দাঁড়িয়ে। মাটিতে বসে আছে হামেদের মা।

সগির কাশে। কাশির দমকে তার চোখের কোণে পানি চলে এলে চাঁদের আলোয় দুই গণ্ডে দুটো ছোট চাঁদ রচিত হয়। কাশি থামিয়ে সগির বলে, 'বাহে, তোমরা তিনজনে সেয়ানা হইছেন। বড় দুই ভাই বিয়াও করছেন। খালি হামেদের বউয়ের মুখ দেখি যাবার পারমো বলি মনে হইতেছে না। কাল আইতে মুই খোয়াব দেখছোম। দেখনু বলে মোর ঘরের মধ্যে ওই আকাশের সমান একজন খাড়ায়া আছে। ধবধবা ফরসা। তাঁয় মোকে ডাকি কয়, চলো হামার সাথত চলো। মুই বুঝি ফেলাইছোম, মোর সময় শ্যাষ। এলা মোকে যাওয়া লাগবে।'

শুনে হামেদের মা ডুকরে কেঁদে ওঠে। বুড়ি না কানে কম শোনে? কই, এত দূর থেকেও তো সে ঠিকই শুনতে পেয়েছে তার স্বামী মৃত্যুর কথা পেড়েছে!

সগির আবার কাশে। তারপর বলে, 'তা তোমাক মুই শ্যাষ কথা কয়া যাঁও। এই ভিটাত তিনোভাই মিলিমিশি থাকবেন। আর মুই মোর গরুর গাড়িখান হামেদের হাতত তুলি দিবার চাঁও, কী কন তোমরা।'

ছেলেরা কেউ কিছু বলে না। বউ দুজন নিজেদের মধ্যে গুজুর গুজুর করে। তারপর বড় বউ বড় ছেলেকে ডাকে, 'ময়নার বাপ, শুনি যান ক্যানে?'

বড় ছেলে বউয়ের কাছে আসে। বউ তাকে একটা কিছু শিখিয়ে দেয়। ফিরে গিয়ে আবেদ বলে, 'ঠিকে কইছেন বাপজান, আপনে যা কইবেন তাকে হইবে। হামেদে গাড়ি চালাইবে। হামার তো কায়কারবার আছে। হামেদ গাড়ি চালেয়া যা আয়-ওজগার করবে, তাক থাকি হামাকে ভাগ দিবে। শরিকের হক অঁয় কি আর মারি খাইবে?'

সগিরের চোখ দুটো চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল দেখায়। সে বলে, 'হামেদ তুই কী কোস?'

হামেদ বলে, 'তোমরা মুরুব্বি মানুষ যাকে কইবেন তাকে হইবে।'

সগির বলে, 'আয় বাপ গরু দুখান তোর হাতত মুই তুলি দিয়া যাঁও।'

গরু দুটো বাথানে বাঁধা। তারা আরামে পোয়াল খাচ্ছে। পোয়াল কেটে দেওয়া হয়েছে। তাতে মেশানো হয়েছে খৈল।

পাশেই গরুর গাড়িটা ত্রিভুজের মতো করে পড়ে আছে।

সগির মাটি থেকে উঠে দাঁড়ায়। দাঁড়াতে তার কষ্ট হয়। হামেদ গিয়ে বাবাকে ধরে। বাবা তাকে ধরে ধীরে ধীরে গরু দুটোর কাছে যায়।

দুটো গরুর দড়ি ধরে হামেদের হাতে তুলে দেয় সে, বলে, 'তোর বাপ-দাদায় যে কাম করি খাইছে, সেই কামের ভার মুই তোর হাতত তুলি দিয়া যাইতোছোম, দেখিবুলি থুস। বাপ-দাদার দোয়া তোর ওপরে থাকবে।'

সগির চোখ মোছে। হামেদও। চাঁদের আলোয় তাদের চোখের নিচে অশ্রুর মুক্তা রচিত হয়। হামেদের মা কান্না চাপার চেষ্টা করে, কিন্তু তাতে তার গোঙানি আরও করুণ শোনায়।

হামেদ বলে, 'আল্লায় দিলে তোমরা আরও মেলা দিন বাঁচি থাকবেন। এলায় এলায় এত কথা কওয়ার দরকার কী?'

সে কাঁদে। অন্য ভাইয়েরাও চোখ মোছে।

সগির হামেদের গরুর গাড়ির পেন্টি তুলে দেয়, বলে, 'এই নে, গরুর গাড়ির পেন্টি, তুই মোর দড়ি বুঝি নিছিস, পেন্টি বুঝি নিছিস, মোর আর কোনো চিন্তা নাই। মুই এলা যাবার পারিম। নিশ্চিন্ত মনে চলি যাবার পারিম।'

সগির আস্তে আস্তে তার ঘরে যায়। বাঁশ দিয়ে বানানো খাটিয়ায় শয্যা গ্রহণ করে। ঘরের দরজার পাল্লার কাছে হারিকেনটা মৃদু মৃদু জ্বলে।

হামেদের মা হারিকেনের আলো কমিয়ে দেয়।

এই ঘটনার সাত দিন পর। ভোর হচ্ছে। হামেদের মা আর হামেদের বাপ সগির পাশাপাশি শুয়ে আছে তাদের ঘরে। কার্তিক মাস। শেষ রাতে ঠান্ডা পড়েছে। হামেদের মা কাঁথা টেনে সগিরের গায়ে দিতে যায়। সগিরের গায়ে হাত দিয়ে চমকে ওঠে। এত ঠান্ডা কেন শরীরটা?

জোরে ধাক্কা দিয়ে হামেদের মা টের পায় যে ছেলেদের বাবা আর নাই।

হামেদের মা বিলাপ করে ওঠে, 'আবেদের বাপ অ আবেদের বাপ... । অ আবেদ অ ছাবের অ হামেদ, আয় রে তোরা। আল্লাহ্‌রে...তোদের বাপ আর নাইরে...'

ভোরে ধানখেতের ওপরে কুয়াশা থমকে আছে। গোয়ালে গরুগুলোর চোখে পানি। সগির মারা গেছে। গাড়িয়ালবাড়িতে রোদন ওঠে। আবেদের বউ, সাবেরের বউ গলা ছেড়ে সুর তুলে বিলাপ শুরু করে। গোয়ালে বাঁধা গরুগুলোও সরবে অশ্রুপাত করতে থাকে।

গ্রামে এই খবর ছড়িয়ে পড়ে যে চ্যাম্পিয়ন গাড়িয়াল সগির মারা গেছে। মানুষজন এসে ভিড় করে তাদের উঠানে। কুকুরগুলো দল বেঁধে ঘাড় উঁচিয়ে এই ভিড় নিরীক্ষণ করে। গলায় ঘুঙুর দেওয়া ছাগলছানা ছুটে যায় খুলিতে। বিড়াল উঠে বসে ঘরের চালে।

লোকজন বলে, 'হায় হায়, আফসোস, বাহে, হামার গেরামের গর্ব সগির গাড়োয়ান হামাক ছাড়ি চলি গেল। আল্লাহ তাকে বেহেশত নসিব করুক। এলা হামার গেরামের কী হইবে? হামার গেরামত এই রকম গাড়ি কাঁয় চলাইবে? গরুর গাড়ির রেস হইলে হামার গেরামের নাম কাঁয় উজালা করবে?'

কথায় কথায় গ্রামবাসী জানতে পারে, সগির গাড়োয়ান যাওয়ার আগে বলে গেছে, এই দায়িত্ব তার ছোট ছেলে হামেদের। সে এখনো বিয়ে করেনি, সংসারের দুর্ভাবনা তার নাই, আর সে জোয়ান আছে, গরুর যত্ন করে, গাড়ির যত্ন করে। সগির তাই তার পেন্টি তুলে দিয়ে গেছে হামেদের ওপরেই।

গ্রামবাসী হামেদকেও দোয়া করে, আর বলে, 'দেখিশুনি চলবেন, বাপের নাম থোয়া লাগবে।'

২

ধান কাটা হয়ে গেছে বোয়ালবাড়ি গ্রামে। পড়ে আছে খেতের

পরে খেত। কাটা ধানের গোড়াগুলো খেতময় জেগে আছে কুয়াশা আর শিশিরে মাখামাখি হয়ে।

গরু জুড়িয়ে গাড়ি নিয়ে চলেছে হামেদ। আজ প্রথম সে একটা প্রতিযোগিতা করতে চলেছে। গরুগাড়ির রেস। আসার আগে সে গেছে বাঁশতলায়। বাবার কবরটা এখনো কাঁচাই বলতে হবে। শিয়রের খেজুরগাছের পাতাগুলো শুকিয়ে গেলেও অক্ষতই আছে। দূরে একটা বেজি গ্রীবা তুলে তাকায়। মাথার ওপরে ঘুঘু ডাকে। হামেদ বাবার কবর জিয়ারত করে। বলে, হে আল্লাহ, আমার বাপক জান্নাতবাসী করো। তারপর বলে, বাপ, মোর লাগি দোয়া করেন। মুই যাইতোছোম গাড়ি ধরি। আইজকা মোর পয়লা খেলা। আইজ য্যান মুই তোমার মান-সম্মান ধরি রাখিবার পারি।

বলতে বলতে হামেদের চোখ ভিজে আসে। তার গলায় বাষ্প জমে। বুকের কাছে চাপ অনুভূত হয়। তার মনে পড়ে, গরুর গাড়িতে সামনে বসার জন্য ছোটবেলায় সে বাবার সঙ্গে জেদ ধরত। সে গাড়ি চালাবে। দড়ি ধরে একবার ডানের গরুর পেটের কাছে তার ছোট ডান পা দিয়ে লাথি দেবে, একবার বাঁ পা দিয়ে বাঁয়ের টাকে। এই হ্যাট হ্যাট। চল, গুড়ড়ড়। গরুর লেজটা ধরে মুচড়ে দিলেই গরু ছুটবে। পিঠে একটা চাপড়। না, পেন্টি সে চালাবে না। গরুকে মারতে তার খুব খারাপ লাগে।

সেই সময় বাবা তাকে গরুর দড়ি ধরতে দিতেন, যদি রাস্তা কখনো খুব খাড়া, উঁচু আর সরু হতো। গাড়ি পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকত কোনো গাড়ায়। তখন হামেদ বসত সামনে। দড়ি ধরত, পেন্টি ধরত, আর বাবা তার গরুর গাড়ির সামনে গিয়ে আগাটা ধরত। এভাবে তারা পাড়ি দিত বিপজ্জনক সরু উঁচু রাস্তা।

বাবার কথা ভাবতেই তার চোখের পানি স্রোত হয়ে ঝরে যায়। বুকটা খানিক হালকা লাগে। হামেদ বাঁশঝাড় থেকে এসে মাকে কদমবুসি করে। 'এই বুড়ি, মুই যাইতোছোম গাড়ি ধরি, আইজকা খেলা। মোক দোয়া করেন।'

এই সময় ময়না ছুটে আসে। বছর পাঁচ বয়স। তার গায়ে একটা লাল জামা, পিঠের বোতাম ছিঁড়ে গেছে। জামা এক কাঁধ বেয়ে নিচে পড়ে যাচ্ছে। ময়নার দাঁত পড়ে গেছে একটা, সে কারণে তার হাসি আরও সুন্দর লাগে। ময়না বলে, চাচা, তোমরা নাকি খেলাত যান। তাইলে তো স্কুলের মাঠত মেলা বসিবে। মোকেও নিয়া যান।

হামেদ বলে, আইজকা তো মুই খেলিম। তখন তোমরা কার কাছে থাকিবেন। হারায়া যাইবেন। আইজকা না যান মাও। মুই তোমার লাগি মেলাত থাকি এলা মিঠাই আনমো।

মোর লাগিয়া একখান পুতুল আইনেন। লাল রঙের পুতুল।

আচ্ছা। আনিম এলা। তোমরা মোর লাগি দোয়া করেন য্যান মুই জিতি আইসবার পারোম। য্যান তোমার দাদার মুখ উজালা রাখিবার পারোম। য্যান বোয়ালমারির নাম ধরিয়া রাখিবার পারোম।

লালু আর ধলু—গরু দুটোকে গতকালই পুকুরের পানিতে গোসল করিয়ে রেখেছে হামেদ। তাদের গলায় কাগজের মালা। আর ঝুলছে দুটো ঘণ্টি। ঘণ্টির শব্দে গরু দুটো আরও জোরে ছুটবে।

কালীতলা উচ্চবিদ্যালয় মাঠে হচ্ছে প্রতিযোগিতা। মাঠের মধ্যখানে একটা বড় বাঁশ পুঁতে তার সঙ্গে সুতলি টানা দিয়ে লাল-নীল কাগজের ত্রিকোনা নিশান ঝোলানো হয়েছে। এ মাথা থেকে ও মাথা চুন দিয়ে ট্র্যাক বানানো হয়েছে। হেমন্তের সকালটা মাজা কাঁসার বাসনের মতো ঝকমক করছে। গাছের পাতায় পাতায় আলো।

মোট সাতটা গাড়ি অংশ নিচ্ছে রেসে। গরুগাড়ি উঠে যাচ্ছে এলাকা থেকে। তাই আগের মতো আর ভিড় হয় না, প্রতিযোগীর সংখ্যা বছর বছর কমছে। কিন্তু বেড়ে চলেছে দর্শকের ভিড়।

চারদিকে লোক গিজগিজ করে। মাইকে গান বাজছে, 'আমার গরুর গাড়িতে বউ সাজিয়ে...'

সাতটা গরুর গাড়ি পাশাপাশি লাইন করে দাঁড়ায়। মাইকে একজন ঘোষণা দিচ্ছে, 'শুরু হচ্ছে অত্র এলাকার ঐতিহ্যবাহী গরুগাড়ির দৌড় প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি কালীতলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জননেতা জনাব আজিজুর রহমান মণ্ডল। আজকের চ্যাম্পিয়ন পাবেন একটা সাদা-কালো টেলিভিশন। ভাইসব...ভাইসব... প্রতিযোগীদের রেডি হতে বলছি। ভলান্টিয়ার ভাইয়েরা, গাড়িগুলোকে লাইন ধরে দাঁড় করান। আমি রেডি, ওয়ান টু থ্রি বলার সাথে সাথে গাড়ি ছুটতে শুরু করবে। কেউ আগে গেলে তাকে ডিসকোয়ালিফায়েড করা হবে।'

হামেদের বুক ধুকপুক করে কাঁপে। এই গরুগাড়ি প্রতিযোগিতায় তার বাবা অংশ নিত। বাবা কখনো ফার্স্ট ছাড়া সেকেন্ড হয় নাই।

মাইকের দিকে কান সবার। যদিও চ্যাংড়াপ্যাংড়ারা চিল্লানো বন্ধ করে না। রেডি ওয়ান টু থ্রি...

হই হট হট...হামেদ গরুর পিঠে দুই হাতে চাপড় মারে, পেটে পা দিয়ে ধাক্কা দেয়। লেজ মুড়ে দেয় দুই হাতেই। লালু আর ধলু ছুটতে থাকে। কিন্তু সে তাকিয়ে দেখে বাকি ছটা গাড়িই তার আগে রওনা দিয়েছে। সবগুলোই তার চেয়ে এগিয়ে। পেন্টি দিয়ে বাড়ি দিলে তার দুই গরু ছুটতে শুরু করবে। কিন্তু সে গরুকে মারার পক্ষে নয়। ঘণ্টি বাজে। গরু দুটো যেন সেই আওয়াজে জোর পেয়ে যায়। হঠাৎই গতি বাড়িয়ে দেয় তারা। পেছন থেকে ক্রমাগত এগিয়ে সামনের দিকে যায় হামেদের গাড়ি। শেষ পর্যন্ত সবার আগেই হলুদ ফিতা স্পর্শ করে লালু আর ধলু। ফার্স্ট হয় সে।

ছেলেপুলেরা হামেদকে মাথায় করে নিয়ে বেড়ায়।

তারা স্লোগান ধরে : হা-মেদ হা-মেদ।

হামেদ খুশিতে চোখ মোছে। তারপর হুঁশ হয়। ময়না তার কাছে পুতুল চেয়েছে। সে বলে, ও ছোলপোল ছাড়ো তো বাহে তোমরা হামাকে, মুই একখান পুতুল কিনমো বাহে, মোক এলা ঘাড়ত থাকি নামান তো।

হামেদ পুতুল কিনতে যায়। পুতুল বিক্রেতা গর্বে ফুলে উঠে তাকে দাম কমিয়ে দেয়। এরপর সে জিলাপি কেনে। তারপর গরুগাড়ি চড়ে চলে আসে বাড়িতে।

ময়না গরুর ঘণ্টার শব্দ পেয়ে ছুটে আসে সবার আগে, চাচা, চাচা, আনছেন পুতুল।

পুতুল সে তো এনেছেই, এনেছে একটা টেলিভিশন। কিন্তু কী লাভ? তাদের বাড়িতে তো বিদ্যুৎ নাই। তবু বউঝিরা ভিড় করে টেলিভিশন দেখে। পুরো পাড়ায় সাড়া পড়ে গেছে। তারা টেলিভিশন নামের যন্ত্রটা দেখে। তাদের চোখেমুখে বিস্ময়। ওই খোসাছাড়া লিচুর মতো ঘোলা পর্দাটায় কেমন করে মানুষ আসে, কেমন করে বাস, ট্রাক, রিকশা, গাছপালা আসে।

ছাবের আসে। বলে, 'শাবাশ হামেদ। তুই বাপের নাম থুইছিস। হামরা খুব খুশি হইছি। টেলিভিশনটা কী করবু? বেচি দিবু? কত দাম হইবে। হামরা তিন ভাই সমান ভাগ করি নেমো টাকা। কী কস?'

হামেদ বলে, 'বেচমো না। ব্যাটারি কিনি আনমো। তোমরা দুই ভাই ব্যাটারি কিনি দিমেন। সবায় মিলি টেলিভিশন দেখা যাইবে।'

ছাবের বলে, এইটা কেমন কথা।

ছাবেরের বউ বলে, হ, কথা খারাপ কী। হামরা টেলিভিশন দেখমো। সিনেমা দেখমো। অয় ছোট মানুষ। অয় কষ্ট করি খেলিয়া টেলিভিশন জিতি আনচে। তোমরা বড় দুই ভাই একখান ব্যাটারি আনি দেন। তাইলে হামরা সগায় মিলি

দেখমো।

ছাবেরের বউয়ের নাম মিলি। মিলির বাচ্চাকাচ্চা নাই। তার আল্লাদ বেশি। তার কথা ফেলতে পারে না ছাবের। ওদিকে ময়নাও তার বাবাকে ধরে, বাপ, তোমরা ব্যাটারি কিনি আনেন। হামরা টেলিভিশন দেখমো।

অগত্যা বড় দুই ভাই আবেদ আর ছাবের মিলে গঞ্জে যায়। টেলিভিশনের মেকানিককে ধরে তাদের টেলিভিশনটা ব্যাটারি দিয়ে চালানোর ব্যবস্থা করে দিতে।

বাঁশের ডগায় অ্যানটেনা লাগানো হয়। কবুতর গিয়ে বসে সেই অ্যানটেনায়। নিচে ব্যাটারি দিয়ে চালু করা হয় টেলিভিশন। সাদা-কালো টেলিভিশনে কাঁপা কাঁপা ছবি আসে। শুক্রবার দুপুরের পর গাড়োয়ানবাড়িতে ভিড় লেগে যায়। এরা সবাই এসেছে টেলিভিশনে সিনেমা দেখতে। সিনেমা শুরু হয়। *কেয়ামত থেকে কেয়ামত*।

বোয়ালমারি গ্রামের ছেলেপুলে, বউঝিরা হাঁ করে সিনেমা দেখে।

তাদের কৌতূহল মেটে না। অতটুকুন একটা পর্দায় কী করে বাড়িঘর, গাছপালা ঢুকে যায়!

•

৩

সকালবেলা গাড়িয়ালবাড়ির উঠানে মুরগিগুলো চড়ছে। একটা ডেগি মুরগি বাচ্চা দিয়েছে, তাতে পাঁচটা হাঁসের ছানাও আছে। ময়না সেই মুরগির বাচ্চার পেছনে ছোটে। আবার হাঁসের বাচ্চাগুলো ময়নাকেই তার মা ভেবে পেছনে পেছনে আসে।

কবুতরগুলো বাড়ির চালে বসে। আমগাছের ডালে বসে। টেলিভিশনের অ্যানটেনাতেও বসে বাকবাকম ডাকে। বাঁশঝাড় থেকে আসে নানা পাখির ডাক।

সকাল সকাল লোক আসে হামেদ গাড়িয়ালের কাছে। 'বাহে গাড়িয়ালের বেটা বাড়িত আছেন নাকি? ও হামেদ, বাড়িত আছেন।'

হামেদ গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে বের হয়, 'কাঁয় ডাকেন? ও আবদাল ভাই? তোমরা? নিজে ক্যানে আসবার গেছেন, কাকো দিয়া খবর দিলেই তো পারলেন হয়! আইসেন আইসেন, টঙত আসিয়া বসেন। গরিব মানুষ কোনটে বা বসবার দেওঁ। চেয়ার তো আর নাই। টঙতেই বসেন। রোদত আরাম লাগিবে। যে ঠান্ডা পড়ছে বাহে।'

আবদালের গায়ে একটা জ্যাকেট, তার চিবুকের নিচে দাড়ি, মুখে রগ ফুলে আছে, দড়ি পাকানো চেহারা।

আবদাল বলে, 'বাহে একনা জরুরি কাম বুলি আসলোম। বাহে বরযাত্রী যামো শুকানপুকুর। হামেদ গাড়িয়ালের গাড়ি ছাড়া তো আর বরযাত্রী যাওয়া চলে না। তাই আসনো বাহে। তোমাক কিন্তু গাড়ি ধরি যাওয়ায় লাগবে।

হামেদ গায়ের চাদরটা টেনে নিয়ে বলে, 'তা বিয়াও কার? বর কাঁয়?'

আবদাল বলে, 'দ্যাখ তো পাগলার কথা, নিজের বিয়ার কথা মুই এলা তোকে নিজের মুখত কেমন করি কঁও? শরম লাগে না?'

হামেদ হাসে, 'হয় হয় আর কওয়া না লাগবে বুঝছোম বুঝছোম...'

আবদাল বলে, 'তা মোর বরযাত্রী হয়া তোমরা গাড়ি ধরি যাবার লাগছেন তো? ট্যাকাপাইসা যা লাগে মুই দেম। কিন্তু তোমার গাড়ি ধরি না গেলে মোর তো ইজ্জত থাকে না, বুঝিসই তো।'

হামেদ লজ্জামাখা হাসি ফুটিয়ে তোলে মুখে। বলে, 'হয় হয় তাক ফির না বোঝে কেমন? যামো যামো এলা।'

আবদাল বিদায় নেয়। হামেদ গাড়ির কাছে যায়। চাকার লোহার ঘেরে পানি দেয়। গরুগুলোকে পোয়াল কেটে দিতে হবে। কালীতলা স্কুলের রেসটার পরে তাদের বাড়িতে কেবল একটা ব্যাটারিচালিত টেলিভিশন এসেছে তা-ই নয়, তার কাছে গাড়িয়ালের কাজও আসছে। এটা ভালো লক্ষণ।

কী ছোট গাড়িয়াল, 'সকাল সকাল গরুর কামে লাগি পড়িলা? কাঁয় আসছিল? ক্যান আসছিল?'

'ওই পাড়ার আবদাল ভাইয়ে আসছিল ভাবি?' হামেদ ভাবির দিকে তাকিয়ে বলে।

ভাবির হাতে একটা কুলা, তিনি চুলার ছাই ফেলতে যাচ্ছেন বাঁশঝাড়ের দিকে। বলেন, 'ক্যানে আসছিল?'

'বিয়ার খ্যাপ মারার কথা বলবার আসছিল। অর বিয়াত মোর গাড়ি লাগিবে বরযাত্রী হওয়ার লাগিয়া।'

ভাবি তার নথটা নেড়ে হাসেন, 'খালি মানষের বিয়ার খ্যাপ মারিবা? নিজে বিয়াশাদি না করিবা বাহে।'

হামেদ লজ্জা পায়। বলে, 'মোর কি বিয়ার বয়স হইছে ভাবি। ক্যানে তোমরা মোক পর করি দিবার কন। মাও আছে। এক হাঁড়িত খাই। এইটা তোমার বুঝি সহ্য না হয়!'

ফজরের আজানের সময় হামেদ তার গরুগাড়ি নিয়ে হাজির হয় আবদালের বাড়িতে। লালু আর ধলুকে শীতের রাত কাটানোর জন্য চটের কোট বানিয়ে দিয়েছে সে। সেই দুটো সঙ্গে করে আনলে ভালো হতো। এখন আবদালের খুলিতে গাড়ি রেখে গরু দুটোকে চাকার সঙ্গে বেঁধে কুয়াশার মধ্যে কাঁপতে কাঁপতে হামেদ ভাবে। ভয়াবহ ঠান্ডা পড়েছে। কুয়াশায় বেশি দূর দেখাও যাচ্ছে না। গরু দুটোকে একটু গরম পানি, ভাতের মাড় খাওয়ানো যায় কী করে?

বিয়াবাড়িতে সাড়া-শব্দ কম। শুকানপুকুর মেলা দূর। রোদ ওঠার আগে রওনা না দিলে দিনে দিনে যাওয়া মুশকিল। আবার বিয়ের অনুষ্ঠান সেরে তাড়াতাড়ি রওনা না দিলে রাত হয়ে যাবে। পথে তালতলা এলাকাটা ভালো না। নতুন বউ নিয়ে তালতলাটা পেরিয়ে আসতে হবে রাত নামার আগেই। আবদালই সব শিখিয়ে-পড়িয়ে রেখেছে হামেদকে। এখন তারাই তৈরি না।

বাড়ির ভেতরে উঁকি দেয় হামেদ। কুয়াতলায় কুয়াশার ভেতরে একটা বেগুনি শাড়ি নড়তে দেখে। হামেদের বুকটা ধড়াস করে ওঠে। কে ওটা? আবদালের বোনটা নাকি? মেলা দিন আগে আবদালের বোন জরিনাকে দেখেছিল একবার। তখন সে নিতান্ত বালিকা। ক বছরেই কি কলাগাছের মতো লকলক করে বেড়ে উঠেছে?

কয়লা দিয়ে দাঁত মাজছিল মেয়েটা। কাছে গিয়ে হামেদ কাশি দেয়। বলে, 'কাঁয় ওকনা? মুই হামেদ গাড়িয়াল। বাহে, তোমার বিয়া বাড়িত সবায় নিন্দ যায় নাকি?'

'মুই জরিনা, ভাইজান।'

'ও জরিনা। তুই এত বড় হয়া গেছিস। কুয়াশাত দূর থাকি টেরই পাই নাই। মাশাল্লাহ, তোর চেহারা তো একেরে সেনেমার নায়িকা মৌসুমীর লাকান হয়া গেইছে।'

'মৌসুমী কাঁয়?'

'ওই যে টেলিভিশন সিনেমা দেখাইল। হামরা দেখনো সবায় মিলি। কেয়ামত থাকি কেয়ামত। তারে নায়িকা হইল গিয়া মৌসুমী। তুই দেখতে তো একেরে মৌসুমীর লাকান হয়া গেছিস বাহে মণ্ডলের বেটি।'

জরিনা লজ্জা পায়। মুখের কয়লার ফেনা কুলি করে ফেলে দিয়ে সে কুয়ার বালতি পানিতে নামায়, কুয়ার আড় কড়াৎ কড়াৎ শব্দ করে।

হামেদ বলে, 'জরিনা, একনা গরম পানি কর না।'

জরিনা বলে, 'ক্যানে, চা খাইমেন?'

'না রে, গরুগুলাক খাওয়ামো। যা হ্যাল (শীত) পড়ছে।'

'ও রে মানষির কথা শুনো। সকালবেলাত গরম পানি চায় গরুর লাগি।'



বাওকুমটা বাতাস যেমন ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরে

'মুই গাড়িয়াল। মোর তো গরুই আসল। বাস-ট্রাক যেমন ডিজেল খায়, মোর গরু তেমনি পানি খায়, ঘাস খায়, পোয়াল খায়।'

জরিনা বলে, 'বইসেন তো, ওই খানকা ঘরত যায়া বইসেন। মুই আনতেছোম।'

একটু পরে জরিনা একটা মগে করে চা নিয়ে আসে। বলে, 'আগে চা খায়া নিজে শরীল একনা গরম করেন। মুই গরুর পানিও গরমত দিছোম।'

সূর্য উঠছে। কুয়াশা কেটে রোদের রশ্মি এসে পড়ছে জরিনার মুখে। ওকে দেখা যাচ্ছে আকাশের পরির মতো। হামেদের মনটা যেন ফুটো হয়ে যাচ্ছে। ইস, মনটা কয়, ওই মুখটার দিকে খালি চায়া থাকোম। খালি চায়া থাকোম।

হামেদ মনে মনে চেয়েছিল জরিনাও বরযাত্রী যাক। কিন্তু এত দূরের পথ, আসতে রাত হবে, বিয়েবাড়ির কথা কিছু বলা যায় না, তাই পথে তারা নারীবর্জিতা। মেয়েমানুষ ছাড়াই তারা রওনা হয়। যাত্রারম্ভ করতে করতে রোদ বেশ চনমনে হয়ে ওঠে। কুয়াশা কেটে যায়। কেবল দূরে ঝোপঝাড়ের মাথায় কিছু কিছু কুয়াশা লটকে থাকে।

হামেদ গাড়িয়ালের গাড়ি। ওরা রঙিন কাগজের মালা দিয়ে ছইটাকে ঢেকে দিয়েছে। দেখতেও লাগে বেশ। হামেদ আর তার দুই ভাগ্নে বসেছে তাদের গাড়িতে। পেছনে আরও দুটো গরুগাড়িতে আরও কিছু আত্মীয়স্বজন। সাইকেলেও যাবে কিছু। তারা পরে রওনা হবে।

গাড়িতে গরু জুড়ে হামেদ বিসমিল্লাহ বলে রওনা দেয়। বারবার সে পেছন ফিরে তাকায়। জরিনা ঘরের বেড়া ধরে তাকিয়ে আছে। জরিনাকে ছেড়ে যেতে হামেদের মন সরে না।

দুপুর নাগাদ পৌঁছে যায় তারা। আবদালের শ্বশুরবাড়ি, শুকানপুকুর।

হামেদের গাড়ি সবার আগে। বাকি গাড়ি দুটো পেছনে পড়ে। সাইকেল-আরোহীরাও আগে এসে পৌঁছেছে। বিয়েবাড়ির সামনে গেট বানানো হয়েছে কলাগাছ দিয়ে। হুলুস্থুল ব্যাপার।

বিয়ে পড়ানো হয়।

খাওয়া সারতে সারতে বিকেল হয়ে আসে। পোলাও, গরুর মাংস আর বুটের ডালযোগে খাওয়া হয় বেশ ভালো। মুরুব্বিরা তাড়া দেয়। ওই রাস্তাঘাট ভালো না। রওনা দেও।

হামেদের জীবনের প্রথম বিয়ের খ্যাপ। এর আগে তার বাপ এই কাজ করত। এখানে সে প্রতিটা ঘটনায় আনন্দ পাচ্ছিল। গেট ধরা, বিয়ে পড়ানো, শা-নজর।

কিন্তু শেষ পর্বটা তার মনটাকে বিষণ্ন করে দেয়—কন্যাবিদায়।

আবদাল একটা পাঞ্জাবি আর পায়জামা পরা, মাথায় টুপি। বউয়ের মাথায় ইয়া বড় ঘোমটা। মুখ দেখার উপায় নাই। তারা দুজনে ধীরে ধীরে হামেদের গাড়ির দিকেই আসছে। বউঝিরা তাদের ঘিরে আছেন। শুধুই কান্নার রব। বিনবিনিয়ে কাঁদছে সবাই।

হামেদের মনটাও হু হু করে ওঠে। কতটা পথ তাদের বাড়ি। বোয়ালমারি কি এখানে-সেখানে? এত দূরে যাবে এই মেয়েটা? কেমন করে থাকবে অপরিচিত লোকদের সঙ্গে? বাবা-মাকে দেখতে ইচ্ছা করলে সে কী করবে?

আবদাল তার নববধূ আর দুই ভাগ্নে এসে ওঠে গাড়িতে। পেছনে টিনের ট্রাঙ্ক রাখা হয়। হামিদ গরু জোড়ে। তারপর গাড়িতে এক লাফে উঠে বলতে থাকে, 'হ্যাট হ্যাট।'

ভাগ্নে দুজনের নাম রকেট আর বুলেট। হামেদ বলে, বাবাজিরা, রকেট-বুলেট, তোমরা আসো, মোর সামনে বইসো, গাড়ি চালাও। আসো। রকেট আর বুলেটকে হামেদ ছইয়ের বাইরে সামনে এনে বসায়।

গাড়ি চলছে। ওদিকে কনেবাড়ির লোকেরা এখনো তাদের ঘরের কোনা ধরে, সুপুরিগাছ ধরে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে তাদের গরুগাড়ির দিকে। কান্নার আওয়াজ মিইয়ে আসছে।

ছইয়ের ভেতর থেকে বউয়ের চুড়ির আওয়াজের সঙ্গে বিনবিনিয়ে কান্নার করুণ সুর শোনা যায়।

তাদের পেছনের গাড়ি থেকে জয়নাল গায়েন গান ধরেছে। তার হাতে একটা দোতরাও আছে। সে গাইছে—

ধীরে বোলাও গাড়িরে গাড়িয়াল আস্তে বোলাও গাড়ি
আরেক নজর দেখিয়া লওঁ মুই দয়াল বাপের বাড়ি।

বাপো কান্দে ওই দেখা যায়
আশ পড়শি নিকাশ ফেলায়
বাচ্চা বইনক নিয়া কোলায়
মাও কান্দে ডুকুরি রে গাড়িয়াল
মাও কান্দে ডুকুরি।

গাড়ি আস্তেই চালাচ্ছে হামেদ। পেছনের গাড়িগুলো বেশি পিছে পড়লে মুশকিল। বিপদ-আপদ হতে পারে। সামনের সাইকেলগুলোও আস্তে চালাচ্ছে। একটু পরপর থামছে ওরা। সবাই মিলে একসঙ্গে চলতে হবে। রাস্তায় না আবার ডাকাত

পড়ে।

একসময় সব নিস্তব্ধ। শুধু গরুগাড়ির চাকার ক্যাঁচর ক্যাঁচর শব্দ।

তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আবদালের নাক ডাকার শব্দ আসে। আবদাল ছইয়ের নিচে তোশক-বিছানা পেয়ে আরাম করে ঘুম দিচ্ছে। নতুন বউ নিয়ে যাচ্ছে। সারা রাত জেগে থাকতে হবে। তারই প্রস্তুতি।

হঠাৎই ফের রোদনের শব্দ। হামেদ বোঝার চেষ্টা করে পেছনে না ঘুরে।

আবদালের বউ কাঁদছে।

হামেদ বলে, 'ভাবি না কান্দেন তো বাহে। এত ভালা ঘরত বিয়াও হইছে...। ওই বাড়িত যায়া দেখবেন নিজের বাড়ির লাকান সোগ (সব)। মন খারাপ না করিবেন।'

নতুন বউ চোখের জল মুছে হাসে।

ঘোমটা একটু সরিয়ে জিগ্যেস করে, 'গাড়িয়ালের নাম কী?'

'হামেদ।'

'ও হামেদ গাড়িয়াল। তোমার তো বাহে খুব নামডাক। তোমার গরু দুইটা নাকি জিনের দেওয়া।'

হামেদ বলে, 'আর কন না ভাবি। মানষে যে কত কথা বানাবার পারে।'

'যাক তোমার লাকান নামকরা গাড়িয়ালের গাড়িত চড়ছি, শুনিয়া মোর মনটা ভালো হয়া গেল।'

'শোনেন। তোমার যখনই বাপের বাড়ি আসার হাউশ হইবে, মোকে খবর দিমেন। মুই একেরে গরুগাড়ি ধরি উড়ি চলি আসমো। তোমাক গাড়িত তুলি মুই পঙ্খিরাজ ছুটি দেমো। তখন এই রকম আস্তে আস্তে না চালামো। দেইখেন দুই ঘণ্টাতে চলি আসমো।'

নতুন বউ কিছুটা আশ্বস্ত হয়। কল্পনায় দেখতে পায় সে ফিরে আসছে বাপের বাড়ি, নাইয়োর যাচ্ছে।

বরযাত্রী বাড়ি ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা পেরিয়ে যায়। শীতের দিনের বেলা। খুব ছোট।

গাড়ি নিয়ে আবদালদের খুলিতে রাখে হামেদ। জরিনার ভাবি হয় নববধূ। হারিকেন হাতে সে আসে। বউকে বরণ করে। আরও নারীরা আসে। শিশুরা আসে। ভিড় হয়।

আঙিনায় হ্যাজাকের আলো।

হামেদ জরিনার আলোরাঙা মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার শরীরটা বিবশ বিবশ লাগে।

৪

কয়েকটা দিন জরিনাকে ভুলেই থাকে হামেদ। কিন্তু মাসখানেক পরে ওই পথ দিয়ে গরুগাড়ি নিয়ে যেতে হয় তার। জরিনাদের বাড়ির পাশ দিয়েই রাস্তা। বাঁশঝাড়টার ভেতর দিয়ে গেলে রাস্তার ওপরেই জরিনাদের একটা ঘর। তার ওই পাশে খুলি। খুলিতে ধান শুকোতে দেওয়া হয়েছে। জরিনা তার একটা ভাস্তেকে নিয়ে ধান পাহারা দিচ্ছে।

একটা মাদুরে বাচ্চাটা রোদে বসে আছে। শীতের রোদ। আরামের রোদ। বাচ্চার সামনে কাঁসার বাটিতে মুড়ি।

হামেদ দূর থেকে দেখতে পায় জরিনাকে। জরিনা তখন বিছানো ধানে পা দিচ্ছিল।

হামেদের গরু দুটোর ঘণ্টা বাজে।

তাতেও কি জরিনা এই দিকপানে তাকাবে না?

হামেদ গাড়িয়াল গান ধরে—

বাওকুমটা বাতাস যেমন ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরে,
ওরে সেই মতো মোর গাড়ির চাকা পন্থে পন্থে ঘোরেরে,
ওকি গাড়িয়াল মুই চলোং রাজপন্থে।

হামেদ তার গাড়ি নিয়ে যায় জরিনাদের বাড়ির পাশ দিয়ে। তাকিয়ে থাকে জরিনা। বাড়ির বেড়া ধরে দাঁড়িয়ে নিজের বুকের ধুকপুকুনি নিজেই শুনতে পায়।

এদিকে বাচ্চা ছেলেটার মুড়ির বাটি উল্টে যায়। একটা দুটা মুরগি বাচ্চার ভয়ে ভীত না হয়ে কাছে চলে এলে বাচ্চা কেঁদে ওঠে। তার নাকে সর্দি। সে মাটি থেকে মুড়ির বদলে মাটি তুলে মুখে দেয়। আর কাঁদে।

কান্না শুনে বাচ্চাটার মা জরিনার বড় ভাবি আসে, 'জরিনা, এ জরিনা, তুই কোটে গেলুরে। হায় হায় রে ছাওয়াক মোর একলা ফেলি থুয়া জরিনা গেছে কোটে।'

'এ জরিনা, জরিনা।'

ভাবি বেড়ার কাছে আসে। দেখেন ননদ তার বেড়া ধরে দাঁড়িয়ে আছে, তাকিয়ে আছে দূরের গাড়ির দিকে।

ভাবি হাসে, নথ নেড়ে বলে, 'আব্বাজানক কওয়া লাগবে ননদিনীর বিয়াও দেওয়া খায়। হায় হায় রে কাম ফেলি ননদিনী মোর গাড়ির দিকে তাকেয়া আছে।'

জরিনা বলে, 'তোমাকে কইছে। মুই বলে খুঁজবার লাগছোঁ গাইয়ের বাছুরটা কোটে গেইছে।'

এমন সময় বেরসিক বাছুর খুলিতে ডেকে ওঠে। বাছুরটা বেশ করে বাঁধাই আছে।

ভাবি বলে, 'বাছুরটাও তোর কথা শুনি হাসি উঠলে। বাছুর বান্দা খুলিতে, আর হামার সেয়ানা ননদিনী তাকে খোঁজে আস্তাতে, ঘাটাতে।'

জরিনা স্বীকার করে, 'ঠিকে কইছেন ভাবি, মোর ক্যান জানি সোগে উল্টাপাল্টা হয়া যাবার লাগছে।'

হামেদকে ডাক দেয় ভাবি, 'ও গাড়িয়াল, গাড়ি ধরি কোটে যাইস রে।'

হামেদ বলে, 'কাঁয় ডাকে? ভাবি না? তা ভাবি মজিদ ব্যাপাররি আড়ত বুলি বারাইছঁ। তাংকু ধরি হাটত যামো। ও ভাবি একনা পান খিলাও ক্যানে?'

ভাবি বলে, 'পান খাবু। আয় গাড়িখান এটে কোনা খাড়া করি একনা জিরা ক্যানে? মুই পান ধরি আসোম বাড়ির ভিতর থাকি।'

হামেদ বলে, 'ভাবি, তোমরা আর ক্যানে কষ্ট করিবেন? ননদিনী তোমার চেংড়ি মানুষ। তোমার ননদিনীকে কও কেনে? এক দৌড়ে পান সাজেয়া ধরি আসুক।'

ভাবি বলে, 'কথা তো ভালোই শিখছিস। ও জরিনা, জরিনা?'

জরিনা হাঁক পাড়ে, 'কী?'

'হামেদের লাগি একখান পান ধরি আয় ক্যানে?'

জরিনা আসে, বলে, 'ভাবি, ও ভাবি, ঘরত পান আছে, গুয়া তো নাই। এলা কী করোম?'

ভাবি বলে, 'তুই খালি পানে ধরি আয় ক্যানে? তোর হাতের পান, খালি পানে অর মজা লাগবে।'

জরিনা হাসে, 'তোমার যে আরো কথা, মোর ন্যাড়া মাথা!'

হামেদ বলে, 'হয় ভাবি, তোমরা ঠিকে কইছেন, তোমার ননদিনীর যে সোন্দর চেহারা, একবারে মৌসুমীর লাকান, অর হাতের পান, মজা লাগিবেই।'

ভাবি হাসে, বলে, 'যা জরিনা, পান ধরি আয়। দেখিস ফির কাঁঠাল পাতা ধরি আসিস না।'

জরিনা গা মোচড়ায়, 'যাও তোমরা যে কী কন না?' তারপর দ্রুত বাড়ির ভেতরে ঢুকে যায়।

হামেদ গাড়ি থেকে নামে, গাড়িতে গরু জোড়ানোই থাকে। 'ভাবি, ভাইজান কোটে গেইছে?'

'কামও গেছে।'

'আবদাল ভাই, তাই কোটে গেছে?'

'তাইও কামত গেছে।'

'নয়া ভাবি হামার কেমন আছে?'

'খালি নয়া ভাবির খোঁজ করেন। মুই কি পুরানা হয়া গেইছ?'

'আরে কী কন ভাবি। তোমার সাথত কারও তুলনা?'

'তোমার মাও বুড়ি কেমন আছে?'

'আছে ভাবি। বুড়ি হইছে না। তা তোমার ছাওয়া কোনা কত বড় হইলে।'

'আল্লায় দিলে তো হইছে তিন বছর ১ মাস ফির ১৫ দিন।'

জরিনা আসে পান সাজিয়ে নিয়ে, বলে, 'ন্যাও ভাবি। তোমার সাধের দেওরাকে দ্যাও ক্যানে?'

ভাবি বলে, 'তুই দিবার পারিস না। ফুটানি দেখাস ক্যানে?'

জরিনা পান এগিয়ে দেয়। হামেদ বলে, 'আহারে মিঠা হাতির মিঠা পান। পানটা মুখে পুরে সে আরাম করে চিবোয়।'

জরিনা তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

'ওরে বাপরে একি পান রে। মুখ তো পুড়ি গেল রে।' হামেদ চিৎকার করে ওঠে।

ভাবি আর্তস্বরে বলে, 'এ জরিনা, তুই কী করছিস?'

জরিনা বলে, 'গুয়া নাই বুলি বেশি করি চুন দিছি। তারে বাদে...'

হামেদ চুনের জ্বালায় থুথু করে, লাফায়, রোদন করে, 'আহারে মিঠা হাতের মিঠা পানরে, মোর মুখ পুড়ি গেলোরে। মোর গান গেল পান গেল জিভাও গেল রে। মুই মরি যাও রে...'

জরিনা বুঝতে পারে, কাজটা সে ঠিক করে নাই। সে বিলাপ করে, 'ও আল্লাহরে, মানুষটা বুঝি মরি যায়, এলা মুই কী করোম। মুই তো বোঝোম নাই...হায় আল্লাহ মোকে বাঁচাও রে।'

ভাবি বলে, 'যা হারামজাদি তাড়াতাড়ি পানি ধরি আয়...। মানষের ছাওয়াকে মারি না ফালান বাহে...।'

জরিনা দৌড় ধরে।

হামেদ করুণ গলায় বলে, 'তাড়াতাড়ি পানি আনেন বাহে, তাড়াতাড়ি আনেন। মুখত আগুন লাগছে...মুখ আংরা হয়া গেল...।'

জরিনা পানি আনে কাঁসার বদনায় করে।

ভাবি বলে, 'কুলি কর কুলি কর।'

জরিনা পানি এগিয়ে দেয়। হামেদ কুলি করে। সে জরিনার হাত ধরে। ঘন হয়।

হামেদ কুলি করতে করতে বলে, 'তোমার মিঠা হাতত এত ঝাল ক্যানে?'

জরিনা বলে, 'বুঝিশুনি হাত ধরেন, বুঝছেন।'

'হয়, বুঝছোম, বোঝোম নাই ফির।' হামেদ কুলি করা সেরে বলে। এতক্ষণে মুখের জ্বালা খানিক কমেছে।

সন্ধ্যাবেলা। হামেদ গরুগাড়ি নিয়ে চলেছে। আরও দুটো গরুগাড়ি নিয়ে চলেছে আরও দুজন গাড়িয়াল। তাদের সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে চলেছে ফজর আলী ব্যাপারী। গায়ে লম্বা পাঞ্জাবি, পরনে লুঙ্গি। মাথায় টুপি।

ফজর আলি বলে, 'এ হামেদ, তোর সাথে নাকি জিন আছে বাহে, কথা ঠিক নাকি রে?'

হামেদ বলে, 'কাঁয় কয় বাহে আজাইরা কথা।'

ফজর আলি বলে, 'গাড়ি যদি গাড়াত পড়ে, গরু যদিল শুতি পড়ে, কাঁয়ো তুলবার না পারে, সখন তুই যদি হাত লাগাস, গাড়ি নাকি গড়গড়ায়া দৌড়ায়? হয় বাহে কথা কি ঠিক?'

হামেদ হাসে, 'সোগ মানষের বানান কথা। গুল বাহে, গুল।'

সামনের গাড়িয়াল ডাকে, 'ও ব্যাপারী, একনা সামনত আইসেন বাহে। একলা একলা কি যাওয়া যায়?'

ফজর আলি সামনে যায়। হামেদ নিজের গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখে পেশাব করতে নামে।

সামনের গাড়িয়াল ফজর আলিকে বলে, 'সামনের বটগাছতলাটা ভালো না বাহে। একলা একলা ভয় লাগে। তোমরা একনা বিড়ি ধরান।'

ফজর আলি পাঞ্জাবির পকেট হাতড়ে বিড়ির প্যাকেট বের করে। দেশলাই বের করে। বিড়ি ধরায়।

গাড়িয়াল ভয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় গান ধরে।

বটগাছের আগে একটা নিচু জায়গায় গাড়ির চাকা আটকে যায়। সামনের গাড়িয়াল গরুকে পেন্টি দিয়ে মারধর করে। কিন্তু গাড়ি ওঠে না।

ফজর আলী ব্যাপারীও গাড়ি চাকায় হাত লাগায়। গাড়িয়াল ঘাড় লাগায়। গাড়ি ওঠে না।

মেরে মেরে গাড়িয়াল গরুর পিঠের বারোটা বাজায়। পিঠে চাকা চাকা দাগ হয়ে যায়। চাঁদের আলোয় সে দাগগুলোকে দেখায় সাপের মতো।

এর মধ্যে ফিরে আসে হামেদ। নিজের গাড়িতে উঠে বসে। সামনে গাড়ি আটকে আছে। সে বলে, 'বাহে কী হইলে বাহে।'

ফজর আলী ছুটে আসে, বলে, 'হামেদ মিয়া, তুই একনা চল বাহে। হাত লাগা। গাড়ি তো ওঠে না।'

'চলেন।'

হামেদ এগিয়ে যায়। গরুর পিঠের দাগগুলো দেখে সে চমকে ওঠে। সে ফজর আলীর কাছ থেকে দেশলাই নিয়ে কাঠি জ্বালায়। গরুর পিঠের দাগ ভালোভাবে নিরীক্ষণ করে।

হামেদ বলে, 'বাহে তোমরা মানুষ না আর কিছু। গরুক কাঁয়ো এমন করি মারে। গরুর গাত হাত দেওয়া লাগে আদর করি। দেখেন তো দেখেন।'

হামেদ হাত লাগায়। অমনি গরু উঠে দাঁড়ায়। গাড়িও গড়গড়িয়ে চলতে থাকে। গাড়িয়াল আর ফজর আলী বুকে থুতু দেয়। কলেমা পড়ে।

খারাপ জায়গাটা পেরিয়ে যায় তারা। ওইখানে একটা ঝাঁকড়া তেঁতুলগাছ ছিল। সবাই জানে, তেঁতুলগাছটা ভালো না। একটা চেংড়ি একবার ওই তেঁতুলগাছে লটকে ছিল।

জায়গাটা পেরিয়ে ফজর আলী ব্যাপারীর বহর চড়কতলা হাটে এসে পৌঁছায়। এখনো জেলেরা, সবজি বিক্রেতারা ল্যাম্প জ্বেলে লাইন ধরে বসে আছে। দূর থেকেও হাটের কলরব শোনা যায়। তিনটা মনিহারি দোকান। সাইকেলের মেকানিকের দোকান। মুচির দোকান, কামারের দোকান। ধানচালের বেচাবিক্রি ওই মাঠের ধারে। সেখানে গরুর গাড়ি অনেকগুলো। বড় বড় বস্তা।

হাটে গিয়ে তাদের ধড়ে জান ফিরে আসে। ফজর আলী অপর গাড়িয়ালকে বলে, হামেদের সাথে আসলেই জিন আছে।

৫

জরিনার দিনরাত্রিগুলো কেমন যেন উদাসীন হয়ে আছে। শীত চলে গেছে। বসন্ত বাতাস বইছে। পাথারের মধ্যে ঘূর্ণিবাতাস চরকির মতো ঘোরে। ঝরে পড়া পাতা ওড়ে। কালাইয়ের খেতের ধারে দুটো ছাগলছানা দৌড় ধরে। প্রজাপতি ওড়ে। জরিনা সেই প্রজাপতি ধরতে চায়। ছাগলছানাকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করে।

আহারে, হামেদ গাড়িয়ালের কত নামডাক। আর অমন একটা মানুষের মুখ সে কিনা চুন দিয়ে পুড়িয়ে দিল। তার মতো পোড়ামুখী মেয়ে কি আর আছে এই তল্লাটে?

দুপুরবেলা। চুলায় হাঁড়ি। ভাতের বলক উঠছে। গরম

ভাতের গন্ধে আঙিনা ম-ম করছে। মাথার ওপরে আমগাছে মুকুল এসেছে। বাতাসে মুকুল ঝরে পড়ছে জরিনার মাথায়। কী যে পাগল-করা গন্ধ এই মুকুলের!

জরিনা কাজ করে। তার মনের ভেতরটাও হাঁড়ির ভাতের মতো ফোটে। দুই ভাবি আছে আশপাশে। এক ভাবি ঘর লেপে। আরেক ভাবি কুয়াতলায় কাপড় কাচে। হঠাৎ রাস্তায় গরুগাড়ির চাকার আওয়াজ ওঠে। জরিনা চুলা ফেলে ছোটে বেড়ার ধারে।

বড় ভাবি কুয়ার পাড় থেকে চিৎকার করে, 'এ জরিনা, চুলাত তো ভাত পুড়ি যায়। তুই ওটে কোনা আস্তাত কী দেখিস?'

রাস্তায় গরুগাড়ি দেখা যায়। তবে এটা হামেদ গাড়িয়ালের গাড়ি নয়। জরিনা হতাশ হয়।

বিকেলবেলা। জরিনা কুয়াতলায় থালাবাসন মাজে। থালাবাসন ধুতে ধুতেই তার কানে আসে গরুগাড়ির চাকার শব্দ। সে দৌড়ে বাইরে আসে।

তিনটা গরুগাড়ি নিয়ে ফজর আলী ব্যাপারী যায়। গরুগাড়িগুলোর পেছনটা দেখা যায়। একটা গাড়ি কি হামেদ গাড়িয়ালের। জরিনা বুঝতে পারে না। আহা, কুয়াতলা থেকে সে আগে এল না কেন।

সে ট্রানজিস্টরটা হাতে নেয়। বারান্দায় বসে। তিস্তাপাড়ের গানের অনুষ্ঠান হবে এখন রংপুর রেডিওতে। ঘরঘর আওয়াজ হয়। শ্রোতাবন্ধুরা এখন শুরু হচ্ছে ভাওয়াইয়া গানের অনুষ্ঠান তিস্তাপাড়ের গান।

গান শুরু হয়। ফেরদৌসী রহমানের কণ্ঠে 'ওকি গাড়িয়াল ভাই' গানটাও বেজে ওঠে।

ওকি গাড়িয়াল ভাই
কত রব আমি পন্থের দিকে চাইয়া রে।

যেদিন গাড়িয়াল উজান যায়
নারীর মন মোর ছুঁইয়া রয় রে...

ওকি গাড়িয়াল ভাই,
হাঁকাও গাড়ি তুই চিলমারির বন্দরেরে

আরকি কব দুঙ্কেরও জ্বালা, গাড়িয়াল ভাই
গাঁথিয়াছি কনমালা রে।

ওকি গাড়িয়াল ভাই...
কত কান্দিম মুই নিধুয়া পাথারে রে

ওকি গাড়িয়াল ভাই
কত রব আমি পন্থের দিকে চাইয়া রে
ওকি গাড়িয়াল ভাই
হাঁকাও গাড়ি তুই চিলমারির বন্দরে রে।

হামেদ গাড়িয়ালের মনটাও টানে। পরের দিন ব্যাপারীর আড়তের দিকে খালি গাড়ি নিয়ে যাওয়ার পথেই সে গাড়ি নিয়ে যায় জরিনাদের বাড়ির পাশ দিয়ে।

গরুর গলায় ঘণ্টা বাজে। সেও চিৎকার করে বলে, এই হুট হুট হ্যাট হ্যাট।

সকাল দশটা হবে। জরিনা দৌড়ে বাইরে আসে। তার পায়ে পায়ে সকালের লম্বা ছায়া।

জরিনা হাঁক পাড়ে, 'ও গাড়িয়াল, চলি যান কেনে? আইসেন।'

হামেদ গাড়ি দাঁড় করায় খুলির ধারে। গাড়ি থেকে নেমে বলে, 'বলে, ভাবি কোনটে?'

জরিনা বলে, 'তাঁই তো এলা আসবার পারিবার নোয়ায়। তার মেলা কাম।'

'তাইলে মুই যাঁও।'

'কতদিন পরে আসনেন। চলি যাইবেন। মুই বলে...ঘাটার দিকে তাকায়া থাকতে থাকতে...'

'না বাহে মুই যাওঁ।'

'ও বাহে গাড়িয়াল, গোস্বা করছেন নাকি।'

হামেদ তো গোস্বা করতেই পারে। জরিনা তার মুখ পুড়িয়ে দিয়েছে চুন দিয়ে। গোস্বা করেছে এমন ভাব করে সে এগোয়।

জরিনা বলে, 'গোস্বা না করেন বাহে। আইসেন হামার খুলিতে আসেন। একখান পান এলা বানি খিলামো।'

হামেদ হতাশ কণ্ঠে বলে, 'আরো পান। সেদিন এমন পান খিলাইলেন, মোর মুখ পুড়ি একেরে আংরা হয়া গেইছে।'

'আহা রে।'

'আর মুই কোনো দিন গান না করিবার পারমো, মুখখান মোর গেইচে। কোন দিন যে মোর মুখখান ভালো হইবে, কাঁয় জানে।'

'আইসেন বাহে আজকা ভালা করি খিলি পান সাজে দেমো। চুন না দেমো। তোমরা দেখি খাইবেন।'

'জিভাত মোর ঘাও। পান তো মুই চাবে খাবার না পারমো।'

জরিনা হামেদের হাত ধরে টানে, 'আরে চলেন ক্যানে।'

হামেদ বলে, 'গোটা পান মুই চাবাবার না পারমো।'

'তাইলে মুই এলা তোমাকে পান হামান দিস্তাত পিষি দেমো।'

'সেটা একখান ভালো কথা কইছেন। কিন্তুক মুই কঁও বলে এককাম করেন। তোমার সোনা মুখ দিয়া যদিল পান চাবায়া দেন তাইলে মুই খাইম। দিমেন?'

জরিনা নীরব হয়ে থাকে।

'কী, কথা কন না ক্যানে? যাঁও তাইলে মোর ঘাটাত মুই যাওঁ।'

জরিনা বলে, 'চলেন হামার সাথত চলেন। খুলিত যায়া এলা বসেন।'

তারা খুলিতে যায়।

জরিনা একটা টুল এগিয়ে দেয়। বলে, 'বইসেন। ভাবি, ও ভাবি, দেখো ক্যানে কাঁয় আসছে।' বাড়ির ভেতরে যেতে যেতে সে হাঁক পাড়ে, 'তোমার রসিয়া দেওরা।'

বড় ভাবি এগিয়ে আসে, 'তাই নাকি। তাইলে মোর মুখপোড়া দেওরা আসলেন।'

হামেদ বলে, 'হয় ভাবি। মুখখান তো মোর গেইছে।'

বাড়ির ভেতরে বাচ্চা কেঁদে ওঠে। ভাবি বলে, 'ও জরিনা কোটে গেলু, আয় ক্যানে, মোর তো ছাওয়াকোনা কান্দবার লাগছে।'

জরিনা আসে পেষা পান নিয়ে।

ভাবি বলে, 'তোর হাতত কী রে?'

জরিনা বলে, 'পেষা পান। হামানদিস্তাত পিষিয়া আনলোম।'

ভাবি হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে, 'হায় হায় রে মুখপোড়া দেওরা মোর বুড়া হয়া গেইছে।'

ভেতরে তার ছেলে আরও চিৎকার করে উঠতে থাকলে সে চলে যায়।

জরিনা হামেদের কাছে আসে, বলে, 'ধরেন। খান।'

'হামান দিস্তাত পেষা পান। না, এ পান মুই না খাওঁ।

'আরে খান তো।'

'তোমার সোনামুখের পান হইলে খাইলাম হয়।'

'আইজ পর্যন্ত কাকো দেখছেন, মুখত পান পিষিয়া খিলায়।'

'দেখছোম না? ঠিকে দেখছি। মোর দাদি ওমার মুখের পান বার করি মোক কত খিলাইছে।'

'মুই কি তোমার দাদি হওঁ?'

'তাইলে কী হন, কন ক্যানে?'



জরিনা কেঁদে ফেলে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলে, 'ধরেন। তোমার ফুল তোমরা ধরি যান।...'

'জানোম না। অত কথা কি আর মুই কবার পারোম। নেন তো, পান কোনা খান।'

'কইছোঁ তো বলে তোমার মুখের পান ছাড়া না খাইম।'

'আরে খান তো।'

'হামেদ আশান্বিত হয়, তার বুক কাঁপে, সে বলে, কী? চাবেয়া আনছেন?'

জরিনা পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে মাটি খুঁটতে খুঁটতে বলে, 'এত কথা তো মুই পুরুষ মানষেক না কবার পারিম বাহে।'

হামেদ ভালো করে তাকিয়ে দেখে, জরিনার মুখে পানের দাগ। সে হাত বাড়ায়, 'আচ্ছা দ্যাও তাইলে।'

পেষা পান জরিনার হাত থেকে নিয়ে হামেদ মুখে দেয়। চিবায়, পিক ফেলে আর বলে, 'বড় মজাক। বড় মজাক।'

জরিনার পেটের ভেতর গুড়গুড় করে। সে হামেদের পান খাওয়া দেখে। শেষে বলে, গুয়া একনা কম হইছে না। ঘরত গুয়া নাই। গাছত পাক পাকা গুয়া। কাঁক এলা কই বলে উঠি পাড়ি দেও।'

হামেদ গানের সুরে গেয়ে ওঠে, 'বাপ মুই চ্যাংড়া রে, গাছত উঠিয়া দুই খান হা ও মোক জলপুই পাড়িয়া দে।'

জরিনা বলে, 'আহারে মুই যদিল গান পারিনো হয় ঠিকে তোমাকে এই কথাই কনু হয়। খালি জলপাইয়ের বদলে কওয়া লাগিল হয় বলে গুয়া পাড়ি দে।'

'সত্য করি কইতোছেন। গুয়া গাছত উঠিম।'

'গুয়া তো পাড়া লাগে, কিন্তুক তোমাকে কেমন করি কওঁ।

'ও বুঝছি, মোকে আর কওয়া না লাগিবে। কোন গাছত ওঠা লাগবে, কন তো দেখি।'

জরিনা তাকে গাছ দেখিয়ে দেয়। হামেদ পায়ে দড়ি বেঁধে উঠে পড়ে। তর তর করে সে গাছ বায়।

গাছের চূড়ায় উঠে সে সুপারি পাড়ে। নিচে ফেলে দেয় সুপারিগুচ্ছ।

জরিনা ওপরে তাকিয়ে দেখে। কী চমৎকার দুটো খালি পা। হাঁটু, উরু। সুপারিগাছের ঢালের মতো। তার বুকের কাঁপন বাড়ে।

হামেদ নামার সময় ইচ্ছা করে পড়ে যাওয়ার ভান করে। হাতটা ছেড়ে দিয়ে নিচের নরম কাদামাটিতে সে ধপাস করে পড়ে যায়। পড়ে গিয়ে চিত হয়ে থাকে নিঃশব্দে।

জরিনা ভয় পায়, আর্তনাদ করে ওঠে, 'ওরে আল্লাহরে বাঁচাও রে। মরি গেল নাকি লোকটা?'

সে হামেদের কাছে গিয়ে তার শ্বাসপ্রশ্বাস নিরীক্ষণ করে। দেখে, না, বেঁচে আছে, 'চোট পাইছেন?'

হামেদ বলে, 'হয়।'

জরিনা দুঃখিত কণ্ঠে বলে, 'কোটে?'

হামেদ প্রথমে দেখায় হাত, তারপর পাঁজর, শেষে দেখায় বুক, 'এই যে, এটে।'

জরিনা সত্যিকার মায়া দেখিয়ে হামেদের বুকে হাত দেয়। হামেদ তার হাত বুকে চেপে ধরে। তারপর মাথা টানার চেষ্টা করলে জরিনা বলে, 'ওরে বজ্জাত।'

জরিনা উঠে পালায়।

হামেদ হো হো হো করে হাসে, 'মোক তোমরা সেদিন কেমন ঠক খিলাইছেন। আজকা মুই তোমাকে কেমন ঠক খাওয়ানু।'

৬

আবদালের বউ সোনিয়া স্বামীকে বলে, 'শোনেন। কত দিন শুকানপুকুর যাওঁ না। বুড়া বাপ-মাও মোর একলা একলা থাকে। বেটা বেটার বউ কেমন থুইছে কাঁয় জানে? ভাই ভাবিগুলানকও তো দেখবার ইচ্ছা করে। ছয় মাস হয়া গেছে তামাক না দেখিয়া অন্তরটা মোর কান্দে।'

আবদাল বলে, 'তা তোমাকে যদিল ওমরা নায়োর ধরি না যায়, তোমরা ক্যামন করি যাইবেন।'

সোনিয়া বলে, 'হামেদ গাড়িয়াল উদিনকা শুকানপুকুর থাকি ঘুরি আসছে। কইলে বলে মাও কইছে মোকে যাবার। এখন ভাইয়েরা নেজের সংসার ধরি ব্যস্ত, তামরা সময় পায় না। মাকে দেখিবার যামো, তাক ফির দাওয়াত দিয়া নিয়া যাওয়া লাগিবে নাকি?'

'তাও তো কথা।'

'তাইলে তোমরা মোকে যাবার দেন।'

'মুই তো কারবার ধরি ব্যস্ত। তোমাক নিয়া যাবার সময় পাবার নও।'

'তাইলে মুই হামেদ গাড়িয়ালক ধরি যামো।'

'আচ্ছা। তাইলে সাথত জরিনাকে ধরি যাও।'

'হয়। এইটা একখান ভালো বুদ্ধি হইছে।'

তারা বসে আছে বারান্দায়। মাদুর বিছিয়ে আবদাল ভাত খায়। তাকে তুলে তুলে খাওয়ায় সোনিয়া। পাশে বিড়াল লোভী চোখে তাকিয়ে থাকে। আঙিনায় মুরগি চড়ে। সোনিয়া স্বামীকে কাঁসার গেলাসে পানি ঢেলে দেয়। ভাত খেয়ে আবদাল থালায় পানি ঢেলে হাত ধোয়।

সোনিয়া জরিনাকে ডাকে, 'এ জরিনা, হাটেক বাহে মোর সাথে শুকানপুকুর যাই। মুই একলা একলা এতকোনা পথ না যাবার পারিম।'

জরিনা বলে, 'ক্যানে ভাবি, ভাইজান যাবার নয়?'

সোনিয়া বলে, 'না বাহে, ওমরা তো টাইমে না পায়!'

জরিনা বলে, 'না ভাবি মুই না যাইম। আগ বাড়েয়া গেলে লোকে মোক খারাপ কইবে।'

'আরে চল ক্যানে? হামেদ গাড়িয়ালের গাড়িতে যামো।'

'ঠিক কইতোছেন তোমরা? না কি মোর সাথত কুয়ারা করতাছেন।'

'নাইলে মুই কি হাঁটি হাঁটি যামো। গাড়িত গেলে তো হামেদ গাড়িয়ালের গাড়িতে যাওয়া খায়। হামেদের কত নামডাক। ওমার মতোন গাড়িয়াল আর দুইটা আছে?'

'তা নাই।'

'তাইলে?'

'তাইলে মুইও যাওঁ তোমার সাথত শুকানপুকুর।'

'হামেদ ঔষধে ক্যামন কাজ হয় দেখছেন? হিহিহি।'

'এগলা কইলে কিন্তুক মুই না যাইম!'

'আচ্ছা বাবা আচ্ছা মুই না কঁও কিছু।'

হামেদকে আবদাল বলে রেখেছিল, তার বউকে নাইওর নিয়ে যেতে। কিন্তু ভাবির সঙ্গে যে ভাবির ননদও যাবে, এই ধারণা তার ছিল না। কিন্তু জরিনা তো জানে, সে যাবে ভাবির সঙ্গে, ভাবির বাপের বাড়ি। যাবে সে হামেদ গাড়িয়ালের গাড়ি চড়ে। ভাবতেই তার সমস্ত দেহমন কেমন যেন ঝিমঝিম করে। কবে আসবে সেই দিন। সে খালি দিন গোনে। সারা রাস্তা তারা কী গল্প করবে? জরিনা কিন্তু ছইয়ের সামনের দিকে বসবে।

দিন বহে যায়। তুমি চাও কি বা না চাও, সূর্য ডুববে, সূর্য উঠবে, দিন গড়াবে। সবচেয়ে দুঃখের দিনও গত হয়, সুখের দিনও স্থায়ী হয় না, প্রতীক্ষার অনড় সময়ও শেষতক প্রবাহিত হয়। সোনিয়া ভাবির নাইওরের দিন চলে আসে। তিন দিন ধরে ভাবি বাঁধাছাদা করে। আর কত দিন ধরে জরিনা মনের মধ্যে নকশিকাঁথা বোনে।

গাড়ি আসে খুলিতে। হামেদ গাড়ি থেকে নামে। গরু দুটোকে বাঁধে চাকার সঙ্গে। হাঁক পাড়ে, ও ভাবি, আইসেন ক্যানে। সকাল সকাল যাওয়া খায়।

সোনিয়া ভাবি আসে, সঙ্গে ইয়া বড় ঝুড়ি। তার সঙ্গে আসে জরিনাও। তার চোখে কাজল, চুলে লাল ফিতা। সেও তো দেখি এসে ওঠে গাড়িতে। সেও যাবে তাহলে। হামেদের মনে খুশি আর ধরে না।

আবদাল আসে। বলে, 'তাইলে তোমরা আল্লার নাম বুলি সকাল সকাল রওনা হয়া যাও। আর দেরি না করেন। মেলা দূর ঘাটা।'

সোনিয়া বলে, 'তোমরা কিন্তুক বেষ্যতবার শুকানপুকুর আসি হাজির হইবেনই।'

আবদাল বলে, 'হমো হমো। নে রে হামেদ, গাড়ি জোড়। হামেদ গাড়িয়াল বুলি না মুই তোমাকে একলা ছাড়বার সাহস পাইতোছো। নাইলে কি আর ছাড়ি?'

হামেদ বলে, 'চিন্তা করা না লাগিবে ভাইজান, দেখেন এলা বেলা থাকতে থাকতে ঠিকে পৌছি যামো। আল্লাহ ভরসা।'

গাড়ি জুড়ে হামেদ রওনা দেয়।

আজ তার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিন। জরিনা আজ তার গাড়িতে সোয়ারি হয়েছে।

গাড়ি চলছে। জরিনাই বসেছে পেছনের দিকে। সোনিয়া ভাবিই সামনের দিকে। ভাবি আসলে পোয়াতি। ঝাঁকি লাগানো তার চলবে না।

ছইয়ের গাড়ি। সামনে বসে হামেদ গাড়ি চালাচ্ছে। হ্যাট হ্যাট করছে একটু পরপর।

ভাদ্র মাস। বেশ গরম পড়েছে। আকাশ নীল। সাদা সাদা মেঘও ভাসছে দুধের সরের মতো। রাস্তায় মাঝেমধ্যে কাদা। বর্ষাকালের পর রাস্তা বহু জায়গায় বেশ খারাপ।

ভাবি বলে, 'ও হামেদ, তোমার টেলিভিশনটার খবর কী।'

'না ভাবি, দুই দিন বাদে নষ্ট হয়া গেইছে। কয় বলে তিন হাজার ট্যাকা লাগবে, সারাইতে। অত ট্যাকা কই পামো। বেচি দিছি পাঁচ শ ট্যাকা দিয়া।'

'ও হো।'

তারা একটা বাঁশঝাড়ের তলা দিয়ে এগিয়ে যায়। বাঁ দিকে একটা গম্বুজওয়ালা মসজিদ পড়ে।

ভাবি বলে, 'শুনছেন নাকি দেওরা এই মসজিদটা কেমন করি বানাইছে?'

হামেদ বলে, 'না তো ভাবি, কেমন করি?'

ভাবি বলে, 'এক আইতে বানাইছে। শাহ সাহেব খোয়াব দেখলেন বলে মাওয়ের বেরাম ভালো হইবে, কিন্তুক এক আইতে মসজিদ বানেয়া দেওয়া লাগবে। এক হাজার মিস্ত্রি খাটে, কিন্তু এক আইতে কাম কি আর শ্যাষ হয়, তখন জিনেরা আসিয়া হাত লাগাইলে।'

জরিনার গলাও শোনা যায়, 'কও কী ভাবি?'

হামেদ বলে, 'তোমরা কন কী ভাবি, জিনেরা আসিয়া হাত লাগাইলে?'

ভাবি বলে, 'হয়। তা দেওরা তোমার সাথত নাকি জিন আছে? কথা কি ঠিক?'

হামেদ বলে, 'জিন নাই ভাবি, জিন নাই। কিন্তুক মোর ঘাড়ত একখান পরির আছর আছে।'

জরিনা বিস্ময়মাখা কণ্ঠে বলে, 'পরির আছর?'

হামেদ বলে, 'হয় সেই পরিটা এখন এই গাড়ির ভেতরে ছইয়ের মধ্যে বসি আছে।'

গাড়ি আবার একটা বাঁশঝাড়ে ছাওয়া পথে ঢোকে। জায়গাটা অন্ধকার। সামনে একটা শ্যাওড়ার গাছ। দূরে একটা শিমুল ডালে কতগুলো শকুন।

জরিনা বলে, 'এ গাড়িয়াল এগলা কথা না কন তো মোর ভয় লাগে?'

ভাবি বলে, 'দেওরা কী কইছে মুই বুঝছুঁ।'

জরিনা বলে, 'কী কইছে?'

ভাবি বলে, 'আরে পাগলি তাকে তোকে ভাঙি কওয়া না যাইবে।'

গাড়ি চলে। ক্যাঁচর ক্যাঁচর একটানা শব্দ। ভাবি ঘুমিয়ে পড়েছে।

জরিনা সামনে ছইয়ের কাছে চলে আসে।

হামেদ হেসে বলে জরিনাকে, 'শোনেক, সেবার যে মুই এই ঘাটা দিয়া ভাবিকে ধরি গেছি, তখনই মোকে ভাবি এই জিন মসজিদের গল্প কইছে।'

জরিনা বলে, 'গাড়িয়াল শোনেন, তোমরা যে পরির কথা কইলেন, তাকো মুই কিন্তুক ঠিকে বুঝছোঁ। ভাবির সামনত কি তাকে কওয়া যায়? তোমার তো কোনো হায়া শরম নাই...'

হামেদ গাড়িয়ালের গানের গলার সুনামও আছে। দোতরা বাজিয়ে সে গান গাইতে পারে। এখন গাড়ি চালাতে চালাতে সে দোতরা বাজাতে পারে না বটে, কিন্তু খালি গলায় গান ধরতে তো কোনো অসুবিধা নাই। সে গান ধরে—

ওরে বান্ধিনু বাড়ি
গুয়া উনু সারি সারি
গুয়ায় বাগুচায় ঘিরি লইলে বাড়িরে।

আসিবে মোর প্রাণের মায়া
তায় পাড়াইবে গাছের গুয়া
মুই নারীটা ফাঁকিয়া খাইম তাক।

ওরে আসিবে মোর প্রাণের নাত
তাঁয় কাটিবে কলার পাত
মুই নারীটা বসিয়া খাইম বোল ভাত।

ওকি ও প্রাণকালারে
ওরে মাহাকালের ফল যেমন
মোর নারীর যৈবন তেমন
খায়া দেখ কালা যৈবন কেমন মিঠারে।

জরিনা হাত বাড়িয়ে হামেদের চুল বোলায়। হামেদ ঘুরে তার হাত ধরে। তারপর হাতটা মুখে ধরে কামড়ে দেয়। জরিনা উফ্ বলে দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে।

৭

ভাদ্র মাস ভালোই যায়। আউশ ধান উঠেছে ঘরে ঘরে। দুটো মাসের খাওয়ার চিন্তা নাই।

ভাদ্র আশ্বিন মাস গিয়ে আসে কার্তিক মাস।

খেতে খেতে ধান। কিন্তু কাটামারির দেরি আছে। মাঠে কারও কোনো কাজ নাই।

এবং গাড়িয়ালেরও কোনো কাজ নাই। এই সময় গাড়ি কোনো কাজেই লাগছে না। না কেউ নাইওর যায়। না ধান নিয়ে চাষিরা হাটে যায়। না হাট থেকে ধান কিনে ব্যাপারীরা গঞ্জে যায়। কার্তিক মাসের মতো করাল মাস আর নাই।

হামেদের বাড়ির অবস্থা খারাপ।

হামেদ বসে আছে ঘরের সামনে একটা টঙের ওপরে। তার মা আসে, 'বাপো, একখান কথা। ঘরত তো চাউল-ডাইল একটা কিছু নাই। আজকা কিন্তুক হাটত থাকি চাউল না আনলে বাপো খাওয়া নাই।'

হামেদ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'ধার-কর্জ পাওয়া যাবার নোয়ায়? ওই দুই ঘর কী কয়?'

মা বলে, 'ওমরায় বলে না খায়া আছে!'

হামেদ বলে, 'কও কী মা? তাইলে দোকানত থাকিয়া বাকি নিয়া আসোম।'

মা হতাশ কণ্ঠে বলে, 'দেখ, পাইস নাকি দেখ।'

হামেদ ওঠে। কিছু একটা করা দরকার। বসে থাকলে তো আর মুখে অন্ন জুটবে না।

হামেদ একটা গৃহস্থ বাড়িতে যায়।

মিয়াবাড়ির মিয়া তার বাড়ির সামনে দাওয়ায় বসে আছে।

হামেদ বলে, 'চাচা, কোনো কামকাজ আছে নাকি বাহে?'

মিয়া বলে, 'কী কাম?'

হামেদ বলে, 'এই ধরেন তোমার বাইগুন খেতখান নিড়ি দিনো কি তোমার বেটির বাড়িত লাউকুমড়া ধরি গেনো?'

মিয়া বলে, 'কার্তিক মাসত কাম যে করাইম, তোক দিম কী? আগন মাস আসুক, ধান কাটামারি শুরু হোক, আসিস, কাম দেমো।'

হামেদ বলে, 'কার্তিক মাসটাই তো চাচা মিয়া আকাল। আগন মাস আসলে তো মুইও গাড়ির কাম মেলা পাইম।'

মিয়া বলে, 'না রে নাই। হামার গাঁত আর কাঁয় তোকে কাম দিবে। আশরাফ মেম্বার পর্যন্ত না খায়া আছে। গাছ কাটি বেচায়া দেতোছে।'

হামেদ বলে, 'যাঁও দেখোম, আর কোনেটে কোনো গতি হয় নাকি!'

আবদালের বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছে হামেদ। মনে দুশ্চিন্তা। পেটে খিদা। বড় ভাবি বেরিয়েছে ছাই ফেলতে। দেখলেন হামেদ যায়।

বড় ভাবি বলে, 'ও দেওরা কোটে যাও? খুব পাও ভারী হয়া গেছে একেরে হামার বাড়ির দিকে আসেন না। কী ভাবিকে ভুলি গেলেন?'

হামেদ বলে, 'ভাবির যে আরো কথা। কার্তিক মাস না ভাবি। কাম-কাজ নাই। তা ভাবলাম যাই একনা নদীর ঘাটত, যদি কোনো কাম-কাজ পাওয়া যায়।'

'ও, তাও তো একখান কথা। তোর ভাইও তো গেছে গঞ্জত। হামারও অবস্থা খারাপ। এবার মংগাটাত জমি বেচা নাগে নাকি?'

তোমার তো ভাবি জমি আছে বেচবেন, 'মুই এলা কী বেচোঁ? তা ভাবি তোমার ননদ কোটে?'

'আছে বাড়ির কোনেটে। ডাকি দেমো?'

'দেও।'

আবদাল টঙের ওপরে বসে। ভাবি বাড়ির ভেতর থেকে একটা বেতের ধামায় মুড়ি এনে দেয়।

ভাবি বলে, 'নেও। বসি খান। জরিনা বলে একনা ওই পাড়াত গেছে। অটে কোনা নাকি খ্যাতা সিলাইয়ের কাম পাইবে। হামার ননদকোনার খুব সিলাইয়ের শখ। নে খান না কেনে মুড়িকোনা। সকালে কিছু খাইছেন?'

হামেদ বলে, 'ভাবি, মুড়িকোনা মুই ধরি যাঁও। ঘাটত না গেলে ফির দেরি হয়া যাইবে।'

'আচ্ছা।'

হামেদ লুঙ্গি পেতে মুড়ি নেয়। সাবধানে লুঙ্গির কোছাটা ধরে সে বাড়ি ফিরে আসে।

বাইরে থেকে ডাকে, 'মাও মাও...'

মা আসে, 'কী বাপো?'

'একনা মুড়ি ধরি আসছোম। খাও।'

'তুই খাছিস?'

'হোয়ায়।'

মা তার আঁচলে মুড়িটুকু নেয়। ঘরের দুয়ারে বসে। ডাকতে থাকে, 'ময়না ময়না...ওই ঘরের ছাওয়াটাকে ডাক। একলা একলা মুড়ি কি মুই খাবার পারোম। ওমরা খাইছে কি খায় নাই তার তো ঠিক নাই।'

ময়না আসে। গোগ্রাসে মুড়ি খায়। মাও খায়। হামেদ ওদের খাওয়া দেখে। তার মনটা খুব খারাপ হয়।

রাতের বেলা উঠানে সভা বসে। তিন ভাই আবেদ, ছাবের, হামেদ আর মা সব বসে আছে।

আবেদ বলে, 'এবারের মতন কার্তিক মাস তো আর কোনো বছর পড়ে না। তিন তিনবার বান আসিয়া সব ফসল খায়া ফেলাইল।'

ছাবের বলে, 'পুরা এলাকাতে কারো ঘরত ভাত নাই। কায়ো বাঁশ বেচে, কাঁয়ো গাছ বেচে, কায়ো ফির শোনোম জমি বেচে। এখন হামরা কী বেচি? হামার তো আর জমিজিরাত তেমন নাই।'

আবেদ বলে, 'ছাওয়াগুলান ভাত ব্যাগরে কান্দে। কার শুনবার ভালো লাগে। মাও শোনো, বাপে তো একখান গরুগাড়ি থুয়া গেছে। তার ওপরে তো তোমার সব বেটারই হক আছে। মুই কওঁ কী, গরু দুকনা বেচায়া দেওয়া খায়।

এইবার মংগাটা আগত পার হই। ছাওয়াপাওয়া ধরি আগে খায়া বাঁচি।'

হামেদ বলে, 'না। বাপ মোক এই গরুর দড়ি হাতত ধরি দিয়া গেইছে। কইছে বাপ-দাদার কায়কারবার, তুই ধরি থুস। মুই গাড়িখান বেচবার দেমো না।'

ছাবের বলে, 'পাগলামি করিস না রে হামেদ। তোর না হয় খাওয়াইয়া মুখ নাই। হামার ঘরত তো আছে। বাঁচি থাকা লাগবার নয়? মাও তুমি কী কও?'

মা বলে, 'বাপের হিস্যা তো সবায় পাইবে। এখন তোরা যদিল চাস, বেচি দেওয়া ছাড়া তো কোনো উপায় নাই।'

ময়না বাপের কাছে আসে। বলে, 'বাপো আজকা চাইল আনবার চাছলেন, আনছেন?'

আবেদ বলে, 'যা তো এলা কাজের কথার মাঝে ভেজাল করিস না।'

ময়না বলে, 'বাপো আজ কিন্তুক ভাত দেওয়াই লাগবে।'

আবেদ রেগে মেয়েকে চড় মারে। মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে চলে যায়।

নীরবতা নেমে আসে চরাচরজুড়ে। আকাশে কার্তিকের চাঁদ। তারাপুঞ্জ অগণন। বাঁশঝাড়ে হঠাৎ পাখা ঝাপটায় কোনো পাখি। ঝিঁঝি ডাকে। দূরে শেয়াল আর কুকুরের ডাক। এই বাড়িতে আজ হাঁড়ি উঠে নাই চুলায়। ওরা আজকের রাতটা না খেয়ে কাটাবে।

হামেদ বলে, ঠিক আছে গরু দুইটাকে কাল হাটত ধরি যামো। তোমরা দুজনও হামার সাথে যাইবেন।

ময়না ভাত খেতে পাবে, সে নিজেও ভাত খেতে পাবে, এই চিন্তা তাকে মোহগ্রস্ত করে। খিদেয় সে জেগে থেকে খোয়াব দেখে, টিনের থালায় গরম ভাত, কাঁচা মরিচ, নুন, একটুখানি ঢেঁকিশাক...। সে গরু বেচে দেবে। ধলু আর লালু তার কে হয়। তার পেট চলে না। আহ, খিদে...

হাটে গরু নিয়ে যেতে হবে। গঞ্জের হাটে যাবে তারা। ছয় মাইল হাঁটতে হবে গরু নিয়ে। আবেদ আর ছাবের তাড়া লাগায়। ও হামেদ, চলো বাহে।

হামেদ গরু দুটো ধরে নিয়ে যায়। গরু দুটো ভারি অবাক হয়। এই প্রথম গাড়ি ছাড়া শুধু গরু চলেছে হাটে। তারা বোধ হয় বুঝতে পেরেছে আজ তাদের শেষ দিন। তাদের চোখের নিচে পানি দেখা যায়।

ময়না কাঁদে। ধলু আর লালুকে ধরি কোটে যান?

আবেদ বলে, ময়না, যাও তো বাড়ির ভিতরত যাও। এ চল তো, ছোলের জেদে জেদ করলে চলবে?

গরু বেচা টাকা দিয়ে প্রথমে তারাগঞ্জের হোটেলে বসে ভাত খায়। মুরগির মাংস, ডাল আর ভাত। টাকা তিন ভাগ করে। হামেদ তার ভাগের টাকা নিয়ে যায় স্বর্ণকারের দোকানে। একটা নাকফুল পছন্দ করে। তিন শ টাকা দিয়ে সে একটা নাকফুল কেনে।

সেই রাতে তাদের বাড়িতে চুলায় হাঁড়ি ওঠে। হাঁড়িতে চাল চড়ানো হয়। আগুন জ্বলে, চাল সেদ্ধ হয়। ভাতের গন্ধ নাকে এসে লাগে। পুরা বাড়ি ভাতের গন্ধে ম-ম করে। ময়না পাগলের মতো বলতে থাকে, ভাত খামো, ভাত খামো।

পরের দিন ভোরবেলা জরিনার বাড়ির উদ্দেশে বের হয় হামেদ। বুক পকেটে সাবধানে রাখা একটা নাকফুল। সে পেছনের দিকে তাকাবে না। বাথানে গরু দুটো নাই। থাকবার কথা ছিল। এটা সে মনে করতে চায় না। সে শুধু জরিনার কথা ভাববে। আহা। জরিনা। কী সুন্দর হাসি মেয়েটার। শ্যামলা বরন মেয়েটির চোখ দুটো কী রকম ভাসা ভাসা।

জরিনা তখন কুয়ার পাড়ে দাঁত মাজছে কয়লা দিয়ে।

হামেদ বাড়ির বাইরে গিয়ে গলা খাঁকারি দেয়।

জরিনা হামেদকে দেখে দৌড়ে বাইরে আসে। বলে, 'কী? বিহান বেলাত আসছেন ক্যানে?'

হামেদ বলে, 'চল। একনা ওই বাঁশঝাড়ের কি গোয়ালটার আড়ালত যাই।'

'ক্যানে?'

'আরে বেটিছাওয়া আগে চলো না ক্যানে?'

হামেদ তাকে একটু নিরালা জায়গায় নিয়ে যায়। পকেট থেকে পুঁটলি বের করে বলে, 'দেখেন, হাট থাকি তোর লাগিয়া কী ধরি আনছোম?'

জরিনা উৎসুক চোখে তাকায়, 'কী?'

হামেদ পুঁটলি থেকে একটা নাকফুল বের করে। সোনার পানি দিয়ে ধোয়া। বলে, 'তোর লাগিয়া আনছোম। সোনার।'

'সোনার?'

'হয়।'

'করছেন কী? ট্যাকা পাইলেন কই?'

'সে কথা আর পুছ না করেন বাহে। বলদ দুকনা বেচি দেছম।'

'বলদ বেচছেন মানে? কী কন?'

'হয়। শরিকের গরু। ভাইজানেরা ধরি বসলে যে কার্তিক মাসের আকালত টেকা না যায়, গরু বেচো। মুই বেচবার চাঁও নাই, কিন্তুক ওমরা জোর করি...'

জরিনা কেঁদে ফেলে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলে, 'ধরেন। তোমার ফুল তোমরা ধরি যান। গাড়ি যদিল না থাকিলে তাইলে কিসের গাড়িয়াল। তোমাক যে মুই এত ভালোবাসোঁ, সবায় ভালোবাসে, ক্যানে? আরে তোমার তো যত নামডাক ওই গাড়িয়াল হিসাবেয়। না মুই তোমার এ ফুল নিবার নোয়াও।'

হামেদ বলে, 'ক্যানে রে মোকে দুঙ্ক দেন। মোর কলিজাটা কি পুড়ি যাইতোছে না। দেখেন মোর ঠিকে আরেকখান গাড়ি হইবে।'

জরিনা বলে, 'যত দিন তোমার নিজের গাড়ি না হইবে, তত দিন তোমরা মোর বাদে না আসিবেন। যেদিন তোমার গাড়ি হইবে, সেদিন গাড়ি ধরি আইসেন। মুই তোমার গাড়িত চড়িয়া তোমার বাড়িত যামো এলা। তোমার নাকফুল নাকত পরিমো এলা। কিন্তুক এখন তোমরা মোর চোখের সামনত থাকি দূর হয়া যান।'

হামেদ বলে, 'ঠিক আছে মুই তাঁই যাইতোছোম। ঠিকে দেখমেন নয়া গাড়ি জুড়ি নয়া বলদ নিয়া মুই আসি হাজির হমো। তোমাকে ঠিকে নিয়া যামো। যাই।'

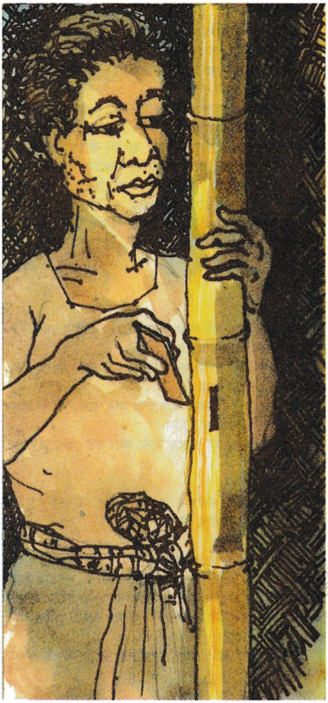
হামেদ চলে যায়। জরিনা কাঁদতে থাকে হাউমাউ করে। বলে, 'শোনেন, বলদ বেচা ট্যাকার ভাগ যাকে পাইছেন তাকে খরচ না করি থুয়া দেন। নয়া গরু কিনার সুমে লাগবে।'

হামেদ তার পরামর্শটা মেনে নিয়ে বলে, 'আচ্ছা।'

৮

গরু নাই। গাড়ি পড়ে আছে খুলিতে। হামেদ তো আর কোনো কাজ জানে না। সে গাড়িয়াল। সে গাড়ি চালাতে পারে। বৃদ্ধ বাবা গাড়ি চালাতে পারতেন না। তাকে দিয়ে গাড়িয়ালের কাজ করাতেন। আজ বাপ নাই, সেই তো গাড়িয়াল হয়েছে। কিন্তু তার গাড়ি নাই। গরু নাই গাড়ি আছে, হামেদ গাড়িয়াল। বেকার। তার কোনো কাজ নাই। তার মনের মানুষ জরিনা তাকে বলে দিয়েছে, গরু বেচা টাকা খরচ না করতে। কিন্তু বাড়িতে বসে থাকলে তো সব টাকা খরচ হয়েই যাবে। পেটের আগুনের মতো আগুন এই ত্রিভুবনে আর নাই। সে সবকিছুকেই পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দেয়।

হামেদ তার মাকে বলে, 'মাও মাও শোনেক গাঁত তো কোনো কাম নাই। সবায় বিদেশে গেইছে। মুইও যাঁও। গরু


বাঁশের খুঁটিতে ফুটা করে সে ব্যাংক বানিয়েছে

বেচা ট্যাকা থাকিয়া এই যে ধরো কয়টা ট্যাকা মুই তোমাকে দিয়া যাওঁ। তোমার আর বেটারা আছে। তারাও তোমাকে দেখপে।'

মায়ের চোখ কোটরাগত, মুখে বলিরেখা, ব্লাউজবিহীন একটা কালচে নীল শাড়ি দিয়ে ক্ষীণকায়া ঢাকা। সে তার পান খাওয়া কালো দাঁত বের করে বলে, 'কোটে যাবু, কার কাছে থাকবু, ঠিক করছিস কিছু?'

হামেদ বলে, 'না। তাক ঠিক করোম নাই। অমপুর শহরত যামো আগত। তার বাদে দেখা যাইবে।'

'অমপুরত যাবু? শোন অটে কোনা আমপুরা গাঁত তোর মজনু মামারা আছে। সেটে গেইলে বুদ্ধি দিবে।'

'আমপুরা। আচ্ছা যামো।'

মা বিড়বিড় করে বলে, 'হাটত থাকি যে চাউল আনছিস খুব ভালা চাউল। ভাত তুলি দিছোম চুলাতে। ভাত খায়া তারপরে আল্লাহর নামে বাইর হয়া যা। গরু বেচা চাউল। গরু দুকনা...হামার যে একখান গাই আছল, তার বাছুর। বড় বাছুর ছোট বাছুর, কেমন জোড়া মিলি গেছল। সেই বাছুর বেচা লাগল। তোর দাদা আছল গাড়িয়াল, তোর বাপে আছল...,' মার গলা ধরে আসে।

হামেদ বলে, 'মাও মুই টাউনত যাবার লাগছোম ট্যাকা ওজগার করিবার বাদে। ট্যাকা ওজগার করি হামরা ফির গরু কেনমো, গাড়ি জোড়মো। তুমি দোয়া করো খালি...'

হামেদ বের হয়। ময়না তাকে দেখে বলে, 'চাচা, মুইও যামো।'

'কোটে যাইবেন।'

'তোমরা যেটে যাইবেন।'

'হামরা তো অনেক দূর যামো মাও।'

'মোকেও ম্যালা দূর ধরি যান।'

'না, মাও, তোমরা থাকেন।'

'তাইলে তুমিও থাকেন চাচা।'

'নারে মাও।'

ময়নাকে ছেড়ে যেতে হামেদের বুকের ভেতরটা খাঁ খাঁ করে ওঠে।

তবু সে এগোয়। কার্তিক মাস। খেতে খেতে সবুজ ধান। পুরুষ্ট ধান। শিস আসছে। সে দ্রুত হাঁটে। তার পায়ে বাটার খুব ভালো একজোড়া নাগরা। তার নিচে শিশির আর মরা ঘাস আর মাটি। চটর চটর শব্দ হয়।

জরিনার বাড়ি যায় হামেদ। দুই ভাবিকে ডাকে, 'ভাবিরা আছো নাকি বাহে।'

একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে।

বড় ভাবি বেরিয়ে আসে।

হামেদ বলে, 'ভাবি, বিদায় নিবার আসলাম। টাউনত যাবার লাগছি। নিজের গরুগাড়ি না করিয়া মুই আর এ গাঁত কোনো দিন না ফিরমো।'

ভাবি বলে, 'যাবার চাচ্ছেন যাও। মাঝেমধ্যে আসবেন। তালাশ করবেন। আর আসমো না এই মতন জেদ ধরার তো দরকার নাই। তোমার একটা নিজের গরুগাড়ি হইলে সব চায়া খুশি হইম মুই।'

ভাবি ভিতরে যায়। হাঁক ছাড়ে, 'এ জরিনা, গাড়িয়াল টাউনত যায় রে, বিদায় নিবার আসছে। যা, দেখা করি আয়।'

জরিনা আসে। তার বুকের ভেতরটা মোচড় দিচ্ছে। তবু বুকে পাথর বেঁধে সে বলে, 'যান?'

হামেদ বলে, 'হয়। নাকফুলটা সাথত ধরি যাইতোছোম। যখনই তোমার কথা মনে পড়বে, সে সুমে মুই ফুলকোনাক বার করি দেখমো।'

জরিনা বলে, 'মোর লাগি একটা কিছু চিহ্ন থুয়া যান।'

হামেদ এদিক-ওদিক তাকায়, খোঁজে কী দেওয়া যায়।

'তোমার ঘাড়ের গামছাটা দিয়া যান।'

হামেদ তার ঘাড়ের গামছাটা জরিনার হাতে তুলে দেয়।

ঘুঘু ডাকে। মুরগির পেছনে ছোটে একটা মোরগ। সুপারির গাছ থেকে একটা পাতা খসে পড়ে।

জরিনা গামছাটা মুখে ধরে চোখের জল মোছে। মুছতেই থাকে।

হামেদ হাঁটে। সে পেছন ফিরে তাকাবে না। জরিনা হামেদের দিকে তাকিয়ে থাকে। হামেদ গাবগাছ, বাবলাগাছ পেরিয়ে, সোনাঝুরি গাছটার আড়ালে চলে যায়। ঢোলকলমির দঙ্গল হামেদকে আড়াল করে ফেলে। সেই শূন্য পথের দিকে জরিনা তাকিয়ে থাকে।

হামেদ তিন মাইল হেঁটে পাকা রাস্তায় ওঠে। একটু পর টেম্পো যাচ্ছে, সাইকেল, রিকশা যাচ্ছে। বাসের দেখা নাই। খানিকপরে একটা রংপুরগামীবাস আসে। পাকুড়গাছের নিচে বাস থামে। হামেদ বাসে উঠে বসে।

জরিনা একলা ঘরে গামছা দেখে আর কাঁদে। রেডিওতে রংপুর কেন্দ্রে তখন গান বাজে—

ও কী ও বন্ধু কাজলভোমরারে
কোন দিন আসিবেন বন্ধু কয়া যাও কয়া যাও রে।।

যদি বন্ধু যাবার চাও
ঘাড়ের গামছা থুইয়া যাও রে
বন্ধু কাজলভোমরারে
কোন দিন আসিবেন বন্ধু কয়া যাও কয়া যাও রে

বটবৃক্ষের ছায়া যেমন রে
মোর বন্ধুর মায়া তেমন রে।
বন্ধুরে, বন্ধুরে, বন্ধুরে।
বন্ধু কাজলভোমরারে
কোন দিন আসিবেন বন্ধু কয়া যাও কয়া যাও রে...

৯

রংপুর শহরের বাস টার্মিনালে বাস থেকে নামে হামেদ। এখান থেকে রামপুরা গ্রাম হাঁটা দূরত্ব। সে হেঁটে হেঁটে তার মামুর বাড়ি যায়। গিয়ে শোনে, বাড়িতে মামু নাই। রিকশা নিয়ে বের হয়েছে। মামু তার রিকশা চালায়। বাড়ির সামনে একটা মুদির দোকান। তার সামনে টং।

টঙে বসে থাকে হামেদ। একটা রিকশা, তার নিচে লণ্ঠন, মজনু মামা ফিরে আসে ভাড়া করা বাসায়। রিকশা চালিয়ে।

হামেদ ডাকে, 'মামু, মামুজান।'

মজনু রিকশা থামায়। 'কাঁয়? হামেদ। তুই এটে? বাড়ির সগায় ভালো আছে? বুবু?' দোকানের আলোয় ভাগ্নের চেহারাটা ভালো করে দেখে নিয়ে মজনু বলে।

'আছে।'

'তোর বাপের মরার খবর পায়া গেলাম গাঁত। তার বাদে আর যাওয়া হয় নাই। চল চল ঘরত চল।'

যেতে যেতে মামু বলে, 'টাউনত যে আসলু, কী বুলি?'

হামেদ বলে, 'আসলাম। গাঁত খুব অভাব। তাই আসলাম দেখি টাউনত যদিল কিছু করা যায়।'

'কী করবু?'

'জানোম না।'

'এশকা চালাবার পারবু?'

'এশকা। হয় মামু, পারমো। না পারিবার কী আছে। আছলাম গাড়িয়াল, হমো এশকাঅ্যালা। কপাল মামু, কপাল।'

'ফুটানির কথা কস ক্যা? মুই চালাওঁ না। খারাপ কী?' বাসা এসে যায়। 'হ্যা গো পুঁটির মাও, দেখেন কাঁয় আসছে?'

'কাঁয় আসছে? মামি এগিয়ে আসে। ও, হামেদ। আসো বাপ আসো। চোখমুখ যে শুকি গেছে। কিছু খান নাই?'

ভাড়ার রিকশা জোগাড় করে দেয় মজনু মামু। রিকশার হ্যান্ডেল ধরে হামেদ মনে মনে বলে, 'জরিনা, মুই পণ করনু, দিনরাত খাটিয়া এশকা চালেয়া মুই মেলা ট্যাকা জোগাড় করমো। তার বাদে গেরামত ফিরি যামো। সকাল থাকি দুপুর, দুপুর থাকি সানঝের বেল মুই খাটমো, সারা আইত খাটমো। ট্যাকা মুই জোগাড় করমোই।'

হামেদ রিকশা চালায়। খুবই পরিশ্রমের কাজ। রিকশাওয়ালারা তাই ছয় থেকে আধঘণ্টা রিকশা চালায়। এর বেশি সময় চালায় না। বেশি করে খায়। বেশি করে ঘুমায়। হামেদ এসবের কিছুই করবে না। দিন-রাত পরিশ্রম করবে। টাকা কামাবে। জমাবে। গ্রামে ফিরে যাবে।

একদিন রিকশা চালাতে চালাতে সে ঘুমিয়ে পড়ছে। চোখ তার বন্ধ হয়ে আসছে। রিকশা রাস্তার বাঁ দিক থেকে মধ্যখানে চলে যাচ্ছে।

যাত্রী বলে, 'কী রে, ওই, তুই রিকশা চালাস না ঘুমাস?'

হামেদ লজ্জা পেয়ে বলে, 'না জাগি আছোম তো।'

'কী রে ডাইল খাচ্ছিস নাকি?'

'না ভাই।'

'তাইলে ঝিমাস ক্যান?'

প্যাসেঞ্জারকে তার গন্তব্যে নামিয়ে দিয়ে সে বলে, ভাইজান, কালকা সারা আইতত এশকা চালাছোম।'

যাত্রী বলে, 'ক্যান?'

হামেদ বলে, 'মোর খুব ট্যাকার ঠ্যাকা। আট হাজার টাকা মোক জোগাড় করা লাগবেই লাগবে।'

রংপুর শহরে রিকশা চালিয়ে হামেদ কাঁচা টাকার মজা পেয়ে গেছে। রোজ সে ভালো টাকা জমাতে পারছে। সারা রাত রিকশা চালিয়ে টাকা নিয়ে সে ফিরে আসে তার বস্তিঘরে। বাঁশের খুঁটিতে ফুটা করে সে ব্যাংক বানিয়েছে। সেখানে সে টাকা জমিয়ে রাখে। আর হিসাব কষে। কবে সে তার গরু কেনার টাকা হবে।

১০

আবদাল আর তার বউ ঘরে শুয়ে আছে। বউটার পেট উঁচু। সামনের মাসে তার বাচ্চা হবে।

আবদাল বলে, 'সোনিয়া, জরিনার তো বয়স হইছে। অক তো বিয়াও দেওয়া খায়।'

সোনিয়া জোরে জোরে শ্বাস নেয় আর বলে, 'না কী এমন বয়স হইছে। পরে দেন আরো।'

আবদাল বলে, 'না লোকে নানা কথা কয়। শুনতে ভালো লাগে না।'

'লোকের কী?'

'যদুপুরা থাকি একখান ভালো প্রস্তাব আসছে। কইনা দেখবার ওমরা আসবার চায়। কী করমো?'

'কয়টা দিন পর।'

'সোনিয়া বড় ভাবিকে বলে, 'একনা হামেদের বাড়িত যান তো। তোমার দেওর তো জরিনাকে বিয়াও দেওয়ার লাগি উতালা হইছে। এলা হামেদের সাথে সম্বন্ধ না হইলে জরিনা কি সুখ পাইবে? একনা খবর দেন। হামেদ কোটে আছে, য্যান তাড়াতাড়ি চলি আসে।'

জরিনার বড় ভাবি গেছে হামেদের মায়ের কাছে। 'চাচি কেমন আছেন?'

হামেদের মা কোমর বাঁকা করে চলে, একটা পিঁড়ি এনে বলে, 'আছোঁ মাও। বুড়া হয়া গেছুঁ, বিধবা, বোঝেন না।'

'হামেদ গাড়িয়ালের কোনো খবর জানেন?'

'নাতো মায়ো।'

'ঠিকানা জানেন?'

হামেদের মাও বলে, 'ওই আবেদ মনে হয় জানে। এ আবেদ, আবেদ...।' মা কোমর বাঁকা করে বড় ছেলেকে ডাকতে যায়। মুখে বলে, 'অর মজনু মামার বাড়ির কাছেই ঘর বাড়া নিছে শুনছি। ঠিকানা তো জানোম না।'

আবেদের বউ বেরিয়ে আসে। বলে, 'কী আম্মাজান, ক্যানে খোঁজেন বেটাকে?'

মা বলে, 'হামেদের ঠিকানা তোমরা জানো? মজনুর অটেকোনা না উঠছে? আমপুরা? অটে না ঘরভাড়া নিছে?'

বউ বলে, 'ক্যানে? গণেশ তো যাইবে টাউনত। তাকে দিয়া তো খবর দেওয়া যায়।'

জরিনার ভাবি বলে, 'আচ্ছা, গণেশক তাইলে মোর কাছে একনা পাঠি দিবেন।'

গণেশ পরের দিনই রংপুর যাচ্ছিল। তাকে জরিনার বড় ভাবি বলেন, 'হামেদক খুঁজি বাইর করবু।'

'উটকান না লাগিবে। মুই চেনোম ওমার ঘর।'

'ওমাক যায়া কইবেন বুলে জরিনার বিয়াও হয়া যায়। তোমরা তাড়াতাড়ি বাড়িত যাও।'

'আইচ্ছা বলমো। কার বিয়া হয়া যাইতোছে?'

'জরিনার।'

'জরিনা কাঁয়?'

'আরি জ্বালা। কথা বেশি কয়। যা কয়া দিনোম, তাই যায়া কবু। এত কথা পুছ করে ক্যানে?'

গণেশ রংপুরে গেলে রামপুরার ওই বস্তিতেই ওঠে। সে সহজেই খুঁজে পায় হামেদকে। হামেদকে গিয়ে সে বলে, 'জরিনার বিয়াও। তোমাকে আবদাল ভাইজানের ভাবি ডাকি পাঠাইছে। কইছে, তাড়াতাড়ি রংপুর থাকি গেরামত যাওয়া লাগবে। মোক পুছ করেন না য্যান জরিনা কাঁয়। মুই কবার না পারিম।'

জরিনার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। কী বলে! হামেদের আর কিছু ভালো লাগে না। পরের দিন সকাল সকাল সে রিকশা গ্যারাজে জমা দিয়ে রওনা হয় তাদের গ্রামের দিকে। বাস থেকে নেমে সে একটা রিকশাভ্যান ভাড়া করে। তারপর সোজা চলে যায় জরিনাদের বাড়ি।

'ভাবি, ভাবি।'

ভাবি বাইরে আসে। জরিনা বাইরে আসে। তারা খানকা ঘরের বারান্দায় দাওয়ায় বসে।

হামেদ বলে, 'খবর পায়া তো ছুটি আসনো। এলা কী করা লাগবে কন?'

ভাবি বলে, 'তোমরা জরিনার ভায়োক সোজা কও বলে মুই জরিনাক বিয়া করবার চাঁও।'

জরিনা বলে, 'না ভাবি। মুই এশকাঅ্যালাকে বিয়া না করমো। মুই যাকে পছন্দ করছোম, তাঁই গাড়িয়াল। এশকাঅ্যালা নোয়ায়। গরুগাড়ি টানে গরুতে, আর এশকা টানে মানষে। না মুই এশকাঅ্যালার সাথে বিয়াও না বসিম।'

হামেদ মাথার চুল ছেঁড়ে, 'কবার পারলা তুমি এ কথা?'

জরিনা বলে, 'যেদিন তোমার নেজের গাড়ি হইবে, সেদিন তোমাকে আমি বিয়াও করমো। এখন না।'

হামেদ বলে, 'কিন্তুক তোমার ভাই যদিল তোমাকে বিয়াও দিয়া দেয়।'

জরিনা বলে, 'হামি মরি যামো, তবু হামাক কাঁয়ো জোর করি বিয়াও দিবার পারবার নয়।'

হামেদ বলে, 'মোর ১ হাজার ট্যাকা প্রায় জমি গেছে। আগের গরু বেচা ট্যাকা কিছু আছে। আর কয় ট্যাকা লাগে? হয়া যাইবে রে।'

জরিনা বলে, না আগে গরুগাড়ি করিবেন। তারপর আসবেন। এখন যান। মুই তোমাক বিয়াও করি কি অমপুর শহরত যায়া এশকাঅ্যালার বউ হমো? আমি না হমো এশকাঅ্যালার বউ।'

হামেদ অভিমান করে বলে, 'ঠিক আছে মুই যাঁও।'

সে ভেবেছিল, জরিনা তাকে থাকতে বলবে। কিন্তু জরিনা বলে, 'আচ্ছা।'

হামেদ মন খারাপ করে বলে, 'ঠিকে আছে। তাই মুই যাইতোছোম। আর না আসিম। গরুগাড়ি চড়িয়া না আসিতে পারলে আর কোনো দিন না আসিম।'

ভাবি বলে, জরিনা, 'কেনে তুই চ্যাংড়াটাকে এত দুঃখু দিলু?'

জরিনা বলে, 'ভাইজানক তো তোমরা চেনেন। তাঁই কিছুতে এশকাঅ্যালার সাথত মোর বিয়াত মত দিবে না। গেলে আরো অপমান হইবে। সেইটা কি মুই সহ্য করবার পারলাম হয়? তাই ভাবি তাই...,' ভাবিকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদে জরিনা।

হামেদ গাড়িয়ালের মর্যাদাবোধে আঘাত লেগেছে। সে হামেদ গাড়িয়াল। এলাকার সবচেয়ে নামকরা গাড়িয়াল। গরুতে তার গাড়ি চালায়। সে কেন গাড়ি চালাবে।

রংপুর শহরের উপকণ্ঠ রামপুরায় ফিরেই গ্যারাজে চলে যায় হামেদ। রিকশা বুঝিয়ে দেয় মহাজনকে।

বলে, মহাজন, তোমার এশকা তোমরা বুঝি নেন। মোর খুবে কমরত বিষ। ডাক্তারে মোকে এশকা না চালাবার কইছে। ইয়াকে মুই আর না চালাইম। ধরেন।

মহাজন বলে, 'তাইলে তুই কী করবু ঠিক করছিস?'

'দোকানত কাম নেমো।'

'পাছিস কাম?'

'পাই নাই। তোমার বগলত কোনো খবর থাকলে একনা কয়া দিয়েন।'

'আচ্ছা দেমো নে।'

কিন্তু সে কাজ জোগাড় করতে পারে না। বসেই বসেই তার দিন কাটে।

মজনু তাকে বলে, এশকা চালাবু না বঝুলাম কিন্তুক বেকার বসি থাকলে চলবে? আজাবাদশার ধনও বসি খাইলে ফুরায়।'

হামেদ বলে, 'মামু, তোমরা মোর লাগি কাম খুঁজি দেও।'

মজনু বলে, 'কইলে কি আর কাম পাওয়া যায়।'

'তোমরা ঠিকে পারেন।'

'যা তাইলে একবার বাজারত খয়বার মুন্সির গোলাত যা। ওমার তো বস্তা টানবার লেবার লাগে।'

হামেদ ওঠে, 'আচ্ছা, তাই যাওঁ।'

খয়বার মুন্সির গোলার উদ্দেশে রওনা দেয় হামেদ। একটা রিকশায় মাইক লাগিয়ে সিনেমার বিজ্ঞাপন প্রচারিত হচ্ছে। তার সামনে সামনে রিকশাটা চলে। একদল পিচ্চি রিকশার পেছনে পেছনে ছোটে। প্রিয় রংপুরবাসী, আগামী শুক্রবার থেকে শাপলা টকিজে সগৌরবে মুক্তি পাচ্ছে বাম্পার হিট ছবি *স্বামী কেন আসামী*। *স্বামী কেন আসামী*।

হামেদ ভাবে, তাই তো, স্বামী কেন আসামী।

১১

বোয়ালমারি গ্রামে রাস্তা পাকা হচ্ছে। এলজিডির প্রকল্প। রাস্তায় ইট বিছানো হচ্ছে। পিচঢালা চলছে। একজন কন্ট্রাক্টর মোটরসাইকেলে বসে কাজ দেখছে। তাকে গ্রামের মানুষজন শুধায়, 'আছছালামুআলায়কুম, বাহে তোমাকে তো চিনলাম না...'

কন্ট্রাক্টর প্যান্টের পেছনের পকেট থেকে চিরুনি বের করে বলে, 'আমি...এই তো মোকসেদপুর বাড়ি।'

'তোমরা কি বাহে এই কাজের ঠিকাদারি পাইছেন?'

'হ্যাঁ।'

'এই আস্তা কত দূর যাইবে?'

'এই নদীর ধার দিয়া যাইবে। বান্দের কামও হইবে, রাস্তার কামও হইবে। একবারে চলি যাইবে বুড়ির হাট...'

'ভালো...ভালো...'

পাশ দিয়ে জরিনা হেঁটে যাচ্ছে। তার হাতে একটা কাঁথার কাজ। সে ইদানীং নকশিকাঁথা সেলাই করছে। গ্রামে একটা মহিলা সমিতি হয়েছে। সেখানে কাজ জমা দিলে নগদ টাকা আসে।

ঠিকাদারের চোখ পড়ে জরিনার ওপরে। মেয়েটা তো বেশ ডাগর আছে। ঠিকাদার তারিফপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায়। তারপর হাঁক পাড়ে, 'সুপারভাইজার...'

একটা লোক গজ-ফিতা নিয়ে খুব তৎপরতা করছিল। সে ছুটে আসে। লোকটা বেজায় ফরসা আর বেজায় লম্বা। এবং খুবই হালকা-পাতলা। ঠিকাদার কালো কুচকুচে, গলায় তার মাফলার, চোখে সানগ্লাস।

সুপারভাইজার ছুটে আসে, 'ভাইজান...'

'মেয়েটা কে?'

'মনে হইতোছে আবদাল মিয়ার বোন।'

'ঠিক আছে। কাজ করো। কাজ করো।'

সুপারভাইজার বলে, 'এই লেবারেরা, কাম করো কাম করো।'

জরিনাদের বাড়ির সামনে ঠিকাদার যায় মোটরসাইকেল চালিয়ে। ভটভট শব্দ শুনে কয়েকটা পিচ্চি চলে আসে।

ঠিকাদার চ্যাংড়াপ্যাংড়াকে বলে, 'বাহে একনা পানি হইবে?'

একটা পিচ্চি দৌড়ে এক গেলাস পানি নিয়ে। মোটরসাইকেলের চালককে পানি খাওয়ানো গৌরবের কাজ।

তখন বের হয় জরিনা। সে পিচ্চিটাকে বলে, 'এই মানিক কী করিস রে?'

'ওমরা পানি খাবার চাইছে। পানি আনি দিলোম,' মানিক বলে।

জরিনা বলে, 'খালি পানি কাঁয়ো দেয়। খাড়া।'

জরিনা বাড়ির ভেতরে ঢুকে একটা বাটিতে দুটো খইয়ের মোয়া এনে মানিকের হাতে দেয়, বলে, 'টুলটা আগেয়া দে মানিক।'

'নেন, বসি খান।'

ঠিকাদার সানগ্লাসটা চোখ থেকে নামিয়ে বলে, 'আপনার আদব-কায়দা মাশাল্লা বড়ঘরের মেয়ের মতো। আমার নাম আনোয়ার। মোকসেদপুরের মিয়াবাড়ির ছেলে আমি। কন্ট্রাক্টরি করি। আবদাল ভাই নাই?'

জরিনা বলে, 'না ভাইজান তো বাড়িত নাই।'

কন্ট্রাক্টর বলে, 'ও। আচ্ছা আমি আসি।'

আনোয়ার ঠিকাদার বাড়ি গিয়েই সম্বন্ধ পাঠিয়ে দেয়।

রান্নাঘরের পিঁড়িতে বসে আবদাল ভাত খায়। ভাবি ভাত তুলে দেয়। ভাত খেতে খেতে জরিনার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে সে, 'জরিনার একটা প্রস্তাব আসছে। ছেলে খুব ভালো। মোকসেদপুরের মিয়াবাড়ির আনোয়ার। লেখাপড়া জানে। আয়-ওজগার ভালো।'

আবদালের বউ বলে, 'মোটরসাইকেল আছে। অত বড়ঘরত বোন বিয়া দিবেন? চলবার-ফিরবার পারিবেন?'

আবদাল বলে, 'হামার কথা না ভাবিয়া জরিনার কথা ভাবি। অঁয় যদিল ভাত-কাপড়ে সুখে থাকে।'

'কী জানি? উয়ার যে কী মত?'

'মাইয়ামানষের ফির মত কীরে? পাত্র অক দেখছে। পছন্দ হইছে। এলা বাড়ির লোকজন নিয়া আসি পাকা দেখা দেখবার চায়। দিন পাকা করবার চায়।'

'কয়দিন সবর করেন। তাড়াহুড়ার কী আছে?'

আবদালের বউ সোনিয়া ননদকে ডেকে বলে, 'ও জরিনা, তুই হামেদক একখান চিঠি লেখ। ক বলে তাড়াতাড়ি চলি আসবার। গণেশক দিয়া খবর দেমো।'

জরিনা বলে, 'আচ্ছা। দেমো।'

'না দেমো না। এলাই দে।'

জরিনা চিঠি লিখতে বসে। চিঠি নিয়ে গণেশ রংপুর যায়। চিঠি দেয় হামেদের হাতে।

হামেদ পড়ে।

গণেশ বলে, 'কী লেখছে বাহে চিটিত। মোক একেরে জরুরি পাঠে দিলে?'

হামেদ বলে, 'গণেশদা। ওমরা মোকে বাড়িত যাবার লেখছে। কইছে বলে তাড়াতাড়ি যায়া য্যান জরিনার বিয়াও ঠেকাই। মুই তো এর আগত একবার গেছনো। ওমরা হামাকে কইছে বলে নেজের গাড়ি না হইলে ওমরা মোকে পছন্দ করবার নোয়ায়। মোর আর অল্প কয় ট্যাকা বাকি। তা জোগাড় করিয়া মুই এলা যাইম নেজের গরুগাড়ি ধরিয়া। এলা মুই না যাইম। ওমাকে কবু বলে হামার আসতে আরো মাস তিন দেরি হইবে। মুই এলা যাবার না পারিম।'

হামেদ চোখ মোছে।

গণেশ গ্রামে ফিরে আসে। জরিনার সঙ্গে দেখা করে। বলে, 'হামেদ না আসিবে। তার ট্যাকা তো জোগাড় হয় নাই। কয় বলে ট্যাকা জোগাড় না করিয়া মুই বাড়িত না ফিরিম।

জরিনার মনের মধ্যে বলক আসে, টগবগ করে ফোটে বেদনা। যেন ভাওয়াইয়া গান বাজে তার সব ইন্দ্রিয় আচ্ছন্ন করে—

ও মোর বানিয়া বন্ধুরে
দিবার চায়া নাকের নোলক মোক
ছাড়িয়া গেলেন রে।

আবদাল বলে দিয়েছে, সামনের মাসে জরিনার বিয়ে। পাকা কথা হয়ে গেছে। ছেলেকে কিছু টাকা ডিমান্ড দিতে হবে। সে বেশি কিছু নয়। এমন শিক্ষিত বড়লোক ছেলে পাওয়া গেছে। এই সুযোগ কিছুতেই ছাড়া উচিত নয়।

হামেদ গিয়েছিল রংপুর শহরে। একটা আড়তে সে মজুরের কাজ করে। ফিরে এসে দেখে, তার ঘরের জায়গাটা ফাঁকা। ছাই পড়ে আছে। অর্ধদগ্ধ কিছু জিনিসপাতি। পানি দেওয়া হয়েছে, আশপাশে কাদা। এখনো ধোঁয়া উঠছে পোড়া কাঠকয়লা থেকে।

রংপুরের শহরতলি। হামেদের ঘর। সে ঘরে আগুন লাগে।

মজনু চুল ছেঁড়ে।

হামেদকে দেখে মজনু বলে, 'হামেদ রে এলা আলু রে। সর্বনাশ হয়া গেছে রে। তোর ঘর তো পুড়ি গেছে রে।'

হামেদ বলে, 'কও কী? মোর এত দিনের আশা-ভরসা, মোর এত দিনের জমান ট্যাকা।'

সে পাগল হয়ে যাবে। সে টাকা জমাচ্ছে গরু কিনবে বলে। তারপর গরুগাড়ি চালাবে। জরিনাকে বিয়ে করবে। এখন যদি তার টাকা সব পুড়ে যায়, তাহলে সে পাগল হয়ে যাবে। এ ছাড়া তার করবার আর কিছু থাকবে না।

সে দৌড়ে ঘরে যায়। গিয়ে দেখে খুঁটি নাই। তারপর একপাশে পোড়-অর্ধপোড়া খুঁটিগুলোর স্তূপ দেখে। সেখানে সে উন্মাদের মতো নিজের টাকাওয়ালা খুঁটি খুঁজতে থাকে। পায়ও। সে একটা দা তুলে নিয়ে খুঁটি কাটে। দেখে তার টাকা অক্ষত আছে।

হামেদ বলে, 'হালাল ট্যাকা মামু হালাল ট্যাকা। থাকপেই তো...মোর গরুগাড়ি কেনার ট্যাকা। মামু এ ট্যাকা আর মুই বাঁশের খুঁটিত না থোমো, তোমার কাছত থো। মুই আর সাত দিন বাদেই গ্রামত যামো। গরু কিনিয়া গরুগাড়ি চালামো। মোকে সাত দিন বাদে ট্যাকা দিমেন।

রংপুর শহর। শীতের রাত। ঘন কুয়াশা। কামিনী ফুলের ঘ্রাণ কুয়াশায় এসে ভর করেছে।

সোডিয়াম লাইটের হলুদ আলো রাজপথে। দুপাশে গাছগাছালি। একজন, দুজন পুলিশ ডিউটি করছে।

এক রিকশাওয়ালা রিকশায় যাত্রী নিয়ে যাচ্ছে। একজন ছিনতাইকারী ছুরি ধরে রিকশা থামায়। ভয়ে যাত্রী তার সবকিছু দিয়ে দেয়। ছিনতাইকারী মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যায়।

রিকশাওয়ালা পুলিশের কাছে যায়। যাত্রী পুলিশের কাছে অভিযোগ করে। এই সময় পুলিশের সামনে এসে পড়ে হামেদ।

পুলিশ ক্ষিপ্র তৎপরতায় ধরে ফেলে হামেদকে।

'এই নাম কী?'

'হামেদ।'



মামু এ ট্যাকা আর মুই বাঁশের খুঁটিত না থোমো

'করিস কী?'

'বাজারে চাউলের দোকানে কামলাগিরি করোম।'

'এত রাতে কই থাইকা আসা হচ্ছে?'

'আইতের বেলা স্টেশনত চায়ের দোকানে কাম করোম। বয়ের কাম।'

'চল শালা থানায়। সব থানাত বলবি।'

হামেদ বলে, 'স্যার, আমি গরিব মানুষ স্যার। আমাকে ছাড়েন স্যার।'

'তুই বেটা ছিনতাইকারী।'

স্যার, 'আমি কাম করি খাই স্যার। চলেন স্যার মোর চা দোকান দেখাই। মোর চাউলের গোডাউন দেখাই।'

'চল বেটা আগে থানায়। তারপর সব বের হবে।'

হামেদকে পুলিশ থানার মেঝেতে ছুড়ে ফেলে।

১২

ধুমধাম করে জরিনার বিয়ে হয়ে যায় আনোয়ারের সঙ্গে। জরিনার মত আছে না নাই তা কেউ জানতে চায় না।

কুড়ি হাজার টাকা ডিমান্ড। আবদাল বলে, 'অতো ট্যাকা কই পামো।'

'জমি বেচি দেন। তোমার তো জমি-জমা কম নাই।' আনোয়ারের বাবা বলে।

জরিনাকে শাশুড়ি খোঁটা দেয়। ছোটলোকের মাইয়া। চাষার মাইয়া। আদবকায়দা কিছু জানো? তোমার বাপক কও আগে কুড়ি হাজার টাকা দিতে। নাইলে এই বাড়িতে থাকার দরকার নাই তোমার। বাপের বাড়ি গিয়া থাকো। ট্যাকা জোগাড় হইলে খবর দিও।

জরিনা বলে, 'জে আম্মা, আমারে বাপের বাড়ি পাঠায় দেন। আমি ট্যাকা জোগাড় হইলে খবর দিমু।'

কয়েক দিন পরে শরীরে মারধরের দাগ নিয়ে জরিনা ফিরে আসে বাপের বাড়িতে।

আবদাল কোনো কথা বলতে পারে না। জমি বেচে কুড়ি হাজার টাকা দেবার প্রশ্নই আসে না। জরিনাও কিছু বলে না। ভাইয়ের ওপরে তার বড় অভিমান।

ঢাকায় গার্মেন্টসের কাজ করে দুই বোন। সোনা আর রুপা। জরিনার সঙ্গে প্রাইমারি স্কুলে পড়ত। ঢাকায় চাকরি করে, ভালো নাকি বেতন পায়। সোনা আর রুপা দুই বোন দেখা করতে আসে জরিনার সঙ্গে।

সোনা বলে, 'কোটে মোর সই জরিনা কোটে?'

রুপা বলে, 'ও জরিনারে দেখ কাঁয় আইছে।'

জরিনা দৌড়ে আসে। খুশি আর অবাক হয় তার ছোটবেলার দুই বন্ধুকে দেখে। বলে, 'সোনা, রুপা, হায় হায় তোমারগুলাকে তো পরির মতন নাগে। এত বাহারের কাপড়চোপড়! এত চুড়ি! তোমরা কি পরির টাকা পাইছেন?'

রুপা বলে, 'জরিনা রে, তুই কেমতন আছিস।'

জরিনা বলে, 'আছোম রে আছোম।'

সোনা বলে, 'ধর, তোর লাগিয়া চুড়ি আনছোম।'

সোনা চুড়ি বের করে দেয় ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে।

এরই মধ্যে গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা তাদের ঘিরে ধরে। তারা ভীষণ অবাক হয়েছে দুই বোনের সাজসজ্জা দেখে, কথাবার্তা শুনে।

জরিনা বলে, 'ঢাকা শহরত নাকি খালি ট্যাকা উড়ি বেড়ায়? তোমাক দেখি মনে হইতোছে কথা ঠিক।'

সোনা বলে, 'কথা ঠিক নয়। আকাশত ট্যাকা থাকে না। ট্যাকা থাকে বড়লোকঘরে পকেটত। হামার গার্মেন্টিসের মালিকের মেলা ট্যাকা। তাই ওমরা গার্মেন্টিস বানাইছে। হামার মতন মাইয়া লোক আবার বেটা ছাওয়া সবাক চাকরি দিছে। হামরা সেলাই করি দেঁও। আর বেতন পাঁও। আর ওমরা কাপড় বিদেশত পাঠি দিয়া ফির মেলা ট্যাকা পায়।'

জরিনা বলে, 'এ তোরা কয় ট্যাকা বেতন পাইস রে।'

রুপা বলে, 'তাক তো কওয়া যাবা নয়। ধর হাজার ট্যাকা।'

জরিনা বলে, 'তোরা কি অটে কোনা সেলাই করিস। সেগলা জামা শার্ট কোটে যায়।'

সোনা বলে, 'বিদেশ যায়। বিদেশি সাহেবরা তো কাপড় বানাবার পারে না। হামরা বানে দেই ওমরা পরে।'

'জরিনা, তুই কত শুকি গেছিস, এটে কোনা কত অভাব।

তুইও চল হামার সাথত গারমেন্টত, তোকও এলা চাকরি জোগাড় করি দেমো।' রুপা বলে।

'মুই যায়া থাকিম কোটে?'

সোনা বলে, 'হামার ঘরত থাকবু। হামরা ঘর ভাড়া করি থাকি না!'

রুপা বলে, 'চল জরিনা, সেনেমা দেখবার পারবু।'

সোনা বলে, 'মাথার চুলত তুই কি মাখিস? সাবান। হামরা মাখি শ্যাম্পু। মুখত তুই কী মাখিস? স্নো। হামরা মাখি ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি।'

রুপা বলে, 'এ জরিনা, হামরা এ শুক্কুরবারের পরের শুক্কুরবার ঢাকাত চলি যামো, তুই রেডি হয়া থাক। ঠিক আছে?'

জরিনা কয়, 'দেখোম, ভাবনাচিন্তা করি দেখোম।'

এর মধ্যে খবর আসে, আনোয়ার আরেকটা বিয়ে করতে যাচ্ছে। শুনে জরিনা মনস্থির করে, সে ঢাকা চলে যাবে। গার্মেন্টসের কাজ করবে।

১৩

হাটবার হাট বসেছে। হাটে হইচই লেগে গেছে। বাইরে কয়েকজনের গলা শুনে একজন জানতে চায়, 'কী হইছে বাহে কী হইছে?'

'আরে বাহে হামেদ গাড়িয়াল নয়া গাড়ি ধরি আসতোছে। দেখো দেখো গাড়িয়ালের রাজা আইসে।'

গ্রামের মানুষ অবাক হয়ে দেখে নতুন গাড়ি নতুন গরু নিয়ে হামেদ গাড়িয়াল আসে। সে গান ধরে—

বাউকুণ্ঠা বাতাস যেমন ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরে হে
ওরে সেই মতন মোর গাড়ির চাকা পন্থে পন্থে ঘোরে রে
ওকি গাড়িয়াল মুই চলং রাজপন্থে

বাচ্চা ছেলের দল তার গাড়ির পেছনে পেছনে ছোটে।

জরিনাদের বাড়ির সামনে গাড়ি নিয়ে যায় হামেদ। চিৎকার করে, 'ও ভাবি সকল, ও আমার রসিয়া ভাবিরা, কোটে গেইলেন সোগ...আইসেন, দেখেন কেমন গাড়ি ধরি আসছোম...'

দুই ভাবি আসে। বড় ভাবি বলে, 'গাড়িয়ালের বেটা তোমরা আসছেন? বইসেন। গুড়মুড়ি দেওঁ, খান।'

হামেদ বলে, 'গরু দুকনা কেমন হইছে ভাবি তাক যে তোমরা কইলেন না।'

ছোট ভাবি বলে, 'ভালো হইছে ভাই, সোন্দর হইছে...তোমরা কিনছেন...তোমরা কি খারাপ জিনিস কেনমেন?'

হামেদ বলে, 'তা ভাবি সকল, জরিনা কোটে। তাকে যে দেখোম না।'

বড় ভাবি বলে, 'তোমরা খবর জানেন না। জরিনা তো নাই।'

হামেদ বলে, 'নাই মানে।'

ছোট ভাবি বলে, 'নাই মানে এটে কোনা নাই।'

হামেদ বলে, 'কোটে গেইছে? বিয়াও হয়া গেইছে?'

বড় ভাবি বলে, 'বিয়া হইছিল। সেই বিয়া তো টেকে নাই। ভাই অঁয় গেছে ঢাকাত। গারমেন্ট না কি কয় সেই চাকরি নিয়া। ক্যানে তোমরা জানেন না।'

হামেদ বলে, 'না তো। জানোম না।'

বড় ভাবি বলে, 'আসপে তো। দুই মাস পর অঁয় আসবে। চিঠি লেখছে। তোমরা আছলেন না, অঁয় চিঠি লেখল তাও তোমরা আসলেন না। তখন তোমার ভাই বিয়ার লাগি খুব চাপাচাপি করল, বিয়া হয়া গেইল। তারপর শাশুড়ি অত্যাচার করে। ডিমান্ডের ট্যাকা চায়। পরে খেদি দিল। এই বাড়িতে আসি উঠল। তখন অঁয় কয় বলে মুই ঢাকাত যামো। ঢাকাত চলি গেল।'

হামেদ বলে, 'মোকে পুলিশে ধরছিল ভাবি। জেলত নিছিল। এত দিনে ছাড়া পাইনো। ছাড়া পাইয়াই চলি আসছি। ট্যাকা খরচ করলে জেল হইত না। কিন্তু মুই তো গরু কিনিম, গাড়ি কিনিম, তাই ট্যাকা জমি থুইছোম। যাই ভাবি।'

নিজের বাড়িতে গাড়ি চালিয়ে যায় হামেদ। তার গাড়ির আওয়াজ পেয়ে তার মা বাইরে আসে।

মা বলে, 'হামেদ তুই আসছিস মুই গাড়ির আওয়াজ শুনিয়ায় বুঝছোম এ হামেদ ছাড়া আর কাঁয়ো নয়। আয় বাপো। আয়। গাড়িয়ালের বাড়ি। গাড়ি ছাড়া কি মানায়? আয়।'

বড় ভাই বেরিয়ে আসে।

আবেদ বলে, 'আয় হামেদ আয়। কোটে আছলু, কেমতন আছলু, হামরা তো চিন্তায় চিন্তায় মরি যাই। গাড়ি কিনি ধরি আসলু।'

হামেদ গাড়ি দাঁড় করায়। গরুগুলোকে ছাড়ায়। বলে, 'হয়। ভালা হইছে না?'

আবেদ বলে, 'হইছে। কিন্তুক নয়া ঘাটা হইছে। নদীত বান্ধ হইছে। এলা তো আর গরু-গাড়ির কদর নাই। এশকা ভ্যান হইছে না মেলা। ভটভটি হইছে। কাঁয়ো আর গরুগাড়িত না চড়ে।'

হামেদ বলে, 'হোক। কিন্তুক হামেদ গাড়িয়ালের কদর ঠিকে হইবে। দেইকেন।'

আবেদ বলে, 'তা হবার পারে।'

জরিনা ঢাকা শহরে গার্মেন্টসে চাকরি নিয়েছে। প্রথম মাসে কোনো বেতন পায় নাই। শুধু কাজ শিখেছে। দ্বিতীয় মাস থেকে সে বেতন পেতে শুরু করেছে। দিনের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে তাদের শিফট শুরু হয়। শেষ হয় সন্ধ্যার পর। ওভারটাইম পায় তারা। সন্ধ্যার পর একসঙ্গে হাঁসের পালের মতো কলকল করতে করতে তারা তাদের বস্তিঘরে ফেরে। সোনা, রুপা রাস্তাঘাট ভালো চেনে। জরিনা তাদের সঙ্গ নেয়।

ঘরে ফিরে সে বাড়ির জন্য কাঁদে। খুব মন খারাপ হলে একটা পুরোনো গামছা বের করে। সেটা ধরে থাকে। তার মনে গান বাজে—

ওকি গাড়িয়াল ভাই
কত রব আমি পন্থের দিকে চায়া রে।

গ্রামে নিজের ঘরে শুয়ে আছে হামেদ।

মা বকছে, 'এত বড় জোয়ান মানষক কি বসি বসি খিলান যায়। গরু দুটাকে বা কী খিলায়? ক্যানে তোমরা সাহেব হয়া আসছেন। কোনো কাম করবার পারেন না। ভ্যান চালাবার পারেন না।'

হামেদ উঠে বসে। বলে, 'মাও, মোকে সোগ কাজ করবার কন। ভ্যান চালাবার না কইবেন। মুই হইনো গাড়িয়ালের আজা। মুই ক্যানে ভ্যান চালাইম।'

মা বলে, 'তাইলে না খায়া থাকো। আইজ আর ভাত নাই।'

সত্যি সত্যি রাতে ভাত রাঁধে না মা।

হামেদ সেটা ভুলে গেছল। ভীষণ খিদা নিয়ে যখন সে বলে, 'মাও ভাত দেও, মা তখন বলে, ভাত তো আন্দি নাই বাপ।'

রাগ করে নিজের ব্যাগটা গুছিয়ে নিয়ে হনহন করে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায় হামেদ। সোজা চলে যায় পাকা রাস্তায়। একটা টেম্পোতে উঠে বাসস্ট্যান্ড। সেখানে পেয়ে যায় ঢাকার বাস। আরও আরও কিষানের সঙ্গে বাসের ছাদে উঠে বসে। ১০০ টাকা ভাড়ায় তার ঢাকা যাওয়ার ব্যবস্থা হয়।

১৪

ঢাকায় হামেদ আসে ঝোঁকের মাথায়। কোনো ঠিকানাও আনে নাই। ঢাকায় এসে সে অন্য কিষানদের পেছনে পেছনে একটা বস্তিতে এসে আশ্রয় নেয়। এখানকার লোকেরা কেউ রাজমিস্ত্রির কাজ জানে। কেউ জানে ইলেকট্রিক লাইনের কাজ। হামেদ তো আর কিছু জানে না। একটাই কাজ তার জানা, রিকশা চালানো।

দু-চার দিন অন্য কাজ খুঁজে অবশেষে সে রিকশা নিয়েই বের হয়। ঢাকার রিকশাভাড়া তাকে বিস্মিত করে। এ তো সোনার খনি। চালালেই টাকা।

ঢাকা শহরে ভালোই আছে হামেদ। রায়েরবাজার বস্তিতে থাকে। রায়েরবাজার গ্যারেজের রিকশা চালায়। রোজ তার ৫০০ টাকা জমা হয়।

একদিন রিকশা চালাতে চালাতে তার সঙ্গে দেখা হয় তাদের এলাকার এক লোকের সঙ্গে। একেবারে পাশের গ্রামের ছেলে। রতন। কাজ করে গার্মেন্টসে। তার মুখেই সে শোনে, জরিনা ঢাকা শহরেই আছে। জরিনার বস্তিঘরের ঠিকানা নেয় রতনের কাছ থেকে।

একদিন সে হাজির হয় জরিনার ঘরে। তখন রাত বাজে নয়টা। জরিনা একটু আগে এসেছে কারখানা থেকে। এখন তারা রান্না করছে।

জরিনার ঘরের সামনে আসে হামেদ।

গলা খাঁকারি দেয়। তারপর ডাকে। 'জরিনা আছো, জরিনা।'

জরিনা বের হয়। সামনে হামেদকে দেখে কেঁদে ফেলে। রাস্তার আলোয় জরিনার চোখের জল টলমল করে।

জরিনা বলে, 'গাড়িয়াল আসছেন। কত দিন পর আসলেন। তোমরা কেমন মানুষ কন তো মুই বাঁচি আছোম নাকি মরি গেছম তোমরা এনা খোঁজ না নিলেন।'

হামেদ বলে, 'তোমরা কইছেন, এশকাঅ্যালার সাথে তোমরা দেখা না করিমেন। তাই মুই আর দেখা করোম নাই। নেজের গরুগাড়ি চড়িয়া তোমার সাথত দেখা করমো এই হইলে মোর পণ। জরিনা রে, মুই নেজের গাড়ি করছোম। গরু কিনছোম।'

জরিনা বলে, 'ভালা করছেন।'

'তোমরা খুশি হন নাই? এত বড় একটা খবর শুনি তোমরা খুশি হন নাই?'

জরিনা মাথা নিচু করে বলে, 'হইছোম।'

হামেদ বলে, 'তোমরা কি আর মোকে মনে থোন নাই?'

'দেখেন এটা কী?'

জরিনা তার ট্রাঙ্ক থেকে গামছা বের করে এনে মেলে ধরে। বলে, 'এই গামছা ধরি তো এত দিন আছোম গড়িয়াল। নাইলে কি আর বাঁচি থাকি।'

হামেদ বলে, 'চলো তোমরা ফির হামার গাঁত চলি যাই। গাড়ি চালামো। ভালো থাকমো।'

'গাড়িতে ওজগার ভালো হয়?'

'না তা হয় না। দুই মাস একটাও খ্যাপ পাঁও নাই।'

'তাইলে আর ক্যান যাইমেন গাঁত। এটেকোনায় থাকো।'

'এটে কোনা মুই কী করিম।'

'একশা চালাবেন।'

হামেদ অবাক হয়, 'এশকা? তুই না এশকা দেখবার পারিস না।'

জরিনা বলে, 'আগে পারতাম না। এখন পারি।'

জরিনা নির্লিপ্ত, হামেদের ভেতরে ভাঙচুর, উথালপাথাল; কী বলছে জরিনা, সে যদি রিকশা মেনে নিতেই পারে, তাহলে আগে পারল না কেন। যখন সে গিয়েছিল জরিনার কাছে, তখন যদি সে রাজি হতো, তাহলে আজকে এতটা ঘুরপথে বাউকুণ্ঠা বাতাসের মতো ঘুরতে হতো না তাকে! হামেদ দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

জরিনা চুলের খোঁপা খুলে আবার বাঁধে।

হামেদ বলে, 'আজকা যাই। ওই বড় আস্তার ওই পারে বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধর ওই পাশে হামার অমপুরের বুদুমিয়ার বস্তিঘরত উঠছোম। তাড়াতাড়ি না গেলে ওমরা ফির চিন্তা করবে।'

'না, না, কিসের চিন্তা। ভাত চড়াছোম। ভাত খায়া যান। হামার দুই সখীর সাথত পরিচয় করায়া দেমো। সোনা আর রুপা। থাকেন তো।'

হামেদ ঘরের ভেতরে বসে।

সোনা রুপার সঙ্গে পরিচিত হয়। একসঙ্গে তারা ভাত খায়।

খাওয়ার পরে চারজন মিলে থালাবাসন বাজিয়ে গান ধরে—

ও কী ও বন্ধু কাজল ভ্রমরারে
কোন দিন আসিবেন বন্ধু কয়া যাও কয়া যাও রে।।

যদি বন্ধু যাবার চাও
ঘাড়ের গামছা থুইয়া যাও রে
বন্ধু কাজল ভ্রমরারে
কোন দিন আসিবেন বন্ধু কয়া যাও কয়া যাও রে

বটবৃক্ষের ছায়া যেমন রে
মোর বন্ধুর মায়া তেমন রে।
বন্ধুরে, বন্ধুরে, বন্ধুরে।
বন্ধু কাজল ভ্রমরারে
কোন দিন আসিবেন বন্ধু কয়া যাও কয়া যাও রে

আবার আসবে সে। আর কোনো দুশ্চিন্তা নাই। তার জরিনাকে সে খুঁজে পেয়েছে। জরিনার এখন রিকশাওয়ালাকে গ্রহণ করতে আপত্তি নাই।

ঢাকার রাস্তায় রিকশা চালায় হামেদ।

মিরপুর রোডে উঠেছে সে। এই রাস্তাটা কি ভিআইপি, এটা কি রিকশামুক্ত—হামেদ বোঝে না। মাঝেমধ্যে সে দেখে, এই রাস্তায় রিকশা চলছে। মাঝেমধ্যে দেখে চলছে না।

তার সামনে একটা রিকশা। পেছনে পেছনে সে চলছে। সামনে ট্রাফিক পুলিশ সামনের রিকশাটাকে আটকায়। বলে, 'এই ভিআইপি রোডে রিকশা আনছিস কেন। সে একটা ফোঁড় বের করে রিকশার টায়ার ফুটা করে।'

রিকশাওয়ালা বলে, 'ভিআইপি রোড মানে কী। দুই টাকা দিলে তো সব রোডই রিকশাঅ্যালার রোড। ক্যান খালি খালি চাকাটা ফুটা করলেন।'

'ও ফকিরনির পুত। তর্ক করিস কেন।'

'আমি ফকিরনির পুত। আপনে কি জমিদারের পোলা। আপনের মা জমিদারের বিছানাত যাইত। গিয়া হুইত।'

ট্রাফিক পুলিশ পেটাতে থাকে রিকশাওয়ালাটাকে। আকাশে গনগন করে চৈত্রের সূর্য। সূর্য যেন নেমে এসেছে পিচঢালা পথে।

সূর্য নেমে এসেছে ট্রাফিক পুলিশের মেজাজে। কী মার। কী মার।

হামেদের চোখে সূর্যের আলো পড়ে। তার চোখ ধাঁধিয়ে যায়। সে দেখতে পায়, এক লক্ষ সূর্য সামনের রিকশার ঘন্টিতে বাড়ি খাচ্ছে। ঘন্টি বাজছে। ঘন্টি বাজছে। সে দেখতে পায়, তাদের বোয়ালমারি গ্রামের রাস্তায় ব্যাপারীর ধান নিয়ে যাচ্ছে একটা গরুগাড়ি। সেই গরুটাকে পেটাচ্ছে সামনের গাড়ির গাড়িয়াল। গরুর পিঠে পেন্টির দাগ।

ট্রাফিক পুলিশটা তখনো রুলারের বাড়ি মারছে রিকশাওয়ালার পিঠে। ❦



গল্প



সচিত্রকরণ : চন্দ্রশেখর দে

সুমন রহমান

নীল হিজাব

সুখী পরিবারগুলো সব এক রকম, আর অসুখী পরিবারগুলো যার যার ধরনে আলাদা। কথাটা লিও তলস্তয় নামক এক রাশিয়ান লেখকের, ছাপোষা বিমা এজেন্ট আবুল বাশারের সেটা জানবার কথা নয়। কিন্তু ঘটনাচক্রে কথাটি সে কোটেশন আকারে শুনেছিল তার বনিয়াদি প্রশিক্ষণের তৃতীয় দিনে, আখলাক বিমা কোম্পানির ভাইস প্রেসিডেন্ট ইয়াজদানী স্যারের মুখে। কথাটা মনে ধরেছিল খুব, ডায়েরিতে টুকেও রেখেছিল। কিন্তু সে তো দু বছর আগের কথা। সেই ডায়েরি কোথায় হারিয়ে গেছে। কিন্তু কথাটা গেঁথে আছে বাশারের অবচেতনায়।

এ মুহূর্তে বাশারের সামনে যে মেয়েটি বসে আছে, সে সুখী না দুঃখী—তার ভেদবিচার তলস্তয় বা ইয়াজদানী স্যার



কেউই করতে পারত বলে মনে হয় না। একটি গাঢ় নীল হিজাবের বাইরে এক জোড়া অত্যন্ত আকর্ষণীয় চোখ ছাড়া আর কোনো ক্লু নাই এই মহিলাকে বুঝবার। মহিলাই সে, সাথে বাচ্চা। আট-দশ বছর বয়স হবে বাচ্চাটার। মায়াকাড়া মিষ্টি চেহারা। আপাতত শিশুটির দিকে মনোযোগ দিতে চাইল বাশার। তাতে মায়েরা খুশি হয়। কিন্তু এই মহিলা সেই ধাঁচেরও না। আবুল বাশারের বাড়ানো চকলেট মেয়েকে নিতে বারণ করল, বেশ রূঢ়ভাবেই।

ইয়াজদানী স্যার বনিয়াদি প্রশিক্ষণে অনেক মূল্যবান কথাবার্তা বলেছিলেন। বিমা ব্যবসায় কোনো দার্শনিকের পদ থাকলে তাঁকে সেটা অনায়াসেই দেওয়া যেত বলে মনে হয় বাশারের। সব দার্শনিকেরই কিছু না কিছু মুদ্রাদোষ আছে। ইয়াজদানী স্যারের মুদ্রাদোষ হলো, তিনি সুখ আর দুঃখের বাইনারিতে জগৎ ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে, সুখী মানুষেরা সুখের স্থায়িত্ব চায়। কিন্তু বিমাশিল্পের ক্লায়েন্ট হিসেবে এই গোষ্ঠী অত্যন্ত খারাপ। কারণ যারা সুখী মানুষ তারা সুচতুর, সতর্ক এবং যেনতেন প্রকারে মুনাফা ম্যাক্সিমাইজ করবার ব্যাপারে দক্ষ। এরা আদতে বিমাশিল্পের শত্রু। এদের মারফত বিমা কোম্পানির সর্বোচ্চ লস হওয়া সম্ভব।

পরিবার যত দুঃখী, ক্লায়েন্ট ততই অপ্রস্তুত, বিমাব্যবসার ততই রমরমা। সদ্য বিধবা, ডিভোর্সি, বিপত্নীক, সন্তানের খোরপোষে একা একা থাকা বৃদ্ধ বাবা কিংবা মা, উচ্চরক্তচাপের রোগী, স্বামী বিদেশে, পরনারীতে আসক্ত, সন্তান নেশা করে—এই-ই হলো বিমাশিল্পের জন্য আদর্শ পরিবারব্যবস্থা। বর্তমানের জীবন নানা দিক থেকে চেপেচুপে তাদের এমন ছিবড়া বানিয়ে দেয় যে সুখী ভবিষ্যতের সামনে যেকোনো ফ্যান্টাসিসমেত দাঁড়াতে দুবার ভাবে না তারা। শুধু যেকোনো উপায়ে স্বপ্নটা দৃশ্যমান করে দিতে পারলেই হলো। যেমন : ভাইবা দেখেন, আসা-যাওয়ার পথে যদি কোনোভাবে আপনি দুর্ঘটনায় বাম হাতের কনে আঙুলও হারান, কোম্পানি আপনাকে দেবে বিশ লাখ!

মাত্র একটা আঙুলের জন্য বিশ লাখ! বিশ লাখ টাকার সাথে এই যে আঙুলসমান দূরত্ব, তার উত্তেজনায়ই বিমাসনদ স্বাক্ষরিত হয়ে যায়। বাদবাকি যেসব শর্ত, পড়ার অযোগ্য ছোট ছোট হরফে লেখা, সেসব পড়ে দেখবার কোশেশ এদের কেউই করবে না। খালি বলবে, ভাই সাইন করে দিলাম, নিয়মকানুন কী লেখা আছে আপনি তো জানেনেই।

কিন্তু আজ বাশারের সামনে যে মহিলাটি বসে আছে, তাকে পরিষ্কারভাবে কোনো ক্যাটাগরিতে ফেলা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। এই নিয়ে তৃতীয়বার এসেছে। একটা পলিসি করতে চায়। তিনবারই বাচ্চাকে নিয়ে এসেছে। স্বামী একবারও আসেনি, এমনকি অফিসে বসেও কোনো দিন স্বামীকে ফোন দেয়নি। ফোন পায়ওনি। মাকে ফোন করেছে একবার। চাপা গলায় কথা বলেছিল। স্বামী বিদেশে, অথবা ডিভোর্সি—এই অনুমানের ওপর দাঁড়িয়ে তাকে সম্ভাব্য 'দুঃখী' ক্যাটাগরিতে ফেলবে, মনে মনে ঠিক করল বাশার। কিন্তু বাচ্চাটা এত কিউট! এমন ছটফটে সুন্দর বাচ্চা আশপাশে থাকলে দুঃখবোধ করা খুবই কঠিন।

> স্বামী আছে, বাচ্চা আছে, তবু নমিনি করেছে বোনকে। নির্ঘাত ফ্যামিলি ট্রাবল আছে!

হাসেম বিন আবদুল্লাহ একদৃষ্টে অনেকক্ষণ মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকলেন। নীল হিজাব পরা মেয়েটির চোখজোড়া তার স্মৃতির গহিনে কোথায় যেন উসকানি দিচ্ছে। এ রকমই এক জোড়া চোখের একটি বোরখা পরা মেয়ের সাথে তার টুকিটাকি কথা হতো প্রথম যৌবনে। দুয়েকটা চিঠিও চালাচালি হয়েছিল। সেসবের কাঁচামাল দিয়েই তিনি পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে প্রথম বই লিখলেন। বইয়ের নাম *বোরখা পরা মেয়ে*। কাভারে অবশ্য ছাপা হয়েছিল *বোরখা পড়া মেয়ে*। হাসেম সে সময় প্রুফ রিডার ছিলেন, ফলে এই ভুল তার দারুণ মর্মপীড়ার কারণ হয়েছিল। বউয়ের গয়না বেচে বইটা ছাপিয়েছিলেন তিনি। কাভারটা ছাপা হওয়ার সময় আবার ব্রংকাইটিসের কারণে হাসপাতালেও ভর্তি ছিলেন। সেই অবকাশে বীণা আর্ট প্রেসের কম্পোজিটর আলী আহমেদ ওস্তাদি করে বানানটা এমন করে দিয়েছিল। কাভারটা আরেকবার ছাপানোর পয়সা ছিল না। যে কারণে ভুল শিরোনামেই বের হয়েছিল তার পয়লা বই। তিরিশ বছর আগের কথা। কিন্তু সেই বইয়ের কাটতি হয়েছিল অনেক। ফলে পরের সংস্করণে বানান ঠিক করে দিতে পেরেছিলেন তিনি। এই বইয়ের সুবাদে লেখক হিসেবে হাসেম বিন আবদুল্লাহর বেশ পসার হলো। আরও বই লিখতে থাকলেন তিনি। পয়সাও আসতে থাকল। প্রুফ রিডারের চাকরি ছেড়ে একসময় বইয়ের দোকান দিলেন। একটা প্রেসও দিলেন, অবশ্য ক্রমাগত লস খাওয়ায় বছর পাঁচেক পর বেচে দিয়েছিলেন। এখন দোকান চালায় বড় ছেলে, তিনিও মাঝে মাঝে বসেন। এই মেয়েটিকে তিনি আগে কোথাও দেখেননি এটা নিশ্চিত।

চাচা, *খুন রাঙা পথ* বইটা কি আছে? নসীম হিজাযীর লেখা।

না। শেষ হয়া গেছে। নসীম হিজাযীর অন্য কিতাব আছে। *শেষ প্রান্তর*। দিব?

না। ওইটা আমার আছে। *খুন রাঙা পথই* লাগবে।

পথে খুন থাকা তো ভালো জিনিস না।

কী থাকা ভালো?

ঘাস থাকা ভালো। খোদার নেয়ামত। আচ্ছা, তুমি কি *বোরখা পরা মেয়ে* কিতাবটা পড়েছ?

মেয়েটি কতক্ষণ চুপ থাকল। স্পষ্টতই আহত হয়েছে। সাথের বাচ্চাটা সম্ভবত আইসক্রিমের বায়না ধরেছে। তাকে চুপ করতে বলল।

এখন যে হিজাবের যুগ, চাচা। বোরখা দিয়া কী হবে?

দুইটাই তো পর্দা, মা। একটা ঢাকবার পর্দা, অন্যটা দেখানোর।

এবার হাসেম বিন আবদুল্লাহর রুষ্ট হওয়াও মেয়েটির নজর এড়াল না।

রাগ করলেন? মজা করলাম, চাচা। *বোরখা পরা মেয়ে* পড়ছি অনেক আগে। ভালো লাগছিল। হাসেম বিন আবদুল্লাহর আরও অনেকগুলা বই পড়ছি ছোটবেলায়। *ফুটন্ত গোলাপ, পথহারা পাখি, বেহেশতের সুবাস, সুবেহ সাদেক*। আরও দুয়েকটা, নাম মনে নাই।

মরু প্রান্তর পড়ছ? যে ফুল না ফুটিতে? প্রেমের অভিশাপ?

প্রথমটা পড়ছি। বাকি দুইটা পড়ি নাই।

আমি তোমাকে দিতেছি। পয়সা লাগবে না। উপহার। আমার নামই হাসেম বিন আবদুল্লাহ। এসব কিতাব আমিই লিখছিলাম। জোয়ান বয়সে। এই দোকানটাও আমার। চালায় আমার

ছেলে। লেখার মুড না থাকলে মাঝে মাঝে বসি।

চাচা, একটা প্রশ্ন করি, কিছু মনে না নিলে?

করো করো।

বোরখা পরা মেয়ে বইয়ে ফাতেমারে মাইরা ফেললেন ক্যান?

সবই আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা।

পড়তে পড়তে অনেক কানছি। আপনারে মনে মনে অনেক বদদোয়া দিছি। সে তো প্রতিবাদ করতে পারত। স্বামীকে তালাক দিতে পারত।

প্রতিবাদ করলে তুমি আমারে বদদোয়া দিতা না। চোখের পানি ফেলতা না। ভুইলা যাইতা, তাই না?

তাও তো সে বাঁইচা যাইত।

হাসেম বিন আবদুল্লাহ হাসেন। নীল হিজাব পরা রাগী রাগী চেহারার মেয়েটাকে তার ভালোই লাগছে।

তোমার নাম কি, মা?

ফাতেমা। আপনি আমারেই মাইরা ফেলছেন। আমি এখন একটা জিন্দা লাশ।

বই যারা লেখে সবাই লাশের কারবারি। মুর্দাফরাশ।

অনেক রাগ দেখায়ে ফেললাম, চাচা। খোদার কাছে মাফ চাইয়া নিমু। আপনেও মাফ কইরা দিয়েন।

মেয়েটি হুটহাট করে চলে গেল। প্রসন্ন হাসেম একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন। অন্য রকম রক্ত চলাচল টের পাচ্ছেন তিনি বহুদিন পর শিরার ভেতর। লেখকের রক্ত আবার সচল হয়ে উঠল নাকি? *বোরখা পরা মেয়ে* পার্ট টু বাইর করবার জন্য কত লোকে বলেছে। হাসেমের বড় ছেলে তুষার বিন আবদুল্লাহও অনেক গাঁইগুই করেছে। বলেছে, বাবা অনেক দিন তোমার কোনো কিতাব নাই। *বোরখা পরা মেয়ের* পার্ট টু লেখ। অনেক কাটতি হবে। লোকে খোঁজে। হাসেম রাজি হননি। *বোরখা পরা মেয়ে* তার পয়লা কিতাব। পয়লা সন্তানের চেয়েও বেশি দরদের। এটার স্মৃতি তিনি নষ্ট করতে চান না। বরং পয়লা সন্তানটার প্রতি হাসেমের তেমন কোনো দরদ নাই। লোভী কিসিমের ছাওয়াল, খালি টাকাপয়সার জন্য ছোঁক ছোঁক করে।

আজকে, মেয়েটির চলে যাওয়া দেখতে দেখতে হাসেম সিদ্ধান্ত নিলেন, *বোরখা পরা মেয়ে* পার্ট টু লিখবেন। নাম দেবেন, *নীল হিজাব*। টাইটেলের নিচে ছোট করে লেখা থাকবে 'বোরখা পরা মেয়ের দ্বিতীয় ভাগ'।

ওই কিতাবেও নায়িকার নাম ফাতেমা থাকবে। তবে ওই ফাতেমা বয়সে বড়, আধুনিক, হিজাব পরে। হিজাব জিনিসটা তাকে টানে না,



দেখানেপনা লাগে। তবু এটাকে মেনে নিতে হবে। নতুন যুগের রুচি। বইতে মেয়েটার একটা ছোট বাচ্চাও থাকবে। এই বাচ্চাটার মতোই। মিষ্টি। তবে এতটা দুষ্টু না। মেয়ে বাচ্চা শান্ত হওয়া ভালো। বাচ্চাটাও মাথায় স্কার্ফ পরবে। নামাজ পড়ে দুহাত তুলে সুন্দর করে মোনাজাত করবে। আর বড় বড় চোখ দিয়ে ড্যাব ড্যাব করে দেখবে দুনিয়া।

ছবি আর ভোটার আইডি নিয়ে এসেছেন?

মাথা নাড়ল হিজাবি মেয়ে। এনেছে। আইডির সুবাদে বাশার এখন তার নাম জেনেছে। রোকসানা বেগম।

পলিসি চলাকালীন মৃত্যু হইলে বিমার পুরা টাকা নমিনি পাবে, তাই না?

অবশ্যই।

যদি দুর্ঘটনায় মরে?

দুর্ঘটনার জন্যই তো এই বিমা লোকে করে, আপা।

যদি অন্য রকম কিছু হয়। ধরেন, আত্মহত্যা?

আমাদের পলিসিতে আত্মহত্যায় পলিসি নষ্ট হয় না। নমিনি বিমার টাকা পেয়ে যান। তবে কিছু টাকা কম পান আরকি।

কত কম?

এই হিসাবটা একটু করে বলতে হবে। কিন্তু আত্মহত্যার হিসাব কেন আপা? আত্মহত্যা করবেন নাকি?

করতেও তো পারি।

রোকসানার চোখে কৌতুক। বাশার হাসে। আবার পড়তে থাকে। নমিনির ঘরে এবার চোখ আটকে যায়। বোনকে নমিনি করেছে রোকসানা।

সবাই অবশ্য সন্তান না হয় স্বামীকে নমিনি করে।

আমি না হয় মায়ের পেটের বোনকে করলাম।

আপনার ব্যাপার আপনি ভালো বুঝবেন। লতিফা মঞ্জিলে থাকেন আপনি? পাশের সালাম মেম্বারের বাড়ির শেষ মাথায় ইসহাক মঞ্জিলের নিচতলায় আমি ভাড়া থাকি। মেসে।

রোকসানার ভ্রু কিছু কোঁচকাল। একটু থেমে থেকে জিজ্ঞেস করল :

দেশ কোথায় আপনার?

কুমিল্লা।

ইসহাক মঞ্জিলে কত দিন আছেন?

গত মাসে উঠেছি। গত মাসেই কোম্পানি এখানে বদলি করছে। আগে চালাকচর ছিলাম।

বদলি করল কেন? কাজকাম ঠিকঠাক করতে পারেন না বলে?

রোকসানা এখন স্পষ্টতই কৌতুক করছে। বাশার হাসল।

জি না। বিমার চাকরিতে ঘন ঘন বদলি উন্নতির লক্ষণ।

তাই নাকি? কেন?

আরেক দিন বলব, আপা।

আরেক দিন আর কী কী বলবেন?

বাশার থতমত খায়। বলে, না, তেমন কিছু না। এইটাই বলব।

আরেক দিন আপনার সাথে কেন দেখা হবে? ধান্দা কী?

রোকসানা অদ্ভুতভাবে হাসে।

ধান্দা তো এইটাই আপা। প্রিমিয়াম জমা দিতে আসবেন না? তখন দেখা হবে।

আমি ছয় মাসের প্রিমিয়াম আজকেই জমা দিয়ে যাইতেছি।

তাহলে ছয় মাস পর আসবেন। তখন বলব।

তখন অন্য কেউ হয়তো আসবে। তারে বলে দিয়েন। আমি জাইনা যাব। বলবেন তো?

জি না আপা। এটা শুধু আপনারেই বলা যাবে।

আইচ্ছা তাইলে পরকালে যদি দেখা হয় তখন বইলেন।

ইহকালে আর দেখা হবে না, আপা?

কেমনে হবে? আপনার না ঘন ঘন বদলির চাকরি।

বাশার কথা খুঁজে না পেয়ে বোকার মতো হাসে। খানিক পর বিমার কাগজপত্র নিয়ে বাচ্চাসহ রোকসানা চলে যায়। বাম হাতে বাচ্চাকে বেশ টাইট করে ধরে রেখে রোকসানার এই চলে যাওয়া বাশারকে বিস্তর ভাবায়। কেমন একটা অধরা ব্যাপার আছে এই হিজাবি মহিলার মধ্যে। স্বামী আছে, বাচ্চা আছে, তবু নমিনি করেছে বোনকে। নির্ঘাত ফ্যামিলি ট্রাবল আছে! অবশ্য তাতে বাশারের ব্যবসার পোয়া বারো। পরিবার যত দুঃখী, বিমা এজেন্টের তত রমরমা। দুইভাবে। প্রথমত, দুঃখী পরিবার খারাপ পলিসিগুলো খায়। দ্বিতীয়ত, তারা প্রিমিয়াম নিয়মিত পরিশোধ করতে পারে না। প্রিমিয়াম নিয়মিত জমা না দিলে বিমার কাগজে ছোট ছোট হরফে লেখা চুক্তি মোতাবেক পলিসি বাতিল হয়ে যায়। এজেন্টের কাজ হলো বাতিল হয়ে যাওয়া পলিসি সম্পর্কে ক্লায়েন্টকে ঘুণাক্ষরেও টের পেতে না দেওয়া। ফলে বাতিল পলিসির তলাবিহীন ঝুড়িতে ক্লায়েন্ট প্রিমিয়াম ঢালতেই থাকে, বছরের পর বছর। তা দিয়ে বসের বাড়িগাড়ি হয়, বাশারের বোনাস হয়, শেয়ারবাজারে কোম্পানির প্রোফাইল বাড়ে।

ফলে, বাশার আসলে কোনো দিনই রোকসানাকে বলতে পারবে না কীভাবে ঘন ঘন বদলি বিমাব্যবসায় উন্নতির সূচক। যখনই কোনো এজেন্টের প্রচুর পরিমাণ 'দুঃখী' ক্লায়েন্ট হয়ে যায়, এর অর্থ এদের বেশির ভাগ কোনো না কোনো জটিলতায় পলিসি ক্যানসেল হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে থাকবে। পরিচিত এজেন্ট হাজির নাজির থাকলে জটিলতার নিরসন হয়ে যাওয়া সম্ভব। তাতে কোম্পানির লস। বরং পুরোনো এজেন্ট বদলি হয়ে গেলে, নতুন এজেন্টের সাথে যোগাযোগ তৈরি হতে হতে বাতিল হয়ে যাওয়া পলিসিতে আরও কিছু অফেরতযোগ্য প্রিমিয়াম জমা হয়ে যাবে। এভাবেই বলেছিলেন ইয়াজদানী স্যার। বনিয়াদি প্রশিক্ষণে।

প্রমোশন নিয়ে ডিসেম্বরে বাশার কটিয়াদী থেকে আখাউড়া বদলি হয়ে যায়। রোকসানা, তার স্বামী এবং সন্তান, কটিয়াদীর লতিফা মঞ্জিল জাতীয় পর্যায়ে সংবাদের শিরোনাম হয় এর তিন মাস পর। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝিতে। ওই যে, কটিয়াদীর একটি জঙ্গি পরিবারকে দুদিন ঘিরে রাখল হাজারখানেক পুলিশ। বারবার আত্মসমর্পণ করার জন্য মাইকিং করল। মেয়ের মাকে দিয়ে। ছেলের চাচাকে দিয়ে। তারপর জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পুলিশের সোয়াট টিম গিয়ে ভবনের অন্য বাসিন্দাদের বের করে আনল। পুরো পরিবারটি শরীরে বোমা বেঁধে বসে ছিল, দুদিনের মাথায় সেই বোমা ফাটিয়ে আত্মঘাতী হয়ে গেল তারা। একটি পুরুষ, একটি নারী, একটি বাচ্চা। বাচ্চাটা পাড়ার স্কুলে ক্লাস ফোরে পড়ত। অভিযানের সময় পুলিশের সোয়াট টিমের সার্জেন্ট রফিক খুব কাছ থেকে ওদের দেখেছিল। সে দেখেছে, বোমা ফাটানোর আগে স্বামী আর স্ত্রী দুজনেই সন্তানকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়েছিল। বোমা ফাটবার আগে তারা হাত ধরাধরি করে জড়াজড়ি করে জোরে জোরে কী যেন বলছিল।

অন্য সবার মতো বাশারও পুরো ঘটনাটি ফলো করেছে টেলিভিশনে। আখাউড়ায় বসে বসে। দেখছিল, আর তার বিহ্বল চোখে ভাসছিল অন্য একটা দৃশ্য। লতিফা মঞ্জিলের সামনে একটা ভরাট করা জায়গা ছিল, রোকসানার বাচ্চাটা সেখানে একদিন বাবার সাথে বুড়ি ছোঁয়াছুঁয়ি খেলছিল। সন্ধ্যার একটু আগে আগে। রোকসানা ছিল না, কিন্তু কী মনে করে বাশার দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। মাগরিবের আজান পড়লে বাপ-মেয়ে ভেতরে চলে গেল। সাধারণ একটি দৃশ্য, ছোট পরিবারের অতি সাধারণ বাৎসল্যের চেহারা। কিন্তু বাশার কোনো দিনই ভাবে নাই যে এই সাধারণ দৃশ্যটি তার আজীবন বয়ে বেড়াতে হবে।

জুন মাসের দিকে কটিয়াদীর এজেন্ট মুতাসিম ফোন করল। রোকসানা বেগমের পলিসি ক্লেইম করছে তার বোন। হেড অফিস ইন্সপেকশন করছে। বাশারকে কটিয়াদী যেতে হবে।

পরদিন বেলা এগারোটায় কটিয়াদী পৌঁছাল বাশার। স্টেশনের পাশে নিরিবিলি হোটেলে নাশতা সারল। আখলাক বিমা কোম্পানির অফিস দশ মিনিটের হাঁটাপথ। যাওয়ার পথে হঠাৎ বাশার একটা বইয়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে। একটা বইয়ের কভারে চোখ আটকে গেছে তার। বইটির নাম *নীল হিজাব*। লেখক হাসেম বিন আবদুল্লাহ। কী মনে করে বইখানা কিনল বাশার। ঘটনাচক্রে হাসেম বিন আবদুল্লাহ নিজেই ছিলেন দোকানে। বাশারের জানবার কথা নয়।

নিয়া যান তিরিশ পারসেন্ট ডিসকাউন্ট আছে এই কিতাবে।

আচ্ছা। তিরিশ পার্সেন্টি কি খুব বেশি ডিসকাউন্ট?

খুব বেশি না। হাসেমের লেখা আজকাল বেশি চলে না। তাই বেশি বেশি ডিসকাউন্ট।

আমি আসলে পড়িটরি না। বইটার নাম দেখে কিনলাম। লেখকের নাম হাসেম না হয়ে কাশেম হইলেও

কিনতাম।

কাশেম হইলে যা লিখত, হাসেম তা লিখত না। একেক মানুষ একেক রকম খোদার দুনিয়ায়।

কী নিয়া বইটা, চাচা? পড়ছেন আপনি?

সত্য ঘটনা নিয়া। কাহিনি আগে বইলা দিলে মজা নষ্ট হয়। পড়েন। অবশ্য আপনারা আজকালকার মানুষ। তেমন ভালো লাগবে না হয়তো।

নীল হিজাব একটি অল্পবয়সী বিধবা সুন্দরীর গল্প, যে কিনা ফুটফুটে একটি বাচ্চা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। নানান লোকের সাথে তার দেখা হয়। তারা তাকে সিরিয়া যেতে বলে, আফগানিস্তান যেতে বলে। মেয়েটি বলে, এই দেশ আর এই জায়নামাজই আমার মানচিত্র। তারপর সে এক বৃদ্ধ লেখকের প্রেমে পড়ে। অসফল প্রেম, কারণ বৃদ্ধ লেখকটি মারা যায়। হাসেমের এই বইটা একেবারেই চলেনি। হাসেমও জানতেন, চলবে না। এখনকার কিতাবিদের নায়ক-নায়িকা জায়নামাজে বসে থাকে না। দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ায়। প্রেম নয়, রক্ত ঝরায়। তাতে নতুন যুগের পাঠকের জোশ আসে। জোশের পেছনে কখনো ছোটেননি হাসেম, হুঁশের পেছনেই ছুটেছেন। লেখক হওয়া বা বই না চলা নিয়ে কোনো খেদ নেই হাসেমের। খোদার দুনিয়ায় সবার সময় নির্দিষ্ট। সায়মন তারিক, নসীম হিজাযী, আযম হিলালী—এদের সময়ও ফুরাবে একদিন। অন্য যুগে তারাও অচল হয়ে থাকবে। হাসেম যেমন এই যুগে।

বইটার জন্য একটা প্যাকেট চাইছিল বাশার। হাসেম বিন আবদুল্লাহ প্যাকেট খুঁজে পাচ্ছিলেন না। ইত্যবসরে বাশার বইটার কয়েক পাতা উল্টে দেখছিল। নীল হিজাব পরা রোকসানার কথা ভাবছিল সে। প্যাকেট খুঁজতে খুঁজতে হাসেম বিন আবদুল্লাহও ভাবছিলেন ফাতেমার কথা। একটি নীল হিজাবকে কেন্দ্র করে অসমবয়সী দুজন পরস্পর-অচেনা মানুষের স্মৃতি এক জায়গায় ঠেকে যাওয়া অদ্ভুত সুন্দর ঘটনা। আর সেটা তাদের দুজনের কারোরই টের না পাওয়া আরও সুন্দর ঘটনা। কেবল খোদারই এটা বুঝবার প্রিভিলেজ থাকে। তাই তিনি চির আনন্দময়। সর্বজ্ঞানী।

লতিফা মঞ্জিলের রোকসানার গল্পটা এখন সবাই জানে। কিন্তু নীল হিজাবের গল্পটা জানে কেবল দুজন। বিমা এজেন্ট বাশার আর প্রবীণ লেখক হাসেম বিন আবদুল্লাহ। হাসেম অবশ্য তাকে 'ফাতেমা' নামে চিনতেন। নসীম হিজাযীর *খুন রাঙা পথ* কিতাব কিনতে আসা মেয়েটি। যাকে তিনি খুনে রাঙা নয় এমন দুটো বই উপহার দিয়েছিলেন। তার নিজের লেখা। যাকে নিয়ে *নীল হিজাব* নামে *বোরখা পরা মেয়ের* দ্বিতীয় ভাগ লিখেছিলেন। হাসেমের পুত্র তুষার বিন আবদুল্লাহর ধারণা, ওর বাবা সেই হিজাবওয়ালির প্রেমে পড়েছিল। ফলে নানান আজগুবি দিবাস্বপ্ন দেখত দোকানে বসে বসে। লতিফা মঞ্জিলের ঘটনার পরেও বহুবার নাকি ওই হিজাবওয়ালি দোকানে এসেছে। গল্পগুজব করে গেছে। এমনকি *নীল হিজাব* বইটা কয়েকবার কিনেও নিয়ে গেছে। তবে তখন একাই আসত সে, বাবা বলেছে। কোনো বাচ্চা ছিল না সাথে।

বাশারের গল্পটা ভিন্ন। লতিফা মঞ্জিলের ঘটনার এক মাসের মধ্যেই রোকসানার পলিসি ক্লেইম করে তার কঠিন হয়ে পড়বে। খুব সেনসিটিভ কেইস।

আমাদের কাছে ওর চিঠিপত্র আছে। ডেথ সার্টিফিকেট আছে। আরও অনেক প্রমাণ আছে। একটু হেল্প করেন ভাই। আপনারা পাশে থাকলে আর খোদা চাইলে নিশ্চয়ই পাব।

বিমা কোম্পানি নিয়ে লোকে যত খারাপ কথাবার্তা কয়, বিমা জিনিসটা অত খারাপ না নিশ্চয়ই। নইলে রোকসানার পলিসিটা নানান গ্যাঁড়াকলে পড়ার পরেও ছয় মাসের মাথায় নমিনি ফাতেমা কীভাবে যেন পুরো বেনিফিট পেয়ে যায়। কী মনে করে রিপোর্ট ভালো দিয়েছিল বাশার। ভালো মানে খারাপ, বিমা কোম্পানির দৃষ্টিকোণ থেকে। যেসব পয়েন্টে আটকাতে পারত, সেগুলো বাশার ওভারলুক করে গেছে। বিরাট ঝুঁকি নিয়েছে। সেকেন্ড অডিট হলে হয়তো তার চাকরিই থাকত না। তবু বাশার সেটা করেছে। কেন করেছে নিজেও জানে না।

> **জরুরি কাজে সে আখাউড়া এসেছে। সময় দিলে বাশারের সাথে দেখা করতে চায়।**

নমিনি, বোন ফাতেমা বেগম। তদন্ত করার জন্য যেদিন সে কটিয়াদীতে যায়, ফাতেমার সাথে দেখা হয়। সাধারণ সাদামাটা চেহারা, পেস্ট কালারের একটা জামা পরেছিল, সাদা ওড়না। হিজাব ছিল না। কিন্তু অবিকল সেই চোখ। রোকসানার চোখের মতো। ফাতেমা গম্ভীর ধরনের। কথা কম বলে। বাশারের হাতে থাকা বইটা সে ঠিকই খেয়াল করে।

বইটা কি আজকেই কিনলেন?

হু। মাথা নাড়ায় বাশার।

নীল হিজাব। ভালো না তেমন। বেশি আজগুবি কাহিনি। হাসেম বিন আবদুল্লাহ আজকাল কেউ পড়ে না।

কী পড়ে লোকে আজকাল?

অনেকেই আছে। নসীম হিজাযীর বই পড়ছেন? *খুন রাঙা পথ*?

না পড়ি নাই। আমি তেমন পড়িটরি না।

তার লেখা ভালো। আর বেদুঈন সিরিজের বইগুলোও ভালো। পড়তে পারেন।

বেশ। এইখানে একটা সাইন করেন। কেইসটা জটিল। আপনারা বলছেন, আপনার বোন অনিচ্ছাসত্ত্বেও আত্মঘাতী হয়েছে। স্বামী ব্রেইন ওয়াশ করে ফেলছে। তার ইচ্ছা ছিল না, নিরুপায় ছিল। এসব প্রমাণ করা

এর বেশ কিছুদিন পর একদিন ফাতেমার ফোন আসে। তত দিনে সে বদলি হয়ে চাঁদপুর সদরে। এরিয়া ম্যানেজার। ফাতেমা বাশারকে ধন্যবাদ দেয়। তারপর জানায়, জরুরি কাজে সে আখাউড়া এসেছে। সময় দিলে বাশারের সাথে দেখা করতে চায়। বাশার হেসে বলে, সে এখন চাঁদপুরে। সেটা শুনে ফাতেমা খিলখিল করে হেসে ওঠে। হাসতে হাসতেই জানতে চায়, বিমাশিল্পে ঘন ঘন বদলি কেন উন্নতির সূচক? ফাতেমার প্রশ্ন শুনে বাশার ভীষণ চমকে যায়। এ কথা তো সে রোকসানাকে বলেছিল!

আপনি কী করে জানলেন?

কী জানলাম? জানি না বলেই তো প্রশ্ন করলাম।

এই প্রশ্নটা। রোকসানা আপনাকে বলেছে?

ফাতেমা খুব হাসে।

দাওয়াত দেন। যেদিন চাঁদপুর আসব, সেদিন বলব। আপনার জন্য নসীম হিজাযীর বইটাও নিয়ে আসব। আর একটা নীল হিজাব পরে আসব।

দাওয়াত যদি না দিই?

তাহলেও আসব, বেদাওয়াতি হয়ে। ❦

স্মৃতিকথা



ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ

মনজুরুল হক

কিয়েভ পর্ব

অনিশ্চিত পথে

আমি তখন ছাত্র ইউনিয়নের সক্রিয় কর্মী, যুক্ত হয়েছি ছাত্র ইউনিয়নের সাপ্তাহিক পত্রিকা *জয়ধ্বনির* প্রকাশনার সঙ্গে। খান মোহাম্মদ ফারাবী, সাদী (হাসান ফেরদৌস) আর আমি তিনজনই সদ্য প্রকাশিত ওই সাপ্তাহিক পত্রিকাকে কীভাবে আরও বেশি আকর্ষণীয় করে তোলা যায়, মুকুল ভাইয়ের (আব্দুল কাইয়ুম) নেতৃত্বে সেই চেষ্টায় নিয়োজিত হয়েছি।

আমরা যখন *জয়ধ্বনির* প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত হই, শোনা যাচ্ছিল ছাত্র ইউনিয়নের সদস্যদের বিদেশে লেখাপড়ার জন্য বৃত্তি দেওয়া হলে সেই দলে আমাদের জায়গা হতে পারে। তবে ফারাবী ও সাদী বিদেশে যাওয়ার ব্যাপারে তেমন উৎসাহী ছিল না। ওদের ধারণা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের একেবারে শুরুতে বিদেশে লেখাপড়া করতে না গিয়ে বরং উচ্চতর শিক্ষার জন্য পরবর্তী সময়ে বিদেশ যাওয়াটা হবে অনেক বেশি অর্থবহ। আমি অবশ্য শুরু থেকেই ভেবেছিলাম সুযোগ মিলে গেলে মন্দ হবে না। তখনো জানি না যে বছর না ঘুরতেই ফারাবী আমাদের ছেড়ে চিরদিনের জন্য চলে যাবে অন্য এক জগতে এবং এক বছর পর সাদীও সিদ্ধান্ত পাল্টে সরকারের বৃত্তি নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হবে সোভিয়েত ইউনিয়নে।



ঢাকা থেকে যাত্রা করার আগে বিমানবন্দরে বন্ধুদের সঙ্গে আমি ও আলি নকি (মাঝের দুজন), আগস্ট ১৯৭২

মে মাসের দিকেই পরিষ্কারভাবে জানা যায়, আন্তর্জাতিক ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীদের উচ্চশিক্ষা লাভের কয়েকটি বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। সোভিয়েত সরকার তখনো বাংলাদেশের ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়নি। আমার বিদেশযাত্রার প্রকৃত প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল বেশ কিছু আগে, যদিও সত্যিকার অর্থে আমার দেশ ছেড়ে যাওয়া ১৯৭২ সালের আগস্ট মাসের দ্বিতীয়ার্ধে, সরকারি বৃত্তি নিয়ে যাওয়া ছাত্রদের প্রায় একই সময়ে বা কিছুটা পরে। আন্তর্জাতিক ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সেবার পাঁচটি স্কলারশিপ দেওয়া হয়। সেই পাঁচজনের দলে অন্তর্ভুক্ত হই আমিও।

দেখতে দেখতে চলে আসে যাত্রা করার দিন। আমাদের মধ্যে কারোরই এর আগে বিদেশে যাওয়ার অভিজ্ঞতা ছিল না। অজানা দেশে একাকী যাত্রা করা নিয়ে মনে শঙ্কা দেখা দিলেও আনন্দ আর উত্তেজনার অনুভূতিও মনকে আন্দোলিত করে চলেছিল। আত্মীয়স্বজন আর বন্ধুদের বেশ বড় একটা দল সেদিন সমবেত হয়েছিল তেজগাঁও বিমানবন্দরে আমাদের বিদায় জানাতে। সেটা ছিল রৌদ্রোজ্জ্বল আলোকিত এক সকাল। মনে অদ্ভুত এক অনুভূতি নিয়ে আমরা বিমানবন্দরে সমবেত সবাইকে বিদায় জানিয়েছিলাম। হাতে সরকারের অনুমোদিত গ্রাটিস পাসপোর্ট আর পকেটে বাংলাদেশ ব্যাংকের বরাদ্দ করা পাঁচ পাউন্ডের একটি নোট। ব্যস, ওটুকুই।

বিমানে ওঠার পর কয়েকবার খাবার পরিবেশন করা হয়। তবে সংশয় আর উত্তেজনার মুখে সেসব খাবারের স্বাদ নেওয়ার মতো অবস্থা আমাদের তখন ছিল না। দীর্ঘ ভ্রমণপথে একমাত্র যাত্রাবিরতি ছিল ৎবিলিসি বিমানবন্দরে, একসময় তিফলিস নামে পরিচিত শহরটি তখন সোভিয়েত জর্জিয়া প্রজাতন্ত্রের রাজধানী। অর্থাৎ, আমরা ততক্ষণে পৌঁছে গেছি সোভিয়েত ভূখণ্ডে, যদিও মস্কো সেখান থেকে আরও কয়েক ঘণ্টার পথ। ঘণ্টাখানেকের যাত্রাবিরতিতে প্লেনের ভেতরেই আমাদের বসিয়ে রাখা হয়েছিল। বিমানের জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল এয়ারোফ্লতের আরও কয়েকটি যাত্রীবাহী বিমানের পাশাপাশি সামরিক বিমানের ওঠানামা। এর বাইরে আরও চোখে পড়ছিল দূরের পাহাড় এবং একতলা টার্মিনাল ভবন। সন্ধ্যা তখন নেমে আসার মুখে।

পরের ধাপে বিমান মস্কোর শেরিমেতিয়েভো বিমানবন্দরে যখন অবতরণ করে, স্থানীয় সময় তখন রাত নয়টা। এত রাতেও দিনের আলো চোখে পড়ায় আমরা সবাই অবাক হয়ে যাই। ঢাকার সঙ্গে মস্কোর সময়ের ব্যবধান তিন ঘণ্টা, ঢাকায় তখন প্রায় মধ্যরাত। অর্থাৎ পুরো বিমানযাত্রায় সময় লেগেছে ১৫ ঘণ্টার মতো।

শেরিমেতিয়েভো বিমানবন্দরে বাস্তব অর্থে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ—আমি, মাকসুদুল আলম, সবুর আহমেদ, দীপা দাস ও আলি নকী। আলি নকী ছিল আমাদের দলের তরুণ চটপটে নেতা। ইমিগ্রেশন পুলিশ যান্ত্রিক দৃষ্টিতে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল আমাদের। তারপর কাস্টমসের আনুষ্ঠানিকতা পার হয়ে বিমানবন্দরের মূল লবিতে এসে আমাদের জন্য কেউ উপস্থিত আছে কি না দেখছিলাম। ঢাকা থেকে সে রকমই আমাদের বলে দেওয়া হয়েছিল। সেদিনের একেবারে সাদামাটা তেজগাঁও বিমানবন্দরের তুলনায় শেরিমেতিয়েভোকে মনে হলো খুবই আধুনিক এবং আলোকোজ্জ্বল এক বিমানবন্দর। যাত্রীদের ভিড়ও কম না। লাইন লম্বা হলেও দ্রুতই আমরা ইমিগ্রেশন পার হয়ে এসেছি। বিমানবন্দরের এদিক-সেদিক খোঁজাখুঁজি করে কাউকে না পেয়ে আমরা যখন প্রায় ক্লান্ত, তখন এক রুশ তরুণ কাছে এগিয়ে এসে ভাঙা ইংরেজিতে তাঁকে অনুসরণ করতে বলে। আমরা মালপত্র নিয়ে তাঁর পিছু পিছু বাসে উঠে বসি। অল্পক্ষণের মধ্যেই বাস ছেড়ে দেয়। প্রায় অন্ধকার পথ ধরে বাসটি কোন গন্তব্যের উদ্দেশে যাত্রা করে তার কিছুই আমরা আঁচ করতে পারিনি। ঘণ্টাখানেকের যাত্রা শেষে বিশাল এক চত্বরঘেরা পুরোনো ধাঁচের এক ভবনের সামনে বাস থামে। বলা হলো মালপত্র নিয়ে আমরা যেন সেই ভবনে উঠে যাই।

পুরো ভবনে আর কেউ আছে বলে মনে হলো না। অধিকাংশ ঘর বন্ধ। করিডরে জ্বলছিল স্বল্প আলোর বাল্ব। তরুণটি পাশাপাশি দুটি ঘর খুলে দিয়ে সেখানে আমাদের রাত কাটানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে চলে যায়। রাতের খাবার পাব কি না বা কোথায় পাব তার কিছুই জানি না। দুটি কক্ষের একটিতে চারটি খাট। কম্বল, বালিশ সবই পরিপাটিভাবে সাজানো। আমরা চার যুবক চারটি বিছানার দখল নিই। দলের একমাত্র তরুণী দীপা দাসকে পাঠানো হয় অন্য কক্ষে।

মাঝরাতে দীপা এসে বলে, এক ঘরে একা রাত কাটাতে ওর ভয় করছে। ফলে আমাদের মধ্যে দুজন একটি বিছানায় ভাগাভাগি করে গা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ে। অন্য



কিয়েভ বিশ্ববিদ্যালয়

বিছানাটি ছেড়ে দেওয়া হয় দীপার জন্য। তবে শিগগিরই কারও চোখেই ঘুম আসেনি।

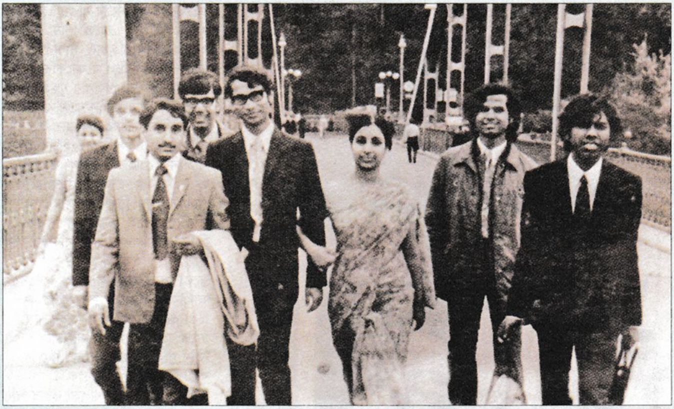
খুব সকালে ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর আমরা পাঁচজন একসঙ্গে বের হয়েছিলাম জায়গাটি কেমন তা দেখে নিতে। ঘড়ির কাঁটায় স্থানীয় সময় তখন ভোর পাঁচটাও বাজেনি, অথচ সূর্য দাপটে ছড়িয়ে দিচ্ছে আলো। চারদিকে আলোকিত প্রভাতের উপস্থিতি, অন্যদিকে কনকনে ঠান্ডা বাতাস হাড়ে গিয়ে বিঁধছিল। দেশ থেকে নিয়ে আসা শীতের কাপড় যে মস্কোর সেই গ্রীষ্মেও দেহ উষ্ণ রাখার জন্য যথেষ্ট নয়, রাশিয়ার প্রথম সকালের প্রাতর্ভ্রমণে তা বোঝা গেল।

বিমানবন্দরে আমাদের নিতে আসা সেই তরুণ আবারও আসে সকাল আটটার দিকে, নিয়ে যায় ক্যাফেটেরিয়ায়। প্রাতরাশ শেষ হওয়ার পর আমাদের একটি অফিসঘরে নিয়ে যাওয়া হলে বুঝতে পারি যে আমাদের আসলে ভুল জায়গায় নিয়ে আসা হয়েছে। সেটা ছিল কমিউনিস্ট তরুণদের সংগঠন কমসোমলের প্রশিক্ষণ স্কুল, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির তরুণ কিছু সদস্যের সেখানে কয়েক মাসের প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য আসার কথা ছিল। যোগাযোগের বিভ্রান্তির কারণে কোন ফ্লাইটে ওরা মস্কো পৌঁছাবে, তা নিয়ে ভুল-বোঝাবুঝি হয়েছে। বিমানবন্দরে পাঠানো তরুণ আমাদের সেই দলের সদস্য মনে করে সরাসরি কমসোমল স্কুলে নিয়ে এসেছে। এখন প্রশ্ন, কীভাবে আমরা গন্তব্যে পৌঁছাব? আমরা চাইছিলাম সেখানকার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলতে। পরে অবশ্য পৌঁছুতে পেরেছিলাম। গাছপালায় ঘেরা নির্জন পথ দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ চলার পর একসময় শহরের দেখা পাই। বুঝে নিতে পারি আমরা মস্কোয় পৌঁছে গেছি।

উঁচু এক ভবনের প্রবেশপথে বাস এসে থামে। সেখানে নানা দেশের তরুণ-তরুণীর ভিড়। সেটা ছিল বিভিন্ন দেশ থেকে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য সদ্য আসা ছাত্রদের অভ্যর্থনাকেন্দ্র, যেখান থেকে তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে এদের পাঠিয়ে দেওয়া হয় নিজ নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। প্রায় এক বছর পর আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে সেই ভবনটি ছিল মস্কো রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত একটি হোটেল। সেখানেই বলা যায় আমার সোভিয়েত জীবনের সূচনা, যে জীবনের স্থায়িত্ব ছিল আট বছর। তবে ভাষা শিক্ষার জন্য প্রথম বছরটি আমার কেটেছে কিয়েভে। সেই কিয়েভ, যেটা এখন ভিন্ন এক দেশ ইউক্রেনের রাজধানী।

প্রফুল্ল ছাত্রজীবন

উনিভার্সিতেতস্কি হোটেলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিদেশি ছাত্রদের ব্যবস্থাপনার অস্থায়ী দপ্তর সেদিনই জানিয়ে দিয়েছিল, আমরা কে কোথায় যাচ্ছি। দুপুরের পর মাকসুদ—পরবর্তী জীবনে জিনবিজ্ঞানী হিসেবে খ্যাত মাকসুদুল আলম—প্রথম দলছুট হয়ে চলে যায় টোকিও রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলে। এরপর সন্ধ্যায় আমাদের দলের তরুণ নেতা আলি নকী যাত্রা করে খারকভের উদ্দেশে। অল্প পরে আমাকে রেলস্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয়



কিয়েভে দ্নিপার নদীর পদযাত্রার সেতুতে (বাঁ দিক থেকে) শ্রীলঙ্কার কুমুদিনি, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক তাজুল ইসলাম, আবদুল আওয়াল, অদসরপ্রাপ্ত কাস্টমস কর্মকর্তা ডক্টর রফিকুল ইসলাম, প্রয়াত জিন-বিজ্ঞানী মাকসুদুল আলম, বিআইবিএমের অবসরপ্রাপ্ত গবেষণা কর্মকর্তা বন্দনা সাহা, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক জহুরুল আলম ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শাকের আহমেদ

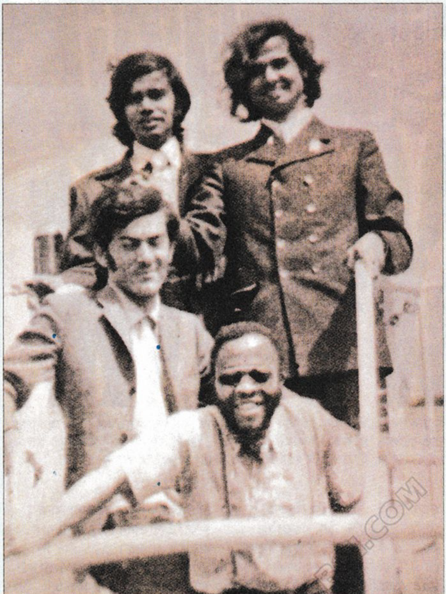
কিয়েভগামী ট্রেনে তুলে দেওয়ার জন্য। বাকি দুজন দীপা দাস ও সবুর আহমেদ মধ্যরাতের ট্রেনে যাত্রা করেছিল লেনিনগ্রাদের পথে, সেখানে ভিন্ন দুটি ইনস্টিটিউটে ওদের জায়গা হয়। লেনিনগ্রাদ এখন তার পুরোনো নাম—সাংক্ত পিতেরবুর্গ-এ ফিরে গেছে।

মস্কোর কিয়েভস্কি ভকজাল থেকে রাত ১০টার দিকে আমাদের ট্রেন যাত্রা করে। বুঝে উঠতে পেরেছিলাম যে ট্রেনের যাত্রীদের মধ্যে কিয়েভগামী বিদেশি ছাত্র আমি একা নই। তবে একমাত্র বাংলাদেশি। অল্প সময়ের মধ্যে ট্রেনে পরিচয় হয় জর্ডানের মুহামেদ, ভেনেজুয়েলার অস্কার, পেরুর নোরা ও মারিয়া এবং ইসরায়েল থেকে আসা ফিলিস্তিনি যুবক কাসাবের সঙ্গে।

মস্কো থেকে রওনা হওয়ার আগে আমাদের সবার হাতে কিছু রুবল ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যেন পথে খেয়ে নিতে পারি। এর ভেতরে আমার সঙ্গে কথা বলল একজন লোক। সে বলল সে বাংলাদেশ সম্পর্কে জানে। আমাদের কথা চলছে। এক ফাঁকে জর্ডানের মুহামেদ আমার কাঁধে হাত দিয়ে বলল, আমাকে কিছু বলার আছে ওর। কাছে যেতেই সে বলল, 'ইয়ুদা, ইয়ুদা!' আমি বুঝলাম না। সে বলল, আমি যার সঙ্গে কথা বলছি সেই লোকটি ইহুদি এবং আমার সাবধান হওয়া উচিত। আমি জানতে চাই, লোকটি যে ইহুদি, তুমি বুঝলে কী করে? ও বলল, চেহারাই বলে দিচ্ছে সে খাঁটি ইহুদি। ধর্ম, বর্ণ আর জাতিসত্তার ভিত্তিতে বিভাজন কতটা গভীরে গিয়ে পৌঁছেছে বুঝলাম।

কিয়েভ স্টেশনে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন কিয়েভ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা শিক্ষা প্রস্তুতি অনুষদের দোভাষী তামারা। আমাদের সাত-আটজনের দলটিকে তিনি সরাসরি নিয়ে যান শহরের এক প্রান্তের একটি গোলচত্বর ঘেঁষে দাঁড়ানো পুরোনো এক ভবনে। সেটাই ছিল আমাদের নিবাস, অর্থাৎ সোভিয়েত জীবনের প্রথম ছাত্রাবাস। ছাত্রদের প্রায় সবাই ইতিমধ্যে এসে গেছে। এক দিন পর সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিন শুরু হবে ভাষা শিক্ষার ক্লাস। আমরা ছিলাম শেষ দিকে পৌঁছানো দলে। হোস্টেলে আমার জায়গা হয় চারতলা ভবনের সবচেয়ে উঁচু তলায়। ভিক্তর নামে এক রুশ ছাত্রের সঙ্গে ভাগাভাগি করে দেওয়া হয়েছে রুম। ভিক্তর রুমে ছিল না। ওর সঙ্গে পরিচয় হয় সন্ধ্যায় সে ফিরে এলে। আমাদের কয়েক বছরের বড়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বর্ষের ছাত্র সে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে লেখাপড়া করায় একটি বিদেশি ভাষা শেখা ছিল ওর জন্য বাধ্যতামূলক। ও নিয়েছিল ইংরেজি। ফলে একেবারে শুরুর দিনগুলোতে ইংরেজি ভাষা জানা রুমমেট পাওয়ায় কিছুটা সুবিধা হয়েছিল আমার।

রুমে ছিল দুটি লোহার স্প্রিংযুক্ত খাট, কাপড় রাখার কেবিনেট, লেখাপড়া করার টেবিল-চেয়ার ও একটি বুকশেলফ। ছিল পাইপযুক্ত ধাতব একটি অচেনা বস্তু, ঘরের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে যেটার রং করা। পরে বুঝতে পারি, সেটা রাশিয়ার প্রচণ্ড শীতে ঘরের ভেতরে স্বাভাবিক তাপমাত্রা ধরে রাখার হিটার। পাইপ দিয়ে আসা গরম পানি যন্ত্রটিকে সচল রাখে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সব জায়গাতেই সে রকম সেন্ট্রাল হিটিং ব্যবস্থা ছিল খুবই কার্যকর এবং আবশ্যকীয় এক উপাদান। শীতের সময় তাপমাত্রা শূন্যের নিচে ২০-২৫ ডিগ্রিতে নেমে গেলেও ভবনের ভেতরে পরিবেশ থাকত সহনীয় ও স্বাভাবিক। এমনকি ঘরের ভেতরে সোয়েটার পরে কিংবা কম্বলমুড়ি দিয়ে বসে থাকার প্রয়োজনও হতো না। মনে পড়ে বাইরে শীতের প্রচণ্ডতা সত্ত্বেও হোস্টেলের ভেতরে কখনো কখনো আমরা দেশ থেকে নিয়ে আসা খদ্দরের পাঞ্জাবি পরেও একে অন্যের ঘরে যাওয়া-আসা করেছি। সে রকম পোশাক পরতে দেখে অন্য দেশের ছাত্ররা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেও আমরা কিছু মনে করিনি। এমনকি ছবি তোলার উদ্দেশ্যে পাঞ্জাবি পরে



দাহোমির 'কালি কালি' (সামনে), লেবাননের মাস্টর (সামনে বাঁয়ে), আমি (পেছনে বাঁয়ে) ও জহুর

অল্প সময়ের জন্য বাইরের খোলা ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ানোর মতো সাহসও দেখিয়েছিল আমাদের কেউ কেউ।

বাড়তি পাওনা ছিল ঘরের সামনের ব্যালকনি। সেখানে দাঁড়ালে চত্বর ও এর আশপাশের বিস্তৃত এলাকা বেশ ভালোভাবে চোখে পড়ে। রাস্তাঘেরা গোলচত্বরের মাঝখানটায় সাজানো একটি বাগান। চত্বরের চারদিকের রাস্তার অন্য পার ধরে ছিল দালানকোঠা। অধিকাংশই যথেষ্ট পুরোনো।

খাওয়াদাওয়া করার জন্য একতলায় ক্যাফেটেরিয়ায় গিয়ে অবাক হয়ে গেলাম আমার স্কুলজীবনের বন্ধু জগলুকে দেখে। দূর থেকে আমাকে দেখেই ও চিৎকার করে বলে উঠল, 'কিরে, তুই এখানে কী করছিস?' আমিও ওকে একই প্রশ্ন করি। আনন্দে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরার পর জগলু বলল, আমাকে নিয়ে বাংলাদেশি ছাত্রের সংখ্যা দাঁড়াল ১৭। জগলু যে কেবল আমার স্কুলজীবনের বন্ধু তা-ই নয়, একই পাড়ায় থাকার কারণে বন্ধুত্ব ছিল অনেক গভীর। জগলুও যোগ দিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধে। টাঙ্গাইলে কাদেরিয়া বাহিনীতে ছিল সে। একই হোস্টেলে প্রথম দিন এই দেখা আমাদের দুজনের জন্যই ছিল দুর্লভ প্রাপ্তি। আমাকে সে নিয়ে যায় অন্য সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে। আমরা সেই ১৭ জন বাংলাদেশি ছাত্র শুরুর সেই দিনগুলো থেকে আনন্দ-বেদনা আর সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে নিয়ে কাটিয়েছি কিয়েভে আমাদের সোভিয়েত জীবনের প্রথম একটি বছর। আগে থেকে পরিচিতদের মধ্যে ছিলেন বন্দনা দিদি ও তাজুল ভাই। পেলাম অনেক আগে ল্যাবরেটরি স্কুল ছেড়ে যাওয়া বন্ধু মনসুর এবং আমার স্বল্পকালীন ক্যাডেট কলেজজীবনের সঙ্গী অভিজিৎ, মোস্তফা ও আফজালকে। মনে হলো পরিচিত এক পরিবেশ ফিরে পেয়েছি।

১৭ জনের কারোরই রুশ ভাষার কিছু জানা ছিল না। আমাদের আগে বাংলাদেশ থেকে উচ্চশিক্ষার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নে যাওয়ার নজির খুব একটা নেই। হাতে গোনা যে কয়েকজন গিয়েছিলেন, সাধারণভাবে তাঁদের বিচরণ ছিল মস্কোকেন্দ্রিক। আমরা যখন আগরতলায় যুদ্ধপ্রস্তুতির অপেক্ষায় শিবিরে দিন কাটাচ্ছিলাম, মিনি মর্জিনা নামের এক ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীকে তখন সোভিয়েত ইউনিয়নে পাঠানো হয়েছিল উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য। অনেক পরে যখন মস্কোর প্যাট্রিস লুমুম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি তাঁর দেখা পাই, তত দিনে সেখানে তিনি চন্দ্রনা শতদ্রু নামে পরিচিত হয়ে উঠেছেন। যুদ্ধকালে ভারত থেকে মস্কো যেতে হয়েছিল তাঁকে। দেশের আত্মীয়-পরিজনদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে তাঁকে একটি নতুন নাম নিতে হয়েছিল। পরে সেই নামেই তিনি পরিচিত হয়ে ওঠেন। ছিলেন ষাটের দশকের শেষ দিকে চিকিৎসাবিজ্ঞানে লেখাপড়া করার জন্য মস্কো যাওয়া আমাদের প্রায় সবার অগ্রজ সেলিম সিদ্দিকী এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজন। সেদিক থেকে আমরা ছিলাম উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নে যাওয়া বাংলাদেশি ছাত্রদের সত্যিকার অর্থে প্রথম দল।

শুরুর দিনগুলোতে ট্রলি-বাসে চেপে এদিক-সেদিক গিয়ে বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা হতো। ভাষাগত অসুবিধার কারণে ছুটির দিনগুলোয় আমরা সাধারণত দলবদ্ধ হয়ে বাইরে বের হতাম। কোথায় যাচ্ছি তা আমাদের জানা নেই। জানা নেই কোন বাস ধরে আমাদের ফিরে আসতে হবে। কারও কাছে পথের নিশানা জানার উপায়ও ছিল না ভাষা জানা না থাকায়। রুশ ভাষার বাইরে অন্য কোনো ভাষায় কথা বলতে পারে এমন সোভিয়েত নাগরিক কদাচিৎ পেয়েছি। দৈনন্দিন জীবনের বাধ্যবাধকতা শিখে নিতে বাধ্য করেছে আমাদের।

ভবনের বেসমেন্টে নারী আর পুরুষের জন্য ছিল ভিন্ন ভিন্ন স্নানঘর। লাগোয়া একটি ঘরে কাপড়চোপড় খুলে রেখে বস্ত্রহীন হয়ে যেতে হতো সেখানে। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্য অনেক দিন পর্যন্ত অন্য পুরুষের সামনে উলঙ্গ হতে রাজি হয়নি। এমন সময় ওরা স্নান করতে যেত যখন অন্য কারও স্নানে যাওয়ার কথা নয়। যেমন খুব ভোরে কিংবা ক্লাস শেষ করে ফিরে আসার ঠিক পরপর। কেউ কেউ আবার অন্যদের উপস্থিতিতে শর্টস বা হাফপ্যান্ট পরে স্নান সারত। তাতেও কয়েকজনকে মাঝেমধ্যে বিড়ম্বনার মুখে পড়তে হয়েছে। একদিন স্নানঘরে

ঢোকার মুখে শুনতে পেলাম একদল তরুণের জোর গলার অট্টহাসি। স্নানঘরে ঢুকতেই চোখে পড়ল আফ্রিকার কয়েকজন ছাত্রের দিগম্বর অবস্থায় আমাদের এক সহপাঠীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ার দৃশ্য। আমাদের সেই সহপাঠী হাফপ্যান্ট পরে স্নান করছে—এটাই হাসির কারণ।

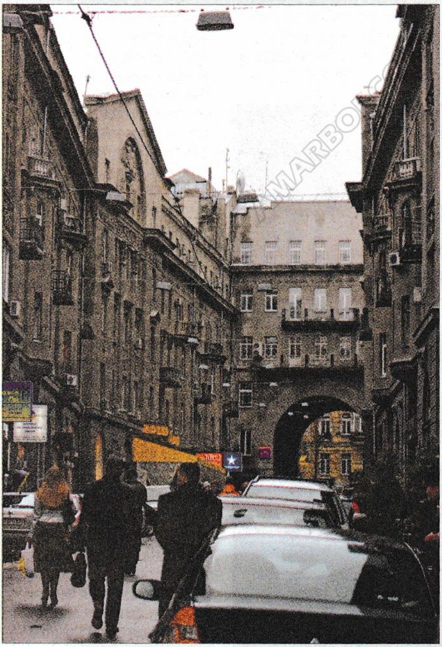
একসময় এসে পড়ল শীত। কিয়েভে সাধারণত নভেম্বর মাসে তুষারপাত শুরু হয় এবং বরফের রাজত্ব চলে মার্চের শেষ দিক পর্যন্ত। আমাদের ১৭ জনের কেউই আগে তুষারপাত দেখিনি। তুষারঢাকা পথঘাট আর বাড়িঘর দেখার অভিজ্ঞতা ছিল এক তৃপ্তিকর চমক।

একদিন ক্লাস শেষ করে ফিরে আসার পর হোস্টেলের করিডরে হেলালের সঙ্গে দেখা। বলল, 'কেমন আছ, তাভারিশ?' শেষের শব্দটির অর্থ তখনো জানা হয়নি। ওর দিকে কিছুটা অবাক চোখে তাকাতে দেখে বলল, 'আজ ক্লাসে শিখেছি শব্দটি। এর অর্থ কমরেড। তুমি যেহেতু কমরেডদের একজন, তাই তাভারিশ বলেই তোমাকে সম্বোধন করছি।' জানতে চাই, যেহেতু সে নিজেকে কমরেডদের দলভুক্ত ভাবছে না, ওর বেলায় সম্বোধন কী হবে। সেটাও সে আজ শিক্ষকের কাছ থেকে জেনে নিয়েছে। বুর্জোয়া সম্বোধন 'মিস্টার'-এর রুশ হচ্ছে 'গসপাদিন'। ওকে আমি গসপাদিন গেলাল বলে ডাকতে পারি। গসপাদিন না হয় বোঝা গেল। তবে হেলাল কেন গেলাল হলো?

রুশ ভাষায় ইংরেজি এইচ অক্ষরের উচ্চারণ না থাকায় বিকল্প হিসেবে এইচের উচ্চারণ সাধারণত খ দিয়ে করা হয়। কখনো আবার এইচ হয়ে যায় গ। দুই উচ্চারণের মধ্যে হেলালের পছন্দ ছিল গ। ফলে সে নিজের পরিচয় দিত গেলাল বলে, হিটলারকে যেমন রুশ উচ্চারণে বলা হয় গিতলের এবং হ্যামলেটকে বলা হয় গামলেত।

দৈনন্দিন জীবনের কখনো তিক্ততাও জমেছে। এ প্রসঙ্গে আলজেরিয়া থেকে আসা কয়েকজন তরুণের কথা বলতে হয়। আলজেরিয়াকে আমরা জেনেছি বিপ্লবী অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে যাওয়া উত্তর আফ্রিকার স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে ফ্রান্সের কবজামুক্ত হতে আলজেরিয়ার স্বাধীনতাযুদ্ধের মিলও কেউ কেউ খুঁজে পেয়েছিল। আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি আলজেরিয়ার মানুষের সহানুভূতি থাকবে। বাস্তবে তা দেখিনি। শুরু থেকেই ওরা আমাদের ধরে নিয়েছে ইসলামের শত্রু হিসেবে; বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান ভাঙাটা আমাদের মস্ত বড় অপরাধ। প্রথম পরিচয় থেকেই আমাদের সবার সঙ্গে ওরা দুর্ব্যবহার করতে শুরু করে। ওদের চোখে আমরা যেন অবাঞ্ছিত। শুরুতে আমরা ওদের বাজে আচরণের প্রতিবাদ করিনি। তবে গোঁয়ারের মতো আমাদের পেছনে লেগে থাকায় শেষ পর্যন্ত আমাদেরও এর জবাব দিতে হয়েছে। পরে চলার পথে ওদের নিয়ে আমরা হাসিঠাট্টা করতাম। আমাদের জগলু ওদের দলনেতা গোছের তরুণটির নাম দিয়েছিল চিকা। রুগ্ণ-পাতলা, কিছুটা লম্বাটে—এ কারণেই সেই নাম। দেখা হলেই জগলু বাংলায় ওকে জোর গলায় জিজ্ঞাসা করত, 'কিরে চিকা, চললি কোথায়?' প্রশ্ন বুঝতে না পেরে সে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত আমাদের দিকে।

আফ্রিকা মহাদেশ থেকে আসা এক ছাত্রের সঙ্গে আমাদের প্রায় সবার সখ্য গড়ে উঠেছিল। সে ছিল হিন্দি ছায়াছবির একনিষ্ঠ ভক্ত। সত্তরের দশকের শুরুর দিকে খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠা বলিউডের একটি ছবির বেশ জনপ্রিয় একটি গানে কালি কালি শব্দ ছিল। আমাদের দেখলেই সে গানের ওই অংশটি গেয়ে উঠত। এ কারণেই জগলু ওর নাম দিয়েছিল কালি কালি। এ নামে তাকে ডাকা হবে তা ওকে বলাও হয়েছিল। ওর আসল নাম এখন ভুলে গিয়েছি। উচ্চশিক্ষার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নে আসার আগে কালি কালি ছিল বিমানবাহিনীর একজন কর্মকর্তা। ছোটখাটো শক্ত দেহ। মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। মাথার কোঁকড়ানো চুল ছোট করে ছাঁটা। চালচলনে ছিল ক্লাউনের অভিব্যক্তি।



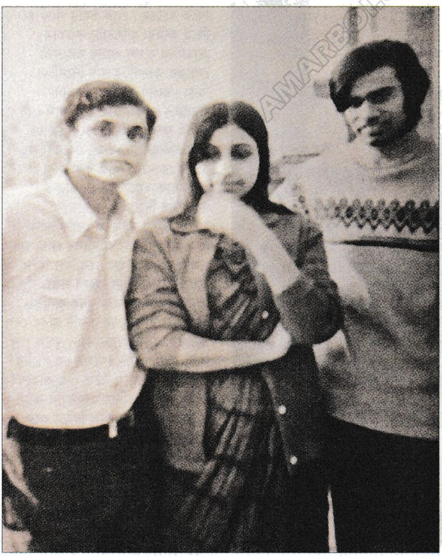
শীতের শুরুতে কিয়েভ

খুব সহজে সে অন্যদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারত। ওর উপস্থিতি পরিবেশকে সহজেই হালকা করে তুলত। কালি কালির সঙ্গে একবার আমরা নৌভ্রমণে যাই। লঞ্চের ছাদে সেই হিন্দি সিনেমার নাচও দেখিয়েছে সে।

বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার মধ্যে রাশিয়া একসময় আমাদের সামনে উন্মোচিত হতে শুরু করে। দেশে থাকা অবস্থায় সোভিয়েত জীবনে সুখের যে ছবি আমাদের সামনে মেলে ধরা হয়েছিল, কাছে থেকে দেখে বুঝেছি, বাস্তবে সে দেশের মানুষের জীবন তার চেয়ে অনেকটাই ভিন্ন। রাজনীতির দিক থেকেও স্বপ্নের সোভিয়েতজুড়ে কোনো রকম ভিন্নমত না থাকার যে তালিম আমরা পেয়েছিলাম, সে রকম ব্যাখ্যার বাস্তববর্জিত দিকটিও ক্রমশ পরিষ্কার হতে শুরু করে। অন্যদিকে এ দেশের মানুষ খুব সহজে ভিনদেশিদের আপন করে নিতে পারলেও কোথায় যেন একটা অদৃশ্য দেয়াল ঠিকই থেকে যায়, যা অতিক্রম করা হয়তো সম্ভব নয়।

আমরা ১৭ জন কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে ভাষা শেখার ক্লাসে যোগ দিয়েছিলাম। শুরুতে যে দলে আমাকে রাখা হয়েছিল, সেই দলের সবাই অর্থনীতি নিয়ে লেখাপড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আমার বিষয় যেহেতু সাংবাদিকতা, সে কারণে অল্প কিছুদিন পর আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি দলে আমাকে ভিড়িয়ে দেওয়া হয়, যে দলের অন্য বাংলাদেশি সদস্য ছিল আমার স্বল্পকালীন ক্যাডেট কলেজজীবনের সহপাঠী মোস্তফা।

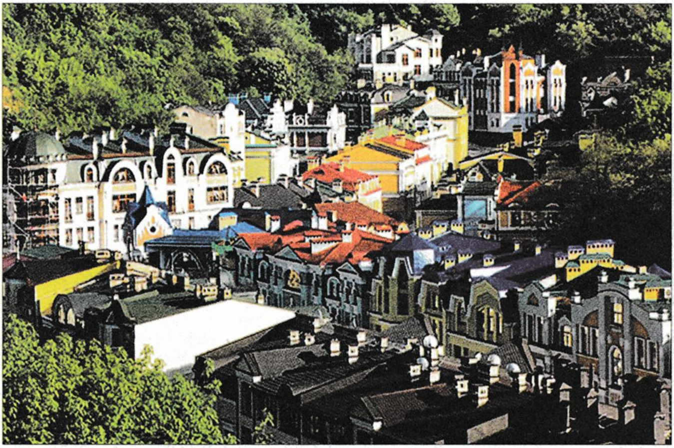
মোস্তফার সোভিয়েত জীবন স্থায়ী হয়নি। সম্ভবত বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র থাকাকালে গ্রীষ্মের ছুটিতে অস্ট্রিয়া গিয়ে সেখানেই সে থেকে গেছে। অনেক পরে ১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি মোস্তফা একদিন ঢাকায় আমার সেই সময়ের কর্মক্ষেত্র জাতিসংঘ তথ্যকেন্দ্রে এসে উপস্থিত হয়। সে জানায়, ভিয়েনায় বিভিন্ন জায়গায় ছোটখাটো কাজ করে টাকা জমিয়ে একসময় সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয় এবং লেখাপড়া শেষ করে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচিতে চাকরি পায়। ওর পোস্টিং হয় মঙ্গোলিয়া। এরপর ওর ভাগ্যে ঠিক কী ঘটেছে তা আর জানার সুযোগ হয়নি।



হোস্টেলের ব্যালকনিতে তাজুল ভাই আর বন্দনাদির সঙ্গে

১৭ জনের দলে আরও ছিল ছোটখাটো গড়নের, আমাদের চেয়ে কিছুটা বেশি বয়সী আবদুল্লাহ, সর্বক্ষণ খোশমেজাজে থাকা রফিক আর হেলাল, সদা হাসিখুশি জহুর, কিছুটা ভাবগম্ভীর আওয়াল, অতিরিক্ত ধর্মপরায়ণ রউফ, অপেক্ষাকৃত শান্ত আর চুপচাপ শাকের ও ফয়েজ এবং সব সময় প্রমিত বাংলায় কথা বলতে অভ্যস্ত খোরশেদ। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শুরু থেকেই চাইছিল আমরা সবাই যেন বাংলাদেশি ছাত্রদের একটি সংগঠনের ছায়ায় একত্র হই। এতে করে নেতার সঙ্গে কথা বলে সব বার্তা ছাত্রদের কাছে পৌঁছে দেওয়া কর্তৃপক্ষের জন্য সহজ হবে। কোনো উপায়ে নেতা হওয়ার বাসনা বা মনের ঘোরপ্যাঁচের হিসাব আমার জানা ছিল না। ফলে নিজেদের একটি সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগে খুব সহজেই এক ষড়যন্ত্রের জালে আমি আটকা পড়ে যাই।

মনে পড়ে আমাদের ক্লাস শুরু হওয়ার অল্প কিছুদিন পর হঠাৎ করে আবদুল্লাহ আমাকে ওর ঘরে নিয়ে যায়। দেখি রফিক আগে থেকেই উপস্থিত। আবদুল্লাহ আমাকে বলেছে, পরদিন তিনজনে মিলে আমরা কোনো এক কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করতে যাব। এ বিষয়ে কাউকে যেন কিছু না বলি। পরদিন ক্লাস শেষে ট্রলি-বাসে চেপে শহরের অন্য এক জায়গায় উপস্থিত হই। সেখানে আমাদের সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি ঘরে নিয়ে বসানো হয়। কিছুক্ষণ পর বিশ্ববিদ্যালয়ের পদস্থ এক কর্মকর্তা এসে বাংলাদেশের ছাত্রদের সমিতি গড়ে তুলে এর নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য আমাদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এখন থেকে কর্তৃপক্ষ সমিতির সভাপতি হিসেবে আবদুল্লাহর সঙ্গে সব রকম যোগাযোগ রক্ষা করবে। তখনই আমি প্রথমবারের মতো জানতে পারি তিন সদস্যের যে নির্বাহী কমিটি গঠনের বার্তা আবদুল্লাহ ইতিমধ্যে কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে, আমি সেই কমিটির সাংস্কৃতিক সম্পাদক। রফিক সাধারণ সম্পাদক। আমি বিস্ময় প্রকাশ করি। অন্যদের কিছু না জানিয়ে এভাবে কেন কমিটি গঠন করা হলো—আবদুল্লাহর কাছে এ প্রশ্নের উত্তর পাইনি। হোস্টেলে ফিরে এসে কমিটি গঠনের সংবাদ অন্যদের কাছে পৌঁছে দিতে হলো। এর ফলে ১৭ জনের দলে প্রথমবারের মতো ফাটল ধরার আওয়াজ পেলাম। অন্যদের কঠোর সমালোচনার মুখে আবদুল্লাহকে শেষ পর্যন্ত পিছু হটতে



পুরোনো শহরে বসন্ত

হয়। ওকে বাদ দিয়ে সবার সম্মতি নিয়ে পরে নতুন কমিটি গঠন করি আমরা।

ক্ষণিকের সেই স্খলন প্রবাসে গড়ে ওঠা বন্ধুত্বে বড় কোনো ফাটল ধরাতে পারেনি। আবদুল্লাহর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক থেকে গেছে আগের মতোই। ছোটখাটো গড়ন আবদুল্লাহর জন্য বাড়তি কিছু সুবিধা নিয়ে এনেছিল। ঠাট্টার ছলে ওকে বলতাম, ঈশ্বর ওর দেহ ছোটখাটো করে দিয়েছেন যাতে সে বিশেষ ফায়দা লুটতে পারে। কেননা, ছোট দেহের কারণে আবদুল্লাহ খুব সহজে 'দেতস্কি মির' বা 'শিশুদের জগৎ' নামের দোকানে গিয়ে খুব সস্তায় নিজের মাপের নানা রকম পোশাক কিনতে পারত। জুতা-মোজা থেকে শুরু করে স্যুট-কোট পর্যন্ত সে শিশুদের পোশাকের দোকানে পেয়ে যেত।

এ রকম মান-অভিমান আর আনন্দ-ফুর্তির মধ্য দিয়ে কেটেছিল আমাদের প্রবাসজীবনের সূচনার কয়েকটি মাস। দেশের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম ছিল চিঠিপত্র। আমরা যখন ক্লাসে রুশ ভাষার পাঠ নিয়ে গলদঘর্ম হচ্ছি, তখন ডাকপিয়ন এসে চিঠির বস্তা হোস্টেলের প্রবেশপথের দ্বাররক্ষক বুড়ির কাছে রেখে যেত। নানা দেশ থেকে আসা চিঠি বস্তা থেকে বের করে সামনের একটি টেবিলে সাজিয়ে রাখা হতো। ক্লাস শেষ করে দৌড়ে আমরা ছুটে যেতাম সেই টেবিলের দিকে। কোনো দিন হয়তো হাতে আসত একসঙ্গে তিন-চারটি চিঠি। এরপর আবার হয়তো দেখা যেত চিঠির আকাল। আমাদের মধ্যে কে দিনে কয়টি চিঠি পেল, সেই প্রতিযোগিতাও অলক্ষ্যে চলত। জগলু যেমন দেখা হলেই প্রশ্ন করত, 'কিরে! আজ কয়টা পেলি?'

কিয়েভে আমরা পৌছেছিলাম গ্রীষ্মের একেবারে শেষ দিকে। তখনো খুব বেশি বাড়তি কাপড়চোপড় গায়ে না চড়ালেও চলছিল। অল্প দিনের মধ্যে হেমন্ত শীতের আগাম বার্তা পৌছে দিতে শুরু করে। অবাধে বাইরে ঘুরে বেড়ানোর দিন শেষ হতে থাকে। নভেম্বর বরফঢাকা শীতের উপস্থিতির জানান দিতে শুরু করে। শীত শেষে কবে আবার বাইরে ঘুরে বেড়ানোর মতো পরিবেশ তৈরি হবে, আমরা তার অপেক্ষা করি।

এর মাঝে আমি, বন্দনাদি ও তাজুল ভাই মিলে সস্তা একটি ক্যামেরা কিনে ইতিমধ্যে ছবি তুলতে শুরু করেছি। ঘরে বসে কীভাবে ছবি প্রিন্ট করা যায়, ভিক্তর আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিল সেই কৌশল। ভিক্তরের নিজের একটি প্রিন্টার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ছিল। সে সুবাদে ঘরে বসে নিজের তোলা ছবি নিজে প্রিন্ট করার আনন্দ পেতে শুরু করি।

আমাদের ১৭ জনের দলে একমাত্র নারী সদস্য বন্দনা দিদি। লেখাপড়ায় তিনি কয়েক বছর ওপরে ছিলেন। তাজুল ভাই চুনি ভাই নামে অল্প দিনের মধ্যেই সবার কাছের মানুষ হয়ে ওঠেন। দেশে দুজনই তাঁরা ছিলেন ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃস্থানীয় কর্মী। তাজুল ভাই—যার ভালো নাম তাজুল ইসলাম—পরে তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। তাজুল ভাই সোভিয়েত ইউনিয়নে গিয়েছেন স্নাতকোত্তর পর্যায়ে লেখাপড়া করতে। ভুল-বোঝাবুঝির কারণে কর্তৃপক্ষ তাঁদের আমাদের মতো স্নাতক পর্যায়ের ছাত্রদের দলে ভিড়িয়ে দেয়।

বন্দনাদির মাধ্যমে আমাদের প্রায় সবারই প্রথমবারের মতো পরিচয় হয় রুশ তরুণীদের সঙ্গে। বন্দনাদির দুই রুশ তরুণী রুমমেট অল্প দিনের মধ্যেই আমাদের দলের বর্ধিত অংশ হয়ে ওঠে। আরও দুই ভিনদেশি তরুণীর উল্লেখ না করলেই নয়। এদের দুজনের সঙ্গেও আমাদের গড়ে উঠেছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কুমুদিনী এসেছিল শ্রীলঙ্কা থেকে, তারানার নিবাস ভারত মহাসাগরের দ্বীপরাষ্ট্র মরিশাস।

যে কিয়েভ শহরে আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নে আমাদের শিক্ষাজীবন শুরু করেছিলাম, সেই কিয়েভ এবং বৃহত্তর গণ্ডিতে ইউক্রেন যে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক অস্তিত্ব—যার রয়েছে নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি—কিয়েভে অবস্থান করার

ফলেই তা আমরা ভালোভাবে জানতে পেরেছিলাম। রুশ ছাত্ররা প্রায় সবাই নিজেদের সোভিয়েত পরিচয় নিয়ে গর্ববোধ করলেও ইউক্রেনের অধিবাসীদের মধ্যে একধরনের সুপ্ত জাতীয়তাবোধ দেখেছি। এটা নিয়ে এরা গর্বিতও ছিল। সে রকম ইউক্রেনবাসীর কাছ থেকে জেনেছি ইউক্রেনের জাতীয়তাবাদী নেতা বাগদান খমেলনিভস্কির বীরত্বের নানা রকম গল্প, শুনেছিলাম তারাস শেভচেঙ্কোর কথা, যার কাব্যপ্রতিভাকে ইউক্রেনের লোকজন পুশকিন কিংবা লেরমেন্তোভের সমপর্যায়ের মনে করত। তবে সেটা ছিল অনেকটাই সোভিয়েতের মোড়কে ঢাকা সুপ্ত জাতীয়তাবাদ। এদের কেউই সে রকম কোনো ইঙ্গিত আমাদের কখনোই দেননি, যা থেকে ভিন্নমতের বিস্তৃতির কোনো রকম আঁচ পাওয়া যায়। হতে পারে সে রকম মতবাদ বিদেশিদের সামনে প্রকাশ করার মতো উপযুক্ত সময় সেটা ছিল না। তবে তা সত্ত্বেও ইউক্রেনের ভেতরে যে যথেষ্ট বিভাজন বিদ্যমান, সেই আভাস কিন্তু আকারে-ইঙ্গিতে আমরা পেয়েছি।

কিয়েভের জীবনের শুরুর কয়েক মাস আমরা প্রায় সবকিছুই করেছি দলবদ্ধভাবে। ছবিও দেখেছি একসঙ্গে মিলে। আরও পরে ক্রমে আমরা দলছুট হয়ে যেতে শুরু করি। কারও কারও বান্ধবী জুটে যাওয়ায় তখন আর সবাই মিলে সেভাবে সবকিছু করে ওঠা হয়নি। তবে মাঝেমধ্যে বেশ কয়েকজন মিলে বাইরে কোথাও বেড়াতে যেতাম। সিনেমা আমরা নিজে থেকে দেখতাম। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাদের জন্য ব্যালের মঞ্চ-উপস্থাপনা দেখানোর ব্যবস্থা করে দেয়। সেই সূত্রে কিয়েভে আমি প্রথমবারের মতো *সোয়ান লেক* ব্যালে দেখার সুযোগ পেয়েছি। একবার আমাদের সার্কাস দেখাতেও নিয়ে যাওয়া হয়।

বসন্তের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও প্রস্তুতি নিতে শুরু করি রুশ ভাষা শেখার পর্ব শেষ করার। শেষ করার আগে অবশ্য পরীক্ষার বাধা পার হতে হবে। পরীক্ষার পাট চুকে যাওয়ার পর গ্রীষ্মের ছুটির শেষে আবারও আমাদের ছড়িয়ে পড়তে হবে নানা দিকে। কেউ থেকে যাবে কিয়েভে, অন্যরা যাবে অন্যান্য শহরে।

বসন্তের আগমন আবার দলবদ্ধ হয়ে বাইরে বের হওয়ার অনুপ্রেরণা দেয় আমাদের। আগের চেয়ে বেশি আত্মবিশ্বাস নিয়ে আমরা এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াতে শুরু করি। এর আগে শীতের ছুটিতে অবশ্য প্রথমবারের মতো অন্য শহর দেখার সুযোগ হয়েছিল আমাদের। শীত ও গ্রীষ্মের ছুটিতে বিদেশি ছাত্রদের জন্য বিভিন্ন জায়গা ভ্রমণের ব্যবস্থা করত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। নির্দিষ্ট একটি তালিকা থেকে আমরা নিজেদের পছন্দের গন্তব্য বেছে নিতে পারতাম। শীতের ছুটিতে আমি গিয়েছিলাম বেলারুশের রাজধানী শহর মিনস্কে। তখন মিনস্ক ছিল বরফের পুরু চাদরে ঢাকা। শীতের প্রচণ্ডতার মধ্যে বাইরে ঘুরে বেড়ানোর মধ্য দিয়ে ভ্রমণ ভালোভাবে উপভোগ করার সুযোগ তেমন হয়নি। যেসব জায়গায় আমরা গিয়েছি, সেগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসি বর্বরতার সাক্ষ্য বহনকারী স্মৃতিসৌধ মনে দাগ কেটেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান বাহিনী পূর্ব দিকের ফ্রন্টে অগ্রাভিযান শুরু করার পরই বেলারুশের পতন ঘটে। দীর্ঘ সময় নাৎসিদের দখলে থাকা অবস্থায় নাৎসিরা সেখানকার রুশ ও ইহুদি জনগোষ্ঠীর ওপর নানা রকম নিপীড়ন চালায়। সেই বর্বরতার চিহ্ন বেলারুশের বেশ কিছু জনপদ আজও ধরে রেখেছে। সেবার বেলারুশে ভ্রমণে গেলেও আমার অবশ্য যাওয়ার কথা ছিল ইউক্রেন আর বেলারুশের বিস্তৃত অঞ্চলজুড়ে আয়োজন করা বাসভ্রমণে। ভাষাগত জটিলতা সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে আমাকে।

তিরিশ মিনিটের হিসাব গণনায় রুশ ভাষার সঙ্গে অন্যান্য ভাষার কিছু পার্থক্য আছে। আমরা যেমন সাড়ে ১০টা বলতে বুঝি ঘড়ির কাঁটার ১০টা বেজে ৩০ মিনিটে গিয়ে দাঁড়ানো। রুশ ভাষায় এটা ঠিক সে রকম নয়। পোল দেসিয়াতাভা বা ১০টার অর্ধেক হচ্ছে ৯টা বেজে ৩০ মিনিট। অর্থাৎ, অর্ধেকের অংশটি রুশ ভাষায় আসছে যে সংখ্যার সঙ্গে, সেটা যুক্ত করা হচ্ছে তার আগে, আমাদের বাংলা ভাষা কিংবা ইংরেজির মতো পরে নয়। ভাষার এ রকম জটিল নিজস্ব নিয়মকানুন চট করে বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। তখন মাত্র চার মাস রুশ ভাষার ক্লাস করেছি। সে বিদ্যা নিয়ে এ জটিলতা ধরতে পারিনি। আমি যে ইউক্রেন ও বেলারুশের কয়েকটি শহরে যাওয়ার বাসভ্রমণে যোগ দেব, তা ঠিক হয়ে যাওয়ার পর আমাকে বলা হয়েছিল যে বিশেষ একটি দিনে ভ্রমণের বাস পোল দেভিয়াতাভা বা নয়টার অর্ধেকের সময়ে স্কুলচত্বরে এসে উপস্থিত হবে। আমি যেন বিলম্ব না করে সেখানে উপস্থিত থাকি। নয়টার অর্ধেককে আমি বাংলা গণনার হিসাব অনুসরণ করে সকাল সাড়ে নয়টা ধরে নিই এবং সেই সময়ের কিছুটা আগে সঠিক জায়গায় পৌঁছাই। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখি কেউ নেই। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও বাসের দেখা না পেয়ে মালপত্র নিয়ে হোস্টেলে ফিরে গিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করি। আমাকে বলা হলো যে, বাসটি ঠিক সাড়ে আটটায় সেখানে পৌঁছে মিনিট দশেক অপেক্ষা করেছিল। শেষ পর্যন্ত আমাকে না পেয়ে রওনা হয়ে গেছে গন্তব্যের পথে। সেই ভুল থেকে সময়ের হিসাব আমি ভালোভাবে শিখেছি। সেই ভুল আর করিনি।

সত্তরের দশকের একেবারে গোড়ার দিকের যে কিয়েভকে আমরা পেয়েছিলাম, তার সঙ্গে একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের কিয়েভের মিল খুব বেশি নেই। কিয়েভ এখন হচ্ছে স্বাধীন একটি দেশের রাজধানী। গৃহযুদ্ধে দেশটির অনেক ক্ষতি হলেও কিয়েভের অগ্রযাত্রা এতে থেমে থাকেনি। সেই সময়ের কিয়েভ ছিল মফস্বলি ধাঁচের এক শহর। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে শহর গড়ে উঠলেও এর প্রাণকেন্দ্র ক্রেশ্চাটিক এবং নগর কেন্দ্রের আরও কয়েকটি অংশ ছাড়া বাদবাকি সবটাই সন্ধ্যার পর মফস্বল শহরের মতোই নিজেকে গুটিয়ে নিত। তবে ক্রেশ্চাটিক এবং কাশতান বা কাঠবাদামগাছের ছায়াঘেরা এর প্রাণবন্ত সড়কপথের ছিল গাম্ভীর্য ভরা এক সৌন্দর্য। আমি নিশ্চিত, কিয়েভ আজও সেই সৌন্দর্য ধরে রেখেছে। পরিবহনব্যবস্থায় পাতালরেল থেকে গেলেও তখন পর্যন্ত তা খুব বেশি সম্প্রসারিত ছিল না। ট্রলি-বাস ছিল সেই সময়ের কিয়েভের মূল যানবাহন, যা আমাদের খুব পছন্দের ছিল। নামমাত্র ভাড়ায় ট্রলি-বাসে চেপে যেকোনো দূরত্বে চলে যাওয়া যেত। কিয়েভের গাছপালাঘেরা পরিবেশ গ্রীষ্মে শহরকে অনেক বেশি প্রাণবন্ত করে তুলত। রুশরা বলে, রুশ সভ্যতার পত্তন কিয়েভ থেকে। দৃষ্টান্ত হিসেবে কিয়েভস্কি রুসের উদ্ধৃতি দেয় তারা। সে সময় অবশ্য বিষয়টি নিয়ে কোনো বিতর্ক শুনিনি, যেমনটা শোনা যাচ্ছে একালের কিয়েভ ও ইউক্রেনে। আমরা যে ১৭ জন কিয়েভে আমাদের সোভিয়েত জীবন শুরু করেছিলাম, তাদের কাছে কিয়েভ সব সময় ভিন্ন এক অর্থ নিয়ে উপস্থিত থাকবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে আট বছরের পুরো সময়টায় ফুটবলে আমি ছিলাম দিনামো কিয়েভ দলের একনিষ্ঠ

সমর্থক। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়ার আগে রাশিয়ার শীর্ষ পর্যায়ের ফুটবল লিগে দিনামো কিয়েভ ছিল নেতৃস্থানীয় একটি দল। তখন স্টেডিয়ামে গিয়ে ফুটবল খেলা দেখার সুযোগ না হলেও দিনামো কিয়েভ সম্পর্কে সেখানকার লোকজনের উৎসাহ আমরা ঠিকই আঁচ করতে পেরেছিলাম। মস্কো চলে আসার পর শুরুর দিকে হোস্টেলে ইউক্রেনের এক রুমমেট আর আমি বেশ কয়েকবার দিনামো কিয়েভের খেলা দেখতে স্টেডিয়ামে গিয়েছি। একবার কাপ ফাইনালে দিনামো কিয়েভের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ফুটবল লিগে আর্মেনিয়ার প্রতিনিধিত্ব করা দল আরারাত। ফাইনাল খেলাটি হয়েছিল মস্কোর লুঝনিকি স্টেডিয়ামে। আমাদের আর্মেনীয় বন্ধু সাশা পাপাজিয়ানও সেবার আমাদের সঙ্গে স্টেডিয়ামে গিয়েছিল। অবশ্যই ওর সমর্থন ছিল নিজের দলের প্রতি। ওর সঙ্গে ছিল দুই বোতল আর্মেনিয়ান কনিয়াক। পাপাজিয়ানের বদ্ধমূল ধারণা ছিল, আর্মেনিয়ার দল খেলায় জিতে যাবে এবং বিজয়ের আনন্দে কনিয়াক সে আমাদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেবে। তবে শুরু থেকে এক গোলে পিছিয়ে থাকা আরারাত যখন খেলা শেষ হওয়ার মিনিটখানেক আগে পর্যন্ত গোল শোধ করতে পারেনি, বেচারা পাপাজিয়ান তখন মনের দুঃখে ব্যাগসহ বোতল দুটি আমাদের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, আমরা যেন বিজয়ের আনন্দে পান করে নিই। এ কথা বলে ও ফিরে যাওয়ার জন্য স্টেডিয়ামের গেট পর্যন্ত যেতেই একেবারে শেষ মুহূর্তে আরারাত গোল করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনে। পাপাজিয়ান তখন দৌড়ে আমাদের কাছে ফিরে এসে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, কনিয়াকের বোতল যেন আমরা না খুলি। খেলা এরপর অতিরিক্ত সময়ে গড়ায় এবং আরারাত শেষ পর্যন্ত জিতে যায়। আমি এতে কষ্ট পেলেও আমার ইউক্রেনের রুমমেটের চোখে পানি চলে এসেছিল। পুরো সময় ধরে এগিয়ে থেকেও শেষ মিনিটে একটি গোল খেয়ে দিনামো খেলায় হেরে গেল। পাপাজিয়ানের আনন্দ তখন দেখে কে! কনিয়াকের খোলা বোতল সে সবার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে আনন্দের বন্যায় ভাসছিল। আমাকে বলেছিল, অন্য দেশ থেকে এসেছি বলে আমার আরারাতকে সমর্থন করা উচিত ছিল। তাহলে এ হারের জন্য আমাকে আর কষ্ট পেতে হতো না।

কিয়েভের ছাত্রজীবন শেষ হয়ে আসার আগে বসন্তের প্রাণবন্ত দিনগুলোতে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক অভিজ্ঞতা হয় আমাদের। মে দিবসের ছুটি উপলক্ষে মাকসুদ তখন মস্কো থেকে আমাদের কাছে ছুটি কাটাতে এসেছে। এক বিকেলে আমরা কয়েকজন ওকে নিয়ে বের হয়েছি কিয়েভের আশপাশে হেঁটে ঘুরে বেড়াতে। হোস্টেল থেকে অল্প দূরে পাহাড়ঘেরা শহরতলির দিকে রোদমাখা বিকেলে আমরা হাঁটছিলাম। কাছেই টিলার ওপরের একটি বাড়ি থেকে লোকজনের আনন্দ-ফুর্তির আওয়াজ ভেসে আসছিল। আমরা ভেবেছি শ্রমিক-জনতা মে দিবসের ছুটি উপভোগ করছে। সেদিকে আরও কিছুটা এগিয়ে যেতেই চোখে পড়ল, কিছু বয়স্ক নারী-পুরুষ গাছের নিচে চেয়ার-টেবিল পেতে পানাহারে মত্ত। এরাও অবাক হয়ে আমাদের দেখছিল। একসময় সেই দলের এক বৃদ্ধ এগিয়ে এসে আমাদের ডেকে বললেন, আমরাও যেন তাঁদের সেই পানাহারের আসরে যোগ দিই। ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না কী করা দরকার। এ ধরনের কোনো অভিজ্ঞতা এর আগে হয়নি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য অল্প সময়ের জন্য এদের আমন্ত্রণে সাড়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। আমরা সেখানে যেতেই অন্যরাও আমন্ত্রণ জানিয়ে একসঙ্গে পানাহারে অংশ নেওয়ার জন্য আমাদের কাছে ডেকে নেয়।

স্থানীয় লোকজনের পানাহারের রীতিনীতি আমাদের জানা ছিল না। অনেকটা কৌতূহল থেকেই আমরা সানন্দে রাজি হয়েছি। তবে টেবিলে একবার বসে যাওয়ার পর বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে অল্প সময়ে সেখান থেকে বের হয়ে আসা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। সমানে আসছিল নানা রকম খাবার ও ভোদকার বোতল। পরে অবশ্য বুঝেছি, সেই সব মদের অধিকাংশই ছিল এদের নিজেদের চোলাই করা, যেগুলো ভোদকার চেয়েও অনেক বেশি কড়া। আমাদের মধ্যে কেউই তখন পর্যন্ত সেই অর্থে মদে আসক্ত হয়ে ওঠেনি। অল্পবিস্তর যেটুকু পান করেছি, তা ছিল বিয়ার। খুব বেশি হলে সস্তার ওয়াইন। সেখান থেকে একেবারে ঘরে তৈরি চোলাইয়ে উত্তরণ আমাদের জন্য ছিল রীতিমতো ভীতি জাগানো ব্যাপার।

রুশ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে পুরো গ্লাসের মদ এক চুমুকে পান করা অনেক ক্ষেত্রেই গৃহকর্তার প্রতি শ্রদ্ধার প্রকাশ বুঝিয়ে থাকে। আমন্ত্রণকারীও প্রত্যাশা করেন যে অতিথি সে রকম স্বাভাবিক আচরণ দেখাবেন। গ্লাসের পুরো মদ এক ঢোঁকে শেষ করে ফেলাকে রুশ ভাষায় বলা হয় দো দ্না, যার আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে তলানি পর্যন্ত। আমাদের বেলায়ও গৃহকর্তাদের প্রত্যাশা ঠিক সে রকমই ছিল, অর্থাৎ দো দ্না পর্যন্ত আমরাও এক চুমুকে পুরো গ্লাসের মদ উগরে দেব। কিন্তু সেটা তখনো আমরা বুঝে উঠতে পারিনি এবং আমাদের ধারণা ছিল না যে বিদেশি তরুণদের কাছেও একই রকম প্রত্যাশা থাকতে পারে। আমাদের প্রত্যেকের হাতে গ্লাস ধরিয়ে দিয়ে তাঁরা বলেছেন, যেন এক ঢোঁকে পুরো গ্লাস শেষ করি। বুঝতে পারলাম, তাঁদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে কোন সমস্যা নিজেদের জন্য ডেকে এনেছি। ফলে আমরা তখন পাল্টা অনুনয় শুরু করেছি। যেহেতু সেই অর্থে মদ খেতে আমরা অভ্যস্ত নই, তাই তাঁরা যেন অনুকম্পা করে ছাড় দেন। সেই দলে অল্প যে কয়েকজন বয়স্ক নারী ছিলেন, কোন অসুবিধায় আমরা পড়েছি, সেটা তাঁরা আঁচ করতে পেরেছিলেন। আমাদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে তাঁরা বলেছিলেন যে একবারে পান না করলেও চলবে, তবে আমরা যেন ধীরে হলেও গ্লাসের পুরো মদ শেষ করি। আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। তবে মাকসুদের কানে হয়তো কথাটি যায়নি; কিংবা হতে পারে চাতুরীর আশ্রয় নিয়ে ওদের সে ধোঁকা দিতে চেয়েছে। ধীর গতিতে আমরা মদ খাওয়া শুরু করার অল্প কিছুক্ষণ পর নিজের খালি গ্লাস অন্যদের দেখিয়ে সে বলে ওঠে, যেহেতু পুরো গ্লাসের মদ সে এক চুমুকে শেষ করে ফেলেছে, তাই গৃহকর্তারা এবার যেন দয়া করে আমাদের চলে যাওয়ার অনুমতি দেন। মাকসুদ হয়তো মনে করেছে, সে রকম বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার সহজ এবং একমাত্র পথ ছিল সেটা। তবে ওর সেই চাল একেবারে উল্টো ফল নিয়ে এসেছিল এবং আরও বড় বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছিল আমাদের।

এক বৃদ্ধ মাকসুদের দিকে শুরু থেকে লক্ষ রাখছিলেন, মাকসুদ তা বুঝে উঠতে পারেনি। মাকসুদ ওর গ্লাস উঁচু করে দেখানোর পর সেই বৃদ্ধ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান এবং বড় একটি গ্লাস হাতে নিয়ে মাকসুদের দিকে এগিয়ে যান। আমরা বুঝে উঠতে পারছিলাম না কী হতে যাচ্ছে। মাকসুদের একটি হাত শক্ত করে ধরে তিনি বললেন, তাঁর অন্য হাতে ধরে রাখা বড় গ্লাসের পুরো মদ মাকসুদ এক চুমুকে পান না করলে রাত হয়ে



দেখতে গিয়েছিলাম রুশ ব্যালে *সোয়ান লেক*

গেলেও সেখান থেকে আমাদের যাওয়ার অনুমতি দেবেন না। তিনি ঠিকই দেখেছেন, মাকসুদ গ্লাসের মদ পান না করে পুরোটাই মাটিতে ফেলে দিয়েছে। কিন্তু বলেছে, পুরো মদ সে পান করেছে। বৃদ্ধ এটাকে দেখেছিলেন গৃহকর্তার অপমান হিসেবে। এ জন্যই এতটা ক্ষুব্ধ হয়েছেন তিনি। সেই অপরাধের শাস্তি হিসেবে তিনি আরও মদ পান করাতে চেয়েছিলেন। বৃদ্ধের চোখে তখন ফুটে উঠেছিল ক্রোধের চিহ্ন, যা আমাদের আরও বেশি হতবুদ্ধি করে দিয়েছিল।

শুধু মাকসুদ কেন, আমাদের সবারই তখন কান্না পাওয়ার অবস্থা! শেষে আমরা তাঁদের বোঝাতে চেষ্টা করি যে আমাদের ভুল হয়ে গেছে। সে জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। গৃহকর্তা যেন বিদেশি হিসেবে আমাদের অপরাধ মার্জনার চোখে দেখেন এবং আমাদের ক্ষমা করে দেন। একদল বৃদ্ধ মাতালকে কিছু বুঝিয়ে বলা কঠিন কাজ। আমাদের সৌভাগ্য, নারীরা আমাদের সেই করুণ অবস্থা আঁচ করতে পেরেছিলেন এবং তাঁরাই আমাদের চলে যাওয়ার অনুমতি দিতে বৃদ্ধ সাথিদের রাজি করান। বৃদ্ধরা তখনো আমাদের অনুনয়-বিনয় শুনতে রাজি ছিলেন না। অবশেষে দলের এক বৃদ্ধা আমাদের বলেন, আমরা যেন তখনই উঠে গিয়ে চটপট তাঁকে অনুসরণ করি। কথাটা বলেই অন্য বৃদ্ধাদের হাতে মাতাল সামাল দেওয়ার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে আমাদের নিয়ে তিনি উঠে পড়েছিলেন। তাঁর নিশ্চয় জানা ছিল যে মাতালদের পক্ষে খুব বেশি দূর হেঁটে যাওয়া সম্ভব নয়। তিনি আমাদের পাহাড়ি সেই পাড়াগাঁ থেকে মূল রাস্তা পর্যন্ত নিয়ে আসেন এবং মনে করিয়ে দেন, সে রকম ভুল আমরা যেন আর কখনো না করি। মনে মনে সেই বৃদ্ধার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা দেখিয়ে অনেকটা দৌড়ে আমরা ফিরে গিয়েছি হোস্টেলের পথে। হোস্টেলে ফিরে ভিক্তরকে বলেছি সব। ভিক্তর অবাক হয়ে গেছে। জায়গাটির যে তেমন সুনাম নেই, পরে তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি আমাদের এবং আর কখনোই সেদিকে পা বাড়াইনি।

আবার স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে মেলামেশার তৃপ্তির অভিজ্ঞতাও আছে আমাদের। সম্ভবত বন্দনাদির দুই রুমমেটের একজনের মাধ্যমে সাশা বলে এক তরুণের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। মেদহীন দীর্ঘকায় দেহের অধিকারী সাশার চোখ দুটি ছিল হালকা নীল, যে চোখকে পশ্চিমে রমণীমোহন আঁখি হিসেবে দেখা হয়। স্বভাবে সাশা ছিল খুবই শান্ত প্রকৃতির। আমাদের সঙ্গে কয়েকবার বাংলা খাবারের স্বাদ নিয়েছে সে এবং তৃপ্তির সঙ্গে খেয়েছিল ঝাল খাবার।

বেশ কিছুদিন পরে আমরা জানতে পারি যে সাশা উদীয়মান এক কবি এবং কিয়েভের বিভিন্ন সাহিত্য আসরে এই তরুণ কবির আছে নিয়মিত আসা-যাওয়া। আমরা ওর কবিতা শোনার বায়না ধরলে সে আমাদের ওর নিজের লেখা কিছু কবিতা শোনায়, যার অর্থ তখন আমরা পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারিনি। কবিতার প্রতি সাশার এতটা আকর্ষণ লক্ষ করে চুনি ভাই একসময় ওর নাম দেন কাজী নজরুল ইসলাম। ওর কাছে ব্যাখ্যাও দিয়েছিলেন কেন ওকে আমরা কাজী নজরুল ইসলাম বলে ডাকি। সাশা পরে বায়না ধরে, আমরা যেন ওকে নজরুলের কবিতা শোনাই। আমাদের মধ্যে কেউ ওকে বিদ্রোহী কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়েছে। বাংলা সেই আবৃত্তি সাশার পছন্দ হয়েছিল। তবে রুশ ভাষায় এর অর্থ বুঝিয়ে দিতে আমাদের কয়েকজনের ঘাম বেরিয়ে গেছে। রুশ ভাষায় আমাদের দৌড় তখনো সীমিত। পরে অবশ্য সাশা নিজেই লাইব্রেরি থেকে রুশ ভাষায় নজরুলের কবিতার একটি সংকলন জোগাড় করেছে এবং সেটা আমাদের দেখিয়ে অনেক আনন্দ পেয়েছে সে। ❦